"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

(মাসিক পত্র)

দ্বিতীয় বর্ষ

আচার্য্যগণের নাম—

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্ন

" " " শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্ন

শ্রীমৎ ঠাকুর কানাইবংশ্য বৈষ্ণবকুলভাস্কর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

পৃষ্ঠপোষকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি-এল্ জমিদার

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার ও
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট

তাড়াশাধিপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়

পরিদর্শক ও পরামর্শদাতা—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, (City architect,
Calcutta Corporation)

কোষাধ্যক্ষ (Honorary Treasurer)

রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন)

[বার্ষিক মূল্য সডাক

বর্ষ-শেষে

ভক্তগণের বড় আদরের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। জীবনের পথে তাহার এই জয়যাত্রার উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা ভক্তমণ্ডলীকে সানন্দে আমন্ত্রণ করিতেছি।

অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া যে বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ বিদায়ের পথে পদক্ষেপ করিয়া পুরাতনের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই পুরাতনের পিছনে লুকাইয়া আছে নূতনের সুষমা-মাখা অভিনব মূর্ত্তি।

গাছের পাতা পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে—নূতনের উদ্গমের জন্য—তাহাকে পোষণ করিবার জন্য। মহাকালের আইনের খাতায় ইহা একটি বিশেষ ধারা; পুরাতন নূতনের অগ্রদূতরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং তাহাকে উৎসাহভরে অভিনন্দিত করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

তারপর সেই পুরাতনই আবার যখন জীর্ণবেশে বিদায়ের পথে পদক্ষেপ করিয়া নূতনের আসিবার পথ সুগম করিয়া দেয়, তখন তাহাকে বিদায়সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া নূতনের আবাহনের জয়গীতি গাহিতে হইবে। এই আসা যাওয়াই যে প্রকৃতির সনাতন নিয়ম। তাহাকে অনাদর করিলে চলিবে কেন?

ধর্ম্মজগতেও এই আসা যাওয়া অবিরাম চলিতেছে, সেই কৃতযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজপর্য্যন্ত নানাবিধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম নবীন সুষমোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ফলে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া ভারতের প্রতি পল্লীতে প্রতি ঘরে মহাভাবের এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া অভিনব উন্মাদনায় সকলকে অভিভূত করিয়া তুলিল, জীবের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। এই শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মই এবারের যুগবাণী। ইহাতে ধর্ম্মে নবভাব আনিবে, কর্ম্মকে মহিমাময় মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবে, প্রেমের নব জাগরণে সমস্ত জগৎ উদ্বুদ্ধ হইবে। সর্ব্ববিষয়কে মহিমান্বিত চিরসুন্দর করিয়া তুলিবে,—যাহার ফলে "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলী কবে বা ছিল এ রঙ্গ" এই বাণী সার্থক হইবে।

এই চিরনবীন যুগবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই 'শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের' আবির্ভাব হইয়াছিল; এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে এবং যতদিন বাঁচিবে করিবেও তাহাই।

বরষার অবিরল ধারা সম্পাতে সমগ্র ধরার বুকে যেমন জীবনের স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে, তেমনই শ্রীশ্যামসুন্দরের কৃপাবারিতে অভিষিক্ত হইয়া ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আমাদের "শ্রীশ্যামসুন্দর" সুষমোজ্জ্বল মহিমাময় মূর্ত্তিতে নববর্ষে প্রকাশ পায় ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের সেই ইচ্ছা ভক্তগণের সমবেত সাহায্যে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাই আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি—ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে যেন বঞ্চিত না হই। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিয়া অতুল সৌভাগ্য লাভ করুন।

গত দুই বর্ষ আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আমরা সাধ্যমত ভক্তগণের সন্তোষবিধানের চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি এবিষয়ে বহু ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিবার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ দয়া করিয়া নিজগুণে তাহা জানাইলে ভবিষ্যতে সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ—তাঁহারা যেন শ্রীশ্যামসুন্দরের মূল্য বর্ষারম্ভেই পাঠাইতে সচেষ্ট হন। বাধ্য হইয়া ভিপি করিয়া যেন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না হয়।

আজ নূতন ও পুরাতন বর্ষের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহকগণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া যুক্তকরে সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি—

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভির্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥

শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামি কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ ভাদ্র—১৩৩৯ ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণ

[প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী]

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

"এই চতুর্থ শ্লোকে শ্রীলগ্রন্থকার সমস্ত জগতের জীব-য় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা সংলিত আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিএ কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥ আঃ চঃ।

এস্থলে প্রথম সন্দেহ এই যে—

বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের পর আশীর্ব্বাদরূপ এই মঙ্গলাচরণ করিবার সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই যে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব অতি মহান্, জীবতত্ত্ব অতি অণু; তাই অতি ক্ষুদ্র জীব কেমন করিয়া অতি বৃহৎ ও অতি নিগূঢ় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে? একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী কৃপা-শক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই এ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। সেই শ্রীকৃষ্ণকৃপা হইতেও ভগবদ্ভক্ত-কৃপা সর্ব্বথা নিরপেক্ষা ও বলবতী! সেই মহতী কৃপাশক্তি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর প্রতি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; তাই শ্রীপাদরূপ-গোস্বামি কৃত শ্রীবিদগ্ধমাধবোক্ত শ্লোকের দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

দ্বিতীয় সন্দেহ উঠিতে পারে এই যে—শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি চরণ নিজ-কৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ না করিয়া শ্রীপাদরূপগোস্বামিচরণকৃত শ্লোকদ্বারা মঙ্গলাচরণ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে কেহ বলেন—"অপেক্ষাকৃত মহত্তর ব্যক্তি, তদপেক্ষা লঘুতর ব্যক্তিকেই আশীর্ব্বাদ করিতে পারে, কিন্তু লঘুতর ব্যক্তি মহত্তর ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে না; এজন্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী যদি নিজে জগৎকে আশীর্ব্বাদ করেন, তবে তাঁহার দৈন্যের হানি হয়, তাই তিনি নিজকৃত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ কৃত শ্লোক দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন"। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা ভক্তিবিরুদ্ধ, কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর সাক্ষাৎ দৈন্যের মূর্ত্তি; যাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পবিত্র ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত হইয়াও যবনের দাসত্ব করিয়াছেন বলিয়া স্বীয়

হানি হইয়াছে, এজন্য নিজকে অত্যন্ত অযোগ্য মনে করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখ দিয়া গমন করেন নাই, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিবার সময় দৈন্যহীন হইয়াছেন—এরূপ অ· ং সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। আরও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিচরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিজে বলিয়াছেন—"চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ"। এই বাক্যানুসারে জানা যাইতেছে যে—আশীর্ব্বাদের কর্ত্তা যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ নিজে না হইতেন, তবে "করি" উত্তম (অস্মৎ) পুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ না করিয়া "করেন" এই নাম পুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতেন। তবে এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে—উত্তম ব্যক্তিও কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে যেমন আশীর্ব্ব ·· পারেন, কনিষ্ঠ ব্যক্তিও উত্তম ব্যক্তিকে তেমনি ·· ·রেন। তবে আশীর্ব্বাদের প্রকার-ভেদ মাত্র আছে অর্থাৎ কনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন উত্তম-ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তখন বলিতে হইবে যে আমি শ্রীভগবা·ের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি আপনার কল্যাণ বিধান ·ন, আর উত্তম ব্যক্তি কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিবেন যে—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার কল্যাণ হউক্" এই মাত্র ভেদ।

তবে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিচরণকৃত শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে—এই শ্লোকটীর শেষ দুই পাদে জগতের প্রতি আশীর্ব্ব· ·হিয়াছে আর প্রথম দুইপাদ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ দুইটী বর্ণিত আছে যথা—

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার॥

সেই বহিরঙ্গ কারণটী শ্রীপাদরূপগোস্বামি চরণ যেমন জানেন, তেমন অন্য কেহ জানেন না। শ্রীপাদরূপগোস্বামি-চরণ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা "যঃ কৌমারহরঃ" এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট বলিয়াছেন। প্রয়াগে শ্রীপাদরূপগোস্বামিচরণের প্রতি সম্পূর্ণ কৃপাশক্তি-দান প্রসঙ্গ শ্রীগ্রন্থের মধ্যলীলায় উনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ আশীর্ব্বাদ-সম্বলিত মঙ্গলাচরণস্বরূপ এই অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটী যখন শ্রীরূপগোস্বামিচরণ—শ্রীরায় রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতির নিকট পাঠ করেন, তখন তাঁহারা এই শ্লোকের ভিতরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি উপলব্ধি করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন যে—

সব ভক্ত গণ কহে শ্লোক শুনিয়া,
কৃতার্থ করাইলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া॥

অন্ত্যঃ—১ম,

বিশেষতঃ এই শ্লোকটি যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পঠিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণরূপে বর্ণিত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনিন্দিত তখন ইহা নি·· বলা যায় যে—এই শ্লোকটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনু· কেন না শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনিয়া কেবল ছিলেন—অতিস্তুতি কৈল মোরে ইত্যাদি।

এক্ষণে মূল প্রস্তুত বিষয় আরম্ভ করা যা· শ্লোকস্থ "হরি শব্দের বহু অর্থ শাস্ত্রে দেখিতে পাও তন্মধ্যে আত্মারাম শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণকে বলিয়াছেন—

হরি শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥

হরতীতি হরিঃ—হরণ করেন এই অর্থে হরি. কি হরণ করেন, এই অপেক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া·· হে সনাতন! শাস্ত্রে হরিশব্দের যে সকল অর্থ ·· আছে তাহা গৌণ, তন্মধ্যে সর্ব্ব-অমঙ্গল হরণ করে· প্রেম দিয়া মন হরণ করেন" এই দুইটী অর্থ মুখ্যত· অমঙ্গল শব্দে আমরা সাধারণতঃ বুঝি—যাহা পুণ্য তাহা· মঙ্গল, আর তদ্বিপরীত যাহা, পাপ তাহাই অমঙ্গল। এ· অর্থটী স্থূলবুদ্ধিকল্পিত মাত্র; যেহেতু পাপ ও পুণ্য শব্দের পর্য্যায় শব্দ কখনও অমঙ্গল ও মঙ্গল হইতে পারে না। বস্তুত· অমঙ্গল ও মঙ্গল শব্দের অর্থ এক কথায় বুঝিতে হইলে—যাহাতে মায়াময় জড়ীয়-পদার্থ ভোগ করিতে হয়, তাহার নাম অমঙ্গল, কারণ যাহা মহাজড়, তাহাই দুঃখের আকর, আর যাহা যাহা চৈতন্য, তাহা তাহাই সুখের আকর জড়ীয় পদার্থ ভোগ করাই দুঃখ বা অমঙ্গল। সর্ব্বপ

প্রয়োগ থাকাতে ভোগের মূল কারণ-বাসনা, বাসনার মূল কারণ কূট, কূটের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ ভগবদ্‌বিস্মৃতি। যাঁহারা পরমমঙ্গলময় শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদিতে তৎপর হয়েন, শ্রীহরি তাঁহাদের ভোগবাসনাদি ভগবদ্‌বিস্মৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হরণ করেন। এস্থলে হরণ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে—অভাব সম্পাদন. অর্থাৎ যাঁহারা হরি বলিবেন, হরিস্মরণ করিবেন শ্রীগৌর-হরি তাঁহাদের হৃদয়গুহা হইতে ভোগ বাসনাদি ভগবদ্‌-বিস্মৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের অভাব সম্পাদন করি-বেন। হরণ শব্দের ইহাতে মুখ্য-অর্থ প্রকাশ পাইতেছে ,ণ যাহার নিকট যে বস্তু আছে, তাহার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট স্থাপন করার নাম ন্য মুখ্য অর্থটী বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—

সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন।

" অর্থ বুঝিতে হইবে যে—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ অমঙ্গল .ত যিদূরিত করিয়া সেই নির্ম্মল হৃদয়ে প্রেম-প্রদান থাকেন। প্রেম-প্রদানের পর আবার মনটীকে .রন বলিতে বুঝিতে হইবে যে—মনের ধর্ম্ম "সঙ্কল্প" রেন। অর্থাৎ প্রাকৃতবিষয়ভোগাদি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিদূরিত করিয়া নিজ (শ্রীহরি) বিষয়ক সঙ্কল্প ঐ নর মধ্যে অর্পণ করেন।

হরি শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থটীও সাধারণ, কিন্তু শ্রীগৌরহরি-অসাধারণ;—হরণ শব্দের অর্থ শ্রীরূপ... স্তব-লায় বলিয়াছেন—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কিমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যিনি প্রণয়িজনবৃন্দমধ্যে কাহারও অপার মধুর রস-স্তোম অর্থাৎ আস্বাদন-সমূহকে দর্শন করিয়া হরণপূর্ব্বক উপভোগ করিবার লালসায়, নিজের ইন্দ্রনীলমণি দ্যুতিকে ঢাকা দিয়া যাহার রসস্তোম আস্বাদনে লোলুপ হইয়াছেন, তদীয় কনক-দ্যুতিকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া বিরাজিত আছেন—সেই শ্রীচৈতন্যরূপী হরি আমাদিগের প্রতি সর্ব্বাতি-শায়িনী করুণা বিস্তার করুন।

এস্থলে শ্রীপাদরূপগোস্বামিচরণ দেখাইলেন যে—যাঁহার কোনও অভাব নাই, সেই শ্রীহরি স্বকীয় প্রেয়সীশিরোমণির মধুর জাতীয় অসমোর্দ্ধ আস্বাদনরাশি ভোগের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া তদীয়দ্যুতি হরণ করিয়াছিলেন—এই স্থানেই "হরি' শব্দের মুখ্য অর্থ শ্রীগৌরচন্দ্রে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। এইটি বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ। ইহার অর্থ এখন বলা যাইতেছে—উপভোগের নিমিত্ত যাঁহার ধন হরণ করিতে হইবে, তাঁহার বর্ণটী ধারণ করিতে না পারিলে, তদীয় কোষাগারে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে; এজন্য রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ... নীলমণি-দ্যুতিটী ঢাকা দিয়া সেই ম... ...র ঈশ্বরী নিজ প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকার স্বর্ণবিনিন্দিত কান্তি-সমূহ বাহিরে প্রকাশ করতঃ সম্যক্ রূপে দীপ্তিশালী হইয়াছেন। ইহাই "পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দী..." শব্দের অর্থ।

"শচীনন্দনঃ" পদটী পূর্ব্বোক্ত হরিশব্দের আর একটী অসাধারণ বিশেষণ, শ্রীগৌরহরিকে পরিচয় করাইবার নিমিত্ত শ্রীল গ্রন্থকার 'শচীনন্দন' এই বিশেষণটী প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে "দশ..-নন্দন" ইত্যাদি পিতৃ নামানুসারে শ্রীপ্রভুর নামনির্দ্দেশ না করিয়া মাতৃ-নামানু-সারে "শচীনন্দন" এই নাম নির্দ্দেশ করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে,—যত জনই করুণা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে মায়ের করুণাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এমন কি পিতৃকরুণা অপেক্ষাও মাতৃকরুণা উৎকৃষ্টা। নির্ব্বোধ শিশু-সন্তানের অঙ্গে ধূলি-কর্দ্দমাদি লিপ্ত দেখিলে পিতা সেই নিজ সন্তানকে ক্রোড়ে করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু ঐ ধূলিকর্দ্দমাদি লিপ্তাবস্থায় হিতাহিতবিবেকশূন্য শিশু-সন্তানটী যখন ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন স্নেহময়ী জননী যে কোনও কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন অমনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এমন কি মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া নিজ অঞ্চল দ্বারা সন্তানের গায়ের কর্দ্দমাদি মুছিয়া ফেলিয়া সন্তানের মুখচুম্বন করিতে করিতে স্তন্যপ্রদানে সন্তানকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকেন, হিতাহিত-

বিবেকশূন্য শিশু সন্তানের প্রতি এইরূপ অবিচারিত সর্ব্বাতিশায়িনী করুণা যেমন একমাত্র জননীতেই দেখা যায় সেই প্রকার কাল-কবলিত দুর্গত জীবগণের প্রতি অবিচারিত সর্ব্বাতিশায়িনী কৃপা এই শ্রীগৌর-হরিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌর-হরির এই অপরিসীম করুণাটী বুঝাইবার নিমিত্তই পিতৃনামানুসারে নাম-নির্দ্দেশ না করিয়া স্নেহময়ী জননী শ্রীশচীমাতার নামানুসারে "শচীনন্দন" এই নামের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

বিলাস-বিবর্ত্ত।

শ্রীঅমিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্

তোমায় পাব' না, পাব' না,
জেনেছি পাব' না,
তবুও এ প্রাণ কেঁদে উঠে শ্যাম।

আমায় দাও ভুলাইয়ে,
অন্য কিছু দিয়ে,
এ যাতনা আর সহেনাক শ্যাম।

চাহি গো সতত ভুলিতে তোমারে,
তব শ্যামরূপ সদা খেলা করে,
অনলে অনিলে, চির নভো-নীলে,
ভূধরে সলিলে গেয়ে উঠে শ্যাম।

কর্ণবন্ধ করি শুনিবনা নাম,
ভিতরেতে হেরি সেই ঘন-শ্যাম,
মৃদু মৃদু হাসি, অধরেতে বাঁশী-
বিষ-বাণে বুঝি বধে গো পরাণ।

মরণের পথে চাহি গো মরিতে,
তব বাঁকারূপ হেরি চাবি ভিতে,
শঙ্কিত চাহনি, কিবা মুখ খানি,
তৃষিত-বাসনা গেয়ে উঠে শ্যাম

ভুলিতে তোমারে, ছুটি গো সংসারে,
মাতা, দারা, সুতে হেরিগো তোমারে,
তোমার বিলাস, আমার বিনাশ,—
বাঁচাও আমারে ফিরে লহ নাম

অমিতারঞ্জন শুন এই বাণী,—
শ্যাম-প্রেম-দায়ে ঠেকিলে গো তুমি,
বিলাস-বিবর্ত্তে, পড়েছ আবর্ত্তে,
উঠিবে এখনি গাহ শ্যাম নাম।

শ্রীশ্রীদামবন্ধন লীলা

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমরা এই লীলা হইতে বুঝিলাম যে—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা ভক্তের হৃদয়স্থিত অকৈতব-প্রেমরস পান করিবার জন্য লোলুপ হইয়া থাকেন এবং ঐ রস মাতা ব্রজেশ্বরীর হৃদয়ে পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িলেন। শ্রীভগবানের স্বরূপই এই রস পান করেন। স্বরূপ হইতে অভিন্ন বস্তুতে পান করিবার তাঁর রতি প্রকাশ হয় এবং সেই অভিন্নবস্তু হইতেছে—হ্লাদিনী শক্তি।

শ্রীভগবান্ হইতেছেন সৎ-চিৎ-আনন্দময়বস্তু। আমরা সৎ বলিতে সাধারণতঃ যে ভাল বুঝি, তাহা কিন্তু এই 'সৎ' এর অর্থ নয। শ্রীভগবানের 'সৎ' এর অর্থ—তিনি যেমন স্বয়ং কাল-কর্ম্ম-মায়া-পরাভবকারী আবার অপরকেও তিনি ঐরূপ 'সৎ' করান। সেইরূপ তাঁহার 'চিৎ' শব্দের অর্থ যে—তিনি যেমন নিজেকে চেনেন আবার অপরকেও তেমনি চেনান। তাঁহার 'আনন্দ' শব্দের অর্থ যে—তিনি নিজেও আনন্দ ভোগ করেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও আনন্দ ভোগ করান। যে শক্তির দ্বারা তিনি আনন্দ ভোগ করেন এবং ঐ সঙ্গে অপরকেও ভোগ করান তাহাকে হ্লাদিনী-শক্তি বলে। নিজে কেবল আনন্দভোগ করা আর নিজে ভোগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অপরকে ভোগ করান এই দুই আনন্দের পরস্পরের অনেক প্রভেদ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বটি অপেক্ষা শেষেরটি অত্যধিক আনন্দদায়ক। আলিঙ্গন একটি আনন্দদায়ক বস্তু এবং যখন স্বীয় হস্ত স্বীয় শরীরকে আলিঙ্গন করে তখন একপ্রকার আনন্দ-অনুভব হয় সত্য—কিন্তু যখন সেই হস্ত কোন প্রিয়বন্ধুকে আলিঙ্গন করে, তখন আনন্দমূর্ত্তিস্বরূপ সেই আলিঙ্গনটি নিজে যেমন নৃত্য করিতে করিতে থাকে, বন্ধুকে সেইরূপ নৃত্য করায় এবং যে আলিঙ্গন করে তাহাকেও তদ্রূপ করায়। তরঙ্গ যেমন স্বয়ং নৃত্য করে, নদীকে নৃত্য করায় এবং নদীর উপরিস্থিত নৌকাকে নৃত্য করায়—সেইরূপ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ যখন ভক্তকে কৃপা করেন, তখন তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি নৃত্য করিতে থাকে, স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকেও নৃত্য করাইতে থাকেন। আবার স্বাতি-নক্ষত্রের জল যেমন গজমস্তকোপরি পতিত হইলে গজমুক্তা, সর্পমস্তকোপরি পতিত হইলে মণিরত্ন, গোমূত্রোপরি পতিত হইলে গোরোচনা, মৃগোপরি পতিত হইলে মৃগনাভি, শুক্তির উপর পতিত হইলে মুক্তা প্রসব করে—সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তি যখন শান্ত-দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তাগণের উপর আরোপিত হয়, তখন যথাক্রমে শান্ত্য-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের সৃজন হয়।

শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয়স্থিত যে অকৈতব-রসটি পান করেন, সেটি হইতেছে ভক্তের প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি বলিতে যেন আমরা ভক্তের পূজা-অর্চ্চনা-শ্রদ্ধা-ক্রন্দন প্রভৃতিকে না বুঝি। যাহার দ্বারা ভক্ত শ্রীভগবানের হৃদয় গলাইতে পারে তাহাকে প্রেমভক্তি বলে। অগ্নির সংস্পর্শে মোমবর্ত্তিকা যেমন গলিয়া বাঁকিয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তের সংস্পর্শে শ্রীভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারেন না, তিনি গলিয়া ভক্তকে সঙ্গে করিয়া নাচিতে থাকেন। শ্রীমতীর পার্শ্বে শ্রীভগবান যখন দাঁড়ান তখন সেই অসমোর্দ্ধ-মাদনাখ্য-মহা-প্রেমের তাপে শ্রীভগবান্ নিজেকে আর ধীর স্থির সবল রাখিতে পারেন না, ক্রমে ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম হইয়া বামে শ্রীমতীর অঙ্গে হেলিয়া পড়েন। তাই আজ মা ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ মধুর বাৎসল্যপ্রেমের তাপে সেই অচ্ছেদ্য অদাহ্য অব্যক্ত অচিন্ত্য অনাদির আদি ত্রিভুবনের পালনকর্ত্তা তাঁহার নিকট প্রাকৃত বালকের মত রজ্জুবদ্ধ হইলেন।

তারপর শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—'হে মহারাজ! আজ মা ব্রজেশ্বরী 'যত্তৎ' যে একটা জিনিষ লাভ করিলেন, ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী শ্রীভগবানের নিকট অনেক প্রসাদ লাভ করিয়াছেন কিন্তু এরূপ জিনিষ

লাভ করেন নাই।" শ্রীশুকদেবের 'যত্তৎ—যে একটা জিনিষ' এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবার কারণ কি? তাঁহার ত বলা উচিত ছিল যে—'মা ব্রজেশ্বরী যে প্রসাদ লাভ করিলেন'। ইহার তাৎপর্য্য যে, যেমন কোন সেবাপরায়ণ সুপুত্রের সম্মুখে কোন ব্যক্তি যদি তাহার মাতাকে বলে—'মা! তুমি তোমার পুত্রকর্ত্তৃক যে প্রসাদ (অনুগ্রহ) পাইলে', ইহাতে বক্তার যেমন ভাষাপরাধ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্রও অসন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এখানেও যখন মা ব্রজেশ্বরীর আবেশ রহিয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 'স্বার্ভক' উদরের সন্তান; আর শ্রীকৃষ্ণের আবেশ রহিয়াছে যে—ব্রজেশ্বরী তাঁহার 'স্বমাতা' নিজের মা। এরূপ অবস্থায় যদি শুকদেব 'যত্তৎ'এর পরিবর্ত্তে 'প্রসাদং' বলিতেন তাহা হইলে ভাষাপরাধ ও শ্রীকৃষ্ণের অসন্তোষ উৎপাদন করা হয়। তারপর যশোমতী এমন কি জিনিষ লাভ করিলেন, যাহাতে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে—ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী প্রভৃতি সেরূপ জিনিষ লাভ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানকারী শ্রীভগবান্‌কে আজ মাতা যশোমতীর নিকট বিক্রীত হইতে দেখিয়া শ্রীশুকদেব ঐরূপ বলিলেন। মাতা যদি কোন প্রকারের মুক্তিলাভ করিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই ঐরূপ বলিতেন না। কারণ পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে—অসুরেরাও যুদ্ধাদি করিয়া শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া ঐরূপ প্রসাদ লাভ করিতেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ বলেন যে—শ্রীভগবান্ যাহাকে সর্ব্বোত্তম প্রসাদ দিতে ইচ্ছা না করেন তাহাকে ঐরূপ একটা মুক্তি-প্রসাদ দিয়া থাকেন।

তারপর মহারাজ পরীক্ষিত যখন শুনিলেন—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশে অবতরণ করেন নাই, যদুবংশে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে একটি আক্ষেপ উপস্থিত হইল। শ্রীশুকদেব ইহা বুঝিতে পারিয়া মহারাজকে বলিলেন—"মহারাজ! তুমি আক্ষেপ করিও না, দুই বংশের তুলনা কর, বুঝিবে কোন বংশ ধন্য, কোন্ বংশ শ্রীভগবানের প্রকৃত প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যদুবংশে অবতরণ করিয়া তিনি সেই বংশের রক্ষক-রাজা-গুরু-কুলপতি প্রভৃতি ছিলেন সত্য, কিন্তু তোমার বংশে অবতরণ না করিয়াও ঐরূপ ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংস করিয়া কেবলমাত্র বজ্রকে রাখিলেন, তোমাদের বংশও ধ্বংস করিয়া কেবলমাত্র তোমাকে রাখিলেন, তাহা হইলে বুঝিলে উভয় বংশের প্রতি প্রায় একরকম ব্যবহার করিলেন। কিন্তু বল দেখি যদুবংশে কখন তিনি কিঙ্কর হইয়াছিলেন কি? তোমার পিতামহ অর্জ্জুনের নিকট তিনি কিন্তু কিঙ্কর-সদৃশ সেবা করিয়াছিলেন। যখন তোমার পিতামহ আজ্ঞা করিলেন—'যুদ্ধের মধ্যস্থলে রথ রাখ' শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেই আজ্ঞা পালন করিলেন। যখন তোমার পিতামহদিগের দূত হইয়া কুরুসভায় গমন করিলেন, কৌরবগণ তখন তাঁহাকে কত অকথ্যভাষায় গালি দিল,—কাহার জন্য তিনি এই সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন? আবার যখন তোমার পিতামহদিগের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ একমত না হইয়া কোপান্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন করিবেন বলিয়া আগমন করিতেছিলেন, তখন নবজলধর শ্রীভগবান্ দেখিলেন যে—তিনি যদি জলবর্ষণ না করেন তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া তাঁহার প্রাণাধিক ভক্ত তোমার পিতামহগণের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিবে এবং তাহাতে তাহাদের (পাণ্ডবগণের) অমঙ্গল হইবে—তখন তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। বল দেখি যদুবংশ ভাগ্যবান্—না তোমার বংশ ভাগ্যবান? তোমার পিতামহগণ ভক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীভগবান্ যে মা যশোদার নিকট বিক্রীত হইলেন অর্থাৎ প্রাকৃত বালকের মতন রজ্জুবদ্ধ হইলেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? কারণ ব্রজবাসীদিগের প্রেমের তুলনা নাই এবং সেইহেতু তাহারা যেরূপ শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন কুত্রাপি কেহ তাহা পায় নাই। তাহাদের সৌভাগ্য দেখিয়া একদিন লোকপিতা ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন যে—তিনি নিজেকে সহস্র গুণ ভাগ্যবান্ মনে করিতেন যদি ব্রজে গুল্মলতা হইয়া ব্রজের নীচ-জাতিরও চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেন। বাস্তবিক ব্রজের সৌভাগ্য অপরিসীম। বেদে যাঁহাকে "আনন্দ ব্রহ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ব্রজে সেই তিনি প্রাকৃত সীমাবদ্ধ মানুষের মতন বাস করিতেন। আবার বেদশাস্ত্রে সকলের অধিকার নাই কিন্তু ব্রজে নীচজাতি যে দর্জি সেও শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে এবং এমন কি প্রয়ো-

জন হইলে সেই শ্রীঅঙ্গকে জানিতে পারে আর বেদে তাঁহাকে জানা ত দূরের কথা—তাঁহার একবিন্দু অনুভব করাও দুঃসাধ্য, তিনি অবাঙ্মনসোগোচর বলিয়া অভিহিত হন।

এখন শ্রীশুকদেব আর একটি নূতন সংবাদ দিতেছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে—ব্রহ্মার কৃপায় 'দ্রোণ ও ধরা' নন্দ ও যশোদা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিলাম যে নন্দযশোদা শ্রীভগবানের যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন ব্রহ্মা সেরূপ লাভ করেন নাই। অতএব ব্রহ্মা নন্দযশোদার সৃজনকর্ত্তা ইহা অসম্ভব ও অযুক্তিপূর্ণ। তাহা হইলে নন্দযশোদা কে এবং কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে আছে শ্রীভগবান্ যখন মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হন্ তখন পার্ষদগণও আসিয়া থাকেন। নন্দযশোদা হইলেন সেইরূপ পার্ষদদ্বয় এবং তাহারা গোলোকে যে যে অংশ লইয়া যেরূপভাবে লীলা করেন, এখানে আসিয়া সেই সেই অংশ লইয়া সেইরূপ ভাবে লীলা করিলেন, আর দ্রোণ ও ধরা হইলেন নন্দযশোদার অংশ, তাঁহারা মর্ত্ত্যভূমে আসিয়া অংশীদ্বয়ের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, শ্রীভগবান্‌কে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হওয়া চাই। আবার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেই ভগবান্‌কে ঠিক পাওয়া হইল না। তাঁহাকে আস্বাদন করা চাই তবে তাঁহাকে ঠিক পাওয়া হইল। যেমন মিষ্টান্ন যদি হাতে আসিল তবে তাহা আস্বাদন করিতে হইলে রসনার প্রয়োজন, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমভক্তি যাহার যেরূপ পরিমাণ আছে তিনি সেইরূপ পরিমাণে শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিতে পারিবেন। যেমন যাহার দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ পরিমাণে সতেজ তিনি সেইরূপ পরিমাণে সুন্দর-পদার্থ উপভোগ করেন।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সত্ত্ব হইতেছে তিনটি, যথা—স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। স্বরূপে তিনি আনন্দময়। ঐশ্বর্য্যে তিনি অতুলনীয়—অঘাসুর তাঁহাকে বধ করিতে আসিল, সমস্ত দেবতারা দেখিতেছেন যে সেই অসুরের কি পরিণাম হয়, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া সত্ত-মুক্তি দিলেন, এরূপ কৃপা-ঐশ্বর্য্য কোন দেবতার নাই। সেই জন্য বলা হয় যে—ঐশ্বর্য্যে তিনি অতুলনীয়। সর্ব্বমনোহরতা-ধর্ম্মটি হইতেছে মাধুর্য্য। এই বস্তুটি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক-মাত্র নিজস্ব ধর্ম্ম যে ভক্ত তাঁহাকে মাধুর্য্যে বাঁধিতে পারিয়াছেন, তাহার নিকট তখন তিনি আর ভগবান্ নহেন, স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া বেড়ান। ব্রজবাসীগণ শ্রীভগবান্‌কে "আমার" পুত্র 'আমার সখা' 'আমার কান্ত' এইরূপ বিশুদ্ধমাধুর্য্য ও প্রীতি-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দামবন্ধনলীলা করিবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ মা ব্রজেশ্বরীকে দুইবার ঐশ্বর্য্য (বিশ্বরূপ) দেখাইয়াছিলেন তথাপি মাতা এমনই বাৎসল্যরসে ডুবিয়া থাকিতেন যে—সেই শ্রীভগবান্ যে তাহার জঠরজাত-পুত্র সেই মধুর ভাবটি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীভগবান্ সেই মাধুর্য্যপ্রেমে এমনই গলিয়া গিয়াছিলেন যে, নিজেকে ভক্তের মনোমত অর্থাৎ প্রাকৃত শিশু হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মাধুর্য্যরসের রসিক ভক্তেরা শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ সুখের ভোগ করিতে পারেন যোগী বা জ্ঞানিগণের কথা দূরে থাকুক, এমন কি জ্ঞানমিশ্রিতভক্ত বা গৌরবমিশ্রিত ভক্তগণ সেরূপ-ভাবে পারেন না। তবে সেই সমস্ত শ্রেণীর ভক্তেরা যদি কোন রসিক-ভক্তের সঙ্গ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐরূপ সুখ-আস্বাদনে সমর্থ হয়েন্—রসিকভক্ত শ্রীভগবানের এত প্রিয় জন। রসিকভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে 'গোপিকাসুতঃ ভগবান্' আবেশে উপাসনা করেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে এত মধুর এত সুখপ্রদভাবে আস্বাদন করেন চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা ঠিক এই জিনিষই দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টকে বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণ' শব্দের যদিও বহু অর্থ আছে, কিন্তু আমি সে সমস্ত মানি না। আমি কবল জানি তিনি শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন।" 'গোপিকাসুত ভগবানের' আবেশে শ্রীভগবানের উপাসনা করা যেমন এ দিকে অতি সুখপ্রদ, অপর দিকে এই পন্থা তেমনই অতি সঙ্কটজনক। কারণ—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ নন্দগৃহে প্রাকৃত বালকের মত খেলা করিতেছেন। ননী চুরি করিতেছেন, সখাদের সঙ্গে উচ্ছিষ্টভোজন করিতেছেন ইত্যাদি এই সমস্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের

হৃদয়ে বিশুদ্ধ পূর্ণ মদীয়তাযুক্ত ভক্তিরসের উদয় না করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীশুকদেব বলিলেন যে—যাহার হৃদয়ে লেশমাত্র দেহাভিমান বিচারাভিমান জ্ঞানাভিমান প্রভৃতি আছে, তাহার এইরূপ লীলায় জড়বুদ্ধি আসিয়া পড়িবে। আবার 'গোপিকাসুত' শব্দটিকে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র উপলক্ষণ বলিয়া জানিলে চলিবে না। ইহা শ্রীভগবানের নিত্য-বিশেষণ হইতেছে। যেমন নীলকমলের নীলে ও কমলে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না, সেইরূপ গোপিকাসুতে ও শ্রীভগবানে কখন ছাড়াছাড়ি হয় না। (ক্রমশঃ)

(শ্রীচন্দ্রশেখর বিশ্বাস)

(কেন) প্রাণমাতান, কুল মজান, বাঁশি বাজাও শ্যাম
(বহে) বাঁশির স্বরে দুকুল ভ'রে, যমুনা উজান ॥
নদনদী বন উপবন, পশু পক্ষী-প্রাণবিমোহন,
ধন্য হ'ল গিরি গোবর্দ্ধন, পূর্ণ মনস্কাম।
সুর নর কিন্নর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
বিমোহিত চরাচর, শুনি বাঁশির গান ॥
আমরা সব কুলনারী, যমুনাতে নিতে বারি,
ভেঙ্গে গেল গাগরি, জাতি কুল মান।
রহি যবে গৃহকাজে, বাজে বাঁশি বনমাঝে,
পশি হৃদয়ের মাঝে, আকুল করে প্রাণ ॥
রসময় রসিক নাগর, প্রেমময় প্রেমের সাগর,
মদন মোহন নটবর, গোপীজন-প্রাণ।
স্মিতাধরে সুখে বসি, পিয়ে সুধা রাশি রাশি,
জানেনা কি আন বাঁশি, বিনে রাধার নাম ॥
ব্রজবধূ জন-বরা, বিনোদিনী দিশেহারা,
নয়নে ঝরিছে ধারা, নাহিক বিরাম।
পায়ে ধরি বংশিধারী, যাতনা দিয়োনা হরি,
দেখনা তোমার কিশোরী, হ'ল হতজ্ঞান ॥
চন্দ্রশেখর ভনে, নিবেদি রাঙ্গাচরণে,
যেন নিদানের দিনে, জপি রাধে শ্যাম।
হেরি যেন নয়নে, যুগলরূপ-বৃন্দাবনে।
শুনি যেন শ্রবণে, বাঁশি অবিরাম ;

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের দ্বিতীয়বর্ষ প্রবেশ

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী)

এই ভাদ্র মাসের শুভ শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েন। তখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় কাল উপস্থিত,—রোহিণী নক্ষত্র উদিত এবং তারকানিকর শান্ত, দিক্ সকল সুপ্রসন্ন এবং ব্রজ গ্রাম পুরাদি মঙ্গলময়, নদী সকল প্রসন্নসলিলা, এবং বায়ু পুণ্যগন্ধ বহন করিয়া মৃদু মৃদু সঞ্চালিত হইতেছিল। শ্যাম-জলধর দর্শন আশায় জলধর মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। ফলকথা, যে ঋতুর যে গুণ আছে, তাহাই বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিবার জন্য শ্রীব্রজমণ্ডল অভিমুখে সকলেই ধাবিত হইল। আনন্দে দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ মধুর-স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরী অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল। দেবগণ সুগন্ধি-পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কবি গাহিয়াছেন—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥

সূর্য্যবংশে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে এতদিন কোন শ্রীভগবান্ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই ক্ষোভে চন্দ্র বড়ই ম্রিয়মান ছিলেন। আজ অন্য নিরপেক্ষ-সত্বাক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা॥
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
ঐছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।

এই আনন্দে চন্দ্রের আজ বুক ভরিয়া গিয়াছে। তাই আজ অষ্টমীর চন্দ্র পূর্ণচন্দ্ররূপে বিরাজমান। এদিকে ব্রজে শ্রীনন্দনন্দনকে দর্শন করিয়া গোপগণের আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।—

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা॥
কোহপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোহপি জনো বহুবারম্॥
কোহপি মধুরমধুগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোহপি সদধি-নবনীতম্॥
কোহপি তনোতি মনোরথ-পূর্তিম্।
পশ্যতি কোহপি সনাতন মূর্ত্তিম্॥

অর্থাৎ যশোদা তাঁহার উদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রসব করেন। তাহাতে সমগ্র গোপসমাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেহ কেহ বিবিধ উপহার আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। কেহ কেহ বার বার নৃত্য, কেহ মধুর গান গাহিতেছেন। কেহ কেহ দধিসহ নবনীত ভূমে নিক্ষেপ করিতেছেন। কেহ মনোরথ পূরণ করিতেছেন, কেহবা সনাতন মূর্ত্তি বালককে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে জগতে একটা অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত বহিয়া যায়। স্বর্গে দেবতাগণও অত্যন্ত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন কেবল অসুরগণের মনে শান্তি নাই। বিশেষতঃ ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি মথুরার রাজা কংশ ঐ বালক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য বারম্বার রাক্ষসী পূতনা অঘবকাদি অসুরগণকে ব্রজে প্রেরণ করিতেছিল। সুতরাং পিতা নন্দ মা যশোদা নিরন্তর বাল-গোপালের অনিষ্টাশঙ্কায় এক মুহূর্ত্তকালও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। সর্ব্বদা মনে ভয়—বুঝি, গোপালকে আর বাঁচাইতে পারিলাম না।

মা মনে মনে ভাবেন বহু তপস্যার ফলে শ্রীনারায়ণ বৃ[illegible] বয়সে যদিও একটী পুত্রসন্তান দিলেন, ইহাকে এত উপদ্র[illegible] হইতে কি প্রকারেই বা রক্ষা করি। আরো মনে বিচা[illegible] করেন গোপাল আমার পেটের ছেলে‥‥ যদি আমি সর্ব্বদা ইহাকে লালন পালন ও রক্ষা না করি তবে ইহাকে আ[illegible] কে রক্ষা করিবে এবং এই শিশু কি প্রকারেই বা মানু[illegible] হইবে? বিশুদ্ধ-বাৎসল্যপ্রেমের মূর্ত্তি মা যশোদা গোপাল[illegible]

তাহা জানিতে পারেন নাই। পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার ঘরে পুত্ররূপে আবির্ভূত, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বয়স যখন এক বৎসর হইল, তখনও মায়ের চিন্তা উদ্বেগ সমানভাবেই বর্ত্তমান। কংস এবং তাহার অনুগত অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবিনাশের জন্য তখনও সমভাবেই চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য নানা প্রকার উদ্যম করিতেছিল।

বাৎসল্যভাবে মুগ্ধা মা যশোদারও গোপালের জন্য খাইতে শুইতে সোয়াস্তি নাই।

গত বৎসর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভতিথিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিন্নকলেবর চিরমধুর ও চিরসুন্দর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর আবির্ভূত হইয়াছেন। শাস্ত্র বলেন ঃ-

"অভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার প্রতিধ্বনি করেন ঃ—

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ॥

শ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাবে বৈষ্ণবজগতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ শ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাবে অসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আবির্ভাবের পর হইতেই তাঁহার স্থায়িত্বের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন। বিরোধভাবাপন্ন-জনগণ শ্রীশ্যামসুন্দরের অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি একবৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখনও আচার্য্যগণ তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কায় চিন্তাসমাকুল। শুদ্ধ-বাৎসল্যভাবাপন্ন মা যশোদা ও পিতা নন্দ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাকৃত পুত্রের ন্যায় মনে করিয়া যেমন চিন্তিত ও ভীত হইয়া কাল কাটাইতেন, স্বচক্ষে পূতনা, অঘ, বক, শকটাদি অসুরের নিধন, গোবর্দ্ধন ধারণাদি, শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক-ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য দর্শন করিয়াও প্রগাঢ়-বাৎসল্যস্নেহে এই-সকল লীলা শ্রীনারায়ণের কৃপাশক্তিরপ্রভাবে সংসাধিত হইতেছে বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলা অঘটনঘটনপটীয়সী তাঁহার স্বরূপশক্তি যোগমায়ারই খেলা—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। এই যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা আত্মীয়স্বজনের এই ভ্রম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতবুদ্ধির উদয় উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করা দূরে থাক্ কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এবং অনিষ্টাশঙ্কা করিবার অবসরও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক্ তাঁহার অংশ বা অংশাংশ অন্য কোন ভগবৎস্বরূপের কোনরূপ অনিষ্টসাধন করিবার শক্তি কাহারো নাই। সুতরাং আমরাও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অকারণে ব্যাকুল হইতেছি। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রথম আবির্ভাবে সম্পাদকের নিবেদনে আমি যে কথা বলিয়াছি সেই কথা পুনরায় বলিতেছি ঃ—

করুণা নিকরম্ব কমলে
মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষ-শালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
নহি চিন্তা কণিকাভ্যুদেতি নঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে ঃ—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচান, সেই তৈছে করে নৃত্য॥

সুতরাং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কার্য্য শ্যামসুন্দরই করিয়া লইবেন। আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইলে চিরমধুর ও চিরসুন্দর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বয়োবৃদ্ধির সহিত নিত্য নব নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়া জগজ্জনের বিশেষতঃ তদনুগত সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইব না।

আপন ইচ্ছায় জীব কত বাঞ্ছা করে,
কৃষ্ণ যে ইচ্ছা করে সেই ফল ধরে॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি মহাশয় কৃত পাঠাবলম্বনে

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক লিখিত ।]

শ্রীভগবান্ নিজের ঐকান্তিক-ভক্ত শ্রীব্রহ্মাকে স্বকীয় অন্তরঙ্গ-শাস্ত্রের উপদেশ করিবার জন্য সেই শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বস্তুচতুষ্টয়ের পরিচয় করাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এইস্থানে ৭টী শ্লোকের মধ্যে "জ্ঞানং পরম গুহ্যং" এই প্রথম শ্লোকটী প্রতিজ্ঞা বাক্য, "যাবানহং যথাভাব" এই শ্লোকটীতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, "অহমেবাসং" ইত্যাদি শ্লোকটীতে নিজ স্বরূপে পরোক্ষজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। "ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি শ্লোকটীতে মায়াত্যাগমুখে অনুভব-পদার্থটীর পরিচয় দিয়াছেন। "যথা মহান্তি ভূতানি" ইত্যাদি শ্লোকে রহস্য (প্রেম) স্বরূপের উপদেশ দিয়াছেন। "এতাবদেব" ইত্যাদি শ্লোকে সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। "এতন্মতং" ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট বস্তু-চতুষ্টয়ের বোধের জন্য পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আমার (ভগবানের) জ্ঞান (শব্দদ্বারা যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণ) আমি উপদেশ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। আমার বিষয়কজ্ঞান অন্যে উপদেশ করিতে পারে না; যেহেতু আমার ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে,—জ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত, পরোক্ষও অপরোক্ষ; তন্মধ্যে শাস্ত্রদ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করাকে পরোক্ষ-জ্ঞান বলে, এবং হৃদয়ে যথাযথরূপে বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধি করার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। তন্মধ্যে পারমার্থিক জ্ঞানের তিন প্রকার অভিব্যক্তি,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান, পরিপূর্ণ অভিব্যক্ত বিশেষভগবজ্জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর, ভগবজ্জ্ঞান গুহ্যতম, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরমাত্মজ্ঞানের ও ভগবজ্জ্ঞানের অভাব থাকিয়া যায়, পরমাত্মজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান হয় বটে কিন্তু ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব থাকিয়া যায়, কিন্তু ভগবজ্জ্ঞানের উদয় হইলে সকল জ্ঞানই অন্তর্ভুতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই শ্লোকে "পরম গুহ্য" পদটী জ্ঞানের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভগবজ্‌জ্ঞানের যে দুর্লভতা, তাহা ৬।১৪।৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নে স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—"মুক্তানামপিসিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে।" হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত-জীবের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভ করে, আবার কোটি কোটি সিদ্ধ মহাত্মার মধ্যে একজন নিষ্কাম নারায়ণ পরায়ণ সুদুর্লভ। এই প্রমাণে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভগবজ্‌জ্ঞানের দুর্লভতা দেখান হইয়াছে। শ্রীধর স্বামিপাদও "তথাপি ভূমন্! মহিমাগুণস্য তে" ইত্যাদি ১০।১৪।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় "এবং তাবং সগুণনির্গুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমিতি তৎকথাশ্রবণাদিনৈব তৎপ্রাপ্তি র্নান্যথেত্যুক্তম্। ইদানীং যদ্যপ্যুভয়োরবিশেষেণ দুর্জ্ঞেয়ত্ব মুক্তং তথাপি গুণাতীতস্য জ্ঞানং কথঞ্চিদ্ ভবেৎ, নতু সগুণস্য তব, অচিন্ত্যানন্তগুণত্বাৎ ইতি শ্লোকদ্বয়েন স্তৌতি তথা পীতি" অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয় স্বরূপেরই জ্ঞা দুর্ঘট, এইজন্য তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনা দ্বারাই তোমাকে লাভ করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়ে তোমাকে পাওয়া যায় না, ইহা পূর্ব্বে ৩টী শ্লো বলা হইয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি নির্গুণ ও সগুণ এই উভ স্বরূপেরই অবিশেষে দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলা হইয়াছে তথাপি গুণ তীত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান (অনুভব) সাধনপ্রকার-বিশে হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্য অনন্তগুণহেতু সগুণ ভগব স্বরূপ তোমার জ্ঞান (অনুভব) হইতে পারে না—এ মর্ম্মার্থে ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞান হইতেও ভগবৎস্বরূপ জ্ঞা পরমগুহ্যত্ব স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। আবার যে মদ্বিষ জ্ঞানটীর তোমাকে উপদেশ করিতেছি, তাহাও আম অনুভব সম্বলিত রূপেই গ্রহণ কর। অর্থাৎ কোনও শা দ্বারা আমার যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ রূপ পরোক্ষ-জ্ঞানই উপদে

করিব না তাহার সঙ্গে আমার অনুভবটীও উপদেশ করিতেছি, কেবলমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানই উপদেশ করিব তাহা নহে তাহার সঙ্গে—রহস্য নামে যে বস্তুটী আছে, তৎসম্বলিত জ্ঞানটীও উপদেশ করিব। এই রহস্য পদের অর্থ "প্রেমভক্তি" বলিবা অগ্রে "যথা মহান্তি ভূতানি" এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইবে ; এবং সেই সঙ্গে আমার অনুভব ও রহস্য বস্তুটীর অভিব্যক্তির জন্য প্রেম-ভক্তির অথবা জ্ঞানের সাধনরূপ সাধনভক্তিটীরও বর্ণনা করিব তাহাও গ্রহণ কর। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত নামাপরাধরূপ বিঘ্ন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার অনুভব ও মদ্বিষক প্রীতির আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপ বিশুদ্ধ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অপরাধাখ্য বিঘ্ন নিবৃত্ত হইলে অতি সত্বর মদ্বিষয়ক অনুভব ও মদ্‌বিষয়ক প্রীতি সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য সাধন-ভক্তিটীরও উপদেশ করিব তাহাও গ্রহণ কর। এস্থলে জ্ঞান পদটী বিশেষ্য, আর বিজ্ঞান-সম্বলিত, সরহস্য, তদঙ্গ, এই তিনটী পদ জ্ঞানের বিশেষণ-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা "সরহস্যম্" এই পদটী তদঙ্গ পদের বিশেষণ, যেহেতু সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তি এই দুইটী পরস্পর বন্ধুজনের মত পরস্পরের সম্বর্দ্ধক হইয়া একত্র অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ যতটা পরিমাণে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে, ততটা পরিমাণে প্রেমভক্তির উদয় হইবে, আবার যতটা পরিমাণে প্রেমভক্তির উদয় হইবে, ততটা পরিমাণে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে আবেশ বাড়িবে। ইহাই চতুঃশ্লোকীয় প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ।

প্রতিজ্ঞাত চারিটী বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মার হৃদয়ে "যাবানহম্" এই শ্লোকে সাধ্য-জ্ঞান ও রসস্থের আবির্ভাব জন্য শ্রীভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আমার অনুগ্রহে আমি 'যাবান্' অর্থাৎ স্বরূপগত আমি যেরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট, আমার সত্তাটী যে প্রকার, এবং আমার স্বরূপভূত শ্যামত্ব চতুর্ভুজত্বাদি রূপটী যে প্রকার, আমার স্বরূপসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্যাদিগুণসমূহ যে প্রকার, আমার স্বরূপভূত লীলাসমূহ যে প্রকার, এই কয়েকটী স্বরূপগতধর্ম্মের সর্ব্ব-প্রকার তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ যাথার্থ্য-অনুভব তোমার হউক্। শ্রীভগবানের এইপ্রকার উক্তিতে চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য বস্তুর নির্ব্বিশেষব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যা স্বয়ংই নিরস্ত হইল। যেহেতু ব্রহ্মের রূপগুণ-কর্ম্ম নাই অথচ এই শ্লোকে বলিতে-ছেন—আমার রূপগুণকর্ম্মের স্বরূপের প্রকারটী তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক্। ইহাতে নির্ব্বিশেষব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিবার অবসরই হইতে পারে না। এই চতুঃশ্লোকীকেই উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই উদ্ধবের প্রতি ৩।৪।১৩ শ্লোকে বলিবেন—

পুরা ময়া প্রোক্ত মজায় নাভ্যে,
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে সৃষ্টিপ্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মার নিকটে আমি ঋষিগণ যাহাকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই আমার লীলাপ্রকাশক পরম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম। এই শ্লোকে চতুঃশ্লোকী-প্রতিপাদ্য বস্তুর সবিশেষ-ভগবৎপরত্ব স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। মূল শ্লোকে "তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানং" এই পদের উল্লেখ থাকায় শ্রীভগবানের রূপগুণ-লীলার স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে; যদি রূপগুণ লীলা ভগবানের স্বরূপভূত না হইত, তবে তত্ত্ব-পদটীর উল্লেখ করিতেন না। এই শ্লোকে বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভববিষয়ে আশীর্ব্বাদটী স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তি বিষয়ে আশীর্ব্বাদটী স্পষ্টরূপে উল্লেখ না করিলেও শ্রীভগবানের পরমানন্দস্বরূপ রূপ-গুণ-লীলার যথাযথরূপে অনুভব হইলে অবশ্যই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া বিজ্ঞানাশীর্ব্বাদের (অনুভবের) অন্ত-র্ভূতরূপেই প্রেমভক্তিবিষয়ে আশীর্ব্বাদটী করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরমানন্দই পরমপ্রীতির আস্পদ। পরমানন্দ বস্তুর অনুভব হইলে প্রীতি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন এই অভিপ্রায়ে ১১।২।৪২ শ্লোকে শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

অর্থাৎ হে রাজন! ভোজনে প্রবৃত্ত মানবের প্রতিগ্রাসে গ্রাসে যেমন সন্তোষ উদরভরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি এই তিনটী একসময়েই হইয়া থাকে, তেমনই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত মানবেরও উদরভরণ-স্থানীয় ভগবদনুভব, সন্তোষ-স্থানীয় প্রেমভক্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তিস্থানীয় বিষয়বৈরাগ্য, একসময়েই উদিত হইয়া থাকে। যিনি যে পরিমাণে ভোজন করিবেন, তাহার সেই পরিমাণেই যেমন সন্তোষ উদরভরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমনি যে ভক্ত যে পরিমাণে ভজন করিবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে ভগবদনুভব, ভগবৎপ্রেম ও বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হইবে। অতএব বিজ্ঞানাশীর্ব্বাদের অন্তর্ভূত-রূপেই প্রেমভক্তির আবির্ভাবের আশীর্ব্বাদটী করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

ধ্বন্যালোক

(শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ)

আমরা 'কবি ও কাব্যরস' শীর্ষক প্রবন্ধে কাব্যে কিরূপে ধ্বনিদ্বারা শোভাতিশয্য প্রকাশিত হয়, সে বিষয় প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অবকাশ পাপ্ত হইয়াছি। ধ্বনি সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানি একটী বিশেষ প্রাচীন প্রামানিক গ্রন্থ। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতেই তাঁহাদের রসশাস্ত্রে প্রমাণরূপে বহু স্থানে উহার কারিকা ও শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন ঐ গ্রন্থে স্থানে স্থানে যে সকল অমূল্য শ্লোকরাশি ব্যঙ্গ্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য-পুষ্টির প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ এই প্রবন্ধে আস্বাদন করিবার প্রয়াস করিব।

প্রথমে গ্রন্থখানির কিছু পরিচয় আবশ্যক। ধ্বন্যালোক দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগ কারিকারূপধ্বনিসংজ্ঞায় অভিহিত, অন্যভাগ তাহারই বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আলোক সংজ্ঞক। কেহ কেহ বলেন যে কারিকা ও বৃত্তি এই উভয়েরই প্রণেতা শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্য। জহ্লন সঙ্কলিত সূক্তি মুক্তাবলীতে রাজশেখর দ্বারা একটী শ্লোক উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ধ্বনিনাতিগভীরেণ কাব্যতত্ত্ব নিবেশিনা।
আনন্দবর্দ্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্দ্ধনঃ॥"

অর্থাৎ কাব্যতত্ত্ব প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ অতি গভীর-ধ্বনিদ্বারা আনন্দবর্দ্ধন কাহারই আনন্দবর্দ্ধন করেন নাই? অর্থাৎ সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই পদ্যটীও আনন্দবর্দ্ধনই যে ধ্বনিকার তাহা সূচনা করিতেছে, কিন্তু অভিনব গুপ্তপাদের ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কারিকাকার ও বৃত্তিকার দুইজন ভিন্ন লোক। কে যে ধ্বনি-কারিকাকার তাহা আজ পর্য্যন্ত নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্তিত হয় নাই। কিন্তু বৃত্তিকার যে রাজানক শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ব্যাখ্যার এক স্থানে এইরূপ উল্লেখ আছে। 'অতএব মূল কারিকায় সে বিষয়ের নিরাকরণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বৃত্তিকার সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইলেও উহার অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট রূপে নিরাকরণ করিয়াছেন।' 'বৃত্তিকার আমি উহা বলি নাই, কিন্তু কারিকাকারেরই এইরূপ অভিপ্রায়।' এইরূপ অভিনব গুপ্তপাদের ব্যাখ্যা হইতে স্থানে স্থানে বৃত্তিকার ও কারিকাকারের ভেদ পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষতঃ ধ্বনির প্রাচীনতা প্রথম কারিকায় ব্যক্ত আছে 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাত পূর্ব্বঃ'। যাহা-হোক্ রাজতরঙ্গিণী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে—শ্রীআনন্দ-বর্দ্ধনাচার্য্য খৃষ্টাব্দীয় নবম শতকের পরবর্ত্তীভাগে কাশ্মীর-প্রদেশে অবন্তিবর্ম্ম মহীপতির রাজ্য সময়ে খ্যাতনামারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যে 'নোণ' ছিল তাহা তদীয় প্রণীত দেবীশতক হইতে জানা যায়।

ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানি আয়তনে স্বল্প হইলেও উহার মধ্যে যে অপূর্ব্ব রসবিচারপরিপাটী ও গভীর রসাস্বাদন প্রণালীর বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন একদিকে সূক্ষ্ম-বিচার পদ্ধতির পরিচায়ক, সেইরূপ অপরদিকে অসীম রস বোধসূচক।

প্রথমে ধ্বনি কাহাকে বলে সে বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। কর্ণরন্ধ্রে প্রবাহ দ্বারা আগত অন্তিম শব্দসমূহ শ্রুত হয়। সেই শব্দ সমূহের ঘণ্টানুরণন-রূপতা বিদ্যমান আছে—সেই জন্য উহা ধ্বনি শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি বলেন,—

"যঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে
স স্ফোটঃ শব্দজঃ শব্দো ধ্বনিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া সংযোগ বিয়োগ দ্বারা উদ্ভূত হয়, তাহা শব্দজাতস্ফোট (স্ফুটাতে বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটঃ) অর্থাৎ বর্ণ দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহাই স্ফোট। প্রত্যয় উৎপাদনের পূর্ব্বে যাহা কেবল শব্দ-প্রতীতি করায় তাহা ধ্বনি। ভগবান্ পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদী। তাহাদের মতে কণ্ঠতালুর সংযোগে যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা অর্থবোধক হয় না। কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। উহারা শব্দরূপ ধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্য বর্ণময় শব্দদ্বারা অর্থ-জ্ঞান হইতে পারে না; কিন্তু ক, খ, প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটী শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম স্ফোট। উহা নিত্য, অখণ্ড ও একরূপ। স্ফোটসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দস্থানীয় অনুরণনাত্মক ব্যঙ্গ্য এবং অর্থও ধ্বনি শব্দে অভিহিত হয়। অব্যক্ত শব্দ সমূহেরই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। ব্যক্ত শব্দসকলের সদৃশ নাদ-শব্দবাচ্য যে সকল বর্ণ শ্রুত হয়, যাহারা অন্তিমবর্ণগ্রাহ্য ও স্ফোটের অভিব্যঞ্জক, তাহারাও ধ্বনি শব্দে অভিহিত হয়। ইহাদ্বারা ব্যঞ্জক শব্দার্থ-যুগলও ধ্বনি শব্দে উক্ত হয়। অতি অল্প প্রয়াসে উচ্চারিত বর্ণও ধ্বনি শব্দে ব্যবহৃত হয়। তদনুরূপমাত্র পরিণাম-শ্রুত শব্দসমূহে বক্তার যে দ্রুতবিলম্বিত বৃত্তি, ভেদাত্মক ও প্রসিদ্ধ উচ্চারণাদি ব্যাপার হইতে যাহা অধিক, তাহাও ধ্বনি শব্দে অভিহিত হয়। এইরূপ চারি প্রকারে ধ্বনি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি যোগেই সকল কাব্যই ধ্বনি শব্দে অভিহিত হয়। অভিধা, তাৎপর্য্য ও লক্ষণানুরূপ প্রসিদ্ধ শব্দশক্তি হইতে অতিরিক্ত শব্দব্যাপারই ধ্বনি শব্দে কথিত হয়। পূর্ব্বে যে 'অন্তিমবর্ণগ্রাহ্য' বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য্য এই যে গৌঃ শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রথমে গ এই বর্ণের সংস্কার, তদনন্তর ঔ সংস্কার ও সর্ব্বশেষে বিসর্গের সংস্কার মনে বিদ্যমান হয়। শেষবর্ণ-সংস্কারের সহিত পূর্ব্ববর্ণ-সংস্কারদ্বয় একীভূত হইলে অর্থবোধ হয়।

এইরূপ অভিমতই আচার্য্য অভিনব গুপ্তপাদ ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্যোতে জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে সকল শ্লোকরাজি উহাতে নিহিত আছে সেগুলি পদসৌষ্ঠবে, রসমাধুর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে ও উপমা-লালিত্যে অতুলনীয়। বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনির উদাহরণরূপে এই শ্লোকটী প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"শিখরিণি ক নু নাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ।
তরুণি যেন তবাধর-পাটলং দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ।"

অর্থাৎ হে তরুণি, এই শুকশাবক পর্ব্বতে কি তপস্যা করিয়াছিল যে—তাহার ফলে তোমার অরুণ অধরপল্লব আস্বাদন করিতে সমর্থ হইতেছে। বিঘ্নশূন্য উত্তম সিদ্ধগণ শ্রীপর্ব্বতাদিও এরূপ সিদ্ধি-লাভ করেন নাই। দিব্যকল্প সহস্রকালও শুকশাবকের তপস্যার নিকট অতিশয় পরিমিত কাল এবং পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি তপস্যাও এরূপ উত্তম ফলদায়ক নহে। এই শুক যে তোমার অধর, পেটুক ব্যক্তির মত ভোগ করিতেছে, তাহা নহে, কিন্তু পরম রসজ্ঞের মতই। তোমার অধরপল্লবপ্রাপ্তির মত তাহার রসজ্ঞতাটিও তপস্যাপ্রভাব হইতেই লব্ধ। 'শুকশাবক' শব্দে ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে যে...তরুণ বয়সরূপ উচিত কাল লাভও তপস্যারই ফল। এখানে অনুরাগীর প্রচ্ছন্নভাবে স্বীয় অভিপ্রায় খ্যাপন ও চাটুবাক্য বিরচনাত্মক বিভাব-উন্মীলনই ব্যঙ্গ্য। ইহার সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে,—'অত্র কবিনিবদ্ধস্য কস্যচিৎ কামিনঃ প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধেন বস্তুনা তবাধরঃ পুণ্যাতিশয় লভ্যঃ ইতি বস্তু ব্যজ্যতে'। বক্রোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ এই শ্লোকটী ধ্বন্যালোকে উল্লিখিত আছে,—

"দৃষ্ট্যা কেশব গোপরাগহৃতয়া কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ময়া
তেনৈব স্খলিতাস্মি নাথ পতিতাং কিং নাবলম্বসে"॥
একস্ত্বং বিষমেষু খিন্নমনসাং সর্ব্বাবলানাং গতি-
র্গোপ্যৈবং গদিতঃ সলেশমবতাদ্গোষ্ঠে হরির্বশ্চিরম্'।

অর্থাৎ হে কেশব! (গোপরাগ) গোধূলি দ্বারা আমার দৃষ্টি আবৃত হওয়ায় আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই কারণেই আমি পদস্খলিত হইয়াছি। এইরূপে পথে পতিতা আমাকে কোন্ কারণে তুমি অবলম্বন দান করিতেছ না? যেহেতু তুমিই একমাত্র অতিশয় বলবান্—নিম্ন ও উন্নত সকল শ্রেণীর বালবৃদ্ধাঙ্গনাগণের—যাহারা গমন করিতে অসমর্থ, তাহাদের আলম্বনাদি উপায়স্বরূপ। ইহাই সরলার্থ। এইরূপ অর্থে যদিও এ প্রকরণে অভিধা-বৃত্তি দ্বারা শব্দসমূহ নিয়ন্ত্রিত আছে, তথাপি দ্বিতীয় অর্থ ব্যাখ্যাত হইলে অভিধা শক্তি নিরুদ্ধা হইয়া 'সলেশং' ইত্যাদি শেষ চরণের বাক্য দ্বারা পুনর্ব্বার উজ্জীবিতা হইয়া উঠে।

শব্দশ্লেষে বক্রোক্তির দ্বারা অন্যার্থ এইরূপ হইবে—হে কেশব গোপ (গুপ্ ধাতু রক্ষণে) স্বামিন্! রাগদ্বারা আমার দর্শন-শক্তি হৃতা হইয়াছে, সেই জন্যই আর্য্যপথ হইতে পতিত হইয়াছি বা খণ্ডিতচরিত্রা হইয়াছি। অতএব স্খলিতা আমার প্রতি কোন্ কারণে তুমি ভর্তৃভাব অবলম্বন করিতেছ না? যেহেতু একমাত্র অসাধারণ সৌভাগ্যশালী তুমিই মদনবেদনাবিধুরহৃদয় অবলাগণের ঈর্ষাকলুষতা নিরাসপূর্ব্বক সেবিত হইয়া তাহাদের জীবিত রক্ষার উপায়। এইরূপে গোপীদ্বারা কথিত হইয়া আকার দ্বারা

(আলিঙ্গন) ভাব সূচনাকারী গোষ্ঠস্থিত হরি তোমাদিগকে চিরকাল রক্ষা করুন। এইরূপে এই শ্লোকটী বক্রোক্তির দ্বারা বাচ্য-শ্লেষের বিষয়ীভূত হইল।

সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শব্দাশ্বরাদি দ্বারা যেখানে গোপন হেতু চমৎকারিত্বের বিপর্য্যাস তাহাও গুণীভূত ব্যঙ্গ—তাহারই উদাহরণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত আছে। এখানে গোপ রাগাদি শব্দসকলের গোপে রাগ ইত্যাদি ব্যঙ্গার্থ সকলের 'সলেশ' এই পদে স্পষ্টরূপে অবভাস দৃষ্ট হয়। 'সলেশ' এই পদত্যাগ করিলে ধ্বনিই হইবে।

যে স্থলে ব্যঙ্গ্য অপেক্ষা বাচ্যের চারুত্বোৎকর্ষ প্রতীয়মান হয়, সে স্থানে ব্যঙ্গ্যটী বাচ্যের অঙ্গ বলিয়া ধ্বনির বিষয়ীভূত হয় না। সেই জন্য প্রতীয়মান অর্থটী স্ফুট হইলেও যদি উহা বাচ্যের অঙ্গরূপে অবভাসিত হয়, তবে তাহাও অনুরণনরূপ ব্যঙ্গধ্বনির অগোচর বা বিষয়ীভূত নহে। ধ্বন্যালোকে সেই জন্য উক্ত আছে,—

"যত্র প্রতীয়মানোঽর্থ প্রক্লিষ্টত্বেন ভাসতে
বাচ্যস্যাঙ্গতয়া বাপি নাস্যাসৌ গোচরো ধ্বনেঃ" ২।৩২

উদাহরণ স্বরূপে একটী শ্লোক উল্লিখিত আছে। যথা :—

"কমলাকরা ন মলিনা হংসা উড্ডীয়িতা ন চ পিতৃষণঃ
কেনাপি গ্রামতড়াগেঽভ্রমুত্তানিত্যঃ ক্ষিপ্তম্।"

অর্থাৎ কমলসমূহের আকর বা স্থান অর্থাৎ জলাশয় মলিন হয় নাই—পিসিমার হংসসমূহও উড্ডীন করা হয় নাই। কোন এক নিপুণ ব্যক্তি উর্দ্ধস্থিত মেঘ জলে নিক্ষেপ করিয়াছে। এখানে বিস্ময়ের কারণরূপ বাচ্যের দ্বারা মুগ্ধাতিশয় প্রতীত হইতেছে। সেই জন্য বাচ্য হইতে চারুত্ব-সম্পৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে মেঘের প্রতিবিম্ব দর্শনরূপ প্রতীয়মান অর্থটী বাচ্যের অঙ্গ।

গুণীভূত ব্যঙ্গ্যও রসভাবাদি তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্বনিরূপই ধারণ করে। তাহার উদাহরণরূপে এই শ্লোকটী উল্লিখিত আছে,—

"দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত-
স্তবৈতৎ প্রাণেশাজঘন বসনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈ বিরমহে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ॥"

এই শ্লোকের শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে শ্রীরাধিকার খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—তুমি অসময়ে কুপিতা হইয়া তোমার পদতলে পতিত আমার প্রতি প্রসন্না হইতেছ না; আহা! তুমি দুরারাধ্যা অর্থাৎ তোমার দুর্জ্জয় মান কোনরূপেই প্রসাধিত হইতেছে না। তুমি রোদন করিওনা, এই বলিয়া প্রিয়তম কৃষ্ণ অশ্রুধারা মার্জ্জন করিতে থাকিলে, শ্রীরাধিকা তদীয় নির্ণয়গর্ভোক্তি এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—'হে সুভগ বা সুন্দর! প্রত্যক্ষরূপে দেখ, তুমি তোমার প্রিয়ার যে জঘনবসন দ্বারা আমার মার্জ্জন করিতেছ তাহাতে তোমার অশ্রু পতিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রিয়ার বস্ত্রে তোমার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। প্রিয়া দ্বারা সম্ভোগ ভূষণ বিহীন হইয়া তুমি ক্ষণকালও তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হও না। প্রত্যক্ষরূপেই ইহা দেখ। তুমি তাহার প্রতি একপ আদর প্রকাশ করিয়াছ যে, লজ্জাদি ত্যাগ করিয়াও তাহারই বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। তোমার প্রত্যুত সংস্রধারাবাহী অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তুমি হতবুদ্ধি, অর্থাৎ সেই নায়িকার প্রেমে জ্ঞান হারাইয়াছ সেই জন্য আমাকে বিস্মৃত হইয়া এখনও তাহাকেই কুপিতা মনে করিয়াছ; তাহা না হইলে তুমি একপ করিবে কেন? এখন রোদনের অবকাশ গত হইলেও অশ্রু পতিত হইল কেন? এইরূপ অর্থই শ্রীরাধিকার সোল্লুণ্ঠ (স্তুতি পূর্ব্বক দুর্ব্বাদ) বচনভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে—এত আদর করিয়াও তোমার কোপ উপশান্ত হইলনা, আমি কি করিব? স্ত্রীগণের হৃদয়ই পাষাণসদৃশ কঠোর। তাহাদের হৃদয় বজ্রসার হইতেও অধিক কঠিন; যেহেতু এরূপ আমার আচরণ সাক্ষাৎ করিয়াও উহা সহস্রবার বিদলিত হইল না! [illegible] সুকুমারহৃদয়া স্ত্রীর মত কোমলহৃদয়বিশিষ্ট—ইহাই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—স্ত্রীচিত্ত কঠোর, [illegible] যে সকল উপচার [illegible] জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। হে রাধে, তুমি মান ত্যাগ কর, এইরূপে বহু অনুনয়কারী শ্রীহরি তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। এখানে 'অনুনয়েষু' এই বহুবচন প্রয়োগদ্বারা বারম্বার বল্লভের এইরূপ অনুনয় সূচিত হইল। শ্রীরাধিকার সৌভাগ্যাতিশয় অভিব্যক্ত হইল। এইরূপে ব্যঙ্গ্যার্থসার বাচ্যার্থকে ভূষিত করিয়াছে। সেই বাচ্যও এইরূপে ঈর্ষ্যামানাখ্য বিপ্রলম্ভের অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্যঙ্গ্যের যে প্রকৃত গুণীভূততা বা বাচ্যার্থ হইতে অচমৎকারিতা, তাহা এইরূপে সমূলে অপগত হয়।

ভক্তির অপূর্ব্ব মহিমা ধ্বন্যালোকের এই শ্লোকটীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

"যা ব্যাপারবতী রসানরসয়িতুম্ কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
শ্রান্তা, নৈব চ লব্ধমব্ধি শয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখং।"
৩।২২১ পৃঃ।

যে প্রতিভারূপা দৃষ্টি-ব্যাপারবতী অর্থাৎ বিভাবাদি যোজনাত্মিকা বর্ণনা ব্যাপারময়ী ও রস্যমানতা সারতাহেতু

ভাবসমূহকে রসতাবস্থা প্রাপ্তিযোগ্য করিতে কবিগণের যে দৃষ্টি নব নব বৈচিত্র্য সূচনা করিয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপ যে দৃষ্টি নিশ্চেতব্য বিষয়ে অচলোন্মেষশালিনী ও জ্ঞানময়ী। এই দৃষ্টিদ্বয় অবলম্বন করিয়াও বারম্বার অশেষ-রূপে নিঃশেষে বর্ণনা করিয়া আমরা খিন্ন হইয়াছি, কিন্তু কোন সার বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। হে সাগরশায়ি, তুমি যোগনিদ্রামগ্ন, অতএব সার স্বরূপজ্ঞ ও স্ব স্বরূপে অবস্থিত; যে ব্যক্তি শ্রান্ত হয় তাহার শয়নস্থিত জনের প্রতি বহু মান প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। তুমিই পরমাত্ম স্বরূপ বিশ্বসার—তোমার উপাসনা ক্রমে যে আবেশ সঞ্জাত হয়, তজ্জাতীয় বস্তুর কথা দূরে থাক্। তাহার তুল্যও কোনবস্তু আমরা লাভ করি নাই।

এই শ্লোকটী আনন্দ বর্দ্ধনাচার্য্য সহৃদয় ভাগবতগণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধনার্থই যেন রচনা করিয়াছেন। শ্লোককার মহোদয় প্রথমেই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পরমেশ্বর-ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার কুতুহল মাত্র অবলম্বনকারী কবি ও প্রামাণিকগণ এই উভয়ের কার্য্য হইতে পরমেশ্বর ভক্তি বিশ্রান্তি যে শ্রেষ্ঠ ও যুক্ততর তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য বলেন—'সকল প্রমাণ পরিনিশ্চিত দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় বিশেষজং যৎ সুখং যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্ব্বণাত্মকং তত উভয়তোঽপি পরমেশ্বর-বিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃষ্যতে। তদানন্দ বিপ্রুষ মাত্রাবভাসোহি রসাস্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মাভি লৌকিকং তু সুখং ততোঽপি নিকৃষ্টপ্রায়ং বহুতর দুখানুষঙ্গাদিতি তাৎপর্য্যম্ (লোচন)। বিশেষতঃ শ্রীরাধামাধবের লীলাবিলাসের মধ্যেই রস বৈচিত্রী ও বৈদগ্ধী চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সে বিষয় বিজ্ঞ রসিকগণ বলেন,—

> "যদমিত রসশাস্ত্রে ব্যক্তি বৈদগ্ধ্যবৃন্দম
> তদণুমপি ন বেত্তুং কল্পতে কামিলোকঃ।
> তদখিলমপি যস্য প্রেমসিন্ধৌ ন কিঞ্চি-
> ন্মিথুনমজিত গোপীরূপমেতদ্বিভাতি॥"

অর্থাৎ অসংখ্য রসশাস্ত্রে যে রস পরিপাটী সমূহ অভিব্যক্ত আছে, কামীলোক তাহার অনুমাত্রও অবগত হইতে সমর্থ নহে। কিন্তু সেই অখিল বিদগ্ধতা পরিপূর্ণ অবয়বে প্রকাশিত হইলেও যে যুগলকিশোরের প্রেম সিন্ধুতে অতি ক্ষুদ্র রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীরূপ যুগল শোভা পাইতেছেন। অতএব তাঁহারা সাধারণ মিথুন নহে।

শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই—সকল প্রমাণ দ্বারা পরিনিশ্চিত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে বিরাগ হইতে উদ্ভূত যে সুখ, কিম্বা লোকোত্তর রসাস্বাদনাত্মক যে সুখ, এতদুভয় হইতেও যে পরমেশ্বর বিশ্রান্তি জনিত আনন্দ উৎকৃষ্ট তাহা প্রদর্শন করাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। সেই ভগবদ্ভক্তি হইতে উত্থিত আনন্দসাগরের কণামাত্র অবভাসই যে কাব্যরসাস্বাদ, তাহা শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। লৌকিক সুখ যে তাদৃশ রসাস্বাদ হইতেও নিকৃষ্ট ও দুঃখবহুল তাহা বলাই বাহুল্য। এই শ্লোকটী ধ্বন্যালোকে বিরোধালঙ্কার দ্বারা ধ্বনি ভেদ অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যের সংকীর্ণত্বের উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে। সাহিত্যদর্পণে উহার লক্ষণ এইরূপ আছে,—

'বাক্যান্তর পদানাং বাক্যান্তরেঽনুপ্রবেশঃ সংকীর্ণত্বম্।

অর্থাৎ অন্য বাক্যের পদ যদি অপর বাক্যে অনুপ্রবেশ করে, তাহা হইলে উহা সংকীর্ণ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এই শ্লোকে দৃষ্টি শব্দাপেক্ষা দ্বারা একপদের বাক্যান্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। দৃষ্টি—অবলম্বন করিয়া নির্বর্ণনম্—ইহা দ্বারা বিরোধালঙ্কার পরিস্ফুট। কারণ এখানে নির্বর্ণন 'শব্দে' নিঃশেষে বর্ণনা বা বর্ণনা দ্বারা নিশ্চয়ার্থ বর্ণনই বুঝাইতেছে কিন্তু তাহার প্রকৃতার্থ দর্শন বুঝায় না।

দৃষ্টি শব্দে চাক্ষুষ জ্ঞান তাহার দ্বারা নির্বর্ণন—এখানেও বিরোধালঙ্কার; অতএব নূতন বিরোধের দ্বারা ধ্বনি এখানে অনুগৃহীত।

চাক্ষুষ জ্ঞান অবিবক্ষিত হইতে পারেনা—অত্যন্ত অসম্ভবের অভাব হেতু উহা অন্য বিষয়কও হইতে পারেনা। কিন্তু ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানাভাস দ্বারা উল্লসিত প্রতিভালক্ষণ অর্থান্তরে সংক্রান্ত হইবে। ইহা দ্বারা বিরোধের অনুগ্রাহক হয়। 'বৈপাশ্চতী' শব্দে এখানে বিপাশ্চতামিয়ং বৈপাশ্চতী এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই যে দৃষ্টি উহা জ্ঞানীগণেরই—আমি কবি বা পাণ্ডিত নহে—এইরূপে আপনার অনৌদ্ধত্য ধ্বনিত হইয়াছে। যেরূপ দারিদ্রগৃহে অন্য স্থান হইতে উপকরণাদি আনীত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দৃষ্টিদ্বয়ও আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য অন্যের নিকট আহরণ করিয়াছেন। এই এক দৃষ্টি দ্বারা সম্যকরূপে বর্ণন হয় না বলিয়া সেই জন্য দুটীর আবশ্যক। ইহা এই প্রকার, এইরূপে পরামর্শ অনুমানাদি দ্বারা বিভাগ করিয়া এখানে কোনটী সার বস্তু আছে তন্নিমিত্ত তিল তিল বর্ণন। যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহার মধ্যে বিভাবাদি যোজনা পূর্ব্বক রস ঘটনা পর্য্যন্ত ক্রিয়াপর ও অর্থবিশেষে নিশ্চল দৃষ্টি দ্বারা সম্যক্ বর্ণিত হইলেই নির্বর্ণন হইয়া থাকে। শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যার ইহাই তাৎপর্য্য।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ—৩

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত]

শ্রীভগবান্ ভক্তের কেবল ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া থাকেন, তিনি ভক্তের কুল শীল বিদ্যাদি অন্য কোনও গুণের অপেক্ষা করেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রূয়তে।

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ, ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

১১।১৪।২১

অর্থাৎ কেবল একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত-ভক্তিতেই ভক্ত আমাকে পাইয়া থাকে; মন্নিষ্ঠা ভক্তিই কুক্কুরভোজী চণ্ডালেরও জাতিদোষাদি প্রারব্ধ পাপ নষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া থাকে

পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী পদ্যাবলীতে দেখাইয়াছেন যে শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট হয়েন, আর কিছুতেই নহে—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্
বংশ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ

দাক্ষিণাত্যস্য

ধর্ম্মব্যাধের কি সদাচার ছিল, ধ্রুবের বয়সই বা কি ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, কুব্জার কি রূপ ছিল, সুদামার কি ধন ছিল, বিদুরের কি বংশ ছিল, উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল, তথাপি শ্রীভগবান্ ইহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন, কেবল সদাচারাদি গুণসকলদ্বারা কখনও পরিতোষ লাভ করেন না।

গোস্বামি-চরণ আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

অনুচিতমুচিতম্বা কর্ম্ম কোঽয়ং বিভাগো
ভগবতি পরমাস্তাং ভক্তিযোগো দ্রঢ়ীয়ান্।
কিরতি বিষমহীন্দ্রঃ সান্দ্রপীযূষমিন্দু
দ্ব য়মপি স মহেশো নির্ব্বিশেষং বিভর্ত্তি॥

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাম্

অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ দৃঢ় হইলে সদাচার ও দুরাচার বলিয়া কোনও ভেদ থাকে না। বিহিতাকরণ কিম্বা নিষিদ্ধকরণে অভিমানাভাবহেতু ভক্তের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধিই হয় না। অহীন্দ্র বিষ উদ্গিরণ ও শশধর নিবিড়ামৃত ক্ষরণ করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীশঙ্কর বৈষ্ণব-চূড়ামণি, তিনি ঐ দুইটিকেই নির্ব্বিশেষভাবে ধারণ করিতেছেন।

বৈষ্ণবকবি শ্রীল প্রেমানন্দদাস মহাশয় গাহিয়াছেন—

মন! কি করে বরণ কুল।
যেই কুলে কেন, জনম না হয়, কেবল ভকতি মূল
কপিকুলে ধন্য, বীর হনুমান, শ্রীরামভকতরাজ॥
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বরসভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশ।
স্ফটিকস্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইয়া যাহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডালবর॥
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাহার ঘর॥
দেখনা কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই॥

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিয়াছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

ভাগ ৭।৯।১০

অর্থাৎ ধর্ম্মসত্যাদিদ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনে বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালও যদি শ্রীগোবিন্দচরণে তাঁহার সকল কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ অর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে সেই চরণ ভজন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তাঁহা হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ; কারণ এই চণ্ডাল নিজের কুলের সকলের সহিত পবিত্র হইয়া যায়, আর এই ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না। ভক্তিহীন-গুণসকল ব্রাহ্মণের গর্ব্বেরই হেতু হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিদ্যামদো ধনমদস্তথা চাভিজনমদঃ।
মদা এতৈরলিপ্তানাং ত এব হি সতাং দমাঃ॥

বিদ্যামদ, ধনমদ ও সৎকুলজন্মহেতু মদ এই তিনটিকেই মদ কহে। সাধুভক্তের হৃদয় ইহা স্পর্শ করিতে পারে না। এই তিনটিই তাঁহাদের দম অর্থাৎ অন্তর ও বাহেন্দ্রিয়-দমনের হেতু বা সহায় হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও এই কথাই বলিয়াছেন—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

ইতিহাসসমুচ্চয়

অর্থাৎ ভক্তিবিহীন চতুর্ব্বেদনিপুণ ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহে! আমার ভক্ত সুনীচ চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। তাঁহাকে সকলেরই সম্মানাদি দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাঁহার নিকট হইতে সকলেরই উপদেশাদি লওয়া আবশ্যক। তিনিই দানের সুপাত্র এবং তাঁহার দান সকলেরই গ্রহণযোগ্য। তিনি আমার ন্যায় সকলেরই পূজ্য।

সাধুভক্ত নীচকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহার সহিত প্রীতি-সংস্থাপন সকলেরই কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী এই প্রীতির লক্ষণ দেখাইয়াছেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্।

অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুহ্যকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুহ্যবিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান, এই ছয়টি প্রীতিলক্ষণ, এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে।

অতিশয় দুরাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিও সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। একবার ভজনে প্রবৃত্ত হইলে আর কদাপিও তাঁহার নাশ-সম্ভাবনা নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের সাটোপ-বাক্যই প্রমাণ—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা

অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার ভজন করিলে তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে। "একমাত্র ভগবদ্ভজনেই কৃতার্থ হইব" তাহার এই অধ্যবসায় অতি প্রশংসনীয়; সে ইহার ফলে অনতিবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মদেকনিষ্ঠা পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে উদ্ধবাহু হইয়া পটহাদি মহাঘোষ সহকারে সকলের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আইস যে, আমার ভক্ত সুদুরাচার হইলেও কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীভগবান্ শ্রীরামাবতারেও এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম।

আমার ব্রতই এই যে—যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হইয়া একবার মাত্র "আমি তোমার" একথা বলিতে পারে, আমি তাহাকে চিরকালের জন্য অভয় দিয়া থাকি।

যোগ ও জ্ঞানমার্গে দুরাচারী যোগী ও জ্ঞানী নিন্দার পাত্র, এবং দুরাচারত্বদোষে তাঁহাদের যোগ ও জ্ঞান সাধন নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তিমার্গে দুরাচার হইলেও ভক্ত নিন্দনীয় নহেন, এবং তাঁহার ভক্তিসাধনও নষ্ট হয় না। গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ যোগভ্রষ্ট ও জ্ঞান

ভ্রষ্টের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তের সম্বন্ধে গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি", এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে বলিয়াছেন

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

১১।১৪।১৮

অর্থাৎ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেই সাধক জীব কৃতার্থ হইয়া যায়, উৎপন্নভাব ভক্তের ত কথাই নাই। সাধক-ভক্তের প্রথম হইতেই সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সম্ভবপর নহে। বিষয় কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইলেও পরিবর্দ্ধমানা মদীয়া ভক্তির প্রভাবে সাধক ভক্ত তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হয়েন না। যেমন শৌর্য্যশালী বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও পরাভূত হয়েন না, সেইরূপ ভক্তিমান সাধক বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও অভিভূত হন না। যেমন পিত্ত-জ্বরগ্রস্থ ব্যক্তি একদিন পিত্তজ্বরঘ্ন মহৌষধ সেবন করিলে সেই দিন তাহার জ্বর আসিলেও সে জ্বর যৎসামান্য ও প্রকোপশূন্যই হয়, এবং পরদিন হইতে আর আইসে না, সেইরূপ ভক্তি আশ্রয় করিলে সাধক ভক্তের বিষয়-তৃষ্ণা প্রথমে কিছু থাকিলেও অনতিবিলম্বে একেবারেই দূর হইয়া যায়।

ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত সাধকের হৃদয়ের কামনা বাসনাদি মলরাশি শ্রীভগবান্ নিজেই মার্জ্জিত করিয়া দিয়া থাকেন। যোগীন্দ্র করভাজন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্ত্বান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

ভাগ ১১।৫ ৩৬

অর্থাৎ যে সাধক নিজের দেহাদিতে আবেশ এবং দেবতান্তরে সেব্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দচরণ ভজন করিয়া থাকেন, তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়, তাঁহার নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদি কখনও প্রমাদ-বশতঃ প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থ শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয় হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার পাপবাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া দুর করিয়া দিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থআপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

ভাগ ১।৫।১৭

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্ব্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ

ভাগ ১।৫।১৯

অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিয়া গোবিন্দচরণ ভজন করিতে করিতে অপক্ক অবস্থায় যদি কেহ ভজনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার নীচ যোনিতে জন্মলাভ হইলেও ভক্তি-বাসনা-সদ্ভাব হেতু কখনও অমঙ্গল হয় না। পক্ষান্তরে, গোবিন্দচরণ ভজন না করিয়া কেবল স্বধর্ম্মাচরণে কাহারও কখন মঙ্গল হয় না। ভগবচ্চরণ-ভজনকারী কোন দুরভিনিবেশ হেতু কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মিজনাদির ন্যায় পুনঃ সংসারগ্রস্ত হন না; কারণ পরমানন্দঘন ভগবচ্চরণ আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া পুনরায় আর তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রসনীয় ভগবচ্চরণ-কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থাৎ বশীকৃত হইয়া আছেন।

এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় সখা বলিয়াছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

এই ভক্তিমার্গে প্রারম্ভের নাশ কখনও হয় না, এবং আমার কৃপা হেতু ইহাতে বিঘ্ন বৈগুণ্যাদিরও সম্ভাবনা নাই। অতি অল্পমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা সংসারলক্ষণ মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকে।

গর্ভস্তুতিতে দেবতারা শ্রীভগবান্‌কে সেই কথাই বলিয়াছেন—

তথা ন তে মাধব তারকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো॥ ভাগ ১০।২।৩৩

হে মাধব! অভক্ত কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানীর মত তোমার ভক্তসকল কখনও ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হয়েন না, কারণ তাঁহাদিগের সুহৃত্তম তুমি তাঁহাদিগকে নিজ চরণকমলে বাঁধিয়া রাখিয়া থাক। তুমি প্রভু, তোমাকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিঘ্নদাতাগণের মস্তকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা বিঘ্নদাতাগণকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলেন যে, তাহারা তাঁহাদিগের চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে!

ভক্তের ভক্তিই পরমপুরুষার্থচূড়ামণি, কারণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বনিয়ন্তা ও মহাস্বতন্ত্র হইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তিলোলুপ, এবং শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তের ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তের ভক্তিই তাঁহার একমাত্র উপজীব্যরূপে আস্বাদনীয়, তজ্জন্যই তিনি ভক্তমাত্রেরই ভক্তিবিবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা লালায়িত। কেহ তাঁহাকে সকামভাবে ভজন করিলেও তিনি তাহার কামনাসমূহ দূর করিয়া স্বচরণে অহৈতুকী ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতো যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৬।১৯।২৬

অর্থাৎ তিনি সকামভক্তের প্রার্থনানুসারে তাহাকে অর্থাদি দিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা পরমার্থ নয় বলিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার যে হৃদয় হইতে পুনঃ পুনঃ কামনার উদয় হয়, তথায় তাহার সর্ব্বকামপরিপূরক নিজ পাদপল্লব স্থাপন করিয়া দেন; তখন সে তাঁহার চরণকমলের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীধ্রুবমহাশয়ের মত সে কাঁচ খুঁজিতে বাহির হইয়া দিব্যরত্ন পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়।

গীতায় শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

যে ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র পুষ্প, ফল ও জল মাত্র প্রদান করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিমিশ্রিত দ্রব্যসকল আদরের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকি।

গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

অর্থাৎ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তিমিশ্রিত একটি তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্র জল পাইলেই তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ এতাদৃশ ভক্তবৎসল হইলেও অধিকাংশ ভক্তকে বিঘ্ন বিপদাদি দুঃখ দিয়া তাহার ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার ভক্তহিতৈষিতারই পরিচয়। তিনি স্বভক্তি-বিবর্দ্ধনচতুর, যাহার যাহাতে মঙ্গল হইবে তিনিই তাহা জানিয়া ব্যবস্থা করেন। ভক্তের দুঃখ বহির্দৃষ্টিতে সাধারণ দুঃখের ন্যায় বোধ হইলেও তাহা কর্ম্মফলজন্য নহে বলিয়া ভক্তকে অভিভূত করে না। সাধারণ দুঃখ কাল-কর্ম্মাদিকৃত, ভক্ত কালকর্ম্মাদির অতীত বলিয়া তাঁহার দুঃখ কেবল ভগবদিচ্ছাহেতু জানিতে হইবে। ভগবদ্দত্ত বিপদাদি দুঃখহেতু তাঁহার ভজনোৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তিনি ভগবচ্চরণে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দই ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের বিপদ ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির সহায়তা করে বলিয়া তিনি তাহা সম্পদজ্ঞানেই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। শ্রীকুন্তীদেবী সেইজন্যই বলিয়াছিলেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্রতত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

ভাগ ১।৮।২৪

হে জগদ্‌গুরো! যে বিপদে তোমার দর্শনলাভ হয়, আমি যেন নিরন্তর সেই বিপদই পাই, কারণ তোমার দর্শনলাভ হইলে আর সংসার-দুঃখের দর্শন করিতে হয় না।

শ্রীভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

"যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"

ভাগ ১০।৮৮।৮

অর্থাৎ আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিব বলিয়া মনে করি, আমি তাহার ধন অল্প অল্প করিয়া হরণ করিয়া থাকি। ধনজনাদির প্রতি আবেশ থাকিতে আমার ভজন সফল হয় না।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপায় ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই সুদুরাচার ব্যক্তিও সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকেন, এবং অনতিবিলম্বে সাধুর সকলগুণই তাঁহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে ও দুরাচারাদি দোষ দূর হইয়া যায়। আমরা ইহাও আলোচনা করিয়াছি যে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই জীবের সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়; তাহার জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদি ভোগ বদ্ধজীবের মত কর্ম্মবন্ধনহেতু আর হয় না, এই সকল তাঁহার কেবল ভগবদিচ্ছাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভক্তির অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে এই সর্ব্বকর্ম্মধ্বংস-কার্য্য যুগপৎ সম্পাদিত মনে হইলেও তাহা ক্রমশঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন— "উৎপলসহস্রদলভেদবৎ"। অর্থাৎ একসহস্র পদ্মদল একটির উপর আর একটি করিয়া সাজাইয়া লইয়া সূচিকাদ্বারা ভেদ করিলে একসময়েই সকল দলগুলি বিদ্ধ হইল মনে হইলেও যথাক্রমে একটির পর আর একটি দলই ভেদ হইয়াছে জানিতে হইবে। এইজন্য ভক্তিমার্গে প্রথম প্রবর্ত্তমান ভক্ত ও উৎপন্নভাব-ভক্ত এই দুই জনের পার্থক্য অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শাস্ত্রপ্রমাণসহ প্রথমে ভক্তির অধিকারীর ৩টি শ্রেণী দেখাইয়াছেন, যথা—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ দেখিয়া সামান্যমনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহার অবজ্ঞা করিয়া আমরা যাহাতে অপরাধে পতিত না হই, সেই উদ্দেশ্যেই কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রয়াস। তিনি বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী।

সামান্যভক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে, কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। ভ-র-সিন্ধু

অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই ভগবদ্ভজনের যোগ্যতায় অধিকার আছে। পূর্ব্বোক্ত পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধাবান্ জনই অন্যাভিলাষিতাশূন্যাদিলক্ষণ-যুক্তা উত্তমা-ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধার তারতম্যেই ভক্ত উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বলিয়াছেন—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥

মধ্যম অধিকারীর লক্ষণ বলিয়াছেন—

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥

এই পয়ারে "নাহি" অল্পার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ শাস্ত্র একেবারেই না জানিলে শ্রদ্ধা হইতেই পারে না।

কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ বলিয়াছেন—

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

এই কনিষ্ঠ অধিকারী কোমল শ্রদ্ধাবান্ হইলেও কালক্রমে তিনিও উত্তম অধিকারী হইবেন।

ভক্তির এই ত্রিবিধ অধিকারী দেখাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তেরও উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিনটি শ্রেণী দেখাইয়াছেন। যোগেন্দ্র হরি মহারাজ নিমিকে এই তিন শ্রেণীর ভক্তের যে পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই প্রমাণ দিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতেই শ্রীভগবানের সত্তা, অথবা শ্রীভগবানে নিজের যে জাতীয় ভাব বিদ্যমান সর্ব্বভূতে তাহারই অভিব্যক্তি দেখিতে পান, এবং সর্ব্বভূতই শ্রীভগবানে আশ্রিত দেখিতে পান তিনিই ভাগবতোত্তম। উত্তম ভক্ত চিদানন্দময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালী বলিয়া জগতের যেখানেই তাঁহার চক্ষু পড়ে সেই খানেই তিনি চিদানন্দময়মূর্ত্তিই দেখেন। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ গীতা

অর্থাৎ যে আমাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আমাতে দেখিয়া থাকে, আমি তাহার কখনও অদৃশ্য হইনা, এবং সেও কখন আমার অদৃশ্য হয় না।

উত্তম ভক্তের কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে হইবে। প্রাকৃতদৃষ্টি সম্পন্ন আমাদের চক্ষু জগতের যেখানেই পড়ে, কেবল ভোগ্যদৃষ্টিতেই দেখে, আর চিদিন্দ্রিয়বান্ উত্তমভক্ত সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনহেতু সর্ব্বদা সেব্য-দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। শাস্ত্র এই জন্যই বলিয়াছেন—

নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ।
জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্॥

অর্থাৎ ধীর পরমার্থিগণ জগৎ নারায়ণময় দেখিয়া থাকেন, লুব্ধব্যক্তি জগৎকে ধনময় এবং কামুক ব্যক্তি ঐ জগৎকেই কামিনীময় দেখিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দকেও উত্তমভক্তের এই লক্ষণই বলিয়াছেন—

মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি॥

উত্তম ভক্তের দৃষ্টি একমাত্র শ্রীভগবানে থাকিলেও তাঁহার অন্তরের অবস্থাভেদে দৃষ্টির তারতম্য হইয়া থাকে, যথা—(১) উৎকণ্ঠাপ্রাবল্যাবস্থায়, জগতের যেখানেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তিনি জগৎ দেখেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহার ইষ্টদেব—দ্বিভুজ, শ্যামসুন্দর, পীতাম্বর, মুরলীধরমূর্ত্তিই তাঁহার নয়নগোচর হইয়া থাকেন।

(২) প্রেমপ্রাবল্যাবস্থায়, জগতের যেখানেই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই তাঁহার ইষ্টদেব মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

(৩) ভাবপ্রাবল্যাবস্থায়, শ্রীভগবানে তাঁহার নিজের যে ভাব সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি জগতের যে পদার্থে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে তাহাতেই তিনি দেখিতে পান। উত্তম ভক্তের এই অবস্থার আদর্শ পূর্ব্বরাগবতী ব্রজবালাগণ বেণু-গীতে দেখাইয়াছেন। রাসরজনীতে যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে বিরহ-বিধুরা ব্রজরামাগণও বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে এই অবস্থার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীদ্বারকায় মহিষীগণেও ইহার যথেষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছিল।

(৪) শরণাপত্তিপ্রাবল্যাবস্থায়, সকল দৃশ্যবস্তুই আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানে আশ্রিত দেখেন।

(৫) তত্ত্বানুভূতি-প্রাবল্যাবস্থায়, তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির খেলা বুঝিতে পারেন, এবং স্বরূপশক্তির কৃপায় চিন্ময়ীবৃত্তি লাভ করিয়া জীব কিরূপে কৃতার্থ হয় তাহাও বুঝিতে পারেন।

উত্তম ভক্ত সাধনবলে সাধনভক্তি ও ভাবভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি কেবল শ্রীভগবৎসম্বন্ধেই আবদ্ধ। তাঁহার কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা বিচক্ষণ পণ্ডিতেও বুঝিতে সমর্থ নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।

উত্তমভক্তের বাহ্যিক ও আন্তরিক চেষ্টা যোগেন্দ্র কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগ ১১।২।৪০

অর্থাৎ এইরূপ ভজনশীল জাতপ্রেমা ভক্ত স্বপ্রিয় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলাদির স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারহেতু শ্লথহৃদয় হইয়া কখন উচ্চহাস্য, কখনও রোদন, কখন চিৎকার কখন গান এবং কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন। তাঁহার লোকমর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। লীলানিধি শ্রীভগবানের লীলাসমূহের স্ফূর্ত্তিহেতু তত্তৎলীলানুসারেই তাঁহার এই আচরণ-সকল প্রকট হইয়া থাকে।

উত্তমভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যোগেন্দ্র হরির বাক্যেই মধ্যম ভক্তের লক্ষণ দেখাইয়াছেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
১১।২।৪৬

অর্থাৎ মধ্যমভক্ত শ্রীভগবানে ভক্তি করেন, তিনপ্রকার ভক্তের সহিতই সখ্যতা অর্থাৎ যথোচিত শুশ্রূষাপ্রণতি-সমাদরাদি করেন, বহির্মুখলোকের প্রতি কৃপা করেন, এবং ভক্তও ভগবদ্বিরোধীজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব মধ্যমভক্তের দৃষ্টি চারিস্থানে চারিপ্রকার। মধ্যমভক্তই জীবোদ্ধার-কার্য্যে কৃতসংকল্প, মধ্যম ভক্তই জগতের যথার্থ উপকার করিয়া থাকেন।

মধ্যমভক্ত প্রায়শঃ সাধন ভক্তির রাজ্যেই বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রথমে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ভজনবলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে, তিনি ভক্তিতে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি লাভ করিয়াছেন। ভাব ভক্তির লক্ষণও তাঁহাতে কখন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষমা, বৃথাকালক্ষেপত্যাগ, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, ভগবৎ-প্রাপ্তিতে আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সদানামগ্রহণে রুচি, ভগবদ্‌-গুণ কীর্ত্তনে আসক্তি ও ভগবল্লীলাভূমিসকলে প্রীতি, জাতভাবাঙ্কুর ভক্তের এই অনুভাব সকল মধ্যমভক্তে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ দেখাইয়াছেন—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়ে হতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
ভাগ ১১।২।৪৭

অর্থাৎ যিনি হরিসন্তোষণের জন্য লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতেই হরিপূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলন-দ্বারা সর্ব্বতত্ত্ব অবগত হইয়া হরিভক্তজনের পূজা করেন না, কিম্বা অন্যকাহারও সহিত সখ্যতা করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রারম্ভ বা কনিষ্ঠ ভক্ত কহে। ইঁহাতে ভক্তিবীজ রোপন হইয়াছে মাত্র, ইনিও যথাকালে মধ্যম ও উত্তম ভক্ত হইবেন।

একদা শ্রীনীলাচলে কুলীনগ্রামবাসী বসু রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজখান শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গৃহস্থের সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন ও নিরন্তর নামকীর্ত্তন এই তিনটিই গৃহস্থের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীসত্য-রাজখান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥

তাহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলেই আমাদের সকল মঙ্গল সাধন হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম,
সেই ত বৈষ্ণব করিহ তাহার সম্মান॥

একবৎসর পরে কুলীনগ্রামবাসীগণ পুনরায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর চরণপ্রান্তে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বৈষ্ণবলক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এইবার তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥

তৃতীয় বৎসরেও ঐ কুলীনগ্রামবাসীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তৃতীয়বার বৈষ্ণবলক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই তিনবারে তিনপ্রকার উত্তর দিয়া বৈষ্ণবের তারতম্য অর্থাৎ বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতম এই তিনটি ক্রম বা শ্রেণীর লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া-ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতদ্দ্বারা ইহাও শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তমান সাধকের পক্ষে প্রথমশ্রেণীর বৈষ্ণব-সঙ্গই সুলভ ও যথেষ্ট, এবং সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিলেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবসঙ্গলাভের সৌভাগ্য যথাসময়ে সাধকের হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিলেই দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম আপনিই উদয় হয়, তিনি সামান্য বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মহাভাগবত বলিয়া জানিত

হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকারের উত্তরে ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐ তিন প্রকারের বৈষ্ণবেরই সকলেরই সেবা করা কর্ত্তব্য; এই তিন জনই জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

অর্থাৎ যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবে তাঁহাকে স্ব-সম্প-র্কীয়বোধে মনে মনে আদর করিবে। দীক্ষিত কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন তাঁহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবে, আর অন্যনিন্দাদিশূন্য ঐকান্তিক ভজনবিজ্ঞ মহা-ভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা দ্বারা আদর করিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী কেবল বৈষ্ণববেশই বৈষ্ণবের যথেষ্ট পরিচয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী নলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অর্থাৎ যাহার কণ্ঠে তুলসী বা নলিনাক্ষমালা দেখিবে, যাঁহার বাহুমূলে শঙ্খচক্র চিহ্ন দেখিবে, এবং যাঁহার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক দেখিবে, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে, তিনিই ত্রিভুবন আশু পবিত্র করিয়া থাকেন। গোস্বামি-চরণ বৈষ্ণববেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।

করুণাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সাধুভক্তের পরিচয় দিয়া আমাদিগের মত কলিহত জীবের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। উত্তমভক্ত প্রাকৃতদৃষ্টিবান্ আমাদিগের পক্ষে দুর্দ্দর্শ। মধ্যম ভক্ত কদাচিৎ কাহারও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গলাভেই বহির্মুখ বদ্ধজীব কৃতার্থ হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ-ভক্তের সঙ্গলাভও আমাদের পক্ষে আপাততঃ বাঞ্ছনীয়। যেকুলে বা দেশে একজন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল ও যশ ধন্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতি চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥

অর্থাৎ যে কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করে, সে কুল পবিত্র, সে জননী কৃতার্থা, এবং সেই বসতি ও পৃথিবী ধন্যা। বৈষ্ণবের পিতৃগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তও ভগবদ্দ্রোহী দৈত্যপিতা হিরণ্যকশিপুর পাপ-নির্ম্মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছিলেন—

ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥
ভাগ ৭।১০।১৮

হে নিষ্পাপ! তোমার ন্যায় কুলপাবন পুত্র যাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে পিতা কেবল নিজে কেন, তাঁহার একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, এই অপার মহিমার্ণব সাধুভক্তের মহিমাকীর্ত্তন করিবার প্রয়াস আমাদের পক্ষে পঙ্গুব্যক্তির গিরিলঙ্ঘন প্রয়াসের মত কিম্বা উদ্বাহু বামনের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের মত কেবল ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র, কারণ আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান বা ভজন সাধন কিছুই নাই, সুতরাং ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। যাঁহাদের ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাঁহারাও বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হঙ্ শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণববন্দনা॥
শ্রীল দেবকীনন্দন দাস।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন—

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ
শুন ভাই! হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণ॥

বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব অধরামৃত, তাতে রহু মোর চিত,
ভরসা মোর বৈষ্ণব শরণে।
বিষ্ণুভক্ত দয়াময়, বড় মনে পাঞা ভয়,
তনু মন সঁপিল চরণে॥

এই অপার মহিমাসিন্ধু বৈষ্ণব-ঠাকুরের মহিমাকণার দিগ্-দর্শন মাত্র করিবার উদ্দেশ্যেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা হয়ত বৈষ্ণবপদে অপরাধী হইলাম, কিন্তু আমাদের ভরসা এই যে—বৈষ্ণব অদোষদর্শী ও ক্ষমাগুণশালী, এবং সুধী ও সজ্জন পাঠকবৃন্দ নিজগুণে আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের চরণে নিরন্তর দণ্ডবৎপ্রণতি ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

(সমাপ্ত)

ঝুলনে।

(শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী)

নীপতরুশাখে দুলিতেছে ফুল-দোলারে।
ময়ুর ময়ুরী ফুল্ল হরষে
অজানা কাহার মধুর-পরশে
তরুমূলে আজি নাচিছে আপন ভোলারে॥

কি শোভা কুঞ্জে কি দিব তাহার উপমা।
পিয়া পিয়া রবে ডাকিছে পাপিয়া
মৃদু বায়ে লতা উঠিছে কাঁপিয়া
বৃন্দাবিপিনে এ কি হেরি আজি সুষমা॥

অপরূপ সাজে সাজিয়াছে আজি রজনী।
পূর্ণিমা-শশধর নববেশে
হাসিছে শুভ্র সুনীল আকাশে
থাকি থাকি জাগি উঠিছে কোকিল-কুজনী।

ঝিঁঝির বীনাটী শুনিয়া হরষে শিহরে।
মধুমাখা আহা যুথিকা কামিনী
ঝুলনেতে মাতি কাটায় যামিনী
হাসি-রেখাটুকু মুখে মৃদু মৃদু বিহরে॥

যমুনা মাধবে দেখিতে ফুল্ল আননে।
নাহি লাজ ভয় আসিয়াছে আজি
নীপতরুমূলে উজ্জ্বল সাজি
কুল ত্যাগ করি আকুল-পিয়াসে কাননে॥

ভ্রমর ভ্রমরী ছুটিছে কুসুমে শিহরি।
বকুল শেফালি মুগ্ধ নয়নে
চেয়ে আছে আহা নীপশাখা পানে
ঝুলিছে ঝুলনে শ্যামসনে যেথা কিশোরী॥

সহচরিগণে ফুলদোলা ধরি দেয় দোল।
শ্রীরাধামাধব উঠে চমকিয়া
শ্রীরাধারাণীরে শ্যাম কোলে দিয়া
হাততালি দিয়া বলে সবে বোল হরিবোল॥

নবনটবর সচকিতা দেখি প্রিয়ারে
দুটী বাহু গলে জড়াইয়া ধরি
কাছে মুখ আনি চাহে ফিরি ফিরি
চুম্বনরাশি পিয়ার গণ্ডে অঙ্কিত করি দিয়া রে॥

কাতরতা

[শ্রীকালিকিঙ্কর ঘোষ

ফুটেছিনু হ'য়ে ফুল,—
বৃন্দাবনত বন্ধ ছিল না, আমারই ছিল ভুল ;
প্রণয়-বাসরে পূতি-গন্ধের বসেছিল যেথা হাট,
সেথা ছিনু প'ড়ে তোমারে ভুলিয়া ; হায় ! হায় রে ললাট !
তোলেনি ক' কেউ কৃষ্ণপূজার তরে মোরে ভরি' সাজি !
কাতরতা তাই লইয়া এসেছি, ঠাঁই দাও মোরে আজি ।
প্রাকৃতের খেলা খেলিবনা আর, লও হে খেলাতে তব ;
নিত্যধামের মুক্ত বাতাসে দেহ' প্রাণ অভিনব ।
তব দিবারাতে জাগাও আমারে, ঘুচাও এ দিন রাত্রি,
আমি নিত্য-ধামের যাত্রী !

বহেছিনু হয়ে বায়,—
নিজ প্রসংশা শুনিবার তরে ঢলিয়া কামিনী-গায় ;
অঞ্চলে কভু লয়েছি শরণ, ব্যজনে খেলেছি ঢেউ ;
রাধাকান্তের লীলার কথাটি স্মরণে আনেনি কেউ ।
বিলাসিনীদের ভৃত্যের মত গোলাপগন্ধ ল'য়ে,
যোগাইনু মন প্রমোদ-কাননে মৃদুল মধুর ব'য়ে ।
চতুর্দ্দিকের মুক্ত বাতাসে ঝড়ে ল'য়ে গেল ধরি' ;
বাতাস-জন্ম শুধু গেল মোর জনমে মরণে বরি' !
যাই নাই ব্রজে যেথা অলিটিও তব মধুনামে গুঞ্জে ;
মোরে স্থান দাও তব কুঞ্জে ।

এসেছিনু হ'য়ে মাটি'—
তব নাম যেথা অজ্ঞাত ছিল, না ছিল কেহই খাঁটি ;
নিকটে কোথাও বহিত না তার পূত ত্রিধারার ধারা ;
আপন গরবে গাথিয়া ছিলাম অনিত্যতার কারা ;
'মিথ্যা'র সেথা রাজ-সম্মান, 'সত্য' খোঁজেনা কেহ ;
কি গতি আমার হ'বে ভগবান ! তুমি আজি ব'লে দেহ ।
তব মন্দির-মার্জ্জনে কেহ লাগা'লনা মোরে কভু,
করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা মাগি হে, কৃপা কর, মোরে প্রভু !
পাইনি ক্ষমতা করিতে তোমার ভক্ত-পাদুকা-স্পর্শ ;
যাচি, চির-আনন্দ—বর্ষ ।

দুলেছিনু হ'য়ে পাতা,—
নাচি নাই কভু দূর হ'তে শুনি তোমার প্রেমের গাথা ।
পঙ্গু যে নামে নর্ত্তন করে, মূকমুখে ফুটে ভাষা
সে মধুর নাম করি নাই কানে ; তবু মোর এত আশা !
চির-আপনার জনে করি'পর কতই পেয়েছি কষ্ট ;
কোটি অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি চির পথভ্রষ্ট ।
আবর্জ্জনায় কাড়াইনু, যবে শুখায়ে গেলাম ঝরি',
তব ভোগশালে অঙ্গাররূপে পাই নাই শোভা, হরি !
'বড়' হ'তে গেছি, হই নাই 'ছোট', হেলি' দুলি' করি' রঙ্গ
মাগি, ভক্তজনের সঙ্গ

প'ড়েছিনু হ'য়ে জল,—
'ব্রজ' নামটিও ভুলে রয়েছিনু, ফলে নাই কোন ফল ;
হয়নি ভাগ্য ছুটিতে আমার যমুনা-গর্ভে চলে ;
কিম্বা বীচিতে আছাড়ি' পড়িতে রাধাকুণ্ডের কূলে !
প্রেমহীন-জনে কত আয়োজনে করায়েছি বৃথা স্নান
নর্দ্দমা বাহি' বহিয়া গিয়াছি গাহি নাই তব গান ।
খেদে ক্ষোভে আজ ল'য়েছি শরণ কেহত আমার নাই,
তুমি যদি টানি' নাহি ল'বে কাছে, কেবা তবে দিবে ঠাঁই;
তোমার পূজায় কখনও হায় ! হই নাই বিনিযুক্ত !
মোরে কর আজি মোহমুক্ত ।

কাটিয়াছে কত কাল,—
বহির্ম্মুখের যাতনা হ'য়েছে;—ভুলিওনা হে দয়াল !
পৃথিবীর কালো কর্দ্দমে ভরা অঙ্গ ; দুআঁখি বহে ;
তোমার ধুলায় ধূসরিত নহি, প্রেমাশ্রু-ধার নহে ।
কাঁদিবার মত পারিনি কাঁদিতে, কাঁদাও আমারে আজি;
সব মলিনতা ধুয়ে যাক্ মোর, ভরিয়া তুলিতে সাজি ।
ভক্তগণের চরণ-ধূলায় গড়াগড়ি দেব' লুটি' ;
এতদিন শুধু ঝুটার জন্য করিয়াছি ছুটাছুটি !
তোমা' ছাড়া হ'য়ে ঘুরিয়া ম'রেছি, বড়ই হ'য়েছি শ্রান্ত
আজ তোমা'-মুখী কর কান্ত !

ব্যাধ সর্দ্দার।

(শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ)

সন্ধ্যাকালে কতকগুলি মৃতপশু কাঁধে লইয়া রক্তমাখা-দেহ ব্যাধসর্দ্দার নিজের ঘরের দরজার নিকট আসিয়া ডাকিল—"সর্দ্দারণী" !!

তখনও সন্ধ্যারাণী তার কালরঙের ওড়নাখানি গায়ে দিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া একেবারে জগতের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। তখন সেই মাত্র বৃক্ষ-কোটরে পেচকগুলি মনের আনন্দে আস্ফালন করিয়া আক্রোশে সূর্য্যের দিকে মুখ বিকৃত করিয়া তাকাইতেছিল, এবং কুমুদিনীসকল পদ্মিনী-নায়িকার ম্লান মুখখানি দেখিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে আপনাদের মুখের আবরণ ধীরে ধীরে অপসারণ করিতেছিল। এই সকল দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া সূর্য্যদেব রাগে মুখখানি রক্তবর্ণ করিয়া তখনও অস্তাচলের উচ্চচূড়ায় অপেক্ষা করিতেছিল। এবং সেই-সঙ্গে সারাটা জগৎকেও নিজের কোপের রঙ মাখাইয়া দিতেছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যাধসর্দ্দারের দেহখানাও মৃত-পশুর রক্তে এবং সেই রঙ্গে লাল দেখাইতেছিল।

স্বামীর আহ্বান শুনিয়াই ব্যাধরমণী সর্দ্দারণী তাদের জীর্ণ শীর্ণ পর্ণকুটীরের দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল,—"কি সর্দ্দার! বেশী পরিশ্রম হ'য়েছে? আজ যে অনেক হরিণ মেরেছ দেখ্‌ছি!" এই বলিয়া সর্দ্দারের আর কোনও প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই একঘটী জল ও একখানা ভাঙ্গা পাখা হাতে বাহিরে আসিয়া, ঘটীটী স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

রাত্রে ভোজন সমাপন করিয়া ছেঁড়া একখানা চেটাইএর উপর স্বামী শয়ন করিলে, সর্দ্দারগৃহিণী তাহার পার্শ্বে বসিয়া আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"বড় পরিশ্রম হ'য়েছে, সর্দ্দার?

ব্যাধসর্দ্দার পত্নীর কথায় একটু হাসিয়া বলিল "এতে আর পরিশ্রম কি? তবে আজ অনেকগুলি হরিণ মেরেছি কিনা?"

"আচ্ছা, সর্দ্দার! এত হরিণ আমাদের কি হবে?"

"কেন? কাল সকালে বাজারে বিক্রী ক'রবো, পয়সা হবে। আমি বাজারে মাংস না নিয়ে গেলে কি আর রক্ষা আছে? বাবুরা সব পাঠায়ে দেয় তাদের চক্ষুকে পথের দিকে—আমার অনুসন্ধানে। আমিই যে তাদের প্রতিদিনের খোরাক যোগাই।"

"সর্দ্দার! তোমাকে আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! আচ্ছা, তুমি যে এত পশু মার, এতে তোমার প্রাণে কি একটুকুও মায়া দয়া হয় না, আমার কিন্তু এসব দেখে, বু-টা... ..।"

জড়ান-স্বরে এই কথা কয়টা বলিয়াই পত্নীকে চুপ করিতে দেখিয়া ব্যাধসর্দ্দার তার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তার বড় বড় চক্ষুদুটীতে ফোঁটা ফোঁটা জল জমিয়াছে। যেন বর্ষার জলে ভিজা নীলপদ্মের দুইটী পাপড়ীর প্রান্তভাগে জলবিন্দু বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সর্দ্দার হাসিতে হাসিতে বলিল "আরে, পাগ্‌লি! তুই কাঁদছিস? পশু মারি দেখে তোর কষ্ট হয় বুঝি? এতে আমার কিন্তু খুব আনন্দ? আর এই ত আমাদের জীবিকা। আমার বাপ ঠাকুরদাও এই কাজ ক'রে গেছে। এতে আবার মায়া দয়া কি? আমরা যে জাতিতে ব্যাধ!"

"হতে পারে এ আমাদের খেয়ে বাঁচবার উপায়, তবু ত অন্য উপায়ও আছে। ভেবে দেখ আমাদের যেমন প্রাণ আছে, তাদেরও তেমনি প্রাণ আছে। একটা আঙ্গুল কেটে গেলে আমরা যেমন খুব কষ্ট পাই ওদেরও তেমনি হয়। তুমি যখন তাদিকে মার, তখন তারা কত না কষ্ট পায়। কেউ বা মাতৃহীন হয়, কেউ বা স্বামীকে হারায়, কারও বুকের ছেলেকে জোর ক'রে হত্যে কর। তুমি যেন সাক্ষাৎ যম। ওঃ! তোমার প্রাণটা কি......"

"কঠোর" এই শেষ কথাটী আর সর্দ্দারণীকে বলিতে হইল না। তাহার কথায় বাধা দিয়া সর্দ্দার হটাৎ বলিয়া উঠিল, "আরে? রেখে দে পাগ্‌লি! তোদের ওসব

ধর্ম্মকথা। আমার ও সব ভাল লাগে না। তোরা মেয়েলোক কিনা, তাই তোদের ওরকম। এখন ঘুমো।" এই বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল এবং শীঘ্রই নিদ্রাদেবীর সব ভুলিয়ে দেওয়া কোলে আশ্রয় লইল।

সর্দ্দারণীর কিন্তু সেদিন সহসা ঘুম আসে না। জগতের জমাটবাঁধা দুঃখ যেন আজ তার বুকটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মরা পশুদের অব্যক্ত করুণ রোদন যেন আজ তার হৃদয়ের অন্তরতমস্থল হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সে হাত দুটী একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইল, এবং চুপে চুপে বলিল, "হা ভগবান্! আমাদের গতি কি হবে? এই কথা বলিতে বলিতে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত তার গণ্ড বহিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

(২)

"বেলাত হ'য়েছে অনেক, এখনও কেন সর্দ্দার আজ বাজার হ'তে ফিরছে না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সর্দ্দারগৃহিণী সংসারের কাজ সারিয়া রান্নার সাজ করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বরাত্রের কথাগুলি বুকের মধ্যে ব্যথা জাগাইতেছে। সেই ব্যথায় সে কখনও কখনও কেমন আনমনা হইয়া যায়। এমন সময় রান্নাচালার দরজায় ঝোলান ছেঁড়া চটের পর্দ্দার কাছে ব্যাধসর্দ্দার কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সর্দ্দারণী ততক্ষণ লক্ষ্য করে নাই

পত্নীর মুখে চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া সর্দ্দার বলিয়া উঠিল,—"আরে, পাগ্লি! ভাবছিস্ কি?"

"ভাব্‌বো আর কি? তোমারই কথা। তোমার এত দেরী হচ্ছে কেন, তাই।"

এতটুকু প্রীতিমাখা কথা শুনিয়া সর্দ্দার উৎফুল্লচিত্তে বলিয়া উঠিল—"আমাদের কি সময় আছে? বাজার গিয়ে হাজার লোকের মন যোগাতে হয়। সবটুকু মাংস অংশ অংশ ক'রে সবাইকে বেচ্‌তে হয়। দেরী হয় এতেই। আচ্ছা এখন খেতে দে, আবার জঙ্গলে যেতে হবে।"

"আচ্ছা, সর্দ্দার! কাজ নাই আজ আর জঙ্গলে যাওয়ায়।"

"তবে কাল কি খাবি?"

"ঘরে যা আছে তাই খাবো, কিছু না থাক্‌লে ভিক্ষে কর্‌বো। তবু আমি অকারণ ঐ পশুগুলিকে মারা দেখ্‌তে পারি না। আমার বড় কষ্ট হয়।"

পত্নীর বক্ষের পঞ্জরভেদী বাণী শুনিয়া পাষাণহৃদয় লুব্ধক অণুমাত্র ক্ষুব্ধ হইল না, বরং আরও উপহাসের সুরে বলিতে লাগিল,—"আরে, তুই দেখ্‌ছি মস্ত বড় সাধু হ'য়ে গেলি। আমি কিন্তু এসবের ধার ধারিনে। দে দুটী খেতে, বনে চলে যাই।"

বনে যাওয়ার আগেই ব্যাধসর্দ্দার তার তীরগুলি ভাল করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া দেখিয়া লইল। ধনুতে গুণ লাগাইতে গিয়াই যখন ধনুটী হঠাৎ চট্‌ৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সে একটু বিমর্ষ হইয়া বলিতে লাগিল,—"কি রে! সর্দ্দারণীর মত তোরও আজ ভাগ্যে বৈরাগ্য এলো না কি? না হলে আমার হাতের ধনুক, তাও কিনা ভাঙ্গা? আচ্ছা যা তুই, আরও অনেক আছে।"

বেলা দ্বিপ্রহর—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড সন্তাপে সারাটা বিশ্ব নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। যেন দেবী প্রকৃতি রৌদ্রের রুদ্রতাপে ক্লান্তা হইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট যোগীর ন্যায় ধ্যানে বসিয়াছে। সূর্য্যের ভয়ে ভীতা ছায়া মানুষ বৃক্ষ প্রভৃতি সকলের পদতলে আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামের বাহিরে একটী গহন কানন। তন্মধ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুলি শাখা প্রশাখা দ্বারা সমগ্র বনটীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিহঙ্গকুলের মধুর সঙ্গীতে জঙ্গল পূরিত হইয়া মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। নানা রঙ্গে চিত্রিত কুরঙ্গসকল বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল।

এমন সময়ে অকস্মাৎ সেই বনের বুকের শান্তি ভাঙ্গিয়া রুক্ষমূর্ত্তি তীক্ষ্ণবাণ হাতে ব্যাধসর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং ক্ষিপ্র হাতে চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে একটা মৃগের বক্ষ বাণ-বিদীর্ণ করিল। তাহাকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। পরে যখন অন্য একটীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, তখন প্রাণভয়ে ভীত অন্যান্য বন্য পশুগুলি ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। ব্যাধ সর্দ্দার একটী শূকরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল—"আরে বেটা!

পালাবি কোথা? এ আমি সাক্ষাৎ যম, আমার হাত থেকে নিস্তার নেই—এই এখনই তোকে যমের বাড়ী —"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সে বাণ ছাড়িয়া দিল। বিদ্ধ বরাহটী কিছু দূরে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সে মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল—"বাঃ কি মজা! কেমন লাফাচ্ছে!"

এই বলিয়া অলক্তকবর্ণ সেই রক্ত নিজের কপালে দুই বাহুতে ও বক্ষে লেপন করিতে লাগিল। তখন সেই জল্লাদের আহ্লাদ দেখে কে? এই ভাবে কিছু সময় পর্য্যন্ত আরও কয়েকটী জীবকে নির্জীব করিয়া, যখন সে অন্য একটী নিরীহ বরাহকে বিদ্ধ করিবার জন্য লক্ষ্য স্থির করিতেছিল, তখন সে দেখিল—হঠাৎ পশুগুলি কেন যেন ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। প্রথমতঃ সে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। কিছু পরেই দেখিল অদূরেই বীণাধারী অরণ্যচারী এক ঋষি ধীরে ধীরে তাহারই দিকে আসিতেছেন। এবং মৃদু মৃদু স্বরে বলিতেছেন —'অহো! এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য আর দেখতে পারছিনা'। এ কথা ভাবিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। তুচ্ছ ভোগলালসার তৃপ্তির জন্য বন্য-জীবগুলিকে নিধন করিয়া কোন পাপিষ্ঠ এই মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে? কে আজ নারদের হৃদয়ে বজ্রাঘাত সম শেল বিদ্ধ ক'রে দিল! হা ভগবান্! হা প্রভো! রক্ষা করো। আর যে সহ্য হয় না।"

করুণ-কণ্ঠে জলভরা চোখে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে ব্যাকুল-হৃদয় দেবর্ষি নারদ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাধসর্দ্দার প্রথমতঃ থতমত খাইয়া একটা প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ডের পশ্চাতে গিয়া লুকাইল। পরে আরও নিকটে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হওয়তঃ ঋষিকে উৎপাতস্বরূপ মনে করিয়া গালি দিতে উদ্যত হইলেও দেবর্ষির প্রভাবে তার মুখে সে ভাষার স্ফূর্ত্তি হইল না। দেবর্ষি দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ যমদণ্ডধর মহাভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ রক্ত-নেত্র ধনুর্ব্বাণহস্তে এক ব্যাধ দণ্ডায়মান।

ব্যাধ কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিল, 'কি, সাধু!—এদিকে কোথা?"

দেবর্ষি স্থিরভাবে উত্তর করিলেন—"বাবা! প্রয়াগে ত্রিবেণী স্নান ক'রবো মনে করে সত্বর যাওয়ার জন্য এই বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে দেখ্লাম কতকগুলি হরিণ শূকর ও শশক পরে আছে, সে গুলি কি তোমার?"

'হাঁ আমার।"

ব্যাধসর্দ্দারের উত্তর শুনিয়া দেবর্ষি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা, বাবা যদি তুমি জীবহত্যাই কর, তবে তাদিকে একেবারে না মেরে, আধমরা করে রাখো কেন?"

"ঠাকুর! তা তুমি কি বুঝ্বে? জান ত আমরা ব্যাধ, আমার বাপ পিতামহেরাও এই কাজই ক'রে গেছে। দেখ, 'আধমর' জীবগুলো যখন যাতনায় ধড়্ফড়্ করে, তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হয়, তা আর কি ব'লবে!"

"বাবা! আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাই।"

দেবর্ষির কথা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, "ঠাকুর সাধুমানুষ, বোধ হয় বসবার জন্যে বাঘের কি হরিণের একটা চামড়া চাইবে তা ভালই, একটা চামড়া দিয়ে ওকে ভুলিয়ে ভূত পেত্নী তাড়ানোর কিছু মন্তর তন্তর শিখে নেব। সময় অসময়ে কাজ লাগ্বে।" এই ভাবিয়াই সে বলিল,—"কি ঠাকুর! তুমি একটা হরিণ চাও নাকি? না হরিণের ছাল চাও? তা বাঘের ছালই হোক, আর হরিণের ছালই হোক, তুমি যা চাবে তাই দেবো। এসো আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে, সেখানে এসব অনেক ঝুলানো আছে।"

"না বাবা! ও সবে আমার প্রয়োজন নেই। আমি অন্য জিনিষ চাই। কাল হ'তে তুমি যে পশু মার্বে, তাদিকে একেবারেই মেরে ফেল্বে, আধমরা ক'রে রাখ্তে পারবে না। কেবল এইমাত্র আমার ভিক্ষা। তা কি তুমি আমাকে দিবে না, বাবা?"

ছলছলনয়ন-নারদের ভাব দেখিয়া ও এই সমস্ত কথা শুনিয়া ব্যাধসর্দ্দার অবাক্ হইয়া গেল। এ ভাবের কথা সে জীবনে কোন দিন শুনে নাই। তাই সে বলিল—"এ আবার কি চাইলে সাধু! আধমরা ক'রে মারা ও একেবারে মারার আবার তফাৎ কি?" ভাবিল সাধু বুঝি পাগল।

দেবর্ষি বলিলেন,—"দেখ বৎস! জীবকে আধমরা ক'রে রাখ্‌লে সে বড় কষ্ট পায় এবং যাতনায় ছট্‌ফট্ করে। তুমি যে তাদিকে এই ভাবে যাতনা দিচ্ছ তোমারও শেষে এই যাতনা পেতে হবে। দেখ, ব্যাধ! তুমি যে জীবসকলকে হত্যা কর, এ তোমার অল্প পাপ, কিন্তু তাদিকে যে কষ্ট দিয়ে মার, এতে অপার পাপ। তুমি যেমন ওদিকে কষ্ট দিয়ে মার্‌ছ, ওরাও তোমাকে জন্মে জন্মে এই ভাবে কষ্ট দিয়ে নিশ্চয়ই মারবে। এই শাস্তি হ'তে নিস্তার নেই তোমার—ঠিক জেনো।"

দেবর্ষির সঙ্গপ্রভাবে দুর্দ্ধারহৃদয় ব্যাধসর্দ্দারের চিত্ত কিছু দ্রবীভূত হইল। সাধুর বাক্য শুনিয়া তার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। বহুদিনের সংস্কারগত অজ্ঞান-আঁধার জ্ঞানালোকের আভায় যেন কিছু উদ্ভাসিত হইল। সে ভাবিল, "সত্যই আমি একি করিতেছি? আমার গতি কি হবে? ছেলেবেলা হ'তে কেবল এই দুষ্কর্ম্মই ত ক'রে আস্‌ছি।" তখন ভবিষ্যতের শাস্তির ভয়ে বিহ্বল হইয়া সে বলিল,—"ঠাকুর! ঠাকুর! অধম আমি, পরম পামর আমি। আমার উপায় কি হবে? কিসে আমি উদ্ধার পাবো? তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর! আমাকে রক্ষা করো, আমার নিস্তার করো। হায় হায়! কিসে আমার পাপ যাবে। আমার পাপের যে শেষ নেই।" এই বলিয়াই ব্যাধসর্দ্দার দেবর্ষির চরণে লুটাইয়া পড়িল, এবং নয়ননীরে চরণ সিক্ত করিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া করুণানিদান শ্রীনারদেরও হৃদয় গলিয়া গেল। ভাবিলেন আজ অন্তকেরও দুঃখের অন্ত হইল। তখন তিনি ধীরভাবে সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস! স্থির হও। যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে নিশ্চয়ই নিস্তার পাবে।"

"ঠাকুর! দেবতা! তুমি যা ব'লবে, আমি তাই কর্‌বো।"

আচ্ছা, তবে প্রথমে তোমার ঐ ধনুকটী ভেঙ্গে ফেল।"

"ধনুক ভাঙ্গলে কি ক'রে বাঁচ্‌বো ঠাকুর?

"কোন চিন্তা নাই, আমিই তোমার প্রতিদিনের অন্ন যোগাবো।"

দেবতার আশীর্ব্বাদের মত দেবর্ষির বাক্য শুনিয়া ব্যাধসর্দ্দার ধনুকটী ভাঙ্গিয়া সাধুর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দেবর্ষি তাহাকে উঠাইয়া গুরুগম্ভীরস্বরে স্নেহের সহিত বলিলেন,—"দেখ, বৎস! ঘরে গিয়া তোমার যা কিছু টাকা পয়সা আছে, সব ব্রাহ্মণকে দান করো। আর তোমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে এক এক খানি মাত্র কাপড় পোড়ে ঘর হ'তে বের হ'য়ে পড়ো। নদীর তটে একখানা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ক'রে, তার সামনে একটী তুলসী রোপন ক'র্‌বে। প্রতিদিন তুলসী-পরিক্রমা ও তুলসীসেবা ক'রবে। এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ক'রবে। তাতেই তুমি নিস্তার পাবে। দেখ বৎস! খাওয়ার জন্যে কোনও চিন্তা ক'র্‌তে হবে না তোমাকে। আমি তোমাকে প্রতিদিন যথেষ্ঠ অন্ন পাঠাবো, কিন্তু মাত্র তোমাদের দুজনের পরিমাণে অন্ন গ্রহণ ক'রবে।" এই কথা বলিয়াই দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্যাধ-সর্দ্দারের উদ্ধত মস্তক ভক্তিভরে অবনত হলো দেবর্ষির শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে।

অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসাইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে ভাব-বিভোর ব্যাধসর্দ্দার যখন তাহার পর্ণশালার দ্বারে আসিয়া পৌছিল, তখন সর্দ্দারণী তারই অপেক্ষায় পথের দিকে তাকাইয়াছিল। স্বামীর অবস্থার বিপর্য্যয় দেখিয়া ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল,—"সর্দ্দার! আজ শুধু হাতে কেন? আর তোমাকেই বা অমন দেখাচ্ছে কেন? কেমন আছ—কোন অসুখ হয়নি ত?

"না, সর্দ্দারণী! কোন অসুখ নয়। আমার মত হতভাগার উপর আজ ভগবানের দয়া হ'য়েছে। ভগবান্ আজ আমাকে দেখা দিয়েছেন। চ'লে আয়, শীঘ্র চ'লে আয়। আজ আমাদের শুভদিন। বিলম্ব ক'রলে বুঝি আবার হারাবো।" এই বলিতে বলিতে সেই ব্যাধ পাগলের মত হইয়া উঠিল।"

সর্দ্দারণী জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো! সে কি রকম ভগবান্, আমাকে একবার দেখালে না কেন?"

"আরে সে খুব অদ্ভুত কথা। আমি শিকার ক'রতে যেতে আছি, এমন সময়ে কোথা হ'তে এক সাধু এসে আমার বুকের পাঁজরা গুলোকে একেবারে ওলট পালট

করে দিল। ওঃ! কি আশ্চর্য্য শক্তি সেই সাধুর। আমার হাতে মরা পশুগুলিও তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌লো। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, তাঁর মুখের কথাতে, আমার মত পাপিষ্ঠের মরা প্রাণেও স্পন্দন এসেছে। হায়! হায়! প্রভু কি আমাকে রক্ষা করিবেন? না—আর অপেক্ষা ক'রতে পার্‌ছি না। শীঘ্র চলে আয়, যদি শান্তি পেতে চাস্‌!"

(৪)

"চলুন, মহর্ষে! আজ আপনাকে আমার এক নূতন ভক্ত দেখাবো।'

"সে কোন্‌ ভাগ্যবান্‌ দেবর্ষে! কার হৃদয়বীণার তন্ত্রী তোমার বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনুধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে?"

"মহর্ষে পর্ব্বত! প্রয়াগের পথে বনের মধ্যে হিংসারত এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যাধ আজ কৃষ্ণনামে পাগল হ'য়েছে। তার আহারবিহার ভোগলালসা সব চিরকালের তরে ঘুচে গেছে।"

"তার জীবিকানির্ব্বাহের কি ব্যবস্থা করেছেন আপনি!"

দেবর্ষি নারদ ব'ললেন,—"সে এক চমৎকার ঘটনা। সেই ব্যাধ প্রতিদিন বাজারে মাংস বেচত। যেদিন সে ভগবানের কৃপার উপলব্ধি লাভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণনামে পাগল হ'য়ে নদীতটে আশ্রয় নিল, তার পরদিন তাকে বাজারে অনুপস্থিত দেখে দেশের দশজনে মনে কর্‌লে, হয়ত সে রোগশয্যায় শয়ন ক'রেছে, অথবা কোন বন্য-জন্তুর উদরে চিরবিশ্রাম লাভ ক'রেছে। পরে কিন্তু ব্যাধসর্দ্দারের প্রতিবাসীদের মুখে তার সাধু হওয়ার কথা শুনে সকলে ভাবিল, বুঝিবা সে বনের মধ্যে কোন দেবতার দেখা পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে খুব বড় একটা কিছু হ'য়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে এই কথা প্রচার হওয়া মাত্রই দেশের লোকে তার কাছ হ'তে কিছু ওষুধ বা কবচ পাবার আশায়, তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য চাল ডাল তরকারী প্রভৃতি বহু উপঢৌকন-সম্ভার নিয়ে তার কাছে যেতে লাগ্‌লো। যদিও ব্যাধ-সর্দ্দার কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করে না, তথাপি নানাদেশের লোকে প্রতিদিনই তার কাছে এই ভাবে যাতায়াত ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। ঐ দেখুন মহর্ষে! ঐ দেখুন ভক্তের নদীতীরস্থ পবিত্র কুটীরখানি। ঐ দেখুন—কুটীরের সম্মুখে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উপবেশন ক'রে, কেমন পরমানন্দে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রছে। উঁহাদের দেহে পুলক, চক্ষে অশ্রুধারা নির্গত হ'চ্ছে। আহা হা! ভক্তকে দেখ্‌লেও প্রাণে আনন্দসিন্ধু উথ্‌লে উঠে।"

দেবর্ষির বাক্য শুনিয়া মহর্ষি পর্ব্বত অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"দেবর্ষে! আপনাকে দূর থেকে দেখেও ঐ ব্যাধ অগ্রসর হ'য়ে সম্বর্দ্ধনা করা দূরে থাক্‌, দণ্ডবৎ প্রণাম পর্য্যন্তও করিতেছে না কেন? মাটীর দিকে হেঁট হ'য়ে কি যেন ক'র্‌ছে।"

'সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সব বুঝ্‌তে পারবেন।" এইভাবে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ব্যাধ-দম্পতীর নিকটবর্ত্তী হইলে, মহর্ষি পর্ব্বত সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষুর উন্মীলনকারী তোমার শ্রীগুরুদেব সম্মুখে সমাগত, তথাপি অভ্যর্থনা ও যথোচিত সমাদর করিতেছ না কেন?"

ব্যাধসর্দ্দার অতি কোমল অক্ষরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"ঠাকুর! ছেলেবেলা হ'তে অনেক জীব হত্যা ক'রেছি। পাপের বোঝায় দেহটা খুব স্থূল ও ভারী হ'য়েছে। সম্মুখে পথে অনেক পিপীলিকা ও ক্ষুদ্র পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চল্‌তে গেলে পায়ের চাপে, কিম্বা দণ্ডবৎ প্রণাম কর্‌বার কালে দেহের চাপে, এতগুলি জীবের প্রাণ যাবে এই ভয়ে ভূমিতে ফুঁ দিয়া ও কাপড় নাড়া দিয়া ওদিকে তাড়াচ্ছি। এতেই বিলম্ব ক'রে আমি আমার প্রভুর চরণে অপরাধী হতেছি। আমার পাপের বোঝা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। হায় প্রভো! আমার গতি কোথায়? আমাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়াই স্বামী স্ত্রী উভয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। পরে ঋষিদ্বয়কে পর্ণকুটীরের আঙ্গিনায় আনিয়া পরম ভক্তির সহিত উভয়কে তৃণাসনে উপবেশ করাইল

ও ধীরে ধীরে তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিল। সেই জল উভয়ে পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিল। তখন তাদের দুজনার আনন্দের সীমা নাই। আজ ব্যাধদম্পতী শ্রীগুরুদেবের চরণ দর্শন করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে। তাহারা পাগলের মত দুই হাত উর্দ্ধে উঠাইয়া বস্ত্র উড়াইয়া নানারঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিল। তখন তাহাদের দেহে অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাবের বিকাশ হইতেছিল।

তখন উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীনারদ বলিলেন—"বৈষ্ণব! তোমার আহার নিয়মিত আসিতেছে ত?"

ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"দয়াময়! আপনি যাকে পাঠান, সেই আমাদের আহার দিয়ে যায়। কিন্তু প্রভো! এত অন্ন আর পাঠাবেন না। হয়ত তাহাতে লোভ জন্মাতে পারে। মাত্র আমাদের দুজনের যোগ্য ভক্ষ্য দিবেন—এই প্রার্থনা।"

ব্যাধসর্দ্দারের প্রেমোত্থ-দৈন্য দেখিয়া ও তাহার মধুর ভাষা শুনিয়া মহর্ষি পর্ব্বত বলিলেন,—"দেবর্ষে! নিশ্চয়ই তুমি স্পর্শমণি—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে! কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥"

নিদ্রাহারি

(শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রভা দেবী)

ভুবন যখন নিদ্রামগন তুমি কেবল নও
নিদ্রাহারিরে বক্ষে লইয়া পথমাঝে চলি যাও
নিদ্রা ঘোরেতে কংস তখন বলিছে রক্ষ রক্ষ
দুঃখহারিরে কক্ষে লইয়া জুড়ায় বসুর বক্ষ॥

কারার প্রাচীর বেষ্টন করি লৌহকপাট বন্ধ
ভববন্ধন মোচনকারি সে ঘুচায় সকল দ্বন্দ
কোলেতে পাইয়া হেরি শিশুমুখ জুড়ায় হৃদি ও বক্ষ
মৃত্যু-ভীষণ কংসের দূত আগুলি রয়েছে কক্ষ॥

ব্যাথায়' ব্যথিত করুণ নয়নে চাহি মুখপানে সতী
বুকে তুলে শিশু চলি যায় বসু অতীব শীঘ্রগতি।
যমুনা দুকুল উর্ম্মি ফেলিল বজ্র সঘন ডাকে
তাণ্ডব-লীলা জুড়িয়া প্রকৃতি না জানি ডাকিছে কাকে।

ফণি ফণ্ ফণ্ বারি ঝন্ ঝন্ সন্ সন্ বহে বায়ু
ডাকিছে কাতরে রক্ষা কর গো দিব গো আমার আয়ু।
নিমেষে সকল হইল স্তব্ধ শান্ত পবন ধাম
বিশ্বমোহন এলে ব্রজধামে সাধিতে আপন কাম॥

একখানি পত্র।

প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন।—

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রভুপাদ শ্রীমৎ-প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় তারকব্রহ্মনাম হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র অসংখ্যাত-কীর্ত্তনীয় কিনা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া, পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছি। যদিও এসম্বন্ধে আমরা অসংখ্যাত ভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি, এবং তাহাতে পরম আনন্দলাভ করিয়া থাকি, তথাপি ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত বা অনুমোদিত কিনা এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকায় এবং অন্যান্য স্থানে যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই অতি সংক্ষেপে প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আশা করি প্রভুপাদ নিজগুণে আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া আমাদের সংশয় অপনোদন করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লীলা হইতে যদি দেখাইতে পারা যায় যে—তিনি নিজে ঐ মহামন্ত্র অসংখ্যাত-ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন বা কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন তবে আর আমাদের সংশয়ের বিষয় কিছু থাকেনা। আমার মনে হয় এই যুক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠযুক্তি। আশা করি প্রভু-পাদ আমাদিগকে ইহা দেখাইয়া দিয়া নিঃসংশয় করিবেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দুইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে "কীর্ত্তন কি" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

(১) শিষ্যগণ বোলেন "কীর্ত্তন কেমন?"
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তাল দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥

মধ্য—৮ম অধ্যায়

(২) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

মধ্য—২৩ অধ্যায়।

এই দুই স্থানেই একই উক্তি পাওয়া যায়। এখানে মহামন্ত্রের কীর্ত্তনীয়তার উল্লেখ নাই।

কাজী-দলনের সময় নবদ্বীপময় মহাকীর্ত্তন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু করিয়াছিলেন। সেস্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—

"হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম" এই নাম এবং
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

এই উভয় নামই কীর্ত্তন হইয়া ছলেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনের কোন কথা পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীহরিবাসর কীর্ত্তনেও দেখিতে পাওয়া যায়—

পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি "গোপাল গোবিন্দ"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি খণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে তপন-মিশ্রের উপদেশ প্রসঙ্গে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে—

রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

"খাইতে শুইতে" নাম লইতে হইলে অসংখ্যাতই হইয়া পড়ে। তবে এই অংশ মূল শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে কিনা তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বাণীনাথ-উদ্ধার প্রসঙ্গে পাওয়া যায় যে—

বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে আঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হইলে অঙ্গে কাটে রেখা॥

অন্ত্য—৯ম।

এখানে এই প্রশ্ন যে বাণীনাথের এইরূপ অবস্থায় জপ-

পর্য্যায়ে না করিয়া কীর্ত্তন পর্য্যায়ক্রমে মহামন্ত্র গ্রহণের কোন বাধা ছিল কি?

তবে ঐ মহামন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠ বাণী, এবং বোধ হয় তদুপরি কোন কথা উত্থাপন করা যায় না।—

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া
কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া॥

এই আদেশের পর সংখ্যারাখারূপ বিধি ইহাতে আরোপ করা চলে না। আমাদের সংশয়ের মূল কারণ নিবেদন করিলাম। আশা করি প্রভুপাদের আলোচনায় আমাদের সকল সংশয় দুরীভুত হইয়া এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অনুরাগ হইবে। প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইয়া আমরা সন্দেহ জানাইলাম। সংশয় দুরীভুত হইবে এই আশায় যাহাতে আলোচনাটী একটু সুবিস্তৃত ভাবে হয়, এবং প্রধানতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলায় নিজের আচরণ হইতে বা তাঁহার দেওয়া উপদেশ হইতে মহামন্ত্রের অসংখ্যাত কীর্ত্তনীয়তার প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য।

কৃপাভিখারী
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যুগধর্ম্ম-শ্রীনাম

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী

(আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম জপেরই উপদেশ করিয়াছেন, গণনাপূর্ব্বক ভাবে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনবিধানে কীর্ত্তনের উপদেশ করেন নাই, বা শাস্ত্রেও বিধি নাই; অতএব অসংখ্যাত-ভাবে শ্রীমহামন্ত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনীয় নহেন।"

এরূপ আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলা যাইতেছে যে— শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অসংখ্যাত-ভাবে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন বিধানে মহামন্ত্র শ্রীনাম কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন কি, না এবং শাস্ত্রে বিধি আছে কি না, তাহা পরে বলিব। যাঁহারা বলেন—তাদৃশ ভাবে "হরেকৃষ্ণ নাম" উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ নাই বা শাস্ত্রে বিধি নাই, সর্ব্বাগ্রে অভ্যুপগম-ন্যায়ে তাহাদের কথা স্বীকার করিয়াই বলা যাইতেছে যে—"অসংখ্যাত-ভাবে কীর্ত্তন করা হইবে না" এরূপ নিষেধবাক্য কোথাও আছে কি? কোথাও নাই। সুতরাং অসংখ্যাত-ভাবে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম-কীর্ত্তন যখন কোথায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভু নিষেধ করেন নাই বা শাস্ত্রেও নিষেধ নাই তখন নিরর্থক সংশয় করিয়া মহা-মহানামসংকীর্ত্তনযজ্ঞরূপ যুগধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা নহে কি? ইহাতে কি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় না? যেহেতু শাস্ত্রকার-গণের একটী সিদ্ধান্ত স্থিরতর আছে এই—"একত্র বিনাতঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্র প্রতিষেধং বিনা পূর্ব্ববৎ প্রসজ্জেত আনন্দ চন্দ্রিকা। শাস্ত্রে একস্থানে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট থাকে, অন্যস্থানে তাহার বাধক প্রমাণ না পাওয়া গেলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধিই সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, অতএব "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের কোথাও নিষেধ না থাকায় "হরের্নামানি কীর্ত্তয়েৎ" "হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়শ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা" এবং "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ এই সকল শ্রুতি পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে মহামন্ত্র নামও সর্ব্বথা উচ্চসংকীর্ত্তনীয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই! এক্ষণে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নামের সংকীর্ত্তনবিধি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শ্রীমুখবিনিঃসৃত আদেশ ও শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মহাপ্রভু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নামের জপ্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব
যেই জপে তার উপজয়ে কৃষ্ণে ভাব ॥

এই পর্য্যন্ত তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র হরেকৃষ্ণ নামের জপের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে সেই নামেরই কীর্ত্তনের আদেশ করিয়াছেন যথা—

ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হইলাঙ্ কৃতার্থ ॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশে তার সর্ব্বজন ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবত-সার এই বলে বারে বারে ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

এই প্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন হেতুক নিজ অভীষ্ট দেবের প্রতি আকুল পিপাসায় বিগলিতহৃদয় হইয়া উচ্চৈস্বরে কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা উচ্চশব্দ করেন, আবার কখন গান করেন, কখন বা উন্মত্তের মত নৃত্য করিয়া থাকেন,—কিন্তু কোন আচরণেই নিজের প্রেমিকত্ব দেখাইবার কাপট্য থাকেনা। সেই অবস্থায় তিনি বাহ্যদৃষ্টি ও বাহ্যলোকাপেক্ষা শূন্য হয়েন।

এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি,
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি,
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাতোদক সম ।

এই প্রকরণটীর জপ্যমহামন্ত্র হরেকৃষ্ণ নাম-সম্বন্ধে প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি। যে শ্রীমহামন্ত্রের জপের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই শ্রীমহামন্ত্রেরই—"নাচগাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন" এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। এস্থানে 'সঙ্কীর্ত্তন' ক্রিয়াটী সংখ্যাপূর্ব্বক কীর্ত্তনপর ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে না। যেহেতু "ভক্তসঙ্গে" এই পদের উল্লেখ থাকাতে "বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানমুখং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুজন মিলিত হইয়া প্রথমতঃ গৌরসুন্দরের কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নাম সঙ্কীর্ত্তন এই কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীপাদজীবগোস্বামিচরণকৃত মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে ; কারণ বহুভক্তসঙ্গে সংখ্যা রাখিয়া সঙ্কীর্ত্তন কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এই উপদেশপূর্ণ প্রকরণে যে নামের জপ্যত্ব বিধান করিয়াছেন, সেই "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রেরই" যে কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা সুধীপাঠকবর্গমাত্রই প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ নাগরীয়াগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রের জপ্যত্ব ও কীর্ত্তনীয়ত্ব এই দুইটী বিধিরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য ২৩শ অধ্যায়ে—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে' ॥
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ রূপ "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের" জপ্যত্ব ও কীর্ত্তনয়ত্ব বিষয়ে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে।

শ্রীপাদ তপন মিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশেও শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিলীলার দ্বাদশাধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে—

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার।
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদ নাহি পারে দিতে ॥

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণে তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
খুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথ মহামন্ত্র—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
এই শ্লোকে নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশেও সাধ্যসাধনতত্ত্বের সাররূপে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রেরই সঙ্কীর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কোথাও ইহা কীর্ত্তন করেন নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে উপদেশ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু জপ ও কীর্ত্তন ভিন্ন সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদা অনুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য সঙ্কীর্ত্তনের বহু-অপেক্ষা আছে, কিন্তু জপের অন্য অপেক্ষা নাই—এমন কি স্বর-তালাদি বোধেরও অপেক্ষা নাই। সর্ব্বসাধারণ জীবমাত্রই জপ করিতে পারে এবং সর্ব্বসময়েই করিতে পারে। শয়ন-ভোজনাদি কালে জপকরা অসম্ভব হইলেও উচ্চৈঃস্বরে বলিবার সম্ভাবনা আছে—এই অভিপ্রায়ে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রের জপ করিবার উপদেশই অধিক পরিমাণে করিয়াছেন এবং আপনিও সেইরূপই আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনস্থানে এই "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" নাম কীর্ত্তনের নিষেধ করেন নাই। যদি কেহ বলেন—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আচরিত হয় নাই তাহা আমরা আচরণ করিব কেন? তাহার উত্তরে বলিতে পারি যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধানাম-সম্বলিত করিয়া কোথাও শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন নাই। তাই বলিয়া আমরাও কি "জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ" ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করিব না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যের অষ্টম পরিচ্ছেদে—শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু "রাধাকৃষ্ণ" নাম কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া আমরাও "রাধাকৃষ্ণ" নাম কীর্ত্তন করিব না। আর একটী বিশেষ জানিবার বিষয় এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাহাকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাঁহারই মুখে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপাদকেও উপদেশ করিয়াছেন—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন"। তাহা হইলে সর্ব্ব-সাধ্যসাধনসার "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে" এইরূপে গ্রন্থন কোন্ শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে? এবং সেইস্থানে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের জপের কিম্বা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিনা—ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার করা কর্ত্তব্য। মূল আকর গ্রন্থ না দেখিয়া বৃথা সংশয় পোষণ করা বিজ্ঞজনের পক্ষে সমুচিত হয় না। এই তারকব্রহ্ম নামের উল্লেখ কলিসন্তরণ উপনিষদে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেস্থানে গ্রন্থনের ক্রমটী বিপরীত-ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এইরূপে বর্ণন করিয়া পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে" এইরূপ গ্রন্থন করা আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উত্তর খণ্ডে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে যথাক্রমেই গ্রন্থন করা আছে বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের বচনটীকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সেস্থানে প্রমাণ যথা—

দ্বৈপায়ন উবাচ—

গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপোঽপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতোভবেৎ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল-কল্মষাপহম্।
নাতঃপরতরোপায়ঃ সর্ব্বদেহেষু বিদ্যতে॥
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমমতেষু চ।
মীমাংসা-বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্॥
তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়বিনাশনং।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্॥
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনাং তস্মাৎ সদা কার্য্যং বিপশ্চিতা॥

অর্থাৎ দ্বৈপায়ন বলিলেন—যে মন্ত্র গ্রহণে দেহাভিমানী জীব ভগবৎস্বরূপ হইতে পারে, এবং মহাপাপীও যাহার আশ্রয়মাত্রে পবিত্র হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হয়, আমি তোমার নিকটে সেই মন্ত্র বলিব, যেহেতু তুমি মহাভাগবত। সেই মন্ত্রটী বলিতেছি—"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে"॥ এই বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্রের ১০৮ বার জপ বা কীর্ত্তন করিলে ত্রিকালের পাপ বিনাশ হইয়া থাকে। সর্ব্বদেহে ইহা হইতে পাপ বিনাশের উপায় অধিক কিছু নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস, আগম, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গে উচ্চৈস্বরে ইহাই ঘোষণা করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ সেই নামকীর্ত্তন ত্রিতাপ বিনাশ করেন এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, ত্রিভুবনে নামকীর্ত্তন হইতে অধিক পবিত্র সাধন কিছুই নাই। সঙ্কীর্ত্তন হইতেই এ নাম তারকব্রহ্ম নামে অভিহিত। কারণ উচ্চৈস্বরে সংকীর্ত্তন করিলেই স্থাবরজঙ্গম মাত্রই শ্রীনাম-ধ্বনি শ্রবণে মায়াবন্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞজনের সর্ব্বদা এই পতিতপাবন নাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এস্থানে এই হরেকৃষ্ণ নাম তারকব্রহ্ম নামে অভিহিত কেন, তাহার হেতুটিও সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণে পর্য্যবসান করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণে "শ্রীহরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র" কীর্ত্তনীয় কি না—এ বিষয়ে সংশয় উঠিবার কোন অবসর থাকে কি? বিশেষতঃ শ্রীপদকল্পতরুতে মাথুর-বিরহবতী শ্রীরাধিকা প্রতিনামের নিজভাবানুরূপ আস্বাদনপূর্ব্বক এই নামই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্টই উল্লেখ আছে। অদ্যাপি শ্রীপাদগোপাল ভট্ট গোস্বামিচরণের তিরোভাব-তিথিতে তাঁহার সমাধিবাটীর প্রাঙ্গণে প্রায় চারিশত বৎসরাধিক কাল হইতে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নামের অহোরাত্র কীর্ত্তন হইয়া আসিতেছেন, মাননীয় নিত্যধামগত শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরুমুখ হইতে বড়দশকুশী তালে "হরে-কৃষ্ণ মহামন্ত্র" গান শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, নিজে গরব করিতেন এবং আমাদিগকে অতি আদরে শুনাইতেন এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। মাননীয় সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল-কারী পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদরলালগোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন"—বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে একটা সংশয়ের কথা আমরা কখনও শুনি নাই"। আমাদের অধ্যয়নাবস্থায় পূজনীয় প্রভুপাদ ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামি মহাশয় নিজ বাটীতে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই মহামন্ত্র নাম অষ্ট প্রহর কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন সংশয় করিবার হেতু কি, তাহা আমরা খুঁজিয়া কিছুই পাই না, বিশেষতঃ এই শ্রীহরেকৃষ্ণ নাম "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্যক্ আস্বাদিত বলিয়া শ্রীপাদরূপ-গোস্বামিচরণ শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে মঙ্গলাচরণরূপে ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকাতে অতি আবেশ ও আদর ভরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

এ স্থানে "মুখোদ্গীর্ণা" ও "মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি" কং দুইটী একটু ভাবিয়া দেখিলে যে উচ্চ কীর্ত্তনের কথাই ব[illegible] হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পূজ্যপাদ বলদে[illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও টীকায় ইহাই বিশদ করিয়াছেন।

অতি অল্পদিনের কথা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীনন্দী শ্বরে ছয় মাস ব্যাপী ও চতুর্ম্মাস্যব্যাপী নাম য[illegible] হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই" সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছেন ও অদ্যাপি হই[illegible] ছেন। তবে যাহারা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" কি "ভজ নিতাইগৌর রাধেশ্যাম জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম" ইত্যা[illegible] ভিন্ন ভিন্ন নাম অভিরুচি-ভেদে ও তানলয়ের অনুরো[illegible] কীর্ত্তন করেন তাহাতে আমাদের বিশেষ আদরবুদ্ধি আ[illegible] কখনও অনাদর করিবার কারণ দেখি না এবং শ্রীনামই কলিযুগের মুখ্য সাধ্য ও সাধন সেই নাম লইয়া ঝগড়া [illegible]

বা হৃদয়ে অনাদর বুদ্ধি পোষণ করা ভক্তিসাধকের পক্ষে বিশেষ অপরাধজনক! তবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বদা আস্বাদিত বলিয়া "হরেকৃষ্ণ" নামেই আমাদের বিশেষ আদর—এইজন্য "হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে" অহোরাত্রাদি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকি এবং করিবার উপদেশও করিয়া থাকি। আশা করি প্রিয়তম সুধীপাঠকবর্গের ইহাতে কোন সংশয় থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে প্রত্যুত্তর দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। প্রিয়তম স্নেহ-গৌরবাস্পদ মুন্সেফ বাবু শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংশয় নিরসন হইল কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

কবে?

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ]

বিন্দু বিন্দু করি মোর তপ্ত নয়নের জল।
দীর্ঘ বরষ ধৌত করেছে চরণ তল ॥
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে বক্ষ দেখায়েছে বারে বারে।
কার চিত্র আছে গাঁথা হৃদয়ের স্তরে স্তরে ॥
তিল তিল ক'রো চূর্ণ দেখায়েছে এই প্রাণ।
অণুতে অণুতে তাব কে আছে বিরাজমান ॥
বার বার ডুবি অন্ধকার নিরাশার জলে।
অন্তর এখনও আশা পূর্ণ 'তোমা পাব ব'লে' ॥
সন্ধ্যা ঘিরিল ধরা দিবা হ'ল অবসান।
হে নিঠুর! কাছে এসো জুড়াক্ তাপিত প্রাণ।

বৈষ্ণব সংবাদ

ভাগবত পাঠ—ভাগবত ব্যাখ্যাশ্রবণপিপাসু সুধী-বর্গকে আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যাতা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয় ২৯শে ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ দিন প্রত্যহ রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণপুর লক্ষণদাস লেনস্থ ৺নিত্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার স্বভাব মধুর-ভাষায় ভাগবত-কথামৃত বর্ষণ করিয়া ভক্তগণের শ্রবণ পিপাসা শান্তি করিতেছেন। এরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মনোহর পাঠ শ্রবণ সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। আশা করি ভগবদ্ভক্ত জনগণ কেহই এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে বিরত হইবেন না।

জগুবাবুর বাজারের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে শ্রীযুক্ত রামধক্ মারওয়ারী মহাশয়ের বাটীতেও মহালয়া পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা চলিবে।

সময়—অপরাহ্ন ৬টা হইতে ৭টা।

সুপ্রসিদ্ধ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় লোকরোডে ভাগবত কথামৃত বর্ষণে শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

☞ এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরোধী পরিদৃষ্ট হওয়ায় সেই প্রবন্ধ বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে বন্ধ করা হইল। আমাদের অনবধান-বশতঃ এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে, আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ সে জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

ম্যানেজার।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ } আশ্বিন—১৩৩৯ ২য় সংখ্যা

মঙ্গলাচরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী]

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—শ্রীগৌরহরি সকলকেই করুণা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র শচীমাতাকেই সন্ন্যাস করিবার সময় হইতে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদাইয়াছেন। ইহার উত্তরে ঐ বিশেষণটী দ্বারা দেখাইয়াছেন যে—পরমকৃপালু শ্রীগৌরহরি শচীমাতাকে সুখিনী করিয়াছেন, যেহেতু তিনি শচীনন্দন—শচীং নন্দয়তি অর্থাৎ শচীমাতারও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এ অর্থটীও শচীনন্দনপদে বুঝাইয়াছে। এস্থানে "চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং। জয়োদ্‌ঘোষৈঃ সম্যগ্‌বিরচিতঃ শচীশোকহরণঃ" শ্রীরূপগোস্বামিকৃত এই শ্লোকটী প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত হরিশব্দটী শ্লিষ্ট। হরিশব্দের বহু অর্থ-মধ্যে এস্থলে শ্লেষার্থে প্রকরণানুরোধে হরিপদে সিংহ বুঝিতে হইবে; যেহেতু মূল শ্লোকে শ্রীলগ্রন্থকার বলিয়াছেন যে—তোমাদের হৃদয়রূপকন্দরে শ্রীশচীনন্দন হরি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকুন। এই প্রকরণানুসারে অর্থাৎ সাধকহৃদয়কে কন্দররূপে আরোপ করাতে শচীনন্দনহরিকে শ্লেষে সিংহ-রূপে আরোপ বা বর্ণন করা শ্রীলগ্রন্থকারের অভিপ্রেত; কারণ শ্লিষ্ট-পরম্পরিতরূপকে একটী বাক্যের অন্তর্গত অঙ্গস্বরূপ কোন পদকে রূপক করিয়া বর্ণনা করিলে মূল অঙ্গী-পদটীকেও রূপক করিয়া বর্ণন করিতে হয়, এজন্য হরি-শব্দের শ্লেষে এস্থলে সিংহ অর্থ। সিংহ যেমন নিজ অঙ্গ-চ্ছটায় পর্ব্বতগুহার নিবিড় অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া হস্তীসকলকে বিনাশ করে ও নিজ সন্তানগণকে পালন করিয়া থাকে, সেইপ্রকার শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হইয়া তত্রত্য কল্মষরূপ হস্তিবৃন্দকে বিনাশপূর্ব্বক তোমাদিগকে রস আস্বাদন করাইয়া পোষণ করুন। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, "সিংহ যেমন শৃগালাদি হিংস্রজন্তুসকলকে বিতাড়িত করিয়া নিজ সন্তানগণকে রক্ষা করেন, শচীনন্দনরূপ সিংহও সেইরূপ তোমাদের হৃদয়ের কামক্রোধাদিরূপ শৃগালসমূহকে বিতাড়িত করতঃ তোমাদিগকে রক্ষা করুন"—এইরূপ অর্থ সমীচীন নহে। কারণ শৃগাল তাড়ান যেমন সিংহের পক্ষে অতিতুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর কার্য্য, সেইরূপ শচীনন্দন হরির পক্ষেও কামক্রোধাদি বিনাশ কার্য্যটী নিতান্ত তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ এই ভক্তিমার্গে কামক্রোধাদিকে মায়িক বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্বিষয়ে নিয়োগ করাই প্রয়োজন; যেহেতু কামক্রোধাদিকে শ্রীভগবদ্-বিষয়ে নিয়োগ করাই প্রয়োজন। যেহেতু কামক্রোধাদিকে বিনাশ করিলে ভক্তিপথে প্রবেশই সুদূরপরাহত।

এই সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদমাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া" বিশেষতঃ কামক্রোধরূপ শৃগাল বিতাড়ন-কার্য্যটী বর্ণন-করা শ্রীল গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে; কারণ শৃগাল বিতাড়িত করিবার জন্য যেমন সিংহকে কোন প্রয়াস করিতে হয় না, পরন্তু সিংহের ভয়ে শৃগাল কোনপ্রকারে নিজের প্রভাব বিস্তার না করিয়া ভীত হইয়াই সেইস্থানে বাস করে, আর শব্দ বা কোনপ্রকার দৌরাত্ম্য করে না; তেমনই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের হৃদয়-গুহায় আবির্ভূত হইলে কামাদি, কোনপ্রকার প্রভাব বা দৌরাত্ম্য করে না, কিন্তু অনুগতভাবে নিজাভীষ্টসাধনের আনুকূল্যই করিয়া থাকে। অতএব কামক্রোধাদি দমন করা শচীনন্দন হরির কার্য্য নহে। হস্তীকে বিনাশ করাই যেমন সিংহের কার্য্য, সেই প্রকার কল্মষ-দ্বিরদ অর্থাৎ অনাদিকালের অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য ভক্তিবিরোধী সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ-কর্ম্মাদিরূপ-অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করাই শচীনন্দন শ্রীহরির উদ্দেশ্য। তাই শ্রীল গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

সেই সিংহ স্ফুরুক সবার হৃদয়কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশ যাঁহার হুঙ্কারে।
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥ আঃ তৃঃ

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ-কারণটী প্রকাশ করিতেছেন—যিনি নিজ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা-নববিধা রাগানুগা-ভক্তি-সম্পত্তি সম্যক্‌রূপে অর্পণ করিবার জন্য অধর্ম্মবহুল কলিযুগে কৃপাপরবশ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এস্থলে স্বভক্তি-সম্পত্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সাধন-ভক্তিরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে এবং সাধনভক্তির মধ্যেও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই সর্ব্বথা প্রাধান্য অভিপ্রেত; কারণ "চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার। প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার"॥ এই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রদত্ত সাধন-ভক্তি মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং সেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনটীও বিধিপ্রেরিত হইয়া নহে, কারণ পরে বর্ণিত হইবেন—

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম"॥
"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজপ্রেম পাইতে নাহি শক্তি॥"

এই দুইটী প্রমাণে অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে রাগানুগা-ভক্তিরই দৃঢ়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি রাগানুগা-মার্গে লীলাদি স্মরণের প্রাধান্য বটে, তথাপি নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া এই লীলাদি স্মরণ কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ অবলম্বনে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র অব্যভিচারী কারণরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; যথা—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া, কেবল লীলাদিস্মরণনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রদত্ত সাধনভক্তি হইতে বঞ্চিত—ইহাই আমার মনের দৃঢ় নিশ্চয়।

'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' এই পদের অন্তর্গত স্বশব্দের অর্থ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তৎসম্বন্ধান্বিতঃ অথবা তদ্বিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিসম্পত্তি; শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রদত্ত সেই ভক্তি-সম্পত্তির দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। একটী "উন্নতোজ্জ্বলরসাং" অপরটী "চিরাৎ অনর্পিতচরীং"। ইহার মধ্যে প্রথমটীর ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে। উন্নত—শ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বল—নির্ম্মল, অথবা মধুর রসাস্বাদন আছে যাহাতে, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত বিমলআস্বাদন যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা সাধনভক্তিতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ ভক্তিসাধন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসন্ধি-রহিত বিমল আস্বাদনটী পাওয়া যায়, এবম্ভূত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-

প্রধান সাধন-সম্পত্তি, যাহাকে তাহাকে দিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "উজ্জ্বল" শব্দের শৃঙ্গার অর্থ না করিবার অর্থাৎ কান্তাজাতীয় আস্বাদনরূপ অর্থ না করিবার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীপাদ গ্রন্থকার পরে ব্যাখ্যা করিবেন, "চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন"। এই পয়ারের অর্থ রক্ষার জন্য উজ্জ্বল পদের "নির্ম্মল" অর্থটাই সুসঙ্গত মনে হয়।

অথবা "নির্ম্মল" শব্দের অর্থ নিরুপাধি. কিন্তু কান্তাপ্রেমে পাঁচটী উপাধি দেখা যায় প্রথম—ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে প্রীতি, অর্থাৎ সাক্ষাৎধর্ম্মীতে প্রীতি না করিয়া তাঁহার অসাধারণ-ধর্ম্ম যে ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ" এইটী ঈশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্ম ; এই ধর্ম্মটী অবলম্বন করিয়া যাহারা প্রীতি করেন, তাহাদের ঠিক ঈশ্বরে প্রীতি করা হয় না। দ্বিতীয় উপাধি "স্বসুখতাৎপর্য্য"। অর্থাৎ যে প্রীতিতে নিজ-দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চরিতার্থতা রূপ স্বার্থ লুক্কায়িত আছে, সে প্রীতিতে নিজ অভীষ্টদেবে গাঢ় আবেশ হইতে পারে না। তৃতীয় উপাধি—যে প্রীতিটী নিজ অভীষ্টের সৌন্দর্য্য, সদ্গুণ এবং কারুণ্যাদি অবলম্বনে আবির্ভূত হইয়া থাকে : এই সৌন্দর্য্যাদিও প্রীতির উপাধি বা হেতু। চতুর্থ-উপাধি—প্রীতির গর্ভে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মসম্বন্ধ উদ্ভাসিত হওয়া। পঞ্চম উপাধি—তুমি কান্ত, আমি কান্তা ; তুমি আমি এবং বিবিধ-বিষয়ে ভাবসমুচিত-সঙ্কল্পের উদ্গম হওয়া ; ইহাও প্রীতির উপাধি বা হেতু। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরুপাধি যে আস্বাদনটী দান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই পাঁচটী উপাধিই নাই।

"চিরাৎ অনর্পিতচরীম্" এই বিশেষণটীর অর্থ করা যাইতেছে—চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য, অনর্পিতচরীং ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। যে উন্নত উজ্জ্বলরসাত্মিকা নিজভক্তি-সম্পত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আটহাজার যুগ পর্য্যন্ত অর্পিত হয় নাই, সেই উজ্জ্বলরসাত্মিকা নিজভক্তি-সম্পত্তিটী দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এস্থলে চিরাৎ বলিতে আটহাজার যুগ অর্থই সমীচীন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এক দিনের ভিতরে একবার অবতীর্ণ হয়েন, তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গও যে দ্বাপর যুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহারই সন্নিহিত কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামিচরণ নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তদেবং যদা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽবতরতীতি স্বারস্যলব্ধে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ।

যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সন্নিহিত কলি-যুগে শ্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন, এই স্বারস্য লাভ হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌর, এই কথা প্রমাণ-বলে পাওয়া যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌর-অবতার পৃথক নহেন। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বার হাজার যুগ, রাত্রির পরিমাণও চারিহাজার যুগ "চতুর্যুগসহস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে"। যেমন দিনের পরিমাণ, তেমনই রাত্রির পরিমাণ বুঝিতে হইবে ; তাহা হইলে আটহাজার যুগ পর্য্যন্ত-চিরকাল শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। যাহা পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই এমত নিজ ভক্তি-সম্পত্তিটী কি ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কেবল গোপীভাবের আনুগত্যে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের উপা-সনারই প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু গোপীবিশেষের অর্থাৎ শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রচার ছিল না, সেই উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসবিশেষের কিছু আকাঙ্ক্ষা আর সত্তা মিশ্রিত ছিল। কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভু অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ-আকাঙ্ক্ষাশূন্য কেবলমাত্র শ্রীরাধাপদদাসীত্ব অভিমানে শ্রীরূপাদি মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুরতর কুঞ্জসেবাপ্রাপ্তি-লালসায় স্বারসিকী-লীলাশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপ্রধান-ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্বে কেবল গোপীভাবের আনুগত্যে শ্রীল শ্রীরাধামাধবের কুঞ্জসেবা-প্রাপ্তি-সাধন প্রচার করিয়াছেন। এই স্বারসিকী লীলাটী শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরকীয়া ভাব ভিন্ন স্বকীয়াভাবে হইতে পারে না শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতিগ্রন্থে যে লীলাস্মরণপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা সকলই স্বারসিকী এবং পরকীয়াভাবে। শ্রীমদুজ্জ্বলনীল-মণি এবং অলঙ্কার-কৌস্তভ প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরকীয়াভাবের লীলারই প্রমাণসকল

উল্লিখিত হইয়াছেন, প্রাপ্তিও পরকীয়া ভাবেই দেখাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য এই যে—সাধক-অবস্থাতেই সিদ্ধ-অবস্থার আস্বাদনটী পাওয়া যায়। তবে সাধক অবস্থায় সেই আস্বাদনটী অস্থায়ী, আর সিদ্ধ অবস্থায় সেই আস্বাদনটী স্থায়ী; এইজন্য প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা,
পক্কাপক মাত্র সে বিচার।

শ্লোকটীতে সম্প্রদানবাচী কোন পদ প্রয়োগ না থাকায় অর্থাৎ কাহাকে দান করিবেন সেই পাত্রবিশেষের উল্লেখ না থাকায় পাত্র এবং অপাত্র দেয় বা অদেয় বিচারশূন্য হইয়া দান করাটাই বুঝাইতেছে।

সমর্পয়িতুম্—সম্যকরূপে দান করিবার জন্য; সম্যক্‌রূপে দান বলিতে বুঝিতে হইবে আপনি আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন-পদ্ধতি শিক্ষাদানপূর্ব্বক প্রদান করা।

আপনি করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী!
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
হেন দয়াল অবতার, হেন দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥

"কলৌ" পদের স্বার্থকতা এই যে—কলিতে ধর্ম্মকর্ম্ম-করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই অধর্ম্মবহুল-কলিযুগেই সর্ব্বসাধনমুকুটমণি শ্রীরাধাপদদাসীত্ব অভিমানে রাগানুগাভক্তি এবং নিখিল-সাধ্যমুকুটমণি শ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবাপ্রাপ্তিরূপ সাধ্যমিশ্রিত সাধনটী প্রদান করিতে আসিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য কৃপাশক্তির পরিচয় দেওয়ার অভিপ্রায়েই কলৌ পদটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

করুণয়া—এই দুর্ল্লভবস্তু দানের হেতু একমাত্র দুর্গত-কলিহতজীবগণের দুর্গতিদর্শনে উত্থিত অসমোর্দ্ধ-করুণা, এইজন্য "করুণয়া" এই পদটী হেত্বর্থে তৃতীয়ায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্লোকটীতে চারি বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বীর-ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। "করুণয়া" পদদ্বারা দয়াবীর "সমর্পয়িতুং" পদদ্বারা দানবীর, "কলৌ" পদদ্বারা শ্লেষে যুদ্ধ-বীর বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটি নানাভাব-রত্নে বিভূষিত, যিনি যতদূর পর্য্যন্ত ভাবনারসিক ও ভাবনা-চতুর, তিনি ততদূর পর্য্যন্ত ভাবরত্নগ্রহণে সমর্থ হইবেন। বাহুল্যভয়ে আর বিস্তার করা হইল না।

(ক্রমশঃ)

গান।

(গোবিনলাল)

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমা

পরমা বৈষ্ণবী তুমি পরমানন্দরূপিণী
নন্দসুত তুমি কৃষ্ণ সদানন্দসোহাগিনী,
তোমারে পূজে মা লোকে ব'লে "নমো নারায়ণী"।
তুমি মা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্য-সনাতনী।
বিষ্ণুরূপে বামে লক্ষ্মী দক্ষিণেতে বীণাপানি
কমলা দক্ষিণে তব দুর্গারূপে বামে বাণী;
বৃন্দাবনে হয়েছিলে তুমি মা কৃষ্ণজননী
গোপালে খাওয়া'য়েছিলে কোলে ক'রে ক্ষীরননী।
হরিহরে ধর হরি-মুরতি মনোমোহিনী।
অর্দ্ধনারীশ্বরে গৌরী তুমি শিবপ্রণয়িনী;
মাতৃরূপে সর্ব্বজীবে ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
পুরুষে তুমি মা গুপ্ত নারীতে স্বপ্রকাশিনী।
জড়ে বিজড়িত আছ প্রকৃতিরূপে জননী।
আব্রহ্ম-মৃত্তিকাখণ্ডে তুমি চিদ্ঘনরূপিণী;
আমি মা তোমারে ডাকি "হরি" বলে হররাণি।
বলে "মা" সেই প্রাণকান্তে ডাকি মা দিনযামিনী।

আমাদের সার্ব্বজনীনতা

[শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামি ব্যাকরণ-তীর্থ]

আজ শরতের স্নিগ্ধ সৌরকরোজ্জ্বল প্রাতে যখন প্রভাতবায়ু সারা জগতের প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় পুলকের শিহরণ তুলিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়েই একটী কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—এই সার্ব্বজনীন হিন্দুসমাজকেও নাকি অস্পৃশ্যতাই অনেক নীচে টানিয়া আনিয়াছে।

আজ যেদিকে তাকাই, ধনী নির্ধন ব্রাহ্মণ শূদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই মুখে ওই এককথা। কিন্তু কথাটা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অস্পৃশ্যতা জিনিষটা কি? যদি কাহাকেও স্পর্শ করিতে ঘৃণা-বোধই ইহার অর্থ হয়, তবে বলিব হিন্দু-সমাজে ইহা কখনই ছিলনা—এখনও নাই। হিন্দুরা চিরকালই আহার-বিহারে সদাচার-রক্ষার পক্ষপাতী; সেই হিসাবে তাঁহারা দেবপূজাদির সময় অস্নাত নিজের সন্তানকেও স্পর্শ করেন না। ইহা কি তাঁহাদের সন্তানের প্রতি ঘৃণার পরিচায়ক? মাত্র সদাচার-প্রীতিই তাঁহাদের এইরূপ আচরণের হেতু। কেহ কেহ এই "অস্পৃশ্যতা-পরিহার" কথাটার অর্থ আরও অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই কথাটী তাঁহারা বিবাহ ভোজনাদি ব্যাপারেও প্রযুক্ত করিতে চাহেন; তাঁহারা বলেন—অনুন্নত জাতির সহিত বিবাহ ভোজনাদি ব্যাপারও চলা উচিৎ। এটা অবশ্য তাঁহাদের একটা সাময়িক ভাবের উত্তেজনা মাত্র, কিন্তু আমরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে চাই—অস্পৃশ্যতা কি এবং তাহার পরিত্যাগ কেন? এই কথা দুইটী একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির মধ্যে একটী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—সেটীর নাম মৈত্রী। সকলের সহিত মৈত্রী বা মিত্রতার প্রতিষ্ঠার জন্যই অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে হইবে। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া "অস্পৃশ্যতাপরিহারের" সংজ্ঞা ঠিক করিলে আশা করি অন্যায় করা হইবে না।

যখনই জীবজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বর্ত্তমান সভ্যতার পেষনে তাহার অনেক হানি ঘটিয়াছে। সহরের কথা ছাড়িয়াই দিই—সেখানে বাস্তবতার প্রবল প্রতাপ। আমি পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি—

রাত্রি দ্বিপ্রহর; সারাদিন ক্ষেতে কাজ করিয়া পরিশ্রান্ত কৃষক শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। পুরোহিত মহাশয় যজমানদের বাড়ী সত্যনারায়ণ সারিয়া এই কতক্ষণ গৃহে ফিরিয়াছেন। তিনি বিছানায় শয়ন করিবা-মাত্রই নিদ্রিত হইয়াছেন। ধনী ব্রাহ্মণ-যুবকও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সহসা সেই শান্ত গ্রাম-খানির বক্ষ বিকম্পিত করিয়া এক আর্ত্তনিনাদ জাগিয়া উঠিল।

কৃষকের নিদ্রা ছুটিয়া গেল, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখিল—মুচিপাড়ায় অগ্নির লেলিহান শিখা দেখা যাইতেছে। তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে একটী কুম্ভ লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই আর্ত্তনিনাদে পুরোহিত মহাশয় ও ধনী যুবকেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বেগে মুচিপাড়া অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তারপর অগ্নি নিবাইয়া যখন তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন, তখন ভোরের বায়ু তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে তাহার মোহময় হাতখানি বুলাইয়া রাত্রিশেষের সূচনা করিয়া দিল। রাখাল মুচির গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, ইহাদের তথায় যাইবার প্রয়োজন কি ছিল? আবার ফিরিবার সময়ে যখন রাখাল করুণকণ্ঠে বলিল—কি হবে দাদাঠাকুর! কাল কি খাইব তাহারও যে সংস্থান নাই। পুরোহিত মহাশয় কত সান্ত্বনার কথা বলিলেন, বলিলেন—কাল সকালেই একবার আমার ওখানে যাস্ রাখাল! যা হোক ভগবান্ একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। কৃষক বলিল—আমার ক্ষেতে তরকারী আছে, কাল সকালেই কিছু পাঠাইয়া দিব। ধনী ব্রাহ্মণযুবক অগ্রসর হইয়া বলিল—"রাখাল দাদা! কিছু ভাবনা নাই তোমার। যতদিন তুমি ঘর করিতে না পার, আমার বাগানের কোনে ঐ ঘরটায় ততদিন থাকিবে। ইহারই নাম কি অস্পৃশ্যতা?

হিন্দুর শাস্ত্রও যুগে যুগে লোকের কর্ণমূলে তারস্বরে

ঘোষণা করিতেছে—জীবকে ঘৃণা করিও না; ঘৃণা করিবার অধিকার নাই তোমার। জীবমাত্রই ভগবানের অংশ অণু-চৈতন্য—তাহাকে অবজ্ঞা করিলে সেই বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরেরই অবজ্ঞা করা হইবে। তাই বলি—জীবকে অবজ্ঞা করিও না; তাহাকে তৃপ্ত কর। পাপী তাপী শত্রু মিত্র বিচার করিও না। সকলকেই সশ্রদ্ধ-অর্ঘ্য প্রদান কর।

তাই পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে হিন্দু পাপী তাপী শত্রু মিত্র বিচার না করিয়া সকলকেই তৃপ্ত করেন; বলেন—

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মকাঃখগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলধারাস্তথৈবা কাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

দেবতা যক্ষ নাগ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা অসুর প্রভৃতি সকলেই আমার প্রদত্ত এই সলিলাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হউন্। অন্য কোনও ধর্ম্মে কি এরূপ উদারতা দেখা যায়? শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। মুক্তিলাভেচ্ছুগণ সকলেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারেন। সে ব্রাহ্মণ হউক্, শূদ্র হউক্, চণ্ডাল হউক, অথবা যবন হউক্ তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যে তাঁহাকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিবে তিনি তাহাকে বুকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিবেন তিনিই শ্রীগীতায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।

ইহাই হইল শ্রীভগবানের বাণী। তবে হে সমাজ-ছিদ্রান্বেষণপটুজনগণ শাস্ত্রের মিথ্যা নিন্দা করিয়া লাভ কি? যদি মনে সৎসাহস থাকে, প্রকাশ করিয়া বল—কি চাও তুমি? তুমি কি নিজের সমাজের অযথা নিন্দা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাও? তুমি কি মনে কর—পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে না পারিলে মৈত্রী স্থাপিত হইবে না? তোমার কি বিশ্বাস—মাংসমদিরার মধ্যে অথবা দৈহিক সম্পর্কের মধ্যেই মৈত্রীর বীজ লুক্কায়িত আছে? হায় ভ্রান্ত মানব! তোমার এ কি বিশ্বাস! তুমি কি দেখিতে পাও না—একই মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কি শত্রুতা? আবার সেই মুহূর্ত্তেই অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে—একান্ত নিঃসম্পর্কীয় ভিন্নজাতীয় একজন লোক কেবলমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে অপরের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতেছে! ইহাই হইল মৈত্রী; ইহার সহিত জাতিভেদের কোনই সম্বন্ধ নাই। শরীরে যেমন মস্তকের প্রয়োজন, পদের প্রয়োজনও সেই প্রকারই; তাই জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহার সহিত অস্পৃশ্যতার কোনই সম্বন্ধ নাই।

শুনা যায় সভ্যজাতিবিশেষের উচ্চনীচভেদে নাকি পৃথক্ পৃথক্ সমাধিস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুর কিন্তু এক চিতাতেই উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী দরিদ্র চণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার। ইহাও কি হিন্দুর অস্পৃশ্যতা-জ্ঞানের পরিচায়ক? কাঞ্চনকৌলিন্যই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহাদের পক্ষে এই মনগড়া "মৈত্রী" অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু তাহা হিন্দুর এই স্বভাবজাত সমদৃষ্টির নিকটে তুচ্ছাদপিতুচ্ছ।

কলিপাবনাবতার শ্রীমহাপ্রভুর কথাই বলি; তাঁহারই শ্রীমুখের উপদেশ—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন
এই তিন ধর্ম্ম হয় শুন সনাতন!

ইহাতেও কি জীবের প্রতি হিন্দুসমাজের ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে? আবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর যখন শ্রীমন্-মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, নিকটে যাইতে পারিতেছেন না—রাজপথে পড়িয়া আছেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন—

————আমি নীচ জাতি ছার
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটার মধ্যে যদি স্থান পাই।
তাহা পড়ি রহোঁ একেলা কাল গোঁয়াই॥
জগন্নাথসেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥

শ্রীশ্রীহরিদাস পরমসত্ত্বপ্রকৃতিসম্পন্ন; এই দৈন্যপূর্ণ উক্তিতে তাঁহার মহাভাগবতত্বই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পরে যখন মহাপ্রভুর সহিত হরিদাসের দেখা হইল

হরিদাস যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। অম্নি হরিদাস বলিলেন—

———প্রভু না ছুইও মোরে
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

ইহাই প্রয়োজন। আভিজাত্যের গর্ব্বে যাঁহারা নিজেকে উন্নত মনে করেন এবং যাঁহারা নিজেকে নীচজাতি বলিয়া উন্নতজাতির সহিত আহার বিহারের জন্য লালায়িত হন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। শ্রীহরিদাসের এই দৈন্যপূর্ণ-সাত্বিকতাই আজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরও শীর্ষদেশে স্থান দিয়াছে। মহাপ্রভুও তাঁহার স্পর্শের জন্য লালায়িত; তাই বলিলেন—

———তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥

শ্রীরামচন্দ্রও গুহক চণ্ডালকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন—তাহার সখ্যতায়—তাহার সাত্বিকতায় মুগ্ধ হইয়া। তেমনি আধুনিক কি উন্নত কি অনুন্নত জাতি আমরা যদি সকলেই একান্তভাবে কাপট্যপরিবর্জ্জন করিয়া নিজ নিজ সাত্বিকতার পুষ্টিসাধন করিতে পারি তাহা হইলে ব্রহ্মণ্যদেব একদিন আমাদিগকে আশ্রয় করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মাতৃস্তোত্রম্

(প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী)

১। যা দেবী দশমাসো মাং সন্দধার নিজোদরে।
বসুধায়া অধিষ্ঠাত্র্যৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১। যিনি দশমাস আমাকে নিজের উদরে ধারণ করিয়াছিলেন, বসুধার সেই অধিষ্ঠাতৃদেবতা মাতৃদেবীকে নমস্কার।

২। যা কুক্ষিবিবরে কৃত্বা স্বয়ং রক্ষতি সর্ব্বদা।
নমামি জননীং দেবীং পরাং প্রকৃতিরূপিণীম্॥

২। যিনি সর্ব্বদা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করেন, সেই পরাপ্রকৃতিস্বরূপিণী মাতৃদেবীকে নমস্কার।

৩। অমরোঽপি ন শক্নোতি যথাবৎ সেবিতুং কচিৎ।
মাতৃপাদান্ সুদূরেঽস্তু মানবঃ স্বল্পজীবনঃ॥

৩। স্বল্পজীবন মানবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও যথাবিধি মাতৃচরণ সেবা করিতে কখনও সমর্থ হন না।

৪। যা তুষ্টে ময়ি সন্তুষ্টা যা রুগ্নে ময়ি রোগিণী।
যা শান্তে ময়ি শান্তাসীৎ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৪। আমি সন্তুষ্ট থাকিলে যিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন, আমার পীড়ায় যিনি পীড়া অনুভব করিতেন, আমি শান্ত হইলে যিনি শান্তিলাভ করিতেন সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

৫। স্বয়ং শুভা জগদ্ধাত্রী যস্যাঃ হৃদয়মাস্থিতা।
করোতি পালনং শশ্বৎ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৫। স্বয়ং শুভকারিণী জগদ্ধাত্রী যাঁহার হৃদয় আশ্রয় করিয়া চিরকাল এই জগৎ পালন করিতেছেন সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

৬। যদর্চ্চনং বিনা যাগব্রতাদ্যাঃ বিবিধা ক্রিয়াঃ।
স্বর্গদা ন ভবন্ত্যেব তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৬। যাগব্রতাদি বিবিধ ক্রিয়াসকল যাঁহার অর্চ্চনা ব্যতিরেকে স্বর্গদান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

৭। মাসংজ্ঞা ভূতলে যস্যাঃ মধুরা মধুরাদপি।
পরমানন্দরূপায়ৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৭। ত্রিভুবনে যাঁহাকে মধুর হইতেও মধুরতর "মা" এই শব্দে সম্বোধন করা হয়, সেই পরমানন্দরূপিণী মাতৃদেবীকে নমস্কার!

৮। মামেতি মধুরাহ্বানং যস্যাঃ সুখকরং সদা।
সুখে বা যদি বা দুঃখে তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৮। সুখে দুঃখে যে অবস্থায়ই থাকুননা কেন "মা" "মা" এই মধুর আহ্বানটী যাহার অত্যন্ত সুখদায়ক হয়, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

৯। সুধাকরে কলঙ্কোঽস্তি পদ্মনালে চ কণ্টকম্।
যস্যাং ন দোষলেশোঽপি তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

৯। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, পদ্মনালে কণ্টক আছে, কিন্তু যাঁহাতে বিন্দুমাত্র দোষস্পর্শ নাই সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১০। গঙ্গায়া অপি যা শুদ্ধা কোমলা কুসুমাদপি।
নির্ম্মলা নির্ম্মলাকাশাৎ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১০। যিনি গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রা, কুসুম অপেক্ষাও কোমলা, স্বচ্ছ আকাশ হইতেও নির্ম্মলা, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১১। অত্যল্পমাত্রভোক্তারং বহুভুঞ্জানমিচ্ছতি।
তনয়ং সর্ব্বদা যা তু তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১১। যিনি অতি অল্পভোজী তনয়কে প্রচুর ভোজন করাইতে ইচ্ছুক সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১২। যা দেবী মদ্ভরাক্রান্তা ক্লান্তাপ্যাসীৎ সুনির্বৃতা।
স্বয়ং ধৃতিস্বরূপায়ৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১২। যিনি আমার ভারে আক্রান্ত হইয়া ক্লান্ত হইলেও আনন্দিত থাকিতেন, সেই ধৈর্য্যস্বরূপিণী মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১৩। যা মৎপীড়াপ্রশান্ত্যর্থং সিষেবে স্বয়মৌষধম্।
স্নানাশনে পরিত্যজ্য তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১৩। যিনি আমার পীড়া উপশমের জন্য নিজেই ঔষধ সেবন করিতেন, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১৪। যদাজ্ঞৈবাখিলা বেদাঃ যদাজ্ঞৈব চ ভারতম্।
রামায়ণং যদাজ্ঞৈব তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ

১৪। নিখিল বেদ, মহাভারত এবং রামায়ণ যাঁহার আজ্ঞাস্বরূপ সেই জননীকে নমস্কার।

১৫। মানবানাং হিতার্থায় দেবতানাং তথৈব চ।
দ্বিধাভূতে শরীরে তে বন্দে শ্রীমাতৃমূর্ত্তিকে॥

১৫। মানবগণের হিতের জন্য এবং দেবতাগণের হিতের জন্য যিনি দুইরূপে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

১৬। আশীর্ব্বাদবশাদ্যস্যাঃ লভতে প্রাণবল্লভম্।
অযত্নেনৈব মনুজঃ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ॥

১৬। যাঁহার আশীর্ব্বাদে মনুষ্যগণ বিনাযত্নেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই মাতৃদেবীকে নমস্কার।

জীবের মনুষ্যজন্ম—১

[রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

মহানুভব বৈষ্ণবদার্শনিকগণ শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জীব সচ্চিদানন্দ-কণ—অণুচৈতন্য এবং শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দঘন—বিভু-চৈতন্য, জীব অংশ এবং শ্রীভগবান্ অংশী, জীব শক্তিতত্ত্ব এবং শ্রীভগবান্ শক্তিমান্‌তত্ত্ব, জীব অল্পজ্ঞ এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, জীব নিয়ম্য এবং শ্রীভগবান্ নিয়ন্তা, জীব নিত্য ভগবদ্দাস এবং শ্রীভগবান তাহার নিত্যপ্রভু।

জীবস্বরূপের পরিমাণ-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ একটি কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক-ভাগকে আবার শতভাগ করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, জীবের স্বরূপ ততটুকু; এই জীব সংখ্যায় অনন্ত, অর্থাৎ অপরি-সংখ্যেয় বা সংখ্যাতীত।

অণুপরিমিত হইলেও জীব নিত্য চিদ্বস্তু। জীব শ্রীভগবানেরই অংশ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", অর্থাৎ এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। জীবের ভগবদংশধর্ম্ম শ্রুতি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যথা—

(১) যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাত্মনো ব্যুচ্চরন্তি।

(২) যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই শ্রুতিবাক্যসকলের অনুবাদ-অবলম্বনেই বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেখাইয়াছেন যে—জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ বা পৃথক্ অংশ, অবতারাদির মত তাঁহার অপৃথক্ অংশ নহে। অথচ, শ্রীভগবানের সত্তাতেই জীবের সত্তা অর্থাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া বস্তন্তরের অস্তিত্বই নাই বলিয়া জীব নিত্য তাঁহাতেই অবস্থিত। জীবে ভগবানে এই অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ বৈষ্ণব-দর্শনকারই সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্র অণুচৈতন্য জীবকে শ্রীভগবানের অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া শক্তিতত্ত্বমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। জীব অনন্তশক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ। গীতায় শ্রীভগ-বান্ বলিয়াছেন যে—জীব তাঁহার জড়াশক্তি নহে, জীব চিদ্বস্তু—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ আমার জড়াশক্তি নিকৃষ্টা, ইহা হইতে ভিন্না জীবভূতা আমার উৎকৃষ্টা শক্তি স্বকর্ম্ম দ্বারা জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

অনন্তশক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিসমূহ প্রধানতঃ ত্রিবিধা—

(১) অন্তরঙ্গা, স্বরূপ বা চিচ্ছক্তি—অনন্ত ভগবদ্ধাম সমূহ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য, ও তত্রস্থ পার্ষদসমূহ তাঁহার স্বরূপশক্তির বৈভব।

(২) বহিরঙ্গা, জড়া বা মায়াশক্তি—অনন্তব্রহ্মাণ্ড ও তত্রস্থ জীবসমূহের দেহাদি মায়াশক্তির কার্য্য।

(৩) তটস্থা বা জীবশক্তি—অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। অণু-চৈতন্যজীব অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। জীবকে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রিত কিম্বা মায়াশক্তির আশ্রিত হইয়া থাকিতে হয়, এইজন্য জীবকে তাঁহার তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। স্বরূপশক্তির আশ্রিত জীবকে মুক্ত-জীব এবং মায়াশক্তির আশ্রিত জীবকে বদ্ধজীব কহে। শাস্ত্র দেখাইয়াছেন যে—শ্রীভগবান্ অগ্নিস্থানীয়, তাঁহার

স্বরূপশক্তি অগ্নির প্রভাস্থানীয়া, জীবশক্তি অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়া, এবং মায়াশক্তি অগ্নির ধূমস্থানীয়া।

অগ্নিও অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই সত্য। কিন্তু শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শক্তিসমূহে এক অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বিদ্যমান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ সেই তত্ত্ব অতি স্পষ্টভাবে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন, যথা—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

অর্থাৎ অগ্নি যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও স্বকীয় প্রভা-দ্বারা বহুল দেশব্যাপী হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ সবিশেষরূপে স্বধামে থাকিয়াও নিজ শক্তিদ্বারা অখিল-জগৎরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি বা বিভিন্নাংশ জীবকে শাস্ত্রকার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) নিত্যমুক্ত—অনাদিকাল হইতে ইহাঁরা ভগবদুন্মুখ, অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রিত, এবং অনন্ত-ভগবদ্ধামে নিরন্তর ভগবৎসেবা পাইয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

(২) নিত্যবদ্ধ—অনাদিকাল হইতে এই জাতীয় জীব ভগবদ্বহির্মুখ, এবং অনাদিকাল হইতেই মায়াশক্তির আশ্রিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুই শ্রেণী জীবের পরিচয় দিয়াছেন—

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ চৈঃ চঃ।

জীব স্বভাবতঃ নিত্য ভগবদ্দাস, এবং তাহার নিত্যপ্রভু শ্রীভগবান্‌কে সেবা করাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন," অর্থাৎ জীব শ্রীহরিরই নিত্যদাস, আর কাহারও দাস নহে জীব সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের নিত্য-নিয়ম্য, মুক্ত ও বদ্ধ দুই অবস্থাতেই জীব ভগবন্নিয়ম্য। সদ্যোজাত শিশু না জানিলেও সে যেমন রাজারই প্রজা, এবং রাজবিদ্রোহী ব্যক্তি না মানিলেও সেও যেমন রাজারই প্রজা, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীব না জানিলে ও না মানিলেও সে সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানেরই নিত্য-নিয়ম্য ও নিত্যদাস। নিত্যবদ্ধ-জীব শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়াই মায়াবদ্ধ হইয়াছে। কবে, কোথায়, এবং কেন ভুলিল—তাহার হিসাব নাই বলিয়া শাস্ত্রকার তাহার কৃষ্ণবিস্মৃতিটা অনাদিসিদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যগণে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

জীব মাত্রই শ্রীভগবানের অপার করুণা ও স্নেহের পাত্র, কারণ জীব তাঁহারই, আর কাহারও নহে। জীব নিত্য তাঁহাতেই উন্মুখ থাকিয়া তাঁহার সেবাসুখেই বিভোর থাকে ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত, জীব তাঁহাকে ভুলিয়া যায় ইহা তিনি কখনই চাহেন না। "তত্রাচ অণুচৈতন্য অল্পজ্ঞ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে সৎপথে আনিবার জন্য লোকে যেমন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহার দণ্ডবিধান করে, বহির্মুখ জীবকে স্বসমীপে আনিবার জন্যও শ্রীভগবান্ সেইরূপ তাঁহার মায়াশক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। জড়া মায়া তাঁহার চিদাভাস পাইয়া ক্রিয়াশীলা হয়, এবং বহির্মুখ জীবের ভগবৎ-বিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ তাহার চৈতন্য-স্বরূপের আবরণ করিয়া এবং নিজেরই কার্য্য জড়-দেহাদিতে তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহাতেই তাহার অহন্তা মমতাবুদ্ধি ঘটাইয়া দেয়। তদবস্থায় জীব তাহার মায়াদত্ত জড় ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা মায়াকার্য্য—ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখোদর্ক জড় বিষয়ই গ্রহণ করে, এবং নিরন্তর পরিবর্দ্ধনশীল ভোগ-বাসনায় বদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে সংসারমরুভূমির ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই বদ্ধজীবের ভোগ-বাসনা ক্ষয় করাইবার জন্যই মায়াশক্তি-দ্বারা শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্টি, পালন ও সংহার-লীলার প্রবৃত্তির উদ্গম হয়, এবং ঐ সৃষ্ট্যাদিলীলার উদ্বোধক বলিয়াই জীবকে শ্রীভগবানের শক্তিমধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

নিত্যবদ্ধ জীবের জন্য করুণাময় শ্রীভগবানের হৃদয় সর্ব্বদা বিগলিত, তাহাকে মায়ার রাজ্য হইতে স্বসমীপে

জানিবার জন্য তিনি সততই লালায়িত। তাই তিনি তাহাকে মনুষ্যজন্ম দিয়া নিজেই শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামীরূপে তাহার দ্বারে দ্বারে ও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকেন; তাঁহার এতই করুণা যে—সে যেমন উন্মুখ হইবে, অমনি তাহাকে তখনই দেখা দিবেন এই উদ্দেশ্যে অনুমাত্রও ব্যবধান না রাখিয়া তাহার অন্তরেই অন্তর্যামীরূপে অনাদিকাল হইতে বসিয়া আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামীরূপে মায়াবদ্ধ-মনুষ্যের নিকট নিজের পরিচয় দিয়া নিজেই নাম ও বিগ্রহ-রূপে তাহাদের নিকট সুলভ হইয়া আছেন। তাহাতেই সে তাঁহাকে তাহার প্রভু ও ত্রাতা বলিয়া জানিয়া তাঁহার ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়, এবং স্বরূপশক্তির কৃপায় চরম-পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিয়া শ্রীভগবচ্চরণ পুনঃপ্রাপ্ত ও কৃতার্থ হইয়া যায়।

শ্রুতি বলিয়াছেন—জীব অমৃতের পুত্র, পরমানন্দামৃতসিন্ধু শ্রীভগবান হইতেই জীবের উৎপত্তি—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে", সুতরাং জীব স্বভাবতঃ আনন্দই চায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেও বদ্ধজীবের আনন্দ লিপ্সা যায় না, সে সুখই চায়, আর কিছুই চায় না। "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ", দেব তির্য্যক্ মনুষ্য প্রভৃতি সকল বদ্ধজীবেরই এই অভীপ্সা ও জিহাসার মূলে ঐ এক আনন্দ-লিপ্সা বিদ্যমান; কিন্তু মায়ার প্রতারণায় বদ্ধজীব জানিতে পারে না যে—যথার্থ সুখ কোথায় এবং সুখের আভাস মাত্রের লোভে অশেষ-দুঃখসঙ্কুল তুচ্ছ বিষয়ের জন্যই সংসার-মরুর মরীচিকায় ছুটিয়া ছুটিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।

বদ্ধজীবের ভগবৎ-বিস্মৃতিরূপ মূলদোষের যতক্ষণ না নিবৃত্তি হইতেছে, ততক্ষণ তাহার মায়াকৃত-আবরণ ও বিক্ষেপ রূপ দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি নাই। বদ্ধজীব মায়াধীন, তাহার স্বসামর্থ্যে মায়াতিক্রম সম্ভবপর নহে। যোগী ও জ্ঞানী যাহাই বলুন না কেন, মায়ার ত্রিগুণবন্ধন, পঞ্চকোষ, ও সপ্ত আবরণ ভেদ করা অণুচৈতন্য জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ সামর্থ্যাতীত। এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া, কিন্তু যে আমার শরণাগত হয়, সেই কেবল এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে। আমার শরণ লইলেই মায়াতিক্রম আপনিই হইয়া যায়।

করুণাময়ের এই আশ্বাসবাণীই বদ্ধজীবের একমাত্র ভরসা। শ্রীমদ্ভাগবত এই তত্ত্ব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
১১।২।৩৫

অর্থাৎ জীব ভগবদ্বহির্মুখ হইলেই মায়া তাহার চৈতন্য-স্বরূপ আবরণ করতঃ জড়দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় এবং স্বরূপবিস্মৃতি উৎপাদন করিয়া তাহাকে সংসারে ত্রিতাপ-ভোগ করাইয়া থাকে। অতএব এই মায়া যাঁহার এবং যাহার অপ্রসন্নতাহেতু মায়ার এই দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুপাদাশ্রয় করিয়া তাঁহারই ভজন করিবেন। তাঁহাকে সাধিয়া প্রসন্ন করিতে পারিলেই মায়া-নিবৃত্তি হইবে, এবং জীবের সকল বিপর্য্যয়, অস্মৃতি ও সংসারভয় দূর হইয়া যাইবে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহা-প্রভু এই শ্লোকের প্রমাণেই বলিয়াছেন—

তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

বদ্ধজীবের এই ভজনসাধন কেবল মনুষ্যজন্মেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীব সংখ্যায় অনন্ত এবং অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। চতুর্দ্দশভুবনাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীবকে কর্ম্মফল ভোগের অধীন হইয়া কর্ম্মফলের তারতম্যে চতুরশীতি-লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করিয়া চতুরশীতি প্রকার দেহ ধারণ করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

এইমত ব্রহ্মাণ্ডভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

তারমধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুইভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥

এই চৌরাশী লক্ষ জীবদেহ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই-প্রকার। বৃক্ষপর্ব্বতাদি অচল জীব স্থাবর সচল জীব জঙ্গম। জঙ্গম তিন প্রকার:—(১) তির্য্যক্—পক্ষী প্রভৃতি, (২) জলচর—মৎস্যাদি, এবং (৩) স্থলচর—মনুষ্য পশু প্রভৃতি। শাস্ত্রান্তরে জীবদেহ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—(১) জরায়ুজ—মাতৃগর্ভে উৎপন্ন—মনুষ্য, পশু প্রভৃতি, (২) অন্ডজ—পক্ষী সরীসৃপাদি, (৩) স্বেদজ—মশকাদি, এবং (৪) উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদি। এই চৌরাশী লক্ষ যোনি-সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

অর্থাৎ জলজ জীব নবলক্ষ প্রকার, স্থাবর বিংশতি লক্ষ প্রকার, কৃমি-কীট একাদশ লক্ষ প্রকার, পক্ষীজাতি দশ লক্ষ প্রকাব, পশু ত্রিংশৎলক্ষ-প্রকার, এবং মনুষ্য চতুর্লক্ষ প্রকার। সর্ব্বসমেত এই চতুরশীতি লক্ষ প্রকার জীবদেহই এই পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি লক্ষ প্রকার স্থাবর-দেহ-মধ্যে বৃক্ষলতা গুল্মাদি উদ্ভিদ জাতিই শ্রেষ্ঠ। ইহারা প্রত্যেকেই আমাদের মত এক একটি জীব। মনু বলিয়াছেন—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসঙ্গা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ-সমন্বিতাঃ।

অর্থাৎ বহুল তামসিক-কর্ম্মহেতু ঘোর তামস-যোনিপ্রাপ্ত বৃক্ষাদি-জীবসকল অন্তঃসঙ্গা হইয়া আমাদিগের মত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞান বহু আড়ম্বরের সহিত উদ্ভিদের প্রাণবত্তামাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুসন্তান হইয়াও আমরা আমাদিগের সনাতন-শাস্ত্রের খবরও রাখি না। ইদানীন্তন দুর্দ্দিনেও আমরা খুঁজিলে হিন্দুর প্রতি গৃহেই অন্ততঃ শ্রীমহাভারত গ্রন্থ পাইতে পারি। অনাদিকাল হইতে ঋষি এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বে বৃক্ষজাতিকে আমাদিগেরই মত চক্ষুকর্ণাদি-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব বলিয়া পরিচয় দিয়া এইরূপ সরল ও সহজ ভাবে তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রমাণীকৃত করিয়াছেন—

(১) উষ্ণতো ম্লায়তে বর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব চ।
ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥

অর্থাৎ উত্তাপহেতু বৃক্ষগণের ত্বক্ ফল ও পুষ্পপত্র ম্লান ও শীর্ণ হইতে দেখা যায়; অতএব ইহাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় বিদ্যমান।

(২) বায়্বগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দ স্তস্মাৎশৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥

বায়ু অগ্নি ও বজ নিনাদে বৃক্ষের ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইতে দেখা যায়। কর্ণের দ্বারাই শব্দ গৃহীত হয়, অতএব বৃক্ষের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে।

(৩) বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বত্রশ্চৈব গচ্ছতি।
নহ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥

দেখিতে পাওয়া যায় যে বল্লী অর্থাৎ লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করিবার জন্য দুর হইতে আসিয়া থাকে, এবং যথাস্থানে বেষ্টন করে। যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, সে কখনও পথ চিনিয়া আসিতে পারে না, অতএব বৃক্ষের দর্শনেন্দ্রিয় আছেই।

(৪) পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈ র্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥

ধূপাদির বিবিধগন্ধে বৃক্ষসকল নীরোগ হইয়া পুষ্প প্রসব করে, অতএব বৃক্ষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিদ্যমান।

(৫) পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়াত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥

পাদ অর্থাৎ মূলদ্বারা বৃক্ষসকল জল পান করিয়া থাকে; ঐ জলের সহিত অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য থাকিলে বৃক্ষের ব্যাধি হইয়া থাকে, এবং ব্যাধিপ্রতিষেধক দ্রব্য মূলে প্রদান করিলে বৃক্ষ ব্যাধিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব বৃক্ষের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান।

সুখ দুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাং অচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ পালনাদি অনুকূল-বেদন-হেতু ও আঘাতাদি প্রতিকূল-বেদন-হেতু বৃক্ষের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং পল্লবাদি ছিন্ন হইলে পুনরায় যথাস্থানে

তাহার উদ্গম হইয়া থাকে। অতএব বৃক্ষ জীব, অচেতন নহে।

উল্লিখিত চতুরশীতি লক্ষ প্রকার জীবদেহেই বিষয়ভোগ সম্পাদিত হইলেও, মনুষ্যদেহই একমাত্র সাধক দেহ এবং তদ্ভিন্ন আর সমস্ত দেহই কেবল ভোগদেহ। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়াবদ্ধ হইলে, মায়ারই কার্য্য জড় দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া মিথ্যা-কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমানে অনন্ত কর্ম্মফল-বাসনা সঞ্চয় করিয়া থাকে; তাহার এই কর্ম্মফল ভোগবাসনাক্ষয়ের জন্যই মায়াদ্বারা শ্রীভগবানের এই চৌরাশীলক্ষপ্রকার জীবদেহের সৃষ্টি। সকল দেহই কর্ম্ম-ফলভোগ সম্পন্ন হইলেও মনুষ্যদেহই শ্রীভগবানের বিশিষ্ট সৃষ্টি; এই দেহেই তিনি বিবেক বা বুদ্ধিযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, যদ্দ্বারা এই দেহধারী জীব আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং এই দেহেরই ইন্দ্রিয়াদি এরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা শাস্ত্র ও গুরুসেবায় তত্তৎকৃপা লাভ করিয়া এই দেহধারী জীব শ্রীভগবানের ভজন করিয়া মায়ার কবল হইতে চিরকালের জন্য নিজেকে উদ্ধার করিয়া ভগবচ্চরণ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সমর্থ হইতে পারে।

মনুষ্যেতর সকল দেহেই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল অবশভাবে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু মনুষ্য দেহেই তাহার প্রতিকারের সামর্থ্য শ্রীভগবান্ দিয়াছেন। মনুষ্য ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিবলে এই দেহদ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ভূর্লোক অতিক্রমপূর্ব্বক স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। এই সব লোকের দেহ দেবদেহ; ভূর্লোকের তির্য্যগাদি দেহের মত দেবতাদির দেহও ভোগদেহ—কেবল সুখভোগের জন্য, তদ্দ্বারা ভজন সাধন সম্ভবপর নহে। কর্ম্মফলে মনুষ্য অতলাদি অধস্তন তামস ভোগভূমি ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেখানেও ভজন সাধন নাই, কেবল ভোগদ্বারা কর্ম্মক্ষয়ই হইয়া থাকে। মনুষ্যদেহের বুদ্ধি-বৃত্তির অপব্যবহারফলে নিকৃষ্ট পাপকর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নরকযোনি প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল নরকযন্ত্রণাও ভোগ করিয়া থাকে। অল্পপাপের ফলে মনুষ্য ভূর্লোকেই তির্য্যগাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকে।

ভূর্লোকবাসী জীবের দেহের মত অল্পকালস্থায়ী না হইলেও স্বর্গাদিলোকের দেবতাদি-দেহও অনিত্য ও মর্ত্ত্য। যতদিন পুণ্যকর্ম্ম-ফলভোগ থাকে, ততদিনের জন্যই জীব দেবতাদিদেহ ধারণ করিয়া সেখানে থাকিতে পারে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা), অর্থাৎ পুণ্যক্ষয় হইলেই জীবকে পুনরায় পৃথিবীতে অন্য কর্ম্মফলভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্রীমদুদ্ধবকে একথাও বলিয়াছেন যে—

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাং।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ। ভাগ ১১।১০।২৯

অর্থাৎ ভোগস্থান স্বর্গাদি লোক ও কল্পজীবী লোকপালগণও কালরূপ আমা হইতে ভীত অর্থাৎ, যথাসময়ে নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি দ্বিপরার্দ্ধকাল-জীবী ব্রহ্মারও পরমায়ুর অবসান হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার এক দিবারাত্র দ্বিসহস্র-চতুর্যুগ-পরিমিতকাল, তাহাই এককল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ ৩৬৫ দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর, এবং এইরূপ ১০০ বৎসর-পরিমিতকাল ব্রহ্মার পরমায়ুকে দ্বিপরার্দ্ধকাল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যের এক বৎসরে সাধারণ দেবতাদিগের একদিন হইয়া থাকে; এইরূপ ৩৬৫ দিনে তাঁহাদের এক বৎসর গণিত হইয়া থাকে। সাধারণ দেবতাদিগের পরমায়ু এইরূপ ১০০ বৎসর মাত্র। এইরূপ ১২০০০ দেবপরিমিত বৎসরে এক চতুর্যুগ, অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ গত হয়। অতি দীর্ঘ পরমায়ুহেতু দেবতারা অমরপদবাচ্য হইলেও তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহাদের প্রতি যে অমর শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার ন নিষেধার্থ নহে, চিরার্থই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅবধূতসম্বাদে বর্ণিত হইয়াছে—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগ-দংশ মৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥ ১১।৯।২৮

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা বৃক্ষাদি স্থাবর এবং সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও মৎস্যাদি বিবিধ জীবদেহ রচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, পরে আত্মসন্দর্শনোপযোগী বুদ্ধিবিশিষ্ট নরদেহ নির্ম্মাণ করিয়াই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। শ্রীভগবানের আনন্দের

কারণ এই যে—এই নরদেহ পাইলে তাঁহার জীব তাঁহাকে জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

শ্রীভগবান্ নিজেও শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥
অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

ভাগ ১১।৭।২৩

অর্থাৎ একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও অপদ এই বহুবিধ জীবদেহ পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক মায়াদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে এক মনুষ্যদেহই আমার নিতান্ত প্রিয়। কারণ, এই মনুষ্যদেহের বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্ব জড় হইলেও স্বপ্রকাশ এক চৈতন্যস্বরূপ আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কখনও প্রকাশধর্ম্মলাভ করিতে পারে না, এইরূপ যুক্তি ও অনুমানাদি বুদ্ধিবৃত্তি-বলে মনুষ্যই তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বেশ্বর আমার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং সমাহিত-চিত্তে আমার দর্শনলাভ করিতেও সমর্থ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে—শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন যে মনুষ্যদেহেই জীব "যুক্তাঃ" অর্থাৎ ভক্তিযোগবন্ত হইয়া, "হেতুভিঃ" অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন দ্বারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপী আমার সন্ধান পাইয়া থাকে, কারণ আমি একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য। কেবল যুক্তি ও অনুমানাদি বুদ্ধিবৃত্তি বলে মনুষ্য অস্বতন্ত্র-কর্ত্তা জীবস্বরূপেরই অনুমান করিতে সমর্থ হয়, এবং স্বতন্ত্র প্রযোজক কর্ত্তা আমার অন্তর্যামী স্বরূপের ও কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার রূপ গুণ লীলা ও ঐশ্বর্য্যাদির অতর্ক্যতা হেতু তাহার একটিও তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। সে সকল কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিগ্রাহ্য, এবং এই ভক্তিযাজন কেবল মনুষ্যদেহেই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে একথাও বলিয়াছেন যে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণ-ধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

ভাগ ১১।২০।১৭

অর্থাৎ সর্ব্ববাঞ্ছিতফলমূল এই মনুষ্যজন্ম সুদুর্ল্লভ এবং সুলভ। অর্থাৎ চতুরশীতি-লক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ইহা একবার আপনিই লাভ হয় বলিয়া ইহাকে সুদুর্ল্লভ এবং সুলভ বলিয়াছেন। শতকোটি উদ্যমেও ইহা যথাসময় ব্যতীত পাওয়া যায় না, অথচ ইহা যদৃচ্ছাক্রমে কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবলে আপনিই লাভ হয়। এই মনুষ্যদেহ এক সুদৃঢ় তরীসদৃশ; ইহা কেবল মায়াসমুদ্র অতিক্রম করিবার জন্য। সাধু ও গুরুকে এই তরীর কর্ণধার করিলে আমি নিজেই অনুকূল বায়ুরূপে এই তরী চালাইয়া থাকি! যে মনুষ্যাধম এই দেহ পাইয়া ভজনসাধনদ্বারা মায়া অতিক্রম না করে সে আত্মঘাতীই হইয়া থাকে।

উদ্বন্ধনে, বিষপানে বা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করার নাম আত্মহত্যা নহে। আত্মহত্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মার অবনতি সাধন এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ বহু সৌভাগ্যের ফলে একবার লাভ করিয়া ইহার যথার্থ ব্যবহার না করিলে কিম্বা অপব্যবহার করিলে আবার তামসাদি চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে হয়; তাহাই বাস্তবিক আত্মহত্যা। মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য ভজন-সাধনে মায়া অতিক্রম করিয়া ভগবচ্চরণ পুনঃপ্রাপ্তি; তাহা না করিয়া অনিত্য ও তুচ্ছ বিষয়-ভোগের জন্যই তাহা ব্যয় করিলে ইহার অপব্যবহার করা হয়। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। সেই জন্যই কোন মহাজন নির্ব্বেদপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

মৃৎকুম্ভবালুকারন্ধ্রপিধানরচনার্থিনা।
দাক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খোহয়ং হন্ত চূর্ণীকৃতো ময়া॥

আমি বহু-সৌভাগ্যের ফলে এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মরূপ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খটি পাইয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি এই মহামূল্য শঙ্খটি পোড়াইয়া চুণ করিয়াছি; কেন জান? বলিতেও লজ্জা হয়, এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ভোগরূপ ক্ষণভঙ্গুর মাটীর কলসীর ছিদ্র রুদ্ধ করিব বলিয়া! ধিক্ আমায়! সহস্র-ছিদ্রময় দুঃখ-সঙ্কুল

বিষয়ভোগসুখ কেহ কখনও পূর্ণ করিতে পারে না, ইন্দ্রাদি দেবতারাও পারেন না। তাহার জন্য দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ব্যয় করা অপেক্ষা দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু বিষয়ভোগে যে সুখ হইয়া থাকে তাহা সকল যোনিতেই সমান, কোনও ভেদ নাই। দেবতা বা মনুষ্যদেহে বিষয় ভোগে যে সুখ হয়, নিকৃষ্ট শূকরাদি দেহেও ঠিক সেই প্রকার সুখই ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীশিহ্লন-মিশ্র বলিয়াছেন—

> ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্য চ সুখদুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং
> স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলুসুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্।
> রম্ভা চাশুচি শূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ
> সন্ত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোঽন্যভাবঃ সমঃ॥

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র ও অশুচি শূকর এই দুইজনের সুখ দুঃখে কোনও ভেদ নাই। দেবরাজের নিকট অমৃত যেরূপ রুচিকর, শূকরের নিকট বিষ্ঠা ঠিক সেইরূপই রুচিকর। দুইজনেরই রুচি স্বেচ্ছাকল্পিত। দেবরাজ দুগ্ধফেন-নিভ স্বর্গীয়-শয্যায় শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করেন, শূকর তাহার পঙ্কিল গর্ত্তে শুইয়া ঠিক সেই জাতীয় সুখই ভোগ করে। দেবরাজের নিকট রম্ভা যেরূপ প্রেমাস্পদ, শূকরের নিকট অশুচি শূকরীও ঠিক সেইরূপ প্রেমাস্পদ। মৃত্যুভয় দেবরাজেরও যেমন, শূকরেরও ঠিক সেইরূপ। পার্থক্য কেবল বিশিষ্টকর্ম্মফলজনিত উভয়ের বিষয়ভোগের বিশিষ্টতা, কিন্তু ভাব দুইজনেরই সমান। দুইজনেই বদ্ধজীব, দুইজনেই মায়ার শৃঙ্খলে বদ্ধ; একজন না হয় স্বর্ণময়ী শৃঙ্খলায় বদ্ধ ও আর একজন লৌহময়ী শৃঙ্খলায় বদ্ধ, বিশেষ কিছুই নয়। "স্বর্ণময়ী লৌহময়ী শৃঙ্খলা বা বদ্ধপতে ন বিশেষাঃ!"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছেন—

> সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
> সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ। ভাগ ৭।৬।৩

হে দৈত্যবালকগণ! দুঃখ যেমন জীবের যত্নব্যতিরেকেই আসিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সুখ ও জীবের দেহসংযোগে সকল জন্মেই দৈববশে লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে যে জাতীয় দেহলাভ হয়, তদনুযায়ী বিষয়সুখও তদ্দেহজাত দুঃখের মত আপনিই লাভ হয়। অতএব দৈহিক-সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-প্রতিকার প্রয়াসে বৃথা কালক্ষেপ করা মনুষ্যোচিত নহে।

শ্রীঅবধূত এই জন্যই যদুমহারাজকে বলিয়াছিলেন—

> লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
> নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ ১১।৯।২৯

অর্থাৎ অনিত্য হইলেও সকল পুরুষার্থের সাধনভূত এই অতিদুর্লভ মনুষ্যদেহ বহুজন্মের পর দৈববশে লাভ করিয়া, রোগাদি দ্বারা অভিভূত ও জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বশীভূত করিয়া অতি-সত্বর সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির জন্য মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য; কারণ, মৃত্যু সততই এই দেহের অনুসরণ করিতেছে, কখন আক্রমণ করিবে ঠিক নাই। মনুষ্যজন্মের ক্ষণকালও বিষয়-সম্ভোগে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিষয়ভোগ কোন যোনিতেই দুর্লভ নহে; অতি নিকৃষ্ট শূকরাদি পশু-যোনিতেও তদুচিত ভোগ্য-পদার্থের অসদ্ভাব নাই।

(ক্রমশঃ)

ওতপ্রোত।

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

যাদেরে তোমাকে না দেখি ভজিতে
সত্যই তারা কি ভজে না?
অথবা আমার ভক্তি নাই ব'লে
মোর মন তাহা বোঝে না?
দিবালোকে সব পেঁচক-পাখীরা
নয়ন মুদিয়া ভাবে।
তারা যদি কয়—সূর্য্য কিছু নয়
তা হ'লে তাই কি হবে?
আমি মনে করি আমি তোমা ভজি,
সে শুধু মনেই করা।
ভজন তো যত "মনকলা" খাই
অভিমানে বুক ভরা॥
অভিমানে শুধু অহংই ফুটিবে
নিরুপাধি জ্ঞান-ঢাকি।
চিন্ময়ানুভূতি গোবিন্দ স্ফূর্ত্তি
পায় না সেখানে থাকি॥
বুঝিলাম মোর ঘুচে নাই কভু
তোমাতে বিমুখ ভাব।
তোমাতে সর্ব্বদা উন্মুখ নহিলে
কেমনে হইবে লাভ॥
আমার যতনে, যাহাই করিব
তাই যদি হেন হয়।
তবে কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত
লাগিছে অন্তরে ভয়॥
(তাই) তোমারে যাহারা সকল সঁপিয়া
তন্ময় করেছে প্রাণ।
তাঁদের পদের ধুলিরাশি দিয়া
আমারে করাও স্নান॥
তবেই আমার ধুইয়া যাইবে
অনাদি বিস্মৃতি রোগ।
তবে সে দেখিব আব্রহ্ম-কীটাণু
তোমাতেই যোগাযোগ॥

সুখ কোথায় ?

[শ্রীঅমূল্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই মায়াময় জগতে নিখিল প্রাণীর নানা প্রকার বাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিকগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে—বাসনাদ্বারা বদ্ধ চৈতন্যই বিশ্বে সংসারী হইতেছে। বাসনাই বন্ধন-রজ্জু এবং উহা ক্ষীণ হইলে জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। যদিও প্রকৃতপক্ষে জীব-স্বরূপ একই, তথাপি কর্ম্ম এবং বাসনার বিচিত্রতায় সেই জীবস্বরূপ নানা রূপে প্রতীত হয়; অর্থাৎ পশু মনুষ্য ইত্যাদি বিবিধভাবে দৃষ্ট হয়। সংসারে বাসনাও নানা প্রকার দেখা যাইতেছে। অন্যান্য জাতি দূরের কথা শুধু মনুষ্য জাতির বাসনা লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মধ্যে বিচিত্রতার অন্ত নাই; যেমন কেহ সম্পদাদি, কেহ মাত্র একমুষ্টি চাউল আবার কেহ বা লক্ষ লক্ষ মুদ্রায়ও সুখী নয়। ইহাও আবার দেখা যায় যে, কোন কোন জন পরের উপকার-সাধনে নিজেকে সানন্দে বিসর্জ্জন দিতেছে, অথচ সেই মনুষ্যই আবার অপর একজনকে ব্যাধের মত হত্যা করিতেছে। ইহার মূল কারণটি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে—একমাত্র "সুখ"ই ঐ সকলের উদ্ভাবক। জীবের সমস্ত আকাঙ্খাই ঐ "সুখ"কে পাইবার জন্য। সুখের জন্যই জীবজগৎ উন্মত্ত। কীট, পতঙ্গ, পশু এবং মনুষ্য ইত্যাদি হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত সকলেই সুখের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রত্যেকেই বলিবে, আমরা সুখের বিনিময়ে ইন্দ্রত্বকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। এমন ভাবে তাহাকে চাই—যেন আর তাহার সহিত বিচ্ছেদ না হয়। যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে না পাইব সে পর্য্যন্ত কেবলই চাহিব। তাহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নাই আমরা তাহার অভাবে উন্মত্ত।

জন্মান্তর-গ্রহণও জীবের এই "চাই" এর অপূরণ-জন্যই। যেদিন এই "চাই"টির নিবৃত্তি হইবে, সেই দিনই জীব সুখী, মুক্ত, শান্ত ইত্যাদি যা কিছু। কি উপায়ে এই "চাই"টির নিবৃত্তি হইবে এবং কি কাজ করিলেই বা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হওয়া যাইবে, ইহার মীমাংসা করার জন্য জগতে যত দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব। কেননা সমস্ত দর্শনেরই মূল উপাদান,—চিরকালের জন্য দুঃখ-নিবৃত্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন-সুখপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করা।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখেই জীব চিরদুঃখী। কেহবা বলিয়া উঠিবেন যে,—কেন! বাতপিত্তশ্লেষ্মা-বিপর্য্যয়-জনিত আধ্যাত্মিক দুঃখ ঔষধাদির প্রয়োগে নষ্ট হইবে; পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি কৃত আদিভৌতিক দুঃখ যথোচিত আত্মরক্ষা করিলেই নিবৃত্ত হইবে; এবং শীতোষ্ণ বাত-বর্ষাদি আধিদৈবিক দুঃখ বেদোক্ত কর্ম্মাদি দ্বারা সেই সেই অধিদেবতার সন্তুষ্টিবিধান করিলেই নষ্ট হইবে; কাজেই সুখের জন্য এত দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং তদনুমোদিত যম, নিয়মাদি কঠিন কঠিন ব্যাপারের অনুষ্ঠানেরই বা কি প্রয়োজন? এই জন্যই সাংখ্যকার শ্রীভগবান্ কপিল-দেব বলিয়াছেন যে—

"দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্ট উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেও তাহা সাময়িক নিবৃত্তি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না।

তবে চিরবচ্ছিন্ন সুখ-প্রাপ্তির উপায় কি? তাঁহাকে না পাইলে আমাদের তৃপ্তি নাই, দুঃখের মুষলাঘাত আর সহ্য করা যায় না, সুতরাং তাঁহাকে আমাদের পাইতেই হইবে। বিশেষতঃ এই "সুখ"টিকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান পর্য্যন্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

"সুখ রূপ কৃষ্ণ করেণ সুখ আস্বাদন"

(চরিতামৃত)

সুখকে যখন পাইতেই হইবে—তাহাকে ছাড়া যখন জীবের হৃদয়ের পূর্ণতা হয় না, তখন সুখ জিনিষটি কি, ভালরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। ঐ একটি জিনিষকে পাইবার জন্য লালায়িত জীবের বাসনা বিচিত্রতার অন্ত নাই, অথচ ঐ বাসনাসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও একেরই অনুসরণ করে, ইহারই বা কারণ কি? এই বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সত্ত্বাদিগুণ-বৈষম্যই উহার একমাত্র কারণ। সাত্ত্বিক-প্রকৃতি মানবের যাহা সুখ, রাজসিকের কিন্তু সেটি নয়; আবার তামসিকের ইহা হইতে অন্য রকম। অতএব গুণবৈষম্য বশতঃ বিবিধ-বাসনাময়ী জীবপঙ্‌ক্তি স্ব স্ব বাসনা চরিতার্থ করিতে উল্লসিত হয় বটে কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ নহে। যদিও "উল্লাসাত্মক জ্ঞানই সুখ" তথাপি বুঝিতে হইবে যে কখনও ধর্ম্মসংসর্গ ভিন্ন তাহার প্রকৃত অনুভব হইতে পারেনা। সুখ তিন প্রকার যথা—১। অনুকূলবেদনীয়ং সুখং, ২। সত্ত্বং সুখং। ৩। পরার্থং সুখং, যেখানে এই তিনটি বিরাজ করে সেইখানেই প্রকৃত সুখ।

প্রীতি এবং করুণা-বৃত্তির পরিপূরণেই ত্রিবিধ ধর্ম্মাত্মক সুখ সম্পাদিত হয়। বিশ্বের সমস্ত সৎসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—প্রীতি এবং করুণা বৃত্তিই তাহার মূল উপাদান। যে সাহিত্যিক স্বীয় প্রবন্ধে এই প্রীতি এবং করুণা-বৃত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অমর সাহিত্যিক রূপে জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্যই জগতে চিরপূজ্য। পরসুখ-তাৎপর্য্যই প্রকৃত প্রীতি এবং করুণাবৃত্তির উদ্ভাবক, অথচ বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণই ইহাকে প্রকাশ করিতে অথবা ইহার অনুভূতি দান করিতে সক্ষম হয়। এই বিশ্ব সংসার ত্রিগুণমিশ্র, সুতরাং এখানে বিশুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি খুঁজিয়া পাওয়া সুদুষ্কর। পূর্ণ পরার্থতাও পাওয়া অসম্ভব। বিশুদ্ধ প্রীতি এবং করুণাবৃত্তির অনুসন্ধানও এখানে মিলিবেনা। যদিও কবিগণ রচনা করিয়াছেন, তথাপি তাহা শুধু কল্পনা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই দার্শনিক-গণ তাদৃশী প্রীতি এবং দয়াবৃত্তিকে পূর্ণ-সুখরূপে স্বীকার করেন নাই। আমাদের বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ কিন্তু বিশুদ্ধ-সত্ত্বের অপ্রাকৃতময়ী কোন একটি প্রীতি এবং করুণা-বৃত্তির সংবাদ দিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন যে—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ" (চরিতামৃত)

শ্রীভগবানের লীলা-অবলম্বনেই প্রীতি এবং করুণা-বৃত্তির অনুভব হওয়া সম্ভব। অন্যত্র যে উহা একান্ত অসম্ভব তাহা না বলিলে অবশ্যই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। সমস্ত লীলার মুকুটমণিস্বরূপ ব্রজলীলা; এবং এই ব্রজলীলার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আস্বাদনেই ঐ বৃত্তিদ্বয়ের অনুভব হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাব্রজলীলারই পরিশিষ্ট লীলা, এই দুই লীলা তত্ত্বতঃ অভিন্ন; সুতরাং ব্রজলীলা বলিতে গৌরাঙ্গ-লীলা পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীভগবানের ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে—এখানে পূর্ণ পরার্থতা সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, কেননা ভগবান্ নন্দব্রজে যত কিছু লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই শুধু নানাভাবে ব্রজজনকে সুখী করা; আর ব্রজজনেরও উদ্দেশ্য কেবল তাঁহাকেই সুখী করা। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের এত গভীর অনুরাগ ছিল যে—শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কার্য্য জগতে আছে অথবা থাকিতে পারে বলিয়া তাঁহারা জানেনেই না!

অতএব ব্রজবাসীগণ জীবকে নিরবচ্ছিন্ন-সুখের অধিকারী হইবার জন্য জগতের সম্মুখে তাঁহাদের চির-মধুমাখা পূর্ণ পরার্থময় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সম্মুখে একটি আদর্শ না পাইলে জগতে কেহই কোন কাজ করিতে করিতে পারেনা; উন্নতই হউক্ আর অধঃপতিতই হউক্ আদর্শই জীবের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক ভক্তগণ জগতের সম্মুখে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলেই জীব 'সুখী' হইতে পারিবে। বিশেষতঃ সাধুপুরুষগণ শ্রীভগবানের সেবায় নিরবচ্ছিন্ন-সুখের আস্বাদন করিয়া, তাঁহাদের সেই "আস্বাদনের পথ" জগতের জন্যই আদর্শরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন যে—

"ভবৎপদাম্ভোরুহ নাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্।" (শ্রীভাগ০ ১০-২-২৫)

(হে ভগবান্! আপনি ভক্তজনের প্রতি পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার চরণরূপ তরণীর সামীপ্য-মাত্রেই ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হয় এবং ভক্তগণ অনায়াসে তাহা পার হইয়া, পরবর্ত্তীদিগের জন্যই উক্ত চরণতরণী রাখিয়া যায়েন।) ব্রজবাসীর আদর্শ অনুসরণ না করিলে এবং সেই আদর্শ-অনুসরণকারী ভক্তের কৃপা না হইলে, কখনও সুখী হইতে পারা যায় না। ইহার মধ্যে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে—"দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবৃত্তি করিবার প্রবল প্রবৃত্তিকে দয়া বলে, সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ দেখিয়া পরম কারুণিক শ্রীনন্দদুলালের হৃদয় গলিয়াছে এবং সত্য সত্যই যেন ভালবাসার কাঙ্গাল হইয়া, পরব্রহ্ম বিভু ভগবান্ নানা প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভালবাসিতে এবং নিজের পরম মধুর ভালবাসা দিয়া চিরদুঃখী জীবকে সুখী করিতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার প্রমাণ রহিয়াছে যথা—

"বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য"
ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবত ১০-২-২৩)

("হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য মূর্ত্তিসকল ধারণ করিয়াছেন।")

অতএব ভগবৎপ্রকাশিত যে কোন বিগ্রহের সেবা দ্বারাই আমরা সুখী হইতে পারিব? তবে আর ব্রজবাসীর অনুসরণের কি প্রয়োজন? উত্তরে ভক্ত পণ্ডিত বলিবেন যে—হাঁ, সবই ঠিক বটে, কিন্তু আনুগত্য ভিন্ন জগতের কোন মহৎ কার্য্যই কেহ সাধন করিতে পারে না—যেমন একটি সাধারণ ঘট তৈয়রী করিতে হইলেও কুম্ভকারের আনুগত্যের প্রয়োজন হয়। তেমনই ব্রজভাবের আনুগত্য না হইলে ঐ বিগ্রহ-সেবার মাধুর্য্য উপলব্ধি হইবে না, মাধুর্য্য উপলব্ধি না হইলে সুখ জিনিষটি যে কি, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। কারণ ব্রজভাবের আনুগত্য অবলম্বন না করিয়া অন্য যে কোন ভাবে তাঁহার সেবা করিনা কেন, তাহাতেই স্বসুখকল্পনা আসিয়া পূর্ণপরার্থ-বৃত্তিটি নষ্ট করিয়া দিবে। ব্রজের গোপ এবং গোপীদিগের ভাব দূরের কথা, তথাকার পশু, পক্ষী, কীট. পতঙ্গাদি স্থাবর বৃক্ষ পর্য্যন্তও শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা এবং তদনুকূল কার্য্য ভিন্ন নিজেদের স্বতন্ত্র কোনরূপ সুখের কল্পনাই তাঁহারা করিতে জানেন না। পরার্থতাই তাঁহাদের জীবনের মূল উপাদান। যখন পূর্ণ পরার্থতা ভিন্ন কিছুতেই "সুখী" হওয়া যায় না, তখন "সুখী" হইতে হইলে পূর্ণপরার্থতা-ভাবের আনুগত্য স্বীকার করাই শ্রেষ্ঠ পথ, অথচ ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণেতে প্রেমই এই বিশুদ্ধ-পূর্ণপরার্থভাবের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

অতএব যেখানে ব্রজবাসীর আনুগত্যে ভগবৎসেবা সেইখানেই "সুখ"॥

জয়দেব।

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী

কোন অতীতের শুভদিনে হায়
বেজেছিলো তব অন্তরে।
আকুল প্রেমের মধুময়ী গীতি
মেঘমেদুর অম্বরে॥
জগতের পতি উঠেছিলো জাগি
তোমার করুণ বন্দনে।
লইতে তোমার প্রেম-উপহার
সিক্ত ভকতি চন্দনে॥
তমাল-কুঞ্জ মুখর করিলে
শারিকা শুকের দ্বন্দ্বে গো।
বরষার প্রাতে শ্যামল আকাশে
বাজাইলে নবছন্দ গো॥
মুগ্ধ ময়ূর উঠিল নাচিয়া
তোমারি সে মধুগান শুনে।
ভকতের প্রাণে অমিয়া ঢালিলে
প্রেম-গীতিকার স্পর্শনে॥
করুণ-কণ্ঠে ভিক্ষা মাগি হে
পদ্মাহৃদয়-নন্দন।
শ্যামপদে যেন দিতে পারি ওগো
ভকতি-বাসিত চন্দন॥

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

(৯)

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

"ভক্তি" বা পূর্ণতম চিৎ-সাম্মুখ্য দ্বারা জীব কৃষ্ণসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন সেই প্রিয়তমের সম্পর্কে কেবল যে আত্মবস্তুই প্রিয় হয় তাহা নহে,—আত্ম অনাত্ম নিখিল বিশ্ব চরাচরই তৎকালে ভক্তের নিকট পূর্ণসুখ স্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির উদয়ে, জীবের হৃদয়-দুয়ারের জড়ত্ব-অর্গল সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইবা মাত্র, সেই পূর্ণ রসোৎস-উৎসারিত পরমানন্দের মধুরধারা, জীবাত্মাকে পরিসিঞ্চিত করিয়া, তাহার অন্তরের অনাবিল পথে বহিতে থাকে,—যাহার প্রভাবে সকল ভুবন প্রেমময় ও মধুময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম "ভক্তভাব" বা "ভাগবতপদ"—ইহাই জীবের পূর্ণ স্বরূপতা। এই অবস্থার উদয়ে জীবের নিকট "বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে"—নিখিল বিশ্বই পূর্ণ-সুখস্বরূপে অনুভূত হয়; সুখ ব্যতীত—আনন্দ ব্যতীত তখন সে হৃদয়ে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না; কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোনও পদার্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্ত প্রেম ও মাধুর্য্যময় তদীয় প্রিয়তমের সম্বন্ধ-সিক্ত নিখিল ভুবনই যেন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠে; আর সেই সকল মাধুর্য্য ও প্রিয়তার উৎসরূপে তাহার মধ্যকেন্দ্রে দণ্ডায়মান যিনি, সেই বেণুবাদন-তৎপর গোপ-কিশোরের তরুণ তমাল হইতেও স্নিগ্ধ-শ্যামল শ্রীমূর্ত্তিখানিই নিজ প্রাণ কোটি হইতেও অতি—অতি প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়! অন্ধকার আর যেখানেই থাকে থাকুক, কিন্তু জ্বলন্ত মশালের সহিত যেমন তাহার কখনও সাক্ষাৎকার হয় না, সেইরূপ ভক্তির স্নিগ্ধালোকে যে হৃদয় একবার উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহার সহিত পরমানন্দ ব্যতীত আর কখন দুঃখাভাসেরও সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; ইহাই জীবের পূর্ণ স্বরূপভাবে অবস্থান। ভক্তত্বই জীবের সেই পূর্ণ স্বরূপতা। জীবের ভক্তত্ব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির অবস্থা বিষয়ে শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈ র্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ যিনি গুরু ও শাস্ত্র প্রসাদে পরমেশ্বরকে বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর দেহদৈহিক মমতাপাশ থাকে না; পাশ না থাকায়, তজ্জন্য কোন ক্লেশও থাকে না; ক্রমে জন্মমৃত্যু নিবারিত হইয়া যায়। তাদৃশ পাশ-বিমুক্ত জীব, যদি ভোগের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু গ্রহণও করেন, তাঁহাকে জন্মাদি নিমিত্ত দুঃখ অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের নিরন্তর স্মরণে লিঙ্গশরীরাদির বিনাশ হয় এবং চান্দ্র ও ব্রাহ্মপদ অপেক্ষা তৃতীয় যে শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, প্রাকৃত-গন্ধাস্পৃষ্ট ভাগবতপদ, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ভাগবতপদ-প্রাপ্তিতে সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

জীবের পূর্ণতম স্বরূপভাব বা ভাগবতপদ-প্রাপ্তির আনন্দের কিঞ্চিৎ আভাস, শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে শ্রীভগবানের নিজোক্তি; যথা—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রাধিষ্ণ্যং
স সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগ সির্দ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

অর্থঃ—আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্ত, আমাকে ভিন্ন, অন্য ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌমত্ব কিম্বা পাতালের আধিপত্য, অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি, কিছুই ইচ্ছা করেন না।

অধিক কথা কি,—ভাগবতগণ ভক্তি বা ভগবৎসেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া, মায়িক ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোকাদির প্রাকৃত সুখ ত দূরের কথা, তৎসকাশে অপ্রাকৃত সালোক্যাদি ভগবত্তুল্য সুখও অল্প বলিয়া বোধ হওয়ায়, তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; তবে যে সকল ভক্তকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কেবল সেবা-সুখ প্রাপ্তির অনুরোধেই জানিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে নিজ মুখেই এই কথা বলিয়াছেন;—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।*
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতঃ)

অর্থাৎ হে জননি! নিষ্কাম ভক্তিযোগীদিগকে সালোক্য, (আমার সহিত একত্র বাস) সার্ষ্টি, (আমার সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য, (আমার সান্নিধ্য) সারূপ্য, (আমার সমান রূপ) এবং একত্ব (সাযুজ্য) দিতে চাহিলেও, তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন এ সকলের কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না।

জড়-সাম্মুখ্য বা চিৎ-বৈমুখ্য অবস্থায় স্বপ্নময় জীবাত্মার প্রতিবিম্ব ও আভাসের সংস্পর্শে অনাত্মবস্তু সকলে "আত্মীয়" বুদ্ধির উদয়ে, জড়ীয় বিষয় সকল প্রিয় হয়; কিন্তু স্বরূপভাব-প্রাপ্ত জীবের ভগবৎ-সাম্মুখ্য বশতঃ দৃষ্টিরও স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে; সুতরাং তখন আত্ম-সম্বন্ধে কোনও বিষয় আর "আত্মীয়" বা "আমার" বলিয়া মনে হয় না; তখন স্থাবর, জঙ্গম,—বিশ্ব চরাচর যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সমস্তই,—আত্ম-অনাত্ম সর্ব্ববিষয়ের মূল কারণ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ বা পূর্ণতম পরমাত্মার সম্পর্কে "পরমাত্মীয়" বা "শ্রীকৃষ্ণের" বলিয়া বোধ হওয়ায়, পূর্ব্বের অবিদ্যা-বাধিত প্রিয়তা হইতে, তাহা প্রিয়তরই হইয়া থাকে। জড়-সাম্মুখ্য বা বিরূপতার অপনোদন এবং চিৎ-সাম্মুখ্য বা স্বরূপতার প্রাপ্তি নিবন্ধন, তৎকালে দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা, স্বজন, সম্পদাদি কোন বিষয়েই আর ভ্রান্ত "আমার" বা "আত্মীয়" বোধ থাকিতে পারে না,—তখন নিজেকেও যেমন "তাঁহার" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বলিয়াই মনে হয়, তেমনি তৎসহ ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সৈকত, সিন্ধু, নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর ও কীটানু হইতে ব্রহ্মা অবধি চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই প্রাণকোটী-প্রিয়তম কৃষ্ণ-সম্পর্কিত-রূপে পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তখন সকলই "শ্রীকৃষ্ণের" বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ও সেই চিরসুন্দর—চিরমধুর—চির-রসস্বরূপের সম্বন্ধে, সকলই সুন্দর—সকলই মধুর ও সকলই পূর্ণ-সুখস্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। নব অনুরাগিনী কান্তার নিকট, তরুণ কান্তের সুখ-সম্বন্ধ-সিঞ্চিত তদীয় গৃহ, পরিজন, বসন, ভূষণ, শয্যা ও আসনাদি সমুদয় বস্তুই প্রিয় ও মধুর বলিয়া অনুভূত হইলেও, যেমন সেই প্রতি অনুভূতির মধ্যে সকল প্রিয়তা ও সকল মাধুর্য্যকে পরাভূত করিয়া কান্তের প্রিয়তম মুখচ্ছবিই জাগিয়া উঠে, সেইরূপ মহাভাগবতগণের শুদ্ধ দৃষ্টিতে—কৃষ্ণসম্বন্ধে সকল ভুবন প্রিয়তায় ও মধুরতায় ভরিয়া উঠিলেও, প্রত্যেক মাধুর্য্যের মধ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়া, সকল প্রিয় হইতে প্রিয়তম—সকল মধুর হইতে মধুরতম সেই কৃষ্ণমুখ-চন্দ্রমা স্ফুরিত হইতে থাকেন।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥" (শ্রীচরিতামৃত)

জীবের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় মহাভাগ্য-সাপেক্ষ—"ভক্তভাব" বা "ভাগবতী-বৃত্তির" উদয়ে, তদীয় বাহ্য আকৃত্যাদি ও ব্যবহারাদি দর্শনে, বহির্ম্মুখ জীবের অবিদ্যা-কলুষিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে উহা দুঃখ, দারিদ্র্যাদি পীড়িত অনভীপ্সিত অবস্থাবিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এবং তন্নিবন্ধন সাধারণ জীব কর্ত্তৃক সেই ভক্ত উপেক্ষিত বা অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া বিবেচিতও হইতে পারেন,—যেহেতু চিৎ-বহির্ম্মুখজীবের জড়ীয় বৃত্তির সমক্ষে চিদানন্দ বিষয়ের অপ্রকাশতাই স্বাভাবিক; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভক্তিরস-পরিসিঞ্চিত ভক্তের সেই অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবিল আনন্দ, কেবল তাঁহারই বা তৎসদৃশ ভগবৎ-সাম্মুখ্যপ্রাপ্ত ভক্তগণের পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই বিষয় হইয়া থাকে। একই মৃত্তিকায় অবস্থিত নিম্ব ও খর্জ্জুর বৃক্ষদ্বয় যেমন পরস্পর বৃত্তিভেদে একই মৃত্তিকা হইতে তিক্ত ও মধুররস গ্রহণ করে; বিশাল ধরিত্রীবক্ষে তিক্তরস ব্যতীত কোথায়ও যে মিষ্টরস আছে, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা নিম্ববৃক্ষের যেমন থাকে না, এবং অন্য পক্ষে মধুরতা ব্যতীত বসুন্ধরার বুকে যে কোথায়ও কোন তিক্ততা আছে, একথা খর্জ্জুর-বৃক্ষের নিকট যেমন গ্রাহ্য হয় না, সেই প্রকার ভগবৎ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত ও জড়-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত জীববিশেষের বৃত্তিবিশেষে যথাক্রমে নিরানন্দ ও আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, ইহাই জানিতে হইবে।

ভাগবতগণেরও সময়ে সময়ে যে ব্যবহারিক দুঃখাদি ভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্ম-বন্ধনের জন্য নহে;

সুতরাং সেজন্য তাঁহাদের কোনও দুঃখস্পর্শ হয় না। বিড়ালী যেমন নিজ শাবককে দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিলেও তন্নিবন্ধন সুখ ব্যতীত মার্জ্জারশিশুকে যেমন দুঃখলেশও অনুভব করিতে হয় না, কিন্তু মূষিকাদির পক্ষে তদবস্থা নিদারুণ দুঃখকরই হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মপাশবদ্ধ জীবের ন্যায় কর্ম্মপাশমুক্ত ভক্তগণকেও এই বিনশ্বর দেহ ধারণকাল পর্য্যন্ত, বাহ্যতঃ একই দশাগ্রস্থ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সেজন্য কর্ম্মপাশ বদ্ধ জীবই দুঃখযুক্ত হয়, এবং স্বরূপভাব-প্রাপ্ত ভাগবতগণ, সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাবস্থায় সুখময়ই হইয়া থাকেন

যে সুখবিন্দুর অন্বেষণে জীবমাত্রেই অনাদিকাল হইতে অহর্নিশ কতই ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছে,—সেই সুখের অতল—অনন্ত ও অনাবিল সিন্ধুর সাক্ষাৎকার, কেবল ভক্তির উদয়েই সম্ভবপর হইয়া থাকে,—এবং যাহার প্রাপ্তিতে জীবত্বেরও সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে। ধন-ধান্যাদি জড়-বিষয়-সকলকে অপেক্ষা করিয়া যে সুখপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যথার্থ "সুখ" নহে—"সুখাভাস" মাত্র। সুখের সন্ধান জানিনা বলিয়া, যাহা সুখাভাস তাহাই আমাদের নিকট "সুখ" নামে পরিচিত বিষয়। যে পর্য্যন্ত আমরা "সুখ" ভ্রমে "সুখাভাসের" কামনা করিব, সে পর্য্যন্ত সুখাভাস-প্রাপ্তির জন্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্যাদি বিষয়কে অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হইবে, যেহেতু অনাত্ম-বিষয়ে প্রতিবিম্বিত সুখ বা আত্মভাবের নামই সুখাভাস; সুতরাং অনাত্মবিষয়কে অপেক্ষা না করিয়া সুখাভাস প্রাপ্তির উপায় নাই; কিন্তু যাহা পরমানন্দ—পরম সুখ, তল্লাভের নিমিত্ত নশ্বর ধন সম্পদাদি কোনও বিষয়কে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই; রাজ-চক্রবর্ত্তীই হউন বা কুক্কুরাদি সহ পথিনিক্ষিপ্ত অন্ন ভোজীই হউন্—ধনী, দরিদ্র, উচ্চ নীচ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, এমন কি জীব মাত্রেরই উহাতে অধিকার আছে; কেবল মুখ ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়া সেই পরমানন্দকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিতে পারিলেই হইল; যেহেতু তাহাই নিত্য ও সুখময় পদার্থ, তাহাই জীবের চিরআত্মীয়, স্বজাতীয় ও স্বাভাবিক বস্তু। অসার ও অনিত্য সুখাভাসকে প্রাপ্ত হইতে হইলে বিষয়-প্রাপ্তির একান্ত প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই চিরাকাঙ্খিত পরমসুখ—পরমানন্দ-সিন্ধুর অতল তলে চির-নিমজ্জিত থাকা, কেবল চিৎ-সাম্মুখ্য—ভগবৎ-সাম্মুখ্য—কৃষ্ণসাম্মুখ্য ঘটিলেই যে কোন জীবের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হইতে পারে, একথা অভাবগ্রস্ত—দুঃখিত জীব মাত্রেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অমলা ভক্তির উদয়ে পূর্ণ স্বরূপভাবপ্রাপ্ত জীব বা ভাগবত-গণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকিলেও তৎকালে শ্রীভগবৎ-প্রীতি লালসায় তদীয় অনুকূলতাময়ী সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আত্ম-সুখের অনুমাত্রও সন্ধান থাকে না; এমন কি, সেই প্রাপ্ত-সুখের প্রাবল্যে, যদি প্রাণকোটী প্রেষ্ঠ—আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোনও বাধ হয়, তবে কেবল তৎ-কালেই সেই প্রাপ্ত সুখের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য পতিত হইয়া, তাঁহারা আত্ম-সুখকে কৃষ্ণ-সেবায় বিঘ্ন বোধে ধিক্কার পূর্ব্বক উহাকে নিদারুণ দুঃখের মতই পরিহার করিতেও ইচ্ছা করেন,—শুদ্ধাভক্তির এমনই স্বভাব! এই অবস্থায় একমাত্র ভগবৎ-সুখবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনও আত্মসুখবাঞ্ছা থাকে না, বা থাকিবার প্রয়োজনও হয় না। "সুখবাঞ্ছা নাই সুখ হয় কোটীগুণ।" (শ্রীচরিতামৃত)। পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তির ইহাই প্রকৃত অবস্থা ও ইহাই প্রকৃষ্ট লক্ষণ। পূর্ণা-নন্দ প্রাপ্ত জীবের পক্ষে যে (১) আত্ম-সুখাভিপ্রায় থাকে না, এবং (২) থাকিবার প্রয়োজনও হয় না তাহার দুইটী হেতু যথাক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে;—

১। পরিপূর্ণ সুখের ইহাই স্বাভাবিকতা।

যেখানে অভাব নাই—ন্যূনতা নাই, সেখানে তৎপ্রাপ্তির জন্য বাঞ্ছা বা কামনাও নাই; আর যেখানে অভাব বা অপূর্ণতা সেখানেই বাঞ্ছা—সেইখানেই কামনা; যে সুখের মধ্যে অভাব আছে—অল্পতা আছে,—যেখানে আরও সুখ চাহি-বার প্রয়োজন আছে, সেখানে সুখস্পৃহা সেখানে অস্থিরতা অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু যে সুখের মধ্যে অল্পতা নাই—অপূর্ণতা নাই—অধিক চাহিবার নাই, তাহাই পূর্ণ সুখ বা পরমানন্দ, তাহাই প্রকৃত শান্ত অবস্থা। সেই পরমানন্দরসে নিমজ্জিত যিনি,—পূর্ণ-স্বরূপ-ভাব প্রাপ্তি নিবন্ধন পূর্ণ-সুখ-সাগরে নিরন্তর পরিস্নাত যিনি, তাঁহার পক্ষে আর কোনও সুখের অভাব—সুখের সন্ধান থাকিতে পারে না; এই জন্যই ভগবৎ-ভক্তের আত্মসুখ বাঞ্ছা না থাকায়, তাঁহাদিগ-

কেই পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ—অতএব শান্ত বা স্থিরতা প্রাপ্ত বলিয়াই জানিতে হইবে; যেহেতু পরিপূর্ণ সুখপ্রাপ্তির নিষ্কামতা বা স্থিরতাই স্বাভাবিকতা।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥"
(চরিতামৃত)

২। কারণের সুখ-সাধনেই তৎ-কার্য্যের প্রকৃষ্ট সুখ-পোষকতা।

ভক্তির আলোকে ভগবৎ সাম্মুখ্য প্রাপ্ত ভক্তের অনাবিল ও অভ্রান্ত দৃষ্টির সমক্ষে সকল বিষয়েরই পূর্ণ-স্বরূপ জাগিয়া উঠে; এই হেতু ভক্তগণই সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন, কার্য্যস্থানীয় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সুখ-সাধন প্রয়াস বা আত্ম-সুখ তাৎপর্য্য পরিশূন্য হইয়াও, কেবলমাত্র তৎকারণ-স্থানীয় শ্রীভগবানের সেবা দ্বারা, ভগবৎ-প্রীতির আনুষঙ্গ বা গৌণ ফলেই যখন তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎ-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও কেবল ভগবৎ-সুখ তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের কোনও সার্থকতা বা আবশ্যকতা বোধ, ভক্তের শুদ্ধচিত্তে সমুদিত হয় না।

কার্য্যের স্বতন্ত্র প্রীতি-সাধন প্রয়াস অপেক্ষা, তৎ-কারণের প্রীতি-সাধন দ্বারা কার্য্য ও কারণ উভয়েরই সম্যক্ প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-তাৎপর্য্য হৃদয়ে লইয়া, অনুকূলভাবে একমাত্র তাঁহারই সেবন দ্বারা তৎকার্য্য স্থানীয় নিখিল ভুবনের সহিত ভক্তগণ নিজ আত্মাকেও পরিপূর্ণ সুখময় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আত্মসুখ তাৎপর্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এবং সুখসন্ধানের পরিবর্ত্তে সুখ-বিস্মরণই পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ; তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

অর্থাৎ, যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত—অর্থাৎ পুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের তর্পণেই ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলেই সকল আত্মা ও সকল ভূতের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-বৈমুখ্য বা জড়ত্ব-প্রাপ্ত জীবের জড়ীয়-বুদ্ধিবৃত্তির নিকট আত্মসুখ তাৎপর্য্যই সুখ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে; কিন্তু এই প্রসিদ্ধি,—সুখ-লাভের এই পন্থা যে দোষদুষ্ট ও মায়া-বিজৃম্ভিত,—তাহা কেবল ভক্তের শুদ্ধ বুদ্ধিতেই পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। ভুক্তি বা মুক্তিকামী—কাহারও পক্ষে এই অবিদ্যার প্রহেলিকাকে সম্পূর্ণরূপে ভেদ করা সম্ভব নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বা স্ব-সুখ তাৎপর্য্য রূপ কৈতব বা অজ্ঞানতা-সংস্পৃষ্ট। কার্য্যস্থানীয় আত্মার সুখাভিপ্রায় ব্যতীত, মুখ্যভাবে কারণাত্মক শ্রীভগবৎ-প্রীতি-বাঞ্ছার কোনও সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম—এই পুরুষার্থত্রয় বা ভুক্তীচ্ছার মধ্যে, আত্ম-সুখ তাৎপর্য্যক—দুঃখ পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির বাসনা স্পষ্ট রূপেই প্রকাশ রহিয়াছে; আর মোক্ষ নামক চতুর্থ পুরুষার্থ বা মুক্তীচ্ছা যাহা,—তাহার সিদ্ধাবস্থায়, জীব-ব্রহ্মৈকভাব উদিত হওয়াও, তৎকালে আত্মার বাঞ্ছাদি-ধর্ম্মের বিলীনতা নিবন্ধন, আত্মসুখেচ্ছা প্রকাশের অসম্ভাবনা বশতঃ উহা অলক্ষিত থাকিলেও, যখন তৎসাধনকালে, স্বীয় দুঃখ নিবৃত্তির অভিপ্রায় মুখ্যভাবে ও স্পষ্টাকারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন মোক্ষাভিসন্ধির অন্তরালেও যে স্বসুখ-তাৎপর্য্য সূক্ষ্মরূপেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবের ভুক্তি বা ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তি বা মোক্ষবাঞ্ছা—স্পষ্টাস্পষ্ট যে ভাবেই হউক, উক্ত উভয়বিধ অভিপ্রায়ই যে আত্ম-প্রীতিবাঞ্ছাসংজাত ও স্বসুখ-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থই যে অল্পাধিক অজ্ঞানতা বা কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট, সুতরাং অকৈতব কৃষ্ণ-ভক্তি পথের বাধক-স্বরূপ, পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার, শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন।—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥”

ভক্ত বা ভাগবতগণের যাহা স্বভাব,—তাহারই নাম ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্মসুখ স্পৃহাশূন্যতা অপর কোন অবস্থায় সম্ভব হয় না; সুতরাং ভাগবত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষার্থই কৈতব-শূন্য নহে। ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে,—ভক্তিভাবের উদয়ে “প্রীতিবাঞ্ছা” জীবাত্মাকে অতিক্রম করিয়া তৎকারণাত্মক পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপের চরণারবিন্দে সংলগ্ন হওয়ায়, ভক্তিই কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব-কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। ভক্তের পুরুষার্থ—ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে পঞ্চম যে ভগবৎপ্রীতি,সেই ভগবৎপ্রীতিতেই সীমা প্রাপ্ত হওয়ায়,উহাকে “প্রেম” বা “পঞ্চম-পুরুষার্থ” বলা হইয়া থাকে। অতএব যাহা পুরুষার্থ হইতে পঞ্চম স্থানীয়, কেবল তাহাই আত্মসুখতাৎপর্য্যকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই প্রেম-ভক্তি ব্যতীত যে আর কিছুই অকৈতব নাই, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা—

ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎ-
সরাণাং সতাম্”—(ইত্যাদি)

তাৎপর্য্যঃ—প্রস্তাবিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই পরম ধর্ম্মটি কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন; “প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ” (প্র+উজ্ঝিত+কৈতব) অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে কৈতব যাহাতে। শ্রীধরস্বামিপাদ “প্র”শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—“প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।” অর্থাৎ মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব পর্য্যন্তও যাহাতে নাই—এই শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম এতাদৃশ অকৈতব; সুতরাং ইহাই মৎসর-রহিত সাধুগণা-চরিত পরম ধর্ম্ম।

শ্রীভগবৎগুণ-লীলাদি প্রসঙ্গরূপ প্রস্ফুটিত কমল-কহ্লার-শোভিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম, কেবল ভক্ত-মরালগণেরই বিহার-দির্ঘিকা। জীবের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পূর্ণতম স্বরূপই “ভক্তত্ব” বা “ভাগবতভাব”। জীবের পূর্ণতম বা পরম-ধর্ম্মই “ভক্তি” বা “ভাগবত-ধর্ম্ম”। জীবের জড়ভাব বা জড়ত্ব’ হইতে চিদ্‌ভাব বা “জীবত্ব” শ্রেষ্ঠতর অবস্থা হইলেও “ভক্তত্বেই” জীবের অভিব্যক্তির অবসান; অতএব জীবত্বই জীবের স্বরূপ নহে—ভক্তত্বই জীবের পূর্ণতম ও বিশুদ্ধ স্বরূপ; এইজন্য ভক্তের অপর নাম “শুদ্ধজীব”। আবার জীবের যাহা পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ স্বভাব,—জড়ত্বজনিত দুঃখ-নিবৃত্তির পর, পরমানন্দপ্রাপ্তিতেই উহা পর্য্যবসিত নহে;—প্রাপ্ত সুখের সকল সন্ধান বিস্মরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্নতাই জীবের পরিশুদ্ধ বা পূর্ণতম স্বভাবের প্রতিষ্ঠা-স্থল। এক কথায় জীবের স্বরূপ—স্বভাব বা স্বধর্ম্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি যাহা—তাহারই নাম “কৃষ্ণদাস”।

“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।”—
(চরিতা [illegible])

জীবের এই পূর্ণতম স্বরূপ বা ভক্তত্বের বিকাশে, পূর্ব্বোক্ত পুরোবর্ত্তী আত্ম সুখের সকল প্রসঙ্গই তখন পশ্চাৎ-বর্ত্তী বা অবসান প্রাপ্ত হইয়া, এ স্থান হইতে অতঃপর কেবল ভগবৎসুখ-তাৎপর্য্যময় প্রসঙ্গই পরিগীত হইতে থাকে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পবিত্র অগুরুগন্ধে ভক্তের হৃদয়-মন্দির পূর্ণিত থাকায়, সেখানে আর আত্ম-সুখরূপ পূতিগন্ধের কোনও সন্ধান মিলে না। আত্ম-সুখাভিপ্রায়—সে ত দূরের কথা, যে জন্ম-মরণরূপ ভববন্ধন ছিন্ন করাই মুমুক্ষুগণেরও মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচিত, সেই ভয়াবহ সহস্র সংসার-দুঃখ গ্রহণ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা—ভগবৎপ্রসঙ্গাদি হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচ্যুত হইতে না হয়, তবে আত্মসুখানুসন্ধান-রহিত ভাগবতগণ সে দুঃখকেও বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ভক্তগণের পক্ষে সকল অবস্থাতেই পূর্ণ সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভবের কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহারা কিন্তু ইহার কোনও সন্ধান রাখেন না।)

তাই ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিতেছেন ;—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি। ইত্যাদি

অর্থাৎ হে নাথ! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, (তাহাতে ক্ষতি নাই) তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।—ইত্যাদি।

এই সুরেই সুর মিলাইয়া ভক্ত বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন ;—

"কি এ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীটপতঙ্গ
করম বিপাকে গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥"

ইহারই নাম আত্ম-সুখানুসন্ধান-শূন্যা ও ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী ভক্তি। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তই উহার অভিব্যক্তির প্রারম্ভাবস্থা এবং পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তেই সেই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তির পূর্ণতার পর্য্যবসান।

দেহ ত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা (অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি ; যথা—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশে বিসন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তাল বৃন্তেঽনিলঃ॥
(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আর না আগমন করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতি কষ্টে আর রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখিনা। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে, তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না। আমার এই দেহ পঞ্চত্বলাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দির্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গনাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন-পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়।

অতএব ভুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তিকে অতিশয় গরীয়সীই জানিতে হইবে। ("সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা"।—নারদভক্তিসূত্রঃ) ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ স্বসুখতাৎপর্য্যের মলিনতা যে পর্য্যন্ত লেশমাত্রও অন্তরে সংস্পৃষ্ট থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে পরমশুদ্ধা ভক্তি-সুখের আবির্ভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাই পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন ;—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ)

অর্থাৎ, যাবৎ ভুক্তি-মুক্তিরূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাবৎ সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব হইবে? (অর্থাৎ সম্ভব নহে।)

যে অহৈতুকী সেবা বা ভক্তিসুখের তুলনায় ভুক্তি দূরের কথা—মুক্তিসুখকেও পিশাচীর ন্যায় অশ্রেয়স্কর বোধ হইয়া থাকে, কোনও লৌকিক ভাব ও ভাষায় সে আনন্দের কোনও বর্ণনা প্রদান করা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। ইহা একমাত্র সাধনগ্রাহ্য বিষয়।

বিশ্বনাথের এই বিশ্বসংসার, ভক্তের শুদ্ধ অনুভব দ্বারা যেমন শুদ্ধরূপে গ্রাহ্য হয়, ভুক্তি ও মুক্তিকামীর নিকট সেরূপ শুদ্ধস্বরূপে গ্রহণযোগ্য হয় না। দেহাত্মবাদী জড়ভাবাপন্ন ভুক্তিকামী জীবের নিকট এই মায়িক-সংসারই একমাত্র সত্য বস্তু ; এই জন্য সেই সকল জীব অত্যন্ত আসক্তির সহিত বিষয়-ভোগ-তৎপর হইয়া কেবল কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে ; অপরপক্ষ—চিদেকাত্মবাদী চিদ্‌ভাবাপন্ন মুক্তিকামী জীবের নিকট বিশ্ব-সংসার সকলই স্বপ্নবৎ অলীক বা অসত্য ; সুতরাং তাঁহারা সংসার-সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, কেবল জ্ঞানেই নিমগ্ন থাকেন। চিৎ-কণাত্মবাদী—"কৃষ্ণদাস" স্বভাবাপন্ন ভক্তিকামী শুদ্ধজীব বা ভাগবতগণ এই জগৎ সংসারকে শ্রীভগবানেরই শক্তিবিশেষ জানিয়া, ইহার নশ্বরতা অনুভব করিলেও, ইহাকে একান্ত সত্য বা একান্ত মিথ্যা বোধে, সংসারে অত্যন্ত আসক্ত বা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন না। শ্রীভগবান্ এ বিষয়ে নিজেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি যদি সাংসারিক-কর্ম্মে অত্যন্ত বিরক্ত না হয়েন, অথচ তাহাতে অতিশয় আসক্তিপরায়ণ না হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়।

স্বরূপশক্তি ও মায়া বা জড়শক্তি উভয়েই যখন বস্তুবিশেষ, তখন স্বরূপ শক্তির ন্যায় জড়শক্তির ও বাস্তবিক সত্তা অস্বীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগত কখনও অলীক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। আবার প্রাপঞ্চিক জগত সত্য হইলেও, উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তির বিপরীত বা বহিরঙ্গা হওয়ায়,অবিকারী বা অবিনশ্বরাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট স্বরূপ শক্তির যে বিপরীত ভাব, অর্থাৎ বিকারী বা নশ্বরাদি ধর্ম্ম,—বহিরঙ্গাশক্তি তদ্ভাবাপন্না। অতএব বিশ্ব-সংসার সত্য হইলেও ইহার অনিত্যতা বা নশ্বরতা নিবন্ধন, অত্যন্ত সত্য মনে করিয়া ইহাতে আসক্তি অথবা অত্যন্ত মিথ্যা মনে করিয়া ইহাতে বিরক্তি,—এই উভয়বিধ অবস্থাকেই আংশিক সত্য বা অজ্ঞানতা মিশ্রিত বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তের পরিশুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভগবৎ সত্তায় সত্তান্বিত এই বিশ্ব-সংসার, সেই মহা-বিশেষ্য স্থানীয় শ্রীভগবানের মহা-বিশেষণ বা তন্মহিমার প্রকাশকরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই গুণবাচক জগতই সেই গুণাকর জগন্নাথের অনন্ত গুণরাশির প্রথম প্রচারক; নিখিল বিশ্ব-সংসার ঐক্যতানে ঝঙ্কৃত হইয়া বিশ্বপতির গুণগানে নিমগ্ন; সুতরাং সেই প্রিয়তম গুণাকরের সম্বন্ধেই তদীয় গুণগায়ক এই নিখিল বিশ্ব প্রিয় হওয়ায়, ভক্তগণ যেমন তাহাতে বিরক্ত হইতে পারেন না, তেমনি এই প্রিয় বিশ্ব অপেক্ষা প্রিয়তম বিশ্বপতিতে অধিক আবেশ থাকায়, তাঁহারা এই সংসারে আসক্তও হয়েন না। জগতের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মধুর—যাহা কিছু মনোহর তাহা দর্শন করিয়া, ভাগবতগণ শ্রীভগবানেরই অসীম সৌন্দর্য্য—অনন্ত মাধুর্য্য ও অতুল মনোহারিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

নিখিল শক্তিবর্গের সহিত শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করাই দর্শনের পূর্ণতা। ভাগবতগণের ভক্তি-বিভাবিত দৃষ্টিতেই কেবল পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রতিভাত হয়,—অন্যত্র সম্ভব হয় না। শক্তিমানকে বাদ দিয়া কেবল শক্তি-বিশেষকেই সত্য বলিয়া জানা, অথবা সবিশেষ শক্তিকে মিথ্যা জ্ঞানে কেবল নির্ব্বিশেষকেই সত্য বলিয়া দর্শন করা,—উভয়ই একদেশদর্শীতার ফল। তাই প্রকৃষ্ট বা পূর্ণ দর্শনের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অর্থাৎ—যিনি চেতন অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবরূপে দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায়।

বিশ্বনাথের সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া, যাহারা এই বিশ্ব-সংসারে আসক্তিপূর্ব্বক, সংসারসুখ ভোগেই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, সেই সকল জীবকে যেমন অন্ধকার-জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইতে হয়, তেমনি আবার ইহাতে একান্ত বিরক্ত জীব, যাঁহারা পরমেশ্বরের মহিমা-ব্যঞ্জক এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে অলীক ও অসত্য বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক, সেই জগদীশ্বরেরই অনন্ত স্নেহ, দয়া, প্রেম ও করুণাদি গুণের সহিত তদীয় অপরিসীম মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যাদি শক্তির অপলাপ করিয়া থাকেন, সেই সকল জীবকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার লোকে গমন করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা॥

অর্থাৎ যাহারা কেবল অবিদ্যার (ভক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্মের) অনুসরণ করে, তাহারা ঘোর তামস লোকে গমন করে; আর যাঁহারা কেবল বিদ্যায় (ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানে) রত, তাঁহারা তদপেক্ষাও ঘোরতর তামস-লোকে গমন করিয়া থাকেন।

অতএব যাঁহারা জগদীশ্বর ও জগৎ, কোনও পক্ষের অস্তিত্বের অপলাপ না করিয়া, শক্তিমানের সহিত শক্তিকে ও শক্তির সহিত শক্তিমান্‌কে সামঞ্জস্য পূর্ব্বক দেখিতে জানেন, তাঁহারা জগতের কোনও বস্তুকে উপেক্ষা করিতে

পারেন না; এবং তাদৃশ দৃষ্টিই দর্শনের পূর্ণতা। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন;—

যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

অর্থাৎ—যিনি পরমাত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন, এবং সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।

ভগবানের মহিমা-ব্যঞ্জক এই বিনশ্বর বা মরজগতের ভিতর দিয়াই ভগবানকে জানিয়া, তদ্দারা মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক, সাক্ষাৎসম্বন্ধে অমৃতময় শ্রীভগবৎসেবাদ্বারাই জীব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন;—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে একত্র জানেন, (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একেকে ত্যাগ ও একেকে গ্রহণ না করিয়া, যিনি উভয়কেই একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন) তিনি উক্ত অবিদ্যা (বা কর্ম্ম) অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

অতএব ভক্তগণ সংসারে আসক্ত বা বিরক্ত না হইয়া অনন্ত-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই এই বিশ্ব-সংসারকেও মধুর ও সুন্দর দেখিয়া, প্রতি অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে চাহেন; ইহারই নাম "বিশ্বজনীন-প্রেম"। বিশ্বের সহিত বিশ্বেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা কোনও জীবে পরিপূর্ণাকারে সম্ভব হয় না।

ভক্তি-শাস্ত্রে এবং ভক্তগণের আচরণের ও উপদেশের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণে সুতীব্র সংসার-বৈরাগ্যভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহা কেবল বহির্ম্মুখ— বিষয়াসক্ত ও মোহ-গ্রস্ত জীবসকলকে ভক্তিপথে সহসা আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং প্রবর্ত্তক ও সাধকদিগকে সাধন পথে সত্বর অগ্রসর হইবার উৎসাহ প্রদান করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে; যে হেতু "জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"—(চরিতামৃত)। নিদ্রিত-ব্যক্তির সহিত তাহার কোনও পরমাত্মীয় মধুর আলাপাদি করিতে আসিলেও, যেমন তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, প্রথমে কঠিন ও কর্কশ শব্দাদি-দ্বারা জাগ্রত করেন, তদ্রূপ মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ও নিরুৎসাহ জীবকে কৃষ্ণভজনে উৎসাহিত করাই ভক্তি-পথের তীব্র বৈরাগ্য-বাণীর অভিপ্রায়। (ক্রমশঃ)

মিলনে।

(ব্রজরেণু)

তালে তালে নাচে গোপিণীর দল
মনোহর তনু রূপেতে উছল
খুঁজিতেছে রাই ব্যাকুল হৃদয়ে
কোথা গেল প্রিয় কানু
দূরে কানুপদে বাজিল নুপুর
রুণু রুণু রুণু রুণু॥

আকুল হৃদয়ে ছুটিল রাধিকা
নুপুর বাজিল ধীরে।
সমীরণ-মাঝে মিলনের বাণী
জাগিল যমুনাতীরে॥

মলয় বায়ুতে জগত ভরিল
কাননে কুসুমগন্ধ উড়িল
সহসা শ্যামের মধুর পরশে
শিহরিল রাধাতনু।
শ্যামসনে রাধাপদেতে নুপুর
বাজি উঠে রুণু রুণু॥

ব্রহ্মহরিদাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীকানাই লাল পাল এম, এ বি, এল]

শ্রীমান্ হরিদাসের ইচ্ছায় মহানাগ তাঁর গোফা ত্যাগ করিয়া গেলেন, এই আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। শ্রীহরিদাসের প্রভাব অবগত হইয়া তাঁদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁরা পরমানন্দে ভক্তপ্রবর শ্রীহরিদাসের সহিত কীর্ত্তনানন্দে জীবন ধন্য-জ্ঞান করিতে লাগিলেন—এমন সময় আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

কোন একদিন জনৈক ডঙ্ক (সাপুড়িয়া) সাপ খেলাইতে খেলাইতে কালীয়দমন লীলা গান করিতে ছিলেন; দৈব-যোগে শ্রীহরিদাস সেইস্থানে আগমন করিয়া সেই লীলা-মহিমা শ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন;—অশ্রুকম্প-পুলকে আবৃততনু শ্রীহরিদাস কখনও ভাবভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও বা ধূলায় ধূসরিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও বা ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়া নিশ্চেষ্ট-ভাবে পড়িয়া রহিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ তাঁকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবার সমাধিভঙ্গের পর শ্রীহরিদাস মধুরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ডঙ্ক তাঁহার সেই ভাবাবেশে নৃত্য দেখিয়া একপার্শ্বে সসম্ভ্রমে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই নৃত্যদর্শনে যাবতীয় লোক কি যে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। শুধু তাই নয় যেখানে যেখানে তাঁর শ্রীচরণস্পর্শ হইল, সমবেত লোকগণ সেই সেই স্থানের ধূলি লইয়া অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীহরিদাসের প্রতি সাধারণের এতাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া কোন এক দুষ্টমতি ধূর্ত্ত বিপ্রের মনে হইল—ঐরূপ ভাবে নৃত্য করিলেই লোকের নিকট গণ্য হওয়া যাইবে ও সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করা সহজ হইবে। এই দুষ্ট-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তিনিও শ্রীহরিদাসের অনুকরণে নৃত্য করিতে করিতে কৃত্রিম ভাবে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া গেলেন। ডঙ্কের নৃত্যস্থানে পড়িবামাত্র ডঙ্ক তাহাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই বিপ্র প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া পলাইয়া গেল। সমবেত লোকজন ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুইজনের প্রতি এরূপ বিপরীত ব্যবহার প্রকাশ করিলেন কেন? একজন নৃত্য করিতে যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর এক জনের নৃত্যে ভীষণভাবে তাকে প্রহার করিলেন ইহার হেতু কি?" তখন সেই ডঙ্কমুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ বলিতে লাগিলেন—"শ্রীহরিদাস পরম ভাগবত—শ্রীভগবানের লীলার সহায়; তাঁর মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? তাঁর প্রেমভক্তির তুলনা কোথায়? সেই ভাবভরে নৃত্যেরই বা মহিমা কে বলিতে পারে? সেই ভক্তপ্রবরের নৃত্য-দর্শন দেবগণও বাঞ্ছা করেন; সেই নৃত্য দর্শনে জীবের ভববন্ধন দূর হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর দর্শনেই মানুষ-মাত্রেই পবিত্র হয়"। সুতরাং তাঁর নৃত্যে তিনি সসম্ভ্রমে যোড়হস্তে মনে মনে তাঁকে স্তব না করিয়া কি রূপে স্থির থাকিবেন। আর এই বিপ্র মিথ্যা শ্রদ্ধা করিয়া কপটতা অবলম্বনে শ্রীহরিদাসের নৃত্য অনুকরণ করিতেছিলেন মাত্র। সুতরাং তার উচিৎ শাস্তিই বিহিত হইয়াছে"। ভক্তির প্রথম সোপান নিষ্কপটতা, অথচ এই বিপ্র সেই কপটতা-অবলম্বনে ভক্তির ভানে নৃত্য করিতেছিল; সুতরাং কপটতার প্রশ্রয় কি করিয়া দিব? উত্তম ভক্তের হৃদয়ে সতত শ্রীগোবিন্দ বিশ্রাম করেন সুতরাং শ্রীহরিদাসের হৃদয়ে সতত শ্রীকৃষ্ণরই অধিষ্ঠান; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীহরিদাসের দেহ অবলম্বনে নৃত্য করিতেছিলেন। সুতরাং দুইজনের প্রতি বিভিন্ন আচরণ যুক্তই হইয়াছে। সেই ডঙ্কমুখে নাগবরগণর আরও বলিলেন—যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, যিনি এমন মহিমাসম্পন্ন তিনি তবে এরূপ নীচ-কুলে

কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাহার উত্তর এই যে—ভক্তির মহিমা প্রকটনের জন্যই ঐরূপ ভাবে তাঁর আবির্ভাব।

ভক্তি দেবী জাতি কুলাদির কোন অপেক্ষা রাখেন না। তাহা ছাড়া শ্রীহরিদাস প্রকৃতপক্ষে ত যবন নহেন, বাল্যে যবনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত মাত্র।

ভক্তমুখে শ্রীহরিদাসের মহিমা শ্রবণ করিয়া সকলে অতীব বিস্মিত হইলেন ও শ্রীহরিদাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় উহার মহিমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

সেটী স্তুতিবাক্যমাত্র নয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"

ক্ষণমাত্র সৎসঙ্গের ফলে জীব সংসারসাগর যদি পার হইতে সমর্থ হয়, তবে তার দর্শনে যে পবিত্র হইবে সে আর অধিক কি কথা। অসৎকে যে ত্যাগ করিয়াছে সেই সৎ। সুতরাং যে জড়কে ত্যাগ করিয়া চিৎ আশ্রয় করিয়াছে সেই সৎ। উত্তম ভক্ত শ্রীভগবান্ ছাড়া এক-মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না, সুতরাং ভক্তমুখে শ্রীহরিদাসের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইল, তাহা কেহ যেন স্তুতিবাদ না মনে করেন।

এস্থলে তৎকালীন দেশের অবস্থা একটু উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ লোকে কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠান তখন খুব প্রচলিত ছিল; লৌকিক ও ব্যবহারিক ব্যাপারে লোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত। শাস্ত্রালোচনা পরতত্ত্বানু-সন্ধানের হেতু না হইয়া প্রায়ই বাদ বিবাদ ও গর্ব্বের হেতু হইয়া উঠিয়াছিল। কতকলোকে বিধিমার্গ অবলম্বনে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। শুদ্ধভক্তের সংখ্যা খুবই বিরল ছিল এবং তাহারা নির্জ্জনে নির্ব্বিবাদে ভক্তিযাজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন; শ্রীহরিদাস সাধারণ-লোকের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। "শ্রীনামের" মত সহজ সাধন নাই বলিয়া তিনি নিজে প্রতিদিন ৩ লক্ষনাম গ্রহণ করিতেন; তন্মধ্যে ১লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। যাহারা সজ্জন তাহারা সেই উচ্চ-কীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দিতেন, কিন্তু সেরূপ সজ্জনের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সুতরাং অন্যলোকে উচ্চকীর্ত্তনে নানা প্রকার আপত্তি উঠাইতে লাগিলেন; কেহ বলিতে লাগিলেন—উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া কি বেশী পুণ্য হইবে? কেহ সে কথার উত্তর দিলেন—"ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করে বুঝিতে পারিতেছ না! একজন বলিলেন "এসব দুষ্টামী মাত্র; আমাদের শুধু নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানই উহাদের উদ্দেশ্য; মনে মনে নাম করিলেই ত যথেষ্ট হয়। কোন পণ্ডিতম্মন্য গম্ভীরভাবে বলিলেন—"চাতুর্ম্মাস্যের কালে ঠাকুর শয়নে থাকেন, উচ্চৈস্বরে তাঁকে ডাকিয়া তাঁর ঘুম ভাঙ্গাইলে ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ ছারেখারে দিবেন—দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। সুতরাং এ সব ভাবুকগুলাকে প্রহার করিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত। কেহ বা বলিলেন—"প্রত্যহ রাত্রে চীৎকার করার প্রয়োজন কি? শুধু হরিবাসরের নিশি জাগরণে কীর্ত্তন করিলেই ত যথেষ্ট"। লোকের নানারূপ আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীহরিদাস ও তাঁর সহযোগীগণ উচ্চকীর্ত্তন যখন বন্ধ করিলেন না তখন তাহাদের মধ্যে জনৈক মদ-গর্ব্বিত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ শ্রীহরিদাসের নিকট উপ-স্থিত হইয়া উচ্চ-কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি তর্ক অব-তারণা করিয়া তাহাকে উচ্চ-কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন। যখন তাহাতেও শ্রীহরিদাস নিবৃত্ত হইলেন না; তখন শ্রীহরিদাসের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক কটু-কাটব্য প্রকাশ ভক্তের স্বভাব সহিষ্ণুতা ও মান শূন্যতা ইত্যাদি গুণযুক্ত। তাই শ্রীহরিদাস সেই সকল কুযুক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া কিছুমাত্র উত্তেজিত হইলেন না; উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের শুধু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন—

হরিদাস বলেন—ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরি-নামের মাহাত্ম্য॥
তোমার সবার মুখে শুনিয়া যে আমি।
বলিতে কি বলিবাঙ্ যেবা কিছু জানি॥
উর্দ্ধকরি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়।
দোষত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

তথাহি—উচ্চৈঃ শতগুণাধিকঃ।

(চৈতন্য-ভাগবত)

এবং কেন উচ্চস্বরে নাম-কীর্ত্তনে শতগুণ পুণ্য হয় তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। পশু পক্ষী কীট প্রভৃতির নাম-গ্রহণের সামর্থ্য নাই কোন কোন পক্ষীকে শিখাইলে কতকাংশে শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র খুবই বিরল। উচ্চৈস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে যেসব প্রাণীই 'নাম' শুনিতে সমর্থ হয়, তাহারা নামশ্রবণে উদ্ধার লাভ করে। যিনি মনে মনে জপ করেন, তিনি শুধু আপনার উদ্ধারসাধন করেন; কিন্তু যিনি উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রাণীর উদ্ধারের হেতু হন। সুতরাং যিনি উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করেন, তার গুণ যে শতগুণ হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীহরিদাসের এ সকল বচন শুনিয়া সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণের ভাল লাগিল না; তিনি বিদ্রূপ করিয়া শ্রীহরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে কলিকালে শূদ্রে বেদ ব্যাখা করিবে;—দেখিতেছি এখনই তার সূচনা হইয়াছে" এবং শ্রীহরিদাসের মহিমা অবগত না থাকায় তাঁহাকে ইহাই অভিসম্পাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না যে—"যদি হরিদাসের বাক্য সত্য না হয় তবে যেন তাঁর নাক কান খসিয়া পড়ে এবং যদি সত্য হয় তাঁর নিজের নাক কান যেন খসিয়া যায়"। সেই বিপ্রের ঔদ্ধত্য দেখিয়া ক্ষমাশীল শ্রীহরিদাস কোন উত্তর করিলেন না। ঈষৎ হাস্য করিয়া উচ্চৈস্বরে নাম গ্রহণ করিতে করিতে স্থানত্যাগ করিলেন।

শ্রীপরমহংসদেব বলিতেন—সব জলই 'নারায়ণ' বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সব জল খাওয়া যায় না; কোন জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করা চলে না। তেমনি সর্ব্বজীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিলেও সকলের সঙ্গ করা চলে না। শুধু তাই নয়, ভক্ত হইলেও সঙ্গ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে—"স্বজাতীয় স্নিগ্ধাশয়"; ভিন্নসঙ্গের ব্যবস্থা নাই। যাক্ সে কথা। শ্রীহরিদাস অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা বিধেয় মনে করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

পরম ভাগবত শ্রীহরিদাসের প্রতি অপরাধ হওয়ায় ও শ্রীহরিনামের প্রতি অপরাধ হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণের কয়েক দিনের মধ্যেই নাসিকা খসিয়া পড়িল।

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ"॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪।৪৬

সাধু বা ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করিলে লোকের পরমায়ু, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, পরলোক ও সকল প্রকার শ্রেয় নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—তিনি সব পারেন ভক্ত-স্থানে অপরাধ ঘটিলে সে অপরাধ হইতে তিনিও উদ্ধার করিতে সমর্থ নন। শ্রীভগবান্ নিজের প্রতি অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু ভক্তাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি ভক্তের মর্য্যাদা চিরদিনই বাড়াইয়া আসিয়াছেন; স্বয়ং শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা" তাঁর নিজের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজাকে বড় বলিয়া তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ বা ভক্তাপরাধ হইতে সকলেরই দূরে থাকা কর্ত্তব্য।

একদিকে যেমন ভক্তকে তিনি উচ্চ-আসন দিয়াছেন, অপর দিকে "শ্রীনামের'ও তিনি উচ্চ-স্থান দিয়াছেন। শ্রীসত্যভামা কর্ত্তৃক তৌলযন্ত্রে একদিকে স্বয়ং ভগবান্ অপর-দিকে "তাঁর নাম" তুলিত হইলে শ্রীনামই" গুরু হইয়াছিলেন, এ পুরাণকাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। এই পত্রিকায় শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রকাশিত হইতেছে সুতরাং অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। তবে যেমন বৈষ্ণবাপরাধ হইতে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে, তেমনি "নামাপরাধ" হইতে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে নচেৎ কোন মঙ্গল নাই। শ্রীমন মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীশ্রীঝুলন-লীলা।

(বিনয় কুমারী দেবী)

সাধের কদম্ব বন, মেঘাবৃত গগন
মৃদু মৃদু বারি-বরিষণ ;
অসংখ্য কদম্ব তরু ফুল ফুটিয়াছে চারু,
গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ অগণন।
রাধাকৃষ্ণে প্রেমোদিতে বৃন্দাদেবী আদেশেতে
সেবাপরা বনদেবীগণ
কদম্ব তরুর ডালে সাজায়ে রেখেছে ভালে
পরম সুখদ হিন্দোলন।
বৃন্তগুলি খসাইয়া তদুপরি পাতিয়া
দিয়াছে কোমল পুষ্পাসন
সুষমার সুহাসে কুসুমের সুবাসে
নিমগন সকল কানন।

....

উদিত শুভক্ষণ আগে পাছে সখীগণ
রাধা বামে রাধিকারমণ ;
মদন-মনোহর বেশে যুগ-যুব-বর
উপনীত সুখে নীপবন।
নূপুর কিঙ্কিনী করি রুণু রুণু ধ্বনী
বাজিল মধুরে ধীরে ;
অনুপম লাবনীতে মৃদু সুধা হাসনিতে
ভাসে বন সুষমা সাগরে।
হিন্দোলা সজ্জিত দেখে, শ্যামসুন্দর সুখে
উঠিলেন হিন্দোলিকা পরে ;

হাতে ধরি উঠাইয়া আপন সম্মুখে নিয়া
বসাইল নিজ প্রেয়সীরে ॥
তবে নর্ম্ম সখীগণ, স্থানে স্থানে সংস্থাপন
করি দিল স্রস্ত কেশ বেশ।
কোটী কাম মনোলোভা ক্ষরিল রূপের প্রভা
মাধুর্য্যের না পাওল শেষ ॥
অন্য ধন্যতরা সখী দুজন দুদিকে থাকি
তাম্বুল দিল দুঁহু মুখে।
আগে পাছে পদ রাখি আগে পাছে দুই সখা,
দোলা দোলাবার তরে সুখে।
দাঁড়াইল ক্ষীণকটি উড়ানি অঞ্চলে আঁটি ;
দোলাতে লাগিল মন্দ মন্দ।
যন্ত্র বিনা মুখে মুখে সব সখীগণ সুখে
গাইলেন "মিলন আনন্দ।"
দোলার উপর দোলে নব জলধর কোলে
অচপলা নব সৌদামিনী।
বিমান উপরে থাকি সে সুষমারাশি দেখি
চমৎকৃতা স্বর্গের রমণী।
মধুর মধুর লীলা- রসের ঝুলন খেলা
হর্ষের বাদরে ভাসে বন।
এ রসের এক কণা এ হৃদয়ে পশিল না
ধিক্ ধিক্ এ ছার জীবন।

শ্রীগুরু

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ]

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জীবনের বহুদিন কাটিয়া গেল। আজ তাহার মধ্য-সন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একেবারে যে ভজন-সম্বন্ধ রাখি নাই, তাহা বলিলেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে আমার অবস্থা হইয়াছে বড় ভীষণ। নৌকা নঙ্গর করিয়া সারারাত্রি দাঁড় টানিয়া যে ফল হয়, অথবা সুতার সহিত সম্বন্ধ নাই, সমস্তদিন তাঁত চালাইলে যে লাভ হয়, আমার এই সকল ভজনের ফলও সেইরূপ হইয়াছে। সবই করিতেছি, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। কেবল কলের মত সব কাজগুলি হইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতদেহ ও দৈহিকাদি সমস্ত বস্তুর সহিত যে মায়িক দৃঢ় সম্বন্ধ, তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধলেশাভাসও না রাখিয়া অবসর মত বিধিপ্রেরণায় কোন একটী ভক্তিঅঙ্গের কিছু যাজন করিলাম।
ইহাতে—"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন।"

এই বাক্যের মূর্ত্ত-উদাহরণ স্বরূপ হইয়াছি। তাহার মূলীভূত কারণ হইয়াছে কুটিলতা। শ্রীপাদ জীব গোস্বামিচরণ ভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে শ্রীভক্তিদেবীর আবির্ভাবের প্রতিবন্ধকস্বরূপে যে পাঁচটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান ও প্রথম হইতেছে "কৌটিল্য"। কৌটিল্যের লক্ষণও তিনিই করিয়াছেন,—"শ্রুতশাস্ত্রাণামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্"। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াও অপরাধ হেতু শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবে সাক্ষাৎ পরমার্থস্বরূপ এই জ্ঞান সম্বলিত আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব-সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করার নামই কৌটিল্য। শ্রীভগবান্ প্রভৃতিতে আন্তরিক আদর নাই, বাহিরে যথেষ্টরূপে মৌখিক আদর প্রদর্শন করার মত গুরুতর দোষ আর নাই; আমারও মূলে ত্রুটী ঐস্থানেই।

যিনি আমার অজ্ঞানান্ধকার-বিনাশকারী, যিনি আমার ভবপারের কাণ্ডারী, যিনি আমা হেন দুর্জ্জন পরম পামরকেও উদ্ধার করিবার জন্য সাধিয়া যাচিয়া অশেষ কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক নিজ দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, সেই শ্রীগুরুদেবের উপর প্রাকৃত রক্তমাংসাদিসঙ্ঘাতদেহাবিশিষ্ট মনুষ্য জ্ঞানজন্য তাঁর শ্রীচরণে অপরাধ। এই অপরাধ হইতে নিস্তারের আর উপায় নাই। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণও এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দান করিতে অক্ষম। শ্রীভগবান্ রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব নিজ কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়া সাধককে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে শ্রীভগবান্‌ও রক্ষা করেন না। কারণ শ্রীভগবান্ই শ্রীগুরুদেব রূপে বহির্ম্মুখ জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য সাধকের ধ্যানের অনুকূল মানবদেহ ও স্বভাবাদি গ্রহণ পূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হয়েন। এইজন্য জীবউদ্ধারকার্য্যকারিত্ব এবং সাধকের সহিত তাঁহারই নিকট সম্বন্ধ; সুতরাং এই শ্রীগুরুরূপী ভগবৎপ্রকাশবিশেষের নিকটে অপরাধী হইলে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ও ক্ষমা করেন না।

এই প্রকার শ্রীবৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিলেও শ্রীভগবান্ ক্ষমা করেন না। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট অপরাধযুক্ত দুর্ব্বাসামুনি এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে অপরাধী চাপালগোপালচরিত্রই এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ও ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন না। শ্রীভগবানের হৃদয়ের ভাব হইতেছে ইহাই যে, "আমার যে দুইটী স্বরূপ জগৎকে কৃতার্থ করিতেছে, তাহাদের নিকটে যাহারা অপরাধী হইবে, সেই পামরগণের অপরাধ যদি আমি ক্ষমা করি, তবে জগৎজীবকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

তাহারা মনে করিবে, গুরু বা বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইলেই তিনি ক্ষমা করিবেন। জগতের এই ধারণা দূর করিবার জন্য আমি নিজে কখনও ঐ অপরাধীগণকে ক্ষমা করিব না। যাঁহাদের নিকট তাহারা অপরাধী তাদের চরণে তাহারা শরণাপন্ন হউক্, তবেই তাহারা রক্ষা পাইবে সুতরাং এইরূপ স্থলে শ্রীভগবানের ঔদাসীন্য অকারুণ্যের পরিচায়ক নহে

শ্রীগুরুচরণে অশেষ বিশেষরূপে অপরাধী বলিয়া আমার অবস্থাও এই প্রকার হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য কিছু বর্ণন করিয়া আত্মশোধন করিতে ইচ্ছা করি। জয় শ্রীগুরুদেব !!

আমরা প্রথমতঃ আলোচনা করিব, "শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিব কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি আমাদিগকে বলিবেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা।"

শোভন জ্ঞানলাভের জন্য পরম যোগ্য বলিয়া আমাদের মতি অর্থাৎ বুদ্ধি পরম প্রীতির আস্পদ। নিজ মনঃকল্পিত যুক্তি তর্কদ্বারা অলৌকিক বস্তু-তত্ত্ব অবধারণ করিতে গিয়া, সেই মতিকে শাস্ত্রোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অসৎমার্গে প্রবেশ করান উচিত নহে। যেহেতু শাস্ত্রকারগণ শুষ্ক তর্ক বর্জ্জন করিবার আদেশ দেন ইহাতে কখনও পারমার্থিক বস্তুর সন্ধান; পাওয়া যায় না বিশেষতঃ জাগতিক যুক্তিতর্কের সমাধান কখনও সম্ভব হয় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা একটা উদাহরণ দেখাইতে পারি। যেমন সর্ব্বত্র রীতি আছে যে ফল পাকিলেই তাহা বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। কিন্তু চাল কুমড়া গাছ শুষ্ক হইয়া মরিয়া গেলেও তাহার ফল চ্যুত হইয়া পড়ে না। আরও এক কথা। পারমার্থিক বস্তু মায়াজগতের পরপারে অবস্থিত। প্রাকৃত মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এইজন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় প্রয়োজন। তজ্জন্য শ্রুতির দ্বিতীয় আদেশ,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
আচার্য্যবান্ পুরুষো পুরুষো বেদ।"

পরমার্থ বস্তু বিজ্ঞানের জন্য শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। যিনি শ্রীগুরুচরণে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি সেই বস্তুর সন্ধান পাইবার যোগ্য। শ্রীভগবানের স্বয়ং শ্রীমুখোক্ত বাক্য যথা,—

"মদ্ভভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং।"

অর্থাৎ যিনি আমার ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণসমূহের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এবং সেই গুণসকল স্মরণ করিয়া আকৃষ্ট হওয়াতঃ বিবিধ রসময়-লীলাবিলাসী আমাতেই যার চিত্ত সর্ব্বদার জন্য অভিরমিত হইতেছে, এবম্ভূত প্রশান্তস্বভাব বিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থে সেই বাক্যের বাঙ্গলা পয়ারে প্রতি-ধ্বনি করিয়াছেন,—

শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই এ সব ভজন পাই
প্রেমভক্তি সখি অনুচরী॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারেনা। জগতের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, কোন একটী কার্য্য স্বচেষ্টায় সম্পাদন করিতে বহুদিবস অতিক্রান্ত হইতেছে, হয়ত সে কার্য্য নিষ্ফলও হইতেছে। কিন্তু যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির আশ্রয়ে বা উপদেশে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে অতি অল্প কালের মধ্যেই অনায়াসে সে কার্য্যে সফলমনোরথ হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিগণ এই কথার সংবাদ দিতেছেন,—

বিজিত হৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥

যেমন জিতেন্দ্রিয় ও জিতপ্রাণ ব্যক্তিগণকর্তৃকও সংযত করা দুঃসাধ্য, যদি কেহ শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় না করিয়াই সেই অশান্ত মনকে বশীভূত করিবার জন্য যত্নবান হয়, তবে সেই ব্যক্তি কর্ণধারহীন তরণীস্থ বণিকসমূহের সমুদ্রতলে নিমজ্জনের ন্যায় উপায়ক্লিষ্ট ও বহু দুঃখে আকুল হইয়া ভবসাগরে নিমগ্ন হয়। অর্থাৎ নাবিক-সকল সমুদ্র-ভ্রমণে বিচক্ষণ, তাহাদের সহায়তা ব্যতীত সমুদ্রমধ্যে বণিক-

গণকে বিপদাপন্ন হইতে হয়। সেই প্রকার শ্রীগুরুদেব সঙ্কটসঙ্কুল সাধনপথের পরিচয় সম্যক অবগত। কোন অবস্থায় কি জাতীয় প্রতিবন্ধক আসিয়া সাধককে সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত করতঃ কোন্ সুদূর সংসার-ভোগের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহা শ্রীগুরুদেব সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। এজন্য তিনি প্রতি পদবিক্ষেপে সাধককে সাবধানতার সহিত অগ্রসর করাইয়া থাকেন। সাধনের মধ্যেই সাধনের অঙ্গরূপে, এমন কি ইষ্টবস্তুর সদৃশ মূর্ত্তিধারণ করিয়াও মায়া তাহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে। শ্রীগুরুদেব কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়া সাধককে সাবধান করিয়া দেন।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয় না করিলে সংসার ধ্বংস হওয়া ত দূরের কথা, মননিরোধ পর্য্যন্ত অসম্ভব। যেহেতু মনের স্বভাব সতত বিষয় গ্রহণ করা এবং এই মন অতিশয় শক্তিশালী। শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

মন অতিশয় চঞ্চল, অচ্ছেদ্য, দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকর, ও কাহারও কর্ত্তৃক সংযত হওয়া অসম্ভব। বায়ুকে নিগ্রহ করা বরং সম্ভব, কিন্তু মননিরোধ করা তাহা হইতেও অসম্ভব। এবম্ভূত মনকে হঠাৎ কোন বিষয় না দিয়া নিরোধের জন্য প্রয়াস করিলে, সে মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে বিপরীত ফল হয়। যেমন উদ্ধত অশ্বকে হঠাৎ সংযত করিবার চেষ্টা করিলে সে বশীভূত না হইয়া বরং ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাকে সংযত করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহার মনের অনুকূল আচরণ করিতে দিয়া ধীরে ধীরে সংযত করিতে করিতে, পরে সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ করিতে হয়; সেই প্রকার মনকে সংযত করিতে হইলেও উক্ত বিধি অবলম্বন করিতে হয়। আবার মন সংযত না হইলেও বাসনা ক্ষীণ হয় না, আর বাসনা ক্ষয় না হইলে সমাধি অবস্থা হইতেও সাধককে পুনরায় বিষয়ভোগের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ঠিক এই কথাই বলেন—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্! দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতম্॥

ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটা গল্পের কথা বলিতেছি। কোন একজন ব্যক্তি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া চিত্তকে সাময়িক সমাধিস্থ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সমাধি ভঙ্গ করিবার উপায় শিক্ষা করে নাই। একদিন কোন এক রাজবাড়ীতে ইন্দ্রজাল-খেলা দেখাইতে দেখাইতে, রাজার নিকট হইতে কিছু অধিক টাকা পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায় সে সমাধিস্থ হইয়াছিল। কিন্তু সমাধিনিরোধের উপায় জানিত না বলিয়া-তাহার সমাধি ভঙ্গ হইল না। ক্রমে ক্রমে বহুবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তথাপি তাহার সমাধি নিরুদ্ধ হইল না। কালক্রমে সেই রাজা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল, এবং পার্শ্ববর্ত্তী নদীর ভাঙ্গনে সম্পূর্ণ সহর ও রাজ অট্টালিকা পর্য্যন্ত নদীগর্ভে জলমগ্ন হইয়া গেল। ঐ সঙ্গে সমাধিস্থ ঐন্দ্রজালিক নদী গর্ভেই রহিয়া গেল। বহুকাল পরে অন্যকোন এক যোগীপুরুষ এপথ দিয়া যাইতেছিলেন। সেইস্থলে নদীমধ্যে এক কপটী যোগী রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, নানা উপায়ে তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলেই ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উঠিল "কৈ মহারাজ! আমার পারিতোষিকের টাকা দেন।" সে ভাবিতেও পারে নাই যে, বহুকাল পূর্ব্বেও সে রাজা ও রাজ্যের অবসান হইয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার পারিতোষিক লাভের বাসনা ক্ষয় নাই। ইহাতে বুঝা গেল যে বাসনা ক্ষীণ না হওয়ায় সমাধির পরেও তাহার বিষয় বাসনা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে এই চঞ্চল মনেরও সংযমন সহজসাধ্য হইয়া পরে তাহার প্রমাণ,—

সর্ব্বমেতদ্গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি মহাশয়কৃত

পাঠাবলম্বনে

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ

মিত্র কর্তৃক লিখিত।]

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিজ্ঞা বাক্য ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইক্ষণ ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানে রজন্য নিজের অসাধারণ লক্ষণের পরিচয় করাইতেছেন।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিতে অনেকের ভ্রম উপস্থিত হয় যে—শ্রীমদ্ভাগবতের সাররূপ চারিটী শ্লোকের নাম চতুঃশ্লোকী, এ ধারণা সত্য নহে। চতুঃশ্লোকী বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটী বিষয়ই মুখ্য-প্রতিপাদ্য। প্রথম ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান, দ্বিতীয় ভগবদনুভব বা মায়ানিবৃত্তি, তৃতীয় ভগবৎপ্রেম, চতুর্থ ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায় বিশুদ্ধসাধনভক্তি। এই চারিটী বিষয় যাহাতে বর্ণিত আছে তাহার নাম চতুঃশ্লোকী। সেই চারিটী বিষয় বলিলেন বলিয়া প্রথম শ্লোকে, শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া 'জ্ঞানং পরমগুহ্যং' ইত্যাদি শ্লোকটী প্রতিজ্ঞাবাক্য। "যাবানহম্" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজস্বরূপের যথাযথ-অনুভব হউক্ বলিয়া—শ্রীব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সেইজন্য দ্বিতীয় শ্লোকটী আশীর্ব্বাক্য। তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজের স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকটীতে পরমগুহ্য শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। চতুর্থ "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" ইত্যাদি শ্লোকে ত্যাগমুখে মায়াতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, মায়াতত্ত্ব বর্ণন করিয়া ভগবদনুভব বস্তুটী উপদেশ করিয়াছেন। পঞ্চম "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকে রহস্য-প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" ইত্যাদি শ্লোকে পরোক্ষবাদে সাধন-ভক্তিতত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সপ্তম "এতন্মতং সমাতিষ্ঠ" ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট বস্তুচতুষ্টয়ের প্রতি জন্মে অবিচলভাবে স্থিতির জন্য পুনরাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তাহার সাধন এই চারিটী বিষয় উপদেশ করিলাম, তাহা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও তোমার হৃদয়েও অক্ষুণ্ণরূপে বিদ্যমান থাকিবে—এইরূপ পুনরাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এই সাতটী শ্লোকই চতুঃশ্লোকী নাম অভিহিত। এইক্ষণ "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকের যথাসক্তি ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। হে ব্রাহ্মন্। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। এস্থানে "অহং" শব্দে অর্থাৎ আমি শব্দে, উপদেষ্টা মূর্ত্তিমান্ ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। কারণ যিনি ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন তিনি মূর্ত্ত না হইলে উপদেশ করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এস্থানে অহং অর্থাৎ আমি শব্দের বাচ্য নহেন। আবার যদি এই শ্লোকে জীবস্বরূপজ্ঞান উপদেশ করা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতির 'তত্ত্বমসি" বাক্যের মত "ত্বমেবাসীঃ" এইরূপ উপদেশ করিলে জীবস্বরূপ-জ্ঞান উপদেশ করার উপযোগী হইত। অর্থাৎ জীবস্বরূপের উপদেশ করার জন্য শ্রুতিতে "তত্ত্বমসি" তুমি সেই ঈশ্বর হও, এইরূপ উপদেশ আছে। তেমনি এস্থানেও সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমিই [জীবই] ছিলে এইরূপ উপদেশ করিতেন। কিন্তু সেইরূপ উপদেশ না করিয়া আমিই ছিলাম এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ থাকাতে "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই উপদেশ করা হইয়াছে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ অথবা জীবস্বরূপের জ্ঞান উপদেশ করা হয় নাই, ইহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অতএব শ্লোকের অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝিতে হইবে।

হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়া বিদ্যমান এই পরমমনোহর শ্রীবিগ্রহ আমিই। মহাপ্রলয়কালেও যে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই ছিলেন, সে বিষয়ে শ্রুতিও উদ্‌ঘোষণা করিতেছেন—"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।" একো নারায়ণো আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।" (বাসুদেব উপনিষদে) পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন এই বিশ্ব ছিলনা, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।

নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, মহাদেবও ছিলেন না এই সকল শ্রুতি হইতে মহাপ্রলয় কালে যে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতেও ৩।৫।২৩ শ্লোকে "ভগবানক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ আত্মেচ্ছানো গতা বাত্মা নানামত্যোপলক্ষণো।" শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরকে কহিলেন—"হে বিদুর! এই বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা এক ভগবান্‌ই ছিলেন, তিনি নিখিল জীবের মূল-স্বরূপ ও স্বামী অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক কিছুই ছিলনা, সেই ঈশ্বর নানা দ্রষ্টৃ, দৃশ্যাদি ভেদমতিতে উপলক্ষিত হয়েন না। তখন শ্রীভগবানে জড়ীয়-সম্বন্ধ রহিত হইয়া একাকী অবস্থানের ইচ্ছাতে এই বিশ্বের প্রলয় ঘটিয়া থাকে, ইত্যাদি প্রমাণে সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে সময়ে একমাত্র ভগবান্‌ই ছিলেন—ইহাই বুঝা যাই তছে। এস্থানে একটী আশঙ্কা আসিতে পারে যে, মহাপ্রলয়-কালে একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই ছিলেন। তাহা হইলে সে সময়ে কি শ্রীভগবানের ধাম ও পার্ষদাদি ছিলনা? তাহার উত্তরে বুঝিতে হইবে এখন "এই রাজা কোন কর্ম্মই করেনা" এই কথা বলিলে যেমন রাজ্য-সম্বন্ধে কার্য্যেরই নিষেধ বুঝায়, কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অন্তরঙ্গ প্রীতিমাখা কর্ম্মের নিষেধ বুঝায় না। সেই প্রকার মহাপ্রলয় সময়ে জগৎসম্বন্ধে যে ব্যাপার তাহাই ছিলনা। কিন্তু নিজ বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও পার্ষদাদি থাকার নিষেধ বুঝায় না। কারণ শ্রীভগবান্ অঙ্গী, শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধাম ও পার্ষদবৃন্দ শ্রীভগবানের উপাঙ্গ। অতএব অঙ্গীর সত্বাতেই উপাঙ্গ শ্রীভগবদ্ধাম ও পার্ষদাদির সত্ত্বা গৃহীত হইয়াছে। মহাপ্রলয়কালে শ্রীভগবান্ যেরূপে অবস্থান করেন, তাহাই জানিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকমুনির নিকট ২।৮।১০ শ্লোকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নটি করিয়াছেন—

"স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ॥"

হে প্রভো! যিনি বিশ্বের স্থিতি সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা, সেই মায়াধীশ্বর সর্ব্বগুহাশয় পুরুষ ভগবান্ নিজ-বহিরঙ্গমায়া ও মায়াকার্য্যের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যে স্থানে শয়ন করেন সেই স্থানটীর কথা বলুন। এই প্রশ্নের দ্বারা মহাপ্রলয়-কালেও যে শ্রীভগবান্ ও তাহার ধাম ছিল তাহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। ৩।৭।৩৭ শ্লোকে শ্রীবিদুরকৃত প্রশ্নেও ভগবৎপার্ষদগণের মহাপ্রলয় কালেও স্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়।

"তত্ত্বনাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনু শেরতে॥"

হে ভগবন্! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা বলিলেন সেই সকল তত্ত্বেরপ্রলয় কত প্রকার? সেই মহাপ্রলয় সময়ে এই পরমেশ্বরকে নিদ্রিত রাজাকে ভৃত্যগণ চামরাদি দ্বারা যেমন সেবা করিয়া থাকে তেমনি কে কে সেবা করিয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ জীব শয়ন করিয়া থাকে? এই প্রশ্নেও ভগবৎপার্ষদগণের মহাপ্রলয়-কালেও নিত্যস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে কাশী-খণ্ডে ধ্রুবচরিত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥"

মহপ্রলয়রূপ বিপদ কালেও যাহার ভক্ত শ্রীভগবান্ হইতে বিচ্যুত হয় না, এইজন্য সেই এক সর্ব্বগত অব্যয় ভগবান্ অখিল লোকে অচ্যুত নামে বিখ্যাত। এই প্রমাণেও ভগবৎভক্তের মহাপ্রলয়-কালেও নিত্যস্থিতি প্রমাতি হইল। মূল শ্লোকে "অহমেব" এই 'এব' করে উল্লেখ থাকায় অন্য কোন কর্ত্তাও নিরাকার স্বরূপে নিষেধ করা হইয়াছে, পুনরায় "আসমেব" ছিলামই এই 'এব' কার প্রয়োগ দ্বারা শ্রীভগবানের স্থিতি বিষয়ে অসম্ভাবনারূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি করা হইয়াছে। সেই মহাপ্রলয়কালে যে মূর্ত্ত ভগবান্‌ই ছিলেন এবং তাঁহার রূপ, গুণ, কর্ম্মও ছিল; তাহা তাঁহার আশীর্ব্বাদ-শ্লোকে "যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ" অহম্ পদের এই বিশেষণদ্বারা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। অথবা "আসমেব" অর্থাৎ ছিলামই এই প্রকার উক্তি দ্বারা ব্রহ্মাদি বহির্জ্জন জ্ঞানগোচর সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি ব্যাপারে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু নিজের অন্তরঙ্গস্বরূপভুত লীলায় নিষেধ বুঝায় না। এইরূপ বর্ত্তমান সময়ে কোনই কার্য্য করে না" এই উক্তিতে রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্যের নিষেধ বুঝায়, কিন্তু শয়ন ভোজনাদি কার্য্যের নিষেধ বুঝায় না, তেমনই মহাপ্রলয়-কালে জাগতিক কার্য্যই থাকে না; কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্তগণের সহিত রসময়ী লীলার নিষেধ বুঝায় না। অথবা দীপ্তি অর্থে 'অস্' ধাতু হইতে 'আসম্' এই ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই পক্ষে 'আসম্' এই ক্রিয়ার অর্থে আপনি [ব্রহ্মা] আমার [শ্রীভগবানের] যে সকল বিশেষ দেখিতেছেন, এই বিশেষের সহিতই অর্থাৎ এই দৃশ্যমান আকারে বসনে ভূষণে বিভূষিতরূপেই মহাপ্রলয়কালেও ছিলাম—ইহাতে মহাপ্রলয়কালে নিরাকার ঈশ্বর ছিলেন এইরূপ অর্থ করিবার অবসর থাকিল না। সেইজন্য শ্রীবোপদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থে, শ্রীল হেমাদ্রিকৃত সাকার এবং নিরাকার বিষ্ণুর লক্ষণ যাহাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই টীকাতেও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "অনেন শ্লোকেন নাপি সাকারেষু অব্যাপ্তিঃ তেষাং আকারাভি রোহিতত্বাৎ" এইশ্লোকের দ্বারা মহাপ্রলয়কালে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সত্বায় অব্যাপ্তি হইতে পার না। যেহেতু মহা-প্রলয়কালেও শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি আকার তিরোহিত হয় না। ঐতরেয়ক শ্রুতিও বলেন "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষাকৃতি আত্মাই ছিলেন। ইহা

দ্বারা মহাপ্রলয়কালেও সাকার পরমেশ্বরের স্থিতির সংবাদ স্পষ্টই পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণে প্রকৃতি ঈক্ষণের পূর্ব্বেও পুরুষ হইতেও ভগবজ্জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—বেদের কোন কোন স্থানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল এইরূপ শুনা যায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "নাস্তৎ-যৎ সদসৎপরং" সৎ-কার্য্য, অসৎ-কারণ হইতে অতিরিক্ত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম আমা [ভগবান্] হইতে ভিন্ন নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপাট পাণিহাটিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের

শুভাগমন-মহোৎসব

ও

বিরাট বৈষ্ণব-প্রদর্শনী।

আগামী ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার (১৩৩৯) ৩০ অক্টবর

আমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী ঃ—

"* * * (পাণিহাটির) রাঘব ভবনে।

নিত্য মম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে॥"

কৃপাসিন্ধু-ভক্ত-চরণ-সরোজে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন.

প্রেমের অবতার দয়ার সাগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, জননী ও জাহ্নবীদেবীকে সন্দর্শন করতঃ শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিবেন মানস করিয়া পুরীধাম হইতে ৺বিজয়া দশমী দিবসে বিজয় করতঃ তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে উক্ত মানন্দের কাহিনী বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে। পাণিহাটির সেই মহাগৌরবময় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলির অধিকাংশই আজিও অতি উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কালধর্ম্মে উক্ত পুণ্যতিথির আরাধনা-উৎসব লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী পতিত পাবন শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেব বা ৺পুরীধামের সি বড় বাবাজী মহারাজের অভিন্নহৃদয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট সি শ্রীল নবদ্বীপচন্দ্র দাসের আজ্ঞায় কয়েক বৎসর হইল এ প্রেম-উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে সেই মহানন্দের দিবস সমাগত। এক্ষ আমাদের প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, পূর্ব্বোক্ত পুণ্য দিব আপনারা কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে ও সসম্প্রদায়ে শ্রী পাণিহাটিতে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ করিবে আমরা আপনাদের প্রত্যেকের নিকটে এই মহামহোৎ যোগদান করিবার জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা জ করিতেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বা পূরণ করুন। নিবেদন ইতি—

ভক্ত-পদরজ প্রার্থী—

দীন—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী (ভাগবত রত্ন)

(শ্রীশ্রীরাঘব বংশাবতংশ)

কাঙ্গাল—শ্রীরামদাস বাবাজী (শ্রীনবদ্বীপ ধাম)

প্রভৃতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির

পাণিহাটী পোঃ, ২৪ (পরগণা)।

বৈষ্ণব-প্রদর্শনী সংবাদ

এবারে খুব বিপুল ভাবেই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সংগৃহীত দ্রব্য ব্যতিরেকেও এবারে নানা **দেশ হইতে** নূতন নূতন ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগৃহীত **হইয়াছে ও হইতেছে।** প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ঐ সকল অপরূপ ও দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান দ্রব্য সুসজ্জিত করা হইবে।

এক্ষণে, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ও সহৃদয় দেশবাসীগণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ নিবেদন :—

আপনারা কৃপাপুরঃসর সবান্ধবে ও সসম্প্রদায়ে শ্রীপাট **পাণিহাটীতে শুভাগমনপূর্ব্বক** প্রদর্শনী সন্দর্শন ও উৎসবে **যোগদান করিয়া আমাদিগকে** কৃতার্থ করিবেন। আপনা-**দের শুভাগমন হইলে** আমাদের সকল চেষ্টা ও সকল পরি-**শ্রম সফল হইবে।** (প্রদর্শনী দর্শন জন্য দর্শনী বা টিকিট **ক্রয় করিতে হয় না।**)

সহৃদয় ভাগবতগণের প্রতি আমাদের বিনীত প্রার্থনা— **বৈষ্ণব পুঁথি, মুদ্রিত গ্রন্থ, পুরাতন** ও বর্ত্তমানে মাসিক **পত্রাদি, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা**চিত্র, শ্রীপাট, শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, **প্রভৃতির এবং** প্রাচীন ও বর্ত্তমানের গৌরভক্তগণের ফটো-**চিত্র, ভক্তগণের স্মৃতিচিহ্ন** অথবা ব্যবহৃত দ্রব্য, বংশাবলী, **হস্তাক্ষর, রচিত** পদ, গ্রন্থ, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি যাঁহার **নিকট যাহা আছে,** তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রেরণ **করুন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র** বিজ্ঞাপনও আছে, তাহা **কৃপা করিয়া আমাদিগকে** প্রেরণ করুন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম **সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনও** আমরা প্রাপ্ত হইলে পরম যত্নে **রক্ষা করিব।**

পরিশেষে প্রার্থনা :—আপনাদের এ দীন সেবক **আজ আপনাদের** প্রত্যেকের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপ-**স্থিত হইয়া অর্থ,** সামর্থ্য, দ্রব্য এবং সর্ব্বোপরি আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে। যিনি যেরূপে পারেন সেই ভাবেই সাহায্য করতঃ উৎসব ও প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরকে ভারতের একটী আদর্শ ভাগবত-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুন—ইহাই—বিনীত প্রার্থনা। প্রীতিদান সামান্য হইলেও মহামূল্য জ্ঞানে গৃহীত হইবে। নিবেদন ইতি—

দ্রষ্টব্য :—(১) বিদেশীয় ভক্তগণের বাসাদির কষ্ট নিবারণ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। (পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড প্রার্থনীয়)।

(২) প্রদর্শনী ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার হইতে ৪ দিবস খোলা থাকিবে। মঙ্গলবার মহিলা দিবস।

(৩) রবিবার দিবা ১১ টায় মহাপ্রভুর নৌকাযোগে পুরীধাম হইতে পাণিহাটীতে বিজয়-লীলা। (এইটী বড়ই আনন্দপ্রদ, ভক্তগণকে ইহা দর্শন করিতে অনুরোধ করি)। দিবা ১২টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন। দিবা ১॥০ ঘটিকায় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীলীলা কীর্ত্তন প্রভৃতি।

পথ-পরিচয় :—পাণিহাটী কলিকাতা হইতে ৮ মাইল উত্তরে। ই, আই আর কোন্নগর ও ই, বি, আর সোদপুর ষ্টেসন হইতে ১ মাইল মাত্র ব্যবধান। (ভাড়া ৵০ আনা)।

কলিকাতা হইতে মটর বাসে পাণিহাটী আসাই সুবিধা। শ্যামবাজার ও বাগবাজার (খালধার) হইতে বরাহনগর হইয়া বাস যাতায়াত করে। (ভাড়া ৵০)

পত্র, বুকপোষ্ট মনিঅর্ডার প্রভৃতি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

নিবেদক—ভক্ত কৃপাপ্রার্থী—দীন সেবক-

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট,

সম্পাদক—শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির।

পাণিহাটী পোঃ, (২৪ পরগণা)।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা।

শ্রীমদ্ভাবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি মহাশয়কৃত পাঠাবলম্বনে
রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকর্ত্তৃক লিখিত

এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—স্বরূপভূতবিশেষ অনুভব করিতে অসমর্থ কোন অধিকারীতে অথবা কোন শাস্ত্রে সবিগ্রহ ভগবান্ আমিই নির্ব্বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকি। বস্তুর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে হইলে সাধকের বা শাস্ত্রের যোগ্যতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ। একো নানায়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥" একই দুগ্ধাদি পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মগ্রহণযোগ্য ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যেমন বহুগুণের আশ্রয়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, অর্থাৎ রূপগ্রহণযোগ্য ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা তাহার শীতলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং রসগ্রহণযোগ্য রসনেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়, সেই প্রকার একই শ্রীভগবান্ জ্ঞান যোগ ও ভক্তি-সাধনের বলে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন—

জ্ঞান যোগ ভক্তি ত্রিবিধ সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

অথবা সেই মহাপ্রলয়-সময়ে প্রপঞ্চে কোন বিশেষ ছিল না বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিতি, আর শ্রীবৈকুণ্ঠে কিন্তু সবিশেষ ভগবদাকারে অবস্থিতি, এই প্রকারে নির্ব্বিশেষপ্রতিপাদক ও সবিশেষপ্রতিপাদক শাস্ত্রদ্বয়ের বাক্যের যাথার্থ্যতা রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যায় শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে উক্ত "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য চ।" হে অর্জ্জুন! নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়ই আমি। যেমন মণি ও মণির জ্যোতি এই দুইবস্তু ভিন্ন না হইলেও জ্যোতি পরমাশ্রয় মণি, তেমনই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও সবিশেষ শ্রীভগবান্ স্বরূপগত ভেদশূন্য হইলেও শ্রীভগবান্‌ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়। অতএব এস্থলে শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক্ জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইজন্য এই শ্রীভগবদ্‌বিষয় জ্ঞানের পরমগুহ্যত্ব উল্লিখিত হইযাছে। ইহাতে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—সৃষ্টির অনন্তর জগতে তোমার (শ্রীভগবানের) স্থিতি উপলব্ধি হয় না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে "পশ্চাদহম্"। অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তরে আমিই আছি। সেই স্থিতিটী বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবদাকারে ও প্রপঞ্চে অন্তর্য্যামী আকারে এই দুই প্রকারে বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োহমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥

মহারাজ নিমি পিপ্পলায়ন যোগীন্দ্রের নিকটে শ্রীনারায়ণাভিধ ভগবানের, ব্রহ্মের ও পরমাত্মার স্বরূপতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে পূজনীয় যোগীন্দ্র মহাশয় বলিলেন,—"হে নরেন্দ্র! যিনি পরম্পরারূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, অথচ সাক্ষাৎরূপে জগতের সৃষ্ট্যাদি-হেতুরহিত, সেই বস্তুটীকে ভগবদাখ্য-পরতত্ত্ব বলিয়া জানিও। দ্বিতীয় যে বস্তুটী স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তি-দশায় এবং এই তিন অবস্থার অতীত সমাধিতে অন্বয়রূপে অবস্থিত সেই বস্তুটীকে ব্রহ্মাখ্য পরতত্ত্ব বলিয়া জানিও; এবং যাহাদ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও হৃদয় প্রভৃতি পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ ব্যাপারে অগ্নি-শক্তির তাদাত্ম্যাপন্ন লৌহের মত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই বস্তুটীকে পরমাত্মতত্ত্ব বলিয়া জানিও। এই উক্তিতে যে ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে, এই শ্লোকের দ্বারা সেই ভগবৎতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানই উপদেশ করা হইতেছে এইরূপ ব্যাখ্যাতেও একটী দোষ উপস্থিত হয় যে—সর্ব্বত্র ঘট পট তরুলতা প্রভৃতি আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল ঘট পট প্রভৃতি ত তোমার নিজরূপ নহে? যদি সেই ঘটপটাদি তোমার আকার না হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বস্বরূপতা কিরূপে রক্ষা হইতে পারে? এই সংশয় নিবারণের জন্য বলিতেছেন "যদেতচ্চ তদপ্যহমেব।" অর্থাৎ এই দৃশ্যমান বিশ্ব আমিই। যেহেতু আমারই মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া এই বিশ্ব আমা হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপ দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তম-অধ্যায়ে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের প্রতি যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবন।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ ২।৭।৪৯

হে বৎস! আমি তোমার নিকটে সেই বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীহরির কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যে শ্রীহরি এই বিশ্ব হইতে পৃথক্, কিন্তু এই কার্য্যকারণাত্মকবিশ্ব শ্রীহরি হইতে পৃথক্ নহে। যেমন সমুদ্র-তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রেরই একটী অবস্থাবিশেষ। সেইপ্রকার অখণ্ড-আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীহরি জড়ীয় বিশ্ব হইতে পৃথক্, অথচ জড়াত্মক বিশ্ব শ্রীহরি হইতে ভিন্ন নহে। যেহেতু এই জড়ীয় বিশ্ব তাঁহারই মায়াশক্তির একটী অবস্থা-বিশেষ। এইরূপ উক্তিতেই শ্রীভগবজ্জ্ঞানই উপদেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই। ইহাদ্বারা ১০।৩।২৪ অধ্যায়ে শ্রীল-দেবকীদেবীকৃত স্তুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,—

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেব শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥

হে ভগবন্! পিতামহ ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধকাল পরিমিত পরমায়ু শেষ হইলে যখন এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, যখন মহাভূত-সকল তাহাদের কারণরূপ তত্ত্বসকলের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়; এবং যখন ব্যক্ত মহদাদিতত্ত্বসকল অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন কেবল আপনিই শেষ নামে অভিহিত হইয়া অবশিষ্ট থাকেন। এই শ্লোকদ্বারাও শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই প্রকারে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী "যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবান্ বলিয়া-ছেন যে,—"আমি তোমার নিকট ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিলাম, তাহা আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে যথাযথরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক্।" এই কথা দ্বারা ইহাই পাওয়া যায় যে—শ্রীভগবৎকৃপাতেই শ্রীভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে, অন্যথা শতচেষ্টাতে নিখিল-শাস্ত্র অনুশীলন করিলেও তাহা প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বে "স্বরূপতঃ আমার পরিমাণটী যাহা, তাহাই তোমার নিকটে উপদেশ করিতেছি।" এইরূপে শ্রীভগবান্ যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহার উত্তরে নিজ স্বরূপের সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অপরিচ্ছেদ্যত্ব জানাইয়াছেন। অর্থাৎ আমার স্বরূপটী সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশব্যাপী এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় "নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্" অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক-বিশ্ব হইতে অতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম আমা হইতে ভিন্ন-বস্তু নহে। যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয় কিম্বা ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। যেমন চিনির রসের ঘন

পরিপাকে চিনির পুতুল, তেমনই আনন্দরসের ঘন পরিপাকে সবিগ্রহ ভগবান্ আমি।" এইরূপ উক্তিদ্বারা প্রতিজ্ঞাত "যথাভাব" অর্থাৎ সত্তা উপদেশ করা হইয়াছে। সর্ব্ব আকারের অবয়বী অর্থাৎ পরমাশ্রয় ভগবদাকার নির্দ্দেশের দ্বারা বিলক্ষণ অনন্তরূপত্ব জ্ঞাপন করিয়া প্রতিজ্ঞাত "যদ্রূপের" উপদেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বসদ্‌গুণাশ্রয়তা নির্দ্দেশের দ্বারা বিলক্ষণ অনন্তগুণত্ব জ্ঞাপন করিয়া প্রতিশ্রুত যদ্‌গুণত্বের উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ আমার রূপটী ব্যবহারিক-রূপের মত স্বরূপ হইতে ভিন্ন বা প্রকৃতিবিকার নহে। এবং আমার রূপ সর্ব্বরূপের পরমাশ্রয় ও অনন্তগুণত্ব জ্ঞাপন করিয়া প্রতিশ্রুত যদ্‌গুণত্বের উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ আমার গুণ অপ্রাকৃত ও অনন্ত অথচ নিখিল সদ্‌গুণের পরমাশ্রয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য্যদ্বারা উপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব বর্ণন দ্বারা অলৌকিক অনন্তকর্ম্মত্ব জ্ঞাপন করিয়া প্রতিজ্ঞাত সৎকর্ম্মত্বের উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ আমার কর্ম্ম বিবিধ ক্রিয়ার পরমাশ্রয়। এবং প্রত্যেকটী কর্ম্ম প্রকৃতির গুণশূন্য বলিয়া অলৌকিক ও অনন্ত। (ক্রমশঃ)

"শ্যাম সঙ্গমে আগতা

(শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ)

এসে পৌঁচেছি তব দাওয়ায়,
তোমার সুচির চাওয়ায়—আমার চাওয়ায়
লহ লহ আজি বরি'!
তোমারে আমার পাওয়ায় আমার চাওয়ায়
লও প্রিয়তম হরি'!

আমার দুরু দুরু করা বুক্
তোমার বক্ষে হউক্ শীতল, আকুল
মম কণ্ঠ হউক্ মুক্।
প্রাণে রও চির জাগরুক্!

আমি শ্যাম-সঙ্গমে আগতা,
"আমার ভাবের" অভাব হউক্ দেবতা!
তব ভাবে যাই ভুলি'
বাঁধন আমার শিথিল করেছ যদি গো,
নিখিল পরাণে দুলি।

আমার ক্ষুদ্র চোখের চাওয়া
তোমার চাওয়ায় হউক্ রুদ্ধ, সজল;—
তবু সার্থক মোর পাওয়া,
আর তব অভিসারে ধাওয়া!

আজি পেয়েছি আমার কালারে!
প্রীতি-উপহার বনফুলে গাঁথা মালারে—
তোমার কুসুমে হর।
কার্য্য-বহুল যত দিবানিশি আছিল
'দিন রাতি হীন' কর।

আমার জ্বলন্ত দীপ, ধূপ
হারা'ক্ জ্যোতি, হারা'ক্ গন্ধ তাদের
যত তব দীপ ধূপে ভুপ!
ওহে চিরবাঞ্ছিতরূপ!

চণ্ডীদাস ও ভাবী গৌরচন্দ্র*

। প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ।

ভগবানের লীলা নিত্য—'নাহি তার আদি-অবসান'। ভাবও নিত্য। ভাবের বাহিরের প্রকাশ-রূপসমূহ অনিত্য। আদি-বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যদর্শনে ব্যক্ত ও অব্যক্তের সম্বন্ধনির্ণয়ে নিত্যানিত্য-তত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইয়ুরোপে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দীতে দার্শনিক প্লেটো এই তত্ত্ব প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অমেয়-গভীর অমিয়-ভাবের প্রকাশ, তাহার আভাসালোক শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ক্বচিৎ চমকে ঝলকে বিকাশ লাভ করিতেছিল। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথা মনে হয়। অনুপমরূপলীলা-লাবণ্যোজ্জলমূর্ত্তি রসরাজরাজেন্দ্র ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার নির্ম্মলপ্রেমতরঙ্গিণীর সমুজ্জল তরঙ্গপ্রবাহ যাহা, তাহাই মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব অন্তরঙ্গ-লীলা। জীব মাত্রেরই গভীর-গহন-গোপন-হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম আছে—অনুরাগোন্মাদিনী ব্রজাঙ্গনার ভাব আছে। তাহার উদ্দীপনার চেষ্টাই বৈষ্ণব-সাধনার শেষ লক্ষ্য। যেহেতু তাহাই অমৃত। সহস্র সহস্র নরনারীর গোপন-হৃদয়ের নিগূঢ় কৃষ্ণপ্রেম সম্বলিত হইয়া এক সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে ক্রিয়াশীল হইলে যাহা সংঘটিত হইতে পারে তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক জীবন।

এই যে শ্রীকৃষ্ণানুরাগময় মহাভাব, যাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহার চেয়ে মঙ্গলময়, যাহার চেয়ে বাঞ্ছনীয় বিশ্বে আর কিছুই নাই, মহাপ্রভুর জীবনে যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল,—মহাপ্রভুর পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণালোকের মত, যে কয়জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে সেই ভাবের ক্রিয়া দেখা গিয়াছিল, বিল্বমঙ্গল তাহার অন্যতম। বিল্বমঙ্গলের "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" পাঠ করিতে করিতে পদে পদে মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুরাগ-বিহ্বল মূর্ত্তিখানিই অন্তরাকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। সেই—

> কাঁহা করোঁ কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥

সেই অমৃতময় বিলাপধ্বনিই কানে আসে। তারপর—

> মুকুলায়মান-নয়নাম্বুজং বিভো
> মুরলীনিনাদ-মকরন্দনির্ভরম্।
> মুকুরায়মানমৃদুগণ্ডমণ্ডলং
> মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্।

* * *

> কমনীয়-কিশোর-মুগ্ধমূর্ত্তিঃ
> মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণঃ।

ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে নবানুরাগোন্মত্ত মহাপ্রভুর সেই—

> তমাল শ্যামল এক বালকসুন্দর।
> নবগুঞ্জা-সহিত কুণ্ডল মনোহর।
> বিচিত্রময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
> ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি।
>
> চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ২য়

ইত্যাদি সদ্য-স্মৃতিচ্ছবির বর্ণনাই স্মরণে জাগিয়া উঠে।

বিল্বমঙ্গলের আবির্ভাবের বহুকাল পরে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রকাশ। ইনি চৈতন্যতপনোদয়ের পূর্ব্ববিভাসিত একটী উজ্জ্বল-অরুণ-অনুরাগরশ্মি।

> জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
> ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর।
> প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবারাত্রি-জ্ঞান।
> ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।
>
> চৈঃ চঃ। আদি। ৯। মধ্য। ৪

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। সুতারাং মাধবেন্দ্র শ্রীগৌরবিম্বমণ্ডলের অন্তর্গত। মাধবেন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে এবং সম্ভবতঃ বিল্বমঙ্গলের সময়সমীপবর্ত্তী কোনো

* লেখক মহোদয়ের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে—ইংরাজী শব্দযুক্ত প্রবন্ধ আমাদের শ্রীপত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধের ইংরাজী অংশগুলি ভবিষ্যতে বাদ দিলে আশা করি তিনি ক্ষুন্ন হইবেন না।
—সম্পাদক।

সময়ে আদি-বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস কবি। কিন্তু শুধু কবি নয়—সাধক; শুধু সাধকও নয়—তত্ত্বদ্রষ্টা প্রেমরসরসিক ঋষি। তিনি প্রণয়ের এবং বিশেষভাবে কৃষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল-প্রকাশ। এক আশ্চর্য্য 'রেভেলেশন" জগৎকে দান করিয়াছেন।* চণ্ডীদাসের এক একটী কবিতা শুধু কবিতা নয়—বিশ্বপ্রেমময়ীর চঞ্চল প্রাণস্পন্দন। উজ্জ্বল অনুরাগের এক অসীমরাজ্য চণ্ডীদাস উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন। প্রণয়ের অরুণকিরণোদ্ভাসিত সুনির্ম্মল-স্রোতস্বতী অনুক্ষণ নব নব তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। নিরন্তর করুণ কলধ্বনি ফুটিতেছে; প্রবাহের পর প্রবাহ—লহরের পর লহরীলীলা—টলমল ঝলমল করিতেছে। কত চমক! কত ঝলক! কত অভাব! কত বিভাব! কত স্পন্দন! কত উচ্ছ্বাস! সমস্তই মর্ম্মস্পর্শী! সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে সেই গভীর বেদননিবেদনময়ী তরঙ্গিনীর সুদূর তলদেশ হইতে ঝলসিয়া আসিতেছে—কত সুগহন-তত্ত্ব-রহস্য-রশ্মি। কত প্রবালমুক্তা-মণির দূরবিসর্পিণী তীক্ষ্ণচ্ছটা। দেখিয়া প্রাণের নয়ন ঝলসিয়া যায়—চিত্ত অকূলে ভাসিয়া আকুল হয়।

আবার কে এক অনাদিকালের অবলা প্রেমবিহ্বলা-বালিকা আমাদেরি গৃহপ্রাঙ্গনের বেদনাতুরা পরিচিতা বালিকাটীর মত কতই দুঃখের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দুঃখ, কত বেদনা, কত জ্বালা, কত হিয়া-দগদগি পরাণ পুড়নি তার—সে তা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাই সে কখনো আপন প্রাণসখীকে, কখনো উদ্দেশ্যে প্রাণের সখাকে জানাইতেছে। তার প্রতি কথায় বিশ্বের সকল নরনারীর প্রাণের সহস্রযুগসঞ্চিত গোপন-ব্যথা প্রতিধ্বনি করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে—আমাদেরি প্রাণের দুঃখ। কিন্তু তাহা সেই বালিকার উচ্ছলিত হৃদয়ফলক হইতে প্রতিফলিত হইয়া কত মধুর কত তীব্র কত দারুণ হইয়া আমাদের প্রাণে প্রবেশ করিতেছে! কত নূতন তাহা, কত অপূর্ব্ব তাহা, কত দুজ্ঞেয়, কত প্রাণোন্মাদকরী! চণ্ডীদাসের কবিতা কবিতা নয়, উচ্ছল-রসতরঙ্গ; তাহা নির্ঝর-সলিল-শীকরের ন্যায় হৃদয়কে শীতল করে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দগ্ধ করে, শাণিত শরের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করে। আবার সুদূর চিন্ময়-রাজ্যের বিদ্যুদ্‌বার্ত্তা বহন করে।

বিদ্যাপতির কবিতার সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনা হয় না। বিদ্যাপতির কবিতা ভাষাসুষমা ও ছন্দোমাধুরীময়ী নিপুণ রচিত কবিতা এইমাত্র, ইহা প্রমাণ করিয়া দেখানো যায়। বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের সমভূমিস্থ যুগলিত-কবিপ্রতিভা মনে করার একটা কুসংস্কার বহুকাল হইতে বিদ্বৎ-সমাজে চলিয়া আসিতেছে, উহা নিরোধ করা কঠিন! আশাকরি একদিন সাহিত্যিকগণ ইহা বুঝিতে পারিবেন। চণ্ডীদাসের কাব্যের সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অন্তরঙ্গ-ভাবখানি কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের কাব্যাকাশে বিভাসিত হইয়াছে, তাহার আভাস দিতে এখানে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব; চণ্ডীদাসের 'আজু কেগো মুরলী বাজায়' কবিতাটী খুবই আশ্চর্য্য, ইহা পাঠকবৃন্দ সকলেই জানেন। কৃষ্ণ-কিশোরের কথা লিখিতে লিখিতে, এবং সেইরূপ ধ্যান

* পৃথিবীতে যত প্রেমানুরাগের কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চণ্ডীদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি কে—কথাটী ভাবিয়া দেখা উচিত। দক্ষিণ ফ্রান্সের "প্রভেন্‌স্‌" নামক প্রদেশের "ক্রুবাদুর" বলিয়া খ্যাত কবিমণ্ডলী (১৬শ-১৭শ শতক) প্রেমবিষয়ক কবিতা রচনার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। এদিকে মধ্যযুগের কবিকুলশিরোমণি দান্তে, (১২৬০-১৩২১) প্রেমের স্বপ্নে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের সমসাময়িক "রাণী এলিজাবেথের" যুগের প্রীতিগীতিরচয়িতা কবিসম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখযোগ্য। পারস্যের সুফিগণ জালালুদ্দিন রুমি প্রভৃতিও প্রেমের কবি। ভিক্টর হুগো, শেলী, রবীন্দ্রনাথ—এঁরাও কমনীয়-প্রেমসঙ্গীত-নিপুণ। কিন্তু এই সমস্ত কবিগণের মধ্যে মনে হয় কেহই চণ্ডীদাসের মত নিগূঢ় প্রেমরহস্য এমন মনোরম অথচ গভীর এবং এমন স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের প্রেমই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে নির্ম্মল এবং দিব্য। একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।
—লেখক।

করিতে করিতে, কবির হৃদয়ে অকস্মাৎ গৌরকিশোর কেমন করিয়া উদিত হইলেন! নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, ইহা নিতান্ত যদৃচ্ছা (Chance) জনিতই মনে করিতেছি। A passing fancy of the poet's Muse meaning nothing beyond! এই প্রকার মন্তব্য বরাবর প্রকাশ করিয়াছি। এখন দেখি ঠিক তা নয়। যদৃচ্ছা নয়। গম্ভীর গোপন ভাবানুসারেই কবিতাটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছেরি ফুল—আকাশকুসুম নয়। চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রাণ ভরিয়া যে নিগূঢ়ভাবপ্রবাহ খেলা করিতেছে, তাহারই ক্ষণিক দৃশ্যমান জ্যোতিশ্ছটা এই কবিতা।

চণ্ডীদাসে যাহা গূঢ়ানুভূত-ভাব এবং ব্যঞ্জনা গৌরাঙ্গলীলায় তাহাই অভিব্যক্ত এবং মূর্ত্ত। চণ্ডীদাসে যাহা অভীপ্সিত, গৌরাঙ্গলীলায় তাহাই প্রকটিত এবং প্রাপ্ত। 'মনের সহিত পীরিতি করিয়া রহিব স্বরূপ-আশে'। চণ্ডীদাস যে স্বরূপের আশায় প্রেমসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, গৌরাঙ্গ সেই স্বরূপ অনাবৃত করিয়া জগৎকে দেখাইলেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।

চণ্ডীদাসে কৃষ্ণপ্রেমের অনুভবময়ী মূর্ত্তিমাধুরী। গৌরাঙ্গের জীবনে সেই প্রেমের বিস্ময়কর দৃশ্যমান লীলা। গৌরাঙ্গলীলা যে দীপ্তিময় অমৃতময় জীবন বিশ্বমানবের নয়ন-সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া ধরিলেন, চণ্ডীদাসের বাক্যে তাহার ছায়াপাত হইল প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে। কৃষ্ণলীলা নরলীলা—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ (চরিতামৃত)

কিন্তু সুদূর কালের ও স্থানের ব্যবধানে দৃশ্য কল্পনামাধুরী-মণ্ডিত হইয়া মোহময় হইয়া উঠে। তাই বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই কৃষ্ণলীলা কল্পনাময় স্বপ্নরাজ্য হইতে ঝলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; 'পৌরাণিক' হইয়াগিয়াছিল। এবং নাস্তিকবাদীরা ঐ লীলাকথা রূপকথার কোঠায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছিল। কাজেই কৃষ্ণলীলার একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যক দেবতার মনে জাগিয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলার "নর-লীলা" পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হইল। বসুদেব দেবকী ভীমার্জ্জুন কুন্তী রুক্মিণীর মত দেবমানব ও দেবমানবী নয়—একেবারে অবিকল আমাদেরি মত নরনারী হইয়া, এই আমাদেরি যুগে, মুসলমানের রাজত্বকালে, দুই চার জন মুসলমান-পাতশাহের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী লইয়া, এই অতি পরিচিত বাংলা দেশের ঠিক মাঝখানটীতে, অভিনব নরলীলা করিবার জন্য লীলাময় দেবতার এক অদ্ভুত খেয়াল হইল।

ব্রজলীলাটী শেষ হইয়াও যেন শেষ হয় নাই। ব্রজনায়কের কোনো কোনো আশা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। নাটকের শেষাঙ্কের কয়েকটী দৃশ্য, যাহা করুণ হইতেও করুণতর, তাহার অভিনয় যেন বাকী আছে—এই প্রকার ভাব। এদিকে কালের গণনায় যুগাবতারেরও সময় আসিয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানি জগতের সর্ব্বত্র অতি ঘোরতর।* অধর্ম্ম যথেচ্ছায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। লীলাবতারে যুগাবতার মিলাইয়া দিয়া একটা বিশ্বচিত্তচমৎকার কিছু করা যাক্; নিজের কাজ হোক্, জগতেরও কাজ হোক্—এই ভাবিয়া সপরিকরে ব্রজের ঘরবাড়ী ব্যাপার বাণিজ্য উঠাইয়া, কতক নদীয়ায়, কতক রাঢ়ে কতক পূর্ব্ববঙ্গে, কতক উড়িষ্যায় নূতন "সংসার" স্থাপন করিলেন।† গৌরাঙ্গ-লীলা আরম্ভ হইল। কোন আড়ম্বর নাই। কোনো যুদ্ধবিগ্রহ নাই। বিশেষ কোনো অলৌকিক ব্যাপারের চমৎকার-কারিতা নাই। অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক সমস্ত ঘটনা। যেন চুপে চুপে, সন্তর্পণে আড়ালে আড়ালে; ঢাকঢোল কাড়া নাকাড়া শানাই বাঁশী কিছুই বাজিল না। কিন্তু অন্তররাজ্যে—ভাবরাজ্যে—অধ্যাত্ম-সাধনা-রাজ্যে—কল্পনাতীত ব্যাপার সমস্ত ঘটিতে লাগিল। সমগ্র গৌড়-

* ঠিক এই সময়—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইয়ুরোপের খৃষ্টধর্ম্মরাজ্যেও এক বিশাল আন্দোলন চলিতেছিল। পুরাতন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মবিধানে নানাপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় উহার বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। একটা অভিনব প্রতিষ্ঠান বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। জার্ম্মানীর মার্টিন লুথার ছিলেন ইহার নেতা। লুথারের জন্ম ১৪৮৩ খৃঃ। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৫ খৃঃ।

† এখানে মনে রাখিতে হইবে—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। শ্রুতি।

দেশে তথা সমস্ত ভারতবর্ষে, আপামর সাধারণ সকলেই প্রাণে প্রাণে মনে মনে অনুভব করিল—যেন ভারতাকাশে সর্ব্বত্র অন্তহীন বিদ্যুতের খেলা চলিতেছে। সহস্র সহস্র ভাগ্যবান্ নরনারী অন্তরে দেখিল সুবিমল সুধাস্রোত। সকল দুঃখ সকল পাপ তাপ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বাহিরে দেখিল—অপার আনন্দের ও আলোকের অনন্ত মেলা। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, স্বার্থ নাই, লোভ নাই, প্রতারণা নাই. সর্ব্বব্যাপী প্রীতির প্লাবন। ভক্তির মন্দাকিনী শত-ধারে প্রবাহিত। কত ছন্দ, কত সঙ্গীত, কত নৃত্য, কত বীণা বেণু বাঁশী, দিকে দিকে মধুর প্রতিধ্বনি। আকাশে াকাশে অভিনব আলোক। কত বর্ণ, কত বিভা, চৈতন্য-যুগের ইতিহাসে যে মানসজগৎ প্রতিভাত তাহা অবিকল এই প্রকার।

> No wish profaned my overwhelmed heart.
> Blest hour! it was a luxury to be!
>
> Coleridge.

এ তো বাহিরের কথা; মানবজীবনের অন্তর্দ্দেশে এক অমৃতবিপ্লব সংঘটিত হইল। শত শত জন্মে যে অধ্যাত্ম-সাধন সম্পাদিত হয়, তাহাই ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতে লাগিল। সর্ব্বত্র অপার্থিব প্রেমসিন্ধুর অসীম আন্দোলন, আর দিকে দিকে অনন্ত-তরঙ্গোচ্ছ্বাস। মানবচৈতন্য পূর্ণ করিয়া ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে অপরিসীম তম, অসংখ্যমুখী অবিদ্যা, পাপবাসনা, মৃত্যু-ছায়া, নিখিলচিত্ত কাম-কল্মষ-জর্জ্জরিত। এই মানবচিত্তচৈতন্য যাহা শতজন্মের নৈতিক-চেষ্টায় সংশোধিত হইবার নহে—তাহাই দেখিতে দেখিতে মূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পর্য্যভিশোধিত হইয়া গেল। আলোকিত, নির্ম্মল, অমৃতায়মান।—কেমন সে স্পর্শমণি—ধূলামাটী গোময়-পঙ্ক সব সোনা করিয়া দিল। কে সে কৌতুকী দেবতা সমস্ত দেশময় স্পর্শমণির দোকান খুলিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিল! স্পর্শমণি, চন্দ্রকান্তমণি—চিন্তামণি, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার-সংঘটনকারীরা সকলেই মানব। নিতান্ত পরিচিত স্বাভাবিক মানুষ। অতি সরল সহজ তাহাদের সকল আবরণ। সরল বাংলায় কথা বলে। সামান্য শাকান্ন আহার করে। মোটা ধুতি চাদর পরিধান করে। কিন্তু এরা কি মানুষ? এত অধ্যাত্মসম্পৎ কি মানুষের হয়। এত প্রেম, এত অনুরাগ, এত শক্তি, এত সঙ্কল্প, এত লালিত্য, এত নির্ম্মলত্ব, এত ব্রহ্মবর্চ্চঃ, এত সত্ত্বশুদ্ধি—এরা কোথায় লাভ করিল? মানুষের জীবনে কি এমন হয়? এরা কেমন? এই অপূর্ব্ব মানুষের মণ্ডলীটী চণ্ডীদাস দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। 'স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখন নাহিক হয়' এই ভাবে কথাটী আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ঘোষণা করিলেন—

> —চণ্ডীদাস কহে শুন হে মানুষ ভাই!
> সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

চণ্ডীদাসের এইসব কথা সহজিয়া-সম্প্রদায়িগণ দেহাত্ম-বাদের দিকে অনেকদূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার শ্রীবাসগদাধর, মুরারি মুকুন্দ, রূপসনাতন, স্বরূপ রামরায় প্রমুখ শতসহস্র গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

কবি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়?" এই কথার সঙ্গে ঐ কথা মিলাইয়া বুঝিতে হইবে। গৌরাঙ্গলীলাতত্ত্বের বীজ এবং সেই লীলাসাধনের মর্ম্ম এই কথায় নিহিত আছে। ইহার অর্থ সুদূরপ্রসারী; গৌরাঙ্গলীলায় যে সমস্ত দিব্যউদ্দেশ্য-সকল সিদ্ধ করা হইল, তাহার একটী হইল নিখিলশাস্ত্রানু-সন্ধানপথে তত্ত্বজ্ঞানবিচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নূতন করিয়া আবিষ্কার করা এবং বুদ্ধিরাজ্যে তাহা সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করা। এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।

> রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যগণ প্রমাণ করিলেন—শাস্ত্রে যে লীলাকথা আছে তাহা কল্পনা নহে। সত্য এবং নিত্য। সাধনা দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। চণ্ডীদাসের চিত্তেও এই তত্ত্বের আভাস জাগিয়াছিল। প্রকট ও অপ্রকট-লীলা, গোলোক বৃন্দাবন গোকুল, পরব্রহ্ম রসব্রহ্ম, তাহার নরলীলা রসলীলা, গোপীজনবল্লভতত্ত্ব, লীলা-স্ফূর্ত্তি, লীলাদর্শন—সমস্ত কথা চণ্ডীদাসের প্রাণে জাগিয়া-ছিল—গৌরাঙ্গ-অবতারে যে সমস্ত কথা পরে বিবৃত এবং সাক্ষাৎপ্রমাণিত হইল।

> প্রবর্ত্ত দেহের সাধন করিলে কোন্ বরণ হব?
> কোন কর্ম্ম যাজন করিলে কোন বৃন্দাবনে যাব?

নব বৃন্দাবনে নব নাম হয় সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয় ?
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারিপাশে ?
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জুরী সাথে ?
কোন বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায় ?
কোন বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম ভ্রমর পশিছে যায় ?

প্রশ্ন হইতে পারে চণ্ডীদাস এ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছেন! এ সব প্রশ্নের উত্তর খুব দূরে থাকে না। এ প্রশ্ন হৃদয়ে জাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তরেরও আবির্ভাব হয়, উত্তর বুকে লইয়াই প্রশ্নের উদয় হয়। ফুলের সঙ্গে ফলের মত প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তর আছে।

শেষের চারিটী লাইনে কবি একটী সুন্দর ক্রম রক্ষা করিয়াছেন।—

(১ বিরজা বিলাস করেন যে বৃন্দাবনে, তাহাই নিত্য-বৃন্দাবন। পরব্যোমের উপরিস্থিত গোলক নামক কৃষ্ণধাম। বিরজার দুই অর্থ; বিরজা কৃষ্ণপ্রেয়সী—শ্রীরাধার প্রতি-যোগিনী। আবার বিরজা সীমাহীন পরব্যোমের দিগন্ত-চক্রভূতা এবং সীমান্ত বলিয়া প্রতিভাসমানা সুবিশাল সিন্ধুসন্নিভা তরঙ্গিণী। এক প্রকার Circumfluent ocean-flood. প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ড বিরজাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (২) যে বৃন্দাবনে মঞ্জরীগণসহ কিশোরকিশোরী বিরাজ করেন তাহাই লীলাবৃন্দাবন। গোলোকের ভেদা ভেদপ্রকাশে ব্রজমণ্ডল। গোকুল মহাবন বৃষভানুপুর নন্দগ্রাম গোবর্দ্ধনাদি ইহার অন্তর্গত। (৩) যে বৃন্দাবনে রস উপজাত হয় এবং সুধার উদ্ভব হয় তাহাই ভাব-বৃন্দা-বন—প্রাণের বৃন্দাবন—নিত্য-বৃন্দাবনের মনোময় প্রতি-ভান। (৪) তারপর আরো আছে, সাধকের অন্তর্হৃদয়ে, 'স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে' সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বৃন্দাবন। ভক্তি-বিভাবিত হৃদয়রসসরসীতে যখন অনুরাগের রক্তপদ্ম বিক-শিত হইয়া উঠে, তখন মধুলুব্ধ শ্যাম-ভ্রমর দ্রুত উড়িয়া আসিয়া সেই সুরভি-পদ্মকিঞ্জল্কের মধ্যে প্রবেশ করে। কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন—

যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল ভ্রমরে উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু বঁধু ফিরে নাহি এল।

মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত অভিনববৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক নিগূঢ়-তত্ত্ব পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। সে সমস্ত অতি গূঢ়-গহনরহস্য আগমপুরাণাদিতে প্রকাশিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর কৃপায় গোস্বামিগণ এই-সকল রহস্য-রত্নাবলী মানবের জ্ঞানগম্য করিয়াছেন॥ চরিতামৃত হইতে যৎকিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করিতে হইবে। ভগবান্ অনন্ত-শক্তিমান্, অপার-ঐশ্বর্য্যবান্, মানুষ অতি অক্ষম অতি অজ্ঞ, অতি অসহায়। আবার ভগবান্ অতি মধুর, করুণাকোমল, প্রীতিসুকুমার, সুন্দর, সুমনোহর, মানুষের একমাত্র ভরসার পাত্র। কিন্তু মানুষ তাহা ভুলিয়া থাকে। ঈশ্বর অধিকাংশ সময় মানুষের অতিশঙ্কা-দূরপ্রেরিত শ্রদ্ধার পাত্র। কখন বা কেবল ভক্তির আস্পদ।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি।
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন,
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

* * *

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন,
দেবস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার,
করিমু বিবিধ-বিধ অদ্ভুত বিহার।

* * *

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥

চৈতন্যচরিতামৃত। আদি। ৪র্থ।

এই সমস্ত রস-তত্ত্ব গৌরাঙ্গলীলায় ভাবে এবং প্রত্যক্ষে, বিচার্য্যতঃ এবং কার্য্যতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—চণ্ডীদাসের প্রাণেও এইসকল তত্ত্বালোক একান্ত অনাবিল-ভাবেই প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।

(ক্রমশঃ)

জীবের মনুষ্যজন্ম—২

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যগাদি সকল জন্মেই বিষয়ভোগ জনিত সুখ ও দুঃখের কোনও ভেদ না থাকিলেও মনুষ্য জন্মের বিশেষত্ব কেবল ধর্ম্মাচরণ, কারণ মনুষ্যজন্মই জীবের একমাত্র সাধকজন্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
নরাণামেতৎ পশুভিঃ সমানং।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটি পশুর সহিত সমান। মনুষ্যের অধিক বিশেষত্ব কেবল তাহার ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন মনুষ্যের পশু হইতে কোনও ভেদ নাই।

বেদাদি শাস্ত্র যে সকল বিধি নিষেধাত্মক বর্ণাশ্রমাচারাদ কর্ম্ম মনুষ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধৃ ধাতুর অর্থই ধরিয়া রাখা, ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে। অজামিলোপাখ্যানে যমদূতগণ বলিয়াছেন—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতিশুশ্রুম॥ ভাগ ৬।১।৪০

অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মই অধর্ম্ম। বেদের প্রামাণ্যে হেতু এই যে, বেদ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ হইতে উদ্ভূত—তাঁহায় নিশ্বাসমাত্রেই বেদ স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইতি।

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহ এবং তত্তদাজ্ঞাপালনরূপ-ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের জন্য। একমাত্র মনুষ্যেরই শাস্ত্র পালনে অধিকার ও সামর্থ্য বিদ্যমান। মনুষ্যদেহই শ্রীভগবানের বিশিষ্ট সৃষ্টি, স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মায়ামুক্ত হইবার জন্যই এ দেহের সৃষ্টি; এইজন্যই মনুষ্য সৎ ও অসৎ যে কোনও কর্ম্ম করে তাহাকে তাহার প্রারব্ধাদি ফল ভোগ করিতে হয়। পশ্বাদিযোনিতে সৎ অসৎ বুঝিবার সামর্থ্য নাই, অতএব শাস্ত্রও পশ্বাদির জন্য নহে। মনুষ্যই ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিবলে ও শাস্ত্রকৃপায় কর্ত্তব্যানুসন্ধান করিতে সমর্থ। পশ্বাদি যোনি জীব পূর্ব্বমনুষ্যজন্মকৃত অসৎকর্ম্মের ফলেই কেবল কর্ম্মফল ভোগেরজন্য পাইয়া থাকে, পশ্বাদিজন্মকৃত অসৎকর্ম্মের প্রারব্ধাদি ফল নাই। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুকে হিংসাবৃত্তির ফলভোগ করিতে হয় না, কিন্তু মনুষ্য পরহিংসা চিন্তার ফলেও পাপ সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

শাস্ত্র আজ্ঞা করিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবদুপাসনা সকল সাধারণ মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। শাস্ত্র মনুষ্যের স্ব স্ব অধিকারোপযোগী বহুপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেও সকল ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য বহির্ম্মুখ জীবের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ তাহার হৃদয় হইতে অনাদিকালসঞ্চিত মায়িক বিষয়ভোগ-বাসনা দূর করিয়া, তাহাকে ভগবচ্চরণোন্মুখ করা। বাসনা-মুক্ত হইলেই জীব অনায়াসে নিজের স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণদাস-স্বরূপের স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল মায়িক স্বর্গাদি সুখভোগ, অতএব দুঃখ-সঙ্কুল ও অনিত্য বলিয়া তুচ্ছ। কর্ম্মমাত্রই নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ ভগবদর্পণ করিয়া করিলে, তাহার ফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং জীব ভগবচ্চরণপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। দেবর্ষি নারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

ভাগ ১।৫।৩৩

হে সুব্রত! যেমন অধিক ঘৃত সেবনের ফলে যকৃদ্‌রোগ উৎপন্ন হইলেও, ঐ ঘৃতই আবার রোহিতকাদি দ্রব্যান্তর-সংযোগে সেই রোগই নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অপরিমিত বিষয়ভোগের ফলেই জীবের এই তাপত্রয়াত্মক

সংসার বন্ধন ঘটিলেও, ঐ বিষয়ই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া ভোগ করিলে তাহাই সংসার-মুক্তির কারণ হইয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি করাইতে সমর্থ হয়।

শাস্ত্র সাধারণ মনুষ্যের জন্য বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া, চরমপুরুষার্থপ্রাপক তিনটি পৃথক্ বিশেষ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—জ্ঞান যোগ ও ভক্তি। বর্ণাশ্রমাচার-যুক্ত মনুষ্য স্ব স্ব অধিকারানুসারে এই তিনটি সাধন পথ আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই সাধনপথ-আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে সাধুকৃপাসাপেক্ষ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনেই মনুষ্যের সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানি-সাধুসঙ্গে জ্ঞানসাধনে মায়ামুক্ত হইয়া জীব শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া চির-নির্বৃতি লাভ করেন। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ ও শমদমাদি সাধন বলে চিত্তশুদ্ধি হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়। তাহার পর জ্ঞানসন্ন্যাস করিয়া জীব ব্রহ্ম-কৈবল্য লাভ করেন। যোগি-সাধুসঙ্গে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনের ফলে শ্রীভগবানের কিঞ্চিদ্বিশেষ পরমাত্মস্বরূপ অংশের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইয়া যান। বহু সৌভাগ্যের ফলে ভক্তসাধুসঙ্গ হইলেই জীবের প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়, অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারাই কৃতার্থ হইব এইরূপ আত্যন্তিক দৃঢ়া শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার ফলে সাধনভক্তি যাজন করিয়া জীবের চরমপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম লাভ হয়, এবং বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়া জীব কৃতার্থ হইয়া যান। ইহাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম প্রাপ্তি। এই ত্রিবিধ সাধনের ফল তত্তৎসাধকের নিকট সর্ব্বোত্তম বোধ হইলেও তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ইহাদের তরতমতা দৃষ্ট হইয়াই থাকে। বিশেষতঃ জ্ঞান ও যোগ সাধনের সিদ্ধির মূলে ভগবদ্ভক্তি প্রয়োজন॥ কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান তিনটি সাধনই ভক্তিমুখনিরীক্ষক, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারাদি নিষ্কাম কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানযোগ এই ত্রিবিধ সাধনই ভক্তি-ব্যতিরেকে কোনও ফল দিতে পারে না। এমন কি ভক্তিশূন্য এই ত্রিবিধ সাধনের ফলে চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধিশুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ চৈ চঃ।

ভক্তিযাজন ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়ে বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥ ভাগ ৬।১।১৮

হে রাজেন্দ্র! গঙ্গাদি স্রোতস্বতীর প্রচুর জলপ্রবাহেও যেমন সুরাকুম্ভ পবিত্র হয় না, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানময় সুবহু অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণপরাঙ্মুখ ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে কখন পবিত্র করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ভক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদি-বিহীন হইলেও কেবল ভক্তির বলে অনায়াসে শুদ্ধচিত্ত হইয়া যান।

শ্রীঅজামিলোপাখ্যানে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছেন—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥ ৬।২।১৭

অর্থাৎ তপস্যা, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে পাপী ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়স্থ পাপপ্রবৃত্তি কিছুতেই যায় না। পাপের সূক্ষ্মরূপ—সংস্কার বা পাপবাসনা-সমূহ কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবচ্চরণসেবাদ্বারাই নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপগোস্বামিচরণ পদ্যাবলীতে দেখাইয়াছেন—

কাষায়ান্ন চ ভোজনাদি নিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি॥

অর্থাৎ বীর্য্যহানিকর কষায়রসসেবন, ভোজনাদিনিয়ম, বনবাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা, মৌনব্রত ও তীর্থপর্য্যটনাদিতে চিত্তশুদ্ধি হয় না; কিন্তু উন্নত শ্রীযমুনাতীরপ্রদেশে নিত্য-বিহরণশীল শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনারম্ভের লেশমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়।

এই জন্যই শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার উপদেশ এই যে—

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লহ কৃষ্ণৈকশরণ॥

প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের প্রসিদ্ধ সর্ব্বোপদেশশেষের বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেৎ"। গীতা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশের ইহা অভিপ্রায় নহে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি দেখাইতেছেন যে অবশ্যপালনীয় ঐ সকল ধর্ম্মাচরণের ফলে তত্তৎ ধর্ম্মে আবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে সমর্থ হওয়াই বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম্মের গূঢ় ও সার মর্ম্ম। আমার এজগতে তুমি ভিন্ন আর কেহই আপনার বলিবার নাই, আমার এজগতে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং তোমার ভজন ভিন্ন আমার আর কিছুই করিবার নাই, এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই অকিঞ্চনত্বের লক্ষণ। এইরূপ অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইতে সমর্থ হওয়াই সকল ধর্ম্ম-আচরণের একমাত্র ফল। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ। ভ-র-সিন্ধু

শাস্ত্র মনুষ্যের জন্য যতপ্রকার বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকল বিধির মূল বিধি এই যে—মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জীবকে সর্ব্বদা হরিস্মরণ করিতে হইবে, এবং সকল নিষেধের মূল নিষেধ এই যে—শ্রীহরিচরণ কখনও ভুলিতে হইবে না। এই বিধিনিষেধই মহারাজস্থানীয় এবং আর যত বিধিনিষেধ আছে সকলেই ইহারই অনুগত ভৃত্যস্থানীয় জানিতে হইবে। অন্য সকল বিধিনিষেধ পালন করিয়াও এই মূল বিধিনিষেধ পালন না করিলে, মনুষ্যের সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়াও বস্ত্রহীন হইয়া থাকার মত হয়।

মায়াবদ্ধ জীবের ভগবদ্ভক্তিই যে একমাত্র অভিধেয়, অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বসম্প্রদায়-সমাদৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্যও একমাত্র ভক্তিযোগ। তিনি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া॥

অর্থাৎ গীতায় শ্রীভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষণ করিয়া ভক্তিউপদেশ দ্বারা সাধক জগতের চিত্ত স্থির করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ প্রথমে অধিকার-অনুসারে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন; তজ্জন্য সাধকচিত্ত কোনটি অবলম্বন করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া চঞ্চল হইয়াছে দেখিয়া, শেষে ভক্তি-উপদেশ দ্বারা তিনি সাধকজগতের চিত্ত স্থির করিয়াছেন। সেইজন্য বলিয়াছেন—

পূর্ব্বআজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥

অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে বহু বিধির উল্লেখ থাকিলে, শেষের বিধিই বলবান্ বুঝিতে হইবে—"পূর্ব্বপূর্ব্ববিধিভ্যঃ পরপরবিধিবলীয়ান্"। গীতায় শ্রীভগবান্ বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়তম, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি তোমাকে সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভজনশীল, মমার্চ্চনশীল ও একমাত্র আমার শরণাগত হইয়া আমাকে নিরন্তর নমস্কার কর; তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া আমি তোমার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম।

শ্রীভগবান্ গীতায় প্রথমে কর্ম্মযোগাদি আজ্ঞা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই শেষ আজ্ঞার মত প্রৌঢ়ী-প্রতিজ্ঞা-সম্বলিত আজ্ঞা কোথাও করেন নাই। অতএব ভক্তিযোগই গীতার যে একমাত্র প্রতিপাদ্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"। তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন যে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানসাধনের ফল ভগবদ্ভক্তিসাপেক্ষ, এক্ষণে আবার বলিতেছেন যে একমাত্র ভক্তিযাজনেই কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছিলেন—

যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ১১।২০।৩২

অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও শ্রেয়ঃসাধক অন্যান্য ধর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু ফললাভ হয়, আমার ভক্ত কেবল আমার ভক্তিযাজনে তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। আমার ভক্ত যদি ইচ্ছা করে, স্বর্গ, মোক্ষ কিম্বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু স্বর্গ ও মোক্ষ ভক্তমাত্রই প্রার্থনা করে না।

শ্রীসূতমহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ভাগ ১।২।৭

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বাসুদেবে দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধযুক্ত ভক্তি-যোগ প্রযোজিত হইলে তৎকালেই শুষ্কতর্কাদির অগোচর ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যানুভবময় জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া বিষয়ান্তরে আশু বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্য ভক্তকে পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না।

যোগেন্দ্র শ্রীকবি নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ভাগ ১১।২।৪২

অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত মনুষ্যের প্রতিগ্রাসে ভোজনসুখ, উদরভরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত জীবের প্রেমলক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তি এবং গৃহাদি অন্যত্রে বিরক্তি ভজনসময়েই একসঙ্গে উদিত হইয়া থাকে। ভজন যেমন যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, সাধকের ভক্তি, ভগবদনুভূতি ও বিরক্তিও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভক্তের এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য জ্ঞানবাদীর নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানলক্ষণ জ্ঞান ও শুষ্ক বা ফল্গুবৈরাগ্য নহে। জ্ঞান-যোগের সাধন তৎ ও ত্বম্ পদার্থদ্বয়ের স্বরূপানুসন্ধান ও উভয়ের ঐক্যানুসন্ধানমাত্র। ভক্তিযোগেও তৎপদার্থ শ্রীভগবান্ ও ত্বম্ পদার্থ জীবের স্বরূপানুসন্ধান ত থাকেই, অধিকন্তু উভয়ের স্বরূপসম্বলিত সম্বন্ধানুসন্ধানহেতু প্রথম হইতেই আস্বাদনের পরমচমৎকার বিদ্যমান। এই সেব্য-সেবকসম্বন্ধানুসন্ধানশূন্য কেবল চৈতন্যৈক্যময় স্বরূপানুসন্ধান-লক্ষণ জ্ঞানসাধনের ফলে মুক্তি অর্থাৎ মায়াতিক্রম কখনই হইতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইলেই জীবের মায়াতিক্রম আপনিই হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা।

জ্ঞানী বহু কঠোর সাধন করিয়াও ভক্তির আশ্রয়ে যে জ্ঞানলাভ করেন, ভক্ত বিনাপ্রয়াসে কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিযাজনে তাহা অপেক্ষা পরমচমৎকারকারী জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, কারণ ভক্তের জ্ঞান ভগবদ্রূপগুণ-মাধুর্য্যানুভবময় জ্ঞান, কেবল চৈতন্যৈক্যময় জ্ঞান নহে। ভক্ত অবশ্যই জানেন যে তিনি অণুচৈতন্য এবং শ্রীভগবান বিভু-চৈতন্য—চৈতন্যাংশে জীবে ভগবানে কোন ভেদ নাই। ভক্তি জ্ঞানবিরোধী হইলে তুচ্ছ অজ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণ-মচ্যুতেজ্যা॥
৪।৩১।১৪

অর্থাৎ যেমন তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ ও শাখা সকলই তৃপ্তিলাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিসাধনে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের পূজা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা হইয়া যায়।

অতএব ভক্তিসাধন সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদ এবং অতি সহজসাধ্য বলিয়া কলিহত বদ্ধ-জীবের তাহাই একমাত্র অভিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া-ছেন ইহা কেবল গীতাশাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য নহে, শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই একবাক্যে তাহা ঘোষণা করিয়া-ছেন। প্রমাণ দিয়াছেন প্রসিদ্ধ মুনিবাক্য—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনাবিধিম্
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা ব্যক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া শ্রুতির নিকট আমার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে আপনার আরাধনাবিধি উপদেশ করিলেন; ভগিনী স্মৃতির নিকট যাইলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃগণকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও সকলে সেই কথাই বলিলেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই একমাত্র শরণ, তাহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।

শ্রীসূতমহাশয় বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ভাগ ১।২।৬

অর্থাৎ সেই ধর্ম্মই জীবের পরমমঙ্গলময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যাহা হইতে শ্রীভগবানে এরূপ ভক্তির আবির্ভাব হয়, যাহাতে কোনও ফলাভিসন্ধান থাকে না, যাহা কোন বিঘ্নকর্ত্তৃক অভিভূত বা নিবারিত হয় না, এবং যাহাতে জীবের চিত্ত প্রসন্নতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীসূতমহাশয় আবার বলিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ভাগ ১।২।৮

অর্থাৎ যে কোন ধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তাহা শ্রীভগবৎকথায় রতি উৎপাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র—তাহাতে কোনও ফল নাই।

মনুষ্যের বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম্মই ভগবদ্দত্ত, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মায়াবদ্ধ মনুষ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্যাসনারদমম্বাদিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগের মুখ হইতে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রদ্বারা তত্তৎধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সকল ধর্ম্ম সাধারণ ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধাভক্তি যাহা আশ্রয় করিয়া মায়াবদ্ধ জীব অনায়াসে ভগবচ্চরণ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার অতিরহস্যত্বহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ং কেবল শ্রীমুখেই তাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, এবং বেদপুরাণাদিশাস্ত্রকারগণ স্বস্বশাস্ত্রে তাহাই গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য ইহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যোগেন্দ্র শ্রীকবি মহারাজ নিমিকে বলিয়াছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।

অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

ভাগ ১১।২।৩৪

অর্থাৎ মায়াবদ্ধ অজ্ঞ মনুষ্যকে অনায়াসে স্বচরণপ্রাপ্তি করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ নিজে যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিও। ভাগবতধর্ম্ম অন্যাভিলাষিতাশূন্য—কেবল শ্রীভগবচ্চরণসেবাই তাহার প্রয়োজন। এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মায়াবদ্ধ জীব অনায়াসে নিজের নিত্যকৃষ্ণদাসস্বরূপের অনুভূতি পাইয়া থাকে, এবং শ্রীভগবচ্চরণে সেবাপ্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।

মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥

ভাগ ১০।৮৭।২

অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বর মনুষ্যের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ এরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা সেই কর্ম্মফল বিষয়ভোগ করিতেও পারে, কিম্বা পুনঃপুনঃ জন্মমরণলক্ষণ সংসার বন্ধনহেতু কর্ম্ম করিতেও পারে; অথবা জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ত্রিবিধ অধিকারানুসারে পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবানে ঐ বুদ্ধ্যাদি সমর্পণ করিয়া সংসারমুক্তও হইতে পারে। কর্ম্মাধিকারী যজ্ঞাদিকর্ম্মসাধনে, জ্ঞানাধিকারী শমদমাদিসাধনে, যোগাধিকারী যমনিয়মাদিসাধনে এবং ভক্ত্যধিকারী শ্রবণকীর্ত্তনাদিসাধনে ঐ বুদ্ধ্যাদি বিনিযোগ করিতে সমর্থ হইলেও, শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভজননিমিত্ত বুদ্ধ্যাদির বিনিযোগই মনুষ্যজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ তাহাই মনুষ্যের চরমপুরুষার্থ।

কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চতুর্বিধ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই মনুষ্য অধিকারানুসারে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্মাশ্রয়ীর মধ্যে কেবলমাত্র নিকৃষ্ট সকাম কর্ম্মীই বলিয়া থাকে—"ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে"। অর্থাৎ মনুষ্যের ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি, এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্যই পুনরায় ধর্ম্মার্থাদিপরম্পরা। এই হেয় মত নিরসনের নিমিত্তই শ্রীসূতমহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতি র্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

ভাগ ১।২।১০

মনুষ্যের ধর্ম্ম অপবর্গ পর্য্যন্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপবর্গ শব্দের অর্থ মোক্ষ অথবা প্রেমভক্তি; শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও পঞ্চম স্কন্ধে অপবর্গ শব্দের মুখ্য অর্থ প্রেমভক্তি বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যোগী ও জ্ঞানী যমনিয়মাদি ও শমদমাদি ধর্ম্মসাধনে মোক্ষরূপ অপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন, এবং ভক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ধর্ম্মসাধনে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীসূতমহাশয় বলিয়াছেন যে—এই অপবর্গ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসকলের ফল যে কেবল অর্থ ও অর্থের ফল কাম এবং কামের ফল ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, তাহা একেবারেই নহে। ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ ও কামদ্বারা কেবল জীবনধারণমাত্রই করিতে হইবে, এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্মকর্ম্মাদির ফলে স্বর্গাদি ভোগলাভ কোনমতেই প্রার্থনীয় নহে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা দ্বারা স্ব স্ব অধিকারানুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষ কিম্বা প্রেমভক্তিরূপ চরমসিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থকামদ্বারা জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভক্তের ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ কেবল ভগবৎ ও ভাগবতগণের সেবার জন্য, নিজের জন্য নহে। জ্ঞানী ও যোগীর অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতি জ্ঞান ও যোগসাধনের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও কর্ম্মফল বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে; কিন্তু ভক্তের অর্থ, কাম ও ইন্দ্রিয়প্রীতি ভক্তিসাধনের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও কর্ম্মফল বলিয়া গণনীয় নহে। ভক্তির কর্ম্মপরিণামাভাব-হেতু ভক্ত কর্ম্মাধীন নহেন, তাঁহার সুখ ও দুঃখ ভগবদ্দত্ত এবং কদাচিৎ ভক্ত্যপরাধফল বুঝিতে হইবে, ভগবদিচ্ছাতেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অতএব ভগবদ্ভক্তিযাজনই যখন বদ্ধজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র কর্ত্তব্য, তখন একমাত্র ভজনোপযোগী এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কেবল হেয় বিষয়সুখ ভোগের নিমিত্ত ইহা ব্যয় করিলেই দুর্লভ মনুষ্যদেহের অপব্যবহার করা হয়, এবং তাহার ফলেই জীব অনন্তকাল মায়ার কবলে কবলিত থাকিয়া স্বর্গনরকাদিতে নিরন্তর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে দগ্ধ হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের নিকট ইহাকেই জীবের আত্মহত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ভাগ ১১।২০।১৭। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

ভাগ ১০।১।৪

মনুষ্যজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবদ্ভজন, ভজনসাধনই জীবের সাধ্যাতিক্রম ও শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সকল ভজনাঙ্গযাজনের প্রথম সাধন শ্রীভগবল্লীলাকথা-শ্রবণ। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিতেছেন যে শ্রীভগবানের রূপ গুণ ও লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তনে সাধারণতঃ কোনও মনুষ্যের বিতৃষ্ণা হয় না। মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই তিনপ্রকার মনুষ্যই জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই তিনপ্রকার মনুষ্যের মধ্যে কাহারও শ্রীভগবৎকথায় অনাস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুক্তগণ সর্ব্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্ষুগণ ভবরোগের ঔষধ মনে করিয়া, এবং বিষয়ীগণ কর্ণ ও মনের আরামদায়ক পরম বিষয় মনে করিয়া শ্রীভগবানের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণিত বিষয়সুখভোগের জন্য পাপ ও অপরাধাদি সঞ্চয় করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে, সেই সকল হিংসাদিপ্ত ও নীরস-হৃদয় দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণই কেবল শ্রীহরির গুণানুবাদে বিরত হইয়া থাকে।

যাহাদের হরিকথায় বিরতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আত্মঘাতী মনুষ্যগণের দুর্গতি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

অর্থাৎ এই আত্মঘাতী মনুষ্যসকল মৃত্যুর পর অন্ধতমসাবৃত অতলাদি লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও ইহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ গীতা

আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরায়ণ ক্রূরস্বভাব

নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনি মধ্যে নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়, তাহারা জন্মে জন্মে আসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইতে পারে না; সুতরাং অনবরতঃ অধম হইতে অধমতর গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রই একবাক্যে ও তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে—মনুষ্যজন্মই জীবের সকল জন্মের সারভূত ও শ্রেষ্ঠতম জন্ম; মনুষ্যজন্ম দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়, কারণ মনুষ্যজন্মেই জীব ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিবলে তাহার অনাদি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও নিত্যপরমানন্দপ্রাপ্তির সাধন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যে শ্রীভগবান্‌কে ভুলিবার ফলে সে মায়ার বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে, সেই শ্রীভগবানের একমাত্র ভজনানুকূল এই মনুষ্যদেহদ্বারা তাঁহার ভজন-সাধনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীভবিষ্যপুরাণ বলিয়াছেন—

> প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
> যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
> অশীতিঞ্চচতুশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবযোনিষু।
> ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্॥
> তদপ্যফলদং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
> বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্।

অর্থাৎ দেবতাগণকর্তৃক বাঞ্ছিত এই অতিদুর্ল্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে সকল ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় না করে, তাহারা চিরকালের জন্য আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে। চতুরশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের এই দেবতাদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম একবার মাত্র আপনি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় না করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি-নরাধমগণের দেহাভিমানবশতঃ এই অতিদুর্ল্লভ জন্মও নিষ্ফল হইয়া যায়।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন—

> যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
> জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
> নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
> সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে॥ ভাগ ৩।১৫।২৪

অহো! মনুষ্যজন্ম আমাদিগের ন্যায় ব্রহ্মাদি অমরেন্দ্রগণ কর্তৃকও প্রার্থনীয়, কবে আমরা ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনপূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যেই বৈকুণ্ঠলাভ করিব! এই জন্মেই ধর্ম্মাচরণদ্বারা যাবতীয় পুরুষার্থসহিত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান অতি সহজে অর্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু কি খেদের বিষয় যে, তাদৃশ ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট নরদেহ লাভ করিয়াও লোকে ভগবদ্ভজনে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানাদির ফললাভ করিতে পারে না! এই সকল দুর্ভাগ্যবান্ মনুষ্যই ভগবন্মায়ায় বিমোহিত সন্দেহ নাই। ইহারাই কখনও বৈকুণ্ঠগমন করিতে পারে না।

শ্রীল প্রেমানন্দদাস ঠাকুর এই কথাই মনঃশিক্ষায় গাহিয়াছেন—

> মন! তোমারে কহিনু সার।
> এতিন ভুবন চাহিয়া দেখনা মানুষ পাবেনা আর॥
> ভাবিয়া বুঝনা দেবের শকতি ক্ষীরোদ যাইতে নারে।
> ভারতভূমেতে সাধিতে পারিলে ছাঁটিয়া গোলোক ধরে॥
> ইত্যাদি।

সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপালাভ কেবল মনুষ্যজন্মেই সম্ভবপর, সাধুকৃপা ব্যতীত বদ্ধজীবের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই মহারাজ রহূগণ শ্রীজড়ভরতকে বলিয়াছিলেন—

> অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
> কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
> ন যদ্ধৃষীকেশযশঃ কৃতাত্মনাং
> মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ। ভাগ ৫।১৩।২১

অহো! যাবতীয় জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবযোনি প্রাপ্ত হইলে স্বর্গাদিলোকে দেবতাদিযোনি-প্রাপ্তির কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ মনুষ্যলোক ব্যতীত স্বর্গাদি কোন লোকেই শ্রীহৃষীকেশের যশঃসমূহদ্বারা শোধিতাত্মা আপনাদিগের ন্যায় মহাত্মগণের শুভ সমাগম যথেষ্টরূপে পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

পৃথিবীর অন্যসকল মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা পুণ্যভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করাই দুর্ল্লভতম, কারণ ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সর্ব্বথাভজনানুকূল সাধনক্ষেত্র ভারতে শীতগ্রীষ্মাদি ও জলবায়ু ভজনের যেরূপ সহায়তা করে, অন্যত্র কুত্রাপি তাহা করে না। গিরিগহ্বরাদি ও বহু ফলমূল ভারতভূমিতেই সুলভ; তীর্থ, ভগবদ্ধামসকল

সর্ব্বত্র সাধুসৎকার পুণ্য ভারতভূমিরই বিশেষত্ব ; এবং সকল ভজনসাধনের মূল সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা এক ভারতভূমিতেই সুলভ। ভারতবাসী মনুষ্যগণকেই লক্ষ্য করিয়া দেবতারা আক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ ভাগ ৫।১৯।২০

এই ভারতবাসী মনুষ্যগণ কি সৎকর্ম্মের ফলে এই পুণ্যভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। অহো, এই জন্ম কোনও পুণ্যের ফলে ত লাভ হইবার নহে! অতএব শ্রীহরি স্বয়ং প্রসন্ন হইয়াই ইহাদিগকে ইহা দিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্মই মুকুন্দচরণারবিন্দ ভজনের একমাত্র উপযোগী জন্ম ; আমাদিগের এই জন্ম পাইবার জন্য অত্যন্ত স্পৃহা থাকিলেও আমরা তাহা পাই না।

শ্রীল প্রেমানন্দদাস ঠাকুর জীবের চৌরাশীলক্ষ জন্মের হিসাব দিয়া মনুষ্যজন্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বদা স্মরণযোগ্য—

মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন এ তোর কেমন বুক॥
স্থাবর যোনিতে ক্রমে যে জনম হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জলজন্তু মাঝে নবলক্ষ আর জলেই বসতি ভক্ষ্য॥
একাদশ লক্ষ কৃমিতে জনম দশলক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে ক্রমে তেত্রিশলক্ষ মানব চতুরলক্ষ॥
মানুষে আসিয়া কুৎসিৎ দ্বিলক্ষ শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণকুলেতে পরে একবার তাসম নাহিক আর॥
কতেক কলপ ভ্রমিয়া মানুষ এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া পুন না ফেলাবে আবার তোমারে বাপ
বদন ভরিয়া হরি হরি বল অসত ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ তবে সে চতুর এসব যাতনা এড়॥

(ক্রমশঃ)

নিমাই সন্ন্যাস।

(শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্)

কেমনে বুঝিব,
কিসে প্রকাশিব,
কেমনে জানাব
ভাবিগো এখন
চৈতন্য-সন্ন্যাস,
রসের নির্য্যাস,
নীরস পরশে পাব কি কখন

ছাড়ি জায়া মাতা চলে নীলাচলে,
নিজ সম সখা সঙ্গে সবে চলে,
ভাবে ভেসে ভেসে, আপন আবেশে,
আপনি নাচিয়া নাচায়ে জগজন।

সম্প্রদায়ী যতির দৃশ্য দ্রষ্টা ভেদ,
সকলি কল্পিত সকলি অভেদ,
হৃদয় বিকার, হয় ভাবাকার,
সে ভাবস্রোতে হয় করম-জনম।

সন্ন্যাসীর দণ্ড, অভেদ অখণ্ড,
যশের সেই ধামে হারালে সেই দণ্ড,
বৃন্দাবন দাস, তোমার লীলাব্যাস,
গাহিল সেই লীলা মাতিল তখন।

আনন্দ-চিন্ময় রসের বিধান,
সত্ত্বের উদ্রেক প্রথম সোপান,
সেখানে ভেদবল ক্ষণিক নিশ্চল,
অভেদ প্রবল জানে গো তবজন।

এই কি শিখাইলে তোমার আচরণে,
তুমি না জানাইলে জানিব কেমনে,
করম সন্ন্যাসী, নহে গো উদাসী,
করম রতিসখা বুঝিনু এখন।

তোমার সন্ন্যাস, তাঁহার মহিমা,
নিগমে গুণময় যাঁহার প্রতিমা,
যেখানে জ্ঞানীগণ, নীরস কারণ,
বৃন্দাবন-ধন করে না যোজন।

নমি গো তব পদে প্রেমের অবতার,
দাঁড়াও আজি তুমি হ'য়ে সে সবিকার,
তোমার বিকারেতে, আমারে ভাসাইতে,
তোমারি কৃপাবারি কর গো বরিষণ॥

শ্রীশ্রী দামবন্ধন লীলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ]

যাহা হউক্ মা ব্রজেশ্বরী পুত্রকে ঐরূপে বন্ধন করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যগ্র হইলে দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষের দিকে প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) দৃষ্টি পড়িল। মা ব্রজেশ্বরীর গৃহকার্য্য আমাদের সংসারকার্য্যের মতন নয়; আমাদের সংসার-কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার অর্থ—মনকে জড়-বস্তুর সঙ্গে সংযোগ এবং স্বরূপবস্তু শ্রীভগবান্ হইতে বিয়োগ; আব মা ব্রজেশ্বরীর সংসার-কার্য্যে মনোনিবেশের অর্থ—স্বরূপে উন্মুখতা এবং জড়ীয়-পদার্থে বিমুখতা। এখানে আবার শ্রীভগবান্‌কে শ্রীশুক-দেব গোস্বামী অন্য কোন নামে সম্বোধন না করিয়া 'প্রভু' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিতেছেন; ইহার তাৎপর্য্য যে যেমন চন্দ্রকান্তমণি অপসারিত হইলে অগ্নির দাহিকাশক্তির পুনরুদয় হয়, সেইরূপ মা ব্রজেশ্বরী এখন চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ আর দুগ্ধপোষ্য বালক রহিলেন না, একজন মহাশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ হইলেন; যেহেতু কুবেরতনয়দ্বয়কে উদ্ধার করিতে হইবে।

অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় পূর্ব্বজন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। মদোন্মত্ততা প্রযুক্ত নারদের শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব জন্মে তাহাদের নাম ছিল নলকুবের ও মণিগ্রাব এবং উভয়েই শ্রীমান ছিল। তাহাদিগের উদ্ধার করিবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; বৃক্ষদ্বয় অনেকদিন হইতে তথায় বিরাজ করিতেছিল তথাপি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও কেন এতদিন তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই? মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা তিরস্কৃত হয় অর্থাৎ মা ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ-বাৎসল্যরসপানে শ্রীকৃষ্ণ এমনই উন্মত্ত যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তি (কুবেরতনয়দ্বয়কে ভববন্ধন হইতে উদ্ধার করা) প্রকাশিত হইবার অবকাশ পাইতেছিল না, আজ প্রথমতঃ মা চলিয়া গেলেন, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং বন্ধনে পড়িয়া বন্ধনের জ্বালা অনুভব করিতেছেন বলিয়া উহাদের ভববন্ধন হইতে মোচন করিবার জন্য তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন।

শ্রীভগবানের কৃপায় আর আমাদের কৃপায় অনেক প্রভেদ হয়। আমরা অন্যের দুঃখমোচন করিবার জন্য কৃপা করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার দুঃখ চিরদিনের জন্য মোচন হয় না, ক্ষণকাল মাত্র হয়, আবার সময় সময় সেই 'কৃপার' জন্য তাহাকে আরও দুঃখভোগ করিতে হয়। একটি লোককে প্রচুর অর্থ দিয়া তাহার দারিদ্র-মোচন করা হইল; কিন্তু পরে দেখা গেল যে সেই অর্থই তাহার অনর্থের মূল হইল অর্থাৎ তাহার গৃহে দস্যুর উৎপাত আরম্ভ হইল অথবা ধনোন্মত্ততা তাহাকে বিপথগামী করিয়া ফেলিল। আর শ্রীভগবান্ যাহাকে একবার কৃপা করেন সে ব্যক্তি চিরদিন চির অক্ষয় আনন্দে ভাসিতে থাকে, এমন কি তাঁহার নিজজন সাধু-বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর কৃপাও চিরদুঃখনাশক ও চিরআনন্দময়।

মহারাজ পরীক্ষিত অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া শ্রীশুক-দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—কুবেরতনয়দ্বয় এমন কি ভয়ানক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে তিতিক্ষার মূর্ত্তি মহর্ষি নারদকেও অভিসম্পাত দিতে হইয়াছিল? শ্রীশুকদেব বলিলেন—কুবেরের দুই গর্ব্বিত তনয়, তাহারা আবার রুদ্রের অনুচর বলিয়া অতিক্ষমতাশালী হওয়ায় অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থ এবং ক্ষমতার একত্র যোগাযোগ হইলে মানুষকে খুব উন্নতির পথে লইয়া যায় অথবা অত্যন্ত নিম্নগামী করিয়া ফেলে। এখানে আমরা দেখিতে পাইব যে—ইহারা এতটা দুর্গতির পথে নামিয়াছিল যে, পতিতপাবনী গঙ্গাগর্ভে কামবিহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল। একদিন তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া কৈলাস-পর্ব্বতের রম্যউপবনে গমনপূর্ব্বক পুষ্পিত-বনমধ্যে সঙ্গীত-কারি স্ত্রীগণসহ বিহার করিতে আরম্ভ করিল। আবার বারুণী মদিরা পান করায় তাহাদের লোচনসকল মদা-ঘূর্ণিত হইতেছিল। অবশেষে তাহারা পতিতপাবনী মন্দাকিনীর জলে প্রবিষ্ট হইয়া করী যেরূপ করিণীগণের

সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ যুবতীদিগের সহিত কামবিহার আরম্ভ করিল। হে কৌরব! এই সময়ে ভগবান্ দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্ষিপ্ত মনে করিলেন'।

এখানে আমাদের শ্রীশুকদেবের তিনটি কথার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমে নারদ মহাশয়কে ভগবান্ 'দেবর্ষি' বলিবার তাৎপর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সেখানে প্রয়োজন কি? তৃতীয়তঃ 'যদৃচ্ছাক্রমে' আসিবার অর্থ কি' দয়া শ্রীভগবানের নিজস্ব গুণ এবং জীবের প্রতি অবিচারে দয়া একমাত্র শ্রীভগবান্ করিয়া থাকেন, তবে অহোরাত্র আজীবন যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবদ্চরণে তন্ময় হইয়া থাকেন, তাঁহাকে শ্রীভগবান্ নিজের ঐসমস্ত বিশিষ্টগুণে অলঙ্কৃত করেন। নারদ মহাশয় ঐ প্রকার উত্তম শ্রেণীর পুরুষ; তাই তাঁহাকে 'ভগবান্' (দয়ার অবতার) বলা হইল। দ্বিতীয়তঃ নারদ মহাশয়ের তথায় উপস্থিত হইবার প্রয়োজন এই যে—কুবেরের তনয়দ্বয় এবম্প্রকার গর্হিত পাপকর্ম্ম করিয়াছে যে, বিচারে তাহাদের আজীবন ভগবদ্চরণবিমুখতারূপ মহাশাস্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু নারদ মহাশয় আসিয়া শাস্তির ছলে তাহাদের প্রতি মহা-কৃপা করিলেন। অর্থাৎ অভিসম্পাতের দ্বারা প্রথমে তাহা-দিগকে বৃক্ষে পরিণত করিয়া বৈরাগ্যের পথে আনয়ন করাইয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শন করাইয়া দিলেন। অহো! মহাপতিতগণকেও এমন অবিচারে সর্ব্বোত্তম কৃপা-বর্ষণ ভগবান্ নারদ ভিন্ন কে করিতে পারে? আবার ঋষিগণকে 'শাস্তা' বলা হয় যেহেতু তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জীবকে অন্যায়-পথে যাইলে শাসন করেন এবং ন্যায়ের পথ দেখাইয়া দেন; কিন্তু যিনি আবার অবিচারে অনায়াসে শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পথ (শ্রীভগবৎচরণ) লাভ করাইয়া দেন তাঁহাকে দেবর্ষি বলা হয়। এখানে নারদ মহাশয় সেইরূপ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি বলা হইল। 'যদৃচ্ছাক্রমে' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান্ দেবর্ষি নারদের আগমন কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না অর্থাৎ কেহ যদি বলে যে কুবেরতনয়দ্বয়ের পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা ভুল। এক নদীতীরে দুইটি বন্ধু এক ক্ষুদ্র কাষ্ঠকে ভাসিয়া যাইতে দেখিল। প্রথম দ্বিতীয়কে প্রশ্ন করিল 'বল দেখি, এই কাষ্ঠের ভাসা কখন থামিবে'। দ্বিতীয় উত্তর করিল "এর কি থামা আর আছে, ইহা ভাসিতে ভাসিতে মহানদীতে পড়িবে, তারপর সমুদ্রে পড়িবে, তারপর মহাসমুদ্রে পড়িবে—চিরকাল ইহা ভাসিতে থাকিবে তখন প্রথমবন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—বলদেখি, এর থামার সম্ভাবনা কখনও আছে কি'? তখন দ্বিতীয় বলিল— 'তা আছে। যদি কখন এই নদীতে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ যদি সৌভাগ্যক্রমে এই কাঠের গায়ে লাগে, তবে ধাক্কা খাইতে খাইতে কূলে লাগিবে, তবে ইহা ভাসার হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। তবে কবে তরঙ্গ উঠিবে, কবে তাহার ধাক্কা খাইবে তাহার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। তবে যদি এরূপ হয় তাহা হইলে থামিবার সম্ভাবনা আছে।" ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে কাষ্ঠের 'তরঙ্গদর্শন, এবং তাহার ধাক্কা খাওয়া' কাষ্ঠের নিজের কোন কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। তরঙ্গের যদি ইচ্ছা হইল 'উঠিল' এবং তাহার যদি ইচ্ছা হইল তবে কাষ্ঠকে ধাক্কা দিয়া কূলে লইয়া গিয়া ভাসার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। সেইরূপ মহাপুরুষের আগমন ও তাঁহার কৃপাবিতরণ কাহারও কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না, ইহা মহাপুরুষের 'যদৃচ্ছার' উপর নির্ভর করে।

তারপর শ্রীশুকদেব বলিলেন—'হে কুরুনন্দন! গন্ধর্ব্ব-মহিলাগণ দেবর্ষিকে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় লজ্জিতা হইল এবং বিবস্ত্রা হইয়া থাকাতে শাপভয়ে সত্বর গঙ্গা হইতে উঠিয়া বসন পরিধান করিতে লাগিল; কিন্তু কুবেরতনয়দ্বয় গঙ্গা হইতে উঠিল না এবং ঐরূপ উলঙ্গ রহিল। উহাদিগকে মদিরামত্ত ও ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ দেখিয়া জননী যেমন চপেটা-ঘাতে নিদ্রিত সন্তানের নিদ্রার আবেশ ভঙ্গ করিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করান, সেইরূপ দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন যে—যদি উহাদের এই মদান্ধাবস্থাটি নষ্ট না করিয়া কৃপা দান করি, তাহা হইলে তাহারা 'কৃপাটি' সম্যক্ উপলব্ধি কিংবা গ্রহণ করিতে পারিবে না, সেইজন্য অভিসম্পাতের দ্বারা ধনমদান্ধ-আবেশটি নষ্ট করিবার জন্য অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ করি-বার পূর্ব্বে সর্ব্বনাশমূলক ধনমদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে লাগি-লেন,—"অহো! ধনমদই সর্ব্ব অনর্থের মূল। বিদ্যাভিজন

যদিও খুব অনিষ্টকারী কিন্তু ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের যেরূপ বুদ্ধিভ্রম অন্যতে তাহা হয় না। ধনমদে স্ত্রীদ্যূত-মদ্য আছে। আবার ধনমদে অন্ধ-অজিতাত্ম-ব্যক্তিরা এই নশ্বরদেহকে অবিনশ্বর ও জরামৃত্যুবিহীন মনে করিয়া নির্দ্দয়ভাবে পশুবধ করিয়া বেড়ায়। দেহকে অশ্বত্থবৃক্ষ বলা হয় যেহেতু অ শব্দে 'না', শ্ব শব্দে 'স্থিতি' এবং থ শব্দে 'কাল' অর্থাৎ কাল যাহার স্থিতি নাই এমন যে দেহ তাহাকে ধনমদান্ধ-ব্যক্তিরা অজয় অমর মনে করে; এবং ঐদেহেতে স্থিত যে রসনা তাহার তৃপ্তির জন্য পরের মাংস ভক্ষণ করে। আবার ইহা—ব্রাহ্মণ কিংবা রাজার হউক্—অন্তে যদি মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় তাহা হইলে কৃমি, যদি শৃগালাদির দ্বারা ভক্ষিত হয় তাহা হইলে বিষ্ঠা, যদি অগ্নিতে দাহ করা হয় তাহা হইলে ভস্ম নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ দেহের জন্য প্রাণিহিংসা করে, তাহার নরক অনিবার্য্য এবং সে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। আবার যে দেহের জন্য এত বিরুদ্ধাচরণ করে একবার ভাবে না যে এদেহ কাহার? এদেহ কি অন্নদাতার বা পিতার বা মাতার বা মাতামহের বা ক্রেতার, বা বলী-ব্যক্তির, বা কুকুরের? যখন এইরূপ সন্দেহ তখনও ভাবিতে হইবে দেহ সাধারণের। আবার ইহা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—মধ্যে ব্যক্ত—পুনরায় অব্যক্তে লীন হইয়া যাইবে। অতএব অসৎ ব্যতীত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দেহকে আত্মা ভাবিয়া জীবহিংসা করে না"। দেবর্ষি নারদ এই প্রকার ঐশ্বর্য্যমদের অনর্থকারিতা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিকার স্বয়ং নিশ্চয় করিয়া কহিলেন—'ঐশ্বর্য্যমদে যাহাদিগের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, দরিদ্রতাই তাহাদিগের উৎকৃষ্ট অঞ্জন। দরিদ্র লোক আপনার সহিত তুলনা করিয়া সকলকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে এবং কাহারও প্রতি হিংসা করে না। তাহার সর্ব্ব অভিমান চূর্ণ হইয়া যায় এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট পায় তাহাই তাহার পরম তপস্যা। কারণ কাহাকেও তপস্যা করিতে হইলে আহার বিহারে সংযমী, অভিমানশূন্য, নিন্দাত্যাগী প্রভৃতি হওয়া প্রয়োজন এবং ঐ সকল বৃত্তি দরিদ্রব্যক্তি আপনা হইতেই অর্জ্জন করে। আবার অন্নপ্রয়াসী দরিদ্রের দেহ ক্ষুধায় প্রত্যহ ক্ষীণ হইতে থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকল শুষ্ক হইয়া যায়; তাহাতে পরহিংসা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়। আবার সমদর্শী সাধুগণ দরিদ্রেরই সাহচর্য্য করেন এবং সাধুসঙ্গ পাইয়া তাহাদের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়। সাধুগণ ধনিগণেরও সাহচর্য্য করিতে যান্ কিন্তু ধনিগণ ঐশ্বর্য্যমদে এত মত্ত হইয়া থাকে যে, তখন সাধুদিগকে অনাদর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। কারণ সাধুদিগের সহিত তাহাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়া অর্থাৎ সাধুরা যে পদার্থগুলিকে (স্ত্রী-দ্যূত-মদ্য) উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা সেই সমস্তগুলিকে সাদরে আহ্বান করে। এখন এই দুইজন ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ এবং সুরাপানে মত্ত, অধিকন্তু স্ত্রৈণ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের বশে নাই, আমি ইহাদের অজ্ঞানকৃত অহঙ্কার অগ্রে নাশ করিব। আহা! ইহারা লোকপালেরপুত্র কিন্তু অজ্ঞানে এমন অন্ধ হইয়াছে এবং ইহাদের গর্ব্ব এত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহারা উলঙ্গ তাহা আদৌ বুঝিতে পারিতেছে না। ইহারা বৃক্ষ হইবার যোগ্য, কারণ বৃক্ষের মতন দরিদ্র জগতে আর কেহ নহে; তবে আমি ইহাদের স্মৃতি নষ্ট হইতে দিব না, কারণ স্মৃতি বিদ্যমান থাকিলে ইহাদের ভয় থাকিবে এবং ভবিষ্যতে শাপমুক্ত হইলে এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কখনও করিবে না"। এই প্রকার কহিয়া দেবর্ষি নারদ উহাদের প্রতি অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিলেন—"তোমরা অচিরে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হও, তবে তোমাদের স্মৃতি যেন নাশ না হয়। একশত দিব্যবৎসর অতীত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যহেতু তোমরা পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইবে এবং পুনরায় স্বর্গে আসিয়া তদ্বিষয়িনী ভক্তি পাইবে'।

দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষ হইয়া গোকুলে নন্দালয়ের নিকটে বাস করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ]

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকৃপায় ভক্তিমাহাত্ম্য আস্বাদন হইলে তাহাতে পরম সুখানুভব হয়। অতএব মন ভক্তি-রসাস্বাদনে বিভোর থাকিয়া আপনা আপনিই সংযত হইয়া পরে নির্বিষয় হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা হয় না। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই এসব ভজন পাই।

কিন্তু এস্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। শ্রীগুরুদেব ও শিষ্য সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এবং শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুদেবের হৃদয় স্নেহ-রসার্দ্র থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে শ্রীগুরুপ্রদত্ত-উপদেশে শিষ্যের কোন উপকারই হয় না; সে সকল উপদেশ আকাশে ভাসিয়া যায়। আবার শিষ্যেরও শ্রীগুরু-চরণে একান্ত নিজজনতা-বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। "শ্রীগুরু-চরণ ব্যতীত এই সংসারে আমার আপন বলিতে আর কেহ নাই; যেহেতু আত্মীয় স্বজন পিতামাতা সকলেই আমাকে সংসারের মধ্যে বান্ধিয়া রাখিতে চান। পরমদয়াল শ্রীগুরু-দেবের কিন্তু এত অপার করুণা যে, তিনি আমার বহির্ম্মুখতা-দোষ বিদূরিত করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-রসাস্বাদনের জন্য আমাকে সততই উন্মুখী করিতেছেন। মায়ার চক্রে বিবিধবাসনাবশে বহুদূরে সরিয়া পড়িলেও, কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত-আস্বাদন দান করিবার প্রলোভন দেখাইয়া নিজ-চরণে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। অতএব শ্রীগুরুচরণ-ব্যতীত এ জগতে আমার আর যথার্থ বান্ধব কে আছে?" এই ভাবটী সর্ব্বদা মনে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তবেই যথার্থ বস্তু লাভ হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম
বন্দ মুই সাবধান মনে॥

শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম কেবল ভক্তির সদ্ম স্বরূপ অর্থাৎ অকপটে ঐ শ্রীচরণসেবায় কেবলাভক্তি লাভ হয়। কেবলা ভক্তি বলিতে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত ভক্তি বুঝিতে হইবে। এজন্য আমি সাবধান-মনে তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি। শ্রীগুরুসেবার প্রকারও তাহাই। চরণসেবা বলিতে চরণ উপলক্ষণে সর্ব্বাঙ্গীন সেবাই বুঝিতে হইবে। আমাদেরই মত একজন মানুষের চরণসেবা করিতেছি, এইভাবে সেবা করিলে, তাহাতে কোন ফললাভ হইবে না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে "এই শ্রীগুরুচরণই আমার সর্ব্বস্ব। ইনিই আমার ইহকাল ও পরকালের বন্ধু। ইঁহার সেবাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইব। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম আমি এই শ্রীগুরুচরণযুগল-সেবাতেই লাভ করিব।" শ্রীগুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময়ও এইপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ভাবিতে হইবে "হা প্রভো! হা গুরুদেব! আর কতদিনে আপনার কৃপা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিব। আমার একান্ত অযোগ্যতা, বহির্ম্মুখতা, পরমপামরস্বভাবতা প্রভৃতি অসংখ্য দোষের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, যদি কৃপাপূর্ব্বক নিজ পরম কারুণ্যস্বভাববশতঃ এ অধমকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন, তবে আর কতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। এই সংসারের ত্রিতাপানলে আমি নিশিদিন দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। কাল সর্পের নিরন্তর দংশনজন্য বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছি। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণ লইলাম। হা প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন!

"ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো! সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥

হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা আমার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিউন্। এবং যাহাতে অকপটহৃদয়ে আপনার শ্রীচরণসেবা-বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, এ জাতীয় কৃপা করুন। হা প্রভো! আপনি ব্যতীত আমার আর কে আছে?" এই প্রকারে কেবল আকুলতাময়ী পিপাসা লইয়া তাঁর কৃপার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে শ্রীগুরুচরণের অপার মাহাত্ম্যসমূহের এক-কণামাত্র স্পর্শ করিয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করিলাম। ভবিষ্যতে শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার আশা রহিল।

ধ্বন্যালোক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ]

শ্রীঅভিনব গুপ্তাচার্য্য গ্রন্থের প্রারম্ভেও আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যকৃত ভক্তিমহিমাদ্যোতক মঙ্গলাচরণ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য এখানে তাহা উল্লেখ করিয়া পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা সমীচীন মনে করি ;

"স্বেচ্ছা কেশরিণঃ স্বচ্ছ স্বচ্ছ স্বায়িতেন্দবঃ
ত্রায়ন্তাং বো মধুরিপোঃ প্রপন্নার্ত্তিচ্ছিদো নখাঃ" ॥

অর্থাৎ যিনি স্বীয় ইচ্ছায় সিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত জনগণের দুঃখহারী নির্ম্মল মনোরম বক্রনখসমূহ, যাহা চন্দ্রকে সৌন্দর্য্যে খেদ প্রদান করে, তোমাদিগকে রক্ষা অর্থাৎ অভীষ্ট লাভের প্রতি আনুকূল্যাচরণ করুক। পূজ্যপাদ বৃত্তিকার আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য স্বয়ং পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্না নমস্কার-সম্পত্তিদ্বারা চরিতার্থ হইলেও ব্যাখ্যাতৃ ও শ্রোতৃগণের নির্ব্বিঘ্নে অভীষ্ট ব্যাখ্যা ও শ্রবণ লক্ষণ ফললাভের জন্য সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রকাশ-পূর্ব্বক পরমেশ্বরের স্মুখ্য জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীভগবান নিত্য উদ্যোগী। তথাপি যখন তিনি নিজ ইচ্ছায় নৃসিংহ-রূপ ধারণ করিয়াছেন ;—ইহাতে সংহারের প্রতিযোগীরূপে উৎসাহ প্রতীতি হওয়ায় বীররস ধ্বনিত হইতেছে। 'নখ-সমূহ আর্ত্তি হরণ করুক' বলায় প্রহরণ দ্বারা রক্ষণ কর্ত্তব্য হওয়ায় নখসমূহের বর্ত্তৃত্বের সাহত করণত্বের অভেদ জ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহাতে অতিশয় ভক্তিই সূচিত হইল। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় কেশরীরূপ ধারণ করিয়াছেন, নিজ কর্ম্মপরতন্ত্ররূপে কিম্বা অন্য কাহারও ইচ্ছায় এরূপ প্রকাশ করেন নাই। জগতের প্রতি কোন এক বিশিষ্ট দান গ্রহণ করিবার জন্যই তদ্রূপ ইচ্ছার উদ্গম হইয়াছে। যদিও সাধারণ নখসমূহের পক্ষে আর্ত্তিহরণ সম্ভবপর নহে, তথাপি যিনি স্বকীয় ইচ্ছায় ঈদৃশ নখসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার নখ সমূহের তাদৃশ কার্য্য অসম্ভব নহে। অথবা ত্রিজগতের কণ্টকস্বরূপ হিরণ্যকশিপু বিশ্বের মহাক্লেশদায়ক। সেইজন্য বস্তুতঃ ভগবানের চরণে শরণাগত জনগনের আর্ত্তিপ্রদ বলিয়া হিরণ্যকশিপুই যেন মূর্ত্তিমতী আর্ত্তি। সে বিনষ্ট হইলেই আর্ত্তির উচ্ছেদ সাধন হইবে। এইরূপে শ্রীভগবানের নৃসিংহ রূপেও পরম কারুণ্যই সূচিত হইল।

'চন্দ্র খেদ প্রাপ্ত হয়' এখানে অর্থশক্ত্যুদ্ভবন মূল ধ্বনি দ্বারা বালচন্দ্রত্বই ধ্বনিত হইতেছে। নখের ক্লেশকারিত্ব লোকে প্রসিদ্ধই আছে। নরহরি-নখসমূহের সেই আযাস-কারিত্বটী লোকাবরূপ প্রতিপাদিত হইল। সেই নখ-সমূহের নির্ম্মলতা ও বক্রতা দর্শনে বালচন্দ্র দুঃখ অনুভব করে। স্বচ্ছতা ও বক্রতা বিষয়ে তুল্য হইলেও, এই নখ-সমূহ প্রপন্ন জনগণের আর্ত্তিনাশে সমর্থ—কিন্তু সে (চন্দ্র) তৎসম্পাদনে অসমর্থ—এইরূপে ব্যতিরেকালঙ্কার ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বালচন্দ্র মনে করে যে পূর্ব্বে সেই অসাধারণ নির্ম্মলতা ও মনোহারিত্ব যোগ হেতু সকল জনগণের অভিলাষের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, অদ্য এই প্রকার দশটী বালচন্দ্রাকার নখসমূহ সন্তাপ ও আর্ত্তি-নাশে সমর্থ, তাহাদিগকেই জগৎ বক্রবালেন্দু মনে করিয়া দেখিবে কিন্তু তাহাকে দেখিবে না। এইরূপ দেখিয়া বালেন্দু অনবরত খেদ অনুভব করে। এইরূপে উৎপ্রেক্ষাপহ্নুতি ধ্বনিও সূচিত হইয়াছে। এইরূপে বস্তু-অলঙ্কার ও রসভেদে তিন প্রকার ধ্বনি দৃষ্ট হয়।

কবির প্রতিভাগুণ থাকিলে ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গের দ্বারা কাব্যার্থের বিরাম ঘটে না অর্থাৎ নব নব অনন্ত অর্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়া কাব্য সহৃদয়-হৃদয়ে আনন্দ বিধানে সমর্থ হয় কিন্তু প্রতিভা না থাকিলে কবির কোন তাদৃশ বস্তুই থাকে না যাহা দ্বারা নব নবত্ব উপজাত হইতে পারে। ব্যঙ্গার্থের যেরূপ অসীমতা ঘটিয়া থাকে, বাচ্যার্থেরও তাদৃশ হয়। সেইজন্য ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে,—

"অবস্থাদেশকালাদিবিশেষৈরপি জায়তে।
আনন্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি স্বভাবতঃ"। ৪।৭

অর্থাৎ শুদ্ধ বাচ্য বা যাহা ব্যঙ্গ্যের অপেক্ষা করে না, তাহারও স্বভাবতঃ অনন্ত অর্থ উপজাত হয়। চেতন ও অচেতন বাচ্যসমূহের স্বভাবই এই যে, অবস্থা, দেশ, কাল ও স্ব লক্ষণ ভেদে তাহাদের অনন্তনা হয়। প্রসিদ্ধ নানা স্বভাবোক্তি দ্বারাও নিরবধি কাব্যার্থ সম্পন্ন হয়।

চেতন বস্তুর অবস্থাভেদে নব নবত্বের উদাহরণরূপে মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন' অর্থাৎ সর্ব্ব উপমা-দ্রব্যের সমুচ্চয়ে বা একত্র মিলনে শ্রীপার্ব্বতীর রূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল উক্তিদ্বারা প্রথমেই তদীয়-রূপবর্ণনা পরিসমাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার যখন তিনি ভগবান্ শম্ভুর নয়নগোচর হইলেন, তখন এইরূপ কবির উক্তি দৃষ্ট হয়—'বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি বাসন্তী কুসুম-ভূষায় ভূষিত। এখানে সেই শ্রীপার্ব্বতীই মদনের উপকরণভূতারূপে অন্য ভঙ্গীদ্বারা বর্ণিতা হইয়াছেন। তিনিই পুনর্ব্বার নব বিবাহ সময়ে "তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং" অর্থাৎ সীমন্তিনীগণ সেই তন্বী পার্ব্বতীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ইত্যাদি। এই সকল উক্তি দ্বারা নূতন প্রকারে তাঁহার সৌন্দর্য্য নিরূপিত হইয়াছে। কবির নিকট সেই প্রকার বর্ণনা-সমূহ অপুনরুক্তি বা নব নব অর্থবিশিষ্টরূপে যে প্রতিভাত হয়, তাহাও বলা যায় না। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও প্রতিভাবলে কাব্যরচনা করিয়া থাকেন কিন্তু অননুসন্ধানেও তাহা এইরূপ নব নব অর্থবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যকৃত বিষমবাণ-লীলায় এইরূপ উক্ত আছে,—

'ন চ তেষাং ঘটতেঽবধির্ন চ তে দৃশ্যন্তে কদাপিপুনরুক্তাঃ
যে বিভ্রমাঃ প্রিয়ানামর্থাঃ বা সুকবিবাণীনাম্' ;

অর্থাৎ সুকবিগণের বাণীসমূহের যে সকল অর্থ ও প্রিয়াগণের যে বিভ্রমসমূহ তাহারা কখনও পুনরুক্ত ও সীমা প্রাপ্ত হয় না। বিভ্রমটী রসশাস্ত্রে পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃতাচিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত' অর্থাৎ শৃঙ্গার বশতঃ চিত্তবৃত্তির অস্থৈর্য্যই বিভ্রম নামে কথিত হয়।

অবস্থাভেদে নবনবত্বের উদাহরণও কুমার সম্ভবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অচেতন বস্তু হিমালয়, গঙ্গা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের যে দ্বিতীয় চেতনরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও উচিত চেতন বিষয় স্বরূপ যোজনা দ্বারা অন্তরূপে সম্পন্ন হয়। যেমন কুমারসম্ভবে প্রথমে পর্ব্বত-স্বরূপ হিমালয়ের বর্ণনা, পুনর্ব্বার সপ্তর্ষিগণের প্রিয়োক্তিতে সেই হিমালয়ের চেতন-স্বরূপ অপেক্ষা এক অপূর্ব্বরূপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সৎকবিগণের এইরূপ বর্ণনা রীতি-প্রসিদ্ধই আছে। যেমন কুমারীগণের নানা অবস্থায় নব নব ভাবোদ্গম হয়, সেইরূপ চেতনবস্তু সকলের অবস্থা-ভেদেও অবান্তর অবস্থাভেদ হেতু নানাত্ব ঘটিয়া থাকে। মদনশরাহত নায়িকাগণের অবস্থার বহু অবান্তরভেদ দৃষ্ট হয়। একই নায়িকার অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অবান্তর-ভেদ দৃষ্ট হয়। দেশভেদে বায়ু ও সলিল-কুসুমাদি অচেতন পদার্থ সমূহের নানাত্ব প্রসিদ্ধই আছে। চেতনা-বিশিষ্ট মানুষ পশুপক্ষীগণের গ্রাম, অরণ্য, সলিলাদিতে বাস নিবন্ধন পরস্পর অনেক ভেদ দৃষ্ট হয়। কেবল বিভিন্ন দিগ্দেশগত মানুষগণের মধ্যেই যে বিচিত্র ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহার কে সীমা নির্দ্ধারণ করিবে? বিশেষতঃ স্ত্রীগণের অনন্তভেদবৈচিত্রী বিদ্যমান আছে। সুকবিগণ সেইসকল বিষয় তাঁহাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বর্ণনা করেন।

কালভেদে নানাত্ব—যেমন ঋতুভেদে দিক্ আকাশের ও সলিল প্রভৃতি অচেতন পদার্থে দৃষ্ট হয় চেতনগণের মধ্যেও কালভেদে ঔৎসুক্যাদি ভাবের ভেদ দৃষ্ট হয়। স্বলক্ষণের ভেদ হেতু জাগতিক বস্তুসকলের বর্ণন প্রশংসনীয়ই হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে সকল কবি স্বীয় অনুভূত সুখ-দুঃখাদি ও তাহাদের নিমিত্তসকল অন্য মানবে আরোপ করিয়া স্বীয় অনুরূপ অন্যত্র সুখদুঃখাদির সামান্য আশ্রয় পূর্ব্বক কাব্য প্রণয়ন করেন, তাঁহাদের রচনা সকলের নিকট পুরাতনরূপে প্রতিভাত হয় কারণ সেই সুখদুঃখ-সমূহ সর্ব্বজনেরই প্রতীতির বিষয়। বিশেষতঃ সেই কবিগণ যোগীগণের মত অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান

মানবচিত্রে স্বীয় লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য তাদৃশ কাব্যের বিষয় পরিমিত হইয়া পড়ে। অতএব ভাবসামান্য-আশ্রয়ে কাব্যরচনা যুক্তিযুক্ত নহে ও আধুনিক যাহারা তাদৃশ প্রকারবিশেষকে অভিনব বলিয়া বোধ করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ধ্বন্যালোকের শেষের দিকে শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্য এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বমত সমীচীন নহে; কারণ সামান্য আশ্রয়ে কাব্য-প্রবৃত্তি হইলে অবস্থাদির-ভেদে, যে কাব্যের বৈচিত্র্য ও নব নবত্ব উপজাত হয়, তাহা অবশ্যই পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট নহে। যদি তাহা না হয়, তবে কাব্যের আনন্ত্যের বিঘাতক কিছুই সেখানে নাই। সামান্য আশ্রয়ে যদি কাব্যের গৌরব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তবে মহাকবিগণের কাব্য জগতে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে কিরূপে? সামান্য ভিন্ন অন্য কাব্যার্থ নাই। আদিকবি বাল্মীকি স্বয়ংই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। তিনি যদি সহচরীবিয়োগজনিত ক্রৌঞ্চের বেদনা সহৃদয় কবিরূপে অনুভব না করিতেন, তাহা হইলে সীতার বিরহজাত শ্রীরামের বিলাপ আত্মসাদৃশ্যে কখনই রামায়ণে বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেন না।

সেইজন্য এ সম্বন্ধে উক্ত আছে:—

বাল্মীকি ব্যতিরিক্তস্য যদ্যেকস্যাপিক স্যচিৎ

ইষ্যতে প্রতিভানন্ত্যং তত্তদানন্ত্যমক্ষয়ম্'।

অর্থাৎ কবি বাল্মীকি ভিন্ন যদি কোন এক ব্যক্তিও প্রতিভার অসীমতা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সামান্য আশ্রয়ে তাহা অক্ষয় হইবে।

মহাকবিগণের বাণী বা বাগ্রূপা ভগবতী দিব্য আনন্দ রস স্বয়ংই নিঃস্যন্দিত করিয়া অলৌকিক স্ফূর্ত্তিশীল প্রতিভা বিশেষ প্রকাশিত করেন। সেই প্রতিভা বা অপূর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা দ্বারাই এই অতি বিচিত্র কবিপরম্পরা-প্রবাহময় সংসারে কালিদাস প্রভৃতি দুই, তিন বা পাঁচজন মাত্রই মহাকবিরূপে গণনা করা হয়। রসাবেশ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণগুম্ফিত কাব্যরচনায় শক্তি প্রতিভারই প্রকাশ বিশেষ। সেইজন্য ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে:—

'সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু নিঃস্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি প্রতিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্ ১।৬

প্রতীয়মান অর্থ বা রসধ্বনির সদ্ভাবসাধক অন্য প্রমাণও আছে; যথা:—

'শব্দার্থ শাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে,
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্'।

অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বভূতো সেই অর্থ বা রসধ্বনির ভাবনা বা বাচ্য হইতে অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্য বিশেষ আস্বাদন বিষয়ে যাহারা বিমুখ ও যাহারা কেবলই কাব্যের শব্দার্থ-শাসন জ্ঞানবান, তাহাদের নিকট সেই শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান কাব্যার্থটী বেদ্য নহে। উহা কেবলই কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ সহৃদয় হৃদয়-বেদ্য। যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থটী বাচ্য রূপই হইত, তাহা হইলে বাচ্য-বাচকের স্বরূপ জ্ঞান হইলেই উহা জানা যাইত। সেইজন্য কাব্যে যাহারা বাচ্যবাচক-লক্ষণ প্রকাশেই বিশেষভাবে যত্নবান্ তাঁহাদের যেরূপ ষড়্জাদি সপ্তস্বর জ্ঞানগোচর হয় না, সেইরূপ প্রকৃষ্ট-কীর্ত্তিশালী গান্ধর্ব্ববিদ্যাবিদগণের নিকট এই ব্যঙ্গ্যার্থটী অগোচর থাকে। শুধু তাহাই নহে, যাঁহারা ব্যঙ্গ্যার্থ ও তৎব্যঞ্জক শব্দবিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহাদের কাব্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই মহাকবি শব্দে অভিহিত হন। এইরূপে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক কাব্যে প্রধান হইলেও কবিগণ যে প্রথমেই বাচ্য-বাচকই উপাদানরূপে গ্রহণ করেন তাহাও যুক্তিযুক্ত; কারণ যেরূপ কেহ যদি কোন পদার্থের দর্শন করিতে অভিলাষী হয়, তাহাকে দীপশিখার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ যাহার ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি আদরবিশেষ আছে সেই বাচ্যার্থে যত্নবান হয়। ব্যঙ্গ্যার্থপ্রাধান্যেই ধ্বনি সম্ভব। যেখানে বাচ্যবিশেষ অর্থ ও বাচক বিশেষ শব্দ অর্থান্তর অভিব্যক্ত করে, তাহাই ধ্বনি। ইহাদ্বারা বাচ্য বাচকের সৌন্দর্য্য-হেতুভূত উপমা ও অনুপ্রাসাদি হইতে ধ্বনির বিষয় যে স্বতন্ত্র তাহাই দেখান হইল। এ সম্বন্ধে ধ্বন্যালোকের কারিকাটী এইরূপ,—

'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জ্জনীকৃত স্বার্থৌ
ব্যক্তকাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ'। ১।১৩

সেইজন্য বাচ্য-বাচকে ধ্বনির অন্তর্ভাব অসম্ভব। এমন কি সমাসোক্তি-অলঙ্কারেও ধ্বনি দৃষ্ট হয় না। সমাসোক্তির লক্ষণ এইরূপ :—

'যত্রোক্তৌ গম্যতেঽন্যোঽর্থস্তৎসমানৈর্বিশেষণৈঃ
সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়া বুধৈঃ'।

অর্থাৎ যে উক্তিতে সমান শ্লিষ্ট বিশেষণ-সমূহের দ্বারা সংক্ষেপে অন্য অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাহাই সমাসোক্তি নামে অভিহিত হয়; যথা—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতং'।

এখানে সমান শ্লিষ্ট বিশেষণ দ্বারা রাত্রি ও নায়িকা-পক্ষে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইরূপে অন্য অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে।

রাত্রি পক্ষে—পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয়ে উদিত সান্ধ্য-অরুণিমা দ্বারা নিশার প্রারম্ভে জ্যোতিষ্ক সকল সেই প্রকারে চঞ্চল হইয়াছিল, যাহাতে শীঘ্রই রাত্রি দ্বারা রশ্মিমিশ্রিত অন্ধকারসমূহ গোধূলীর রক্তিমাভনিবন্ধন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল ও ইহা যে রাত্রির প্রারম্ভকাল তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

নায়িকা পক্ষে,—অগ্রে প্রকৃষ্ট অনুরাগে চঞ্চল নয়ন-তারকা বিশিষ্ট নায়িকার বদনকমল নায়ক-দ্বারা পশ্চাৎ হইতে এরূপ প্রেমরসভরে চুম্বনার্থ গৃহীত হইয়াছিল যে, সেই নায়িকা কখন তাহার নীলবসনখানি প্রেমাধিক্যে স্খলিত হইয়াছে তাহা দেখিতে পায় নাই।

এখানে যদি সম্মুখভাগেই নায়ক দ্বারা নায়িকার মুখ গৃহীত হয়, তথাপি ব্যঙ্গ্য প্রতীত হইলেও উহার প্রাধান্য নাই।

এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও নিশা ও শশিরূপ শৃঙ্গার বিভাবদ্বয়কেই সংস্কৃত করিয়া নায়ক ব্যবহারটী অলঙ্কৃত হইতেছে। সেইজন্য বিভাব-স্থানীয় বাচ্য হইতেই রসাভিব্যক্তি হইতেছে। কেহ বলেন 'তয়া নিশয়া' এইটী কর্ত্তৃপদ কিন্তু অচেতন নিশার কর্ত্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে। শব্দদ্বারাই নায়কের ব্যবহার অনুমিত বাচ্য কিন্তু ব্যঙ্গ্য নহে—এইজন্য ইহা সমাসোক্তি।

যাহারা এইরূপ বলেন তাহারা গ্রন্থের প্রকৃতার্থটী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

নায়িকার নায়ক যে ব্যবহার তাহা নিশায় সমারোপিত ও নায়িকার প্রতি নায়কের যে ব্যবহার তাহা চন্দ্রে সমারোপিত। এইরূপ ব্যাখ্যায় কোন দোষ-প্রসঙ্গই নাই।

ধ্বনিগুণীভূত-ব্যঙ্গ্যমার্গে কবি ভাব প্রকাশ করিলে যে তাহার ফল অনন্ত প্রতিভা তাহাও ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে। যদি কবির বাণী পুরাতন কোন অর্থকেও স্পর্শ করে, তাহা হইলেও অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া উহা নবরূপে প্রতিভাত হয়।

যেরূপ জগতে প্রকৃতি, অতীত কল্পপরম্পরা হইতে অনন্তবস্তু-নির্ম্মাণে হীনশক্তি হয় না, সেইরূপ কাব্যস্থিতি অনন্তকাল ধরিয়া কবিগণ দ্বারা উপভুক্তা হইয়াও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত নবনব ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে পূর্ব্বোক্তির তাৎপর্য্য এই—যে সকল কবি পরিমিত শক্তিশালী তাঁহাদের কাব্য-রচনাও যদি দেশকালাদিভেদে ভাবরস-পরিপাটীযুক্তা হয়, তাহা হইলে নব নবায়মানরূপে প্রতিভাত হয়। কাব্যে যদি সারভূত অর্থ বা রসধ্বনি বিরাজিত থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বতন কবি-নিবদ্ধবস্তুও অত্যন্ত শোভা প্রকাশ করে।

প্রাচীন রমণীয়তা দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া আধুনিক কাব্যও শোভাবিশেষ পোষণ করে যেরূপ রমণীর মুখ জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তদ্রূপ রসভাবাদির সদ্ভাবে কবির কাব্যেও অলৌকিক-মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। যেরূপ একটী জীব অন্য জীবের সদৃশ হইলেও এক নহে, সেইরূপ প্রাচীন কবির ভাবসাম্য কাব্যে বিদ্যমান থাকিলেও, উহা সম্পূর্ণ এক না হওয়ায় পুনরুক্তিদোষদুষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ কবির ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' বলা যাইতে পারে। যদিও উক্তগ্রন্থ আদিকবি বাল্মীকির শ্রীরামায়ণ অবলম্বনে রচিত তথাপি কবির অলৌকিক প্রতিভাবলে

তদীয় কাব্য চিরকাল বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাব্যের অনন্ত নব নব অর্থ বিদ্যমান থাকিতে অন্য-কবি-নিবদ্ধ অর্থগ্রহণে কবির তাদৃশ গুণ প্রকাশিত হয় না, ইহা ভাবিয়া ধ্বন্যালোকের শেষে উক্ত আছে যে, যাহারা পরদ্রব্য গ্রহণে অভিলাষী নহেন, সেই সকল সুকৃতি-শালী কবিগণের কাব্যরচনায় ভগবতী সরস্বতী যথাভি-লষিত বস্তু প্রদান করেন। ইহাই মহাকবিগণের মহা-কবিত্ব; সেইজন্য ইহা লইয়া বিবাদের প্রয়োজন নাই। মূল কারিকাটী এইরূপ :—

'প্রতায়ন্তাং বাচো নিমিতবিবিধার্থামৃতরসাঃ
ন বাদঃ কর্ত্তব্যঃ কবিভিরনবদ্যে স্ববিষয়ে।
পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেঃ
সরস্বত্যৈবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী। ৪।১৭

(ক্রমশঃ)

"স ‌ ‌ ‌ ‌ "

[শ্রীকৃষ্ণদাস কবিভূষণ]

কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ তৃঃ স্কঃ)

পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ প্রতিযুগেই জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবদুপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যাগানুষ্ঠান, দ্বাপর যুগে পরিচর্য্যাদির দ্বারা উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন; কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন।

নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিলাভের পরম উপায়। নাম সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানকারী। এজন্যই পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খাদির বিচার না করিয়া কলিহত-জীবগণের জন্য শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বদা উপদেশ করিয়াছেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিতে অন্য গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
(বৃঃ নাঃ পুঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থানকালে সন্ন্যাসী-প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীপ্রভুকে বলিয়াছিলেন :—

সন্ন্যাসী হইয়া করে নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত-পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭)

সর্ব্বাবতার-শিরোমণি করুণাসাগর প্রভু ভঙ্গীতে উত্তর দিয়াছিলেন—

গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া কৃষ্ণনাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আমি সর্ব্বদা নাম সংকীর্ত্তন করি।

নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার ত্রিভুবন॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবত-সার এই বলে বারে বারে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭)

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ শ্রীভাঃ

শিবি নামক যোগীন্দ্র রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন, রাজন্! ভগবদ্ভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রিয় সেই শ্রীহরির নাম যখন কীর্ত্তন করিতে থাকেন, অনুরাগের আবির্ভাবে তাঁহাদিগের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, আর অবশ-হৃদয়ে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য কখনও রোদন কখনও চীৎকার, কখনও নৃত্য করিতে থাকেন।

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উত্তর প্রত্যুত্তরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় হরিনাম মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকে যথা :—

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

যিনি চিত্তরূপ দর্পণের মলিনতানাশক, সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণরূপ কুমুদের প্রকাশ-বিষয়ে জ্যোৎস্নাপ্রদ, অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য, বিদ্যারূপ বধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বৃদ্ধিকর এবং পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদক স্বরূপ ও অন্তঃকরণের তাপনাশক, এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন্।

কোন এক সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দরায়কে উপদেশ দিয়াছিলেন যে—হরিনাম সংকীর্ত্তন কলির পরম উপায় ও সম্বল। একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন (হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি) দ্বারা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-লাভ করা যায়। ইহাই প্রভুর উপদেশ।

সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণে আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ)

এই নাম সংকীর্ত্তনের এমন অত্যাশ্চর্য্য অপরিসীম গুণ যে—ইহাদ্বারা হৃদয়ের কাম, লোভ ও রাগ দ্বেষাদি মলিনতা দূর হয় ও চিত্ত শুদ্ধ হয়। কলিযুগে একমাত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রবিহিত। সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন, এবং প্রীত হইয়া সাধকের সকল অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে প্রেম অর্পণ করেন, এবং প্রেম দিয়া স্বীয় চরণসেবা দান করেন। যিনি নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা লাভ করেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

করভাজন্ কহিলেন,—রাজন! কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীল-মণি-জ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং অঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র পারিষদগণের সহিত যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন জ্ঞানি-মানবগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন। অর্থাৎ অকৃষ্ণ পীতবর্ণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বরূপ ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য রূপ অঙ্গ, শ্রীবাসাদিরূপ উপাঙ্গ, ভগবন্নাম-রূপ অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর গোবিন্দাদিরূপ পার্ষদ দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুদ্ধিমান্ লোক সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
(চৈঃ চঃ আঃ)

নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সর্ব্ববিধ পাপ দূরীভূত হয়, এবং সংসার-বন্ধন, ত্রিতাপজ্বালাদি দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হয়। চিত্তের দুর্ব্বাসনাদি চিরতরে নষ্ট হয়। তখন চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হয়।

কলির বলবত্তর সাধনই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। উহা দুষ্টাশ্ব-রূপ মনের সুদৃঢ় রশ্মি—উহা মদমত্ত করি সদৃশ চঞ্চল চিত্তের সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ।

ভুবনপাবন ও পরম দয়ার আধার শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয় যে সময় বেনাপোলের বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন সাধন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বহু ব্রাহ্মণ সজ্জনাদি হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে সম্মান ও পূজাদি করাতে, অসহিষ্ণু হইয়া সেই দেশের অধ্যক্ষ পাষণ্ডীপ্রধান বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খান হরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য একটী বেশ্যাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। খানের প্রেরিতা পরমাসুন্দরী যুবতী বেশ্যাটী যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরের দ্বারে বসিয়া থাকে,

ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। বেশ্যার আশা নামকীর্ত্তন শেষ হইলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া খানের নিকট ফিরিবে। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। এক রাত্রি গেল, দ্বিতীয় রাত্রে বেশ্যা উপস্থিত হইল, সে রাত্রিও নামকীর্ত্তনে শেষ হইয়া গেল। তৃতীয় রাত্রিও নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শেষ হইয়া যায় যায়, এমন সময় বেশ্যা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি পাপীয়সী; আমার পাপের সংখ্যা করা যায় না। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া নিস্তার করুন।" বেশ্যার এই কথা শ্রবণ মাত্র দয়ার ঠাকুর হরিদাসের দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি বেশ্যাকে নামকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। নামের কি অচিন্তনীয় শক্তি। সেই শুভ প্রভাতে বেশ্যার জীবনের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। ধন্য সাধুসঙ্গের মহিমা! ধন্য অসংখ্যাত-নামকীর্ত্তনের অপরিসীম শক্তি। সেই অস্পৃশ্যা কুলটা ক্রমে :—

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলা পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি॥ (চৈঃ চঃ)

ধন্য হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মহিমা। কলিতে বিষয়-বৈরাগ্যের জলন্ত মূর্ত্তি পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥

ভগবদ্‌কৃপা লাভের একমাত্র উপায়ই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলির জীবগণকে অল্পায়ু ও দুর্ব্বল জানিয়া, বর্ত্তমানযুগে জীবসমূহ যোগাদি যাজন করিতে অসমর্থ দেখিয়া প্রভু আমার সর্ব্বসাধনার সার শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনেরই উপদেশ করিয়াছেন। যিনি শ্রীপ্রভুর উপদিষ্ট হরেকৃষ্ণ নাম সদা সর্ব্বদা জপ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমান ভাগ্যবান্ আর এ জগতে কে আছেন?

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক সম॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা

(গোবিনলাল)

ঝিঁঝিট—একতালা।

অনন্ত অখণ্ড শ্রীরাসমণ্ডল অসংখ্য শশাঙ্ক উজল গো;
তার মাঝে রাজে প্রেমে ঢল ঢল নবল কিশোরযুগল গো;
সেরূপ মোহন মাধুরী নেহারি গ্রহতারাগণ আপনা পাসরি
অনিমেষ-আঁখি দাঁড়ায়েছে ঘেরি বিমল আনন্দে বিহ্বল গো।
ভূধর নির্ঝর তটিনী সাগর তরুলতা গুল্ম জঙ্গম স্থাবর,
প্রেমানন্দ-ভরে নীরব নিথর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল গো;
যে আছে যেখানে নিখিল ভুবনে চেয়ে আছে সবে
চকিত নয়নে,
প্রাণ ভরি হেরি পরাণ-রমণে করিছে জনম সফল গো;
বিরিঞ্চি নারদ শিব পুরন্দর বক্ষে বহে প্রেম-অশ্রু দর দর,
হেরি অভিনব রূপ মনোহর নবজলধর শ্যামল গো;
যোগী ঋষি দেব অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ বিদ্যাধর,
পিশাচ দানব যক্ষ রক্ষ নর অপূর্ব্ব উল্লাসে উছল গো;

ডালে ব'সে সুখে হেরে শুকশারী গ্রীবা উচ্চ করি ময়ূরময়ূরী,
নীরবে ভ্রমিছে ভ্রমর ভ্রমরী ঘেরিয়া চরণ-কমল গো;
ষড় ঋতু সবে একত্র বিরাজে সেজেছে প্রকৃতি সুমধুর সাজে,
ত্রিভুবন ত্যজি পলায়েছে আজি মদন আতঙ্কে আকুল গো;
সুরভি কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটিয়াছে আজি পুঞ্জে পুঞ্জে,
প্রাণঃনোবম পুণ্য পরিমলে স্বরগমরত ভরল গো;
কৃমিকীট মীন কূর্ম্ম সরীসৃপ পশু বিহঙ্গম পতঙ্গ পন্নগ,
জগৎ মাঝারে আছে যত জীব রাস-রসে সবে মাতল গো;
স্মরি সে বিচিত্র লীলার মাধুরী হিয়া মাঝে হেরি
শ্রীরাসবিহারী,
যুগল চরণে লওগে শরণ পরাণ করিয়া শীতল গো;
জীবে জড়ে সবে দেখিবে তখন—অমল উজল সেরূপ চিদ্‌ঘন
প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ-মিলন; হৃদয় হইবে শীতল গো।

শ্রীকৃষ্ণের দোষ

(শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ)

অনন্ত কল্যাণ-গুণ-রত্নাকর শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হয়েন। দুর্ম্মতিহত এ পামর তাঁহার কতিপয় দোষের কথা লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। মহাপাষণ্ডী মনে করিয়া, অধমের প্রতি তাঁহারা কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিবেন কি?

স্বীয় আবির্ভাববিশেষ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে তাঁহার দোষের কথা স্বয়ং তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। নিজে স্বীয় দোষ কীর্ত্তন করিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় জয় করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন কিনা জানিনা; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহার তথাকথিত দোষগুলি শুনিয়া চিরতরে তদীয় শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন।

তন্ত্রে আঠারটী মহাদোষের উল্লেখ, এবং ঐ সকল দোষ শ্রীভগবানে নাই বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদ আলোচনা করিলে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ষোলটী দোষই অঙ্গীকার করিয়াছেন। কুরুচিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরদারাভিমর্ষণ দোষে জড়িত করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব অকাট্য যুক্তিদ্বারা সেই দোষ খণ্ডন করিয়াছেন, মহামনীষি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও তাহাতে প্রবোধ পাইয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। তন্ত্রকথিত আঠারটী দোষের আলোচনার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা। মহাদোষসমূহ যথা—

> মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বনঃ।
> লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ॥
> অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
> বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষ অষ্টাদশোদিতাঃ॥
> (বিষ্ণুযামল)

"মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বনকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ দোষ।"

শ্রীভগবানে এই সকল দোষ নাই—

> অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিতা ভগবত্তনুঃ।
> সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥

"শ্রীভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষরহিতা, তাহা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী, সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিনী।"

শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাতে রুক্ষরসতা ও উল্বন কাম ব্যতীত ষোলটী দোষ প্রকটিত হইয়াছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মোহ—অঘাসুরবধের উল্লাসধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা নিজধাম সত্যলোক হইতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি অঘাসুরের সদ্গতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্য মনোহর মহিমা দর্শনের ইচ্ছা করিলেন। এদিকে অঘাসুরবধের পর শ্রীকৃষ্ণ সরোবরপুলিনে সখামণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকলেরই ভোজনপরিপাটী অদ্ভুত। শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তের তালুতে একটা বড় গ্রাস পরিমিত দধিমাখা অন্ন রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাসে তাহা ভোজন করিতেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণের পালিত গো-বৎসগুলি নিকটে তৃণ ভোজনে নিরত ছিল; মায়া বিস্তার করিয়া ব্রহ্মা সেগুলি হরণ করিলেন। সখাগণ বৎসগুলি না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন, ভোজন ত্যাগ পূর্ব্বক অনুসন্ধানের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। নিজেই অন্নের গ্রাস হাতে করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এ দিকে সেই অবসরে ব্রহ্মা তাঁহার সখাগণকেও হরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিবার পর,—

ততো বৎস্যানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥

শ্রীভা ১০।১৩।১৬

"বৎসগুলিকে না পাইয়া পুলিনে আসিয়া দেখেন, বৎসপালক সখাগণও নাই। কৃষ্ণ তখন বৎস ও বৎসপালক উভয়কেই বনের চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।"

এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণে মোহ (অজ্ঞান) দেখা যায়। তখন যদি তাঁহাতে সর্বজ্ঞতা থাকিত, তবে ঐরূপ ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধান করিবেন কেন?

তন্দ্রা-খেদ-শ্রম—

কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥

শ্রীভা ১০।১৫।১৪

"শ্রীকৃষ্ণ সখা গোপবালকগণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া, বৃক্ষমূলে পল্লব-রচিত শয্যায় কোন গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন।"

এস্থলে পরিশ্রমের কথা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। পল্লবশয্যায় শয়ন হইতে তন্দ্রা ও খেদ অনুমিত হইতেছে।

ভ্রম—শ্রীকৃষ্ণ কৌমারলীলায় যখন ব্রজরাজের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেন, তখন আঙ্গিনা দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিলে তাঁহাকে নিজগৃহজন মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হামাগুড়ি দিয়া যাইতেন; পরে যখন বুঝিতেন ইনি অন্যলোক, তখন—

মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ।

গীতা, ১০।৮।১২

"মুগ্ধ ও অত্যন্ত ভীত জনের মত জননী যশোদা রোহিণীর নিকট আগমন করিতেন।"

অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিলক্ষণো ভ্রমঃ—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির মত কোন বস্তু যাহা নয়, সেই বস্তুকে তাহা মনে করা ভ্রম। যিনি গৃহজন নহেন, তাহাকে গৃহজন মনে করিয়া অনুসরণ করায় শ্রীকৃষ্ণে ভ্রমের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইল।

লোলতা—চঞ্চলতা—একদা ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, তখন কতিপয় ব্রজমহিলা তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন—'অয়ি ব্রজেশ্বরি! যিনি সুশান্ত হইয়া তোমার ক্রোড়ে বসিয়াছেন, তিনি আমাদের গৃহে যাইয়া কত উৎপাত করেন শুন,—

বৎসান্ মুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাত-হাসঃ।

শ্রীভাঃ ১০।৮।২২

"অসময়ে বৎস মোচন করিয়া দেন এবং ক্রোধ প্রকাশ করিলে হাস্য করেন।" এইরূপ আরও বহু চাঞ্চল্য তাঁহারা বর্ণন করিয়াছেন।

মদ—হর্ষজনিত চিত্তবিকার। অপরাহ্ন সময়ে গোচারণের পর শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন বর্ণন করিতে করিতে শ্রীগোপীগণ বলিয়াছিলেন—

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।

শ্রীভা, ১০।৩৫।২৪

"সুহৃদগণের যথোচিত মানদাতা বনমালী আসিতেছেন; মদে ইঁহার নয়নযুগল বিহ্বল হইয়াছে।"

মাৎসর্য্য—পরোৎকর্ষাসহন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিলে, ইন্দ্র ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত দ্বারা ব্রজবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদন্তমঃ।

শ্রীভা ১০।২৫।১৬

"লোকপালাভিমানী ইন্দ্র অজ্ঞতাবশতঃ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে বড় গর্ব্বিত হইয়াছে; আমি তাহার এই গর্ব্ব হরণ করিব।"

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য তাহার মাৎসর্য্যদ্যোতক।

হিংসা—শ্রীকৃষ্ণ পূতনা, তৃণাবর্ত্ত বকাসুর, অঘাসুরাদিকে বধ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে হিংসা দোষের স্থিতি প্রতিপন্ন হয়।

অসত্য—কৌমার লীলায় শ্রীকৃষ্ণ একদা মৃত্তিকাভক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলরামাদি বালকগণ ব্রজেশ্বরীকে এ কথা জানাইলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে, তিনি বলিলেন—

নাহং ভক্ষিতবানম্ব! সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।

শ্রীভা, ১০।৮।২৬

"মা, আমি মাটী খাই নাই; ইহারা সকলে মিথ্যা-বাদী।"

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণে অসত্যবাদিতা দোষ দেখা যায়। কেবল তাহা নহে, জরাসন্ধ বধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন।

আকাঙ্ক্ষা—দামবন্ধন লীলায় বর্ণিত আছে, একদা প্রত্যূষে ব্রজেশ্বরী দধিমন্থন করিতেছিলেন, তখন—

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নতীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥
শ্রীভা, ১০।৯।২

শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানাভিলাষে দধিমন্থনকারিণী জননী সমীপে গমন করিলেন এবং মন্থনদণ্ড ধরিয়া তাঁহার প্রীত্যুৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে মন্থন করিতে বারণ করিলেন।"

এস্থলে আকাঙ্ক্ষা (স্তন্যপানস্পৃহা) দোষের স্থিতি স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রোধ—তারপর যখন ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন—পাকগৃহে জলন্ত চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিলেন এবং তাড়াতাড়ি দুগ্ধ রক্ষা করিতে গমন করিলেন। ইহাতে—

স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সন্দশ্য দদ্ভিঃ ইত্যাদি।
শ্রীভা, ১০।৯

"শ্রীকৃষ্ণ জাতক্রোধ হইয়া দন্তসকল দ্বারা স্ফুরিত অরুণ অধর দংশন করিলেন।" এইস্থলে স্পষ্টভাবে ক্রোধের উদ্রেক বর্ণিত হইয়াছে।

আশঙ্কা—বিতর্ক। ব্রহ্মা গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিলে—

ক্বাপ্যদৃষ্টান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥
শ্রীভা, ১০।১৩।১৪

"বনমধ্যে কোন স্থানেই বৎস ও বৎসপালকগণকে না দেখিয়া বিশ্ববিৎ কৃষ্ণ সহসা বিধিকৃত সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। যখন বনে বনে বৎস ও বালকগণকে খুজিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের 'তাহারা কোথায়'—এই বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিভ্রম—জগদাবেশ। উপনিষদে আছে,—

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।

"তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে জগতের সৃষ্টি। জগতের যাবতীয় বস্তুরূপে পরিণমিত হওয়ায়, তিনি জগতে আবিষ্ট আছেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ১৭।৬

"যাহারা শরীরস্থঃ ভূতকলকে উপবাসাদি কঠিন তপস্যা দ্বারা কৃশ করে, তাহারা এই কার্য্য দ্বারা শরীর-মধ্যস্থিত আমাকে কৃশ করে। ইহারা আসুর ভাবাবিষ্ট।"

উপবাসাদি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহই ক্লিষ্ট হয় এবং দেহাভিমানী জীব ক্লেশ বোধ করে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ক্লেশ দেওয়া হয় বলায়, ঐ সকলে তাঁহার আবেশ স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

"আমি সর্ব্বভূতে সম, আমার দ্বেষের পাত্র নাই, প্রিয়ও কেহ নাই। কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিদ্বারা ভজন করে আমি তাহাদিগেতে অবস্থান করি, তাহারাও আমাতে অবস্থান করে"।

এস্থলে ভক্তপক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। ভক্তাপেক্ষাও প্রতীত হয়।

পরাপেক্ষা—অন্যাশ্রয়ণ। মৃদ্ভক্ষণ-লীলাদিতে পরা-পেক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়—

যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত।
শ্রীভা, ১০।৮

"যশোদা ভয়ব্যাকুলনয়ন কৃষ্ণকে বলিলেন"। যাহার অপেক্ষা থাকে তাহার অপ্রীতিকর কার্য্য করিলে ভয় উপস্থিত হয়;—যদি অপেক্ষিত বস্তু হইতে বঞ্চিত হই—এই ভাবনাই ভয়ের হেতু॥

আর, শ্রীবৈকুণ্ঠদেবোক্তিতে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে,—

অহং ভক্ত-পরাধীনঃ। শ্রীভা, ৯।৪।৩২

"আমি ভক্তাপরাধীন"। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে বহুস্থলেই ভক্তপরাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শ্রীকৃষ্ণে ষোলটী দোষের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইল। কৃষ্ণরসতা-প্রেমসম্বন্ধ ব্যতীত অনুরাগ এবং উল্বন-কাম-দুঃখহেতু কাম, এই দুইটী না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলা যায় না। শ্রীভগবান্ নির্দ্দোষ গুণ-রত্নাকর বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহার উপাসনা করেন। এত-গুলি দোষ যাহাতে দেখা যায় তিনি কিরূপে উপাস্য হইতে পারেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দোষ সর্ব্বত্র দোষ হয়না, গুণও সর্ব্বত্র গুণ হয়না; দেশ কাল পাত্রভেদে অনেকস্থলে দোষ গুণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যেমন, কোন দুর্ব্বৃত্ত কোন অসহায় রমণীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইয়াছে। উহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গেলে দুর্ব্বৃত্তকে হিংসা করিতে হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া কোন সমর্থ ব্যক্তি যদি ঐ কার্য্যে বিরত থাকে, তবে কেহই তাহার অহিংসাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিবেনা। পরন্তু, এস্থলে হিংসাই গুণ বলিয়া পরিগণিত হইত। ফল কথা, যাহাতে সজ্জনের রুচি জন্মে তাহাই গুণ—"জনানুরাগহেতবো গুণাঃ"। শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত দোষসকল আছে বলিয়া, সজ্জনগণের তাঁহাতে বিরক্তি দেখা যায় না; ঐ সকল দোষসম্বলিত তদীয় লীলাকথা পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি ত্যাগ করিয়া পরমাবেশ-সহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং মহামনীষি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ অন্তিম-কর্ত্তব্য রূপে ঐ লীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরে নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র মহর্ষি আগ্রহ-সহকারে শ্রীসূত মুখে তাহা শুনিয়াছিলেন, অদ্যাপি মহানুভব ব্যক্তিগণ ঐসকল কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থতা বোধ করেন। ইহাতে বুঝা যায় মোহাদি দোষ-রূপে খ্যাত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে সে সকল গুণ-রূপেই ব্যক্ত হইয়া সজ্জন-গণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং মোহাদি শ্রীকৃষ্ণের দোষ নহে।

তন্ত্রে যে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানে মোহাদি দোষ নাই তাহা যথার্থ। এ সকল মায়ার রজঃ তমোগুণ সম্ভূত। গুণাতীত শ্রীভগবানে এ সকল থাকিতে পারেনা। তবে ভক্তবাৎসল্যাদি স্বরূপানুকম্পী গুণসকল তাঁহাতে আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত চিন্ময়ী লীলাশক্তির উদ্ভাবিত মোহাদি তিনি অঙ্গীকার করেন এই অভিপ্রায়ে শ্রীব্রহ্মা বলিয়া-ছেন—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।

শ্রীভা, ১০।১৪।৩৭

"হে প্রভো! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত-জনগণের আনন্দরাশি বিস্তার করিবার নিমিত্ত নরান্তরের মত জন্মাদি লীলার অনুকরণ করেন"।

এই বাক্য-প্রমাণে প্রতীত হয়, ভক্ত-বিনোদের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব তাহাও করিয়া থাকেন।

অজ্ঞ-জীবের মায়াপরবশতা হেতু মোহাদি দোষ উপস্থিত হইয়া তাহাদের মায়াবন্ধন সুদৃঢ় করে, এই নিমিত্ত জীবের পক্ষে এ সকল দোষ। ভক্তিপরবশ শ্রীভগবানে ভক্তিপ্রভাবে মোহাদি ব্যক্ত হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য পুষ্টি করে এবং মহাগুণরূপে পরিণত হইয়া প্রাজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীশুকদেবাদির চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি সমুদয়ই যে ভক্তবিনোদনের নিমিত্ত ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বারান্তরে দেখাইবার আশা রহিল।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[১০]

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

তরুকে আশ্রয় করিবার জন্য লতিকার যেমন স্বাভাবিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়, এবং বিটপী আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত যেমন তাহার নিরাশ্রয়তা ও অবসন্নতার অবসান হয় না, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, লতিকার মতই এমন কোনও এক উৎকৃষ্ট আশ্রয়-তরুকে অবলম্বন করিতে চাহে,—যাহাতে অবলম্বিত হইয়া, তাহার সকল উদ্বেগ ও অবসাদ,—তাহার সকল বিঘ্ন ও বিষণ্ণতা বিদূরিত হয়। জীব মাত্রের ইহা স্বাভাবিক অভিলাষ হইলেও, সেই অভিপ্রায় ব্যবহার-ধর্ম্ম বা স্তূপীকৃত জড়ভাব দ্বারা আবরিত থাকায়, উহা স্বরূপে প্রকাশ না হইয়া বিবিধাকারেই যে ব্যক্ত হইয়া থাকে, নিবিষ্টতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। জীবাত্মার এই বাঞ্ছা-লতিকা যখন কোনও বিশেষ ভাগ্যোদয়ে পরিশুদ্ধি ও পরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়,—সেই আশ্রয়-তরু অবলম্বন করিয়া তাহারই সুখ-সাধনেচ্ছা ভিন্ন যখন অন্য তাৎপর্য্য আর পরিদৃষ্ট হয় না,—জীবের সেই বৃত্তিবিশেষ বা বাঞ্ছা-লতিকার পূর্ণ অভিব্যক্তিরই অপর নাম "ভক্তি" বা "ভাগবতী-বৃত্তি"। "কৃষ্ণ-কল্পতরু" ভক্তি-বল্লীর শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন।

আবার, নবলতা যেমন তরুণ তমালে অবলম্বিত হইতে চাহে, তেমনি তমালের পক্ষেও স্পষ্টতঃ না হউক—এমন একটা অব্যক্ত অভিলাষ অবশ্যই আছে, যাহাতে তমালও চাহে, সে নব-বল্লীর অবলম্বন হয়। ব্রততী ও বনস্পতির মধ্যে এই যে পরস্পরে অবলম্বিত ও অবলম্বন ভাব,—ইহা যে কেবল উপকৃত ও উপকারক সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত তাহা নহে,—তাহার উপরেও এমন কোনও এক স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধে উভয়ে সংবদ্ধ, যেখানে এই পরস্পরের মিলনে একের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যের অপ্রয়োজনীয়তার কোনও পরিচয় নাই,—আছে কেবল উভয়ের মিলনের জন্য উভয় দিকেই সমান প্রয়োজন বোধ—সমান ব্যাকুলতা।

পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপ বা শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মার মিলন-মধ্যেও সেইরূপ উভয় পক্ষেই যে পরস্পর প্রয়োজন বোধ নিহিত রহিয়াছে,—উভয় পক্ষেরই পরস্পর ব্যাকুলতা হইতেই যে সে মিলন সংঘটিত হয়,—সে সংবাদ ভক্তিবাদ ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই; ইহা কেবল ভক্তি বা প্রেমধর্ম্মেরই বিজয় বার্ত্তা। জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যে পরস্পর এই যে ব্যাকুলতাভরা মধুর সম্মিলন,—ইহারই নাম "মহা-মিলন"। একমাত্র প্রেম-সূত্রেই মহামিলনের মধুর গ্রন্থি সংবদ্ধ হয়, তদ্ব্যতীত উহা অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না। 'জীব-জগতের এই শ্রেষ্ঠতম আশার-বাণী কেবল ভক্তিবাদ—বিশেষভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমবাদ" ব্যতীত. কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কোনও ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই। প্রেম-ধর্ম্ম ভিন্ন অপর সকল ধর্ম্মের সারমত এই যে,—কেবল দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বা ভগবদ্রূপ পরতত্ত্বকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু জীবকে প্রাপ্ত হওয়া পরতত্ত্বের নিজের পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই; যে হেতু তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব.—তিনি আপ্তকাম; সুতরাং তাঁহার দিকে কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই; তবে যে শরণাগত জীবকে তিনি সংসার পাথার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক, স্ব-চরণ-সমীপে স্থান দান করিয়া, তাহাকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন, সে কেবল তদীয় অহৈতুকী কৃপাগুণে জীবের উপকারক হইয়া জীবকে উপকৃতই করিয়া থাকেন; ইহাতে জীবের প্রয়োজন সাধন ভিন্ন তাঁহার স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই।"—পরতত্ত্বের সহিত জীবত্বের এতাদৃশ সম্বন্ধ হইলেও, পরতত্ত্বের সীমা ও জীব-ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ যেখানে অবসান-প্রাপ্ত,—সেই ভক্তি-রাজ্যে—প্রেমরাজ্যে—ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। তাই সকল ধর্ম্মের অগোচর সেই নিগূঢ় বার্ত্তা—জীবজগতের

সেই পরমা আশার বাণী, কেবল প্রেমধর্ম্মকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে জগত বিদিত হইয়াছে,—শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া জীবের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, শ্রীভগবানের পক্ষেও জীবকে স্বরূপে বা ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন। ভগবৎসেবারূপ পূর্ণ স্বধর্ম্ম জাগ্রত হইলে, তদীয় চরণাশ্রয় করিবার জন্য জীবের সেই বিশুদ্ধ বাঞ্ছা-লতিকা বা ভক্তিবল্লী যখন কৃষ্ণাভিসারিণী হয়, তখন সেই অভিসারিকাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া, পরম সাদরে তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবার জন্য শ্রীভগবৎ-কল্পতরুও নিরন্তর ব্যাগ্র হইয়া থাকেন। মধুকর যেমন মকরন্দের জন্য লোলুপ হয়, ভক্তিবল্লী হইতে বিকসিত প্রেম-প্রসূনের মধুপান করিবার জন্য শ্রীভগবান মধুব্রত হইতেও সতত ব্যাকুল। তিনি পূর্ণকাম বলিয়া তাহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল প্রেম-মকরন্দই ভগবদ্‌ভ্রমরের একমাত্র উপজীব্য। সর্ব্বাধীশ ভগবানের এই প্রেমাধীনতা—এই ভক্তবশ্যতা, ইহা তাঁহার দুষণ নহে, পরন্তু ভূষণস্বরূপই জানিতে হইবে। সর্ব্ব গুণাকর শ্রীভগবানের—ভক্তিবশ্যতা—ভক্তাধীনতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পদ ; অতএব প্রেমভক্তির বিকাশ দেখিবার জন্য ও বিকসিত প্রেম-প্রসূন প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার নিত্যই আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ আছে। পূর্ণকাম শ্রীভগবানের এই যে অভিলাস বা আবশ্যকতার সংবাদ,—ইহাই জীবের পক্ষে নিরাশার ঘনান্ধকারের প্রান্ত সীমা হইতে সমুদিত আশার তরুণ অরুণালোক-স্বরূপ। একমাত্র ভক্তিবাদ হইতে বিকীর্ণ এই আশার উজ্জ্বলতম আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইলেও উলুক-স্বভাব জীব-সাধারণ আমরা,—আমাদের বদ্ধদৃষ্টির সমক্ষে তাহা গ্রাহ্য হইবার বিষয় নহে ; "উলুক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ"।—(শ্রীচরিতামৃত)

কেবল প্রেম-ধর্ম্মই প্রচার করিতে পারিয়াছেন,—"এক মাত্র মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য, তেমনি ভক্তের হৃদয়-কমলভরা প্রেমামৃতই জগজ্জীবন শ্রীভগবানের জীবনোপায়। শ্রীভগবান্ অসীম বলিয়া তাঁহার প্রেমপিপাসাও অনন্ত ; তাই অনন্ত জীব-হৃদয়-কমলে প্রেম-মকরন্দের সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অনন্ত-ব্যাকুলতার বিরাম নাই। এই জন্যই অনাদিকাল হইতে গোলোকে ও ভূলোকে অনন্তবার তাঁহার আসা ও যাওয়া চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেও। নীড়চ্যুত—"বিপদগ্রস্ত" বিহঙ্গিনীর পার্শ্বে বিহঙ্গ যেমন ব্যাকুল প্রাণে শতবার আসা যাওয়া করিয়া তাহাকে "স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে ;— তাহার মধুর চঞ্চুপুটের প্রেমস্পর্শ প্রাপ্ত হইতে চাহে ;—তাহার সকল "অভাব" ঘুচাইয়া দিয়া তাহাকে "স্ব-ভাব"—স্ব-নীড়ে ফিরাইয়া আনা যেমন বিহঙ্গিনার প্রতি শুধু কৃপা নহে,—কৃপা হইতে অনেক উপরের কোনও এক প্রীতি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট স্বপ্রয়োজন বলিয়াই সেই কৃপাকে যেমন বিহঙ্গম মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ "অবতার-বাদের" উদ্দেশ্য—জীবকে বারম্বার শুধু কৃপা করিতে আসাই নহে, এই কৃপার অন্তরতম প্রদেশে শ্রীভগবানেরও এমন একটা নিজ প্রয়োজন লুকান রহিয়াছে, যাহার জন্য স্বপদচ্যুত পতিত জীবের পার্শ্বে না আসিয়া তাঁহারও চলে না। রজত, সুবর্ণ, মুক্তা বা হীরকে জগৎ ভরিয়া উঠিলেও ভ্রমর যেমন সে দিকে দৃষ্টিপাতও করে না ;—সে কেবল লোলুপ নয়নে চাহিয়া থাকে সেই দিকে—যেথায় একটি শিশিরসিক্ত শতদল উষার আলোকে ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। ধন ধান্যে জগত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও যদি কোথায়ও কুসুম আর প্রস্ফুটিত না হয়,—মকরন্দ আর সঞ্চারিত না হয়, তবে মধুকরের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুলতায় ভরিয়া উঠে, সেইরূপ অনন্ত ভক্ত-কমলের হৃদয়জাত প্রেম-মকরন্দ পানে শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে সংরত থাকিলেও, অনন্ত ও অনাদিবদ্ধ জীবকোটি হইতে যদি আর ভক্ত-কমলের বিকাশ না হয়, তবে প্রেম-বিলাসী ভগবানের হৃদয়ে একটা ব্যাকুল-ব্যথা জাগিয়া উঠে,—তবে প্রেমের রাজ্যে যেন একটা ব্যাকুলতার হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনন্ত প্রেম-সুধা যাহার একমাত্র উপজীব্য, কেবল সেই জানে, প্রতিবিন্দু—প্রতিকণা—প্রেমের মূল্য তাহার কাছে কত অধিক ! অতএব জীবের দিকে—ভক্তের দিকে যেমন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও জীবকে ভক্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া সমধিক প্রয়োজনীয়। যেখানে উভয়ের মিলনে একের প্রয়োজন ও অন্যের নিষ্প্রয়োজন, সেখানে আশার আলোক অতীব ক্ষীণ

বলিয়াই জানিতে হইবে। ক্ষুধিত অতিথির পক্ষে অন্ন-প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকিলেই যে অন্ন সুখলভ্য হইবে তাহা নহে,—যদি গৃহস্থের অন্নদানের আবশ্যকতা বোধ না থাকে; কিন্তু ক্ষুধিত অতিথির অন্নপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতেও গৃহস্থের অতিথি-সেবনের আবশ্যকতা যেখানে অত্যধিক, সেখানেই উভয়ের প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার সহজ সম্ভাবনা; সুতরাং যে ধর্ম্ম—যে বাণী কর্ত্তৃক জীব ও ঈশ্বরের সম্মিলন সমপ্রয়োজন বলিয়া বিঘোষিত, সেই বাণীকেই আশার উজ্জ্বলতম আলোকের মত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে সংস্থাপন করা আবশ্যক। ভক্তিবাদই এই আশার বাণীর প্রচারক এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবাণীতেই তাহার পূর্ণতার পরিসমাপ্তি।

ভক্তিবাদ ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সাধন দ্বারা "পরতত্ত্বের" সম্মিলন সহজসাধ্য নহে; যেহেতু সেখানে কেবল "জীবত্ব" ও "পরতত্ত্ব" সম্বন্ধ। অপূর্ণ-জীবের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তিরূপ স্বপ্রয়োজন লাভের জন্য পরতত্ত্বের সম্মিলন বা সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা থাকিলেও পূর্ণকাম পরতত্ত্বের পক্ষে "ভক্তি" ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না থাকায়, কেবল জীবভাব-বিশিষ্ট জীবকে প্রাপ্ত হইবার, তাঁহার পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই। এই জন্য আপ্তকাম তিনি—জীবের প্রয়োজন লাভ বিষয়ে অপেক্ষাশূন্যই হয়েন। কেবল জৈবভাবের নিকটই ভগবান্ নিরপেক্ষ সুতরাং সমদর্শী; এই অবস্থায় তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নহে সত্য, কিন্তু তিনি সপ্রয়োজন, যেখানে সেই ভক্তভাবের নিকট তাঁহার নিরপেক্ষতা থাকে না; সেখানে ভক্তকে পাইবার জন্য ও ভক্তের হইবার জন্য তিনি সতত ব্যাকুল! নিরপেক্ষ ভগবানের এই সাপেক্ষতা সম্বন্ধে গীতায় তিনি স্বয়ং শ্রীমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন;—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

অর্থাৎ—আমি সকলের পক্ষেই সমান; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নহে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি।

অতএব কেবল জীবত্ব ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধ,—যেখানে উভয় দিকেই প্রয়োজনাভাব, অথবা একদিকে প্রয়োজন ও অন্যদিকে প্রয়োজনাভাব,—সেখানে উভয় পক্ষের মিলন অসম্ভব অথবা সুদূর পরাহতই হইয়া থাকে। তাই সেখানে কেবল অজ্ঞাত—অজ্ঞেয় কিম্বা অনন্ত ও অচিন্ত্যাদি স্বরূপেই তাঁহার অবস্থান করা সম্ভব হয়। সেই জন্যই ভক্তি ব্যতীত অপর সকল অবস্থায়—সকল জীবের নিকট তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ"। স্ব-প্রয়োজন-পর বা সাপেক্ষ জীব ও নিরপেক্ষ পরতত্ত্বের সম্বন্ধস্থলেই শ্রুতি বলিয়া থাকেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

অর্থাৎ—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া, যাঁহার অন্বেষণ হইতে ফিরিয়া আসে।

ভক্তির সংযোগ-সূত্র ব্যতীত জীব ও পরতত্ত্বের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনের জন্য উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ আর কিছুতেই জাগ্রত হইতে পারে না। "আপ্তকাম" পরতত্ত্ব কেবল সেখানেই "ভক্তকাম"—যেখানে পরতত্ত্ব পূর্ণসীমতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আর জীবত্ব যেখানে পূর্ণসীমা প্রাপ্ত—সেখানে ভক্তরূপে জীবত্বেরও বিকাশ হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেম-ভক্তিসূত্র সংযুক্ত থাকায়, উভয়ের মিলনে উভয় দিকেই প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয়। যেখানে ভগবদ্রূপ পূর্ণ-পরতত্ত্ব,—যেখানে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের পিপাসা নিত্যই বিদ্যমান আছে—সেখানে তিনি নিত্যই প্রয়োজনপর। কেবল মাত্র ভক্তের ভক্তির সম্বন্ধেই তাঁহার এই প্রয়োজনপরতা। তদ্ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই। আপ্তকাম পরতত্ত্বের পক্ষে প্রয়োজনশূন্যতা বশতঃ তদন্বেষণ-পর জীবের বাক্য ও মনের সহিত তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিবার কথা—যেমন শ্রুতি বলিয়া থাকেন, তেমনি আবার বরিত আত্মভক্তের সমীপে, শ্রীভগবানের আত্মবরণের অভিলাষ বিষয়েও শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ—এই পরমাত্মাকে (পরতত্ত্বকে) বেদাধ্যাপন অথবা মেধাদ্বারা কিম্বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা না যাইলেও, যাঁহাকে ইনি বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই লভ্য হয়েন;—তাঁহার নিকট ইনি (পরমাত্মা) স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন (ক্রমশঃ)

সংবাদ

শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার সমিতি গঠন

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জগতের সার্ব্বজনীন মঙ্গলকামনায় দেশের সর্ব্বত্র শ্রীহরিনামকীর্ত্তন প্রচার, পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন ও শ্রীভগবদ্বিষয়িণী শিক্ষার প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে একটী কার্য্যোপযোগী পন্থার উদ্ভাবনকল্পে আগামী ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নবেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় আলবার্ট হলের কমিটি রুমে একটী পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে। আপনি আপনার পরিচিত বন্ধুদিগকে লইয়া অনুগ্রহ করিয়া উহাতে যোগদান করিয়া উপযুক্ত পরামর্শ দানে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সাহায্য করিবেন। ইতি—

নিবেদক—

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
,, ,, সত্যানন্দ গোস্বামী
,, ,, রাধাবিনোদ গোস্বামী
ডাক্তার ,, সুন্দরীমোহন দাস
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ
কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক
শ্রীগোপীকিষণ [illegible]
[illegible]
বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত [illegible]
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন [illegible]
,, ব্রজমোহন দাস
,, মৃণালকান্তি ঘোষ
কুমার রমেন্দ্র নাথ রায়
স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সত্যেন্দ্র নাথ বসু
চুনী লাল মুখোপাধ্যায়
বিজয় চন্দ্র সিংহ
নগেন্দ্র নাথ দত্ত
উপেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী

অদ্য ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর তারিখে উপরোক্ত সজ্জনগণের চেষ্টায়, আলবার্টহলের কমিটীরুমে একটী পরামর্শ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। কি প্রকারে জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সার্ব্বজনীন মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া কমিটী স্থির করিয়াছেন,—আপাততঃ,—

১। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। কলিকাতা সহর ও তাহার উপকণ্ঠে, যেখানে যেখানে হরিসভা বা বৈষ্ণবসম্মিলনীর শাখা আছে, অথবা সহরের যে স্থলে ভগবন্মন্দিরাদি বা কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আছে, তাহার সন্ধান করিয়া, সেই সকল স্থানে যাহাতে শাস্ত্রপাঠ-ব্যাখ্যা, কথকতা, বক্তৃতা, আলোচনা, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও প্রত্যূষে বা সন্ধ্যায় প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয় ও সন্নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণ যাহাতে উহাতে যোগদান করেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সাধনকল্পে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ এম, এ. মহাশয়কে সমিতির সম্পাদক করা হইল। এই সমিতি কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাঁহাদের কোনও হরিসভা, কীর্ত্তনসভা, মন্দিরাদি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বা কীর্ত্তনমণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সমিতির কার্য্যের সুবিধার জন্য ৭৬।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায়, এই সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। এবং সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া সমিতিকে সহযোগীতা দ্বারা অনুগৃহীত করিবেন। এই সমিতি দেশবাসী সকলের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া কার্য্য পরিচালনে ইচ্ছুক।

সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত মহাশয়ের ঔষধালয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে যে কোনও ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং সমিতির বিষয়ে মন্ত্রণাদি করিতে পারেন।

নিবেদক—

[illegible]

হিন্দুসমাজের গৌরব ও জগৎবাসী নরনারীর ঐক্য-
বন্ধনের উপায় হইতেছে,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-
প্রবর্ত্তিত "প্রেমধর্ম্ম"। ভ্রাতৃভাব সাধনের
প্রধান উপায় হইতেছে,—"শ্রীশ্রীহরি-
নাম সংকীর্ত্তন" এবং নৈতিক
শিক্ষাদানের জন্য পল্লীতে
পল্লীতে "নৈশবিদ্যালয়" ও
"হরিসভা" গঠনের
একান্ত প্রয়োজন।

বর্ত্তমান ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ বা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৪৭০ বৎসর অতীত যুগের (অর্থাৎ ১৪৬২—১৯৩২ খৃঃ পর্য্যন্তের) বাঙ্গালাদেশের নবদ্বীপাদি স্থানের হিন্দুজাতির সামাজিক রীতি নীতি ও ব্যবহারাদি বিষয়ের প্রসঙ্গ, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

"নবদ্বীপ হেন স্থান ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
সংখ্যাতীত অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-বসে।
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দপুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এইমত বিষ্ণুমায়ামোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রসঙ্গ। যথা,—

"স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা—গঙ্গাস্নান-কৃষ্ণের কথন॥
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
"শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকধন্য॥
দয়ালু অদ্বৈতাচার্য্য বসি নদীয়ায়।
ভক্তি-যোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সময়ে নবদ্বীপে মুসলমান শাসন ও মুসলমান প্রতিপত্তি এবং উক্ত সময়ে নবদ্বীপের লৌকিক রীতি। যথা,—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন?
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে।
পাষণ্ডীর গণে যোল বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহো বোলে এ বামনে এ গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিয়া স্রোতে॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এই মত বোলে সব পাষণ্ডীরগণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥ ইত্যাদি॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত "প্রেম-ভক্তি" দ্বারা, ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি সর্ব্বশ্রেণীর লোক মধ্যে, যে এক পারমার্থিক সম্বন্ধ ও প্রীতির বন্ধন চিরস্থায়ী হইয়া ছিল,

এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রেমানন্দদাস ঠাকুর বিরচিত "মনঃশিক্ষা" গ্রন্থের একটী পদ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল। যথা,—

(এমন) শ্রীগৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার ??
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে, হৃদয়ে শোধিল,
যাচি দিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কান্দিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ??
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত প্রেম-ভক্তির অধিকারী নির্ব্বাচন। যথা,—

এ মন! কি করে বরণ কুল।
যে সে কুলে কেন, জনম না হউক,
কেবল ভকতি মূল ॥
কপি কুলে ধন্য, বীর হনুমান,
শ্রীরাম-ভকত রাজ।
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বরসভার মাঝ ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি,
ভুবনে রাখিলা যশ।
স্ফটিক-গুম্ভেতে, প্রকট নৃহরি,
হইয়া যাঁহার বশ ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা,
গুহক চণ্ডাল বর।
দেখনা কি কুল, বিদুরের ছিল,
খাইলা হরি তাঁর ঘর ॥
বল না কিবা, সাধনা করিল,
গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করয়ে,
সে হরি যে ভজে তারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সভে অধিকারী,
কুলের গৌরব নাই।
কহে প্রেমানন্দে, যে করে গৌরব,
তার সম মুরখ নাই ॥ (মনঃশিক্ষা)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক প্রেমভক্তি বিতরণের পাত্র-নির্ব্বাচণ যথা —

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জগ জীব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুখ ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমরস, ভাসাইয়া গৌড়দেশে,
পূর্ণকর সভাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাস ॥"
বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া,
মধুর কথা কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লওয়াও গিয়ে
যাও নিতাই সুরধুনীর তীরে ॥
নাম প্রেম বিলাইতে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে,
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব, করিতে তাদের শিব,
তুমি আমার পরম সহায় ॥
নীলাচলে উদ্ধারিয়া, গোবিন্দের সঙ্গে লঞা,
দাক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভার, করিতে নামপ্রচার,
ত্বরা করি যাও নিতাই তুমি ॥
মো হৈতে না হবে যাহা, তুমি পারিবে তাহা,
প্রেম-দাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পঁহু, দোঁহার সমান দুহু,
তায় মোরে মুঞিত কাঙ্গাল ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্তিত প্রেমভক্তির সার্ব্বজনীনতা ও পৃথিবীর নিখিল নরনারীর শান্তিদায়ক বিষয়, যথা,—

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের বাণী,—

"সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
বিদ্যা-ধন-কুল আদি তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হবে এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

পাষণ্ড দলনাদিতেও এই প্রকার অভিমত পাওয়া যায়।

"এই ভিক্ষা সর্ব্ব জীবে কর পরিত্রাণ,
সবাকারে দেহ 'হরেকৃষ্ণ বোল নাম'॥
ব্রহ্ম-ক্ষেত্রী-বৈশ্য-শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল পুক্কস ডন ম্লেচ্ছ যবন॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উদারতায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। যথা,—

"বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাইল প্রেমের ভাণ্ডার॥
বড় অপরূপ আমার গোরা চাঁদের লীলা।
রাজা হৈঞা কান্দ করে বৈষ্ণবের খেলা।

"দেখ নিতাই চান্দের করুণ।
কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ
পুরাইতে অদ্বৈত বাসনা॥
হোতা হৈলা নিত্যানন্দ, হরিনাম মহামন্ত্র
বদ্ধ জীবের মুক্ত কল্প কাম।
শ্রীঅদ্বৈত যজমান শ্রীবাসালয় যজ্ঞ স্থান,
যজ্ঞেশ্বর গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বাসনাদি কাষ্ঠগণ, প্রেম ধূম নির্ম্মঞ্জন,
ভক্তি অগ্নি হইল প্রবল।
দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম, অন্য উপাসনা মর্ম্ম
ভস্ম কৈল ইত্যাদি সকল॥
সহচরগণ মেলি, আরম্ভিলা যজ্ঞ কেলি,
নবদ্বীপে হৈল যজ্ঞ ঘটা।
বৃন্দাবন দাসে ভাষে, বিথারল দেশে দেশ,
তিলকাদি হইল যজ্ঞফোঁটা।

উপরোক্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ ও মহাজনী পদাবলী গুলির বিবরণ পর্য্যালোচনা করিয়া, বিগত ৪৭০ বৎসরের বাঙ্গালী রীতি নীতি ও সামাজিক শাসন শৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্বন্ধে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম,—

১। মুসলমান শাসিত বঙ্গদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের সামাজিক আচার ব্যবহারের তীব্র শাসনের মধ্যেও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্তিত "প্রেমভক্তি" অতি উন্নত ও উদারভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, পারমার্থিক বিষয়ে সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীগণের মানসিক বৃত্তি উন্নত পথে আরূঢ় করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ চাণ্ডালাদি জাতিকে 'শ্রীহরিনাম' কীর্ত্তন করা, বা ভগবদুপাসনা' বিষয়ে, অবিচারিতভাবেই স্বাধীনতা ও সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল।

২। শ্রীহরিভজনপরায়ণ উচ্চকুলোদ্ভবদের কেহই তাঁহার ভক্তকে নীচজাতি বলিয়া কখনও ঘৃণা করেন নাই অথবা "অস্পৃশ্য" জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন নাই। বরং পৃথিবীর যে কোন জাতিকেই 'শ্রীহরিনাম গ্রহণ-কীর্ত্তন ও শ্রীভগবদুপাসনা করার জন্য, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই আহ্বান ও সমাদর করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা বা উৎকলদেশের যে কোন শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ, প্রাণ গেলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করেন নাই। আর মহতের মর্য্যাদা রক্ষণকেও তাঁহারা কখনো হেয় চক্ষে দেখেন নাই। বরং মর্য্যাদা-রক্ষণই ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত ছিল। ভারতবাসী, ঐসমস্ত গুণের জন্য যুগ যুগান্তর যাবৎ, নানা প্রকার নির্য্যাতন ও অশান্তির মধ্য দিয়াও আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৌরব ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এবং গুণাবলী সংরক্ষণ দ্বারাই তাঁহারা পুরুষানুক্রমে আপনাদিগকে এ জগতে অমর রাখিতেও পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

জগৎবাসীর যাবতীয় অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাব দূরীকরণ বিষয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবপ্রবর্তিত প্রেমভক্তিই নিখিল নরনারীর একমাত্র আশ্রয়ের সোপান জানিতে হইবে। যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে সার্ব্বজনীন উদারতা ও ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হয়, এ নিমিত্ত প্রতি পল্লীর অধিবাসীগণের সাহচর্য্যে এক একটী সান্ধ্য-বিদ্যালয় বা হরিসভা গঠন করিয়া, সর্ব্বশ্রেণীর লোককে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নার্থ শিক্ষা প্রচার করা এবং প্রাতে ও রাত্রে সকলের সম্মিলন দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন-নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব এসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হওয়ায়, এসভায় সমাগত সুধীমণ্ডলী ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণের নিকট আমরা মন্ত্রণা লাভের জন্য প্রস্তাবটী উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম। এ প্রস্তাবটী যে যে উপায়ে কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, আপনারা ইহার যুক্তি সঙ্গত উপায় দ্বারা দশের দেশের ও জগতের শান্তিদায়ী পন্থা উদ্ভাবন করুন। নিবেদন ইতি ১৬ই কার্ত্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ বুধবার। ২রা নবেম্বর নবেম্বর ১৩০২ ইংরেজী।

আবেদনকারী
শ্রীব্রজমোহন দাস
পোঃ নবদ্বীপ, প্রাচীন মায়াপুর।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩৯ | ৪র্থ সংখ্যা

মা যশোদা ও রাখাল

(গীতি কবিতা)

[শ্রীকালী কিঙ্কর ঘোষ]

"সূর্য্য উঠেছে, এখনো কি কালা, বিছানায় শুয়ে থাকে!
—গোচারণে যেতে বেলা ব'য়ে গেছে।"—ডাকিল রাখাল মাকে।

মা যশোদা আসি কহিল, "না, না রে যাবেনাক যাদু আর;
বনে নিয়ে গিয়ে মারিস, ধরিস, করিস অত্যাচার।
কৃষ্ণ আমার দুধের ছেলেটি, এত কি সহিতে পারে?
গোচারণে যেতে লোক দিব আমি কানুরে পাঠা'ব নারে।"

রাখাল কহিল, "কে মারে? আমরা খুবই ভালবাসি ওকে।
কৃষ্ণ গেলে মা, বনে ভিড় করে কত অদ্ভূত লোকে।
আসে একজন শুভ্র বরণ পাঁচমুখে ডাকে 'রাম';
একজন লাল চারিমুখে তার ঘুষয়ে কৃষ্ণ নাম।
বামা আসে এক তিন চোক তার সিংহ উপরে চ'ড়ে,
দশহাতে তার খাওয়ায় নবনী তোমার গোপালে ধ'রে।"
"—একি কথা বাছা, অমঙ্গলের?" কহিল যশোদারাণী,

"শিব, বিধি আসে? একা পেয়ে বনে আসে কি যোগেন্দ্রানী।"
কহিলা রাখাল, "শিব! সে কে মাগো? মঙ্গলই শুধু ব্রজে,
চিরমঙ্গল ছড়ান রয়েছে শ্রীব্রজের রজে রজে।
বিধি! সে কেমন? জানিনাত। জানি কৃষ্ণ মোদের নিধি,
শ্রীগোকুল বনে বাস করি মোরা রাখিনাক' বাধা বিধি।

জরা বা মরণ জানিনাক' মোরা, যোগের ধারিনা ধার ;
যোগেন্দ্রানী সে কি করিতে পারে ? কানু যে হৃদয়-হার।
থাক্, সেই কথা পাঠায়ে দাও গো ঠাকুরে লইয়া যাব।"
কহিল জননী "না যাদু ! গোপালে বনে যেতে নাহি দিব ?"

রাখাল বলিল, "তোমারই কৃষ্ণ, কার ভয় কর তুমি ?
চরণে তাহার লয়েছে শরণ শ্রীবৃন্দাবন ভূমি !"

কহিলা জননী, "কৃষ্ণ আমার পারিবেনা যেতে বনে।"
রাখাল কহিল "তা হ'লে আমরা সকলে যাব কেমনে ?"
যশোমতী কন্, "বাছার সনে কি তোদের তুলনা হয় ?"
রাখাল কহিল, "কেন হবে না মা, সেও কি গোয়ালা নয় ?
দেরি ক'রো না মা পাঠাইয়া দাও, উদিল গগনে ভানু ॥"
জননী কহিলা, "বকাসুরে আর, যাবেনাক মোর কানু।
তোদের কবলে পড়িয়া কৃষ্ণে হারা'য়ে বসিব কবে।"
রাখাল কহিলা, "ভারি সুখ বটে কালা ঘরে বসি' রবে ?
'ভয় কোরো না মা', তোমার ছেলেটি এত কি চালাকি জানে
ভয় দেখাইতে সজীব সিংহ ব্যাঘ্র তাড়ায়ে আনে।

ব্রজগোপীগণে ডাকে বাঁশীগানে এলে বলে 'ডাকি নাই' ;
গালি দিতে দিতে রমণীরা সবে তখনি ফিরিয়া যায়।
ক্ষীর সর ননী চুরি করে খায়, মারিতে যখন আসে,
মারিতে পারে না তোমাদের চেয়ে ; কালা খিল্ খিল্ হাসে।"

যশোদা কহিলা, "সিংহ ব্যাঘ্র ! সেখানে পাঠায় ছেলে ?
রাখাল কহিল, যাই কর মাগো, যাবনা কালারে ফেলে।
কৃষ্ণ না গেলে চরেনাক' ধেনু বেণু-রবাকর্ষণে
ঘোরা ফেরা করে মাঠে গরুদল কানু যাহা করে মনে।
তোমার যাদুটী এত যাদু জানে বনের বৃক্ষলতা
শ্রীপদে লুটায় সূর্য্য চন্দ্র, নদী অর্চ্চনরতা !
সে না গেলে কিছু লাগিবেনা ভালো, বড় ভালবাসি তারে
পাঠায়ে দাও গো প্রার্থনা তাই জানাই মা বারে বারে।

"কানাই কি শুধু তোমারই জননী ! আর কারো কেহ নয় ?
সে যে গোপীজন-মনোরঞ্জন, রাখালের রাজা হয়।
স্কন্ধে চড়ায় কাঁধে চড়ে কভু, ভাল লাগে মুখে যাহা
তখনি দুহাতে ধরি মুখে তার [illegible] করে 'বাহা, বাহা !"

জননী কহিল, "কচি ছেলে মোর, বনে নিয়ে দিস্ কষ্ট
সেই অপরাধ করিলাম মাপ, পাঠাবনা এই স্পষ্ট।"
রাখাল কহিল, "কাণার মা' ব'লে আমাদেরো মাতা তুমি!
আমাদেরে শুধু পাঠাইয়া বনে ঘরে রবে সুখে ঘুমি'!
বলিতেছি—আজ না পাঠালে তারে গোপালে দিব মা' সাজা।
যশোমতী কন্ "জানিস্ বালক আমরা তোদের রাজা!"

শয্যা হইতে উঠিলা গোপাল জননী শিহরি' গেলা।
কহিলা "হে মাতঃ! সাজায়ে দাও গো হ'যে গেছে কত বেলা!"
জননী বলিল পারিবি ছুটিতে গোধনের পিছু পিছু?"
গোপাল কহিল, এরা সব রবে কষ্ট হ'বেনা কিছু।"

সাজায়ে দিয়ে মা কন্ উদ্দেশে, স্বর্গের দেবগণে,—
"অধম গোপের সন্তানে সবে কৃপা দেখো যেন বনে।"
বাতাস তখন শন শন্ করি' কহিল কর্ণ চুমি—
"দেবতাও তাঁরে খুঁজিতে খুঁজিতে আসেন এ ব্রজভূমি।"

যশোদা কহিলা, "তাহ'লে রাখাল তোরাই কি বড় হ'লি'?"
গোপাল রাখাল সঙ্গে চলিল, "চল সখা চল"—বলি।

চণ্ডীদাস ও ভাবী গৌরচন্দ্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা]

চৈতন্য অবতারে এই তথ্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল যে—"বৈকুণ্ঠান্তে নাহি যে যে লীলার প্রচার", তাহা লীলা-নায়ক কৃষ্ণ প্রেমস্বরূপিণী রাধাকে লইয়া ব্রজে প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস', এবং সর্ব্বভাবরসমাধুর্য্যনির্ঝরিণী একমাত্র শ্রীরাধাই 'জগৎমোহন-কৃষ্ণ তাহার মোহিনী';—আর 'কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে'। সুতরাং "তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি"। মহাভাব সাধনের জন্যই লীলা—

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার।

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখি যার কায়ব্যূহরূপ॥
চরিতামৃত। মধ্য। ৮ম।

ইহা জানিয়াই চণ্ডীদাস শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় আভাস দিবার জন্য কৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়াছেন—

জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরিবাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুলপুরী
বরজ-মণ্ডলে করি বাস॥

এই কথা বলিয়াও কবির কৃষ্ণের তৃপ্তি হইল না।

যেন আবরণ থাকিয়া গেল। যেন রাধার গৌরব-কথা ভাল করিয়া বলা হইল না। তাই আবার বলিলেন—

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
শতযুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মকথাটী চণ্ডীদাস একেবারে জ্যোতিরক্ষরে যেন আকাশপটে আঁকিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তও ভক্তির প্রাণস্বরূপিনী নবীনা কিশোরী শ্রীরাধার অধীন—শ্রীরাধার ভাবকান্তিময় শ্রীগৌরকিশোরের অধীন। এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা; এইজন্য ভক্তির মহিমা।

যদি গৌর না হ'ত কেমন হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে?
(পদাবলী।)

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ আবার রাধাকে বলিতেছেন—

তোমা বিনু যেথা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরল আশ!

চৈতন্যচরিতামৃতে কহিতেছেন—

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
রাধাবিনা সুখহেতু নহে গোপীগণ॥

শ্রীরাধা প্রেমস্বরূপিণী; বিশ্বমানবীর প্রাণস্বরূপিণী। তাই তিনি যুগে যুগে ভক্তহৃদয়ে নানা ভাবে নানা রূপে লীলা রসে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। কখনো দেবী, কখনো মানবী, কখনো জ্যোতির্ম্ময়ী, তেজোময়ী, কখনো অশ্রুময়ী, কখনো প্রেমপ্রার্থনাময়ী। বিশ্বে যত ভগবদারাধনা সমস্তই শ্রীরাধার বিভুত্ববিভূতির অন্তর্গত। শ্রীরাধা চির-আরাধনাময়ী। আবার নিত্য নব নব রসতরঙ্গে রমণীয় নৃত্যময়ী —কখনো গোলোকে কখনো গোকুলে। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপনা—অর্দ্ধপ্রকাশিতা। বনান্তরাল দিয়া রসাবেশমন্থরগমনার বায়ু-চঞ্চল নীলাঞ্চলপ্রান্ত চোখে পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পদ্মপুরাণাদি অন্যান্য পুরাণে ও আগমাদিতে নানারূপে কীর্ত্তিতা। তারপর গীতগোবিন্দে। তারপর চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির কাব্যকুঞ্জে। অনন্তর রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভনাটকে। তারপর শ্রীপাদ গোস্বামিগণের চম্পু ও নাটকাদি গ্রন্থে। শ্রীরূপের ললিত মাধব ও বিদগ্ধমাধবনাটকে। দাসগোস্বামি প্রভৃতির মনোহর স্তবাবলীতে, সর্ব্বশেষে বাংলার বৈষ্ণবকবিগণের গীতি-কবিতায়।

আমাদের জিজ্ঞাস্য চণ্ডীদাসের কবিতায় শ্রীরাধা কি ভাবে অবতীর্ণা হইলেন। যেভাব গৌরাঙ্গলীলায় ঠিক তেমনি ভাব। মানবী, কিশোরী, সরলা, রূপলাবণ্যবতী, বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে। কিন্তু বিশ্বের সকল বালিকাপ্রাণের দর্পণস্বরূপিনী। প্রাণভরা প্রেম, মনভরা প্রেম, অন্তরে অনুরাগের তরঙ্গিত সরোবর। স্বপনে জাগরণে শুধু প্রিয়তমের ধ্যান; সকল চিন্তায় কৃষ্ণ, সকল কল্পনায় কৃষ্ণ, প্রতি নিশ্বাসে কৃষ্ণপ্রণয়োচ্ছ্বাস, যা কিছু নয়নে পড়ে তাই যেন কৃষ্ণের কথা স্মরণে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? একদিন অমৃতরস পান করাইয়া সেই যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে, আর দেখা নাই। বুকে দিবানিশি আগুন জ্বলিতেছে, ঘরে থাকিতে পারি না, বিছানা কণ্টকময়। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কিছুতেই রুচি নাই—প্রাণে কেবল হাহাকার। একটী বার দেখা পাই না, পাঁজর ভাঙ্গিয়া হৃদয় ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। অমৃত পান করিলাম, গরল হইল। কৃষ্ণমেঘ দেখিলাম, জল পড়িল না আগুন জ্বলিল। কি সে জ্বালা! আর তো সইতে পারি না! একবার যদি দেখিতাম, নিমেষের তরে যদি সেই অমিয়-দর্শন পাইতাম, তবেই সকলজ্বালা জুড়াইত। কি নিষ্ঠুর! এমন শঠের হাতে জীবন যৌবন সঁপিয়া দিলাম, কুলবতীর কুলের গৌরব অকূলে ভাসিয়া গেল, সতীধর্ম্ম হাসিয়া বিসর্জ্জন দিলাম, কলঙ্কের কালি গায়ে মাখিলাম, যার জন্য এমন করিলাম সেই এমন করিয়া বঞ্চনা করিল! কেমন করিয়া ইহা সহ্য করি! এখন উপায় কি? ঘরে পরে কেবলি গঞ্জনা, জীবন বিষ হইয়া গেল, মরণ শতগুণে ভাল, বিষ খাইয়া মরিব? কিন্তু সেই অমৃতের আশা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। ভুলিয়া থাকিতে চাই, কিন্তু কেমন করিয়া ভুলিব? মন শাসন মানে না, যা ভাবিব না তাই ভাবে। যে দিকেই যাই, তারি যেন ছায়া দেখি, বাতাসে তারি যেন গায়ের গন্ধ আসে, আকাশে তারি যেন আননের আলো। দিকে দিকে তারি যেন বাঁশী বাজে। গৃহপিঞ্জরের

বিহগী আমি, কেমন করিয়া উড়িয়া যাই! সকলে বলে— ভুলিয়া যা, ও আশা ত্যাগ কর। তা পারিব না, প্রাণ গেলেও না। শ্যাম যে আমার প্রাণ হ'তেও কোটি গুণে-বেশী; কিছুতেই না, শ্যামের স্বপ্নে প্রাণ যায় যাক্। কিন্তু কিছুতেই—ভুলিতে পারিব না।

চণ্ডীদাসের রাধা এম্‌নি একটি কৃষ্ণানুরাগময়ী কিশোরী; চণ্ডীদাস জীবন ভরিয়া এই শ্রীরাধারূপ ধ্যান করিয়া গিয়াছেন। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' গৌরকিশোরের উচ্ছল প্রেমামৃতোজ্জ্বল স্থায়ী ভাবখানি এই কিশোরীর ভাব; আরো গভীর, আরো জ্বলন্ত, আরো বিষামৃতময়। চণ্ডীদাসের হৃদয়ে শ্রীরাধার এই সুধাস্নিগ্ধপ্রেমামৃতরূপ বিভা কোথা হইতে আসিল? পুরাণগ্রন্থগুলির শেষসংস্করণ গুপ্ত-রাজাদের সময়ে, ৭র্থ—৮ম শতাব্দীতে হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মতই যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই যুগ হইতে ১৪শ শতাব্দী (যাহা চণ্ডীদাসের যুগ) হইল সহস্র বৎসরের মধ্যে; এই সময় বাংলা দেশে কিংবা অন্যত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা তথা শ্রীরাধাচরিত্র লইয়া সাধারণ্যে যে কখনো বিশেষ কোনো আলোচনা-আন্দোলন ধ্যান ধারণাদি হইয়াছিল, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। আর পৌরাণিক শ্রীরাধার যত ভাবরূপ আমরা পাই। তাহার সঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার প্রাণের সম্বন্ধ খুব কম, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে শ্রীরাধা শক্তিমতী সম্রাজ্ঞীতুল্যা, তেজোময়ী জ্যোতি-র্ময়ী, গোলোকের শাসনকর্ত্রী, বিরজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপন প্রেমের কথা শ্রীরাধার শ্রবণগোচর হইলে শ্রীকৃষ্ণ ত্রাসে কম্পমান। শাসনে তিরস্কারে ম্রিয়মানপ্রায়। চণ্ডীদাসের রাধা 'অবলা অখলা আহিরিণী বালা'। 'গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পূজন'। 'বিরহ-বেদন তুয়া'। 'ওদুটি চরণ পরাণে ধরিয়া নয়ন মুদিয়া থাকি'

বিষ্ণুপুরাণে বিরহিনী গোপী কৃষ্ণপাগলিনী হইয়া বলিতেছে—

দুষ্ট কালীয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে। ৫।১৩।২৬

মিলনে চণ্ডীদাসের রাধা—

'মিলায়ল যেন কাঁচা ননী'।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দ ভরে
শিরীষ কুসুম কোমলিনী।

বিষ্ণুপুরাণে মিলনানন্দিনী গোপী

দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ
কাচিৎ প্রবিলসদ্‌বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্॥

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ।

কোনো রসবিলাসবতী গোপী কৃষ্ণের স্কন্ধে বাহুলতা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। কৃষ্ণ উচ্চস্বরে রাসসময়োপযোগী গান গাহিতেছেন দেখিয়া—বেশ কৃষ্ণ। বেশ বেশ! এই প্রকার উৎসাহ দিয়া দ্বিগুণ উচ্চস্বরে গান ধরিলেন।

চণ্ডীদাসের রাধাতরঙ্গিনী পুরাণ-পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া আসেন নাই, পুরাণে রাধা গৃহাঙ্গনসঞ্চারিণী কুলা-ঙ্গনা রূপে বর্ণিত হন নাই, গোপীরা সকলেই কুলবধূ এবং কুলকন্যা। কিন্তু তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রাবলী—idyllic pictures পুরাণকার আমাদিগকে দেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে একটু আভাস আছে এই মাত্র।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ * * লিম্পন্ত্যো প্রমৃজন্ত্যোঽন্যাঃ।

পুরাণে ব্রজকিশোরীগণকে আমরা দেখিতে পাই—যমুনাতটে, বৃন্দাবননিকুঞ্জবিতানে, গোবর্দ্ধনগিরিকাননে, রাসাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে। চণ্ডীদাসের কাব্যে শ্রীরাধা গৃহকারাবাসিনী বন্দিনী, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, তাহার 'ঘর হ'তে আঙ্গিনা বিদেশ'। যমুনা, নিকুঞ্জ, গোবর্দ্ধন, কদম্ব-কাননাদির কথা কদাচিৎ দুই একবার শোনা যায় কিন্তু তাহাকে অধিকাংশ সময়ে গৃহকোণে একাকিনী বিরহযাতনায় ছটফট করিতেছে দেখা যায়। এই রাধা-রূপ চণ্ডীদাস কোথায় পাইলেন? রাধা বিশ্বভাবময়ী বিশ্বরমণী রাধিকারই প্রতিভাস। কবিকল্পনার কথা অজ্ঞেরাই বলিয়া থাকে; ভাবানুভবদ্বারে আবির্ভাবের কথাটি হইল আসল কথা। চণ্ডীদাসের হৃদয়কাননে শ্রীরাধা যে রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সমস্ত বঙ্গদেশে নরনারী যেরূপে রাধাকে হৃদয়মন্দিরে বরণ করিয়া স্থাপন করিয়াছে—সেই রাধার ভাবপ্রতিভাস চণ্ডীদাসের পূর্বে

কি আর কোথাও দেখা যায়? উত্তর—নিঃসন্দেহ না। তবে এই অভিনব আবির্ভাবের কারণ? কারণ যুগ-প্রভাব। কোন যুগ? শ্রীচৈতন্য যুগ। গৌরাঙ্গ অবতারে যে যুগসূর্য্যোদয় হইল, তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে তাহার অরুণালোকপাত ভারতের পূর্ব্বাশায়। চণ্ডীদাসের হৃদয়ে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হইল

অন্তরঙ্গপক্ষে গৌরাঙ্গলীলা রাধাভাবের অপার তরঙ্গ-লীলা গৌরাঙ্গযুগ ভক্তিমাহাত্ম্যযুগ, ভক্তিস্বরূপিণী গোলোক হইতে ভারতে বঙ্গের নদীয়ায় আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন কৃষ্ণানুরাগময়ী কিশোরী, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, আমাদেরি নয়নের সম্মুখে গৃহপাঙ্গনে গতাগতি করিতেছেন। চণ্ডীদাস সর্ব্বাগে সে প্রকাশ দর্শন করিলেন, বাশুলী মায়ের কৃপায়। দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কিশোরীর সেবায় যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য কিশোরী হইয়া কিশোরীর অনুগত হইলেন। আর কেহ দেখিলনা, শতবৎসর পরে পরিপূর্ণরূপে নিখিল পরিকরের সহিত সার্ব্বাঙ্গীন ভাবের সংসারটী লইয়া মহাভাবময়ী প্রকাশিত হইলেন; আমরা পাইলাম গৌরাঙ্গ লীলা চণ্ডীদাসে যাহাকে পাইলাম আভাসে ঈষদ্রূপে অনুভবের পথে, গৌরাঙ্গ জীবনে তিনি দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গোচর হইলেন। আমরা দিবালোকে বাহিরে পথে ঘাটে বনে প্রান্তরে তাহাকে দর্শন করিলাম, ভৌমবৃন্দাবন সসীম বিস্তার বলিয়া অব-ভাসমান। কিন্তু বৃন্দাবন অসীম, বিশ্বে সর্ব্বত্রই বৃন্দাবন বর্ত্তমান। কৃষ্ণলীলার শেষ অঙ্কটী বঙ্গদেশে অভিনীত হইল। তাহাতে যে বঙ্গেরই ভাবপ্রভা, বঙ্গেরই রসতরঙ্গ, বঙ্গেরই রূপচ্ছটা, অমলোজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে ইহা স্বাভাবিক তাই শ্রীরাধা মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া কাজে কাজেই বঙ্গগৃহের বালিকা কুলবধূর রূপ গ্রহণ করিলেন। চণ্ডীদাসের কাব্যে আমরা তাহারি জীবন্ত ছবি দেখিলাম। মহাপ্রভুর লীলাবির্ভাবে আমরা মহাপ্রভুতে তাঁহাকে বাস্তব-রূপে দেখিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ব্যাপার দেখি-লাম। অনেক শক্তির, অনেক প্রতিভার, অনেক অলৌকিক-গুণের ক্রিয়া দেখিলাম।

শ্রীরাধা আসিলেন, রসব্রহ্মের ও রূপব্রহ্মের মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি আসিলেন—নবীনা রাগময়ী কিশোরী। কিন্তু পুরুষের অঙ্গ অবয়ব, অথচ তাহার শুধু হৃদয় মন প্রাণ নয়, সুললিত সুগৌর কলেবরখানি পর্য্যন্ত অনুরাগ-বিরচিত। কি আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনা। কি অপূর্ব্ব শিক্ষা। যুগধর্ম্মের বিচিত্র ইঙ্গিত আমরা শ্রীচৈতন্যের জীবনে শ্রীরাধাকে দেখিলাম,—রাধাই কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপিণী'। তাহার প্রেমব্যাকুলতা দেখিলাম, তাহার প্রাণের প্রণয়জ্বালাশিখা দেখিলাম। রাধা আসিয়া শচীনন্দনের অন্তরনন্দনে নিকুঞ্জকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন আশা করিলেন। কিন্তু 'কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে' বালিকার প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া দিল মন পুড়িল, বন পুড়িল জীবননিকুঞ্জকুটীরও পুড়িল, চণ্ডীদাসের প্রাণের বীণায় তারি অনুস্পন্দন।

> ছায়া দেখি যাই যদি তরু লতা বনে।
> জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
> যমুনার জলে যাই দিয়ে হাম ঝাঁপ।
> পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ।

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বদেহে মনে শিরায় শিরায় প্রতিরক্ত-বিন্দুতে প্রেমজ্বালাময়ী শ্রীরাধা। ঐ চণ্ডীদাসের হৃদয়-কাননে যাহার অঙ্গজ্যোতি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, গৌরাঙ্গের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে প্রেমরসরঙ্গিনী গৌরাঙ্গিনী, নর-নারীর ভেদ—নায়ক নায়িকার ভেদ কোথায় গেল!

> পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল,
> অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
> না সো রমণ না হাম রমণী,
> দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।

চণ্ডীদাস বহুপূর্ব্বে কথাটীর আভাস দিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তত্ত্বটী তিনি অন্তরে পাইয়াছিলেন।

> এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
> তবে সে জানিবে রসের কূপ॥

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলিয়াছেন—

> গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
> গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন॥

এই এক দিক। গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ, ইহা কবিতার কথা নয়, গভীর কারণবশে বাধ্য হইয়াই আচার্য্যগণ গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্য দিকে—

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥

বহু অভিজ্ঞতা, বহু ব্যাপার পর্য্যালোচনা, বহু চিন্তা গবেষণার পর সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া গোস্বামিগণ এই অপূর্ব্ব এই অতলস্পর্শ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই সমুজ্জ্বল তথ্যের কিরণাভাস স্পষ্টরূপেই আমরা চণ্ডীদাসের কাব্যে দেখিতে পাই। প্রথমে দেখিতেছি ভাব-সম্মিলনে রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥

ইহাতে ইহাই অভিব্যঞ্জিত হইতেছে যে—প্রেমের দুর্লঙ্ঘনীয়া নীতির শাসনেই কদাচিৎ কৃষ্ণকে রাধা হইতে হয়। "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" চৈতন্য কৃষ্ণই, "কিন্তু রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরে তার বর্ণ।" "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্"। তিনিই কৃষ্ণ, তবে তিনি কাহার বাঁশী শুনিয়া পাগল হইলেন? চণ্ডীদাসের হৃদয়-নিকুঞ্জবাসিনী রাধা বলিতেছেন—

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বমূলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে।
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজকুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবা পীরিতি কেমন জ্বালা॥

তাহা হইলে গৌরাঙ্গকৃষ্ণকিশোর যে বাঁশী শুনিয়া প্রেমোন্মত্ত, সে বাঁশী বাজাইতেছেন কৃষ্ণাঙ্গিনী কিশোরী রাধা। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়
তাই দেখোঁ সবে তাহ বোলোঁ সর্ব্বথায়।

'কৃষ্ণ' না বলিয়া 'কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু' বলায় বিশেষ রহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে, এ রহস্যের তাৎপর্য্য আমরা চণ্ডীদাসে পাইতেছি। ভাবখানি চণ্ডীদাসের সাময়িক খেয়াল নয়, তাহার প্রমাণ আছে। অন্যত্র রাধা গোপনকথা সখীকে বলিতেছেন—

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল॥
তাহার মত আমায় করি সে মোর মত হ'ল॥

গৌরাঙ্গলীলায় অন্তরতম কথাটী চণ্ডীদাসের মুখে প্রকাশিত হইল, ইহা অপ্রাকৃত প্রেমরসাস্বাদনপথে নিগূঢ় অনুভূতি। নিবিড় প্রেমের একটী ভাববিনিময়ের, প্রাণ-বিনিময়ের এবং সর্ব্বস্ববিনিময়ের ব্যাপার আছে। গৌরাঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য অসীম, চণ্ডীদাসের হৃদয়ে কিছু কিছু স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। কৃষ্ণ রাধা হইলেন, রাধা কৃষ্ণ হইলেন। তারপর—

তুমি সে আমার প্রাণের অধিক তেঁই সে তোমারে কই।

স্বরূপ ও রায়রামানন্দের সঙ্গে প্রেমবিবশ মহাপ্রভু এমনি করিয়াই কথা বলিতেন। চণ্ডীদাস যেন মহাপ্রভুরই মধুর বচনচ্ছন্দ কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন।

এই যে কাজ কহিতে লাজ আপনমনেই রই।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

আপনহৃদয়কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজ বীজ খাইয়া।

শ্রীরাধারূপাবৃত গৌরাঙ্গকৃষ্ণের একটী দিব্য ছবি ছায়ার মত চণ্ডীদাসের হৃদয়ে কখনো কখনো ভাসিয়া আসিত। চণ্ডীদাস কল্পনানয়নে একদিন তাহা সমুজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিলেন। অভিনব রূপস্ফূর্ত্তি!—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল।
তাহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু,
এত নহে নন্দসুত কানু।
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি।
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল।
কে বানাল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকন বরণী।

হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় ছিল কিছু নাহি জানি
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত।
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

কবির নয়নে অপরূপ গৌরহরি রূপের প্রকাশ হইল, গৌরহরি প্রকাশের শতবর্ষ পূর্ব্বে। বাঁশী বাজিল, ছুটিয়া গিয়া কেলিকদম্বের ছায়ে দেখি—একি! কৃষ্ণ কই? শ্যামসুন্দর কই! এ যে গৌরাঙ্গ! কনককিরণে চারিদিক আলোকিত. চাঁচর চিকুরে চূড়া বাঁধা,। এত কৃষ্ণ নয়! কৃষ্ণের যে ইন্দ্রনীলমণি জিনিয়া বর্ণ। এ ত আমাদের চিরপরিচিত নন্দনন্দন নয়! অভিনব আকৃতি! অভিনব রূপ! কৃষ্ণকেই ত আমরা নটবর বলিয়া জানি, ইহারও যে দেখি নটবর বেশ। এ বেশ এ কোথায় পাইল? আমাদের শ্যামেরি মত মনোহর বনফুলের মালা গলায় দুলিতেছে, এ অপূর্ব্ব মধুর বেশ কোন দেশে কোন বিজনে লুকাইয়াছিল! আমরা কিছুই জানি নাই, এ ভুবনমোহন রূপ কোন বিধাতা গোপনে বসিয়া রচনা করিয়াছে? বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ইহার বামে এক মনোহর রমণী। তাহার সুনীল সুন্দর সুচিক্কণ কান্তি। যেন নীলমণিময়ী মূর্ত্তিখানি ঝলমল করিতেছে. আমাদেরি শ্যামসুন্দরের সকল ভাবভঙ্গী, কিন্তু রমণী, বোধ হয় ঐ গৌরকিশোরের প্রেয়সী। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমরা সুনীল-কমল শ্যামকে দেখিয়া গিয়াছি। স্বর্ণকমলিনী রাধাকে দেখিয়া গিয়াছি, তারা কোথায় গেল? কিছুই ত জানি না, আজ যে সবই বিপরীত দেখি! ব্যাপার কি! আজ দুইজনে মিলিয়া একটা কিছু কীর্ত্তি নিশ্চয় করিয়াছে। *

সখীগণের এই প্রকার বিস্ময় বিভাবনা। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসিল। তাহার মনে প্রশ্ন হইল—এরূপ কখনো কোনো দেশে প্রকাশিত হইবে? তাহা হইলে চণ্ডীদাসের কাব্যে আমরা অভিব্যক্ত রূপে গৌরাঙ্গকে পাইলাম। তারপর এই কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা গৌরাঙ্গের সুধাময়ী চরিত্রস্রোতস্বিনীটী প্রবাহিত দেখিতে পাইব। দুই চারিটী উদাহরণ এখানে দিব। উদাহরণ দেওয়াই কঠিন, কারণ সবগুলি কবিতাই উদাহরণ। চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রায় সব কথাই কোনো না কোনো সময়ে কৃষ্ণবিরহব্যাকুল প্রভুর মুখে কোনো না কোনো ভাবে ফুটিয়াছে—

"বিরলে বসিয়া পটেতে লেখিয়া বিশাখা দেখা'ল আনি।"

শ্রীমতীর এই প্রথম কৃষ্ণদর্শন। বিশাখা কি দেখাইল?—

"বয়সে কিশোর রূপ মনোহর অতি সুমধুর রূপ";

তারপর,—"দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে"। কেমন রূপ—

কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদয়িছে যেন শশী রবি।

এদিকে মহাপ্রভুর প্রথমদর্শন,—

গয়ার নিকট কালাঞি নাটশালা নামক এক গ্রামে।

তমালশ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর।
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥

চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ২য়।

কৃষ্ণরূপ দেখিবার পর হইতে শ্রীমতী বিহ্বলা ব্যাকুলা শান্তিহীনা পাগলিনী পারা—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধিয়ায় শ্যামরূপখানি॥

(ক্রমশঃ)

* যাঁহারা ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য কোলরীজ্, শেলী, বাইরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং হ্যাজলিট্ হরেফোর্ড থিওডোর-ওয়াট্‌স্-ডান্টন্ প্রভৃতির রোমান্টিক সমালোচনা অনুশীলন করিয়াছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এর চেয়ে সুন্দর এর চেয়ে নিপুণ-রচিত রোমান্টিক কবিতা তাঁহারা কখনো পড়িয়াছেন কি? Romance of wonder এর নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ এই কবিতাটী। এখানে এ কথাটী বলিয়া রাখা ভাল যে চণ্ডীদাসের কবিতা সমস্তই বিশুদ্ধভাবে রোমান্টিক। ক্লাসিকাল পদ্ধতির স্পর্শমাত্র চণ্ডীদাসে নাই।—লেখক।

জীবের মনুষ্যজন্ম—৩

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

আমরা পূর্ব্বে শাস্ত্রপ্রমাণসহ আলোচনা করিয়াছি যে—**জীবের কোন অনির্ব্বচনীয়** সৌভাগ্যবলে পুণ্যভারতভূমিতে **মনুষ্যজন্ম লাভ** হইয়া থাকে, এবং ইহাই যে জীবের অতি-**দুর্লভ** জন্ম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার শাস্ত্র একথাও বলিয়াছেন যে—কলিযুগেই ভারতভূমিতে মনুষ্য-**জন্ম লাভ** জীবের পক্ষে দুর্লভতম। কলিকালে মনুষ্যের **পরমায়ুঃ অতি অল্পপরিমিত** এবং দেহ অতি ক্ষীণ ও অল্পায়-তন হইলেও শাস্ত্র বলিয়াছেন যে—কলিযুগেই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ জীবের পক্ষে দুর্লভতম।

স্বর্গাদিলোকবাসিগণের তুলনায় মনুষ্যের পরমায়ুঃ **অতি অল্পকালস্থায়ী**। মনুষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন, সেই দিনের ৩৬৫ দিবসে দেবতাদিগের একবৎসর হইয়া থাকে। সাধারণ দেবতাদিগের পরমায়ুঃ এই দেব-পরিমিত বৎসরের শতবর্ষ। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের ও ব্রহ্মার পরমায়ুর হিসাব অন্য। ব্রহ্মার একদিনে একসহস্র চতুর্যুগ, শাস্ত্র বলিয়াছেন—"চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিন-মুচ্যতে।" এক চতুর্যুগের পরিমাণ ১২০০০ দেববর্ষ, অর্থাৎ মনুষ্যের হিসাবে ১২০০০×৩৬৫ বৎসর। এই চতুর্যুগের মধ্যে সত্যযুগের মনুষ্যগণের পরমায়ুঃ একলক্ষ বৎসর ও দেহের পরিমাণ একবিংশতি হস্ত এবং তাঁহারা **মজ্জাগতপ্রাণ ও ইচ্ছামৃত্যু**। ত্রেতাযুগের মনুষ্যগণের **পরমায়ুঃ** ১০ সহস্র বৎসর ও দেহের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত এবং তাঁহারা অস্থিগতপ্রাণ। দ্বাপরযুগের মনুষ্য-গণের পরমায়ুঃ সহস্রবৎসর ও দেহের পরিমাণ সপ্ত হস্ত, এবং তাঁহারা রুধিরগতপ্রাণ। কলিযুগের মনুষ্যের পর-মায়ুঃ ১২০ বৎসর, দেহের পরিমাণ সার্দ্ধত্রিহস্ত, এবং কলির মনুষ্য অন্নগতপ্রাণ।

এই বিভিন্ন যুগের মনুষ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ভাগ ১২।৩।৫২

অর্থাৎ সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান, ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ, দ্বাপরের ধর্ম্ম ভগবৎসেবা, এবং কলির ধর্ম্ম কেবল শ্রীহরির নামকীর্ত্তন। সত্যযুগের মনুষ্য বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগের মনুষ্য বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় যজ্ঞ করিয়া, এবং দ্বাপর যুগের মনুষ্য ভগবদর্চ্চনাদি সেবা করিয়া যে ফল লাভ করিয়া থাকে, কলিকালের মনুষ্য সেই ফলই কেবল শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াই লাভ করিয়া থাকে। অতএব কলিকালের মনুষ্য অতি অল্পপরমায়ুবিশিষ্ট ও ক্ষীণকায় হইলেও তাহার সাধন অতি সহজ ও সুখসাধ্য। কলির মনুষ্য অন্নগতপ্রাণ ও সর্ব্বথা সামর্থ্যহীন বলিয়া যম-নিয়মাদি ও শম-দমাদি অতিকৃচ্ছ্র সাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এইজন্যই শ্রীভগবান্ তাহার জন্য এই অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্র-প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন যে কলিহত মনুষ্যের একমাত্র ধর্ম্মই শ্রীহরির নাম। তিনি বলিয়াছেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ চৈঃ চঃ

শাস্ত্র প্রমাণ দিয়াছেন প্রসিদ্ধ বৃহন্নারদী। বচন—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ কলিকালে কেবল হরিনামই একমাত্র গতি, হরিনাম ভিন্ন কলিহত জীবের আর গতি নাই। সত্যযুগের ধ্যানরূপা গতি কলিতে নাই, ত্রেতার যজ্ঞেশ্বর-যজনরূপা গতি কলিতে নাই, এবং দ্বাপরের অর্চ্চনারূপা গতিও কলিতে নাই। কলিযুগের গতি কেবল হরিনামাশ্রয়; কলিহত জীবের পক্ষে অন্যসাধনসকলের নিরর্থকত্ব-হেতু নামাশ্রয়ই তাহার একমাত্র ভরসা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকের প্রথম চরণে তিনবার "হরেনাম" দাঢ্য-হেতু প্রয়োগ হইয়াছে। পুনরায় এবকার এবং "কেবল" শব্দ আরও অধিক নিশ্চয়করণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকের

দ্বিতীয় চরণে "নাস্ত্যেব" পদের ত্রিরুক্তি ইহাই প্রকাশ করিয়াছে যে—যে ইহার অন্যথা মানিবে তাহার আর নিস্তার নাই।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

ভাগ ১২।৩।৫১

হে রাজন্! কলি সকল দোষের আকর হইলেও তাহার এক মহৎ গুণ এই যে—কলিহত জীব কেবল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ফলেই মায়ামুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব একথাও বলিয়াছেন যে—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥

ভা ১১।৫।৩৮

হে রাজেন্দ্র! সত্যাদিযুগের প্রজাসকল কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ কলিযুগেই বহু ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন। বহুভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে ভক্তসঙ্গ ও ভক্ত-কৃপালাভের অধিক সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহাদের এই ইচ্ছা।

সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপাই মনুষ্যের অপবর্গমার্গের ধ্রুব-তারা; অন্যান্যযুগে জ্ঞানসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ সাধুপুরুষ বহু থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্ত অতি বিরল, কেবল কলিযুগেই ভক্তসংখ্যা অধিক। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

ভাগ ৬।১৪।৪

অর্থাৎ কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তপুরুষের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অতিশয় দুর্ল্লভ।

মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালেই কলির আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে এই অধর্ম্ম-হেতু কলির সর্ব্বথা বিনাশ সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল কলির নিগ্রহই করিয়াছিলেন। শ্রীসূত মহাশয় ইহার কারণ বলিয়াছেন—

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিদ্ধন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ॥

ভাগ ১।১৮।৭

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী বলিয়াই কলির বিনাশ করেন নাই, কারণ কলিকালে মনুষ্য পুণ্যকর্ম্মের সংকল্প মাত্র করিলেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং পাপকর্ম্ম করিলে তবে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। অন্যযুগে পাপকর্ম্ম না করিয়াও কেবল তাহার সংকল্প করিলেই ফলভোগ করিতে হয়।

পুণ্যভারতবর্ষে কলিযুগে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও কলিহত-জীব বৃথা আয়ুঃক্ষয় করিয়া পরমার্থ-সাধনের এই অভাবনীয় সুযোগ হেলায় হারাইয়া ফেলে। ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীপ্রেমানন্দ দাস অতিশয় আক্ষেপের সহিত গাহিয়াছেন—

মন! ধিক রে তোমায়।
পাইয়া মনুষ্য জন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণকর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গেল রে খেলায়॥
কতেক সুকৃতি-ফলে, মানুষ উত্তম কুলে,
তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম।
ধন্য কলিযুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে,
প্রকাশিলা "নাম" মাত্র ধর্ম্ম॥
পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাহি পরিশ্রম,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম।
কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না খালিস জ্ঞান,
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম॥
এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,
হেন জন্ম না হইবে আর।
কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে,
কোটিকল্পে নাহিক নিস্তার॥

কলিকালের মনুষ্য অল্পপরমায়ু ও ক্ষীণকায় হইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই, কারণ মনুষ্যজন্মের মুখ্য প্রয়োজন যে পরমার্থসাধন, তাহা তাহার পক্ষে অতি সুলভ ও সুগম। পরমার্থসাধন বস্তুতঃ দীর্ঘকালসাপেক্ষ নহে। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবল সপ্তাহকাল মাত্র অবশিষ্ট পরমায়ুদ্বারা কি পারলৌকিক সাধন হইবে এই

ভাবনায় অধীর হইলে শ্রীশুকদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে—পরমার্থসাধনে সপ্তাহকালও অতি সুদীর্ঘ, এই সপ্তাহ-কাল কেবল শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিয়াই তুমি কৃতার্থ হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম ॥

ভাগ ২।১।১৩

অর্থাৎ ভগবদ্ভজন ব্যতীত পরমায়ুঃ বৃথা ক্ষয় হইতেছে ইহা যে ব্যক্তি অনবধানতাবশতঃ জানিতে না পারে, তাহার পক্ষে বহুবর্ষব্যাপী পরমায়ুরও কোনও ফল নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভজন-ব্যতীত পরমায়ুঃ বৃথা যাইতেছে একথা জানিতে পারে, তাহার পক্ষে এক মুহূর্ত্তকালও পরমমঙ্গল-জনক; কারণ ঐ মুহূর্ত্তমধ্যেই সে সম্যক্‌রূপে সযত্ন হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারে। রাজর্ষি খট্বাঙ্গ দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বহুকাল যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি প্রথমে তাঁহার আয়ুঃ জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আয়ুর কেবল মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে এই কথা দেবতারা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি দেবদত্ত বিমানযোগে অতিশীঘ্র পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীহরিচরণে সম্যক্ শরণ লইয়া সেই মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব এই অমূল্য-মনুষ্য জন্মের ক্ষণমাত্রকালও সম্যক্ সিদ্ধিপ্রদান করিতে সমর্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এতাদৃশ জন্মলাভ করিয়াও অধিকাংশ লোক শ্রীভগবদ্ভজনে বিমুখ হইয়া সমগ্র পরমায়ুঃ বৃথা ব্যয় করিয়া থাকে, এবং পরমার্থসাধনের এই অমূল্য সুযোগ হেলায় হারাইয়া পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কলিহত মনুষ্যের অর্দ্ধেক পরমায়ুঃ নিদ্রায় বৃথা অতিবাহিত হয়, এবং অবশিষ্ট পরমায়ুও বাল্যে অজ্ঞানে, বৃদ্ধাবস্থায় জরায়, এবং যৌবনে কামিনী-কাঞ্চনের মোহে বৃথা ক্ষয় হইয়া থাকে; কলিহত মনুষ্য ভগবদ্ভজনের আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীল প্রেমানন্দ দাস তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া কাতরহৃদয়ে গাহিয়াছেন—

মন! আর কি মানুষ হবে।
ভারতভূমে জনম লভিয়ে কি কাজ করিলি কবে।
প্রথম জননীকোলেতে কৌতুক নাহি ছিল জ্ঞান আর।
শিশুর সহিতে খেলালি বেড়ালি পৌগণ্ড এমতি পার॥
প্রকৃতি অর্থ অনর্থ হইল সে মদে হইলি ভোর।
বুঝিতে নারিলে কামিনী সাপিনী মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড়॥
সুতসুতা ল'য়ে মগন রহিলি ভুলিয়ে পূরব কথা।
মায়ের উদরে কত না কহিলি যখন পাইলি ব্যথা॥
চতুর্থে আসিয়ে জরায় ঘেরিল সামর্থ্য হইল হীন।
তবু তোর ঘোর না ঘুচে বচন শমন গনিছে দিন॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে হরি হরি বল নিকটে শমন ভাই।
কহে প্রেমানন্দ যে নাম লইলে শমন গমন নাই॥

এই ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্যের দুর্ভাগ্যদর্শনেই শ্রীমুচুকুন্দ আক্ষেপ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥

ভাগ ১০।৫১।৪৫

লব্ধা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥

ভাগ ১০।৫১।৪৬

হে ঈশ! কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকল মনুষ্যই তোমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া পরমার্থসুখস্বরূপ তোমাকে জানিতে পারে না বলিয়া তোমার ভজন করে না, কিন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখেচ্ছায় কেবল দুঃখের আকর গৃহাদিতেই আসক্ত হইয়া থাকে।

হে অনঘ! তোমার অনুগ্রহে তোমার একমাত্র ভজন-যোগ্য পূর্ণাবয়ব এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ ঈদৃশ পুণ্য ভারত-ভূমিতে লাভ করিয়াও, তৃণলুব্ধ পশু যেমন অন্ধকূপে পতিত হয়, সেইরূপ মিথ্যা সুখের লালসায় কান্তাদি-

ভোগ্য-বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া জীব অন্ধকূপ-তুল্য ঘোর সংসারে নিপতিত হয়, এবং তোমার অভয় চরণারবিন্দের ভজন করে না।

এই হতভাগ্য মনুষ্যগণ সংসারগ্রস্ত হইয়া পশুর ন্যায়ই দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের পশুবৎ আচরণ কোন মহাজন এইরূপে অনুরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

দেবিণং মে ভবনং মে পুত্রোঽয়ং মে যুবতিরিয়ং মে।

এবং মে মে মে মে কৃত্বা পশুরিব বদ্ধঃ খলু সংসারে॥

অর্থাৎ ছাগাদি পশু যেমন তৃণলোভে অন্ধকূপে পতিত হইয়া কেবল "মে মে" শব্দই করিতে থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্য সংসারে বদ্ধ হইয়া অনিত্য স্ত্রীপুত্র ধন গৃহাদি লইয়া কেবল "মে মে"—আমার আমার করিতেই থাকে।

ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্য মায়াবিমোহিত হইয়াই বুঝিতে পারে না যে—নশ্বর জড় বিষয়ে মানস-সম্বন্ধরচনা বা মমতা বুদ্ধিই তাহার সকল সংসার-দুঃখের কারণ। কোন মহাজন বলিয়াছেন—

মমেতি মূলং দুঃখস্য। ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ॥

মার্জ্জার-ভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।

ন তাদৃগ্‌ মমতাশূন্যে কলবিঙ্কে চ মূষিকে॥

অর্থাৎ "আমার" এই শব্দটই সকল দুঃখের মূল, আর "আমার নয়" এই শব্দই সকল সুখের মূল। উদাহরণে বলিলেন—আমার পোষা পাখীটিকে বিড়ালে খাইলে আমার অতিশয় দুঃখ হয়; কিন্তু আমারই গৃহের মূষিক কিম্বা চড়াই পাখীটাকে বিড়ালে খাইলে আমার কোনও দুঃখ হয় না, কারণ ইহাদের প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি নাই।

এইরূপ দুরবস্থাপন্ন সংসারগ্রস্ত মনুষ্যের শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতীত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এইরূপ দুরবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও সাধুকৃপা লাভ হইতে পারে, একমাত্র সাধুকৃপাবলেই তাহার ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেশ্যা পিঙ্গলা এইরূপ দুরবস্থাসত্ত্বেও শ্রীদত্তাত্রেয় ঋষির কৃপা-লাভ করিয়া বলিয়াছিল—

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণং।

গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥

ভাগ ১১।৮।৪০

অর্থাৎ সংসাররূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া বিষয়কর্ত্তৃক অপহৃত-বিবেক ও কালরূপ অজগর সর্পগ্রস্ত হইলে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত আর কে রক্ষা করিতে পারে?

ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্যের সকল দুর্দ্দশার কারণ এই যে—সে সুখই চায়, কিন্তু প্রকৃত সুখ কোথায় তাহা মায়া-বিমোহিত হইয়া জানিতে পারে না বলিয়াই সে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। অখণ্ডপরমানন্দঘন শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়াই সে মায়াবদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আনন্দলিপ্সা যায় নাই—সে আনন্দই চায়, আনন্দসিন্ধু শ্রীভগবান হইতেই যে তাহার জন্ম। অবিদ্যাবশে এই আনন্দের কেবলমাত্র আভাসের জন্যই সে নশ্বর ও অশেষ দুঃখসঙ্কুল মায়িক বিষয়েরই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়—কখন স্ত্রী, কখন পুত্র, কখন ধন, কখন বা গৃহ এইরূপ একটির পর আর একটি ভোগ করিতে চাহে। মায়াদত্ত ইন্দ্রিয়ে মায়িকবিষয়সংযোগহেতু যে ক্ষণিক অনুকূলবেদন উদ্-ভূত হয়, তাহাকেই সে সুখ বলিয়া জানে; কিন্তু পরক্ষণে তাহাই যে দুঃখে পরিণত হইয়া তাহাকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করে, তাহা সে দেখিয়াও দেখে না, পরন্তু বিষয়ান্তর প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াই থাকে। ইহার ফলে তাহাকে পদে পদে মায়ার পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়া অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিতই হইতে হয়। এই অবস্থায় বিষয়ভোগে তাহার কখনও অলংবুদ্ধি হয় না। নিরন্তর বিষয়ভোগ করিয়াও তাহার বিষয়তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। প্রতিক্ষণ ক্ষয়শীল ও অসীম অভাবসংযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদির স্বভাব এই যে—তাহাতে যত বিষয়সংযোগ হইবে ততই তাহার নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ভাগ ৯।১৯।১৪

অর্থাৎ ঘৃতসংযোগে অগ্নি যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কাম্য-বিষয়-ভোগ করিতে থাকিলে কামপ্রবৃত্তি কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না, বরং উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে।

শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

যৎ কিঞ্চিৎ ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্য নালং কামস্য ইতি মত্বা সমং ব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র ধন ধান্য পশু ও স্ত্রী একজন কামী ব্যক্তির পক্ষেও যথেষ্ট নহে। অতএব মনুষ্যের কামভোগ করিয়া যখন তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না, তখন তাহার সকল কামভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে নিষ্কাম ও সমবুদ্ধি হওয়াই কর্ত্তব্য।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের আনন্দলিপ্সা মায়িক বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। কারণ ভোগ্য বিষয় মাত্রই জড়—অনিত্য ও অপূর্ণ, নিত্য ভগবদংশ-স্বরূপ জীবের আনন্দলিপ্সা মায়িক বিষয়ভোগে কি করিয়া পূর্ণ হইবে? মায়াবদ্ধ মনুষ্যের আনন্দলিপ্সার সীমা মায়ার রাজ্যের অন্তর্ভূত নহে, মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিলেই সে লিপ্সা তৃপ্তিলাভ করে। এই তত্ত্ব কোন মহাজন অতি সুন্দরভাবে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিঃ চক্রেশ্বরত্বম্ ॥
পুনঃ চক্রেশঃ সুরপালতাং সুরপতি র্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা শিবপদং শিবো হরিপদং হ্যাশাবধিং কো গতঃ ॥

অর্থাৎ নিঃস্ব ব্যক্তি মনে করে যে—একশত মুদ্রা পাইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, এবং তাহা পাইবার জন্য তাহার সতত আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। শতমুদ্রা পাইলেই সহস্রের জন্য বাঞ্ছা হইয়া থাকে। সহস্রমুদ্রা পাইলেই পুনরায় লক্ষমুদ্রা পাইবার জন্য অভিলাষ হয়। লক্ষপতি ক্ষিতিপালতা পাইতে ইচ্ছা করে, ক্ষিতিপতি চক্রেশ্বরত্বের জন্য ব্যাকুল হয়, এবং চক্রপতি স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ ইন্দ্রত্বের কামনা করে। ইন্দ্র ব্রহ্মপদ পাইবার বাঞ্ছা করেন এবং ব্রহ্মাও শিবপদ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। পরমবৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীশিবের কোনও ভোগবাঞ্ছা নাই। তিনি কেবল শ্রীহরির চরণসেবা প্রাপ্তির জন্যই ব্যাকুল। নিখিল-পরমানন্দামৃতাব্ধি শ্রীহরিচরণে সেবা-প্রাপ্তিই জীবের আনন্দলিপ্সার সীমা বা অবধি।

মায়াবদ্ধ জীবের আনন্দলিপ্সা তাহার হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া অধোমুখে ধাবিত হয় এবং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বা বিষয়ভোগই তাহার লক্ষ্য বলিয়া কাম-শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীবের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুকৃপা লাভ হইলে ঐ আনন্দলিপ্সাই রূপান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে শ্রীকৃষ্ণচরণাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বা কৃষ্ণসেবাই তাহার লক্ষ্য বলিয়া প্রেম আখ্যা পাইয়া থাকে। কাম ও প্রেমে ধাতুগত কোন ভেদ নাই, কম ধাতু ও প্রী ধাতু উভয়েরই অর্থ এক—"ইচ্ছা"। কিন্তু কাম মায়াবদ্ধ জীবকে অতল দুঃখজলধিতলে নিমগ্ন করিয়া থাকে, এবং প্রেম তাহার সকল দুঃখ দূর করিয়া শ্রীহরিচরণে সেবা-প্রাপ্তি করাইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দেন। মায়াবদ্ধ জীবের জড় দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধিকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু যথার্থ বিবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াকৃত এই মূল ভ্রমবশতঃই ভগবৎ-বিস্মৃত জীব মায়াদত্ত জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা জড় বিষয় ভোগ করিয়াই তাহার আনন্দলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে। প্রতিক্ষণক্ষয়শীল ও সর্ব্বথা অপূর্ণস্বভাব দেহেন্দ্রিয়াদিতে মায়ারই নিয়মে নিরন্তর বিষয়-সংযোগ হইয়া থাকে, নিত্য চিদ্বস্তু জীবের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মায়ামুগ্ধ জীব ঐ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া মনে করে যে—সে নিজে অপূর্ণস্বভাব এবং মায়াকৃত বিষয় সংযোগকেই সে মনে করে যে সে নিজে বিষয় ভোগ করিয়া তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে; অধিকন্তু ইন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগহেতু সে যে আনন্দের আভাস অনুভব করে তদ্দ্বারাই সে তাহার স্বাভাবিক আনন্দলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে। মায়ামুগ্ধ জীব বুঝিতে পারে না যে, ভোক্তৃত্ব তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মায়াকৃত ঔপাধিক বা আগন্তুক ধর্ম্মমাত্র। জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের অংশ ও শক্তি, সুতরাং অংশী ও শক্তিমান্ শ্রীভগবানের সেবা করাই তাহার সাহজিক, ঔৎপত্তিক, বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব নিত্য ভগবদ্দাস, শ্রীভগবানের দাস্য, অর্থাৎ তাঁহাকে ভোগ করাইয়া তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। ভোক্তা একমাত্র শ্রীভগবান্। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ";

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে সকলই শ্রীভগবানের;

সকলেরই একমাত্র ভোক্তা শ্রীভগবান্। মায়াবদ্ধ জীবের আনন্দলিপ্সা কেবল একমাত্র নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি শ্রীভগবানের দাস্যেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু!
কোটিব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া তদ্দাসাভিমানি-ভক্তের যে আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, তাহার তুলনায় কোটি ব্রহ্মানন্দ একটি বিন্দুর সমানও নহে।

অতএব মায়াবদ্ধ জীবের আনন্দলিপ্সা মুক্তপ্রগ্রহে শ্রীভগবচ্চরণে পৌঁছিয়া সেবাধিকার প্রাপ্ত হইলেই পরি-সমাপ্ত হইয়া থাকে, তুচ্ছ মায়িক বিষয়ভোগের সহিত তাহার কোন সম্পর্কও নাই। অধিকন্তু মায়িক কোন বিষয়ই মনুষ্যের নিজস্ব হইতে পারে না; মায়াবিমোহিত-মনুষ্য স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। কর্ম্মফলে কিছুদিনের জন্যই বিষয়সংযোগ হইয়া থাকে—পুণ্যকর্ম্মফলে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়সংযোগ এবং পাপকর্ম্মফলে ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল বিষয়সংযোগই হইয়া থাকে; ইহাই জীবের সুখ ও দুঃখ সংজ্ঞা পাইয়া থাকে। মায়িক বিষয় মাত্রই অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া এই সুখ দুঃখ ও সর্ব্বৈব মিথ্যা; তত্রাপি মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই এই তুচ্ছ বিষয়ও রক্ষা কিম্বা নূতন-বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। কর্ম্মফলে বিষয় পাইলেও তাহা জন্মমৃত্যু আদি ষড়বিকারযুক্ত এবং প্রতিক্ষণক্ষয়শীল, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অনুকূল হইলেও বিষয়মাত্রই মনুষ্যের অশেষ দুঃখপ্রদ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
অসতীব হসত্যন্তর্ভর্ত্তারং পুত্রবৎসলম্।

অর্থাৎ অসতী স্ত্রী যেমন নিজপতিকে জারজপুত্রের লালন করিতে দেখিয়া অন্তরাল হইতে হাসিয়া থাকে, সেইরূপ দেহরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল মনুষ্যকে দেখিয়া মৃত্যুও অন্তরাল হইতে হাস্য করিয়া থাকে, এবং ভূসম্পত্তিতে মমতাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া বসুন্ধরাও হাস্য করিয়া থাকেন।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের দেহেন্দ্রিয়াদি ও দৈহিক বিষয়মাত্র কোনও প্রকারে তাহার নিজের আয়ত্তাধীন নহে, এবং বিষয়মাত্রই তাহার সকল দুঃখের কারণ। কিন্তু তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বিষয় সংগ্রহ ও রক্ষার নিমিত্ত বৃথা আয়ুঃ-ক্ষয় না করিয়া ঐ দেহেন্দ্রিয়াদি ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করিলেই সে যথার্থ সুখের সন্ধান পাইয়া থাকে। মনুষ্যের জীবন-ধারণের প্রয়োজন কেবল ভগবদ্ভজন, কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী বিষয়সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট; তাহাও মমতাবুদ্ধিযুক্ত হইলে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে ভোগ্যসামগ্রীমাত্রই শ্রীভগবানের জন্য, তাঁহার ভোগ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদগ্রহণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মায়ার বন্ধন দূর হইয়া যায় এবং ভগবচ্চরণে প্রেমলাভ হইয়া মনুষ্যজন্ম সফল হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং", অর্থাৎ তাঁহার ভোগ্যদ্রব্য সমুদায় তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ভোগ কর, তাঁহার ভোগ্যে লোভ করিও না। শাস্ত্র একথাও বলিয়াছেন—

পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রী মেতি ন চৌরতাম্॥
পঞ্চদশী।

অর্থাৎ চোরকে চোর বলিয়া জানিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিলে সে যেমন কখনও কোন অনিষ্ট করে না, বরং তদ্দারা বহু ইষ্টসাধনই হইয়া থাকে, সেইরূপ ভোগ্যবস্তু মাত্রেই ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়ার কবলে মহানর্থ ভোগ করিয়া থাকে ইহা জানিয়া প্রারব্ধলব্ধ সর্ব্ব-ভোগ্যবস্তুই একমাত্র ভোক্তা শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ সেবনে জীবনধারণ করিতে পারিলেই মনুষ্য কৃতার্থ হইয়া যায়। শ্রীমদুদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে সেই কথাই শুনাইয়াছেন—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥

অর্থাৎ যোগী ও জ্ঞানী অতিকৃচ্ছ্র সাধনে মায়াতিক্রম করেন করুন; কিন্তু আমরা তোমার দাস, আমরা কেবল তোমার প্রসাদী মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা অল-কৃত হইয়া এবং তোমার প্রসাদী অন্নভোজন করিয়াই

তোমার দুরত্যয়া মায়া জয় করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য ভগবদ্ভক্তমাত্রই ভোগ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াও ভগবৎপ্রসাদ সেবনে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভগবৎপ্রসাদই তাঁহাদের একমাত্র উপজীব্য। এইরূপ জীবনধারণেই তাঁহারা বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার ইহাকেই যুক্ত বৈরাগ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অনাসক্ত ভক্ত যথাযোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া, অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবৎপ্রসাদ ভোগ করিয়া শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধে যে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাকেই যুক্ত বৈরাগ্য বলিয়া থাকে। যুক্তবৈরাগ্যই ভক্তের মায়াতিক্রম ও ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে।

যুক্তবৈরাগ্যের এই পরিচয় দিয়া গোস্বামিপাদ মুমুক্ষু-গণের ফল্গুবৈরাগ্য দেখাইয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ শ্রীভগবৎসম্বন্ধিবস্তুতেও প্রাকৃতবুদ্ধি-হেতু মুমুক্ষু-গণ তাহা যে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাকেই ফল্গু-বৈরাগ্য কহে। মুমুক্ষুগণের এই বৈরাগ্যই শ্রীভগবৎপ্রসাদে অবজ্ঞা-হেতু অপরাধ উৎপন্ন করিয়া অধঃপতনের কারণ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে ফল্গুবৈরাগ্য বলিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্যাম নাম।

(শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল)

কে নিবি গো ব্রজবাসীর আদরের এই শ্যাম নাম,
রাধার শ্যাম,
ব্রজের শ্যাম,
শ্যামার শ্যাম, এই ত নাম।

এ'নাম শুনিলে কানে,
পরাণ আকুল হ'য় গো প্রাণে,
পলকেতে হ'য় গো প্রলয়
বিলয়ে গায় শ্যাম-নাম।

এ নাম পরশমনি,
কি মহিমা কিবা জানি,
নামের গুণে অভিসারে
রাধা গাহে শ্যাম নাম।

পরশেতে শ্যাম-স্মৃতি,
বিরহেতে উঠে গীতি,
বিরহ অনলে প্রীতি
রূপ দেখা শ্যাম নাম।

পররূপ শ্যামরূপ,
নাহিক যার অনুরূপ,
সোহাগে সে রূপ গলে,
রস উঠে শ্যামনাম।

রসতত্ত্ব আস্বাদন,
পঞ্চভূত সম্মিলন,
শুদ্ধ সত্ত্ব সংঘটন,
সত্ত্বা যাহার শ্যামনাম।

শুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
যোগমায়ার হয় এ গতি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্ত্রে,
তন্ত্র যাহার শ্যামনাম।

অমিতারঞ্জন বলে,
নামের কৃপায় অবহেলে,
পূর্ব্বরাগের গম্ভীরাতে,
শুনতে পাবে শ্যামনাম।

বাসনা

[শ্রীচন্দ্রশেখর বিশ্বাস]

কবে হবে ব্রজে বসতি আমার।
(কবে) গোপীপদরজে, সর্ব্ব অঙ্গে সেজে,
যুগল প্রেমে ম'জে রব অনিবার॥

কবে বৃন্দাবনের প্রতিকুঞ্জ-দ্বারে, মাগি মাধুকুরি খাব উদর পুরে,
বলিব বদনে হরেকৃষ্ণ হরে, পিব প্রাণ ভরে জল যমুনার।
নাচ্‌বে পেখম তুলি ময়ূর-ময়ূরী, কল্পবৃক্ষলতা ফল-ফুলে ভ'রি,
ডালে বসি গান গাবে শুকসারি, কিশোর-কিশোরীর নিকুঞ্জবিহার
কোকিল ধরিবে পঞ্চম তান, অলি গুঞ্জরিবে ধরিয়া সুতান,
বিশ্ব চরাচর করিবে নামগান, ডুবে রাধাশ্যামপ্রেমপারাবার।
প্রেমপ্রবাহিনী যমুনা তটিনী, ধরিবে ধরণী-সৌন্দর্য্যসম্ভার॥
কতদিনে আমি সখি সব সঙ্গে, দিবস যামিনী কৃষ্ণকথারঙ্গে,
রব ম'জি সদা লীলারসরঙ্গে, প্রেমেরি তরঙ্গে দিব গো সাঁতার।
কতদিনে আমি নারীদেহধারি, গোপবধূ সনে লইয়া গাগরি,
যমুনার পথে আনিবারে বারি, হের্‌ব বংশীধারীর পলিনবিহার॥
নিভৃতনিকুঞ্জে রাধা রাধা বলি, ডাকিবে সঘনে মোহন-মুরলী,
যাবে বিনোদিনী সখি সব মিলি, হের্‌ব বনমালীর প্রেম-অভিসার।
নিকুঞ্জমন্দিরে বিজন-বিপিনে, মিলিবে নাগরী নাগরের সনে,
অপরূপ রূপ হেরি দুনয়নে, বহিবে সঘনে প্রেম-অশ্রুধার॥
রতিকেলিশ্রমে শ্রান্তকলেবরে, রত্নসিংহাসনে কিশোরী কিশোরে,
করিব ব্যাজন সুবর্ণ-চামরে, মুছাব আঁচরে স্বেদ দোঁহাকার।
ভৃঙ্গারেতে ভ'রি সুবাসিত বারি, ধোয়াব শ্রীপদ হৃদয়েতে ধরি,
মুছাব চিকুরে সযতন করি, হের্‌ব প্রাণভরি যুগলরূপ-সার॥
কর্পূর তাম্বুল শ্রীবদনে দিব, সুগন্ধি চন্দন শ্রীঅঙ্গে মাখাব,
অলক্তকে পদ রঞ্জিত করিব, হৃদয়ে ধরিব পদ-সারাৎসার।
চন্দ্রশেখর অতি অভাজন, না জানে ভজন না জানে পূজন,
সখীগুরুপদে মাগে এই ধন, যুগল চরণসেবার অধিকার॥

শ্রীশ্রী দামবন্ধন লীলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)

কুবেরতনয়দ্বয় যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া গোকুলে নন্দমহারাজের বাটির সম্মুখেই বাস করিতে লাগিলেন এত সন্নিকটে বসবাস করিবার হেতু শ্রীকৃষ্ণের অতি শৈশবাবস্থাতেই দর্শন পাইয়া কৃপালাভে সমর্থ হইবেন। বলিয়া আর যদি ইহা না হইয়া দূরে স্থিতি হইত তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার ঐ শৈশব অবস্থায় কখনই দর্শন পাইতেন না। কারণ মারজেশ্বরী শিশুপুত্রকে কখন দূরে যাইতে দিতেন না এবং শৈশবকাল ব্যতীত অন্যকালে ঐরূপ গর্হিত পাপাচার করিয়া অবিচারে কৃপালাভ করা অসম্ভব হইত।

ভক্তাধীন শ্রীহরি ভাগবতপ্রধান প্রিয়তমভক্ত দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত যে স্থানে ঐ দুই যমলার্জ্জুন ছিল, অল্পে অল্পে উদূখলসহ সেইস্থানে গমন করিলেন এবং সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উদূখলটি আপনা হইতেই বক্রভাবে পড়িয়া গেল অর্থাৎ উদূখল শ্রীভগবানের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ বাঁকা হইয়া গেল। অনেকে এখানে মনে করিতে পারেন যে—উদূখল জড়পদার্থ, তাহার আবার বোধশক্তি কিরূপে থাকিতে পারে। শ্রীভগবান্ চিন্ময়বস্তু, তাঁহার লীলার সামগ্রীও সমস্ত চৈতন্যময় বুঝিতে হইবে ; যেমন কেহ কখন শুনিয়াছেন কি সিংহ-অসুর-সাপ-ইন্দুর প্রভৃতির পূজা হইতে। কিন্তু যখন তাহারা জগন্মাতা শ্রীদুর্গার সঙ্গে আসে, তাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক দেবীর ন্যায় পূজিত হয়, অর্থাৎ চিন্ময় বস্তুর সংস্পর্শে তাহারা তখন সাধারণ পাঞ্চভৌতিক পশু থাকে না, সেইরূপ শ্রীভগবানের লীলাসহায়ক বস্তুসমূহও সাধারণ জড়বস্তু নহে। শ্রীকৃষ্ণের উদরে রজ্জুবদ্ধ ছিল সুতরাং উদূখল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। তিনি বলপূর্ব্বক সেই উদূখল আকর্ষণ করিয়া সেই দুই বিশাল গগনস্পর্শী বৃক্ষের মূল উৎপাটন করিলেন। তাঁহার বিক্রমে সেই বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধ, পত্র ও শাখাসমূহে সাতিশয় কম্প উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া পতিত হইল।

তখন দুই বৃক্ষ হইতে মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় দুই সিদ্ধপুরুষ বহির্গত হইলেন। নিজকৃত পাপাচরণে দেবর্ষির অভিসম্পাতে স্মৃতিযুক্ত হইয়া বহুকাল বৃক্ষমধ্যে আবদ্ধ থাকায় অনুতাপানলে তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছিল এবং শ্রীভগবানের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য তাহাদের চিত্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে বৃক্ষ হইতে মুক্তি পাইবামাত্র সম্মুখে সেই অখিললোকনাথ পতিতপাবন শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে সাহস করিলেন না, যে হেতু ঐরূপ প্রণাম করিতে যাইলে পাছে মুখচন্দ্রকে হারাইয়া বসেন সেইজন্য "শিরসা প্রণম্য" শ্রীমুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে করিতে মস্তকোপরি দুইকর অঞ্জলিবদ্ধরূপে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপর অঞ্জলিবিরচনপূর্ব্বক নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম করি। হে পরম কল্যাণ! আপনাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বাসুদেব, আপনি শান্তমূর্ত্তি, আপনি যদুগণের পতি আপনাকে প্রণাম করি।" বারম্বার শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ এবং তাঁহার চরণে প্রণাম-জ্ঞাপন করা অপরাধস্খালনের এক প্রশস্ত উপায় ; সেইজন্য কুবেরতনয়দ্বয় ঐরূপ পুনঃপুন তাঁহার নামোচ্চারণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিলেন। এখন কুবেরতনয়দ্বয়ের দুইবার 'কৃষ্ণ' নাম করিবার কারণ "কৃষ্ণ" শব্দে এমনই একটি মহিমান্বিত আকর্ষণীশক্তি আছে যে—রসনা যদি একবার উচ্চারণ করে, তৎক্ষণাৎ বার বার উচ্চারণ করিতে চাহিবে। তারপর' শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপটি হইল পরমকল্যাণকারী ; তাই 'পরমকল্যাণ বলিলেন কাম নিষ্কাম উভয় প্রকার জীবের মঙ্গল তিনি করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে 'বিশ্বমঙ্গল' বলিলেন, সকলের প্রতি করুণা (কৃপা) করিবার নিমিত্ত তাঁহার পৃথিবীতে অবতরণ বলিয়া তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলিলেন, সর্ব্ব-

প্রকার দোষ (মায়া) হইতে তিনি মুক্ত বলিয়া তাঁহাকে 'শান্ত' বলিলেন, তারপর কেবল তিনি যাদবগণের অধিপতি হেন, ব্রজেও যাঁহারা বাস করেন তাদেরও অধিপতি সেইজন্য "যদুপতি" বলিলেন। তাহা হইলে কুবেরতনয়দ্বয়ের প্রার্থনার মর্ম্ম—হে কৃষ্ণ! আপনি যখন স্বরূপে কল্যাণ-ময় আপনি যখন সকাম-নিষ্কাম উভয় জীবের মঙ্গল করিয়া থাকেন, আপনার অবতরণ যখন জগৎবাসীগণের প্রতি করুণা বিতরণ করিবার নিমিত্ত, আপনাতে যখন মায়া-প্রতারণা শক্তি নাই, আপনি যখন ব্রজেতে পর্য্যন্ত যাহারা স্থান পাইয়াছে তাহাদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, আমরাও এক্ষণে ব্রজে স্থান পাইয়াছি অতএব আমাদের প্রতি কৃপা করুন। তারপর বলিলেন "হে ভূমন্" অর্থাৎ অযোগ্যকে যোগ্য করেন, আবার আমরা "ভবানুচর-কিঙ্করৌ" আপনার দাসের দাস। প্রাকৃত জগতে পুত্র অপেক্ষা পৌত্রের দাবী যেমন বেশী, সেইরূপ 'ভবানুচর-কিঙ্করৌ' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অবিচারে অনুগ্রহ পাইবার তাহাদেরও একটি বিশেষ দাবী আছে। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়—তাহারা যে ভয়ানক গর্হিত পাপকার্য্য করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের চিরকাল নরকবাস ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা উচিত কিন্তু নারদের অনুগ্রহে তাহাদের ব্রজে বাস ঘটিয়াছিল এবং এক্ষণে শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ-দর্শন করিতেছে। দেবর্ষির অনুগৃহীত বলিয়া যখন তাহারা শ্রীভগবানের এতটা কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তখন শ্রীভগবান্ এক্ষণে তাহাদের অবিচারে পূর্ণ কৃপা করিবেন না কেন? ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় নিজজন।

কুবেরতনয়দ্বয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"দেবর্ষি নারদের কৃপায় আমরা হৃদয়ে ভক্তির অধিকারী হইয়াছি এইজন্য তোমার শ্রীচরণ সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিতে অধি-কারী হইয়াছি। এক্ষণে আমরা হৃষিকেশের সেবা করিতে চাই। পিতা দেবর্ষি দ্বারা আমাদের ভক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আপনি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ বিকাশ করিয়া দিন। আমাদিগের বাক্য আপনার গুণকথনে, কর্ণদ্বয় আপনার কথামৃতে, হস্তযুগল আপনার সেবায়, মন আপনার চরণারবিন্দ স্মরণে, মস্তক আপনার আবাসভূত জগতে প্রণামে (জগৎ শব্দ এখানে ভক্তকে বুঝাইতেছে কারণ ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবানের সতত বিশ্রাম। (ভগবানের মন্দির দুই প্রকার; একটি স্থাবর অর্থাৎ যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হয়। অপরটি অস্থাবর অর্থাৎ যে হৃদয় মন্দিরে শ্রীভগবান্ সতত নিবাস করেন) এবং দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তি-রূপ সাধুদিগের দর্শনে যেন নিযুক্ত থাকে! 'বাক্যে' কথাটি প্রথমেই বলিবার হেতু শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই বাক্যসংযম করা উচিত। কারণ বাক্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে চঞ্চল করে অর্থাৎ বাক্যপ্রয়ো-গের সময় চক্ষু হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি নড়িতে থাকে, আরও বিশেষতঃ বাক্য বাহ্যেন্দ্রিয় (কায়) ও অন্তেন্দ্রিয় (মন) এর মধ্যস্থল। আবার বাক্যসংযমের অর্থ নির্ব্বাক হইয়া থাকা নহে। ইহার অর্থ "গ্রাম্যকথা" নহে অর্থাৎ ভগবদ্‌সম্বন্ধবিহীন কোন কথা নহে।

ভগবান্ গোকুলেশ্বর তখন রজ্জুর দ্বারা উদুখলে বদ্ধ ছিলেন। কুবেরতনয়দ্বয়ের ঐ প্রকার স্তব শুনিয়া তিনি অল্প হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপভাবে হাসিবার তাৎপর্য্য যে—তিনি রহিয়াছেন রজ্জুর দ্বারা উদুখলে বদ্ধ, আর শাপগ্রস্ত কুবেরতনয়দ্বয় তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রে বলে যে মুক্তাত্মা সেই অপরকে মুক্তি দিতে পারে; কিন্তু এখানে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছে, তাই ভগবানকে বেদাতীত বস্তু বলা হয়। তারপর সেইরূপ হাসিতে হাসিতে গুহ্যকদ্বয়কে বলিলেন—"তোমাদের ঐশ্বর্য্য-মদান্ধতা দেখিয়া দয়ালুচেতা দেবর্ষি নারদ যে বৃক্ষজন্মরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি। যেরূপ সূর্য্যকে অবলোকন করিলে পুরুষের চক্ষুর বন্ধন থাকে না সেইরূপ যাঁহারা স্বধর্ম্মবর্ত্তী ও আত্মবেত্তা, সুতরাং যাঁহারা আমাতে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন, আমার দর্শনে তাঁহাদিগের আর সংসারবন্ধন থাকিতে পারে না, অতএব তোমরা নিজগৃহে সত্বর গমন কর।

গুহ্যকদ্বয়কে শীঘ্র শীঘ্র তথা হইতে সরাইয়া দিবার শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গুহ্যকদ্বয়ের ব্রাহ্মণ-শরীর তাহারা ঐশ্বর্য্যের উপাসক, আর নন্দযশোদাদি হইলেন প্রীতির উপাসক। বৃক্ষদ্বয়ের পতনের সময় প্রচণ্ড শব্দ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্থির জানেন যে—মা বাবা প্রভৃতি শীঘ্রই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং যদি দেখেন যে

যে ব্রাহ্মণদ্বয় তাহাদের পুত্রের পদধূলি প্রভৃতি লইতেছে, তাহা হইলে মা বাপের মনে পুত্রের ভাবী অমঙ্গলজনিত ভয়ের উদ্রেক হইবে; আর কুবেরতনয়দ্বয় নন্দযশোদাদির ঐশ্বর্য্যবিহীন প্রীতির ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে উহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন অর্থাৎ মহাপরাধে পতিত হইতে পারেন—ইত্যাদি উভয়কূল রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে ঐস্থান হইতে শীঘ্র শীঘ্র সরাইয়া দিবার মানসে সত্বর তাহাদের আবাসস্থানে চলিয়া যাইতে বলিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দুই যক্ষ উদুখল-বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন।

নন্দাদি গোপগণ যদিও তখন যাগ যজ্ঞাদি কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল কিন্তু তাহাদের মনটি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হইয়া থাকিত, তাই সেই দুই বৃক্ষের পতনকালীন শব্দকে অকালে বজ্রপাত মনে করিয়া পুত্রের কোন বিপদ হইল ভাবিয়া অতি সত্বর সে স্থানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা আসিয়া সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষকে ভূমিতলে সমূল পতিত এবং উদুখলাকর্ষণকারী রজ্জুবদ্ধ শ্যামকে ও অন্যান্য গোপবালকগণকে সম্মুখে দেখিলেন। যদিও বৃক্ষদ্বয়ের পতনের কারণ সম্মুখে রহিয়াছে তথাপি তাঁহারা কারণ স্থির করিতে পারিলেন না এবং যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কিন্তু গোপবালকগণ যখন বলিলেন যে—কৃষ্ণ বৃক্ষদুইটির মধ্যে যাইবার মাত্র উদুখলটি বাঁকা হইয়া গেল, একটু আকর্ষণ করিবার মাত্র বৃক্ষ দুইটি পড়িয়া গেল এবং দুইটি দিব্যপুরুষকে ঐ ভগ্নবৃক্ষদ্বয় হইতে বহির্গত হইতে দেখিল তথাপি কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে তাহাদের দুলাল কৃষ্ণের এই কাজ। কি আশ্চর্য্য! যদিও তাঁহারা প্রত্যেক বারেই ঐরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যের সঙ্গে তাহাদের দুলাল গোপালকে তাহার বক্ষোপরি দেখিলেন, শকট ও তৃণাবর্ত্ত অসুরদ্বয়ের নিপাতের সময় তাহাকে উহাদের সন্নিকটে দেখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের সহিত এমনই বিশুদ্ধ প্রীতিভরা বাৎসল্য রসে বিভোর যে তাহারা তাঁহাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের কথা আদৌ চিন্তা করিতে পারিতেন না। নন্দরাজ পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ দেখিয়া হৃদয়ে যদিও আঘাত পাইয়াছিলেন তথাপি মুখে হাসিয়া অর্থাৎ প্রাকৃতজগতে প্রাণাধিক শিশুপুত্রের পতনে পিতামাতা যেমন হৃদয়ের দুঃখটিকে চাপিয়া শিশুর দুঃখ লাঘবের জন্য মুখে হাসিয়া তাহাকে উৎসাহিত করে এখানেও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে নন্দবাবা মুখে হাসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

এদিকে যমলার্জ্জুনবৃক্ষপতনের শব্দে সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু মা ব্রজেশ্বরী আসেন নাই; তাহার মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইয়াছিল যে তিনি সেই স্থানেই পুত্রকে স্বহস্তে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন—পুত্রের পলায়নের উপায়ও রাখিয়া আসেন নাই—অতএব পুত্র নিশ্চয়ই নিধন পাইয়াছে এবম্প্রকার চিন্তাতেই তিনি মূর্চ্ছা দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোহিণী মা আসিয়া নন্দমহারাজের ক্রোড় হইতে কৃষ্ণকে লইয়া মাব্রজেশ্বরীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার বুকে বসাইয়া দিলেন। শ্যামের স্পর্শে মার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। কিন্তু চাঁদমুখ দর্শন করিয়া আবার মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িলেন। নিদাঘের মধ্যাহ্নকালে উত্তপ্ত ভূমিখণ্ডে বারি সিঞ্চন করিলে ভূমিখণ্ড যেমন স্বল্প শীতল হইয়া পুনঃ সাতিশয় উত্তপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ সিঞ্চনে যেমন পূর্ণশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পুত্রবিরহানলে মা ব্রজেশ্বরী ঘোরমূর্চ্ছান্বিত হইয়াছিলেন, নবজলধর শ্যামকে বক্ষোপরি পাইয়া বিরহানল সম্পূর্ণ আর্দ্র হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, বারম্বার পুত্রের চাঁদমুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলা বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকদেবের এত অত্যধিক আবেশ আসিয়া গিয়াছিল যে তিনি এই সঙ্গে তাঁহার একটি বাল্যলীলা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন—"মহারাজ! আর একদিন আপনারা যাহাকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান বলেন, তাঁহাকে মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ দারুযন্ত্রবৎ অর্থাৎ সূত্রধর যেমন সূতের সাহায্যে পুতুল নৃত্য করায় সেইরূপ "আঁচল পুরে ননী দিব" এই স্তোতবাক্য দিয়া নৃত্য করাইয়াছিলেন। গোপীগণ নন্দালয়ে বর্ত্তুলাকারে বসিয়া করতালি দিতে দিতে সেই স্তোকবাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, আর বালকরূপী ভগবান্ উহার দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া ক্ষুদ্র দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাথৈ তাথৈ করিয়া সুমধুর তালে নাচিতেছেন,

আবার সেই চন্দ্রমুখে কখন কখন গান গাহিতেছেন হাতের তালে তালে প্রেমসূত্র দিয়া পরমব্রহ্মকে নাচাইতে একমাত্র ব্রজাঙ্গনাদিগের সাধ্য হইয়াছিল।

আর একদিন সেই পূর্ণব্রহ্ম "আজ্ঞপ্তঃ" হইয়া অর্থাৎ যিনি সকলের আজ্ঞাকারক, তিনি আজ্ঞাপিত হইয়া নন্দবাবার পাদুকাদ্বয় হেলেদুলে নাচিতে নাচিতে মাথায় করিয়া লইয়া আনিতে লাগিলেন। নন্দবাবার সঙ্কোচ হওয়া ত দূরের কথা বরং তিনি এবং সমস্ত গোপগোপী আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছিলেন; কারণ তাহাদের গোপালের পাদুকা বহন করিবার শক্তি হইয়াছে দেখিয়া। ধন্য ব্রজপ্রেম।

সমাপ্ত

প্রেমিকে প্রেমিকে

(বিনয় কুমারী দেবী)

এমন করিয়া কোথায় চলেছ
আত্মহারা প্রায় হয়ে ?
ওই আগে যায় যেজন, তোমায়
যেন যায় টেনে নিয়ে।
কিবা আকর্ষণে যাইতেছ তুমি,
উহার পশ্চাতে চলে ?
ও তো দেখি শুধু যায় নিজ মনে,
রাধে রাধে রাধে বলে।
তাইতে ধাইছ ওর পাছু পাছু
এমন আকৃষ্ট হয়ে ?
অবিরল ধারে অশ্রু-জল ঝরে
কমল নয়ন দিয়ে ?
তব ভাব দেখি মনে হয় ইহা—
বিকাইছ ওর কাছে;
সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে উঁহাকে;
যা কিছু তোমার আছে।
বয়সে বালিকা সেই শ্রীরাধিকা
বৃষভানু রাজ-মেয়ে
এমন পীরিতি কি কৈল তোমায়
নামে, যাও বিকাইয়ে ?

তাঁর প্রেম কত তুমিই বুঝেছ;
অন্যে কি বুঝিবে ইহা;
অপরূপ প্রেম নাহিক তুলনা
তোমারে বেঁধেছে যাহা।
চতুর সুজন ব্রজবাসী যত
জানে এই সুকৌশল;
মুখেতে তাদের তাই শুনি শুধু
"রাধে" "রাধে" অবিরল।
দীনা ও দুঃখিনী এই অভাগিনী
তোমারে কিনিয়া নিতে
এমন সহজ উপায় থাকিতে
সাধ না করিল চিতে।
প্রেম রসময় হেন "রাধা" নাম
কভু না বলিল মুখে।
কি উপায় হবে, কি করে ঘুচিবে
চির জনমের দুঃখে !
শ্রীগুরু ও ব্রজজনের কৃপায়
মুখে যদি কভু স্ফুরে।
হেন 'রাধা" নাম, তবেই তাহার
দুঃখরাশি যাবে দূরে।

ধ্বন্যালোক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

সংসৃষ্টালঙ্কারান্তর সংকীর্ণ ধ্বনির উদাহরণ রূপে এই শ্লোকটী ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত আছে যথা,—

"দন্তক্ষতানি করজৈশ্চ বিপাটিতানি
প্রোদ্ভিন্ন সান্দ্রপুলকে ভবতঃ শরীরে
দত্তানি রক্তমনসা মৃগরাজবধ্বা
জাতস্পৃহৈর্ম্মুনিভিরপ্যবলোকিতানি।"

অর্থাৎ স্বীয় শাবক ভক্ষণে প্রবৃত্তা সিংহীর প্রতি বোধিসত্ত্ব তদীয় নিজ শরীর দান করিতেছেন দেখিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়াছিল। পরার্থসাধনজনিত আনন্দাতিশয্যে আপনার শরীরে নিবিড় পুলকাবলী উদ্গত হইয়াছে। রুধিরাভিলাষিণী সিংহীর দ্বারা উহা দন্তক্ষত নখবিদীর্ণ হইয়াছে! জাতস্পৃহ মুনিগণকর্ত্তৃক ও ঐ সকল দৃষ্ট হইয়াছে।

এখানে সমাসোক্তি সংসৃষ্ট বিরোধালঙ্কার দ্বারা সংকীর্ণ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এখানে যথার্থতঃ দয়াবীরত্বই বাচ্যার্থীভূত।

'রক্তমনসা' পদটা শ্লিষ্ট বিশেষণ। ইহা দ্বারা রক্তে রুধিরে মনোঽভিলাষো যস্যাঃ তয়া অর্থাৎ রুধিরে অভিলাষ যাহার ও অনুরক্তং চ মনো যস্যাঃ অর্থাৎ অনুরক্ত মন যাহার এইরূপ দুইটী অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহারা মুনি, তাহাদেরও মদনাবেশ উদ্বোধিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা বিরোধালঙ্কার প্রতীত হইয়াছে। 'জাতস্পৃহ' বিশেষণের সার্থকতা এই যে—আমরাও কোন সময় এইরূপ কারুণিক পদবী অধিরোহণ করিব ও সেই সময় যথার্থ মনোরাজ্যযুক্ত মুনি হইব। সমাসোক্তিটীও নায়িকাবৃত্তান্ত হইতে প্রতীত হইতেছে। যেমন কোন নায়ক শত অভিলাষ জ্ঞাপন দ্বারা প্রার্থিত সম্ভোগাবসরে আনন্দে পুলকিততনু হইয়া থাকে, সেইরূপ হে বোধিসত্ত্ব! তুমি পরার্থসম্পাদনজন্য স্বশরীর দান কালে রোমাঞ্চিতকলেবর ধারণ করিয়াছ।

যেখানে কয়েকটী পদ বাচ্যালঙ্কারযুক্ত ও কয়েকটী ধ্বনি প্রভেদযুক্ত সেইখানে বাচ্যালঙ্কার সংসৃষ্টত্ব পদাক্ষেপ দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। ইহার উদাহরণ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
সিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥"

অর্থাৎ যেস্থানে প্রভাত সময়ে সিপ্রানদীর জলসম্বন্ধহেতু সুশীতল মন্দ সমীরণ বিকশিত কমলসকলের সংস্পর্শে অতিশয় সুরভিযুক্ত ও যাহা দূর হইতে সারসগণের স্পষ্ট ও আনন্দজাত মধুরাস্ফুট শব্দ বহন পূর্ব্বক সুরতাভিলাষে প্রিয়বাক্যপ্রয়োগনিপুণ, শরীর-সংবাহনে প্রবৃত্ত প্রেমিকের মত কামিনীকুলের সুরতগ্লানি অপনয়ন করে।

এই শ্লোকের শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য কৃত তাৎপর্য্য এই যে,—সিপ্রাবায়ুদ্বারা অতি দূর হইতেও শব্দ আনীত হইতেছে। সুকুমারপবনস্পর্শে আনন্দাধিক্য নিবন্ধন সারসগণ উচ্চ শব্দ করিতেছে, সেই কূজন, বায়ু দ্বারা আন্দোলিত সিপ্রাতরঙ্গোত্থ মধুর শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া দীর্ঘ হইতেছে, এই বায়ু অতি সুকুমার; কারণ তজ্জনিত শব্দ দ্বারা সারসগণের কূজনও অভিভূত হইতেছে না, উহা যে ব্রহ্মচারী তাহাই সূচিত হইতেছে। ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, যেহেতু মন্দসমীরণস্পর্শজনিত আনন্দের মধুর কলধ্বনি শ্রুত হইতেছে। 'প্রভাতেষু' এই বহুবচন দ্বারা সর্ব্বদাই সেখানে প্রভাতে এইরূপ হৃদ্যতানিরূপিত হইয়াছে। মকরন্দভাবে বিকশিত মনোহর কমলসমূহের সুরভিত কেশরসংসর্গ হেতু বায়ু উপরক্ত বা কষায়বর্ণ ধারণ করিয়াছে ও স্ত্রীগণের বিলাসবাসনা উদ্দীপিত করিয়া সুরতগ্লানি হরণ করিতেছে। উক্ত বায়ু যে বেগে প্রবাহিত হইয়া এইরূপ কর্ম্ম করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু

দেহের অনুকূল, অন্য স্পর্শ দ্বারাই অন্তরে আনন্দবিধান করিতেছে। প্রিয়তমার মধ্যে সম্ভোগলালসা জাগাইয়া উক্ত বায়ু তাহাকে বিলাস প্রার্থনা করাইতেছে ও প্রিয়তমও সেইরূপ বিলাসের জন্য চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে লালসা বিবর্দ্ধিত করিয়া অনুরাগ-প্রাণ শৃঙ্গাররসের সবিশেষ পোষক হইয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ; এই চিরপরিচিত সিপ্রা-সমীরণ নাগরিক কিন্তু অবিদগ্ধ গ্রাম্যপ্রায় নহে; প্রিয়তমও বিলাসান্তে নায়িকার অঙ্গের অনুকূল সংবাহনাদি প্রার্থনার জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া এইরূপেই সুরতগ্লানি হরণ করে। তাদৃশ সেবা অনঙ্গীকারসূচক নায়িকার মধুর বচনসমূহও সে দীর্ঘীভূত করে, সেই চাটুবাক্য কহিবার সময় সেই নায়িকার বিকশিতবদন-কমলের সুরভি দ্বারা নায়ক উপরক্ত হয়। এইরূপে যেখানে মনোহর শব্দ, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ বিদ্যমান—সেইস্থানে পবনও তদ্রূপ। সেইরূপ দেশে অবশ্য গমন করিবে' ইহাই মেঘের প্রতি বিরহবিধুর যক্ষের উক্তি। এখানে 'মৈত্রী' পদটী অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি।

এইরূপে যেস্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ স্পর্শসৌভাগ্য বিরাজ করে না, সে সকল কাব্য সহৃদয়হৃদয়হারী হইতে পারে না। এই কাব্যরহস্যটী পরম শ্রেষ্ঠরূপেই জ্ঞানীগণ বিবেচনা করেন। সেইজন্য ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্যোতে উক্ত আছে—

"মুখ্যা মহাকবিগিরামলঙ্কৃতিভৃতামপি
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জেব যোষিতাম্।" ৩।৩৮

অর্থাৎ মহাকবিগণের শব্দার্থ অলঙ্কারাদি যুক্ত বাক্যেও প্রতীয়মান বা ধ্বন্যাত্মক এই শোভাই অলঙ্কারধারিণী কামিনীগণের লজ্জার ন্যায় মুখ্য ভূষা।

কাব্যের আত্মা যে রসধ্বনি তাহা পূর্ব্বেই ধ্বনিকার বলিয়াছেন, এখন সেই বিষয়েই উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ধ্বনির দ্বারা সকল সৎকবিগণের কাব্যের পরম শ্রেষ্ঠত্ব ঘটিয়া থাকে। তাহা প্রতারণামাত্র অর্থবাদস্বরূপ বলিয়া যেন মনে না করা হয় এই জন্যই এই কারিকাটীর অবতারণা। কাব্যমূলে 'অপি' শব্দের সার্থকতা এই যে—অলঙ্কার শূন্যা নায়িকাগণেরও লজ্জাই ভূষণ। কাব্যে প্রতীয়মান অর্থ দ্বারা যে শোভা প্রকাশিত হয় তাহা লজ্জা সদৃশী, কারণ উহাই নিগূঢ়ভাবে সার সৌন্দর্য্য বিধান করিয়া থাকে। নায়িকাগণ অলঙ্কার ধারণ করিলেও লজ্জাই তাহাদের প্রধান ভূষণ। তাঁহাদের অন্তরে মদনোদ্ভেদ হইলে হৃদয়ে যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় ও লজ্জায় অরুণিত-মুখমণ্ডলে সেই ভাবচ্ছায়া স্পষ্টই পরিস্ফুট হয় সেইরূপ কবির নিগূঢ় ধ্বনির দ্বারা কাব্যেও ঘটিয়া থাকে। লজ্জাই তাহাদের অন্তরের মন্মথবিকার গোপন করিয়া রসবিশেষ পোষণ করে। সেইরূপ সৎকবির কাব্যেও ধ্বনির দ্বারা কোন এক শব্দার্থ হইতে ভিন্ন নিগূঢ়-বিষয় সূচিত হইয়া উহাকে সাতিশয় রসাবহ করিয়া তুলে। যেরূপ শৃঙ্গার-রসতরঙ্গিণী লজ্জা দ্বারা অবরুদ্ধা হইয়া নায়িকার নেত্রগাত্র-বিকাররূপ বিলাসসমূহ বাহিরে প্রকাশিত করে অর্থাৎ এই নায়িকার বিলাসটী গোপন সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া লজ্জা দ্বারা প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রিয়তমের অভিলাষ জ্ঞাপনের পর লজ্জারঞ্জিতমুখী নায়িকার বিলাস-প্রার্থনাটীও শৃঙ্গাররসের অপূর্ব্ব শোভা বিধান করে। কিন্তু বীতরাগ যতিগণের কৌপীন অপসারিত হইলেও লজ্জা বা কলঙ্কস্পর্শ দৃষ্ট হয় না।

নিম্নলিখিত কবিতাটীতে বাচ্যার্থ অস্পষ্টরূপে কথিত হওয়ায় ও ব্যঙ্গ্যার্থটী অক্লিষ্টরূপে উপন্যস্ত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইয়াছে যথা,—

"বিস্রব্ধোত্থা মন্মথাজ্ঞাবিধানে যে মুগ্ধাক্ষ্যাঃ
কেঽপি লীলাবিলাসাঃ।
অক্ষুণ্ণাস্তে চেতসা কেবলেন স্থিত্বৈকান্তে সততং
ভাবনীয়াঃ॥"

অর্থাৎ মদনের আজ্ঞাবিধানে যে সকল প্রণয়োত্থ-মুগ্ধাক্ষ্য নব নব লীলাবিলাস প্রকাশিত হয়, তাহা একান্তে বা নির্জ্জনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত করিয়া চিন্তনীয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মন্মথাচার্য্যের শাসন ত্রিভুবনে বন্দনীয়, অতএব লজ্জা সম্ভ্রমহারী যে অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। সেইজন্য সাধ্বস লজ্জা ত্যাগ দ্বারা সম্ভোগকালে অকৃত-সম্ভোগ হেতু দৃষ্টিপ্রসার প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র, পবিত্র গাত্রনেত্রবিকার নবনবায়মানরূপে প্রতিক্ষণে উন্মেষিত

হয়, তাহা অন্যত্র ব্যগ্রতা পরিহারপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে ভাবনার যোগ্য। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বিলাসসমূহ অন্য কোন উপায়ে নিরূপণ করা যাইতে পারে না।

সহৃদয়গণের রসবিধৌত বিশুদ্ধ স্বচ্ছহৃদয়েই কবিবর্ণিত অনুভাব প্রভৃতি স্ফুরিত হওয়া যুক্তিযুক্ত; কিন্তু যে হৃদয় শত কামনা বাসনার তরঙ্গে আন্দোলিত ও যাহা অন্যবেদ্য-বস্তুর স্পর্শশূন্য না হওয়ায় রজোস্তম গুণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত তাহা কখনও রসসাক্ষাৎকারের যোগ্য নহে, সেইজন্যই সহৃদয়গণের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হইয়া কাব্যরসাস্বাদনে যোগ্যতা লাভ করে।

আলঙ্কারিকচূড়ামণি অভিনব গুপ্তাচার্য্যপাদ অপহ্নুতি ধ্বনি প্রদর্শন করিতে তদীয় উপাধ্যায় ভট্টেন্দুরাজকৃত একটী কবিতা ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

'যঃ কালাগুরুপত্র-ভঙ্গ-রচনাবাসৈকসারায়তে,
গৌরাঙ্গীকুচকুম্ভভুবি সুভগাভোগে সুধাধামনি।
বিচ্ছেদানলদীপিতোত্থবনিতা চেতোহধিবাসোদ্ভবং
সন্তাপং বিনিনীষুরেষ বিনতৈরঙ্গৈর্নতাঙ্গি স্মরঃ'।

অর্থাৎ হে নতাঙ্গি! উৎকণ্ঠিতা বনিতার বিরহানল-প্রজ্জ্বলিতহৃদয়ে বাসনিবন্ধন যে সন্তাপ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নিবৃত্তির জন্য এই কন্দর্প গৌরাঙ্গী তোমার সুন্দর স্তনবিস্তারসদৃশ শীতলচন্দ্রে তদীয় বক্ষঃস্থলের কৃষ্ণবর্ণ অগুরুপত্রখণ্ডের শোভা ও উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

এখানে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ মৃগাচিহ্নটী বিরহানল-সন্তপ্ত বনিতার হৃদয়দাহে মলিনচ্ছবিধারী মন্মথাকারে অপহ্নুতি ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ-ধ্বনিও আছে, যেহেতু চন্দ্রবর্ত্তী সেই কৃষ্ণচিহ্নের নামও গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গীর স্তনমণ্ডলস্থানীয় চন্দ্রে কৃষ্ণাগুরু-খণ্ডের বৈচিত্র্যাস্পদ রূপে যাহা উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে, তাহা কোন্ বস্তু বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহে। এইজন্য সন্দেহও ধ্বনিত হইতেছে।

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ শ্রীমদ্ অভিনব গুপ্তাচার্য্যপাদ নিম্নলিখিত রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কোন নায়িকা পূর্ব্বে নায়কের প্রণয় অঙ্গীকার না করিয়া পরে অনুতপ্তা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা হন। তদনন্তর বল্লভের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রসাধনাদি করিয়া বাসকসজ্জা নায়িকার অবস্থা প্রাপ্ত হন। পূর্ণচন্দ্রোদয়কালে দূতীমুখে প্রিয়তম আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার কুচকলসে ন্যস্ত অগুরুপত্ররচনা মন্মথো-দ্দীপনকারিণী রূপে চাটুবাদ করিতে করিতে বলিলেন—এই অগুরুরচনা চন্দ্রবর্ত্তিনী হইয়া নীলকমলদলের কান্তি প্রকাশ করিতেছে। এখানে প্রতিবস্তূপমাধ্বনিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার লক্ষণ এই যে—উপমান বাক্যে ও উপমেয় বাক্যে যদি সাধারণ ধর্ম্মের স্থিতি হয়, তাহা হইলে প্রতিবস্তূপমা কহে। 'সুধাধামনি' এইপদ চন্দ্রের পর্য্যায় রূপে প্রযুক্ত হইলেও 'সন্তাপ নিবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া' এই হেতুতাও অভিব্যক্ত করিতেছে। এইজন্য হেত্বলঙ্কারধ্বনিও সূচিত হইয়াছে। তোমার পয়োধরশোভা ও মৃগাঙ্কশোভা একসঙ্গে মন্মথ উদ্দীপন করে এইজন্য সহোক্তিধ্বনিও প্রকাশিত হইল। উহার লক্ষণ 'সহোক্তিঃ সা সহার্থেন শব্দেনৈকা ক্রিয়া যদি'। তোমার কুচমণ্ডলসদৃশ চন্দ্রমণ্ডল ও চন্দ্রের মত তোমার বক্ষঃস্থলের বিস্তার এই অর্থ প্রতীতি হইতে উপমেয় উপমাধ্বনিও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ এখানে অন্য শক্ত্যোৎপ্রেক্ষাদিও বিদ্যমান আছে। কারণ মহাকবিগণের বাণী কামধেনুর মত; অর্থাৎ উহা অনন্ত ধ্বনি অনুধ্বনি পূর্ণ ও কেবল একটী অর্থমাত্রই প্রকাশ করিয়া পর্য্যবসিত হয় না।

কোন স্থানে অবিবক্ষিতবাচ্যের বাক্যগত অত্যন্ত তিরস্কৃত দ্বারা ব্যঞ্জকত্ব প্রতিপাদন করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধ্বনিবৃত্তিকার আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লেখ করেছেন, যথা:—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

অর্থাৎ সকল লোকের পক্ষে যাহা নিশা স্বরূপ, তাহাতে সংযমী পুরুষ জাগ্রত থাকেন। (আর যাহাতে ভূতসকল জাগ্রত আছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞ মুনির নিকট নিশাস্বরূপ। ইহাই শ্লোকের সরলার্থ। এইবাক্য দ্বারা নিশার্থ বা জাগরণার্থ কিছুই অভিপ্রেত নহে কিন্তু মুনির তত্ত্বজ্ঞানে অবধান ও অতত্ত্ব-বিষয়ে পরাঙ্মুখত্বই প্রতিপাদন করা শ্লোকের লক্ষ্য। ইহাই এখানে তিরস্কৃতবাচ্যের ব্যঞ্জকত্ব। কালে বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে উপদেষ্টার কোন উপদেশই

সিদ্ধ হয় না। নিশা জাগরণ করিবে ও 'অন্যত্র অন্ধের মত অবস্থান করিবে' এইরূপ উক্তি দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য বাচ্যার্থ দ্বারা বাক্যটীর স্বীয় প্রকৃত ও মুখ্যার্থটী বাধিত হইয়া পড়িতেছে ও সংযমীর অলৌকিক লক্ষণ হেতু দ্বারা তত্ত্বদৃষ্টিতে অবধান ও মিথ্যাদৃষ্টিতে পরাঙ্মুখতাই ধ্বনিত হইতেছে।

ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রাণীগণেরও যাহা মোহজননী নিশাস্বরূপা তত্ত্বদৃষ্টি, তাহাতে সংযমী যোগি-পুরুষ জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইবেন সেইজন্য সর্ব্বদাই জাগরূক থাকেন। কিন্তু কেবল বিষয়-বর্জ্জনমাত্র হেতুই যে তিনি সংযমী, তাহা এখানে বুঝাই-তেছে না। যদিই বা তিনি সকল জীবের পক্ষে মোহিনী-নিশায়ই জাগ্রত থাকেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—কিরূপে তাদৃশী নিশা বা অবিদ্যা ত্যাগ করিবেন সেইজন্যই সচেষ্ট থাকেন। আর যে মিথ্যাদৃষ্টি বা বিষয়নিষ্ঠায় সমগ্রভূত জাগিয়া থাকে অর্থাৎ অতিশয়রূপে বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে, তাহা সেই সংযমীর পক্ষে রাত্রি বা অপ্রবোধ বিষয়। অর্থাৎ সেই বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি জাগ্রত থাকেন না। এই রূপেই লোকোত্তরচরিত্র জ্ঞানীগণ দেখেন ও মনে করেন। তাঁহারা সতত ভগবদ্বিষয়ে সমাহিত থাকেন বলিয়া তাঁহা-দেরই অন্তর ও বাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হইয়া থাকে। অতাত্ত্বিক কিন্তু এইরূপে দেখেনও না মনেও করেন না; কারণ উভয়ের দর্শন অত্যন্ত বিলক্ষণ। এইরূপে এই বাক্যের তাৎপর্য্য তত্ত্বদৃষ্টিপর। মূলে 'পশ্যতঃ' এই বচনটীও স্বার্থ-মাত্রই বুঝাইতেছে না কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থেই উহার বিশ্রান্তি। সকল বাক্যই এখানে ব্যঙ্গ্যপর। ইহাই শ্রীপাদ অভিনব-গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বস্তুদর্শন বিভিন্নরূপেই হইয়া থাকে। শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য তদীয় বৃহদারণ্যক শ্রুতির বার্ত্তিকে বলেন,—

'বুদ্ধতত্ত্বস্য লোকোঽয়ং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ
বুদ্ধতত্ত্বোঽপি লোকস্য জড়োন্মত্তপিশাচবৎ'।

অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞ তাঁহার নিকট এই সংসারের অজ্ঞানীর কায় জড়, পাগল ও শুচি অশুচি জ্ঞানহীন পিশাচের মত প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে দেহাভিমানী সংসারীর নিকট জীবন্মুক্ত পুরুষের চেষ্টাও জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

এখানে নিশা শব্দে অবিদ্যা ও দিবা শব্দে প্রকাশই বুঝাইতেছে। সাধারণ জীব যেরূপ নিবিড় অন্ধকারে সঞ্চরণ করিতে উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ অতি সুকুমারস্বভাব যোগিগণ তদীয় ব্যুত্থানকালে নিশাস্থানীয় অবিদ্যাদশায় অত্যন্ত ক্লেশানুভব করেন। তাঁহাদের এই অবস্থা গাঢ়ান্ধকারময়ী যামিনীর মতই ক্লেশদায়িনী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গমাত্র ভীতিপ্রদ। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য গৌড়পাদ তদীয় "মাণ্ডুক্য কারিকায়" বলেন, 'অভয়ে ভয়দর্শিনঃ'।

(ক্রমশঃ)

ঝুলন

(শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী)

এ দেহ কদম্বতরু সাধনা-কালিন্দীকূলে
আনন্দ বসন্তবায়ু বহিতেছে ঢুলে ঢুলে।
রহি রহি বার বার মুরলীর মধু ধার
ঝরিতেছে ধীরে ধীরে গোপন মরমমূলে
পুলকে পূরিছে তরু পল্লবে মুকুলে ফুলে।

এ দেহ-কদম্বচূড়ে জ্যোতির্ম্ময় শাখে বাঁধা
পিরীতি-ঝুলনে বসি দুলিতেছে কৃষ্ণরাধা।
রতন-হিল্লোল দোলে পশে রাই শ্যামকোলে
আধতনু নীলমণি, গলিতকাঞ্চন আধা,
দোল্ দোল্ হরিবোল্ সফল জনম-সাধা।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[১১]

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে পূর্ণকাম পরতত্ত্বের বরণাভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে। তিনি বেদাধ্যাপনাদি অন্য কিছুতেই লভ্য হয়েন না; কিন্তু যাহাকে এই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব বরণ করেন, তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য হয়েন;—তাহার নিকট ইনি (অর্থাৎ এই পরমাত্মার পূর্ণ-স্বরূপ যে শ্রীভগবান্) স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন; অর্থাৎ ঘনীভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপে দেখা দেন।

ইহাতে একদিকে শ্রীভগবানের যেমন নিত্যই বরণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে "তাহা দ্বারা ইনি লভ্য হয়েন"—অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিদ্বারা লভ্য হইয়া, ভক্তের নিকট আত্ম-বরণ করেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। তাহা হইলে, যুগপৎ উভয়-পক্ষেই পরস্পরকে বরণ ও পরস্পর কর্ত্তৃক বৃত হইবার অভিলাষ জাগ্রত হইলেই, পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে ইহাই জানিতে হইবে; অর্থাৎ যে ভক্ত শ্রীভগবানকে আত্ম-বরণ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক বৃত হইতে চাহেন, শ্রীভগবানও তৎকর্ত্তৃক বৃত হইয়া, সেই ভক্তকে আত্মবরণ করেন। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে যথাক্রমে এই যে আত্মসাৎ করিয়া আত্মদান ও আত্মদান করিয়া আত্মসাৎ,—উভয় পক্ষের যুগপৎ এই সমপ্রয়োজন সিদ্ধিরই অপর নাম—"মহামিলন"।

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥

অর্থাৎ—সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়; তাঁহারা আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না;—ইহা শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের নিজোক্তি।

তিনি যে অনন্ত হইলেও ভক্তের ভক্তির কাছে সান্ত হইয়া আসেন, তিনি যে অসীম হইয়াও ভক্তের বাহুপাশে সসীম হইয়া ধরা দেন, তিনি যে নিস্পৃহ হইয়াও ভক্তকে প্রেমালিঙ্গনে বক্ষে ধরিতে চাহেন, তিনি যে নিরাকার হইয়াও ভক্তের প্রেমনেত্রের সম্মুখে পূর্ণরসময়তনু প্রকট করেন, তিনি অচিন্ত্য হইয়াও যে ভক্তের মানসপটে নিরন্তর প্রতিভাত হয়েন,—এই আশার বাণী কেবল ভক্তিবাদ হইতে যেমন এই মরজগতে মুখরিত হইয়াছে, তেমনি এই মহতী আশার সম্পূরণ, কেবল ভক্তিদ্বারাই সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন;—

> সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
> অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
> ত্যক্ত বন্ধুজনস্নেহো ময়ি যে কুরুতে রতিং।
> একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যেঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্॥

অর্থাৎ—আমি নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রেমরজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ, অজিত হইয়াও ভক্তকর্ত্তৃক বিজিত, এবং আমি অবশ্য হইয়াও তাহাদের নিকট বশীভূত হইয়া থাকি; যাহারা আত্মীয় বন্ধুগণের মমতা পরিহার পূর্ব্বক কেবল আমাতেই অনুরাগ স্থাপন করে, আমি কেবল তাহাদের এবং তাহারাই আমার। ভক্তগণ ভিন্ন আমার আর অপর সুহৃদ্ নাই।

শ্রীভগবান্ কেবল যদি আপ্তকাম, অনন্ত ও অচিন্ত্যাদিই হইতেন, তবে জীবের পক্ষে তাঁহার সহিত "মহামিলনের" কোন আশাই থাকিত না; কিন্তু প্রেম-ধর্ম্মের অভয়বাণী জীবের নিরাশ হৃদয় আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া, জানাইয়া দিয়াছেন,—পূর্ণ স্বরূপভাব জাগ্রত প্রত্যেক জীবকে "মহামিলন" দান করিবার জন্য প্রসারিত-বাহুযুগে শ্রীভগবান্ নিত্যই প্রতীক্ষা করিতেছেন। যত ক্ষুদ্র—যতই দুর্ব্বল হউক্ না কেন, ভগবৎ-চরণে আত্মোৎসর্গ লালসায় জীব তাহার ক্ষুদ্র বাহু

তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া, একান্তভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে চাহিলেই—অগ্রসর হইয়া যাইতে না পারিলেও, শ্রীভগবান্ নিজেই আসিয়া তাহাকে আত্মসাৎপূর্ব্বক আত্মদান করিয়া থাকেন। তিনি জীবকে যদি নিজে না চাহিতেন,—জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার আবশ্যকতা—তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যদি না থাকিত,—যে তাঁহাকেই চাহিয়াছে, তাহার হৃদয় দুয়ারে তিনি যদি নিজেই না আসিয়া দাঁড়াইতেন,—তবে সেই প্রাণের প্রাণ—জীবনের চির-সহচর—আত্মার আত্মা—সেই হৃদয়বল্লভের সহিত মিলিত হইবার সকল আশা—সকল অভিলাষ অনন্ত শূন্যেই বিলীন হইয়া যাইত। তাই মনে হয়,—

"ছোট দুটী ভুজপাশে,
সে যদি না নিজে আসে,
অনন্ত মহান্ সে যে—
মিছে আশা তারে ধরা;
(তবে) মিছে আশা তার সাথে,
নীরব নিথর রাতে—
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে
প্রেম বিনিময় করা।"
(পুষ্পাঞ্জলি)

তাঁহাকে ধরিতে চাহিলেই তিনি ধরা দিতে নিজেই ছুটিয়া আসেন। ভ্রমর যেমন স্বেচ্ছায় ও সাধ করিয়াই কমলে আবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের হৃদয়কমলে স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়েন।

দাম্পত্য-বন্ধনে নবদম্পতি যেমন যুগপৎ উভয়েই উভয়কে বরণ করিয়া, উভয়ের দ্বারা উভয়ে বৃত হইতে চাহিলেই শুভ-মিলন সংঘটিত হয়,—পরস্পরকে প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের অন্তরে জাগ্রত হইলেই যেমন মিলন সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না, সেইরূপ জীব-সমষ্টিকেই ভক্তরূপে পাইবার জন্য, শ্রীকরে বরমাল্য লইয়া শ্রীভগবান্ নিত্যই অপেক্ষা করিতেছেন; জীব, ভক্তিভাবে,—অকৈতব কৃষ্ণসেবা লালসে, উষার শিশিরসিক্ত কমলের মত প্রেমাশ্রু-পূর্ণিত নয়নে—প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া তদীয় রাতুল চরণোপরি নমিত মস্তকে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই, শ্রীভগবানও সাগ্রহে—সানন্দে সেই জীবকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক আত্মবরণ করিয়া থাকেন।

কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে ভক্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভব হয়; এবং "অবাঙ্মনসগোচর" পরতত্ত্ব যে কেবল ভক্তি দ্বারাই "নয়নগোচর" হয়েন, শ্রুতিতে এই কথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে;—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"

অর্থাৎ—ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান; ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন; ভক্তিবশ শ্রীভগবান্ ভক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন।

শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র, সর্ব্বাধীশ হইয়াও যে ভক্তাধীন এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও যে কেবল ভক্তিদ্বারাই প্রকাশ হয়েন—একথা তিনি উল্লাসভরে শ্রীমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন;—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

অর্থাৎ—আমি ভক্তাধীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। আমি ভক্তজনপ্রিয়; ভক্তসকল আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। সাধ্বী স্ত্রী যেমন সাধু পতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমাতে বদ্ধহৃদয়, সমদর্শী ভক্তসকল আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

ভক্তি ব্যতীত শ্রীভগবৎসম্মিলন—পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার অপর কিছুতেই সম্ভব নহে। ভাগবতে শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" অর্থাৎ আমি একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকি; এবং শ্রীউদ্ধবকে এই কথা আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

অর্থাৎ—হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিচার রূপ সাংখ্য, বেদাধ্যায়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না,—আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তিদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই।

তবে যে জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ বা আংশিক সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তাহাও জানিতে হইবে—ভক্তির সংমিশ্রণ জন্যই। অর্থাৎ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনের সহিত যে পরিমিত ভক্তির সংমিশ্রণ থাকে, ভক্তি-সংমিশ্রণের তারতম্যানুসারে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেরও পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ বা সঙ্গলাভ না করিলে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল ভজনসাধনই অজাগলস্তনের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল। শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম সহজে সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে জানাইয়া দিবার জন্য তাই পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥"

শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন, ভক্তির সহায়তায় বা সঙ্গলাভ করিয়াই সিদ্ধ হয়, এইজন্য উহাদিগকে "আরোপসিদ্ধা" ও "সঙ্গসিদ্ধা" ভক্তিই বলা হইয়া থাকে। যাঁহার সংমিশ্রণ প্রভাবে অন্যান্য সাধন সকল সুসিদ্ধ হয়েন,—নচেৎ হয়েন না। পরিপূর্ণস্বরূপে ভগবৎ সাক্ষাৎকার বা সাম্মিলনের পক্ষে সেই বিশুদ্ধা ভক্তির প্রভাব যে কতদূর অচিন্তনীয়,—সে কথা লৌকিক ভাব ও ভাষার পক্ষে প্রকাশ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য-নিরপেক্ষা, বিশুদ্ধা ভক্তিবল্লীই শ্রীভগবৎকল্পতরুর সহিত জীবের মহামিলনের একমাত্র সংযোগ-সূত্র।

ভক্তির সহায়তা ব্যতীত, জ্ঞান, কর্ম্মাদির সার্থকতা না থাকায়, ভক্তিসম্বন্ধবর্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্মাদির নিন্দাই শাস্ত্রে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার প্রমাণ-স্বরূপ কেবল দুই একটি শ্লোক মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে;—

ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানের নিরর্থকতা বিষয়ে, যথা—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
(শ্রীভাগবতঃ)

অর্থাৎ (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে প্রভো! নিখিল পুরুষার্থের আকর স্বরূপ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য শ্রম করে, তাহারা তণ্ডুলহীন তুষসকলে আঘাতকারীর মত কিছুমাত্র লাভবান না হইয়া, কেবল ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয়।

ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মাদির নিরর্থকতা ও নিন্দা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যথা—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়া।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ॥

অর্থাৎ—শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত ক্রিয়াসকল যদি হরি-ভক্তিসম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশভোগ মাত্রই ফল হইয়া থাকে; অধিকন্তু উহাকে কুলটা রমণীর ব্যভিচারসদৃশ দোষা-বহই জানিতে হইবে।

যাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া অপর কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না,—যিনি, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপে বা স্বয়ংই সিদ্ধা হয়েন;—কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়—অপর কোনও অভিলাষ যাঁহাতে লেশ মাত্রও নাই,—তিনিই ভগবৎ-বশীকারিণী "শুদ্ধা-ভক্তি"। নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সারমর্ম্ম অনুভব করিয়া পরমপূজ্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণ, তদীয় শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তির নিম্নোক্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যথা—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধীয় যে কিছু অনুশীলন অর্থাৎ শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা,—তাহা যদি তদীয় প্রাতিকূল না হইয়া, তদনুকূল অর্থাৎ রুচিকর হয়, তাহাকে "ভক্তি" কহে। [ইহা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।] আর পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্য অভিলাষশূন্য হয়, তবে তাহাকেই "উত্তমাভক্তি" বলা যায়; [ইহা ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ।]

উত্তমাভক্তির উদয়েই জীবত্ব পরিপূর্ণ সার্থক তাকে বরণ করিয়া চিরধন্য হইয়া যায়। আপ্তকাম শ্রীভগবানের অন্তরে কেবল একটি বাঞ্ছা—একটি প্রয়োজন নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে ;—অনন্ত শুদ্ধভক্তের সহিত নিত্য মিলিত থাকিয়াও জীবকোটি হইতে অনন্ত শুদ্ধভক্তের সম্মিলন লাভ করাই তাঁহার সেই অভিলাষ। শুদ্ধাভক্তির উদয়ে, কেবল ভগবৎসম্মিলন ভিন্ন জীবেরও অন্তরে অপর কোনও অভিলাষ জাগে না। জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানকে পাইবার লালসা পরিপূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিলেই "মহা-মিলনের"ও বিলম্ব হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির প্রসঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আমেরিকা-বিজয়

[শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়]

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে বলিতেছেন,—

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মম নাম।"

আজ তাঁহারই শুভসূচনা দেখা দিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও প্রভাব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যাহা কেহ কখনও ভাবে নাই, আজ তাহাও সম্ভবপর হইতে চলিয়াছে। সুবিখ্যাত ইংরাজ অধ্যাপক R. H. Nixon M. A. মহোদয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বৈরাগী" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ের অধিত্যকায় "উত্তর বৃন্দাবন" নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের আলোচনা ও সাধনা করিতেছেন। আমরা একজন সামরিক-বিভাগের উচ্চপদস্থ আই, এম্, এস্ ডাক্তারের বিষয় জানি যিনি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মাতোয়ারা হইয়া যান। তাঁহার নাম করা অনুচিত বিবেচনায়, এস্থলে আমরা তাঁহার নামোল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কত বিদেশীয়ভক্ত আত্মগোপন করিয়া নীরবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে ? আমরা এস্থলে মাত্র দুই চারিটীর উল্লেখ করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য "ব্রেজিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আজ শুধু ইংলণ্ড নহে, পৃথিবীর বহুস্থানে ও বহু লোকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতেছেন। সুইজারলণ্ড, জার্ম্মাণ, রুষিয়া, কালিফর্ণিয়া, ব্রেজিল, ভেনেজুইলা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম অল্প বিস্তর প্রচারিত হইয়াছে। পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দির হইতে সকলের সহিত যথাসম্ভব সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে এবং এতৎসম্বন্ধে ঐ সমস্ত স্থানের বিশিষ্ট মনীষিবর্গের পত্রসমূহ গ্রন্থমন্দিরের সংরক্ষণী মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে সুবিখ্যাত উইলিয়ম্ ষ্টেড্ মহোদয় যেদিন বলিলেন,—"এমন উদার ও সুন্দর ধর্ম্ম জগতে এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। আমার ইচ্ছা, ইউরোপের প্রতি গির্জ্জায় গির্জ্জায় শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত পঠিত হউক।"—সেদিন জগতের পক্ষে মহা শুভদিন বলিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় অধ্যাপক G. Tucci মহোদয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে গভীর অনুশীলন করিয়াছেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় মূল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতঃ ইতালীয় ভাষায় "শ্রীচৈতন্য" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিজহস্তে বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা গ্রন্থমন্দিরে সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সুযোগ্যা-সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা Julian Tucci মহোদয়া "শ্রীরাধাতত্ত্ব"

প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। ওদিকে রুষীয় অধ্যাপক Wintenitz মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতেছেন ও বক্তৃতা দিতেছেন। সুইজারল্যণ্ডের spiritual Research School (অধ্যাত্মচর্চ্চা প্রতিষ্ঠান)এ গ্রন্থমন্দির হইতে প্রেরিত শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তিকা পঠিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও জার্ম্মাণ ভাষায় মাধ্ব দর্শনের অনুবাদক Helumth Von Glasenapp মহোদয় আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে ১৯০৭ সালে বার্লিন নগরে Ostursberg কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত "গ্রন্থখানি জার্ম্মাণ ভাষায় অনুদিত হইয়া Das Caitanya Carita mrita des Kishna dasa Kaviraja নামে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহার পিতা Olto Von Glasenapp মহাশয় ১৯২৫ সালে শ্রীচৈতন্যদেববিরচিত পাঁচটি শ্লোক জার্ম্মাণ কবিতায় অনুবাদ করিয়া তদীয় Indische Gedichte নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি "শ্রীশ্রীগ্রন্থমন্দিরের" বিশিষ্ট পাঠক পাঠিকার মধ্যে যাঁহারা জার্ম্মাণ ভাষায় ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা এ বিষয়ে সন্ধান করিয়া আমাদিগকে পত্র দিবেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ভাষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ও গ্রন্থমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়কে উক্ত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কথা বলেন। তদনুসারে ভারতীয় শিক্ষাকলা সম্বন্ধে সুলেখক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র মহাশয়কে Imperial Library তে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পাঠান হয়, কিন্তু ঐ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ Asiatic Societyর পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ থাকিতে পারে। কেহ সন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

উল্লিখিত বিষয়গুলি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। স্থিরচিত্তে বর্ত্তমান জাগতিক ব্যাপার সমূহ বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে—শীঘ্রই জগতে এক মহাসমন্বয়ের যুগ আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম যে ঐ মহাসমন্বয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। এই সকল ঘটনা তাহারই পূর্ব্বাভাস মাত্র। অবশ্য, শ্রীভগবানের অপার করুণায়, এজন্য বহুকাল হইতেই আয়োজন চলিয়া আসিতেছে। আমরা নীলাচলে মার্টিন লুথারের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারই কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এ সম্বন্ধে ১৩২২ সালের "গম্ভীরা" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায় মহাশয় "শ্রীমহাপ্রভু ও মার্টিন লুথার সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিবার পর মার্টিন লুথার পক্ষান্ধ দেশবাসী দ্বারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হন। সমগ্র ইউরোপে তিনি একপ্রকার একঘরে হইয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি এসিয়াখণ্ডে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ৺পুরীধামে চৈতন্যপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহার প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগের মহনীয় আদর্শ ও স্নেহাশীষে পূত হইয়া লুথার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লুথারের স্বলিখিত বিবরণীতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" মার্টিন লুথার দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত বিরোধী Erasmus-কে যে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের "সৌরভ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি এম, এ মহোদয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। মার্টিন লুথার লিখিয়াছিলেন —

"পোপ যদি ধনবলে ও জনবলে বলীয়ান হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিতে চান, তবে তাঁহার সে চেষ্টা বৃথা। তাঁহাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে হইবে এবং তাঁহার পার্শ্বচরদিগকে হিন্দুস্থানের ত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্শ্বচরগণের ন্যায় ধর্ম্ম ও শিক্ষার আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে।"

(আমরা পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহোদয়ের প্রেরিত তথ্যাবলী হইতে উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শেই মার্টিন লুথারের চেষ্টায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে পরিমার্জ্জিত ও সংশোধিত হইয়া জগতে বরণীয় হইয়াছে। ফুল ফুটিবার কত পূর্ব্ব হইতেই বৃক্ষমধ্যে ও ভূগর্ভে তাহার আয়োজন চলিতে

থাকে, কেহ কি তাহার সন্ধান রাখে? তাই বলিতে ছিলাম—সমগ্র জগতের আজিকার এই শ্রীচৈতন্যপ্রীতি কোন আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহাই শ্রীভগবানের শাশ্বতী বিশ্বলীলার সাময়িক পরিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তি মাত্র।

তারপর ব্রেজিলের কথা। ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ, এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্ম নাই। সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে সমভাবে সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্গের সুসন্তান বীরকেশরী কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয় এখানকার সামরিক বিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্ভুত সাহস ও কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে কেবল এই দেশেই বর্ণভেদজনিত কোনরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না সুতরাং এই দেশ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মগ্রহণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শ্রীভগবানের অন্তঃপ্রেরণায় দার্জ্জিলিংয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এবং পানিহাটী গ্রন্থমন্দিরের অন্যতম বান্ধব শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় ১৯২৯ সালে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ Opensamento পত্রিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। ব্রেজিলের circulo Esotarico da communhao do pensamento নামে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসমিতি আছে পত্রিকাখানি তাহারই মুখপত্র। ব্রেজিলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এই সমিতির সভ্য! বড়ই গৌরবের বিষয়—আমাদের ইন্দুবাবু এই সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য। ইন্দুবাবুর প্রবন্ধপাঠে ব্রেজিলের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধানমূলক পত্র আসে। ইন্দুবাবু এই অনুসন্ধিৎসু লোকদিগকে পানিহাটী গ্রন্থমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট বিদ্যাভূষণ সাহিত্য-সরস্বতী মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং নিজে পত্রযোগে উঁহাদিগের সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে যত্নশীল হয়েন ও আবশ্যকমত শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া উঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। পানিহাটী গ্রন্থমন্দিরও আপনার ক্ষুদ্র-শক্তিমত পত্র লিখিয়া ও পুস্তকাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে থাকেন। ক্রমে পানিহাটী বৈষ্ণব প্রদর্শনী ও উৎসবের বিবরণসমূহ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং আমরা মধ্যে মধ্যে তথা হইতে আগ্রহ ও প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইতে লাগিলাম। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক Sir A. O, Rodrignes মহোদয় একবার পানিহাটী উৎসবে একটি মোহর প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের অনুরোধ মত গ্রন্থমন্দিরে নিজ হস্তলিপি ও প্রতিকৃতি প্রেরণ করিয়া উহার বান্ধবশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপে ইন্দুবাবু ও গ্রন্থমন্দিরের নাম ব্রেজিলের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া গেল। এক্ষণে, ইন্দুবাবুর ছবি ব্রেজিলের বহু গৃহে পূজিত হইতেছে এবং সে দেশের বহু নরনারী ইন্দুবাবুকে গুরু বলিয়া মনে করেন ও তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইন্দুবাবু যে ইতিমধ্যেই ইঁহাদিগের কতটা শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন, তত্রত্য "তত্ত্ব-ইন্দু" ['তত্ত্ব' কথাটি উঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার অর্থ দিয়াছেন 'চর্চ্চা বা 'আলোচনা'] এই সভাটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। Luig Argusto Coelho নামে ভেনিজুয়েলার জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখিলে, ঐ বন্ধু তাঁহাকে পানিহাটী গ্রন্থমন্দিরে অনুসন্ধান করিতে বলেন। তদনুসারে Coelho মহোদয় আমাদিগকে পত্র লিখেন। ইহা হইতে গ্রন্থমন্দির বিদেশে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রেজিলের ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় কন্সল্ জেনারেল মহামান্য Vicente Aochied মহোদয় ১৯৩০ সালে পানিহাটি বৈষ্ণব প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়া "শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে যে সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেই তাঁহাকে প্রকাশ্য-সভায় শ্রীগৌরমহিমা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে আত্মহারা ও অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতাটি "O pensrmento" পত্রিকার মুদ্রিত হওয়ায় তত্রত্য বহু নর নারীর দৃষ্টি ভারত ও ভারতের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে

আমরা ব্রেজিলের একজন মনস্বিনী মহিলার নাম করিব। ইঁহার নাম Mr. Visleta odeth. ইনি একজন পরম গৌর ভক্ত—প্রত্যহই কিছু না কিছু শ্রীগৌরলীলা আলোচনা করেন। ইঁহারই অক্লান্ত-চেষ্টায় ঐ দেশে "Circnto"র শাখাস্বরূপ "তত্ত্ব-শ্রীচৈতন্য" নামে এক বৈষ্ণবসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইনি সম্প্রতি ইন্দুবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির ও উহার কার্য্যপদ্ধতির সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Please send me some more instructions about Baishnab society, prospectus etc. How this society thinks that I can act here?"—"আমাকে ঐ বৈষ্ণব সমিতি (পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির) ও উহার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও সংবাদ পাঠাইবেন। উক্ত সমিতি এখানে আমার নিকট হইতে কিরূপ সেবা চাহেন—তাহাও লিখিবেন।" ইন্দুবাবু ব্রেজিল "তত্ত্ব-শ্রীচৈতন্য" প্রতিষ্ঠার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া গ্রন্থমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রেজিল থেকে দক্ষিণ আমেরিকা সমগ্রে তোমাদের নাম খুব জাহির হইয়াছে। ও দেশ থেকে ভক্ত এলে যাতে বরাহনগরের মঠে স্থান পায় ব্যবস্থা করিবে।"

ইন্দুবাবুর নির্দ্দেশমত পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির থেকে ব্রেজিল "তত্ত্ব-শ্রীচৈতন্যে"র আশ্রমে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের সুবৃহৎ চিত্র, সিদ্ধ শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহারাজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি, পানিহাটী বটবৃক্ষের চিত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর প্রভৃতি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অধম প্রবন্ধলেখকের উপর ইংরাজি ভাষায় ঐ সকল চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া দেওয়ার ভার অর্পিত হইয়াছিল। সেদিন গ্রন্থমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়ের যে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি বলিলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্র আর শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্ন উভয়ই চিন্ময় ও তত্ত্বে একই বস্তু। আজ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমেরিকায় শুভবিজয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।"

আমি তাঁহারই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া এই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আমেরিকা-বিজয়।"

শীঘ্রই ও দেশ থেকে Mr. Rhrispin oetoni Soares নামে একজন অনুরাগী যুবক এদেশে আগমন করিতেছেন। ইন্দুবাবু তাঁহাকে ভাল ক'রে ভজন, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ শিখিয়ে দিয়ে ওদেশে পাঠিয়ে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার সে সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে।

বীজ উপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরের যিনি প্রধান হোতা তিনি সহায়-সম্পত্তিহীন, সুদরিদ্র; কিন্তু, তাঁহার প্রাণ গৌরপ্রেমে মতোয়ারা—কিসে শ্রীগৌরনাম জগতের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত। এজন্য তিনি প্রাণপাত করিতেছেন। তিনি একাকী গ্রন্থমন্দিরের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। অন্যদেশ হইলে এতদিন কবে গ্রন্থমন্দিরের একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া যাইত। এই কলিকাতার বক্ষেই দেখিতে পাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামে কত ভক্তিধর্ম্মের উৎসাদক ও অশাস্ত্রীয় মতবাদ প্রচার করিয়া লোকে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। আর সরলমতি নরনারীগণ বৃথা বাগাড়ম্বর ও আত্মম্ভরিতার চটকে বিমুগ্ধ হইয়া অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন অথচ বাঙ্গালার কোন নিভৃত-পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের আজীবন নীরব-সাধনায় এই যে সংনাম প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে সারা বিশ্বময় আপনার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া তুলিতেছে ও দেশে বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও প্রেমধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছে, এদিকে কাহারও নজর নাই। ইহা অপেক্ষা পরম পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এইজন্যই গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুকুটমণি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় একদিন বড়ই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"* * রায় ভট্টকে যদি কোন ধনী লোক সাহায্য করিত, তবে জগতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিত।"

তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—বর্ত্তমান জগতের প্রকৃতিই এইরূপ,—

"সাচ্ কহে তো মারে লাঠ্যা—
ঝুটা জগৎ ভুলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকায়॥

এ জগতে সত্য কথা বলিলে, লাঠি খাইতে হয়—মিথ্যাই জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এখানে গোরস অর্থাৎ দুগ্ধ গলি গলি ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতে হয় আর সুরা একস্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়।

হে গৌরাঙ্গ সুন্দর! কবে তোমার শ্রীমুখের বাণী সফল হইবে? কবে দেখিব—'পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম' সর্ব্বত্রই তোমার মধুময় নাম ও প্রেমের বাণী ধ্বনিত হইতেছে? কবে সর্ব্বত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তোমার আদর্শের অনুপ্রেরণায় জগতের সকল নরনারী হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া একই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে? কবে তোমার এই আমেরিকাবিজয় সমগ্র বিশ্ব-বিজয়ে পরিণত হইবে? আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

এই প্রবন্ধে ভারতের বাহিরে দক্ষিণ আমেরিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের কথা কিঞ্চিন্মাত্র বিবৃত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে শ্রীমদ্ বাবা ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক উত্তর আমেরিকায় যে ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও প্রেম প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থমন্দিরে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্যামসুন্দর মোর।

প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা

শ্যামসুন্দর মোর—
নন্দন-পারিজাত নিন্দি সুরভি শোভা
জনমনোরঞ্জন নবীনকিশোর।
প্রীতিমাধুরী প্রতি অঙ্গে।
পুলকিত নবনব রতিরসরঙ্গে।
কাননে কাননে ফুলকুঞ্জে কোনে কোনে,
অবিরাম অভিরাম বিলাস-বিভোর
চলয়ে চপল গতিছন্দে।
বাঁধিব হিয়া মাঝে চির প্রেমবন্ধে।
চটুল চতুর চারু চোর।

বিস্মৃতি

(প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা)

ঘন ঘন মনে পড়ে কোন বনে লো।
কোন যুগে দেখা মোর সখা সনে লো।
কি কি পাখী গেয়েছিল গিয়েছি ভুলে,
মেতেছিল অলি কি কি সুরভি ফুলে।
কে কে মোর সাথে ছিল নাহি মনে লো
মধুমাসে দিন শেষে কুঞ্জতলে,
করুণ প্রণয় চারু কিরণ-ছলে,
ফুটি উঠেছিল কোন শুভখনে লো।
কি কহিয়া হেসেছিল সোহাগ ভরে,
কি মাধুরী ভেসেছিল প্রাণের পরে,
স্মৃতিটুকু নাহি মনে কোনো কোনে লো।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব

শ্রীবহুবল্লভ গোস্বামি ভাগবত-রত্ন।

শ্রুতি সর্ব্বস্বধন ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ শঙ্করের একাক্ষরী ব্রহ্ম—বেদমাতা গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর; যে বেদমাতা গায়ত্রী দেবীকে আশ্রয় করিয়া চতুর্যুগে আর্য্যগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া জগতের ইড্য ও বরেণ্য হইয়া চতুর্যুগে চতুর্বর্ণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, সেই বিষ্ণুময় অকার, শিবময় উকার, ব্রহ্মময় মকার, এই অক্ষরত্রয়ে সন্নিবেশিত পরম অক্ষর যে ওঁকার তাহা স্বরূপে রাধাগোবিন্দের ব্রজধামের নিত্য-লীলাজ্ঞাপক প্রেমদাতা বিশ্বম্ভরের সহচর আচণ্ডালের তৃষিত-হৃদয়ের সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ স্মৃতি পীযুষধারায় প্লাবিত করিয়া নিরস মরুভূমিকে রসময় করিয়া ব্রহ্মার দুর্ল্লভ সামগ্রী গোবিন্দে ভক্তিরূপ বীজ রোপন করিবার জন্য নিজে দীনাতীত দীনের ন্যায় জীবের দ্বারে দ্বারে কাঙ্গালের ন্যায় ঘুরিয়াছেন—এই আমার প্রেম দাতা নিতাই। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোক,—

> সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
> গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
> শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ সনিত্যা-
> নন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু॥

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

> ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসিত,

জগতবাসী জীব এই উদ্গীথটীকে উপাসনা কর। কারণ যাহা উৎপন্ন হয় তাহা কার্য্য, এবং যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কারণ। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন সুতরাং এই জগৎকে জলের সার বা রস বলা যায় এবং এই জগতের বৃক্ষলতা ঔষধী ইত্যাদিও জলের পরিণাম এবং এই শষ্যাদি মানবগণ ও জীবগণ আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে; সেইজন্য জীবকে ও মানবকে ঔষধীর রস বা সার বলা যাইতে পারে। জীবও মানবগণের মধ্যে যাহার বাক্‌শক্তি আছে তাহারাই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই জগতে বাক্যের সার বেদ। এই বেদ-মন্ত্র গদ্য ও পদ্যময়; এই উভয়ের মধ্যে পদ্যময়-বেদমন্ত্র ঋক্ সার। এই পদ্যময় ঋক্ দ্বিবিধ; গেয় এবং উচ্চার্য্য। গেয়ও উচ্চার্য্য এই উভয়ের মধ্যে সার "গেয় সামবেদ" এই সামের সার উদ্গীথ বা ওঁকার।

এই ওঁকারকে লক্ষ্য করিয়া জগতে কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবগণ ব্রহ্মকে পাইবার আশায় ছুটিতেছে। অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশ দেহে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভ্রান্ত হইয়া কেহ ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বভাবকে আবার কোলে লইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়া কোথায় শান্তি কই শান্তি করিতেছে। কেহ আবার ব্রহ্মকে জ্ঞানের দ্বারায় অনুসন্ধান করিয়া বহুকাল বহু পরিতাপ অনুতাপ অনুভব করিয়া নিজে ভাবান্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই আমি ব্রহ্ম এই অনুভবে "অহং" জ্ঞানে জর্জ্জরিত হইয়া কোথায় শান্তি কোথায় আনন্দ বলিয়া খোঁজ করিতেছে! আবার কেহ নিজে যোগদ্বারা আত্মভাবে ব্রহ্ম অনুভব করিয়া "অহম্" ভাবে ডুবিয়া আনন্দ ও শান্তির জন্য ছুটাছুটী করিতেছে—শান্তি কোথায়? পরম শান্তির আধার সাম্যভাবময় সৌন্দর্য্যের আধার অবধূত। তাই চরিতামৃতের আদিলীলার অষ্টম শ্লোক—

> মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠ লোকে
> পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে
> রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
> তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে চতুর্ভি বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনুরুদ্ধে-সন্নিবেশিত।

সঙ্কর্ষণ কারণতোয়শায়ী। এই সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারতত্ত্ব। যিনি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপ কারণ মহাসমুদ্রে শায়িত রহিয়াছেন এবং যাহা হইতে মায়া প্রকটিত রহিয়াছে এই মায়া শক্তির দ্বারায় উদ্ভূত জগত যাহার আশ্রয়ে রহিয়াছে এই

সঙ্কর্ষণ আমাদের পদ্মাবতীর প্রাণধন প্রেমপ্রচারক শান্তি-নিকেতন রাধাগোবিন্দের সেবাসুখ আস্বাদনের দ্বার-উন্মোচনকর্ত্তা। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতায়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিতাই-পদ পাসরিয়ে
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে
ভজ তাঁর চরণ দুখানি।
নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদাই কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে করো সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

অভিধেয়তত্ত্ব

(১)

[শ্রীনরহরিদাস ভাগবতভূষণ কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ]

অভিধেয় শব্দের অর্থ—করণীয়, অর্থাৎ যেটী জীবের কর্ত্তব্য। জীবের কর্ত্তব্য বহুবিধ, তন্মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য কোন্‌টী তাহাই আলোচ্য বিষয়।

অনাদি বহির্ম্মুখ সংসারী জীবগণ, অনন্ত কাল হইতে সংসারস-াগরের অনন্ত কর্ম্মস্রোতে নিপতিত হইয়া উত্তাল-তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে কতই না হাবুডুবু খাইতে খাইতে অনন্ত কালের জন্য ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, কখনও নিবৃত্তি নাই; তার মধ্যে আবার দুর্ব্বাসনারূপ ভীষণ জলজন্তুসকল করাল কবল বিস্তার করিয়া ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে; তরঙ্গাভিঘাতে প্রপীড়িত নিরবলম্বন জীব, দুস্তরসংসারসাগরবক্ষে সুখময় অবলম্বন বোধে কখনও ঐ সকল ভীষণ জলজন্তুর কোন একটীর গলা জড়াইয়া ধরিতে গিয়া, তাহার করাল কবলে নিপতিত হইতেছে এবং দুর্ব্বিসহ দংশন-যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। দারুণ জলজন্তু স্বীয় কবলে নিপতিত জীবকে প্রাণমাত্র রাখিয়া আছাড় মারিয়া সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করিতেছে। দংশন-বিষ-জ্বালায় মর্ম্মের জীব আবার ভাসিতে ভাসিতে চলিল, কিছুক্ষণ পরে সব ভুলিয়া গেল, পুনরায় ঐরূপ অপর একটী জলজন্তুর গ্রাসে নিপতিত হইল।

সংসারসাগরবক্ষে ভাসিতেছে; কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। করুণাময়ের অপার করুণায় একবার হয় ত নরতনু রূপ সুদৃঢ় তরণ-সাধন পাইতেছে, কিন্তু তথাপি নিজের স্বরূপ, নিজের দেশ, নিজের আবেশ বিস্মৃতিহেতু, পারে যাবার অনুকূল বায়ু ও সুনিপুণ কর্ণধার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহার আশ্রয় না লইয়া, ভীষণ-সংসারসাগরবক্ষেই অমন রমণীয় তরিখানি ডুবাইয়া দিতেছে; অবশেষে হাবুডুবু খাইতে খাইতে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর জলজন্তুনিচয়ের নিদারুণ দংশনযাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঐ সাগরবক্ষেই নিরন্তর প্রবাহ হইতে প্রবাহান্তরে নিপতিত হইয়া চিরকাল ঘুরিয়া মরিতেছে। হায়! যাহার স্বরূপ চিদানন্দকণ, আনন্দময় দেশ যাহার নিকেতন, অখণ্ডপরমানন্দময় পুরুষ যাহার জনক, তাহার এমন ভীষণতর দুরবস্থা! সে আজ নিজ জনকের চরণ-প্রান্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বকীয় দেশ, বেশ, আবেশ, সব ভুলিয়া, কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও বিষ্ঠার ক্রিমি—এইরূপে চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ রূপ সংসার-দুঃখ নিরন্তর ভোগ করিতেছে, কিছুতেই রৌরবযাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না।

যদ্দ্বারা জীবের এই অনাদি সংসারদুঃখ অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া, স্বকীয়স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-জনিত অখণ্ড আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, সেইটাই জীবের অবশ্য কর্তব্য, সেইটাই জীবের নিখিল কর্তব্যের সার এবং সেই কর্তব্যের পালন করিলে জীবের আর কোনও কর্তব্য বাকী থাকে না।

শাস্ত্রে বহুবিধ কর্তব্যের বিধান আছে। যথা—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। এই সকল কর্তব্য মধ্যে কোন্‌টী অবশ্যকর্তব্য অর্থাৎ কোন্‌টীর পালন করিলে জীবের নিখিল সংসারদুঃখ অত্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানের ফলে, কামনানুরূপ ইহলোকে ধন সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, অথবা পরলোকে স্বর্গাদি সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহারই নাম কর্ম্ম। যাগ যজ্ঞ ও দেবতান্তরের উপাসনাভেদে, এই সকল কর্ম্ম বহুপ্রকার। যাবতীয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান অতি-বিরাট্, কিন্তু ফল অতিতুচ্ছ, (ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণঃ ইত্যাদি শ্রীভা)।

যেমন সমিৎ-কুশ-ঘৃতাদি প্রচুর দ্রব্যসম্ভার যথাবিধানে বহু প্রযত্নে আহরণ করতঃ, বিশুদ্ধভাবে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবতান্তরের যাগ করা হইল; কিন্তু তাহাতে দেশ কাল বা কোন দ্রব্যগত কোন প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে কিম্বা বেদোক্ত মন্ত্রে উচ্চারণফলে স্বরের বা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাদির কোন বিপর্য্যয় ঘটিলে ঐ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে, অভীষ্ট ফল কিছুতেই লাভ হইবে না। পুনরায় বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করিলে, যদি নিশ্ছিদ্ররূপে সম্পন্ন হয়, তবে কামনানুরূপ পুত্র-বিত্তাদি ফল লাভ হইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহাও যে ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে বিরস, এ কথা কে না জানেন?

শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে সুরপতিকল্প এক এক জন ক্ষত্রিয় রাজা, কত আয়াস স্বীকার করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, বহু প্রযত্নে হয় ত সমাধানও করিতে পারিতেন; তাহার অপূর্ব্ব ফলে অতিশয় সুখময় স্বর্গরাজ্যও লাভ করিতেন বটে, কিন্তু এই স্বর্গসুখের ভোগভাগ্য কতদিন? পুণ্যরাশির অস্তিত্ব যতদিন। যেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে অমনি আবার এই মর্ত্তলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, আবার ঐ সংসারসাগরের কর্ম্মস্রোতে নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ঘটে না; এজন্য কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য-কর্তব্য নহে। অতএব কর্ম্মকে অভিধেয় বা অবশ্যকর্তব্য বলা যাইবে না।

এক্ষণে জ্ঞানমার্গের অভিধেয়ত্ব আছে কি না, তাহাই আলোচ্য। জ্ঞানিগণ মুক্তিলাভের অপেক্ষায়, নৈপুণ্য-সহকারে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, জড়-চৈতন্যের ভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এবং মায়াময় জড়দেহ হইতে পৃথক্—চৈতন্যগণ জীবস্বরূপকে ক্রমশঃ ব্রহ্মময় ভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া পড়েন; তখন দেহানুসন্ধান ত থাকেই না, এমন কি জীবব্রহ্মের ভেদ-ভ্রম পর্য্যন্তও নির্দ্ধূত হইয়া এক অদ্বৈত-সাগরের অতলগর্ভে নিমগ্ন হয়েন, ইহাই জ্ঞানিগণের জীবন্মুক্ত-দশা। ইহারই পরিপাকে জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিতে সংসারদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে সত্য; স্বরূপসাক্ষাৎকার বা আনন্দ লাভও হইয়া থাকে বটে, কিন্তু একটী গৌণ স্বরূপ, মুখ্য-স্বরূপ নহে; এ আনন্দও খণ্ডিত, অখণ্ড নহে। মুক্তিতে গৌণমুখ্যভেদে উভয়স্বরূপেরই সাক্ষাৎকার (অনুভব) হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গৌণ—জীবস্বরূপ। মুখ্য—পরতত্ত্ব-স্বরূপ। তন্মধ্যে জীবস্বরূপেরও আবার দুইভেদ গৌণ মুখ্য চৈতন্যরূপ—গৌণস্বরূপ; নিত্যকৃষ্ণদাস—মুখ্যস্বরূপ। ঐরূপ পরতত্ত্বেরও আবার গৌণ মুখ্য দুই ভেদ। নির্ব্বিশেষ ভগবৎস্বরূপ মুখ্য।

যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের সাপেক্ষ বা আশ্রিত (—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—গীতা)। এজন্য ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিতে গৌণ স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়—বলা হইল। এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপে হ্লাদিনী আদি স্বরূপশক্তিনিচয়ের অভিব্যক্তি নাই বলিয়া, আনন্দেরও প্রাচুর্য্য বা শক্তিবর্গের বৈবিধ্যজনিত উল্লাসাধিক্য নাই; এজন্যই জ্ঞানিগণের লভ্য ব্রহ্মানন্দকে খণ্ডিত আনন্দ বলা হইল। সুতরাং জ্ঞানসাধনে মুখ্যস্বরূপ এবং অখণ্ড পরমানন্দ লাভ হয় না বলিয়া ইহাও অবশ্যকর্তব্য-

রূপে গণনীয় নহে, অতএব জ্ঞানসাধনকেও অভিধেয়-তত্ত্ব বলা যাইবে না।

যোগসাধন দ্বারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় পরমাত্মস্বরূপ যদিও সবিশেষ, এবং ইহাতে যদিও শক্তি-বর্গের বিকাশ আছে বটে, তথাপি চিচ্ছক্তি অপেক্ষা মায়াশক্তি লইয়াই পরমাত্মস্বরূপের যত কিছু (জগৎ সৃষ্ট্যাদি) ক্রীড়াকৌতুক; অতএব চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বিলাসবৈচিত্র্য এ স্বরূপেও নাই; এজন্য পরম স্ব-সাক্ষাৎকারেও অগণ্ড পরমানন্দ লাভ হয় না। সুতরাং যোগসাধনও অবশ্য কর্ত্তব্য বা শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য নহে; এজন্য যোগও অভিধেয় নহে।

পরিশেষে ভক্তিসাধনের কথা আলোচনা করা যাক্। ভক্তিসাধনপরিপাকে মুখ্য বা ব্রহ্ম-পরমাত্মস্বরূপের অধি-ষ্ঠানভূত অন্যনিরপেক্ষ অতএব পরমমুখ্য ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে এবং অনুগতভাবে চৈতন্য-কণ জীবস্বরূপেরও সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যকণ জীবস্বরূপই, প্রীতিভক্তিরসে গঠিত সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তিমান তদ্দাসরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই উভয়স্বরূপের অনুভূতিটী ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির মত নির্ব্বিশেষ নহে। এ অনু-ভূতি অপূর্ব্ববিলাসবৈচিত্র্যপূর্ণ বা প্রেমময়ীলীলারসবিভাবিত। ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই "প্রীতিরসে গড়াতনু"; ভগবান্ প্রীতিরসের অসমোর্দ্ধ আস্বাদক আর ভক্ত প্রীতিরসের অসমোর্দ্ধ পরিবেশক। শ্রীভগবানের প্রীতিরস-আস্বাদন-চাতুর্য্যের যেমন অনন্তবৈচিত্র্য, ভক্তও তেমন শ্রীভগবানের আকাঙ্ক্ষাতিরেকীভাবে অনন্তবৈচিত্র্যময় অনন্ত পারি-পাট্যে শ্রীভগবান্‌কে প্রীতিরস নিষেবন করাইয়া বিমুগ্ধ করাইতে সমর্থ। সুতরাং যাঁর মায়াশক্তিতে অনন্ত জগৎ বিমুগ্ধ, সেই শ্রীভগবান্‌ও যাহার প্রীতিরস আস্বাদনে নিরতিশয় আনন্দিত ও বিমোহিত হয়েন, সেই ভক্ত যে অপরিসীম আনন্দী হইয়া থাকেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ আছে কি? সুতরাং "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যের এইখানেই চরম পর্য্যবসান নহে কি? বলা বাহুল্য জ্ঞানিগণ যে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত সাধনে রত হয়েন এবং সিদ্ধাবস্থায় বিমুক্তি ফল লাভ করেন, ভক্তগণ সেই মুক্তিবাসনারূপ কৈতবকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া ভক্তি-সাধনে রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, আনুসঙ্গিকেও সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে থাকেন। সিদ্ধাবস্থায় যে ভক্তগণের সংসারবন্ধনের অত্যন্ত বিমুক্তি ঘটে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি আশ্চর্য্য, জ্ঞানিগণ যে মুক্তিকে সাধ্য মনে করেন, ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে না চাহিয়াও, অননুসন্ধানে এবং অনায়াসে আনুসঙ্গিকরূপে সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই ভক্তিসাধনই নিখিল কর্ত্তব্য মধ্যে অন্যনিরপেক্ষ, এবং অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব ভক্তিসাধনই অভিধেয়তত্ত্বশিরোমণি—

> "কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
> অতএব মুনিগণ করিয়াছেন নিশ্চয়॥
> কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় হয় ত প্রধান।
> ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান।
> এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল॥
> কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সংবাদ

আনন্দ সংবাদ।

প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয় নিয়মসেবায় ঢাকার পাঠ শেষ করিয়া ২৬শে কার্ত্তিক শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়া ২৯শে কার্ত্তিক তাঁহার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগর্ভধারিণী ও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষাদায়িনী শ্রীগুরুমূর্ত্তি নিজ জননীর বাৎসরিক কৃত্যাদি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-বিধি অনুসারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় অষ্টাহকালব্যাপি শ্রীশ্রীগুরুনির্য্যাণ মহোৎসবের প্রথম বার্ষিক উৎসবের অধিবাস পূর্ব্বক শ্রীশ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই উৎসবের শোভা ও বৈশিষ্ট্য নিজ চক্ষে দর্শন না করিলে ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তথাপি যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাহাদের অবগতির নিমিত্ত শ্রীশ্রীউৎসবের সামান্যভাবে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। ২৯শে কার্ত্তিক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীউৎসবের শুভ অধিবাস করা হয়, তৎপর ৩০শে কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ভোর ৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমঙ্গল-

আরতি ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছেন; ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত: প্রভু সন্তান, আচার্য্য সন্তান, উদাসীন বৈষ্ণব গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে যাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি পারায়ণ করেন, তাহাদের সংখ্যা ৬০ জন। ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত অবধূত দাস শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল-গান করিয়াছিলেন। তৎপর ১২টা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন অনুষ্ঠান, ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরামলীলা কীর্ত্তন, ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের সুমধুর শ্রীভ্রমরগীত ব্যাখ্যা, ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বঙ্গের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশ দাস ও শ্রীযুক্ত যামিনী মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীলীলাকীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। সে সময় ঐ স্থানের শোভা দেখিলে মনে হইত যেন সকলেই সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিজ নিজ সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসে মগ্ন হইয়া আছেন। তৎপরে ১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন। ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে ভোরে শ্রীশ্রীকুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তনান্তে বিপুল নগর-কীর্ত্তন নানাবিধ ধ্বজ পতাকা ছাতা, খুন্তি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপের কোন কোন অংশ পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীশ্রীনগরকীর্ত্তন বহির্গত হইবার পর হইতেই শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীচৌষট্টি মোহান্তের ভোগ-রাগের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, কীর্ত্তন প্রত্যাগমন করিবার পর ভোগরাগ আরম্ভ হয়; সেই সময় সমাগত ভক্ত-বৃন্দের সুমধুর ভোর-আরতি কীর্ত্তনে সকলেরই মন প্রাণ হরণ করিতেছিল, তৎপর ভোগদর্শন ব্যাপার, চারিদিক হইতেই কেবল জয়ধ্বনি ও উলুধ্বনিতে শ্রীমন্দির একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল। সকল দিক হইতে নানাবিধ ভক্তগণ ভোগ দর্শনের নিমিত্ত পাগলপারা হইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন এবং ভোগ দর্শনান্তে প্রণাম বন্দনা করিয়া প্রাণে বিমলশান্তি লইয়া ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী হইয়াছিল। ইহার পর প্রসাদ পাইবার সময়, শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রভুসন্তান, আচার্য্যসন্তান, উদাসীন বৈষ্ণব, গৃহস্থ ও সমাগত দরিদ্র নারায়ণদিগকে প্রসাদ পাওয়াইবার বন্দো-বস্ত করা হয়। ৮ই তারিখে শ্রীলপ্রভুপাদের পরমারাধ্যা মাতাগোস্বামিনীর তৈলচিত্রখানিকে সিংহাসনে করিয়া নানাবিধ পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া কীর্ত্তনসহ নগর ভ্রমন করাইয়া শ্রীশ্রীপতিতপাবনী সুরধুনীতে অবভৃথ স্নান-উৎসব সম্পন্ন করা হয়। এই উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা, ঢাকা ও বঙ্গের অন্যান্য জিলা হইতে বহু ভক্ত মহোদয়গণ শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন পূর্ব্বক উৎ-সবের বিবিধ আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই ভাবে উৎসবটী সমাধান করিয়া শ্রীগয়া-ধামে শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান জন্য গমন করেন। তথায় দুই দিন থাকিয়া গয়াকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন ধামে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধামে অবস্থান কালীন এবার যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র অনুভববেদ্য—ভাষায় প্রকাশ্য নহে। যদিও তিনি অন্যান্য বার যখনই শ্রীধামে গমন করেন, তখনই বিমল আনন্দ প্রদান করেন, তথাপি এবারের আন-ন্দের যে কি বৈশিষ্ট্য তাহা ভাষায় প্রকাশ্য নহে ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীলপ্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা তড়িৎ-বার্ত্তার মত চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধামের বহু বহু বনবাসী মহাত্মাগণ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাহার শ্রীমুখে সুমধুর ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবন করিবার নিমিত্ত আসিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীলপ্রভু-পাদ এবার শ্রীধামে ১৪ দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীগোপীগীতা ব্যাখ্যা করেন। এবারের ব্যাখ্যায় যে কি আনন্দ প্রদান করিয়া-ছেন, তাহা সভাটী দর্শন করিলেই বেশ অনুভব করা যাইত; দেখিলেই মনে হইত—সভায় যেন কি একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দেখিয়া শ্রোতাদের মনে হইত যে এক জনও আনন্দ ভোগ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, সকলেই যেন আনন্দ-রসে মগ্ন হইয়া আছেন। প্রভুপাদ শ্রীধামে বেশীদিন থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই—কারণ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর মহা-শয়ের স্ত্রীর বিরহ মহোৎসবে সমস্ত পৌষমাস শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রভুপাদ প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং

শ্রীলপ্রভুপাদ ঐ আনন্দস্রোত ভঙ্গ করিয়া কলিকাতা আসিতে ইচ্ছা করেন। সভাতে শ্রীরাধারমণের গোস্বামীপাদগণ ও অন্যান্য মহাত্মা বৈষ্ণবগণ নিত্য আগমন করিতেন। তাহাদের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমৃত রাম শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীধামে অবস্থান করিবার সময়েই পাটনার হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ বাঙ্গালার প্রাণ পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোমলপ্রাণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রঞ্জন দাস (P. R. Das) প্রভুপাদকে কলিকাতায় আসিবার পথে পাটনায় একবার চরণধূলি প্রদান করিবার জন্য তারযোগে প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ তাহার কাতর-প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পাটনায় অবতরণ করেন; তথায় তিনি চারি দিন অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবতধর্ম্ম পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন; শ্রীলপ্রভুপাদের ভজনানুরাগে তাঁহার প্রতি শ্রীযুক্ত দাস সাহেবের প্রথম হইতেই আন্তরিক-ভক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছিল, তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীলপ্রভুপাদের ভজন সাধনের সংবাদাদি জানিয়া অনেকদিন যাবত তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় সুযোগ পাইয়া তিনি (দাস সাহেব) প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনামের মালা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস সাহেব একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী এবং জীবনযাপনও ঐ ভাবধারার ভিতর দিয়া এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—এই সংবাদ গোঁড়ায় বৈষ্ণব মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। বাঙ্গলার চিরপ্রসিদ্ধ এই দাস পরিবারের ত্যাগ, কোমলতা, অমায়িকতা ও নিরভিমানিতার সংবাদ বাঙ্গলার নিকট নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, সত্য তথাপি দাস সাহেবের দৈন্য ত্যাগ ও অমায়িকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রভুপাদের ট্রেনখানী পাটনায় পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিবার জন্য শ্রীযুক্ত দাস সাহেব খালি পায়ে সাধারণ ভদ্র-বাঙ্গালীর পোষাক পরিধান করিয়া ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজবাহাদুর আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু (ব্যারিষ্টার) প্রমুখ সহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেনখানী অল্প সময়ের মধ্যেই ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল, শ্রীযুক্ত দাস সাহেব প্রভুপাদ গাড়ি হইতে অবতরণ করিবার পর ভূমিতে পতিত হইয়া পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করেন। তৎপরে প্রভুপাদকে তাহার পাটনা-স্থিত এক শিষ্যের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীলপ্রভুপাদ যতদিন তথায় অবস্থান করিয়াছেন, ততদিন নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীযুক্ত দাস সাহেব প্রভুপাদের শ্রীচরণধূলি ও অধরামৃত ভক্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস সাহেব বর্ত্তমান দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় শ্রীভগবদনুশীলনে অতিবাহিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম করেন; তৎপরে কিছু জলযোগ করিয়া আফিসের কাজকর্ম্মাদি সমাপণ করিয়া ১০টায় সময় হাইকোর্টে গমন করেন। (তিনি বর্ত্তমানে তথায় ব্যারিষ্টারি করিতেছেন) তথা হইতে ৪টার সময় গৃহে ফিরিয়া নিজে সিদ্ধ পক একবেলা হবিষ্য করেন। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীচরিতামৃত আলোচনা করেন, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়া হাইকোর্টের অন্যতম এড্‌ভোকেট (Advocate) শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত ১০টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন ব্রজবাসীকে খোল বাজাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি মাসিক ২৫৲ টাকা শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভক্তি-বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আগামী চৈত্র মাসে শ্রীলপ্রভুপাদের সুমধুর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য এক মাসের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে কাতর প্রার্থনা করিতেছি—তিনি তাহার আর্ত্তিঅনুরূপ তাঁহাকে আকুলতাদানে অনুগৃহীত করুন।

শ্রীলপ্রভুপাদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া বর্ত্তমানে ৭এ বিডন রো স্থিত ভক্তপ্রবর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের স্ত্রীর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাস ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিমল আনন্দ প্রদান করিতেছেন। এই উৎসবে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশ দাস মহাশয়ও কীর্ত্তন করিতে আহূত হইয়াছেন।

বিনীত ম্যানেজার—
শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | পৌষ—১৩৩৯ | ৫ম সংখ্যা

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[১২]

(শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী)

শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার পূর্ণ-স্বরূপে বা ভক্তরূপে সর্ব্বদাই পাইতে চাহেন। ভগবানের দিক্ হইতে ঐ "চাওয়া" যেমন নিত্যই রহিয়াছে, সেইরূপ জীবের দিক্ হইতে ভগবান্‌কে "চাওয়া" জাগিয়া উঠিলেই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা যে ভগবানকে পাই না, তাহার কারণ তিনি সুদুর্ল্লভ বলিয়া নহে,—আমরা তাঁহাকে চাহিনা বলিয়া। যাহা চাহিলেই পাওয়া যায়, তাহা হইতে সুলভ বস্তু আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবান্‌কে যখন চাহিলেই পাওয়া যায়, তখন তাঁহাকে "দুর্ল্লভ" না বলিয়া "সুলভ" বলাই সঙ্গত; কিন্তু এমন সুলভ বস্তুও যে জীব-সাধারণের নিকট দুর্ল্লভ হইয়াই রহিয়াছেন,—সে দুর্দ্দৈবের একমাত্র কারণ, জীবের দিক্ হইতে তাঁহাকে "চাওয়া" নাই বলিয়া। যেখানে পরস্পরের পরস্পরকে পাওয়া প্রয়োজন,—যেখানে উভয় দিকেই উভয়কে "চাওয়া" আছে,—সেখানে উভয়ের মিলন দুর্ল্লভ না হইয়া সুলভ বা সহজ সাধ্যই হওয়া উচিত। ভগবানের অন্তরে, ভক্তরূপে জীবমাত্রকে পাইবার প্রয়োজনবোধ যেমন নিত্যই জাগ্রত, সেইরূপ জীবহৃদয়ে তাঁহাকে পাইবার লালসা তেমনি করিয়া জাগিয়া উঠিলেই, তখন মহামিলনের আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হয় না; অতএব শ্রীভগবৎ-সম্মিলন জীবের পক্ষে বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত সুলভ হইলেও, তাহা যে সুদুর্ল্লভ হইয়াই রহিয়াছে—"তাঁহাকে না চাওয়াই" "তাঁহাকে না পাওয়ার" একমাত্র কারণ। আমরা সমস্তই চাহিয়া থাকি; কিন্তু যাহা চাহিলে সকল চাওয়ার অবসান হয়,—অবিদ্যা-বিড়ম্বিত জীব আমরা কেবল সেই চাওয়াই চাহিতে পারি না;—আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব!

এখন প্রকৃত পক্ষে "চাওয়া" কাহাকে বলে, আমা-দিগকে সহজে তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে। বিষয়ী জীব যেভাবে বিষয় চাহে, আতুর যেমন আরোগ্য চাহে, পিপাসাতুর যেমন জল চাহে, ক্ষুধাতুর যেমন অন্ন চাহে, অর্থাতুর যেমন অর্থ চাহে,—"চাওয়া" ইহারই নাম। এই ভাবে ভগবান্‌কে চাহিবার নামই প্রেম-ভক্তি। তাই ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

এই প্রকার "চাওয়া" ভগবানের জন্য হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। "চাওয়া" আমাদের নিত্যই আছে। "চাওয়া" জীবের নিত্যসিদ্ধা-বৃত্তি। কিছু না চাহিয়া জীব ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না।

অবিদ্যাচ্ছন্ন—স্বরূপভ্রান্ত জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ সেই "চাওয়াটি" যতক্ষণ প্রাকৃত বিষয়ে প্রযুক্ত থাকে, সেই সগুণা বৃত্তিই "কাম" নামে অভিহিত হয়; আর যখন কোনও অতিভাগ্য বলে সেই "চাওয়া" শ্রীভগবান্‌কেই পাইবার জন্য কোনও জীবের অন্তরে জাগিয়া উঠে, তখন সেই নির্গুণা বৃত্তিই "প্রেম" নামে কীর্ত্তিত হয়েন। "কাম" বা বিষয় চাওয়া,—সংসার-চক্রে চির আবর্ত্তিত হইবার কারণ; আর "প্রেম" বা ভগবান চাওয়া, পূর্ণানন্দের অতল তলে চিরনিমগ্ন থাকিবার একমাত্র উপায়;—

"অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"
—(চরিতামৃত)

"চাওয়া" পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে "পাওয়া" যায় না। ধন, ধান্যাদি বিষয় সকল আমরা যেভাবে প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করি, ইহারই নাম পরিপূর্ণ বা অকপট ভাবে "চাওয়া"; সেইরূপ পরিপূর্ণ চাওয়া ভগবানের জন্য হইলেই, সেই পূর্ণ প্রেমের উদয় মাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। শ্রীভগবান্ যাহার নিকট অপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন,—অবশ্যই জানিতে হইবে তাহার চাওয়ার অসম্পূর্ণতা আছেই। চাওয়ার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ব্যতীত শ্রীভগবান্‌কে না পাইবার অপর কারণ নাই। যিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন নাই তিনিই ভগবান্‌কে প্রকৃত চাহেন নাই,—ইহাই সুনিশ্চয়।

হয়ত অনেকেই স্বীকার করিতে না পারেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানকে চাহেন না; অথবা এমন অনেক সাধক-ভক্ত বা ভাগ্যবান রহিয়াছেন, যাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্য ও তৎসহ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি ও আকুলতা দর্শন করিয়া, অন্ততঃ তাঁহারাও যে ভগবান্‌কে চাহেন নাই, একথা যে সহজে কেহই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তাহা আমরা জানি। এরূপ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরিপূর্ণ বা অকপট রূপে "বিষয়-চাওয়া জীব" যেমন ভগবান্‌কে একেবারেই চাহে না, সেইরূপ ষোল আনা বিষয়-চাওয়া-জীবের মত, সাধক-ভক্তগণ যে একেবারেই ভগবান্‌কে চাহেন না, তাহা নহে; তাঁহারা ভগবান্‌কে চাহিলেও, সাধক-দশা উত্তীর্ণ না হওয়া অবধি, তাঁহাদের সেই "চাওয়ার" মধ্যে কিছু কিছু "না-চাওয়া" লুকাইয়া থাকে। যেমন হাজার বাতির আলোকের মধ্যেও যে অন্ধকার মিশান আছে, এ কথা তখনই বুঝিতে পারা যায়,—যখন সেই আসরে দুই হাজার বাতির আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়; সেইরূপ "ভগবান্ না-পাওয়া" সাধক-ভক্তগণের "ভক্তি" বা "ভগবান্-চাওয়ার" মধ্যে কতটা "না-চাওয়া" মিশাইয়া আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা তখনই উপলব্ধি করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতা আর এক স্তর উর্দ্ধসীমা প্রাপ্ত হয়। প্রেমোদয়ের ক্রম ব স্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ)

অর্থাৎ—প্রথমে শ্রদ্ধা তদনন্তর সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজন ক্রিয়া, পরে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে; সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই ক্রম।

প্রেমোদয়ের এই যে ক্রম বা স্তরের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এক কথায় পরিপূর্ণ রূপে ভগবান্ চাহিবার ইহাই ক্রমিক অবস্থা "শ্রদ্ধা" হইতে "ভগবান চাওয়ার" আরম্ভ এবং সেই "চাওয়া" ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইয়া "প্রেমের উদয়ে তাহার পূর্ণতার অবসান। (প্রেমেরই আবার স্নেহাদি ক্রমে যে পূর্ণতম অবস্থা বিশেষের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।) প্রেমের অর্থ—পরিপূর্ণ রূপে বা একান্তভাবে ভগবান্‌কে চাওয়া। তাই বলিতেছি, প্রেমোদয়ের পূর্ণস্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন ও ভাব ভক্তির ক্রমানুসারে সাধক-ভক্ত-হৃদয়েও "ভগবান-চাওয়ার" মধ্যে কিছু কিছু "না চাওয়া" মিশ্রিত থাকে, সুতরাং শ্রীভগবান্‌ও সাধক-ভক্তগণের "চাওয়ার" অনুরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া,

"না-চাওয়ার" অনুপাতে দূরবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যিনি ভগবান্‌কে যত বেশী চাহিয়াছেন—যিনি "পরিপূর্ণ চাওয়া-বা "প্রেমের" যত সন্নিকটতর হইয়াছেন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে ততই "আসন্ন" বলিয়া জানিতে হইবে। সাধকগণের এই "না-চাওয়া" মিশ্রিত "ভগবান-চাওয়া" যে মুহূর্ত্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ যে "চাওয়ার" মধ্যে আর লেশমাত্রও "না-চাওয়া" লুকান থাকিবে না,—"ততঃ প্রেমাভূাদঞ্চতি"—তখনই সেই "চাওয়া" প্রেম-সূর্য্য রূপে উদিত হয়েন। দিবাকরের উদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ হয়, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে শ্রীভগবান্‌ প্রকাশিত হয়েন।

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম, ভগবান্‌ সুলভই বটেন; কিন্তু দুর্ল্লভ হইয়াছেন তিনি—শুধু আমরাই তাঁহাকে চাহিনা বলিয়া।

বিম্বের সহিত দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের, বিষয়ের একতা থাকিলেও যেমন সংস্থিতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখী বিম্বের প্রতিবিম্ব যেমন পশ্চিমাভিমুখী ইত্যাদি প্রকারে পরিলক্ষিত হয়,—প্রতিবিম্ব-স্থানীয় বহির্মুখ জাগতিক ব্যাপারের সহিত জীবের অন্তর্মুখ ভাব বা বিম্বস্থানীয় ভগবদ্‌ভক্তির সম্বন্ধ।

সংসারী জীবমাত্রেই প্রতিনিয়ত বিষয়াভিলাষ করে, বিষয় চাহে, কিন্তু বিষয় সকল প্রায়ই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। কদাচিৎ কেহ পায়; অধিকাংশ স্থলেই অকপটে বা পূর্ণরূপে বিষয় চাহিয়াও মায়িক ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয় কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত কুক্কুর সকল বারম্বার তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়া, যেমন তৎ-প্রাপ্তির আশায় তদভিমুখে বারম্বার ধাবিত হয়, মোহান্ধ জীবকে মায়িক বিষয়-সুখ সেই প্রকার বারম্বার উপেক্ষা করিলেও, জীব তৎ-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। অতএব জীব-মাত্রের "বিষয়-চাওয়া" স্বাভাবিক ও সুলভ; কিন্তু অকপটে চাহিলেও, সেই বিনশ্বর "বিষয়-সুখ" পাওয়া অতীব সুদুর্ল্লভ; আর শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া অতি সুলভ,—যেহেতু চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাকে "চাওয়া" অতি সুদুর্ল্লভ! "বিষয়-চাওয়া" সুলভ বা সহজসাধ্য বলিয়া ক্রিমি-কীট পর্য্যন্তও বিষয় চাহিতে পারে ও চাহিয়া থাকে। কীটেতেও যে বৃত্তি সুলভ, তাহার মূল্যই বা কি আছে? তাই ইহা অন্যতম "কাম" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু "ভগবান্‌-চাওয়া" সুদুর্ল্লভ; এমন কি দেবতাতেও সে বৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই জন্য এই সুদুর্ল্লভ "ভগবান্‌-চাওয়া" নির্ম্মল ভাবের স্বরূপ "প্রেম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই "প্রেম" বা "পরিপূর্ণ রূপ ভগবান-চাওয়া" ত্রিভুবনে একান্তই দুর্ল্লভ। মহৎকৃপাদি-জনিত কোন ভাগ্যে এই সুদুর্ল্লভ "চাওয়া" জীবের অন্তরে উদিত হইলেই, ভগবান্‌ পাওয়া অত্যন্ত সুলভ বা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবান্‌ অতিশয় সুলভ বস্তু। যাহা চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, তাহাকে "সুলভ" না বলিয়া কি বলিব? কিন্তু তাঁহাকে চাওয়াই অতীব দুর্ল্লভ। যে প্রকার আমরা বিষয়-সুখ প্রার্থনা করি,—প্রার্থনা করিয়াও প্রায়ই তৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি, ঠিক সেই প্রকার যদি শ্রীভগবান্‌কে চাহিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাতে বঞ্চিত হইতাম না। অকপটে তাঁহাকে চাহিয়া কেহ কখন বঞ্চিত হয় নাই। হা দুর্দ্দৈব! আমরা এমন "সুলভ" মহা-সম্পদ কেবল না চাহিয়া "দুর্ল্লভ" করিয়া রাখিয়াছি,—ইহা হইতে অবিদ্যার বিড়ম্বনা আমাদের প্রতি আর কি হইতে পারে।

শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার অন্য কোনও সাধনা নাই; তাঁহাকে পাইবার একমাত্র ও অব্যর্থ উপায়—তাঁহাকে চাওয়া; কিন্তু সেই চাওয়াই সুদুর্ল্লভ বলিয়া যাহা কিছু সাধন-ভজনের কথা—সে কেবল চাহিতে পারিবার সাধন; নচেৎ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একমাত্র "চাওয়া" ভিন্ন অন্য কোনও সাধনা নাই। যাহাতে জীবের হৃদয়ে সেই "চাওয়া" জাগে,—বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রাণ যেমন কাঁদে, যাহাতে শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ তেমনি করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—তাহার জন্যই সাধন-ভজন। অবিবেকী—বিষয়াসক্ত জীবের বিষয়-সুখ প্রাপ্তির জন্য যে অনুরাগ, ভক্ত তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—হে স্বামিন্‌! তোমাতে যেন আমার অন্তরের অনুরাগ সেই ভাবে ধাবিত হয়;—

"যা প্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরত স্বামিন্ হৃদয়াম্মাপসর্পতু॥"

শ্রীভগবৎসেবাভিলাসে তাঁহাকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠার নামই "প্রেম";—ভগবান্‌কে পাইবার জন্য এমনি করিয়া চাহিবার নামই "প্রেম"। জীবহৃদয়ে প্রেমের উদয় হইবামাত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদাব্জ-মধুপ জীব-হিতৈকব্রত, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, শ্রীভগবান্‌কে "প্রয়োজন" রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া প্রেমকেই "প্রয়োজন-তত্ত্ব" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই প্রেম-ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত, জীব, পূর্ণ সফলতাকে বরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

হে শ্রীবাস অঙ্গন;
দিনে দিনে মাস যায় মাসে মাসে বৎসর
তুমি চির জাগ্রত মরতের নন্দন।
হিয়া মাঝে শিহরণ নাচে চৈতন্য
নিত্যানন্দোদয় পতিতের জন্য
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ কলির এ মহাবেদ
কাটে আজো ভবভয়-বন্ধন।
শ্রীবাসের অঙ্গন।

হে শ্রীবাস অঙ্গন,
"কানের ভিতর দিয়া মরমে আজিও পশে"
গোরামুখ-নিঃসৃত সুধামাখা কীর্ত্তন।
"হরিনাম বিনা গতি নাহি আর অন্য"
সঙ্কীর্ত্তন পিতা কহে জীব জন্য
সুমধুর গোরালীলা আজও জলে ভাসে শিলা
ভগবান্ আজও করে নর্ত্তন।
শ্রীবাসের অঙ্গন।

হে শ্রীবাস অঙ্গন,
দেখিবার আঁখি নাই—শুনিবার কান নাই—
ভাবিবার প্রাণ নাই তাই করি ক্রন্দন।
বুকে তব পড়িয়াছে প্রভুপদ-চিহ্ন,
কে দেখাবে মহালীলা আজ তুমি ভিন্ন।
ও ধূলায় পাতি কান শোনাও সে মহাগান
মাখিয়াছ শ্রীঅঙ্গ-চন্দন
হে শ্রীবাস অঙ্গন।

হে শ্রীবাস অঙ্গন,
শতাব্দী কত ঢ'লে পড়ে মহাকালকোলে
পৃথিবীর আছে নাহি তব পরিবর্ত্তন।
তুমি আছ বাঁচি আজও ভকতের চিত্তে
তুমি আছ বাঁচি চৈতন্যের নৃত্যে
মূকেরে যে দেয় বাণী তাঁরি লীলাভূমি জানি
তাঁরি নামে পঙ্গু এ করে গিরি-লঙ্ঘন।
হে শ্রীবাস-অঙ্গন।

বন্ধু সন্দর্শনে।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ত-
বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী জ্যোতির্ভূষণ)

সূর্য্যদেব অস্তোম্মুখ ; বিদায়ের করুণ বাণীর মত তাঁহার মৃদুস্নিগ্ধ কিরণমালা গাছের অগ্রশাখায় ছাদের উপরে পতিত হইতেছিল। অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতেছিল। ক্ষুদ্র জ্ঞান যেমন বিরাট অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, তদ্রূপ বিপুল অন্ধকার যেন দিবাবসানের সামান্য আলোককে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত। মায়ামুগ্ধ লোকের বিষয়ের মোহ যেমন সজ্জনসমাগমে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বাকাশে স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল চন্দ্রমার উদয়ও অন্ধকারের হাত হইতে ধরিত্রীকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতেছিল। কুললক্ষ্মীরা সান্ধ্য-দীপ হস্তে তুলসীতলায় গমনোদ্যতা হইতেছিল। ঠিক এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র সহরের মধ্য দিয়া শস্যশ্যামল প্রান্তরে ভ্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলাম।

কতদূর যাওয়ার পর দেখিলাম—আমার কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধু একটী গৃহে চেয়ারের উপর উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অপরিচিত শিক্ষিত ভদ্রলোকও ছিলেন। আমার বন্ধুরা আমাকে দেখিয়াই সাদরে আহ্বান করিলেন। এবং আমার জন্য একটী আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি আহূত হইয়া উক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলাম। তাহার পর, কুশলাদি প্রাথমিক প্রশ্ন করিয়া অপরিচিত ভদ্রলোকদের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। সেদিন আমার আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

বলা বাহুল্য,—আমার বন্ধুরা কিম্বা অন্য যে কয়জন ভদ্রলোক ছিলেন, কেহই বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন না। তবে যে, তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্মজিজ্ঞাসু তাহা খুবই মনে হইল। তাই তাঁহারা ভদ্রলোকোচিত বিনয় ব্যবহার এবং সুমিষ্ট বাক্যালাপ করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের ২।১টী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

জনৈক বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—শুন্‌তে পাই, আপনাদের মতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ! ইহার মর্ম্ম কি?

আমি বলিলাম—হাঁ, ঈশ্বরের সহিত জীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধই বটে। শুধু ঈশ্বরের সহিত জীবেরই যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ, বস্তুতঃ তাহা নহে। শক্তিমানের সহিত স্বীয় শক্তি মাত্রেরই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমরা অনেক সময় ব'লে থাকি যে, 'আগুণ আমার হাত পোড়াইল।' বাস্তবিক আগুনই হাত পোড়ায়, তা' হ'লেও আগুন হাত পোড়া'তে পারেও না, যদি তাহার মধ্যে হাত পোড়াবার একটা শক্তি না থাকিত। তন্ত্র মন্ত্র ঔষধজ্ঞ অনেক গুণি ব্যক্তি মণি মন্ত্র ঔষধির দ্বারা অগ্নির সেই দাহিকা শক্তিকে স্তম্ভিত করেন। তখন আগুণও প্রজ্জ্বলিত, আগুনের উপর মনুষ্যও বিদ্যমান কিন্তু আগুন মানুষকে দগ্ধ করতে পারে না; যেহেতু আগুন যে শক্তিবলে পোড়াইতে সমর্থ, সে শক্তি এখন স্তম্ভিত অর্থাৎ কার্য্যকরী নহে। ইহাতে বুঝা যায় আগুন হ'তে ভিন্ন আগুনের মধ্যেই কোনও একটা পদার্থ আছে। ঐ পদার্থটাই অগ্নির দাহিকাশক্তি। এই আলোচনায় শক্তিমান্ হ'তে শক্তি যে একটু ভিন্ন রকমের তাহাই যেন বুঝা যায়।

আবার পূর্ব্বোক্ত দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হ'তে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথক্ করতে কা'রও সামর্থ্য নাই, বরঞ্চ অগ্নির মধ্যে উক্ত শক্তি যে আছে, তাহা কখনও কেহও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। শুধু হাত পোড়া'ন একটা কার্য্য দে'খে তা' অনুমান মাত্র করা যায়। আগুনের মধ্যে যে দাহিকা শক্তি আছে, তাহা এত ওতপ্রোত যে জল জলের মধ্যে মিশাইলে যেমন দুই জলেই এক হইয়া যায়, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও উভয় জলের পৃথক্ সত্তা লক্ষ্য

করা যায় না অগ্নির মধ্যে যে অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, তাহাও তদ্রূপ অভিন্ন রকমের; শুধু অনুমান গ্রাহ্য। এই আলোচনা দ্বারা আগুন হইতে দাহিকাশক্তি যে অত্যন্ত অভিন্ন তাই যেন বুঝা যায়।

এই সকল কথায় আমরা যথার্থতঃ ইহাই বুঝি যে অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তি ভিন্ন কিম্বা অভিন্ন রূপে বস্তুতঃ দেখিতে কিম্বা চিন্তা করতে আমরা পারি না। এই সমস্ত কারণে শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধকে অচিন্ত্যভেদাভেদ বলা হয়। প্রত্যেক শক্তিমানের সহিত স্বীয় শক্তিমাত্রেরই এক রূপই ব্যবস্থা।

জীব ভগবানের শক্তিবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। অতএব ভগবানের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাই হ'ল অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তারপর আর একজন প্রশ্ন করিলেন—আমি অনেক দিন চিন্তা ক'রে থাকি, বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; তিনি আমাদের মত হস্তপদ বিশিষ্ট, পরিমিত স্থানে অবস্থান করছেন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সসীম। ভগবান্ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি এবং ধ্বংস। সসীম বস্তুতে এই অসীম ব্যাপার সম্ভবপর নহে। আরও শ্রীকৃষ্ণের ঐ আকৃতিটিকে আপনারা সচ্চিদানন্দময় ধ্বংসহীন নিত্যসত্য বলিয়া থাকেন। পরিমিত বস্তুমাত্রই দেখা যায় ধ্বংসশীল। আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ সসীম হইয়াও ধ্বংস-রহিত হন, কি প্রকারে? তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ইহার উত্তরে আমি বলিলাম—আপনি যা প্রশ্ন করলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত; এরূপ খট্‌কা মনের মাঝে উদয় হওয়াও স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের মত আকৃতি-বিশিষ্ট হইলেও তিনি যে আমাদের মতন ন'ন, তাহা আমি দেখাব। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদের শাস্ত্র ব'লে অনেকেই আপত্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাদ দিলাম। হিন্দুমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা মহামান্য গ্রন্থ। আমার বক্তব্য বিষয় গীতাতেই বিবৃত আছে।

যুদ্ধস্থলে কুরুপাণ্ডব সৈন্যের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ যে রথোপরি উপবিষ্ট হ'য়ে ভক্ত অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ ক'রেছিলেন; সে রথটীর আকৃতি যে কিরূপ ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যেহেতু এখন আর রথে চ'ড়ে যুদ্ধ হয় না। যাহা হউক্ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ রথটী এখনকার ঘোড়াগাড়ীর চেয়ে আকারে কিছু ছোট কিম্বা বড় হ'বে—অন্ততঃ রথটী যে অসীম নয় তাহা অনুমান করা খুবই সহজ। উক্ত রথের সারথির আসনে অর্থাৎ কোচম্যানের আসনে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট। রথটা মনে করুন ফিটিং গাড়ীর মত আকৃতি বিশিষ্ট। অর্জ্জুন রথটীর মধ্যে বসেছেন। কোচবাক্সটী হয়ত এক হাত লম্বা কিম্বা দুই-হাত লম্বা হ'বে। উক্ত পরিমিত আসনে ব'সেই (রথটাকে বড়ও করেন নাই কোচবাক্সটাকেও বড় করেন নাই,) সেই মানবাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই নিজের মধ্যে সমস্তটা জগৎকে দেখালেন। এস্থলে সত্যদর্শী ঋষি ব্যাসদেব বর্ণনা করলেন—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা
অপশ্যৎ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥

গীতা ১১।১৩

"অর্জ্জুন, তখন সেই পরমদেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অনন্ত জগৎ একত্রস্থিত এবং অনেকরূপে বিভক্ত এরূপ নিরীক্ষণ করলেন।

উক্তরূপ দর্শনান্তর ভয়বিত্রস্ত হয়ে অর্জ্জুন স্তব করতে লাগ্‌লেন—

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ। গীতা ১১।২০

"হে কৃষ্ণ! তুমি একাকীই আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক্ ব্যাপ্ত হয়ে আছ।"

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলেছেন:—

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি। ১১।৭ গীতা

'হে অর্জ্জুন! এই আমার দেহের মধ্যেই চরাচর সমস্ত জগৎ দর্শন কর। আরও তোমার যা' ইচ্ছা হয় তা'ও দেখ।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এই আলোচনায় আমরা বুঝ্‌লাম যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মতন মানবাকৃতি বিশিষ্ট হ'লেও তাহা আকৃতি আমাদের আকৃতির মত জড়পিণ্ড নয়, তাঁর আকৃতির সসীমতার মধ্যে বিরাট অসীমতা অতি সংগোপনে লুক্কায়িত। অর্থাৎ তিনি একাধারে সসীমও বটেন, অসীমও

বটেন। তিনি সসীমরূপে স্থিত হ'য়েও অসীম। তাঁর আকৃতিটীতে অসীমতা আছে ব'লে তিনি অবিনশ্বর। বিভু-পদার্থ কখনও ধ্বংসশীল হইতে পারে না। যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐ মানবাকৃতিতে অসীমতা না থাকত, তা' হ'লে তাঁর পক্ষে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখা'ন সম্ভবপর হ'ত না। যার কাছে পাঁচ টাকা নেই, সেই দরিদ্রব্যক্তি পাঁচ টাকা দেখা'বেন কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে যুগপৎ সসীমতা ও অসীমতা আছে ব'লেই তাঁহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি এবং ধ্বংস অসম্ভব নহে।

আপনারা বল্‌তে পারেন যে—"গীতার একাংশে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ, ভেল্কি দেখা'য়েছিলেন। একথা বলা যায় না; যেহেতু, অর্জ্জুন তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ। দেবাদিদেব মহাদেবকে তিনি তপস্যায় এবং যুদ্ধে সন্তুষ্ট ক'রেছেন। তিনি সামান্য ভেল্কিতে দমিবার মানুষ নন্। আরও যদি বিশ্বরূপ দর্শন ভেল্কি হইত, তা'হলে সত্যদ্রষ্টা মহামুনি ব্যাসদেবও এই ঘটনাকে সাগ্রহে মহাভারতের মহিমময় স্থলে স্থান দিতেন না। তা'হলে শ্রীকৃষ্ণের সসীম আকৃতির মধ্যে অসীমতা যে লুকায়িত, তাহা স্থিরীকৃত হ'ল।

এইকথা শুনিয়া আমার বন্ধুটী বলিলেন যে—হাঁ, আমরা হিন্দুশাস্ত্র মেনে চলি। কাজেই হিন্দুর মহামান্য শাস্ত্রগ্রন্থ গীতাতেই যখন শ্রীকৃষ্ণের সসীম আকৃতির মাঝে অসীমতার ইঙ্গিত আছে তখন আমাদের তা' না মান্‌লে চল্‌বে কেন? কিন্তু মুসলমান খৃষ্টানেরা বলবে যে,—হিন্দুদের শাস্ত্রে কতকগুলি আজগুবী গল্প আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানও ঐ গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐ সসীম আকৃতিতে অসীমতা দেখান যেতে পারে কিনা? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাট ভগবত্তত্ত্ব তাহা প্রতিপাদন করা যায় কিনা?

তদুত্তরে আমি ব'ললাম—মুসলমান প্রভৃতিরা ঈশ্বরকে নিরাকার বিভুপদার্থ ব'লে থাকেন, তাঁহাদের মতেও বোধ হয় ঈশ্বরের মধ্যে সর্ব্বশক্তি পূর্ণরূপে বিরাজমান আছে ব'লে স্বীকার করা হয়। যদি তা' হয়, তবে তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন এই:—তাঁদের ঈশ্বর কি আমাদের মতন আকৃতিবিশিষ্ট হ'য়ে কখনও প্রকাশ হ'তে পারেন না? যদি না পারেন, তবে তিনি পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ নন্, এই কথা ব'ল্‌তে হয়। যেহেতু তিনি আমাদের মতন কখনও হ'তে পারেন না। এই শক্তির তাঁ'তে অভাব আছে। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিশালী তাঁকে বলিলে তিনি যুগপৎ বিরাটরূপে থেকেও আমাদের মতন আকৃতিবিশিষ্ট হ'য়েও প্রকাশ পাইতে পারেন এবং দরকার হ'লে সেই আকৃতির মধ্যেই যে বিরাটরূপ দেখাতে পারেন, একথা স্বীকার করতে হয়। নতুবা তিনি পরিপূর্ণ শক্তিশালী নন্ একথা ব'ল্‌তে হয়।

আমাদের মতে ঈশ্বর বিভুও বটেন পরিপূর্ণ শক্তিমান্‌ও বটেন। তাঁতে' সর্ব্বশক্তি পূর্ণরূপে আছে বলিয়াই তিনি যুগপৎ মানুষের মত আকৃতিবিশিষ্টও বটেন, সর্ব্বব্যাপকও বটেন। যে সময়ে তিনি মানুষ সে সময়েই তিনি সর্ব্বব্যাপক। আবার ঐ মানবাকৃতির মধ্যেই ব্যাপকতা লুকায়িত। এই রকম অবস্থা মানুষে সম্ভবপর নয় দেবতারও নয়। ইহা একমাত্র ঈশ্বরে সম্ভবপর। যেহেতু ঈশ্বর শব্দের অর্থই হ'ল—অন্যে যে শক্তি সম্ভব নয়, সে শক্তি যাঁতে আছে তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং তাঁতে সর্ব্বশক্তির পরিপূর্ণতাও অব্যাহত।

বস্তুতঃ ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম পদার্থ হ'লেও তিনি স্বীয় আশ্রিতজনের রক্ষার্থে কিম্বা চিত্তবিনোদনার্থে মানবাকৃতি ধারণ ক'রে আছেনই। ইহাতে তাঁর "ভক্তবাৎসল্য" গুণের পূর্ণ বিকাশ হ'য়েছে। ইহা ভগবানের পক্ষে দূষণ নয় বরঞ্চ ভূষণ। ভগবানের সেই মানবাকৃতি আমাদের জড়ীয় দেহের মত নশ্বর এবং মৃণ্ময় নয়, পরন্তু চিন্ময় আনন্দময় এবং নিত্য সত্তাবান্। ঐ আনন্দময়ের শ্রীচরণই তদীয় ভক্তেরা অর্চ্চনা ক'রে থাকেন।

আর একজন ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করিলেন—ভগবানের জন্ম-মৃত্যু অসম্ভব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং নির্য্যাণ বর্ণিত আছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা থাকে কি?

আমি বলিলাম—শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু অনুসন্ধান লওয়া দরকার, তার জন্মটী আমাদের মত কিনা?

জীবের জন্ম হয় শুক্রশোণিত-সম্পর্কে। কিন্তু ভগবান্ যে আবির্ভূত হ'লেন, তাহা শুক্রশোণিত সম্পর্ক নয়

মানসিক ধারণা-সমাধির ব্যাপারে তাহা সম্পন্ন হয়েছিল। যথা—

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।৬৬।১০।২।১০।

"ভগবান্ আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছায় আনকদুন্দুভি বসুদেবের মনে আবিষ্ট হ'য়েছিলেন—

তারপর বসুদেব নিজের মনে আবিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তি দেবকীর মনে মনোবলে (সমাধিবলে যোগবলে) নিহিত করিলেন। "সমাহিতং শূরসুতেন দেবী" (শ্রীভা ১০।৮। দেবকীও মানসিক ধারণা দ্বারাই মনে ধারণ করিলেন—দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং ..মনঃসু। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।১৮। এবম্ভূত ভক্তিযোগের নির্ম্মলতম ব্যাপারই হ'ল ভগবানের "গর্ভে অভিব্যক্তি"।

জন্মকালে তিনি ঈশ্বরতাও প্রকট ক'রেছিলেন। আমাদের মত জড়পিণ্ডের মতন হ'য়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন্ নি। প্রাদুর্ভূত হ'য়েই তিনি কথা ব'লেছেন। শুধু তা' নয়— তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেনই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হ'য়ে কাপড় চোপর পড়ে। যথা—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং

চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুধায়ুধম্।

শ্রীবৎসলক্ষং গলশোভি-কৌস্তুভং

পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্। শ্রীভা ১০।৩।৯।

অদ্ভুত! যেহেতু তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পদ্মপলাশলোচন শ্রীবৎসচিহ্নধারী ছিলেন। তাঁহার গলদেশে কৌস্তুভ বিরাজমান। তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র ছিল। তাহার বর্ণ ছিল নবমেঘশ্যামল।

এই শ্লোকে অবশ্য বুঝা যায়—আমাদের জন্ম যেমন নগ্নমূর্ত্তিতে, তাঁহার প্রাদুর্ভাব সেরূপ নগ্নমূর্ত্তিতে নয়। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর রূপেতেই প্রাদুর্ভূত হ'য়েছিলেন!

তারপর তিনি প্রকৃত শিশুমূর্ত্তিতে প্রকটিত হ'লেন। যথা—আত্মমায়য়া......বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ। শ্রীভাগঃ ১০।৩।৪৬

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঈশ্বর, তাঁর জন্মও ঐশ্বর্য্যময় ইহাই প্রকটিত হ'ল। এই জন্ম নির্য্যাণ যে ঈশ্বরের আত্মমায়া, ইহাও বর্ণিত হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মত নির্য্যাণও ঈশ্বরভাবে পূর্ণ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ব্যাধের হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হন। সে ছিল জরাব্যাধ! শ্রীকৃষ্ণ সেই জরাব্যাধকে তৎক্ষণাৎ সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্ত করালেন। যথা—যাহি ..স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্।

শ্রীভাঃ ১১।৩০।৩৯।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও দারুককে বলিলেন যে—এই যে আমার নির্য্যাণ অর্থাৎ মৃত্যুবৎ একটী ব্যাপার, ইহা আমার মায়ামাত্র তা না হ'লে আমার জন্ম মৃত্যু কি আছে?

মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।

শ্রীভাগ ১১।৩০।৫০।

এই সমস্ত আলোচনায় বুঝ্‌লেন ত কৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু কি প্রকারের?

তারপর আর একজন প্রশ্ন করিলেন—মুক্তি-অবস্থাতে জীবে, ভগবানের ব্যাপক-রূপের ধারণা হ'বে, না ঐ মানুষ আকৃতির ধারণা হ'বে?

তদুত্তরে আমি বলিলাম—মুক্তি অবস্থাতে দুই প্রকারেই ধারণা হতে পারে, যাঁহারা শুধু ব্যাপকরূপের উপাসক, তাঁহারা শুধু ব্যাপকরূপই অনুভব কর্‌তে পারবে। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐ মানবাকৃতির উপাসক, তাঁরা মানব-আকৃতির তো অনুভব করবেনই, পরন্তু উক্ত উপাসকেরা যখন ব্যাপকরূপ দেখ্‌তে ইচ্ছা করবেন, তখন ঐ মানবমূর্ত্তির মধ্যেই লুক্কায়িত যে ব্যাপকরূপ, তাও দেখ্‌তে পাবেন। যেমন অর্জ্জুন গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মানবীমূর্ত্তির মধ্যেই লুক্কায়িত ব্যাপকরূপও দেখিতেছিলেন।

ইহার পর কিছু রাত্রও হইল আমার বন্ধুরা এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেরা "আপনি আসায় আমাদের মধ্যে অনেক বিষয় আলোচনা হইল এই বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। আমিও নিজের গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলাম।

বংশীবদনের বংশীবাদন

(সঙ্গীত)

রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেহাগ—আড়া

বাঁশী বাজে ওই শুনরে

দিবস রজনী বাজিছে মুরলী এস এস বলি ডাকিছে আদরে ;
যে বাঁশী শ্রবণে আকুল পরাণে গ্রহতারাগণ যে আছে যেখানে
ছুটে দিবানিশি রবিশশী সনে অনন্ত গগণে দিগ্ দিগন্তরে ;
যে বাঁশীর-স্বরে সুনীল অম্বরে জলধরদল ছুটাছুটি করে
পবন-পরশে ভাসি প্রেমরসে চপলা চমকে হাসে উচ্চস্বরে ;
যে বাঁশীর রবে জলধির জলে অবিরল প্রেমতরঙ্গ উথলে
সুধা-সুললিত আনন্দ-কল্লোল দশদিক সুখে সতত মুখরে ;
যে বাঁশীর গানে আত্মহারা প্রাণে সমীরণ সদা ধায় সর্ব্বস্থানে
অবিশ্রান্ত বেগে ফিরিছে সন্ধানে প্রাণকান্ত সনে মিলনের তরে ;
যে বাঁশীর স্বরে ত্যজিয়া ভূধরে ছুটিছে তটিনী দেশ-দেশান্তরে
হ'য়ে উন্মাদিনী নবরঙ্গিণী নাচিতে নাচিতে মিশিতে সাগরে ;
যে বাঁশীর রবে নির্জ্জনে নীরবে সুরাঙ্গ কুসুমে পরিমল ঝরে
মকরন্দলোভে অন্ধ মধুকর পুঞ্জে পুঞ্জে ছুটে মধুর গুঞ্জরে ;
যে বাঁশরীধ্বনি শুনি মহীধর দ্রব হয়ে প্রেমে যামিনী বাসরে
দরদর অশ্রু ফেলে নিরন্তর মহাভাবে মগ্ন বিভোর অন্তরে ;
যে বাঁশীর গানে সুমধুর তানে বিহঙ্গমগণ সুধা ঢালে প্রাণে
বসি কুঞ্জবনে বিজন কাননে পরাণরমণে ডাকে প্রেমভরে ;
যে বাঁশীর ধ্বনি শ্রবণে পশিলে শিশু কেঁদে উঠে জননীর কোলে
যত ভোলাও তারে কিছুতে না ভুলে শুধু ফুলে ফুলে কাঁদিয়া শিহরে ;
শুনি যে বাঁশরী পতিপ্রাণা নারী প্রবাসী পতির প্রেমানল স্মরি
আঁখিবারি আর নিবারিতে নারি বসন-অঞ্চলে বদন আবরে ;
যে বাঁশীর স্বরে স্মরি প্রাণেশ্বরে ভাবাবেশে ভক্ত সতত বিহরে
উন্মত্তের প্রায় কাঁদে উভরায় ছুটিয়া বেড়ায় পর্ব্বতে প্রান্তরে ;
সঘনে বাজিছে শুন সে বাঁশরী চল চল সবে চল ত্বরা করি
হেরি গিয়া সেই প্রাণবংশীধারী প্রাণের নিভৃত নিকুঞ্জ ভিতরে ;
পরাণ-কিশোরী লইয়া শ্রীহরি বিরাজিত যথা রত্নবেদীপরি
সখীগণ হেরি যুগলমাধুরী প্রেমানন্দে ভরি আপনা পাসরে ॥

বৈষ্ণবমহাজনের কৃপাবৈভব

[শ্রীবামাচরণ বসু]

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কৃপা করিয়া চিন্ময়ী বৃন্দাবনধাম-মহিমা প্রকটিত করিয়া জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ব্রজলীলার সহিত যতই আমাদের পরিচয় হইবে, নৈকট্যসম্বন্ধ বাড়িবে, ততই আমাদের ভজনের পথ বিবুধগণের দুর্দ্দর্শ হইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমাদের নিকট সুগম ও সরল হইতে থাকিবে। লীলারসাস্বাদনই সারসিক ভক্তগণের জীবন। শ্রীপাদ সনাতনকে স্বয়ং মহাপ্রভু উপদেশ করিতেছেন—

"কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ"। মাধুর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হইতেছেন—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তিনি কদাচ ব্রজের বাহিরে যান না। ব্রজের বাহিরে গেলেই কৃষ্ণ আর পূর্ণ মাধুর্য্যময় থাকেন না, সেইজন্য শ্রীপাদ গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ব্রজের কৃষ্ণ পূর্ণতম ; ব্রজের সহিত অনেক ঐক্যব্যবহার-যুক্ত মথুরাধামের কৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ণতর, আর ব্রজমণ্ডলের সুদূর প্রদেশস্থিত শ্রীদ্বারকাধামের কৃষ্ণ হইতেছেন পূর্ণ। ব্রজের এই পূর্ণতম কৃষ্ণ শ্রীনন্দদুলালই হইলেন আমাদের আরাধ্য অনুরাগের সহিত রাগমার্গে ভজন ভিন্ন এই মাধুর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই নাই নাই, ইহাই "কেবল" শব্দ দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে। বেদ-কর্ত্তা ব্রহ্ম তিনবার বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া মনীষাদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন—যাহা হইতে শ্রীহরিতে রতি জন্মে তাহাই হইল ভক্তিযোগাখ্য পন্থা। কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যমুকুটমণি মহাকৃপালু শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিখিল শাস্ত্রজলধি বহুবার মন্থন করিয়াও শ্রীমন্ মহা-প্রভুর উপদিষ্ট রাগমার্গে ভজনপ্রণালী কিরূপে করিতে হইবে যথাযথ মনের মত শ্লোক না পাইয়া, নিজেই গৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়া দুইটি শ্লোক প্রণয়ন করিয়া সম্প্রদায়ের পরম মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু হইতে সমুদ্ধৃত ঐ শ্লোক দুইটাই হইল রাগমার্গ-গামী সাধকের জীবাতু, অবশ্যপালনীয় করণীয় বিধি। যথা—

(১) কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

(২) সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণাঙ্গ সাধনের মুখ্যত্ব, সেই স্মরণের ধারা কিরূপ তাহাই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি চরণ খুলিয়া বলিতেছেন—"রতে ব সঃ" কৃষ্ণই আমাদের আরাধ্য হইলেও কেবলমাত্র সেই মাধুর্য্য ও আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে চলিবে না ; "ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য" অতএব স্বাভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ তদীয় প্রিয়তমজনের "শ্রীরাধার" সহিত সম্মিলিত মধুর-লীলারসে নিমগ্ন ইহাই স্মরণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎকথায় সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিতে হইবে। আর সাধ্যায়ত্ত হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের একমাত্র বিহারভূমি মধুর ব্রজধামেই বাস করিবে, সামর্থ্য না হইলে মানসে অন্তঃ-চিন্তিত সেই যুগলসেবোপযোগী দেহে সদা ব্রজে বাস করিবে। অর্থাৎ মনে রাখিবে তুমিও মূলে ব্রজজন ছিলে, দৈবদুর্ব্বশতঃ মায়ার কুহকে পড়িয়া নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িয়াছ ; শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভধৃত এই "রাজোব্যাধ" ন্যায়ানুসারে সদগুরু যখন মিলিয়াছে, তখন ইহজন্মে হউক আর জন্মান্তরে হউক্ ব্রজেই ফিরিতে হইবে। সেইজন্য "ব্রজসুরবণিতার চরণ আশ্রয়সার কর মন একান্ত করিয়া"। তোমার ধ্যানের বস্তু কিরূপ হইবে তাহাও আমি (শ্রীরূপগোস্বামী) দিশা দেখাইয়া দিতেছি"—

শ্যামং রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠম্
সৌন্দর্য্যমোহিত-সমস্ত জগজ্জনস্য।

শ্যামস্য বামভুজবদ্ধতনুং কদাহম্
ত্বামিন্দিরাবিরলরূপভরাং ভজামি॥

হে শ্রীমতি রাধিকে, যিনি লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ত্রিভুবন বিমুগ্ধ করিতেছেন, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীনন্দদুলালের বামভুজাশ্লিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অপেক্ষা সমধিক রূপবতী যে তুমি কৃষ্ণকান্তামুকুটমণি বিরাজ করিতেছ, এই মধুর যুগলরূপ কবে আমি ভজনা করিব। ধ্যান ধারণা সমাধির উদ্দেশ আমরা উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা সমধিক কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং দুষ্প্রাপ্য। বেদবিধির অগোচর রত্নবেদীর পর ও সরস নবজলধরাবৃত ফুল্লেন্দীবরকান্তি "সেবনীত কিশোর কিশোরী।" এই পন্থাই সহজ; ইহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীপাদরূপ গোস্বামি প্রদর্শিত সুমিষ্ট সহজ ভজনপদ্ধতি। ইহাই সেই প্রেমের ঠাকুরের চিরানর্পিত করুণার অবদান। ইহাতে আদৌ ভজনকৃচ্ছ্রতা তো নাই ভজনারম্ভ হইতেই অখণ্ড পরমানন্দ, মধুরাদপি মধুর লীলাস্বাদন ও প্রেমামৃত-সমুদ্রে মজ্জন। তাই পরমানন্দে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আরো বিস্তার করিয়া বাংলা কথায় সাধকের লালসা বাড়াইয়া বলিতেছেন—যদি ভজিতে হয় তো ইহাই ভজ—

"হেমগিরিতনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
সেবন করিব অভিলাষ।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপে ভুবন পরকাশ॥
সখীগণ চারিপাশে সেবা করে অভিলাষে
সে সেবা পরম সুখ ধরে।
সেই রসে মন মোর, সেই রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে॥

কবিরাজ গোবিন্দদাস বৃন্দাবনীর আম্রকুঞ্জ ঝঙ্কৃত করিয়া মধুর যুগলরূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

দাঁড়াইল শ্যামের বামে নবীনা কিশোরী।
পশু পাখী উন্মত্ত ও স্বরূপ হেরি॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥
দোঁহা কাঁন্ধে দুইজন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
ডালে বসি দোঁহারূপ দেখি শুক-শারী।
আনন্দে ধনাগ্রা না চ ময়ূর ময়ূরী॥
গোবিন্দদাস কহে রূপের মাধুরী।
নবী জলদকোরে থির-বিজুরী॥

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম, যুগল বিলাস
স্মৃতিসার
সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই এই তত্ত্ব
সর্ব্বসিদ্ধিসার॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিলাস হইল মুখ্য স্মরণ, যে সাধকচিত্তে তদ্‌জাতীয় স্মরণ মনন নাই তাহার প্রাণহীনদেহ শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য। সুতরাং স্মরণই হইতেছে রাগানুগা ভজনের প্রাণ। ইহা হইতেই অষ্টকালীয় স্মরণপদ্ধতির প্রবৃত্তি। এইখানেই কিন্তু ভক্তিসন্দর্ভকার বলিতেছেন—"হে সাধক! সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও বর্ত্তমানে এই মহাকৃপার যুগে শ্রীনামকীর্ত্তনেরই একচ্ছত্র রাজত্ব, স্মরণাদি অন্য অষ্টপ্রকার সাধনকে কীর্ত্তনের আনুগত্যে চালাইতে হইবে; সুতরাং স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন চলিবে। এই কীর্ত্তন আবার ত্রিবিধ—শ্রীনাম কীর্ত্তন গুণকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন। কীর্ত্তনমাত্রই স্মরণের সহায়তা করে; তবে লীলা কীর্ত্তন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হইলে তাহাতে সাক্ষাৎ লীলা স্ফূর্ত্তি হইবার কথা। ধ্যেয় বস্তু আপনিই সমুদিত। "গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতা চয় মধুর মধুর অতিশোভন"। তাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ লীলাকীর্ত্তনকে পরম "বলবদেবেদং সাধনম্" বলিয়াছেন। একই যুগপৎ দুইপ্রকার সাধন কিরূপে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। যেহেতু শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি, পরস্পর-হেতু হেতুমদ্‌ভাবে সম্বন্ধ। তুমি নিবিষ্টচিত্তে ভক্তিভরে "হরে কৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে যদি ভাগ্যক্রমে শ্রীনামের কৃপা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে নামীর অভ্যুদয় হয়। হরতীতি হর, আর কর্ষতি কৃষ্ণঃ সুতরাং শ্রীনামের ফলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইবে, স্মরণের সাক্ষাৎফল লাভ হইবে। আর লীলাকীর্ত্তন ইতর রাগমাত্রকে বিদূরিত

করিয়া সাধকের চিত্তকে বড়শীবদ্ধ মীনের ন্যায় লীলারস-সাগরে নিমজ্জিত করিবে, সাধকের সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া রাগানুগা সাধকের পরম বন্ধু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় (নরোত্তম) গাহিতেছেন—

ঝ্ঁঝুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহনলীলা করু।
হাসবিলাস রস, মধুর মধুর ভাষ
নরোত্তম মনোরথ ভরু॥

রাগানুগীয় সাধকের ইহাই চরম সিদ্ধিলাভ। "নয়নের অভিরাম ইহা বই আর নাই" যুগলবিলাস দর্শন ও যুগলচরণ সেবা। ইহাই হইল শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত শ্লোকের "তত্তৎকথারত" তাহার অভিব্যক্তি। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক খাঁটী খাঁটী লীলাগান ভক্তগায়কমুখে নির্বিষ্টচিত্তে শুনিবার ভাগ্য তৎ তৎ লীলারসাস্বাদনজনিত অপূর্ব্ব-প্রেমানন্দরসে সাধকচিত্ত আপ্লুত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের শ্রীগুরুদত্ত মঞ্জুরী দেহের বিকাশ হইয়া অনসুসন্ধানে সেবানন্দে হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়। আমরা সে সংবাদ পরম রসিক ভক্ত শ্রীরাধামোহন চরণাশ্রিত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা শ্রীল বৈষ্ণবচরণ দাসের মুখে এইরূপ শুনিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া আছি—

শ্রীগুণমঞ্জরীপদ, মোর প্রাণ সম্পদ,
শ্রীমণি-মঞ্জুরী তার সঙ্গে॥
হেন দশা মোর হব, সে পদ দেখিতে পাব
সখীসহ প্রেমের তরঙ্গে।
মদন সুখদা নাম, কুঞ্জ শোভা অনুপাম,
তাহে রত্নসিংহাসনোপরি।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ, বসিয়াছেন দুইজন,
রসাবেশে কিশোর কিশোরী।
সেই সিংহাসন বামে, দাঁড়াইব সাবধানে,
গুণমনি মঞ্জুরীর পাশে।
শ্রীহেম মঞ্জুরী নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
আমারে ডাকিবে নিজ পাশে॥
মুঞি তাঁ'র কাছে থাঁঞা, দুহুরূপ নিরখিয়া,
নয়ানে বহিবে প্রেমধারা।
দোঁহার দর্শনামৃতে, মোর নেত্র চাতকে,
রহিবে সে হইয়া বিভোরা॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল গোপাল ভট্ট হইতেছেন ব্রজলীলার শ্রীগুণমঞ্জুরী সখি; তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত অনুগতা সখী হইতেছেন শ্রীমতী মণিমঞ্জরী। যিনি গৌরপ্রেমমূরতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু। তৎপুত্র ও শিষ্য শ্রীল গতিগোবিন্দ প্রভুর সিদ্ধনাম বিলাসমঞ্জুরী; তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রভু কোন শিষ্য করেন নাই। তৎপুত্র জগদানন্দ প্রভু পিতামহের নিকট কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণ-মঞ্জুরী নামে সেবারূপামধ্যে পরিগণিত হন; তৎপুত্র ও শিষ্য প্রভু রাধামোহন হইতেছেন শ্রীমতী চম্পকমঞ্জুরী তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রিত হইতেছেন বৈষ্ণবচরণ দাস।

মদন সুখদাকুঞ্জের ঈশ্বরী শ্রীমতি বিশাখা হইতে-ছেন যোগপীঠের ঈশান কোণে অবস্থিত। শ্রীমতী গুণমঞ্জুরী নিজ নিজ গণ সহ এই বিশাখা সখীর অনুগত। সুতরাং এই মদন-সুখদাকুঞ্জ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও আচার্য্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্যগণের নিজ কুঞ্জ হইতেছে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামি-চরণের শ্রীমুখে আমরা ইহা পাইয়াছি। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে—সম্পূর্ণামঞ্জরীও এই মদন-সুখদাকুঞ্জে শ্রীবিশাখা-সমন্বিতা। যুগলরূপদর্শন সুখের কথা হইল; এখন সেবানন্দের কথা শুনুন—

শ্রীরূপ মঞ্জরী সুখে তাম্বুল দিবেন মুখে
রাই-কানু করিবে ভক্ষণ।
পিক্ ফেলিবার বোল আলবাটি আন বলি
আমারে ডাকিবে দুইজন॥

শ্রীগুরুকৃপা সখীর কৃপা হইলে সেবাপরা সখীর ঈশ্বরী শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপা আপনিই নামিবে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধা গোবিন্দ যুগলের সাক্ষাৎ কৃপা আসিয়া তোমাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিবে। তখনও কিন্তু তোমার সখীর আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইতে হইবে। এই দেখুন তাহার নমুনা—

সখীর ইঙ্গিত পাঞা, আলবাটি করে লঞা,
ধরিব সে চন্দ্রমুখপাশে।

তাহাতে ফেলিবে পিক্, মুঞি লঞা একভিত,
দাঁড়াইব মনের হরিষে॥

তারপর পূর্ণ কৃতার্থতা—

কত বা কৌতুক কাজ, হইবে সে কুঞ্জমাঝ,
তাহা মুঞি দেখিব নয়ানে।
পুরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
নিবেদয়ে বৈষ্ণব চরণে॥

এই যুগলসেবকামী সাধকের প্রতি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বসার উপদেশ হইতেছে "কেবল ভকতসঙ্গ প্রেমকথারসরঙ্গ লীলাকথা ব্রজরস পুরে।"

পরম নাগর কৃষ্ণ তাহে হও অতিতৃষ্ণ
ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক ভকত সঙ্গে রহিব পীরিতি রঙ্গে
ব্রজপুরে বসতি করিয়া॥
শ্রীগুরুভকতজন তাহার চরণে মন
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত হইয়া তাহার যুথ
সদা বিহরিব ব্রজপুরে॥
লীলারস সদা গান যুগল কিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষ।
জীবনে মরণে ভাই আর কিছু নাহি চাই
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

এই সম্প্রদায়াচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের কৃত উক্ত "কৃষ্ণ স্মরণ" শ্লোকের সরস আভাসসমন্বিত সিদ্ধ-মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অনুভূত ও আস্বাদিত রসাস্বাদনের সকরুণ অভিব্যক্তি। সাধকের পরম সুহৃদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের রাগমার্গভজনরহস্যের পরিস্ফুট উপদেশ। যে লীলাকথা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার অভ্যন্তরে ব্রজরসের "পুর" থাকা চাই। সুতরাং দ্বারকা মথুরাদি লীলা বারিত হইল। তৎপরে তাহা কেবলাভক্তিরসপাত্র একসঙ্গে হওয়া চাই নতুবা প্রেমকথারসের তরঙ্গ উঠিবে না। পরমারাধ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণ সেই কথাই মহাদাঢ্যের সহিত বলিয়াছেন—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং
তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধোরস-
স্যাবগাহ॥

পরম-কারুণ্যজলধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার অতি-প্রিয় গৌড়ীয় ভক্তগণের ভজনসৌকার্য্যার্থে যে কি অপূর্ব্ব অনায়াসসাধ্য অথচ পরম-বলবৎ-সাধনের প্রচুর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা পরিচিন্তন করিলে কেবল শ্রীল বৃন্দাবন-দাস, ঠাকুরের ন্যায় অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে হয়—

এহেন সম্পদকালে (যখন ইন্দ্রায়াদি স্বরূপে আছে)
গোরা না ভজিনু হেলে
তুয়া পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

ভাই পাঠক! আমার মত মহা হতভাগ্যের কান্নার আর পার নাই; অতি দুর্লভ মানব জনম পাইলাম, তাহা আবার সেই ত্রৈলোক্যে—সেই পৃথিবীতে—"যত্র বৃন্দাবন, পুরী"। আবার অভিন্নব্রজমণ্ডল এই গৌড়মণ্ডলে যেখানে "প্রভু মোর নন্দসুত, বলভাত্নসুতাযুত"। তাহা আবার কিশোর নগরে যথায় শ্রীনন্দদুলাল দুই পার্শ্বে রাধা-ললিতা সহ করেন বিহার, এমন শ্রীনন্দদুলালের ঘরে পরম নৈষ্ঠিক ব্রজরসিক বৈষ্ণবের জন্য চক্ষু মেলিয়াই দেখিলাম—

"অভিনব কুড্মল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল, কুঞ্চিত কুন্তল-ভার।
প্রণয়িজনেরিত বন্দন সঙ্কৃত চূর্ণিত বরঘনসার
অপরূপ সুন্দর নন্দদুলাল।

আবার—

"রাধে জয় জয়, মাধব দয়িতে
ব্রজজনবযুবতীমণ্ডলী সহিতে"—

এই সুমধুর জয়গানে শ্রবণও পরিপূরিত হইল। ভাগ্যের অবধি নাই,—না ডাকিতেই অভিন্ন-গৌরাঙ্গ-স্বরূপ গৌরপ্রেমময় মুরতি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নিজ দাসকে আত্মসাৎ করিলেন। সংসারবাসনাবদ্ধ মায়াকবলিত

মাদৃশ জীবাধমকে মদীশ্বর প্রভু শ্রীল কংসারিলাল অভয়প্রদান করিলেন। এবং শ্রীরাধাপদে দাসীত্বের জন্য শ্রীগুণমণি-মঞ্জরীর শ্রীকরে সমর্পণ করিলেন। গৌড়রাজর্ষি ভক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের কৃপায় বহু সাধু-ভক্তের সম্মেলন দেখিলাম। শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া শ্রীধামবাসের পরম সুযোগ করিয়া দিলেন। কিন্তু মহাপরাধী আমি আমার কিছুতেই রতিমতি হইল না, সাধুগুরু বৈষ্ণবের করুণা লইতে পারিলাম না। অহঙ্কারে বিষয়ভোগলালসায় মজিয়া রহিলাম; যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রহিলাম। তাই ক্ষোভ হইতেছে—

এহেন সম্পদ্‌কালে গোরা না ভজিনু হেলে
এখন এই অন্তিম কালে আর কি করিবে—
হা হা প্রভু নন্দ-সুত বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার॥ (ক্রমশঃ)

সুখ

শ্রীগোপীনাথ বসাক।

কোন্ গহনের নিভৃত হইতে বাজিল মোহন বাঁশী।
স্থাবর জঙ্গমে দেবতা মানবে আকুল করিল আসি॥
কি তাঁর মধুর ব্যাপক ধ্বনি॥
যে থাকে যেখানে আপনারি পানে করিতেছে টানাটানি॥
প্রকাশ করিয়ে বিপুল বিশ্ব স্মৃতি-ধৃতি-আশাবাণী।
প্রতি পলে পলে নূতনের পথে জাগায় সে সুরখানি॥
আব্রহ্ম কীটাণু অনু পরমানু সবাতে বসিল জুড়ে।
অসীম যেন সে ধরা দিতে আসে সসীমের ঘরে ঘরে॥
অন্তর বাসায় আপনা চাওয়ায় পাওয়াতে না পাওয়া ধাঁধা
আশা-বিভীষিকা ভুল মরীচিকা গড়ি দেয় হাঁসা কাঁদা॥
নিসর্গের পথে বিশ্ব ছুটিছে বাদকের অন্বেষণে।
কত ভাঙ্গাগড়া কত ওঠাপড়া অবিরাম সে সাধনে॥
চন্দ্র তপন গ্রহ-তারাগণ খোঁজে তাঁরি আলো ধ'রে।
স্থাবর অবশ নিদ্রিত অলস আঁধারে খুঁজিয়া মরে॥

জাগ্রত যারা সেই মনোহরা ধ্বনির উদ্দেশে ছুটে ।
হরিণের প্রায় কত দিকে ধায় মৃগমদ নাভিপুটে ॥
সৌরভে আকুল ব্যাকুল বাতুল ওই ওই করি ধায় ॥
ধরি ধরি করি ছলনায় পড়ি জীবন বহিয়া যায় ॥
কোন্ রঙস্থানে উঠিল সে গান মোহিল সকল বিশ্ব ।
তান-মুচ্ছ'নায় জানা অজানায় ধনীরে করিল নিস্ব ॥
সবারি সে সুর চিরপরিচিত চির-অনুভূত সত্য ।
অথচ "আমার" করিতে সবার নিজ নিজ মন মত্ত ॥
কি যেন কিসের কত পুরাণের হারাস্মৃতি প্রীতি জাগে ।
কোন্ পরেশের সম্ভোগ-রসের মিলন যখন ভাঙ্গে ॥
অনাদি কালের সেই বিরহের পাগল ভুবনে ভ্রমি ।
জনমে জনমে কত রূপ নামে খুঁজিতেছে "কই তুমি" ॥
জনক জননী সখা ও গৃহিণী আত্মীয় বান্ধব আর ।
প্রতি ঘটে ঘটে তারে অকপটে খুঁজিতেছে কতবার ॥
ব্যবসা ও ধন বিত্ত ভবন কত রূপে উঠে ভেসে ।
আশালোক পেয়ে সজোরে ধাইয়ে ধরিতেই যায় মিশে ॥
প্রতি ঘটনায় অতৃপ্ত আশায় বিবেক-তারণে জাগি ।
অন্তরে আঘাত "শিরে করাঘাত" করি বলে হতভাগি ॥
দৈবজ্ঞের স্থানে পুছিতে যতনে উত্তরে সে গ্রহবল ।
শাস্ত্রজ্ঞের ঠাই শুনিবারে পায় সকলি করম ফল ॥
যোগী সাধু কয় চিত্ত স্থির নয় অশুদ্ধ নাড়ী ও কোষ ।
জ্ঞানীর সদনে শুনিল কারণ মিথ্যা-মায়াত্মক দোষ ।
ভক্ত সাধু কয় ঈশ্বরের হয়, "মায়া" বহিরঙ্গা-শক্তি ॥
জীব তাঁর দাস ভেদাভেদ প্রকাশ "দোষ" বহিরনুরক্তি ।
ব্রহ্ম, আত্মা, আর অবতার যাঁর প্রকাশ বিলাস স্বাংশ ।
সেই নিরুপাধি সুখের মুরতি 'কৃষ্ণ' পূর্ণ অবতংশ ॥
ভক্তি সে সুখের সুখদা-শকতি জীব-কৃষ্ণ-অভিমুখ ।
সে ভক্তি-সাধনে নিরুপাধিপ্রেম প্রেমাধীন "পূর্ণসুখ" ॥

জীবের মনুষ্য জন্ম—৪

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়প্রাপ্তিতে যে আনন্দ অনুভূত হয়, শাস্ত্রকার তাহাকেই আনন্দের আভাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। অর্থাৎ পরতত্ত্বের স্বরূপ যে বিভু পরমানন্দ সেই আনন্দেরই মাত্রা—আভাসমাত্রই মায়াবদ্ধ জীব উপভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পঞ্চদশী বেদান্তকার দেখাইয়াছেন—

বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি

অন্তর্মুখ-মনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুকূল কোন একটি বিষয় প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা হেতু মায়াবদ্ধ জীবের মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। ঐ বিষয়টি প্রাপ্ত হইলেই সেই ইচ্ছা কিয়ৎকালের জন্য উপরত হয়, এবং মনও ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া অন্তর্মুখী হয়। মন যেমন অন্তর্মুখী হয় অমনি অন্তঃস্থিত পরমানন্দঘন পরমাত্মার আনন্দ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ইহাই আনন্দের আভাস। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব এই আনন্দ কোথা হইতে আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়া লয় যে—আনন্দ বিষয় হইতেই আসিতেছে, এবং তজ্জন্য সে বিষয়ভোগেই প্রবৃত্ত হয়। অনুকূল বিষয় সংযোগ-হেতু ইন্দ্রিয়ে যে অনুকূল বেদন অনুভূত হয় অতঃপর তাহাই মায়াবদ্ধ জীবের এই ভ্রান্তি আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেয়, এবং বিষয়-সুখই তখন তাহার যথার্থ সুখ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু জীবের কোন ইন্দ্রিয়ই অধিকক্ষণ বিষয়ভোগ করিতে সমর্থ নহে, করিলে দুঃখই পায়, এবং নশ্বর বিষয়ও কিছুক্ষণ পরে বিষ বলিয়া বোধ হয়; কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলভোগ সমাপ্ত হইলেই বিষয় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের মন নিরন্তর একটি বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, কারণ প্রয়োজন তাহার [illegible] আনন্দ তাহার চাইই, এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে—বিষয় ব্যতীত আনন্দের অস্তিত্বই নাই। মায়াবদ্ধ জীব জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এইরূপে বিড়ম্বিত এবং অশেষপ্রকার লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগ করিয়া কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুকৃপালাভ করিলেই তাহার এই ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে যে-

গতসারেঽত্র সংসারে সুখভ্রান্তির্মনীষিণাম্।

লালাপানমিবাঙ্গুষ্ঠে বালানাং স্তন্যবিভ্রমঃ॥

অর্থাৎ অজ্ঞ শিশু যেমন নিজের লালা সংযোগে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষিয়াই মনে করে যে মাতৃস্তন্য পান করিতেছি, সেইরূপ সারহীন এই সংসারে মনীষিগণও নিজের লালসা সংযোগপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিয়াই সুখভোগ করিতেছি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

দার্শনিকগণ আরও একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে—মায়াবদ্ধ মনুষ্যের বিষয়ভোগ-সুখটা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দুঃখ-সঙ্কুল। দৃষ্টান্তটি এই যে—মাংসলোলুপ নির্ব্বোধ কুক্কুর শুষ্ক অস্থি দেখিলেও মাংসলোভে তাহা চর্ব্বণ করিতে থাকে, এবং শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ-হেতু তাহার সৃক্কণী ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। সেই ক্ষত হইতে রুধির উদ্গম হইলে তাহাই আস্বাদন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য মাংস ভোজন-সুখ পাইতেছে মনে করে। কিন্তু পরক্ষণে যখন দেখিতে পায় যে তাহার কিছুমাত্র উদরপূর্ত্তি হইতেছে না, অথচ সৃক্কণীতে বিশেষ বেদনা অনুভূত হইতেছে, তখনই সে ঐ শুষ্ক অস্থি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে। মায়াবদ্ধ মনুষ্যও নিজের অন্তরস্থিত পরমানন্দের আভাস পাইয়াই বিষয়ভোগে রত হইয়া থাকে, কেবল ইন্দ্রিয়ে বিষয় সংযোগ-হেতু অনুকূল-বেদনে জীব প্রতারিত হইত না, কারণ সে বিষয়ভোগ হেতু দুঃখে জর্জ্জরিত হইলেই অবশেষে বিষয় দূরে পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহার

অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভ হইলেই সে পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণ ভজনে প্রবৃত্ত হয়। অখণ্ড-পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণ এক অদ্বয় রস-বস্তু, একবার সে চরণে চিত্তসংযোগ করিতে পারিলে আর কখনও তাহা হইতে চিত্ত বিচ্যুত হয় না। দেবর্ষি নারদ শ্রীবেদ-ব্যাসকে বলিয়াছেন—

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ ভাগ ১।৫।১৯

হে অঙ্গ! ভগবচ্চরণ-ভজনকারী কোন দুর্ব্বাসনাবেশ হেতু কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মিজনাদির ন্যায় পুনঃ সংসারগ্রস্ত হয়েন না, কারণ পরমানন্দঘন ভগবচ্চরণের আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাঁহার আর তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রসনীয় শ্রীভগবচ্চরণ-কর্ত্তৃক গৃহীত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া আছেন।

শ্রুতি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া শ্রীভগবৎস্বরূপেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—বিভু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশই রস শব্দবাচ্য বলিয়া আচার্য্যপাদগণ এই রস শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি স্তর দেখাইয়াছেন, যথা—

(১) রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ ইতি রসঃ; অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ আস্বাদ্য বস্তু, যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাই রস। (২) রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ, অর্থাৎ সেই আনন্দের আস্বাদনই রসশব্দবাচ্য। (৩) রসয়তি ইতি রসঃ; অর্থাৎ পরমানন্দঘন বস্তু হইয়াও যিনি নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আস্বাদন করান, তিনিই আস্বাদক-রূপে রসশব্দবাচ্য।

জ্ঞানী ও যোগীর সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মও পরমাত্মা কেবল সাধকাবস্থায় কথঞ্চিৎ আস্বাদ্য হইয়া থাকেন, এবং সিদ্ধাবস্থায় কেবল আস্বাদনরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন—জ্ঞানী ও যোগীর পৃথক সত্তা ব্রহ্ম ও পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হইলে কেবল আস্বাদন-তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ভক্তের সম্বন্ধে সাধক ও সিদ্ধ দুই অবস্থাতেই শ্রীভগবান্ আস্বাদ্য, আস্বাদন ও আস্বাদক এই ত্রিবিধ রূপেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। পরমানন্দ-ঘনস্বরূপ শ্রীভগবান্ ভক্তের সম্বন্ধে আস্বাদ্য ও আস্বাদন-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজেও আস্বাদক অর্থাৎ রসিকতত্ত্ব-রূপে আবির্ভূত হইয়াই রসশব্দবাচ্য হইয়া থাকেন। তিনি রস-স্বরূপ—অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও রসিকশেখর; অর্থাৎ তিনি ভক্তমাত্রেরই প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনই তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাহাই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার বলিয়াছেন—

সুখরূপী কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।
ভক্তজনে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

পরমানন্দঘন-রস-স্বরূপ শ্রীভগবান্ নিজেরই হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধার প্রেমানন্দ-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং ঐ হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই ভক্তগণে প্রেম-সঞ্চার করিয়া তাহাদিগেরও প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের এই আস্বাদক বা রসিক স্বভাব না থাকিলে ভক্তি-সাধনে সাধক কখনও কৃতার্থ হইতে পারিত না। মায়াবদ্ধ জীব অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুকৃপা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে চিত্ত একবার মাত্র সংযোগ করিতে পারিলেই তিনি তাহা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লয়েন এবং আর কখনও তাহা ছাড়েন না; কারণ সে চিত্তের ভক্তিরস আস্বাদন তাঁহারই প্রয়োজন, তিনি ভক্তের ভক্তিরসলোলুপ। যোগেন্দ্র হরি নিমিমহারাজের নিকট উত্তম ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ভাগ ১১।২।৫৫

অর্থাৎ একবার মাত্র অবশভাবেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে শ্রীহরি যখন সমস্ত পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন, তখন রসাস্বাদসহ প্রতিক্ষণ তাঁহার নামোচ্চারণ-

স্বয়ং শ্রীহরিই ভক্তের হৃদয়কন্দর কখন ত্যাগ করেন না, অতএব সেখানে কল্মষকুঞ্জরগণের প্রবেশের কোন সম্ভাবনাই নাই। ভক্তে হৃদয়মন্দির হইতে শ্রীহরি কখনও বাহির হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার চরণ কমল সেখানে প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্ব-জীবগণকে মায়াশৃঙ্খলায় বদ্ধ করিয়া তিনি নিজে ভক্ত-কর্ত্তৃক প্রেমশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মা যশোদা তাঁহাকে প্রেমে বশীভূত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের এই রসিক স্বভাব হেতুই তাঁহার চরণে একবার মনঃসংযোগ করিতে পারিলেই মায়ামুগ্ধ মনের বিক্ষেপ ও লয়ধর্ম্ম অতি সহজে দূর হইয়া যায়। জ্ঞানী ও যোগীর ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শ্রীভগবানের মত আস্বাদক বা রসিক-তত্ত্ব নহেন বলিয়া জ্ঞানী ও যোগীর চিত্ত হইতে বিক্ষেপ ও লয় ধর্ম্ম সহজে দূর হয় না। নিরাকার ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে তাঁহারা কোন সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন না। জ্ঞান ও যোগ সাধন নীরস সাধন বলিয়াই পুরাকালে মুনি ঋষিগণ যুগযুগান্তর অভ্যাসের ফলে এই বিক্ষেপ ও লয় হইতে নিস্তার পাইতেন। মায়ামুগ্ধ মনের বিক্ষেপ ও লয়-ধর্ম্মই সকল সাধনের অন্তরায়। রজোগুণের ধর্ম্ম বিক্ষেপ, ও তমোগুণের ধর্ম্ম লয়। মনের উৎপত্তি সত্ত্বগুণে, কিন্তু মায়ামুগ্ধ মন সুখের আশায় রজোগুণ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর একটির পর আর একটী বিষয় ভোগ করিতে চাহে; ইহাই মনের বিক্ষেপ ধর্ম্ম। এই অবিশ্রান্ত বিক্ষেপ হেতু ক্লান্ত মন জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তমোগুণ আশ্রয় করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। ইহার নাম মনের লয়ধর্ম্ম। এই লয় বা নিদ্রাহেতু মনের শ্রান্তি দূর হইলে মন পুনরায় বিক্ষেপেই সমর্থ হইয়া থাকে। পরমানন্দ-ঘন-রস শ্রীভগবচ্চরণে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেই মনের এই দুইটি ধর্ম্মই দূর হইয়া যায়, কারণ তখন মন অনাদিকাল হইতে যাহা চাহিতেছিল, তাহা পূর্ণ মাত্রায় পাইয়া যায়—যে আনন্দের কেবল অভাবের জন্য মন রজোগুণ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের প্রতি বিক্ষিপ্ত হয়, সেই পরমানন্দঘন বস্তুই তখন সে পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করিতে পায়, এবং সেই পরমানন্দঘনবস্তু নিজে আবার আকর্ষক বা রসিকতত্ত্ব-রূপে তাহার নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন! সুতরাং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়-সুখের জন্য তখন আর মনকে রজো-গুণ আশ্রয় বা বিক্ষেপ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে হয় না। মনের বিক্ষেপধর্ম্ম যাইলেই লয়-ধর্ম্মও আপ নই দূর হইয়া যায়, কারণ লয়ের কারণই বিক্ষেপ; বিক্ষেপ না থাকিলে লয়ও থাকে না। শ্রীঅবধূত যদু মহারাজকে বলিয়াছেন—

> যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ
> শনৈঃশনৈঃ মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
> সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
> বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥ ভাগ ১১।৯।১২

অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের লয়-বিক্ষেপাত্মক মন কেবল মাত্র পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণে লব্ধাস্পদ হইলেই শনৈঃ-শনৈঃ কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিহেতু রজঃ ও তমোগুণের অভাবে মনের বিক্ষেপ ও লয়-ধর্ম্মও থাকে না। তখন মন বৃত্ত্যন্তরশূন্য হইয়া ভগবন্ময় হইয়া যায়, এবং সত্ত্বগুণও ক্ষীণ হইলে গুণত্রয়শূন্য মন কেবল নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি শ্রীভগবচ্চরণেই নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

শিবকৃতস্তবে ও এই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে—

> ন যত্র চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
> যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥
> ভাগ ৪।২৪।৫৯

হে ভগবন্! তোমার সাধুভক্তের কৃপাবলে সাধক অপরাধমুক্ত হইলেই ভক্তিদেবীর কৃপালাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইলেই সাধকের চিত্ত তোমার স্মরণশ্রবণাদি সময়ে বাহ্যার্থ-বিক্ষিপ্ত ও সুপ্তি-গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় না, অর্থাৎ বিক্ষেপ ও লয় ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বিশুদ্ধচিত্তেই মননশীল সাধক তোমার লীলা-লাবণ্যাদি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে—সাধক ভক্তের চিত্ত যতদিন বিক্ষেপ ও লয় কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে তাঁহার সাধু ও ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হয় নাই।

মায়ামুগ্ধ মনের বিক্ষেপ ও লয় ধর্ম্মই মনুষ্যের সকল সাধনের অন্তরায় হইয়া থাকে। শ্রীভগবচ্চরণোপাসনাই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রকৃষ্ট এবং একমাত্র সুগম উপায়। শ্রীভগবান্ মহারাজ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

ভাগ ১০।৫১।৬০

ভগবদ্ভজনবিহীন ব্যক্তি প্রাণায়ামাদি বহু কঠোর সাধন দ্বারা মনঃসংযম অভ্যাস করিলেও বাসনাক্ষয়াভাব-হেতু তাহার মন পুনরায় বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয় দেখা যায়। বাসনাক্ষয় ভগবচ্চরণসেবা ভিন্ন আর কিছুতেই হয় না। পরমানন্দসমুদ্র শ্রীভগবচ্চরণেই জীবের বাসনার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবচ্চরণভজনের প্রভাব-সম্বন্ধে যোগীন্দ্র শ্রীকবি নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

ভাগ ১১।২।৪২

অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতিগ্রাসে ভোজন-সুখ, উদরভরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবদ্‌স্ফূর্ত্তি এবং স্ত্রীপুত্রদেহগৃহাদি অন্যত্র বিরক্তি ভজনসময়েই একসঙ্গে উদিত হইয়া থাকে। ভজন যেমন যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, সাধকের ভক্তি, পরমানন্দঘন ভগবচ্চরণের অনুভূতি এবং বিষয়ে বিরক্তিও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব ভক্তিসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন, সহজসাধ্য ও রসসংযুক্ত সাধন বলিয়া মায়াবদ্ধ মনুষ্যের ইহাই সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কলিহত জীবের ভক্তিসাধনই একমাত্র উপযোগী। বিশেষতঃ ভক্তিসাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদ, শুদ্ধাভক্তিসাধনের ফল শ্রীভগবচ্চরণসেবা-প্রাপ্তি এবং তাহাই জীবের চরমপুরুষার্থশিরোমণি! জীব নিত্যভগবদ্দাস, পরমানন্দঘন অশেষগুণার্ণব শ্রীভগবচ্চরণের সেবাসুখই তাহার স্বাভাবিক সম্পত্তি। ঐ সাধনের প্রভাবে হইতেই সেই সর্ব্বাপার্থোত্তম সুখের অনুভূতি পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা মায়াবদ্ধ জীবের আর কোনও শ্রেষ্ঠতর সাধন নাই। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করিতে বলিয়াছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো।
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ভাগ ১০।১৪।৮

হে ভগবান্! সুপুত্র যেমন মিষ্টান্ন ও নিম্বরস, কিম্বা লালন ও তাড়ন তাহার হিতের জন্যই পিতা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ইহা জানিয়া তাহা পিতার কৃপা মনে করিয়াই গ্রহণ করে, এবং পিতৃসেবা করিতে করিতে কোনমতে জীবিত থাকিলেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে দায়ভাগী হইয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ দুঃখ তাহার হিতের জন্যই তুমি ব্যবস্থা করিয়া থাক ইহা জানিয়া তোমার কৃপা মনে করিয়াই প্রসন্ন মনে তাহা গ্রহণ করে, এবং কায়মনোবাক্যে তোমার ভজন সাধন করিতে করিতে ভক্তজীবন জীবিত রাখিতে পারে, সেই নিশ্চয় সংসারমুক্ত হইয়া তোমার চরণে সেবার অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সংসারমুক্তি শুদ্ধাভক্তি-সাধনের কেবল আনুষঙ্গিক ফল মাত্র এবং শ্রীভগবচ্চরণে সেবাপ্রাপ্তিই তাহার মুখ্য ফল। এইজন্যই চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের "মুক্তিপদে" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বৈন্দ্বং তস্মিন্
সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণ-সেবায়াঞ্চেতি।

স্বামিপাদও বলিয়াছেন—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"

অর্থাৎ জাগতিক মিথ্যা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বই জীবের অন্যথারূপ, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপে অর্থাৎ নিত্য-কৃষ্ণদাস স্বরূপে অবস্থিতির নামই জীবের মুক্তি। কেবল হেয় ব্রহ্মসাযুজ্যই মুক্তিশব্দবাচ্য নহে।

নিত্যকৃষ্ণদাস চিৎস্বরূপ জীব তাহার নিত্যপ্রভু সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণের নিত্যসম্বন্ধ ভুলিয়াই মায়ার মোহে অনিত্য জড় মায়িক বস্তু—স্ত্রীপুত্রদেহগেহাদির

সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ মমতা স্থাপন করিয়াই অনন্ত সংসার দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সাধুকৃপায় শ্রীভগবচ্চরণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই সে তাহার সর্ব্বানর্থমূল অস্থানসমূহ হইতে মমতাজাল ক্রমশঃ উঠাইয়া লইয়া যথাস্থান শ্রীগোবিন্দচরণে সংস্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। তখন সে, যে ভ্রমের প্রবাহে তাহার প্রীতি নিরুপাধি-প্রেমাস্পদ শ্রীভগবচ্চরণ হইতে বিচ্যুত হইয়া বহুদূরে সংসার মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় পড়িয়া শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং তাহার সকল মমতা প্রতিলোম-ক্রমে একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই চরণেই প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবচ্চরণ ভিন্ন জীবের প্রীতির আর দ্বিতীয় স্থান নাই, শ্রীভগবচ্চরণই জীবের ঔৎপত্তিক বা স্বাভাবিক প্রীতির বস্তু, এবং এই প্রীতিলাভই মায়াবদ্ধ জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণে অনন্যমমতাযুক্ত প্রীতিই শ্রীভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ কর্তৃক প্রেমভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রেমভক্তিই পঞ্চম-পুরুষার্থ, কারণ তাহাই মুক্তির বহু উর্দ্ধে নিত্য ভগবদ্ধামে শ্রীভগবচ্চরণসেবাসুখ প্রাপ্তি করাইয়া দেন।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

ভাগ ১০।১৪।৫৫

অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের অবিদ্যাবশে মায়িক দেহের প্রতি একরূপ মমতা হইয়া থাকে যে, দেহেই সে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে—দেহের মমতা গাঢ় হইয়া অহন্তায় পরিণত হইয়া থাকে, এবং নিজে অজর অমর ও নিত্য চিদ্বস্তু হইয়াও এই অহঙ্কারাস্পদ জড় নশ্বর দেহের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি জড় ধর্ম্ম সমুদায় সে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ নষ্ট হইলে সে মনে করে আমি মরিলাম এবং আর একটী অপূর্ব্ব দেহ সংযোগ হইলেই মনে করে আমি জন্মিলাম। অনুকূল জড় বিষয়-সংযোগ হেতু তুচ্ছ দেহের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মানিয়া লয় এবং প্রতিকূল বিষয়-সংযোগ হেতু দেহের দুঃখকেও নিজের দুঃখ বলিয়া ভোগ করে। আবার দেহে অহন্তা বুদ্ধি-হেতু দেহের অনুকূল দৈহিক স্ত্রী পুত্র ধন জনাদিতে তাহার মমতা বুদ্ধি হইয়া থাকে। এই মমতাস্পদ স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি দ্বারা তাহার দেহের ভোগসাধন হয় বলিয়াই তাহারা তাহার প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের বিয়োগে সে অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার দেহ তাহার যেরূপ প্রীতির বিষয় ইহাদিগের মধ্যে কোনটিও সেরূপ নহে। স্ত্রী পুত্র স্বজনাদির দেহেই তাহার প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের দেহই তাহার প্রীতির বিষয়, তাহাদের আত্মার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ হয় না। মূঢ় ও পণ্ডিত সকল মনুষ্যই বিপদকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই বৃদ্ধের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে; অতএব মায়াবদ্ধ মনুষ্যের নিজের দেহ যেরূপ প্রিয় স্ত্রী পুত্র ধনজনাদি সেরূপ নহে।

কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্দত্ত বুদ্ধিবলে বিবেকী হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর দেহেরই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ—দেহ আমি নহি এবং আমার জন্ম মৃত্যু নাই। যে আমার বহুকাল পূর্ব্বে সুকুমার দেহ ছিল সেই আমারই তৎপরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবা-দেহ হইয়াছিল, এবং সেই আমিই এক্ষণে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত দেহ পাইয়াছি। গঙ্গাগর্ভে জলপ্রবাহ কিম্বা দীপশিখার ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল হইয়া কেবল প্রবাহরূপেই এই দেহ আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্তি পর্য্যন্তই থাকিবে, এবং প্রারব্ধক্ষয়ে ইহা নষ্ট হইলে পুনরায় অন্য

প্রারব্ধ ভোগের জন্য তদনুরূপ আর একটি অপূর্ব্ব দেহ পাইব। এই প্রত্যভিজ্ঞা মৃত্যুকালে অধিকাংশ লোকেরই লোপ হইয়া যায়, কারণ তখন মনে হয় আমি মরিতেছি, আমার সব শেষ হইয়া যাইল। কিন্তু বিবেকী ও ভক্তের এই প্রত্যভিজ্ঞা মৃত্যুকালেও নষ্ট হয় না। ভক্তের জন্ম মৃত্যু কর্ম্মনিবন্ধন নহে বলিয়া মৃত্যুকালেও তাঁহার নিত্যকৃষ্ণদাস-স্বরূপের বিস্মৃতি হয় না, এবং পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণের স্মরণ হেতু তাঁহার মৃত্যু-যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না। আসন্ন মৃত্যুকালে যখন দেহ আর থাকিবে না বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন সামান্য বিবেকবলেই বুঝিতে পারা যায় যে—দেহের প্রেমাস্পদত্ব কেবল আত্মগত মাত্র; এবং তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে দেহ আমার প্রিয় কেবল আত্মার অনুরোধে। দেহত্যাগে আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় কষ্ট হয় তাহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইয়া আত্মপ্রীতি-হেতুই লোকের মৃত্যু সময়ে দেহে অত্যধিক জীবিতাশা হইয়া থাকে, নতুবা তদবস্থায় কেবল দেহের জন্য দেহে জীবিতাশা হইতে পারে না। আত্মার প্রতিকূল হইলে আত্মহত্যা করিয়াও লোকে দেহ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মায়াবদ্ধ মনুষ্য না বুঝিলেও আত্মাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং আত্মারই অনুরোধে দেহ ও দেহের অনুরোধে স্ত্রী পুত্র ধন জনাদি সমগ্র জগৎ তাহার প্রিয় হইয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ জীবের প্রীত্যাস্পদ কেবল তাহার নিজের দেহপরিছিন্ন চিৎকণ আত্মা, এবং তাহাই তাহার নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। কেবল এই দেহপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে প্রীতিযোগ্য করিয়াছে বলিয়াই জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অজ্ঞানবশতঃ ঐ আত্মসম্বন্ধে দেহেরই উপর আত্মবুদ্ধিতে প্রীতি করিয়া থাকে, এবং দেহের অনুকূল অনন্ত জড়-পদার্থে প্রীতি সঞ্চারিত করিয়া অসীম অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেহকে আত্মা বলিয়া প্রীতি করিতে করিতে দৈহিক পদার্থ স্ত্রী-পুত্রাদিকেও আত্মার মত প্রীতি করে। কিন্তু দেহ দৈহিক সকলই অপূর্ণ ক্ষণভঙ্গুর ও জড় বলিয়া তাহার প্রীতি আশ্রয় পায় না, এবং তজ্জন্যই তাহাকে অপরিসীম দুঃখভোগ করিতে হয়। জীবের নিজের চিৎকণ আত্মার উপর যে স্বাভাবিক প্রীতি তাহার তত্ত্ব-বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সে প্রীতি কেবল আপেক্ষিক মাত্র, বিভু আত্মা—সকল আত্মার আত্মা শ্রীভগবৎসম্বন্ধেই নিজের চিৎকণ আত্মার উপর তাহার প্রীতি। জীবের আত্মার প্রীতি-বিষয়ত্ব কেবল আপেক্ষিক মাত্র, আত্যন্তিক প্রীতি-বিষয়ত্ব একমাত্র শ্রীভগবানের। শ্রীভগবান্ অখিল জীবাত্মার আত্মা—পরমাত্মা এবং একমাত্র তিনিই সকল জীবেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। তাঁহাকে ভুলিয়া কেবল দেহপরিচ্ছিন্ন নিজের আত্মাকে প্রীতিযোগ্য করাই জীবের মূল দোষ। অতএব স্ত্রীপুত্রাদিতে প্রীতি যেমন দেহের অনুরোধে এবং দেহে প্রীতি যেমন আত্মার অনুরোধে, সেইরূপ আত্মাতেও প্রীতি কেবল পরমাত্মার অনুরোধে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেই পরমাত্মাই মূর্ত্তিমান্ পূর্ণ শ্রীভগবান্, তিনিই জীবের আত্যন্তিক প্রীতির বিষয়। শ্রীভগবচ্চরণে প্রীতিই জীবের ঔৎপত্তিকী, সাহজিকী বা স্বাভাবিকী প্রীতি—সেই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তা প্রীতিই জীবের প্রীতির পরাকাষ্ঠা।

মায়াবদ্ধ জীব যেদিন পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বর কিঞ্চনশব্দ-বাচ্য দেহগেহস্ত্রীপুত্রধনজনাদি অনন্ত জড় উপাধি হইতে তাহার সমগ্র মমতাজাল নির্ম্মূলে উৎপাটিত করিয়া অকিঞ্চন-পদবী লাভপূর্ব্বক একমাত্র অপরিমিত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবচ্চরণে একনিষ্ঠমমতাসংযুক্তা প্রীতি-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে, সেইদিনই তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া সে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে; কারণ সে তাহার যে স্বাভাবিক সম্পত্তি পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণ ভুলিয়া সেই আনন্দের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য কেবল তাহার আভাস লইয়াই অনাদিকাল হইতে এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর স্বর্গনরকাদি পরিভ্রমণ করিতেছিল, সেইদিনই সে তাহা পাইয়া যাইবে এবং তাহার পাইবার তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

শ্রীভগবচ্চরণে প্রীতি মায়াবদ্ধ জীব মায়িক বিষয়প্রীতির মত ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারে না। বিষয়-প্রীতিটা জড়মায়িক বৃত্তি বিশেষ, জড় মনেরই ধর্ম্ম। তাহার জন্য মায়াবদ্ধ জীবকে সাধন করিতে হয় না। শ্রীভগবদ্বিষয়িনী প্রীতি শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তির সার, প্রেম নামে অভিহিত। এই স্বপ্রকাশ প্রেমবস্তু মায়াবদ্ধ

জীবের বহুসৌভাগ্য ও বহু সাধনের ফলেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার মনোবৃত্তিকে স্বস্বরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন। অসংখ্য মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে কেহ কোনও অনির্বচনীয় ও অনির্দ্দেশ্য সৌভাগ্যবলে ভক্তসাধুকৃপালাভ করিয়া থাকেন, এই সাধুকৃপা হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সূক্ষ্মবীজ শ্রদ্ধারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা কহে, শ্রদ্ধাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রীতির বীজস্বরূপ। কেবল শ্রদ্ধা লইয়াই বহু জীবকে হয় ত বহুজন্ম কাটাইতে হয়। আবার সৌভাগ্যবলে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই এই শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হয় এবং মায়াবদ্ধ জীব শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়। একমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধাভক্তি যাজনের দ্বারাই এই প্রেমাঙ্কুর পরিপুষ্ট হইয়া পরিপূর্ণ প্রেমরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, বিগ্রহ, লীলা ও লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভক্তিযাজন। কিন্তু এই সকলই চিদ্বস্তু, সুতরাং ইহারা কেহই মায়াবদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সাধুসঙ্গহেতুক শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি কৃপা করিয়া মায়াবদ্ধজীবের জড় ইন্দ্রিয়বর্গকে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধা সাধন ভক্তিই গোস্বামিচরণেরা চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিস্তার করিয়াছেন; তাহার এক কিংবা বহু অঙ্গ সাধনের ফলে সাধকের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার ভজনের সকল বাধাবিঘ্ন ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহার কামনাবাসনাদি সকলই হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া যায়, দেহও ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা ভজনে বাধা দেয় না, এবং স্ত্রীপুত্রশত্রুমিত্রাদি কেহই ভজনে প্রতিকূলাচরণ করে না। এমন কি, হিংস্রজন্তুও তাঁহার প্রতি হিংসা করে না, কারণ শ্রীভগবানই অন্তর্যামীরূপে সকলের প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন—"তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং"। এই অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গেসঙ্গেই সাধকের শ্রদ্ধা পরিপুষ্ট হইয়া ভজনে নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তি যথাক্রমে উদিত হইয়া থাকে। তাহার পর সাধকের হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়। ভাব প্রেমেরই পূর্ব্বাবস্থা, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণোদয় হইয়া থাকে, প্রেমের পূর্ব্বে সাধক হৃদয়ে তেমনি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবেরই গাঢ় অবস্থার নাম প্রেম। বিশুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষস্বরূপ ভাব প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশ, সাধকের হৃদয়ে তিনি উদিত হইয়া গাঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রেম বা প্রীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রেমের উদয়ে সাধকের চিত্ত শ্রীভগবানে অসীম মমতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ-তচ্চরণসেবার অত্যধিক উৎকণ্ঠায় সম্যক্ আর্দ্রীভূত হইয়া যায়।

শ্রীভগবচ্চরণে প্রীতিলাভই জীবের পরমতম পুরুষার্থ, কারণ এই প্রীতিই তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণসেবার অধিকার দিয়া থাকেন। প্রেমলাভের পূর্ব্বে সাধক শ্রীভগবানের শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহাদি প্রকাশের নিরন্তর সেবা করিয়াই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেম-লাভ হইলে সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণসেবাপ্রাপ্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষার তাড়নে তাঁহার সাধকদেহ প্রতিক্ষণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে থাকে। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় এই অবস্থায়ই বলিয়াছিলেন—

তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ॥

এই দশাপ্রাপ্ত প্রেমবান্ ভক্তের দেহধারণ সম্ভবপর নহে, তাঁহারই পরিত্রাণ বা সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্যই শ্রীভগবানকে চিন্ময় গোলোকধামের লীলা মায়িক ভূলোকে প্রকট করিতে হয়। কেবল প্রেমলাভ হইলেই সাধকের সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তির অধিকার হয় না; তাঁহার দেহ তখন পর্য্যন্ত সম্যক্ শুদ্ধ নয় বলিয়া চিন্ময় ধামে প্রবেশযোগ্যও হয় না। ভূলোকে লীলাপ্রকটকালে প্রেমিকভক্ত পূর্ব্ব হইতেই তথায় জন্মলাভ করিয়া থাকেন। ঠাকুর মহাশয়ও সেই প্রার্থনাই করিয়াছেন—

কবে বৃষভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।

লীলাস্থলীতে তিনি যোগমায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণের আনুগত্যে ও কৃপায় তাঁহার প্রেম পরিপক্ক হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও সম্যক্‌শুদ্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি সাধনসিদ্ধপার্ষদরূপে শ্রীভগবচ্চরণের নিত্য সেবাধিকার পাইয়া চিরকৃতার্থতা লাভ করেন। শ্রীভগবচ্চরণে সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তি অপেক্ষা জীবের অধিক প্রাপ্য আর কিছুই নাই। পরমানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণের সেবানন্দই আনন্দের পরাকাষ্ঠা—উৎকর্ষতার পরাবধি বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরমকারুণিক শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে শ্রীভগবচ্চরণের সংসর্গাভাবহেতুই মায়াবদ্ধ জীবের আনন্দের অভাব হইয়া থাকে, এবং এই অভাব কেবল প্রাগভাবমাত্র, ধ্বংসাভাব বা আত্যন্তিক অভাব নহে। কারণ সৌভাগ্যবশে সাধুকৃপালাভপূর্ব্বক শ্রদ্ধাদিক্রমে শ্রীভগবচ্চরণে প্রীতিলাভ হইলেই তাহার সকল অভাব দূরীভূত হইয়া যায়, এবং শ্রীভগবচ্চরণের সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তিহেতু নিখিলপরমানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়া যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ আনন্দমীমাংসা প্রকরণে মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও পিতৃলোকাদিক্রমে আনন্দের উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা দেখাইয়া প্রাজাপত্যানন্দকেই মায়িক বিষয়ভোগের আনন্দের চরমসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পরই ব্রহ্মানন্দের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করিতে শ্রুতিও সমর্থা নহেন। কিন্তু প্রেমানন্দ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধগুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখাম্বুধির পরমাণুতুল্যও হয় না—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারহেতু ভক্তের যে প্রেমানন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, তাহার তুলনায় ভক্ত ব্রহ্মানন্দকে গোষ্পদতুল্য বলিয়া মনে করেন—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

ভ-র-সিন্ধু।

আবার শ্রীভগবচ্চরণসেবানন্দের তুলনায় পার্ষদভক্তগণ প্রেমানন্দকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন, কারণ প্রেমানন্দ অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শ্রীভগবচ্চরণসেবানন্দভোগের বাধক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসারথি শ্রীদারুক চামরব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ জনিত অঙ্গস্তম্ভ সেবার বাধা দিতেছে দেখিয়া প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীও প্রেমানন্দের তিরস্কার করিয়াছেন—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ-বিলোচনা॥

ভ-র-সিন্ধু।

অর্থাৎ কমলনয়না শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু প্রেমানন্দের আবির্ভাবজনিত অশ্রুবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণসেবার বাধক হয় বলিয়া প্রেমানন্দকে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন।

এইজন্যই শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীভগবচ্চরণসেবানন্দকেই অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ-
কিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো"।

ভাগ ১০।৫১।৫৭

অকিঞ্চন ভক্তের প্রার্থ্য ভক্তি, প্রার্থ্যতর প্রেমা, এবং প্রার্থ্যতম সাক্ষাৎশ্রীভগবচ্চরণসেবা, তাহার উপরে তাঁহার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

শ্রীভগবচ্চরণসেবানন্দ যে কি বস্তু তাহা আমাদের ধারণার অতীত, শ্রীভগবান্ নিজে তাহার কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভাগ ৩।২৯।১৩

অর্থাৎ আমার ভক্তগণ কেবল আমার সেবাই চাহে, সালোক্যাদি পঞ্চবিধামুক্তি তাহাদিগকে দিলেও লইতে চাহে না।

পরমানন্দের পরাবধি এই সেবানন্দ শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণেরও নিজস্বসম্পত্তি হইলেও তাঁহাদিগের কৃপায় জীবমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে; নিত্যমুক্ত জীবের ইহাতে নিত্য অধিকার এবং নিত্যবদ্ধ জীব সাধন-

ভক্তি-যাজনে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ইহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। ইহা শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তিভূত আনন্দ হইলেও তিনি নিজেও ইহার আস্বাদন জানেন না, এবং তজ্জন্য ইহা তাঁহারও লোভনীয় বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তিনি ইহার সম্যক্ আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই অতিদুর্ল্লভ-তম বস্তু সাধকভক্ত ভজনকালেও কথঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া থাকেন; সাধকের ভজনানন্দ সেবানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ভজ্ ধাতুর অর্থই সেবা করা—"ভজ সেবায়াং"। এইজন্যই শুদ্ধভক্তের সাধনই সাধ্যবস্তু বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, জ্ঞানী ও যোগীর জড় সাধনের মত সিদ্ধাবস্থায় তাহার পরিত্যাগ হয় না। শুদ্ধভক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণ-সেবা প্রাপ্তির নিমিত্তই সাধকাবস্থায় মন্ত্রে, যন্ত্রে, ঘটে, পটে, শালগ্রামে ও প্রতিমায় শ্রীভগবানেরই সেবা করিয়া থাকেন। তিনি সেবার জন্যই সেবা করিয়া থাকেন, আর কিছুই চাহেন না—সেবাই তাঁহার প্রয়োজন, সেবাই তাঁহার একমাত্র পুরুষার্থ। সিদ্ধাবস্থায় তিনি যে সেবানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সাধকাবস্থায়ও তাহাই করেন, বিভিন্নতা কেবল পক্বাপক্ব মাত্রে। অতএব মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবদ্ভজন করিতে পারে তজ্জন্য তাহাকে চাতকের মত সাধুকৃপাবিন্দুর প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা উদ্গ্রীব হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। সাধুকৃপাকণাই মায়াবদ্ধ জীবের শ্রদ্ধাদিক্রমে এই সৌভাগ্যোদয়ের একমাত্র হেতু।

(ক্রমশঃ)

শ্যামসুন্দর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রাহা

শ্যামসুন্দর নটবর হরি
যমুনা-পুলিন-বিহারী
অধরে মুরলী রাধা রাধা বলি
বাজত মধুরে ঝঙ্কারি
শ্যাম-অঙ্গে বহে লাবণি প্লাবন,
কটিতটে শোভে সুপীত বসন,
গলে বনমালা কৌস্তুভ ভূষণ,
জগজন-মনোহারী।

শিখিপুচ্ছ শিরে দুলিছে সমীরে
শিঞ্জন-মুখর চরণ-মঞ্জীরে,
কুজিছে কোয়েলা কানন-তিমিরে
বংশীরব অনুকারী।
অরুণ নয়নে অমৃত কিরণ'
কোটী শশধর নিন্দিত বদন'
হেরি নীপমূলে মদনমোহন
উন্মাদিনী ব্রজনারী।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি মহাশয়কৃত পাঠাবলম্বনে
রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকর্ত্তৃক লিখিত

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

চতুঃশ্লোকান্তর্বর্ত্তী এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভানুসারে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ রূপাদি সমন্বিত। শ্রীভগবান্ তাহাই নিষেধ মুখে বুঝাইবার জন্য মায়ার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত"—পরমার্থভূত আমাকে ছাড়া যাহা প্রতীত হয়, অর্থাৎ আমার (শ্রীভগবানের) অনুভূতি হইলে—যাহার অনুভূতি হয় না। ইহার ভাবার্থ এই, ভগবৎস্বরূপে মায়া নাই, ভগবদ্বিগ্রহ মায়াতীত। ভগবদনুভূতি যখন মানবহৃদয়ে বিকশিত হয়, তখন মায়াতীত ভগবানের অনুভূতি থাকায় মায়ার স্ফুরণ হইতে পারে না। মায়া ভগবৎস্বরূপের বাহিরে বিদ্যমান। সুতরাং যে বস্তু আমাভিন্ন (ভগবৎস্বরূপভিন্ন) স্থলে প্রকটিত হয়, তাহাই মায়া।

আবার "ন প্রতীয়েত চাত্মনি"—যাহা আমাতে (ভগবানে) প্রতীত হয় না, অর্থাৎ ভগবানে যে বস্তুর সত্তা নাই, অথচ ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত যে বস্তু স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না।

"তদ্বিদ্যাত্মনো মায়াং"—তাদৃশবস্তুকে আমার (পরমেশ্বর-ভগবানের) মায়া বলিয়া জানিবে। উহা আমার শক্তি, ইহা দুই প্রকারে প্রকাশ পায়। একটী অবস্থার নাম জীবমায়া, আর একটীর নাম গুণমায়া।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবৎস্বরূপের মধ্যে মায়া প্রতীয়মান হয় না, এস্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ভগবানে যেরূপ মায়া প্রতীত হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধজীবেও মায়া প্রতীত হয় না। অথচ শুধু ভগবানেই মায়া প্রতীত হয় না, একথা এইশ্লোকে বলা হইল কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ যেমন চিদ্রূপ শুদ্ধজীবও তদ্রূপ চিন্ময়। ভগবান্ পুঞ্জীভূত জ্যোতির্ম্মণ্ডল, আর তাহার ক্ষুদ্র কিরণ হইয়াছে শুদ্ধজীব। সুতরাং শুদ্ধজীব ভগবানের অন্তর্ভুক্ত। এইপ্রকার শুদ্ধজীব ভগবানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পৃথক্‌ভাবে এই শ্লোকে শুদ্ধজীবেরও যে মায়া প্রতীত হয় না, তাহা বলা হয় নাই।

মায়া যে দুই প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্লোকস্থ দুই প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়ায় সূচিত হইয়াছে। মায়ার দ্বিবিধ প্রকাশের মধ্যে জীবমায়ারূপ প্রথমাংশ এখন ব্যাখ্যাত হইতেছে। উক্ত জীবমায়া যে ভগবৎস্বরূপের বাহিঃস্থলে বিদ্যমান্ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত হইবে। এই ভগবৎস্বরূপের বাহিঃস্থলে যে উক্ত মায়া থাকিতে পারে তাহা যে অসম্ভব নহে, তাহাও অভিব্যক্ত হইবে।

"যথা ভাসঃ—যেমন আভাস, তদ্রূপ জীবমায়া। অর্থাৎ জ্যোতিষ্মান্‌বস্তুর নিজের অবস্থানদেশ হইতে দূরবর্ত্তিস্থলে জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্বেরই নাম আভাস। যেমন সূর্য্যগগনমণ্ডলবর্ত্তী, তাহার যদি দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, উক্ত প্রতিবিম্বকে আভাস বলা যাইতে পারে। সেই আভাস যেমন সূর্য্য হইতে বহির্দ্দেশে বিকাশ প্রাপ্ত, কিন্তু সূর্য্য না থাকিলে তাহার থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ জীবমায়াও ভগবৎস্বরূপ হইতে বহির্দ্দেশে অবস্থিত। অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ রাজ্যের বহির্দ্দেশ, বহির্ম্মুখ জীবের উপরেই তাহার প্রভাব, ভগবৎস্বরূপে নহে। অথচ উক্ত মায়া ভগবানেরই শক্তিবিশেষ। ভগবান্ না থাকিলে উক্ত মায়ার সত্তাই থাকিতে পারে না। প্রতিবিম্ব এবং আভাস একার্থবাচক শব্দ। আভাস যে যে অবস্থা দেখায়, জীবমায়াতেও তদ্রূপ অবস্থা দেখা যায় বলিয়া জীবমায়া আভাস শব্দে উক্ত হয়। "যথা ভাসঃ" এই কথায় ইহা ধ্বনিত

হইল। সেই জন্য জীবমায়ার কার্য্যগুলিকে আভাস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" এই শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে জীবমায়ার কার্য্যকে আভাস শব্দে উক্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি গুণমায়া কিরূপ তাহাই দেখান যাইতেছে। সেই পূর্ব্বকথিত প্রতিবিম্ব যদি কোনও স্থলে অত্যুৎকট হয়, তখন স্বীয় চাক্‌চিক্যময় তেজোরাশিতে যাহার দৃষ্টি পতিত হয় তাহাদের নেত্রের দৃষ্টিশক্তিকে অপহরণ করে এবং দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করিয়া স্বীয় অত্যুৎকট তেজঃ জন্যই দর্শক ব্যক্তিগণের নেত্রকে বিমুগ্ধ করিয়া নিজসমীপে নীলপীতাদি নানাবর্ণের উপপাদন করে।

সেই বর্ণসমূহ কখনও কখনও নানা প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। সেই রকম জীবমায়া জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া তাহার সম্মুখে সত্ত্বরজঃ ও তমোময়ী গুণমায়াকে আবির্ভূত করে। এবং কখনও কখনও পৃথক্‌ভূত সত্ত্বরজঃ এবং তমকে নানা আকারে পরিণত করে। অর্থাৎ পূর্ব্বে কথিত দর্পণে প্রতিবিম্বিত যে সূর্য্য, যাহাকে আভাস বলা হইয়াছে, তার একটা উৎকটতেজঃ অনেক সময় দর্শকের চোখে পড়িতে দেখা যায়, ঐ তেজে চক্ষু ঝলসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবর্ণ এবং নানারকম পরিণতিও দেখা যায়। ইহা বস্তুতঃ সূর্য্যের প্রতিবিম্বের একটা অবস্থাবিশেষ, তদ্রূপ জীবমায়াও জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, এবং জীবের জ্ঞানের উপরে সত্ত্বরজ এবং তমের অজ্ঞান উপন্যস্ত করিয়া দেয়, এবং এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করে। উক্ত জীবমায়াপ্রসূত সত্ত্বরজ এবং তমের আবির্ভাবময়ী অবস্থাকেই গুণমায়া বলা হয়। শাস্ত্রে মায়ার ঐ দুই অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, দুই একটী প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইল।

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ॥

এক দেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোতি যে প্রকার বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পরতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে মায়া এবং এই অখিল জগৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইস্থলে ব্রহ্ম হইতে মায়া শব্দে জীবমায়া, এবং অখিল জগৎশব্দে গুণমায়া যে অভিব্যক্ত তাহাই কথিত হইল।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও উক্ত আছে—

জগদ্‌যোনেরনীহস্য চিদানন্দৈকরূপিনঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতি র্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিল মনিত্যং নাটকাকৃতিং॥

জগৎস্রষ্টা অনীহ চিদানন্দময় ভগবানের, সূর্য্যের প্রতিবিম্বতুল্য একটা প্রকৃতি আছে। সে নিত্যা। সে সে চৈতন্যহীনা হইলেও পরমাত্মার চৈতন্যসংযোগে নাটকপ্রহেলিকাময় এই অনিত্য অখিল বিশ্বকে রচনা করিয়াছে।

এস্থলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই প্রকার প্রকাশ হইয়া পড়িল যে জীবমায়াটী নিমিত্ত এবং গুণমায়াটী জগতের পক্ষে উপাদান কারণ, ইহা পরেও বিবেনা করা যাইবে।

সেই গুণমায়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কথা জন্যই বলা হইয়াছে।

"যথা তমঃ"—যে প্রকার তমঃ, সে প্রকার গুণমায়া। অর্থাৎ এস্থলে তমশব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্বের নীলপীতাদি বর্ণই উল্লেখিত হইয়াছে। যেহেতু দর্পণে পতিত সূর্য্যের রশ্মি চোখে লাগিলে তাহা প্রায় অন্ধকারময়ই দেখা যায়। অতএব উক্ত নানাবিধ বর্ণকেও তমঃশব্দের দ্বারাই লক্ষিত করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিবিম্বের জ্যোতিঃপুঞ্জ যে প্রকার মূল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সূর্য্যে বস্তুতঃ নাই, কিন্তু উক্ত জ্যোতিঃগুলি সূর্য্যে না থাকিলেও সূর্য্য ব্যতীত উক্ত জ্যোতিঃসমূহের সত্তা থাকিতে পারে না। তদ্রূপ বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপে সত্ত্বরজ এবং তমঃ নাই। সত্ত্ব রজঃ তমঃ ভগবানে না থাকিলেও শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত উক্ত তত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ যে মায়ার অবস্থা বিশেষ তাহা থাকিতে পারে না।

কিম্বা "যথা ভাসঃ" "যথা তমঃ" এই দুইটী দৃষ্টান্ত শুধু মায়াস্বরূপকে নিরূপণ করিবার জন্যই পৃথক্ উপন্যস্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আভাস দৃষ্টান্তটী পূর্ব্বে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এপক্ষেও তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর মায়াকে বুঝাইবার জন্য যে তমঃশব্দ দৃষ্টান্তরূপে

প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এরূপ হইবে,—অন্ধকার যেমন জ্যোতির্ম্ময়পদার্থভিন্ন অন্যস্থলে প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ অন্ধকার জ্যোতিঃপদার্থ বিনাও প্রতীত হয় না।

যেহেতু জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ চক্ষুদ্বারাই অন্ধকার বোধগম্য হয়, পৃষ্ঠ কিম্বা হাত প্রভৃতি দ্বারা অন্ধকারের প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ মায়া ভগবৎস্বরূপের ব্যতিরিক্ত স্থলেও প্রকাশ পায়, কিন্তু ভগবান্ আছেন বলিয়াই মায়ার প্রতীতি হয়, নচেৎ মায়ার প্রতীতি কিছুতেই হইত না। আলোক বিদ্যমান থাকায় যেমন অন্ধকার বলিয়া একটী পদার্থ মানুষের বোধগম্য হয়, তদ্রূপ চিন্ময় ভগবান্ আছেন বলিয়াই জড়পদার্থ মায়া গৃহীত হইয়া থাকে। তাই এই প্রকার ব্যাখ্যায় মায়ার জীবমায়া এবং গুণমায়া এই অংশদ্বয় "যথাভাসঃ" "যথাতমঃ" এই দুই প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা সূচিত হয় নাই, কিন্তু উক্ত দুইটী অবস্থা মায়ার প্রবৃত্তিবশতঃ স্বয়ংই গৃহীত হইয়া থাকে।

মায়ার পূর্ব্বোক্ত জীবমায়া অবস্থাটী কোন কোন স্থলে আভাসবাচক ছায়া শব্দদ্বারা উল্লেখিত হয়, আর গুণমায়া অবস্থাটী তমঃশব্দ দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। যথা—

"সসর্জ্জচ্ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ"

এই শ্লোকে জীবমায়া আভাস শব্দের সমান অর্থবাচক ছায়া শব্দে কথিত হইয়াছে।

"ক্বাহং তমো মহদহম্"

এস্থলে গুণমায়া তমঃ শব্দে উল্লেখিত হইয়াছে। নিজের মধ্যে অবিদ্যাখ্য নিমিত্তশক্তি আছে বলিয়া আভাস মায়া জীববিষয়ক। অতএব শাস্ত্রে তাহা জীবমায়া বলিয়া কথিত। আর স্বীয় সত্ত্বরজস্তমোময় মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উপাদান বলিয়া তমঃ শব্দে উল্লেখিত মায়াংশ গুণমায়া বলিয়া কথিত।

"সসর্জ্জচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ" এই শ্লোকে ব্রহ্মা ছায়াশক্তি মায়াকে অর্থাৎ জীবমায়াকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির আরম্ভে নিজেই অবিদ্যাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ একাদশে যে বলিয়াছেন, বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুইটী আমার মায়াকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত, ইহার সঙ্গতি থাকে না। অতএব ব্রহ্মা ছায়াশক্তির দ্বারাই যে অবিদ্যা প্রাদুর্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে।

তন্মধ্যে জীবমায়ার কথা পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদীয় কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে দেবগণের স্তুতিতে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইতি স্তুবত্সু দেবা স্তেজোমণ্ডল সংস্থিতং।
দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং ॥
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবু র্ব্যোমচারিণীং।
অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিদিবৈ গুণৈঃ ॥

দেবগণ এই প্রকার স্তব করিলেন, তারপর সহসা দিগন্তব্যাপি তেজোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী এক জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন। দেবগণ ঐ জ্যোতির মধ্য হইতে আকাশবাণী শুনিলেন যে আমিই সত্ত্ব, রজ, তম গুণদ্বারা তিন প্রকারে বিভিন্ন হইয়া বিদ্যমান।

আর গুণমায়ার কথা পদ্মোত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে।

"অসংখ্যং প্রাকৃতস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ম্"।

অর্থাৎ সেই প্রাকৃতিক জগৎ অসংখ্য তাহা নিবিড় অন্ধকার তুল্য এবং তাহা সীমাহীন।

"বিদ্যা" এই পদটী প্রথম পুরুষ প্রয়োগ হওয়ায় এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিতেছে যে, ভগবান্ যেন ব্রহ্মাকে বলিতেছেন এই যে উপদেশগুলি করিতেছি, ইহা অন্যের প্রতিই করিতেছি, তুমি তো আমার শক্তিবশতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই সকল অনুভব করিতেছ। এবং মায়িকদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়াই রূপাদি বিশিষ্ট আমাকে অনুভব করিতে হয়। অর্থাৎ যেহেতু আমাতে (ভগবানে) মায়িক সত্তা নাই। অতএব আমাকে মায়াহীন দৃষ্টিতে অনুভব করিতে হইবে। মায়িক দৃষ্টি ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে নিষেধ মুখে স্বীয় উপদেশ করিতেছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে শাস্ত্রে ত ভগবানের রূপাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ ভগবানের স্বরূপ অনুভব হয় না কেন?

তদুত্তরে বলিতেছেন, যে মায়াকার্য্য দেহগেহ প্রভৃতিতে আবেশ থাকায়ই ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হয় না। সুতরাং ভগবৎস্বরূপ অনুভব করিবার জন্য মায়া এবং মায়িক বস্তু ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আরও, ভগবদনুভূতি এবং বিষয়বিস্মৃতি ভগবৎপ্রেম না থাকিলে হয় না। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রেমও অনুভব করাইয়াছিলেন, ইহা সূচিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু মাহাত্ম্য।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ

ইতি-পূর্ব্বে শ্রীগুরু নামক প্রবন্ধে আমরা আত্মপবিত্রতা-লাভের জন্য শ্রীগুরুচরণের মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই শ্রীগুরুচরণের সেবা সম্বন্ধে আমাদের সম্প্রাদায়াচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ গ্রন্থে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি বলেন "অস্মাদেনাদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে"। শ্রীগুরুচরণের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। অতএব শ্রীগুরুচরণসেবায় অন্য কোন ভজনেরই অপেক্ষা নাই। এই বাক্যটীকে আমরা কিছু পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব। তবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। আমাদের শ্রীশ্যামসুন্দরের পাঠক ও পাঠিকা সকলেই উতঙ্ক ও উদ্দালক নামে দুইজন ঋষির চরিত্র জানেন। তাঁহারা দুই জনে শ্রীগুরুদেবের গার্হস্থ্য কর্ম্মের আনুকূল্য বিধান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদেই চারিবেদ ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া ছিলেন। যেহেতু শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এস্থলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সখা শ্রীদাম বিপ্রের নিকট শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আস্বাদন করিব। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে জীবকে কৃতার্থ করেন, আবার তিনিই নিজ শ্রীমুখে সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এই প্রসঙ্গটী পরম মধুর।

শ্রীদাম বিপ্রকে বলিতেছেন "হে সখে। জ্ঞানপ্রদ-গুরুরূপে বিদ্যমান আমাকে আশ্রয় করিয়া মানবগণ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। যাঁহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে না পারেন, অথবা শ্রীগুরুর উপদেশবাক্যে যাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তাহারা অতিশয় পাপীয়ান। শ্রীগুরুসেবাও শ্রীগুরুকৃপা ভিন্ন সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুকৃপাই সকল ভজনের মূল সম্পত্তি। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া বিগলিত হৃদয়ে অশ্রুজলে বক্ষঃ না ভাসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে শ্রীমন্ত্র শ্রীনাম তার প্রতি প্রসন্ন হন নাই, এবং গুরু-র অপরাধে তার হৃদয় শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণ তুল্য হইয়া আছে। আমি গৃহস্থধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কিম্বা সন্ন্যাসধর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেও তেমন সন্তোষ লাভ করিনা, যেমন গুরুদেবের সেবাতে লাভ করিয়া থাকি।

> নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
> তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজের গুরুগৃহবাসের কথা বলিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদের সামর্থ্য দেখাইতেছেন—"হে সখে! যখন তুমি আমি ও দাদা শ্রীবলদেব চন্দ্র গুরুগৃহে বাস করিতেছিলাম, সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। একদিন শ্রীগুরুদেব কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীগুরুপত্নী আমাদিগকে বলিলেন "বৎসগণ! গৃহে একখানিও কাষ্ঠ নাই, কিরূপে রন্ধন করিয়া তোমাদিগকে ভোজন করাইব। কাষ্ঠ না আনিলে আজ আর পাক করা হইবে না।" তাঁহার এই আদেশ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অতি উল্লাস ভরে আমরা এই যুক্তি করিলাম যে, আজ একটী বৃহৎ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া এত অধিক কাষ্ঠ আনিব যে তাহাতে বহু দিন পর্য্যন্ত পাক হইতে পারে। এইরূপ সংকল্প করিয়া আমরা একটী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচুরতর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলাম, এবং প্রত্যেকে পৃথক পৃথক বোঝা বাঁধিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হইল সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড় শিলাবর্ষণ ঘন ঘন বজ্রপাত ও মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল। আমরা তিন জনে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। কিছুকাল পরে আমরা বৃক্ষের উপর হইতে

নীচের দিকে তাকাইয়া দেখি যে, চারিদিক জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, উচ্চ নীচু কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তখনও প্রবলতর জলবর্ষণ ও ঝড় প্রবাহিত হইতে ছিল। ইহাতে যদিও আমরা অতিশয় পীড়িত হইতে ছিলাম, তথাপি জলের প্রবাহে কাষ্ঠের বোঝা ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিলাম। এবং একস্থানে মিলিত হইয়া যুক্তি করিলাম যে বহুকষ্টে কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়াছি। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ শ্রীগুরু-সেবার বস্তু পরিত্যাগ করিবনা। এইভাবে সংকল্প করিয়া কাষ্ঠের বোঝা মাথায় লইয়া আমরা সমস্ত রাত্রি জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এদিকে আমাদের শ্রীগুরুদেব সান্দীপনি মুনি গৃহে আসিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিলেন এবং ঝড় বৃষ্টিতে বনের মধ্যে আমরা কত কষ্ট পাইতেছি এই ভাবিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারও দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। সূর্য্যোদয় হইবার বহুপূর্ব্বে অরুণোদয় কালেই তিনি আমাদের অন্বেষণের জন্য বাহির হইয়া বনের মধ্যে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে ঐ অবস্থায় ঝড়ের মধ্যে আমাদিগকে কাতর দেখিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন আমাদের শ্রীগুরুদেব কাতর কণ্ঠে স্নেহার্দ্রস্বরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াই আমাদের সকল দুঃখ বেদনা বিদূরিত হইয়া গেল। সেই স্নেহের ভাষাগুলি এখনও আমার হৃদয়ে জাগরুক আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ পাইলে। আত্মাই প্রাণিমাত্রের অতিশয় প্রিয়তম। আমাদের সেবাকার্য্যের জন্য তোমরা সেই আত্মাকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছ। বৎসগণ! আমি তোমাদের সেবায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হউক। সমুদয় বেদ ও তাহার রহস্য তোমাদের হৃদয়ে ইহজন্মে ও পরজন্মে নবাদীপ্তের মত প্রকাশিত হউক।" ভাই সখে! শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না। তাঁহার কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা মূলবিষয়ের আলোচনা করিব। অনেক স্থলে এমন অবস্থা হয় যে—শ্রীগুরুদেব এপ্রকার আদেশ করেন, যে তাহা শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ এমন কি তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইলে ভক্তির মর্য্যাদাও রক্ষা হয়না। সেইসমস্ত গুরু সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। যে হেতু তাঁহারা প্রথমতঃ ত্যক্তশাস্ত্র গুরু। অর্থাৎ শাস্ত্র তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুপদবাচ্যই হইতে পারেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলেন,—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অতএব "দূরত এব আরাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ।

* * *

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

ইতি স্মরণাৎ; তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণব-তয়া,

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

ইত্যাদিবচন বিষয়ত্বাৎ যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়ান্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ম্। (ভক্তিসন্দর্ভঃ)

যে গুরু অন্যায় আদেশ করেন এবং যে শিষ্য তাহা পালন করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নিরয়গামী হয়েন। অতএব সে-জাতীয় গুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবা না করিয়া দূর হইতেই প্রণাম বন্দনা প্রভৃতি করাই কর্ত্তব্য। পাপানুষ্ঠানে রত, কার্য্য অকার্য্য বিবেক শূন্য অথবা অসৎ-পথাবলম্বী গুরুদেবকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যে হেতু তাঁহার যে ভাব তাহা বৈষ্ণবভাবিরুদ্ধ। অতএব অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকগামী হইতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রবাক্যেও পূর্ব্বোক্ত গুরুকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থাই দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী পাদের হৃদয়ের ভাব এইরূপ যে, যদি কাহারও দুর্ভাগ্যবশতঃ শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের চরণে আশ্রয় লাভ না হয়, তবে সেই জাতীয় কোন মহাভাগবতের নিত্য সেবা করাই পরম মঙ্গলজনক।

এইস্থলে বুঝিবার বিষয় ইহাই যে,—যদি অবৈষ্ণব গুরু হইতে অশাস্ত্রীয় বা স্বসম্প্রদায়বহির্ভূত মন্ত্রলাভ হয়, তবে সেই মন্ত্র অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। এবং পুনরায় স্বসম্প্রদায়ী কোন সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি যথোক্তলক্ষণ মন্ত্র লাভ হয়, অথচ গুরুদেবের আচরণ শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ দেখা যায়, তবে সেস্থলে আর দ্বিতীয়বার মন্ত্র গ্রহণের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই গুরুদেবকে দূর হইতে প্রণাম বন্দনাদি করিতে হইবে এবং কোন মহাভাগবতের চরণাশ্রয়ে ভজনাদি শিক্ষা করিতে হইবে। আর সর্ব্বদাই ইহা চিন্তা করিতে হইবে যে, "আমি বড়ই হতভাগ্য। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ হইয়াও আমার সম্মুখে এই প্রকার বিরুদ্ধ আচরণের অভিনয় করিতেছেন। অথবা আমি শ্রীচরণে কতদূর দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব এজাতীয় আচরণ করিতেছেন। আমার কবে এমন সৌভাগ্য হইবে, কবে আমি শ্রীগুরুচরণের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। কবে আমার এই পাপচক্ষু, পাপবুদ্ধি ও পাপদেহ শ্রীগুরু চরণ কৃপাতেই সংশোধিত হইবে। "এইভাবে সর্ব্বদাই ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে হইবে, এবং হৃদয়কে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ নিস্তার নাই। বিন্দুমাত্র অবজ্ঞাবুদ্ধিতে তীব্র নরকযন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিলাভ ত বহুদূরের কথা।

শ্রীগুরুচরণের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়াছি যে "তস্মাদন্যদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণসেবায় আর অন্য ভগবৎ-ভজনের অপেক্ষা নাই। কিন্তু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তির অন্য অঙ্গ অবজ্ঞা করিলে আবার উভয়তঃ বিপদ। যে হেতু শাস্ত্রে আছে শ্রীভগবন্নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ-গ্রহণের মাহাত্ম্য সহস্র সহস্র শ্রীএকাদশী ব্রত হইতেও অধিক। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীএকাদশীব্রতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে যেমন নিরয়যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, সেইপ্রকার একাঙ্গ-ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়া অন্য অঙ্গের অবজ্ঞা করা মহা অপরাধজনক। যে হেতু একাঙ্গভজনের মর্য্যাদা করিতে গিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্য অঙ্গের অমর্য্যাদা করা হয়। ইহাতে দাম্ভিকতা ও নাস্তিকতাই প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ বেদাদিশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিও উৎপাত জনক। যথা—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

আর একদিকে ইহাতে শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করাজন্য বরং অপরাধই উপস্থিত হয়। যেহেতু

"গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং"

এই বাক্যে শ্রীল রূপগোস্বামি পাদ চৌষট্টি প্রকার ভক্তি-অঙ্গের বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—প্রথমতঃ শ্রীগুরু-চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক দীক্ষা ও শিক্ষাদি গ্রহণ করিতে হয়। এই নিয়ম অনুসারে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের পর তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আদেশ দিতেছেন, আর আমি উৎকট গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁর আদেশ অবহেলা করিয়া বলিলাম, "আমার শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রয়োজন নাই।" ইহাতে পতন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ "সেবা হইতে আজ্ঞা বলবান্" এই রীতি অনুসারেও আজ্ঞা পালনই মঙ্গলজনক। আর যদি কোন গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ না দিয়া, নিজের সেবাকেই শিষ্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া আদেশ করেন, তবে সেই গুরুকে ত শাস্ত্র প্রথমেই বর্জ্জন করিবার আদেশ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি অবৈষ্ণব। তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রীগুরুসেবায় মাহাত্ম্যব্যঞ্জক বাক্যটির তাৎপর্য্য ইহাই যে—সাধককে সর্ব্বদাই ভাবিতে হইবে, "শ্রীগুরুদেবের আদেশেই আমি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেছি। কিন্তু আমার এই সাধনার সিদ্ধি কেবল মাত্র তাঁহার শ্রীচরণসেবাতেই লাভ হইবে। আমার নিজের সামর্থ্যে কিছুই হইবার নহে। তিনি যেমন নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপে আবার পরম অযোগ্য আমার সেবাভাস দর্শন করিয়া নিজগুণে পরম সন্তোষলাভ করতঃ আমাকে ভবিষ্যতে শ্রীরাধামাধব যুগলচরণ সেবার অধিকার প্রদান করিবেন"—ইহাই ভাবিতে হইবে।

শ্রীগুরুচরণের মাহাত্ম্য অনন্ত অপার। ক্ষুদ্র অসমর্থ আমি আর কত বর্ণন করিব। তথাপি কৃতার্থতা লাভের জন্য একাংশ স্পর্শ করিলাম মাত্র। আগামী সংখ্যায় শ্রীগুরুর বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার আশা রহিল।

ব্রহ্মহরিদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীকানাইলাল পাল এম্, এ, বি, এল্)

শ্রীনামের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীহরিদাস প্রত্যহ তিনলক্ষ শ্রীনাম গ্রহণ করিতেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত বেশী ফলপ্রসূ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ আচরণ দ্বারা যখন জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁর ভক্তগণ বা পার্ষদগণ ও তাহাই করিয়াছেন। পিত্তদুষ্ট রসনা হইলে মিছরিও তিক্ত লাগে; সুতরাং শ্রীনাম যে অবিদ্যাদুষ্ট জনের নিকট অরুচিকর হইবে বা শ্রীনামগ্রহণকারী যে দ্বেষের বিষয় হইবে সেটী কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। শ্রীহরিদাসের শ্রীনাম আস্বাদনে সাধু-সজ্জনগণ যখন আনন্দিত হইতে লাগিলেন, অসাধু-অসজ্জনগণও আবার ঐ আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া তাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে সংবাদ ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে প্রধান ঘটনাটী ঘটিয়াছিল, সেই কথা আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

বেনাপোলে থাকিতে শ্রীহরিদাস তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন এবং সাধুসজ্জনগণ আকৃষ্ট হইয়া সেই নাম-যজ্ঞে যোগদান করিতেন। আগুন যেমন ছাইচাপা থাকে না তেমনি শ্রীনামের প্রভাবও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরিদাসের প্রভাব প্রচার হইয়া পড়িল। শুধু তাই নয় সাধুসজ্জন সকলেই শ্রীহরিদাসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদ্বেষী সেই দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খাঁ নিজ অপরাধ ও দুষ্কৃতি বশতঃ শ্রীহরিদাসের মহিমা সহ্য করিতে পারিলেন না তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া ও কোনরূপ দোষ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে এক অভিসন্ধি করিলেন।—কতকগুলি বেশ্যাকে আনিয়া রামচন্দ্র খাঁন শ্রীহরিদাসকে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে শ্রীহরিদাসের প্রভাব অবগত ছিল; সুতরাং তাহারা এরূপ অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইল না। তন্মধ্যে কোনও সুন্দরী যুবতী—জানিনা কোন ভাগ্যোদয়ে শ্রীহরিদাসের নিকট যাইতে ও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে স্বীকৃত হইল। ভাগ্যোদয় শুনিয়া হয়ত কোনও পাঠক চমকিয়া উঠিবেন; কিন্তু ভাগ্যোদয় বিনা সাধু সঙ্গ হয় না; এবং সেই বেশ্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা শুনিলে এটী বিশেষ ভাগ্যোদয় ভিন্ন কিছু বলা যাইতে পারে না।

শ্রীভগবৎসঙ্গ যে কোন উপায়েই হউক না কেন যেমন মুক্তিদায়ক বা ভক্তিদায়ক, সাধুসঙ্গও তেমনি যে রূপেই হউক্ না কেন তাহারই সোপান। লৌহ অগ্নির মধ্যে থাকিলে যেমন অগ্নির গুণ প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে ভক্ত ও অনবরত শ্রীভগবান কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায়—ভক্তহৃদয় ও শ্রীভগবান্ একপ্রকার এক হইয়া যাওয়ায় "ভক্তানাং হৃদয়ন্ত্বহম্"—

শ্রীভগবানের গুণও ভক্তে সঞ্চারিত হওয়ায় এটী কোন আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। থাক্ সে কথা, সেই সুন্দরী যুবতী নিজ অঙ্গ সুন্দররূপে উজ্জ্বল করিয়া নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া শ্রীহরিদাসের গোঁফার দিকে গভীর রাত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীহরিদাস নির্জ্জনে সেই বেনাপোলের বনের মধ্যে একাকী গুহার মধ্যে নামানন্দে বিভোর। নাম যে নামী হইতে অভিন্ন তার শ্রীনাম গ্রহণেই যেন সেটী সুব্যক্ত হইতেছিল। তিনি শ্রীনামকে আস্বাদন করিতেছেন কি সাক্ষাৎ নামীকে আস্বাদন করিতেছেন সে বিষয়ে নিশ্চয় করা সুকঠিন। নামীকে আস্বাদন করিয়াও বুঝি এত আনন্দ হয় না। কোন ভক্ত বলিয়াছেন "নামীর চেয়ে নাম বড় নামের বড় নাইরে"—সত্যই যেন তাহাই প্রত্যক্ষ হইতেছিল। ভক্ত প্রবর শ্রীহনুমানজী শ্রীরামনাম গ্রহণে সাগর লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল। তাই শ্রীহরিদাসের আনন্দের তুলনা দিবার

কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই আনন্দে বিভোর শ্রীহরিদাসকে দূর হইতে দেখিয়াই সেই সুন্দরী যুবতীর হৃদয়ের মধ্যে কি একটা বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ" শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব সম্বন্ধে এই লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিদাস হেন উত্তম ভক্তের দর্শনে সেই সুন্দরী যুবতীর হৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপিত হইল। ভক্তিদেবী যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা—কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। তাই সেই সুন্দরী যুবতী দ্বারে শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া শ্রীহরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকেও প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন। এবং নিজের অঙ্গের বসনাদি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করিয়া অতি মধুরস্বরে শ্রীহরিদাসকে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর তোমার মত রূপবান্ পৃথিবীতে দুর্লভ; তার উপরে তোমার প্রথম যৌবন এমন কোন রূপবতী যুবতী আছে যে না তোমাকে পাইতে চায়! সুতরাং কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার কর—তোমাকে না পাইলে আমার জীবন ধারণ অসম্ভব হইবে। দেখ ঠাকুর এখন গভীর রাত্রি জনপ্রাণী কেহ জাগত নাই; তার উপর এটী নির্জ্জন বন, কোন জনপ্রাণীর এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই। আমাকে অঙ্গীকার করিলে কেহ কিছুই জানিতে পারিবে না তোমার জপের হানি হইবে না। আর যদি আমাকে অঙ্গীকার না কর তোমার সম্মুখেই দেহত্যাগ করিব তুমি কলঙ্কের ভাগী হইবে শুধু স্ত্রীবধের ভাগী হইবে না তোমার অপযশ চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত হইবে।

জীব সাধারণতঃ রূপে আকৃষ্ট হয়; জীব যে স্থূলকেই দেখে, তাই সাধারণতঃ স্থূলরূপে আনন্দের অন্বেষণ করে। কিন্তু জীব যত উন্নত হয় যত তার অজ্ঞান আবরণ উন্মুক্ত হয় তত সে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়। ও পরিশেষে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যই যে একমাত্র আনন্দের বস্তু তাহা বুঝিতে পারে। সেই সুন্দরী যুবতী শ্রীহরিদাসের বাহ্যরূপ দেখিয়াই প্রথম ভুলিয়াছিল তাই সেইরূপের আকাঙ্খার অনেক কিছু নিবেদন করিলেন। তখন অহৈতুকী কৃপাময় শ্রীহরিদাস মৃদুস্বরে তাকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং জানাইলেন তিনি একটী ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এক মাসে এককোটী শ্রীনাম গ্রহণে তিনি ব্রতী আছেন। যাহাতে তাঁহার ব্রতভঙ্গ না হয় সেইজন্য কাতর ভাবে সেই সুন্দরীর নিকট ভিক্ষা জানাইলেন ও ব্রত অন্তে তাহাকে অঙ্গীকার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। এবং নাম সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধুর কৃপা অহৈতুকী। কোন্ ভাগ্যোদয়ে সেই সুন্দরী শ্রীহরিদাসের কৃপালাভে সমর্থ হন কে জানে! তবে তিনি যে তাকে অঙ্গীকার করিবেন আশ্বাস দিলেন, সেটী মহৎ কৃপা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। সারারাত্রি শ্রীহরিদাসের মুখে শ্রীনাম শ্রবণ করিয়া রজনীশেষে সেই সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আর সংখ্যা পুরণের বিলম্ব কত? রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিল; যদি আজি সংখ্যা পুরণ না হয়—স্বীকার-কর—কাল আমাকে অঙ্গীকার করিবে আমি আজ ফিরিয়া যাইব"। শ্রীমান্ হরিদাস বলিলেন "পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আজ সংখ্যা পূর্ণ হইল না; ব্রত পূর্ণ হইলে তোমাকে অঙ্গীকার করিব—আমাকে অবিশ্বাস করিও না।" সাধুর বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই বুঝিয়া সেই সুন্দরী যুবতী ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্র খাঁকে সব কথা জানাইল এবং পরদিন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সেই সুন্দরী যুবতী রামচন্দ্র খাঁকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—"যদি একদিনে সম্ভব না হয় তিনদিনে অবশ্যই শ্রীহরিদাসের চিত্ত হরণ করিব" এবং প্রথম রাত্রেই রামচন্দ্র খাঁ তাহার সহিত পাইক পাঠাইতে মনস্থ করিলে নিবৃত্ত করিয়াছিল কারণ সুন্দরী ভাবিয়াছিল—একবার চিত্ত হরণ করিতে পারিলে তাহাকে ধরিয়া আনা সহজ হইবে। তাই প্রথম রাত্রে শ্রীহরিদাস সংখ্যা পূরণান্তর তাহাকে অঙ্গীকার করিবেন প্রকাশ করায় সেই সুন্দরী সমুল্লাসিত চিত্তে দ্বিতীয় রাত্রে আবার তাঁর নির্জ্জন গোফায় একাকী প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বরাত্রের মত শ্রীতুলসীকে ও শ্রীহরিদাসকে প্রণাম করিয়া শ্রীহরিদাসের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্ব রাত্রের মত তন্ময় হইয়া শ্রীহরিদাস নামে মাতোয়ারা ছিলেন; সেই অবস্থায় শ্রীহরিদাসের তার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় যেন কত অপরাধীর মত বলিতে লাগিলেন—গতরাত্রে তোমায় অনেক দুঃখ দিয়াছি; সারারাত্রি আমার কথামত

তুমি বসিয়াছিলে কিন্তু আমার ব্রত পূর্ণ না হওয়ায় তোমাকে অঙ্গীকার করিতে পারি নাই আমার সে অপরাধ লইও না। আজি খুব সম্ভব নামসংখ্যা পূর্ণ হইবে; নামসংখ্যা পূর্ণ হইলে অবশ্য তোমায় অঙ্গীকার করিব সুতরাং তাবৎকাল তুমি নাম শ্রবণ কর।"

সাধুর কৃপা কোন দিয়া বহে কে বলিতে পারে? সাধু-মুখে শ্রীনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সেই সুন্দরীও "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন। প্রথম সোপান শ্রবণ, দ্বিতীয় কীর্ত্তন,—ভজনের এই ২টী অঙ্গ শ্রীহরিদাস দুই রাত্রে সেই সুন্দরীর যাজন ঘটাইলেন। মানুষ সংস্কারের দাস সুতরাং সংস্কারবলে সেই সুন্দরী রাত্রি প্রায় শেষ হইল দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাব সেই ভাব দেখিয়া শ্রীহরিদাস বলিলেন—"একমাসে কোটী নাম গ্রহণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছি আজ ব্রত পূর্ণ হইবে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু আজিও সংখ্যা পূর্ণ হইল না কালি নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে তখন অবশ্য তোমাকে অঙ্গীকার করিব; তোমাকে সারারাত্র জাগাইয়া বসাইয়া রাখিলাম সেজন্য কোন অপরাধ লইও না।

সেই সুন্দরী প্রভাতে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্র খাঁকে জানাইলেন এবং পরদিন রাত্রে কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে আশ্বাস দিলেন। রাত্রি একটু গভীর হইলে পূর্ব্বের মত তিনি একাকী পুনরায় নির্জ্জন গোঁফায় উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীতুলসীকে ও শ্রীহরিদাসকে প্রণাম করিয়া গোঁফার দ্বারে বসিলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন—দুই রাত্রি তোমার অনেক কষ্ট দিয়াছি, আজ আর তোমার দুঃখ পাইয়া ফিরিতে হইবে না আজি আমার নামও পূর্ণ হইবে—পূর্ণ হইলে অবশ্য তোমায় অঙ্গীকার করিব। সুন্দরী কীর্ত্তনের সঙ্গে "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন।

সাধুর আবরণ কে বুঝিবে? সাধারণ লোকে "অঙ্গীকার করিব"। শুনিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। কিন্তু এ কি ঘটিল তিন রাত্রি সাধুমুখে নাম শ্রবণ ও ২ রাত্রি নাম-কীর্ত্তনের ফলে সেই সুন্দরীর চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাধুকৃপায় তার চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় নিজ অন্যায় বুঝিতে পারিয়া সেই সঙ্গে সারা জীবন অসৎভাবে যাপন করিয়াছে বলিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় সেই সুন্দরী শ্রীহরিদাসের দুই চরণ কমলে পতিত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। রামচন্দ্র খাঁর প্ররোচনায় সে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে কথাও নিবেদন করিলেন এবং সেই সঙ্গে অনুতাপের অশ্রুজলে শ্রীহরিদাসের চরণ-কমল সিক্ত করিলেন।

সাধু-বৈষ্ণবের গুণ পরদুঃখ সহিষ্ণুতা, সাধু স্বভাবতঃই করুণহৃদয়। তাঁর কৃপা কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয় কে বুঝিতে পারে। সেই সুন্দরীর কাতরতাকেই সাধু-কৃপার একমাত্র হেতু বলা যায় না কারণ কৃপা অহৈতুকী তবে শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপাময় হইয়া যেমন ভক্তের আকুলতাময়ী পিপাসার অপেক্ষা করেন (কারণ তিনি যে রসিক) তেমনি সাধুর কৃপার হেতু না থাকিলে—অনুতাপ কাতরতা "কে কোথায় আছ আমায় উদ্ধার কর" এই ভাবের প্রার্থনা অপর পক্ষে দেখিতে চান। যাহা হউক শ্রীহরিদাস বেশ্যার সেই ভাব দেখিয়া বলিলেন—"আমি রামচন্দ্র খাঁর বৃত্তান্ত সবই জানি; তাহার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই। তুমি যে নিজের উদ্ধারের জন্য অস্থির হইয়াছ ইহাতে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হইলাম"। তখন পুনরায় সেই সুন্দরী তাঁর শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন "ঠাকুর অসৎ উপায়ে জীবন যাপন করিয়া অনেক পাপ করিয়াছি পাপের ইয়ত্তা নাই। এখন উপদেশ করুন কি উপায়ে আমি ঈশ্বর লাভ করিতে পারি। যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি নিস্তার পাইতে পারি, আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত"। শ্রীহরিদাস তার সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম
নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী সেবন
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে)

এই উপদেশ দিয়া শ্রীনাম মন্ত্র প্রদান করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর "হরি হরি" বলিতে বলিতে সেই গোঁফা ত্যাগ করিয়া চলিলেন। শুনা যায় অল্পকাল মধ্যে সেই বেশ্যা

পরম বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন এবং কতশত সাধু মহান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বেশ্যা উদ্ধার এক অপূর্ব্ব লীলা। পরমহংস দেব বলিতেন—খুব নির্জ্জন স্থানে সুন্দরী যুবতীকে পাইয়া যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বা সন্ন্যাসী। কামিনীর দ্বারা ঋষিমুনি এমন কি দেবতাগণও আকৃষ্ট হইয়া পদস্খলিত হইয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের মোহিনীরূপ দর্শনে বিভ্রান্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মার চিত্ত-বিভ্রম। ইন্দ্র চন্দ্র বিশ্বামিত্র প্রভৃতির ঘটনা অনেকেই জানেন। কিন্তু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র একেবারেই নিষ্কলঙ্ক—তাঁর ত্যাগের মহিমা তার নাম-মন্ত্রের মহিমা—তাঁর কৃপালুতা বেশ্যাদ্বারে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে উপদেশ করিলেন তাহাও সকলের শিখিবার জিনিষ।

মানবের যত অনর্থের মূল—'মন।' যত প্রকার সাধন দেখা যায় সকলেরই লক্ষ্য মন—নিগ্রহ। শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন—

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং।

(শ্রীগীতা)

তবে সেই নিগ্রহের উপায় কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে"

(শ্রীগীতা)

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনের নিগ্রহ সম্ভব। কোন বিষয় অভ্যাস করিতে হইবে কোন বিষয়ে বৈরাগ্যের প্রয়োজন।

তচ্চিন্তনং তৎ কথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্
এতদেব পরব্রহ্ম তত্ত্বাভ্যাসং বিদুঃ বুধাঃ॥

শ্রীভগবানের চিন্তা তাঁর কথা তাঁর নাম পরস্পরের মধ্যে সেই কথার আলোচনা—ইহাই অভ্যাস করিতে হইবে; আর ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগং জ্ঞানঞ্চ রাঘব
যোগ বৃত্তিনিরোধং স্যাৎ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্"

মনের নিগ্রহ বা চিত্তনাশের ২টী উপায় যোগ ও জ্ঞান-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ যেখানে যেখানে বা যে যে বাহ্য-বিষয়ে মন ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন ইহারই নাম যোগ। এবং সমান দৃষ্টি অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-স্ফূর্ত্তির নামই জ্ঞান। তিনিই কোথাও স্বরূপে কোথাও সশক্তিতে কোথাও বা বহিরঙ্গা-জীবরূপে কোথাও শক্তি-রূপে প্রকটিত। সর্ব্বত্র এই জ্ঞানই মনের নিগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই কথাই অতি সহজভাবে শ্রীমান্ হরিদাস বেশ্যাকে উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীভগবানের সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি অনুভবের দ্বারা শ্রীনাম ও শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ ঘটাইতে এমন সহজ উপায় আর নাই। শ্রীনামের কৃপায় শ্রীভগবানের রূপ গুণ লীলা প্রভৃতি ধীরে ধীরে সবই স্ফুরিত হয়। তাই শ্রীহরিদাস বেশ্যাকে নিরন্তর শ্রীনাম লইতে উপদেশ করিলেন।

ভজনের যাহা অনুকূল তাহা গ্রহণ করিতে যাহা প্রতি-কূল তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; তাই একদিকে যেমন "নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে হইবে, অপরদিকে নিরন্তর বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যতক্ষণ কোন বিষয়ে কাহারও মমত্ব বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ তার মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখা বড়ই কঠিন, তাই বিষয়ে মমত্ব বুদ্ধি একেবারে দূর করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।"

'ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান"
আর বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া—"এই ঘরে আসি
তুমি করহ বিশ্রাম"

ধন সম্পদ দান করিয়া ঘরে থাকিতে সঙ্গদোষে পুনরায় সেই সব জিনিষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে তাই; যুগপৎ সর্ব্বস্ব দান ও গৃহত্যাগের প্রয়োজন।

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। (গীতা)

বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয়-নিবৃত্তি আসিতে পারে কিন্তু বিষয়বাসনা সূক্ষ্মাকারে থাকিয়া যাইবে। সেই বিষয়-বাসনা দূর করিবার উপায় "নাম গ্রহণ" তার ফলে—

"পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"— (শ্রীগীতা)

পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া বিষয়বাসনা পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হয়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন।

ভক্তির মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিলে ভজন যে অধিক পুষ্ট হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই কারণেই সাধুসঙ্গের মহিমা ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু বেশ্যার [illegible] যেরূপ

দর্শের সম্ভাবনা বিরল তাই মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীতুলসীদেবীর সেবা শ্রীহরিদাস উপদেশ করিলেন—শ্রীতুলসী বিনা কোন ভোগ শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না সেই শ্রীতুলসীর মহিমা কে না জানে? শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজ শ্রীমুখে তুলসীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রভু বোলে মুঞি তুলসীরে না দেখিলে
ভাল নাহি বাসে যেন মৎস্য বিনা-জলে
যবে চলে সংখ্যানাম করিতে গ্রহণ
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন।
পশ্চাতে চলেন প্রভুতুলসী দেখিয়া—
পড়য়ে আনন্দ-ধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া—"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন—যত বড় পাপী তাপীই হউক না কেন—এই উপদেশ সকলেরই গ্রাহ্য। নিস্তারের উপায় যিনি অবলম্বন করিতে চান তাঁর কর্ত্তব্য কি তাহা বেশ্যা-উদ্ধারে শ্রীহরিদাস সুন্দর ভাবে উপদেশ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

"অন্তরের অশ্রুবাদল"

(প্রভুপাদ শ্রীলপ্রাণগোপাল গোস্বামি কর্ত্তৃক লিখিত)

আমরা ৭ই মাঘের "দৈনিক বসুমতীতে" "রূপসনাতনের জাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। সকলেই বেশ জানেন—শ্রীপাদরূপ ও সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজে লেখা পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-রূপে জানিয়াও "নীচজাতি" বলিয়া উল্লেখ করায় রূপসনাতনের পাদপদ্মৈকসেবি-মাত্রেরই অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইয়াছে। আমরা রূপসনাতন-গোস্বামিপাদের জাতি-সমালোচক মহাশয়কে বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে তিনি নিম্নলিখিত তাঁহাদের পরিচয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্তহৃদয়ে ব্যথা দেওয়া রূপ গবেষণা হইতে বিরত হউন। শ্রীপাদগণের আচরণটী যে আকারে বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে পাইয়া আসিতেছি, তাহার নিরপেক্ষ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের চরণে অতিপাষণ্ডেরও মাথা বিকাইবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক সুতরাং শিক্ষিত জনমাত্রেরই হৃদয়ে যে তাঁহাদিগের গুণরাশি সমুদ্ভূত হইয়া এক অলৌকিক সাড়া আনিবে তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের প্রতিভা, সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সমন্বয়, সাধনের নিরঙ্কুশ-উজ্জল-পরিপাটী কাহার মনে বিস্ময় উৎপাদন করে না? আজীবন বিষয়ের দায়িত্বপূর্ণ-ব্যাপারে অবিচলিত থাকিয়া শেষ মুহূর্ত্তে সাধনার উচ্চগ্রামে অধিরোহণের দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীপাদরূপসনাতন ছাড়া আর কাহার জীবনী আলোচনায় পাইব, জানিনা। তাঁহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসমীপে মিলনের দৃশ্য কি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ এক অপূর্ব্ব-মানবতার আদর্শ হইতে দূরে রাখিবে? ভগবৎকৃপার চরম পরিপাটী রূপসনাতনের ভিতর দিয়াই উপলব্ধি করিবার একটী প্রধান বিষয়। আশাকরি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ-লেখনী-নিঃসৃত (বৈষ্ণবতোষণীর শেষের) অমৃতস্রাবি-পরিচয় বৈষ্ণবভক্তগণের "নীরব-চক্ষের জল" মুছাইয়া আনন্দাশ্রুতে পরিণত করিবে। সকলের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার অক্ষর ও অনুবাদটী দিতেছি।

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতঃ কৃতা
টিপ্পনী দশমস্কন্ধে পূর্ণা বৈষ্ণবতোষণী॥

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চজাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদ্দেববিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃতমহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোহয়ং শ্রীসনাতন নামিনাম্ ॥
তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যবিবক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রীতির নিমিত্ত যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৈষ্ণবতোষণী নামে টিপ্পনী প্রস্তুত করিয়াছেন, যিনি প্রথম বয়সেই কোন এক স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালে নিদ্রাশেষে শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন করিয়া প্রেমামৃত-মহাসাগরে মগ্ন হইলেন, সেই শ্রীসনাতনগোস্বামি-লিখিত বৈষ্ণবতোষিণী সম্পূর্ণ হইল। শ্রীসনাতন-পাদপদ্মৈকজীবি-শ্রীপাদজীবগোস্বামী পূর্ব্ববিষয় নিবেদন করিয়া অন্য বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় তাহা নিবেদন করিতেছেন।১।

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিনী,
জিহ্বাকল্পলতাত্রয়ীমধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
যেহশে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ,
শ্রীসর্ব্বজ্ঞজগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামনীঃ ॥২

পুরাকালে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নামে কর্ণাটদেশে এক রাজা ছিলেন, ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। স্বীয় ক্ষমতায় সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। মধুকরী, মকরন্দ-স্রাবি লতার প্রাপ্তিতে যেরূপ আনন্দে নৃত্য করে, ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদ তাঁহার অমৃতস্রাবিণী জিহ্বা-রূপ কল্পলতায় তেমনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল।২।

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোহভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতি-পূজিতোহখিলযজুর্ব্বেদৈকবিশ্রামভূ,
লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্ ॥

সেই জগদ্গুরুদেবের অনিরুদ্ধ নামে ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী একটী পুত্র হইয়াছিল। তিনি সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও যজুর্ব্বেদের একমাত্র আশ্রয়স্থান বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।৩।

মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ,
প্রজজাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতর ভাবং বহুবিধে,
জগামান্যঃ শাস্ত্রে নিজনিজগুণ-প্রেরিতয়া ॥৪॥

বিখ্যাতযশা অনিরুদ্ধদেবের ঔরসে দুই স্ত্রীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর ও কনিষ্ঠ হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে গুণবান্ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিহর নিজ নিজ গুণ অনুসারে দুর্বৃত্ত হইয়াছিল।৪।

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে,
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজশ্রেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ,
স্বরাজ্যাদার্য্যানাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥৫॥

অনিরুদ্ধদেব লোকান্তরগমনসময়ে দুই পুত্রকে সমান অংশে নিজ রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ হরিহর নিজ-শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া পূর্ণরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।৫

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভি নির্ধুতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌলস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবিশন্,
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিদম্ ॥

রূপেশ্বর দেব অরিকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আটটা ঘোড়া ও স্ত্রীসহ উত্তরদিকে গমন করিলেন। সেখানে শিখরেশ্বর নামক রাজার বন্ধুরূপে পরমসুখে বাস করিবার সময় তাঁহার পদ্মনাভ নামে একটী গুণবান্ পুত্র হয়।৬

যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গোবিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং,
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপটবীং,
ন জাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ ॥ ৭

এই পদ্মনাভের জিহ্বায় সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ ও সমস্ত উপনিষদ্ নিরন্তর নৃত্য করিত। ইনি ৺জগন্নাথের প্রেমে বিভোর ছিলেন। রাজা রূপেশ্বরদেবের পুত্র পদ্মনাভ নিজ গুণে কাহার না শ্রুতিগোচর হইয়াছিলেন?

বিহায়গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং,
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনী তটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥৮

তৎপর গুণিগণের অগ্রগণ্য-পদ্মনাভ, শিখরভূমি হইতে গঙ্গাতটে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দৈত্যদমন-রাজগণের পূজনীয়-পদ কৃতি-পদ্মনাভ অতঃপর নবহট্ট গ্রামে (নৈহাটী) বাস করিতে লাগিলেন।৮

মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ,
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো,
ধীরঃ শ্রীলমুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্মুকুন্দঃ কৃতী ॥৯

শ্রীপদ্মনাভ তথায় শ্রীপুরুষোত্তমদেবের মূর্ত্তি পূজা করিতেন। ঐখানে একটী যজ্ঞোৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও ক্রমে পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে পাঁচটী পুত্র হয়।৯

জাতস্তত্রমুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্‌কুমারাভিধঃ,
কিঞ্চিদ্‌ দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে,
যে স্বংগোত্রমমূত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্‌ ॥১০
আদি শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ত৹ঃ,
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় বলিতো নির্ব্বিণ্ণ যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ,
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ি ॥১১

মুকুন্দের পুত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুমারদেব কোন বিবাদে দেশ-ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে বাস করেন। (এই স্থানের নাম ফতোয়াবাদ, চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপ ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বরিশালের অধীন। ভক্তি-রত্নাকর) কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে প্রথম শ্রীসনাতন, দ্বিতীয় শ্রীরূপ ও তৃতীয় শ্রীবল্লভ। (মহাপ্রভু অনুপম নাম রাখেন) এই তিন জন, শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয়তম—যাঁহারা ইহকাল এবং পরকালে নিজের গোত্রকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই তিন ভ্রাতা সংসারে বিরাগী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অতিশয় কৃপালাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি-সম্পত্তিতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।১০।১১

যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামপাদেন্দিবান্‌,
গঙ্গায়াং ত্যক্তদেহো পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতো।
যাভ্যাং মাথুরলুপ্ততীর্থনিবহোব্যক্তীকৃতভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিতা ॥ ১২

এই তিন ভ্রাতার সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভদেবই আমার (শ্রীজীবের) পিতা। শ্রীরূপদেবের সহিত নীলাচলে আসিতে আসিতে গৌড়দেশে গঙ্গায় দেহত্যাগ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম লাভ করেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে যাইয়া মথুরামণ্ডলের গুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি বর্দ্ধিত করেন। ১২

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্‌ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভরমহীত্যেবানয়োস্ত্রিজগতো-
র্যস্তুল্যত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে হ্যাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥ ১৩

ইঁহাদের প্রিয়তম-মিত্র শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমসমুদ্রের তরঙ্গমালায় নিয়ত ঘূর্ণমান হইয়া শোভা পাইয়া ছিলেন। শ্রেষ্ঠআর্য্যগণ ত্রিভুবন-বিখ্যাত রূপ-সনাতনের দৃষ্টান্ত নাই বলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য, রঘুনাথদাস ইঁহাদের তুল্য পদ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৩

গোপালবালকব্যাজাদ্‌ যয়োঃ সাক্ষাদ্বভুব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥ ১৪

গোপাল বালকের রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরূপসনাতনকে সাক্ষাদ্দর্শন দিয়াছিলেন। ১৪

উল্লিখিত শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-লিখিত পরিচয়ে শ্রীরূপ-সনাতনপাদকে আমরা যজুর্ব্বেদী-ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-রূপে স্পষ্টই পাইতেছি। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বৃথা গবেষণা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত অতি নিগূঢ় গ্রন্থ। শ্রীপাদবল্লভভট্টকে শ্রীরূপগোস্বামি-পাদের পরিচয়ে "ইহোঁ জাতি অতিহীন" এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিটী ভট্টজী বৈষ্ণবতা এবং জাতির মধ্যে কোনটীকে শ্রেষ্ঠাসন দেন ইহা পরীক্ষার জন্যই হইয়াছিল। গূঢ়ার্থ এই যে—রূপগোস্বামি প্রভৃতি ভক্তশূরগণ জাতিকে অতিশয় হীন জ্ঞান করেন। শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীর "নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার" এই মানসচিন্তাটীও দৈন্যোত্থ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বহুস্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় "অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে" এরূপ কথা পাওয়া যায়।

সুতরাং শ্রীপাদঠাকুরমহাশয় এই প্রার্থনা-বাক্যে যে প্রকার "অধম চণ্ডালজাতি" নহেন, তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কায়স্থই ছিলেন। সেইরূপ "নীচজাতি দেহ মোর" বাক্যে পবিত্র-ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ হীন-জাতি নহেন। দৈন্যই বৈষ্ণবের ভূষণ, ইঁহারা বৈষ্ণবগণের মুকুটমণি, সুতরাং ইঁহাদের বহুস্থানে নিজ পরিচয়ে দৈন্যের-সীমাতিক্রম দেখা যায়। একে ব্রাহ্মণ, তদুপরি দৈন্য-পাণ্ডিত্য ও ভক্তিবিভূষণে ভূষিত হইয়াই ইঁহারা জগতের আচার্য্য ও শিক্ষক। যদি ইঁহাদের চরণধূলির একাংশও কেহ পাইয়া থাকেন, তিনিই ইঁহাদের কথঞ্চিৎ মহত্ব বুঝিতে পারিবেন। আমরা কাতর-প্রাণে ইঁহাদের দাসানুদাসের চরণ-রেণু-কণা ভিক্ষা করিতেছি-মাত্র।

পত্রলেখকগণের প্রতি

শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ দত্ত (কুড়িগ্রাম) দিনাজপুর—

আপনি যে নাটিকার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং আপনার প্রতিবাদটী ছাপানো হইল না।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মুন্সেফ) কিশোরগঞ্জ—

আপনার পত্রখানি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি প্রুফ দেখার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, লেখক মহাশয় স্বয়ংই ঐ শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কাজেই আমরাও তাহাই করিয়াছি। মুদ্রাকর প্রমাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতে বিশেষ যত্নবান্ হইতে চেষ্টা করিব।

আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "মাতৃস্তোত্রের" বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম—উহাতে "প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি সংগৃহীত" এইরূপ উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল। ভ্রমক্রমে এইরূপ ঘটিয়াছে। এই ত্রুটী প্রদর্শনের জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া আমরা শ্রীগৌরাঙ্গগতপ্রাণ-পরমদয়াল-বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে বিনয় সহকারে জানাইতেছি—তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভ্রমটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ—গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীধাম একচক্রা গর্ব্ভবাস।
তুড়িগ্রাম, (পোঃ বীরভূম)
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী।

যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং :—

আগামী ১৯শে মাঘ বুধবার শান্তিপুরনাথ শ্রীমন্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এবং ২৬শে মাঘ বুধবার প্রেমাবতার একচক্রা সুধাকর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি আরাধনা উপলক্ষে শ্রীধাম একচক্রা-গর্ভবাসে আগামী ১৮ই মাঘ শ্রীশ্রী৺হরিনাম মহাযজ্ঞের শুভ অধিবাস মঙ্গলাচরণ এবং ১৯শে মাঘ হইতে ২৭শে মাঘ পর্য্যন্ত নবরাত্রি শ্রীশ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞ এবং ২৮শে মাঘ ধুলোট মহোৎসব হইবে। অতএব আপনারা সবান্ধবে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলাস্থলীর মহা-মহোৎসবে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব ও আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি. ১৩৩৯, ১লা মাঘ।

দীনাতিদীন বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীত্রিভঙ্গ দাস, শ্রীনিতাই রমণ দাস,
শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | মাঘ—১৩৩৯ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[৩]

(প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী)

যে দ্রব্য চাহিবামাত্রই পাওয়া যাইতে পারে,—একান্ত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা বশতঃ মুমূর্ষু রোগী কেবল চাহিবার শক্তিহীন বলিয়াই যেমন তাহা প্রাপ্ত হয় না,—সেইরূপ "পরমানন্দ" বা শ্রীভগবান্‌কে চাহিতে পারিলেই পাওয়া যায়, ইহা অতীব সত্য হইলেও, ভবরোগ-ক্লিষ্ট অবসাদগ্রস্ত জীবাত্মা এতই বলহীন যে, সে "চাওয়া" চাহিবার শক্তি পর্য্যন্তও তাহার বিলীন হইয়া গিয়াছে ; এই অপরিসীম আত্ম-দৌর্ব্বল্যই সংসারী জীবের পক্ষে শ্রীভগবান্‌কে না চাহিবার—অতএব না পাইবার কারণ। জীবাত্মার এই বলহীনতাই পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার পথে প্রধানতম অন্তরায়। সেইজন্য শ্রুতিও বলিয়া থাকেন ;—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

অর্থাৎ এই পরমাত্মা (পরতত্ত্ব) হতবল জীবাত্মা কর্ত্তৃক লভ্য হয়েন না। আত্মার এই অবসাদ ও বলহীনতার কারণ কি ? এখন তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অবিদ্যার ঘনান্ধকারে স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের দেহাত্মবোধ-নিবন্ধন, অনাদিকাল হইতে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদিতে "আমি" বা "আত্ম" বুদ্ধি থাকায়, সেই মিথ্যা "আমির" তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য জন্মে জন্মে তৎ-স্বজাতীয় আহার-বিহারাদির অবিশ্রান্ত তর্পণে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিরই বলাধান সংঘটিত হইয়া থাকে ; সুতরাং জীবের ইন্দ্রিয়াদিই বলবান্। অপরপক্ষে আত্মস্বরূপ বা চিৎ-কণ জীবাত্মার কথা বিস্মৃত হওয়ায়, আত্ম-স্বজাতীয় বা চিন্ময় আহার-বিহারাদি বিষয় হইতে সেই সত্য "আমি" বা জীবাত্মা চির-বঞ্চিত রহিয়াছে ; এই জন্যই আত্মা বলহীন ও অবসাদগ্রস্ত। শ্রীভগবান্‌কে চাহিবার শক্তিশূন্যতাই জীবাত্মার শ্রেষ্ঠতম বলহীনতার পরিচয়। না চাহিতে পারিবার দুর্ব্বলতাই জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মা লভ্য না হইবার কারণ।

প্রকৃষ্টরূপে "ভগবান্-চাওয়ার" অপর নাম "প্রেম-ভক্তি"। "প্রেমভক্তি" বা "ভগবান্-চাওয়ার" সামর্থ্য, "সাধন-ভক্তি" রূপ আত্মার অমৃতময় পথ্যের সংযোগ দ্বারাই সুসিদ্ধ হইতে পারে। জড়দেহের শক্তি যেমন প্রাকৃত অন্নরসেরই পরিণতি, সেইরূপ চিন্ময় জীবের পক্ষে "ভগবান্ চাওয়া" বা "প্রেম-ভক্তি-সামর্থ্য," নির্গুণ "সাধন-ভক্তি" রসেরই পরিণতি বা পরিপকাবস্থা। শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় অনুকূলতাময়ী শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিরূপা কায়িক, বাচিক বা মানসিক চেষ্টার নাম "সাধন-ভক্তি"। "সাধন-ভক্তি" রূপ নির্গুণ পথ্য বা স্বজাতীয় আহার-বিহারাদি দ্বারা বলহীন জীবাত্মার ক্রমশঃ বলাধান ঘটিলে,

তখন "ভগবান্-চাওয়া-শক্তি" বা প্রেমের উদয়মাত্র সেই "পরমানন্দ" বা পর-তত্ত্বের পূর্ণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হতবল জীব যে কেবল ভগবান্‌কে চাহিতেই অসমর্থ, তাহা নহে,—জীবাত্মার এতই দৌর্ব্বল্য যে, যাহার গ্রহণে "ভগবান্-চাওয়া" সম্ভব হয়, সেই "সাধন-ভক্তি" রূপ নিগুর্ণ পথ্য চাহিবার বা তৎসেবনের জন্য উন্মুখ হইবার ক্ষমতাও তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মায়াহত বলহীন জীবাত্মার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত বলিয়া তাহার পক্ষে কোন বস্তুই চাহিবার ক্ষমতা নাই। কোন ভাগ্যে, চিন্ময় জীবের চিন্ময় বিষয় প্রাপ্তির জন্য আহ্বান ও আকাঙ্খা ব্যক্ত হইলে, স্বরূপতঃ তাহাকেই আত্মার বাণী—তাহাকেই জীবের জীবত্ব বলিয়া জানিতে হইবে; আর আত্মবিস্মৃত জীবের পক্ষে জড়ীয় আহার বিহারাদি বিষয়ের জন্য যে অবিশ্রান্ত উদ্যম ও আর্ত্তনাদ, উহা আত্মার বাণী—আত্মার বৃত্তি নহে,—দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্ষুধিত চীৎকার! চির-উপসিত—অবসন্ন আত্মার ক্ষীণস্বর, জড়তার কোলাহলের মধ্যে শ্রবণ করা যায় না বলিয়া, আমরা ইন্দ্রিয়াদির চীৎকারকেই ভ্রম বশতঃ আত্ম-স্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকি ও তৎফলস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানপূর্ব্বক আত্মতৃপ্ত বলিয়াই মনে করি; বস্তুতঃ উহা অবিদ্যার প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিন্ময়-বস্তু নিগুর্ণ ও স্বপ্রকাশ। স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে—স্বকৃপায় ধরা না দিলে, আমাদের সগুণ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা নাই। স্বসামর্থ্যে চাহিবার শক্তি না থাকিলেও, দুগ্ধ-পোষ্য দুর্ব্বল শিশু স্তন্যপানের জন্য কিঞ্চিৎ উন্মুখতা প্রকাশ করিলেই, করুণাময়ী জননী যেমন স্বয়ং অগ্রসর হইয়াই তাহাকে স্তন্যদান করেন, তদ্রূপ বলহীন জীবের বলাধানের পক্ষে যাহা একমাত্র স্বাভাবিক ও সুপথ্য,—সেই সাধনরূপা চিন্ময়ী ভক্তিকে স্বসামর্থ্যে গ্রহণ করিবার কোনও যোগ্যতা না থাকিলেও, তৎসেবনে কেবল কিঞ্চিৎ মাত্র উন্মুখতা দৃষ্ট হইলেই, তাহা স্বয়ংই কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকেন। তাই ভক্তিশাস্ত্রে, জীবের প্রতি স্বপ্রকাশ ভক্তিদেবীর এই অত্যাশ্চর্য্য কৃপার কথাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে;—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবন্নাম, গুণ, লীলাদি বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণাদি রূপা নিগুর্ণা সাধন-ভক্তিকে স্বসামর্থ্যে, কর্ণ জিহ্বাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা জীবের গ্রহণযোগ্যতা নাই বলিয়া, এবং তদাশ্রয় ও তৎসঙ্গ ব্যতীত চিৎকণ-জীবের পক্ষে জড়স্তূপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বরূপভাব প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই দেখিয়া—হতবল জীবাত্মার পক্ষে উহা চাহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত না থাকিলেও, কেবল কোন প্রকারে উহা সেবনের জন্য যদি কিঞ্চিৎ উন্মুখতাও পরিদৃষ্ট হয়, তবে স্বপ্রকাশ "সাধনভক্তি" জীবের সেবোন্মুখ প্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় বর্গে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

জড়স্তূপের অন্তরালে সন্নিহিত ও চেতনাহত জীবকে উদ্ধারপূর্ব্বক স্বরূপে ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীভগবান্ ভক্তিদেবীর দ্বারা এতাদৃশী কৃপার বিস্তার করিলেও, জীবের দুর্গতির সীমা এতই বিস্তীর্ণ যে, সে কৃপা-প্রবাহও তাহার দুর্দ্দৈব-মরু অতিক্রম পূর্ব্বক তৎ-সমীপে পৌছাইতে পারে নাই; যেহেতু উন্মুখতা মাত্র প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অবির্ভূতা হইবার সঙ্কল্প প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেও, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা "সাধন-ভক্তি" সেবনের জন্য জীবের কিঞ্চিৎ উন্মুখ হইবার মত আত্মশক্তিও অবশিষ্ট নাই। মৃতদেহে কেবল যে পথ্যাদি চাহিবার শক্তিই বিলুপ্ত তাহা নহে,—তৎসেবনের জন্য লেশমাত্র উন্মুখ হইবার মত জীবনী শক্তির চিহ্নও তাহাতে যেমন আর লক্ষিত হইতে পারে না, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মায়া বা জড়ের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, জীব এমনই জড়তাগ্রস্ত—এতই হীনবল যে, সেই "মায়াহত" জীবের পক্ষে "সাধন-ভক্তি" রূপ স্বাভাবিক পথ্য গ্রহণে লেশমাত্রও উন্মুখতা জাগিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অত্যধিক আহত বা মুমূর্ষু-ব্যক্তিতেও কিঞ্চিৎ জীবন-লক্ষণ বিদ্যমান্ থাকে; সুতরাং জীব কেবল মায়া কর্ত্তৃক আহত হইলেও তদবস্থায় হয় ত' ভক্তি সেবনের কিঞ্চিৎ উন্মুখতা সম্ভব হইত; কিন্তু জীব আহত বা মুমূর্ষু নহে—মায়া কর্ত্তৃক হত বা মৃত; সুতরাং মৃতবৎ

জীবের পক্ষে স্বতঃ ভক্তি-সেবনের "উন্মুখতা" সম্ভব হইতেই পারে না। মায়াহত জীব ভক্তিদেবীর মহতী কৃপার সীমাকেও স্বীয় অপরিসীম দুর্দ্দৈবের দ্বারা এইরূপে অতিক্রম করিয়াছে!

জীবাত্মা চিন্ময় পদার্থ; অতএব নির্গুণ বা অপ্রাকৃত বস্তু। নির্গুণ পদার্থে নির্গুণ ধর্ম্ম ও সগুণ বা প্রাকৃত-বস্তুতে সগুণ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। জীবের যাহা নির্গুণ-ভাব, তাহাই জীবত্ব বা জীবের আত্মধর্ম্ম; আর যাহা কিছু সগুণ বা প্রাকৃত ভাব, তাহাই জড়ত্ব বা জড়বস্তুর স্বধর্ম। জীবমায়া কর্তৃক চিদাণু জীবকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া, তাহারই চেতনায় জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থ সকল চৈতন্যযুক্ত হইলেও, উহারা সগুণ বা জড়বস্তু বলিয়া, উহা হইতে নিরন্তর জড়ধর্ম্ম বা মায়িকী-বৃত্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবমায়া কর্তৃক স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের বিরূপতা বা জড়াত্মবোধ নিবন্ধন, তাহাতে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, অনাদিকাল হইতেই জীবের স্বধর্ম্ম বা নির্গুণ-ভাব বিলীন হইয়াছে। চিন্ময় জীবাত্মা নিত্যবস্তু,—সুতরাং মৃত্যুহীন বা অমৃত। ধর্ম্মী বা জীব কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবার নহে; কিন্তু মায়া-প্রভাবে তদ্ধর্ম্ম বা জীবত্ব বিলুপ্ত হওয়ায়, জীবত্বহীন জীবকেই "মায়াহত" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। "মায়াহত" বলিতে "মায়া কর্তৃক হত বা মৃত" এরূপ অর্থ নহে; মায়া কর্তৃক জীবত্বে জড়ত্ব অধ্যাসিত হওয়ায়, জীবের জীবত্বই হত বা মৃতবৎ জড়তাগ্রস্ত। এক কথায়, জীবত্বহীন জীবকেই "মায়াহত জীব" বলিয়া জানিতে হইবে। দেহাদি জড়ে চেতনা-শক্তির প্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ জীবে জড়ত্ব,—এই ভাববিপর্য্যয় অসম্ভব হইয়াও অচিন্ত্য মায়াশক্তি কর্তৃক ইহাও সম্ভব হয় বলিয়া, মায়াকে "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" বলা হইয়া থাকে।

জড়ীয় দেহাদি বিষয়ে আত্মবোধ নিবন্ধন, জীবের স্বরূপ-ভাবের বিরূপতা বা জড়তা বশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যাবতীয় ক্রিয়াশক্তির উদ্গম হইয়া থাকে, সে সমস্তই সগুণভাব বা জড়ধর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। মৃতদেহ, রৌদ্রে প্রতপ্ত, বায়ুকর্তৃক বিশুষ্ক, সলিলে স্ফীত, ঝটিকায় উৎক্ষিপ্ত, স্রোতবেগে চালিত ও তরঙ্গে কম্পিত হইতে দেখা যাইলেও, যেমন সেই ক্রিয়াশীলতা দ্বারা তাহার মৃতত্বের অপনোদন হয় না, সেইরূপ জীবের জড়তা বা অবিদ্যাচ্ছন্ন জ্ঞান হইতে যে কিছু ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়,—অবিদ্যাসংবৃত জীবে যাহা কিছু ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সকলই শবের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় জড়ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আনুকূল্যে ভগবদনুশীলন বা ভক্তি ভিন্ন জীবের যাহা কিছু কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা, তৎসমুদয়কে জড়ত্ব বা মৃতত্বই জানিতে হইবে। প্রাকৃত বা সগুণ-ভাব মাত্রেই জড়ত্ব বা জড়ধর্ম্ম। ভক্তি নির্গুণা; অতএব ভক্তিভাব ভিন্ন, মায়াহত জীবের আত্মভাব বা জীবন-লক্ষণ অপর কোনও ক্রিয়াশীলতা দ্বারা প্রকাশ হয় না। মহাপ্রতাপান্বিত রাজ-চক্রবর্ত্তীর অরিন্দমী অদম্য উৎসাহই হউক, কিম্বা উন্নতিশীল ও উদীয়মান তরুণের অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতাই হউক, অথবা জীর্ণ-কুটীরের নিভৃত প্রান্তশায়ী—তন্দ্রালসে নিমগ্ন কর্ম্মহীন জীবনের অলসতাই হউক,—ভগবদ্ভক্তিভাবের সংযোগ ব্যতীত, তৎসমুদয়ই জড়ত্ব বা মৃতত্বের পরিচয় ভিন্ন তন্মধ্যে অণুমাত্রও জীবত্ব বা আত্মধর্ম্মের নিদর্শন নাই। নির্গুণা ভক্তিভাবের উন্মেষ, যে জীবে যে পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে, সেই জীবের জীবত্ব বা জীবনের লক্ষণ সেই পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অলসতাদি তমোভাব হইতে কর্ম্মতৎপরতাদি রজোভাব শ্রেষ্ঠ ও অহিংসা-আত্মত্যাগাদি সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠতর হইলেও প্রাকৃত বা সগুণভাব মাত্রেই জড়ত্ব; সুতরাং কেবল সত্ত্বাদি লক্ষণ দ্বারা নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত জীবের জীবত্বের প্রকাশ হয় না। নির্গুণা ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মার আত্মধর্ম্ম বলিয়া, এই নির্গুণ-ভাবের অধিকতর সান্নিহিত ও দূরত্ব বশতই যথাক্রমে তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা এবং সত্ত্ব হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে তমোগুণের অপকর্ষতার হেতু। প্রকাশ-লক্ষণ সত্ত্বগুণ, নির্গুণ ভাবের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়াই অপর গুণদ্বয় হইতে ইহার কিঞ্চিৎ উৎকর্ষতা ও আদর দেখা যায়; নচেৎ সত্ত্বাদি-গুণত্রয় সম্পূর্ণ প্রাকৃত বা জড়বস্তু; অতএব কেবল সত্ত্বাদিগুণের প্রকাশে জড়ত্বেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। জড়ত্বই মৃতত্ব বলিয়া, ভক্তিভাব-

বর্জ্জিত কর্ম্মাদিরত জীবকে "কর্ম্মজড়" আখ্যা প্রদান করা হয়। শবের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় মায়াহত জীবের যাহা কিছু কর্ম্মতৎপরতা,—সে সকলই জড়ত্ব বা মৃতত্ব ভিন্ন যে লেশমাত্রও জীবত্বের পরিচায়ক নহে, উক্ত "কর্ম্মজড়" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শবাসনের শবদেহ যেমন মৃত বা সম্পূর্ণ জড় হইয়াও কখন হস্তপদাদি সঞ্চালন করে, কখন হাস্য বা রোদন করে, কখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকে, কখন মুখ ব্যাদান করে, কখন সিক্ত চণকাদি ভক্ষণ করে, কখন বা উঠিয়া বসিতে চাহে; তথাপি উহা যেমন মৃতদেহ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ অজ্ঞতা বশতঃ আমরা কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসহীন জড়বৎ নীরব ও নিস্পন্দ দেহকেই শব বলিয়া মনে করিলেও আমাদের জানা উচিত, যখন শবেও ক্রিয়াশীলতা ও কর্ম্মতৎপরতা দৃষ্ট হইতে পারে, তখন জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে নিরন্তর উত্থিত জড়ীয় বাসনা ও বিলাসাদি সগুণধর্ম্মমাত্র পরিলক্ষিত হইলেই, তদ্দ্বারা কখন তাহার জড়ত্ব বা মৃতত্বের অপনোদন হইতে পারে না। যে জীবে নির্গুণা ভক্তিলক্ষণের লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই, তাহা প্রাকৃত বা ব্যবহার বিষয়ে যতই কেন স্বার্থকতা বরণ করুক্ অথবা তাহা যতই কর্ম্মতৎপর হউক, যতই কেন শ্রীমান্ বা কৃতিমান্ হউক্, যতই কেন উদ্যম ও উৎসাহশীল হউক্, যতই কেন জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যবান্ হউক্, অথবা যতই কেন সুশ্রী, সুবেশ ও সালঙ্কৃতই হউক্,—তাহাকে "ক্রিয়াশীল শব" বা "কর্ম্মজড়" নামক মৃত বিশেষ ভিন্ন শাস্ত্র অপর কোনও লক্ষণে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

> বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
> ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
> জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
> ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
> ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
> মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
> শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
> হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কনৌ বা॥
> বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
> লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
> পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
> ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
> জীবন্ শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
> ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
> শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ
> শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥

অহো! যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের গুণনামাদি শ্রবণ করে নাই, তাহার সেই কর্ণপুট বৃথা ছিদ্র মাত্র, এবং যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করে নাই, সে জিহ্বা কেবল ভেকজিহ্বার ন্যায় অসতী বা ভ্রষ্টা।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষাদি ও মণিময় মুকুটে ভূষিত হইয়াও যে মস্তক শ্রীভগবানের পাদপীঠে নমিত হয় নাই, তাহা কেবল ভার মাত্র; এবং যে করদ্বয় কনক-কঙ্কনাদিযুক্ত হইয়াও শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয় নাই তাহা শবেরই কর তুল্য।

মনুষ্যগণের যে নেত্রদ্বয় শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সন্দর্শন করে নাই, সেই নেত্রদ্বয় কেবল ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত নয়ন সদৃশ; এবং যাহার পাদযুগল শ্রীহরিক্ষেত্রে বিচরণ করে নাই, সেই পাদদ্বয় বৃক্ষমূলের তুল্য; (অতএব তাহার দেহও বৃক্ষকাণ্ড-সদৃশ কাষ্ঠময়—জড়।)

যে মনুষ্যের অঙ্গ ভগবদ্ভক্তচরণরেণুর সংস্পর্শ লাভ করে নাই, সেই দেহ জীবিতাকারেও মৃত; এবং যে মানব শ্রীভগবদ্পাদ-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই, শ্বাস-প্রশ্বাস থাকিলেও তাহাকে শব বলিয়াই জানিতে হইবে।

শিশিরের পত্র-পুষ্পহীন নিরস ও শুষ্কপ্রায় তরুলতার ধূসরিমা মুছিয়া গিয়া, বিকশিত নব-পল্লবের স্নিগ্ধ-শ্যামলিমা ধরিত্রীবক্ষে ছড়াইয়া পড়িলে, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবের কথা তখনই যেমন বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ জড়জগতের জড়-রাশির অন্তরালে—মর-জগতের মৃত-স্তূপের অভ্যন্তরে চির-শায়িত, জীবত্বহীন জীবের, জড়ীয় দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও সকল ইন্দ্রিয় হইতে সগুণ-বৃত্তি

বা জড়ত্বের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবদনুশীলনরূপা নির্গুণা ভাগবতী-বৃত্তির বা ভক্তিভাবের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেবল তৎকাল হইতেই জীবের জীবত্ব বা অমৃতত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনাদি মায়াহত জীবের পুনর্জ্জীবন-লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত প্রকারেই বিনির্ণীত হইয়াছে।

সা বাগ্‌যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥

সে-ই বাক্য, যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ-নামাদি কীর্ত্তিত হয়, সে-ই হস্ত, যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের কর্ম্ম কৃত হয়, সে-ই মন, যাহার দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমে স্ফুরিত শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা যায়; যে কর্ণে শ্রীভগবানের পুণ্য কথা শ্রুত হয়, সেই কর্ণই কর্ণ, যে মস্তক শ্রীভগবানের বিভূতি-বিশেষ জানিয়া স্থাবর ও জঙ্গমে প্রণত হয়, সেই মস্তকই মস্তক, যে চক্ষু বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবন্মহিমাকে অবলোকন করে, সেই চক্ষুই চক্ষু, এবং যে অঙ্গ নিত্য শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তজনের পাদোদকে সংলিপ্ত হয় সেই অঙ্গই অঙ্গ।

শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয়া ও তদনুকূলভাবময়ী জীবের যে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা—তাহাই পরিপূর্ণ জীবন-লক্ষণ। ভক্তত্বই পরিপূর্ণ জীবত্ব; সুতরাং ভক্তশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ মহারাজের আচরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের পরিপূর্ণ জীবন লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে;—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

অর্থাৎ—সেই মহামনা শ্রীমদম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তায় মনকে, ভগবানের গুণকীর্ত্তনাদিতে বাক্যকে, শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে, করযুগলকে, ভগবৎকথাদি শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে এবং দৃষ্টিকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি ও মন্দিরাদিতে, অঙ্গকে ভক্তজনস্পর্শে, ঘ্রাণকে শ্রীভগবচ্চরণার্পিত তুলসীর গন্ধে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিতান্ন-আস্বাদনে, চরণযুগলকে শ্রীহরিক্ষেত্র গমনে, মস্তক শ্রীভগবচ্চরণ-বন্দনে, কামনাকে বিষয়ভোগের পরিবর্ত্তে কেবল ভগবদ্দাস্যে, এবং সকল কর্ম্মকে ভক্তজনের প্রীতি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন।

উক্ত শাস্ত্রনির্দ্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব—অমৃতত্ব ও মৃতত্ব কেবল ভক্তি সম্বন্ধের উদয় ও অনুদয় অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। জীবনের অন্য কোন লক্ষণ না দেখিয়া, কেবল নাসারন্ধ্রে তুলা ধারণপূর্ব্বক সামান্যাকারে তাহা স্পন্দিত হইতে দেখিলেও যেমন ব্যবহার-বুদ্ধিতে আমরা তাহাকে আর মৃতজ্ঞান করি না, কিন্তু সঞ্জীবিত বলিয়াই মনে করি, সেইরূপ নিত্য সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেই মায়াকর্ত্তৃক নিহত বা মৃত হইলেও যদি তাহাতে লেশমাত্র ভক্তিলক্ষণ লক্ষিত হয়, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর মৃতজ্ঞান না করিয়া যথার্থই জীবনপ্রাপ্ত বলিয়াই জানিতে হইবে। হতজীবে পুনরায় জীবন-লক্ষণ নির্গুণা-ভক্তি-লক্ষণের সংযোগেই সম্ভব হয়, কিন্তু নাসাগ্রধৃত তুলার কম্পনে নহে। আবার ভক্তি উদয়ের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুসারে জীবত্বের প্রকাশ-তারতম্য হইলেও, যেখানেই ভক্তির লেশাভাসমাত্রেরও সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট করিবার পক্ষে কোনই বাধা নাই।

মৃতের উপরই যমরাজের অধিকার—কিন্তু জীবিতের

উপর নহে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। ভক্তির সংযোগ বা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় ও তদনুকুলতাময়ী কায়িক, বাচনিক ও মানসিক চেষ্টার লেশমাত্রও স্ফুরণ হইলে, সেই জীবের জীবন-লক্ষণ তৎকালে যতই কেন অত্যল্প হউক,—তাহাকে তখন হইতে জীবিত, সুতরাং যমরাজের অধিকার-বহির্ভূতই জানা আবশ্যক। জীব যে পর্য্যন্ত ভক্তি-সম্বন্ধহীন, সেই পর্য্যন্তই মৃত। জীবত্বশূন্য জীবেরই নাম "মৃতাত্মা"। মৃতাত্মা ভিন্ন সঞ্জীবিত বা স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত আত্মার উপর যমের কর্তৃত্ব থাকিতেই পারে না; তাই শ্রীভাগবতে অজামিল-উদ্ধার প্রসঙ্গে দেখা যায়, স্বীয় দূতগণের প্রতি যমরাজের সুস্পষ্ট আদেশ এই,—যে জীবে একটিবার মাত্রও ভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ বা ভক্তির অত্যল্প সম্বন্ধও দেখা যাইবে না, কেবল সেই অসৎ বা জড়ত্ব প্রাপ্ত জীব সকলকেই আমার ভয়াবহ ভবনে আনয়ন করিও;—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং।
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্॥
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি।
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণুকৃত্যান্॥

অর্থাৎ—হে দূতগণ! যাহাদের জিহ্বা একবারও শ্রীভগবদ্ গুণ-নামাদি কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত একবারও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ করে নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে যাহাদের মস্তক একবারও প্রণত হয় নাই সেই ভগবদ্ভক্তিহীন অসৎ লোকদিগকেই দণ্ডের নিমিত্ত আমার ভবনে আনয়ন কর।

[উক্ত শ্লোকে "একদাপি" অর্থাৎ একবারও এই পদটি সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য। জিহ্বা, চিত্ত ও মস্তক দ্বারা একবারও কীর্ত্তন স্মরণ ও প্রণামের উল্লেখ থাকায়, শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় আনুকুল্যময়ী বাচিক, মানস অথবা শারীর-চেষ্টা-রূপা স্বল্পমাত্রও ভক্তির উদয়েকেই বুঝিতে হইবে।]

পরিশেষে জীবের জীবত্ব ও জড়ত্ব বিষয়ক সারমর্ম্ম যাহা পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের অমৃত লেখনী বিনিঃসৃত, সেই চিরস্মরণীয় পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা-কড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সেই সম্বন্ধ
সে নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউক্ সে ছার খার,
সেই বপু লৌহ সম জানি॥

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, ভক্তির সংযোগেই জীবের স্বধর্ম্ম বা জীবত্বের প্রকাশ হয়, এবং তৎসম্বন্ধেই দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই সার্থকতাকে বরণ করে—নচেৎ যেমন সমস্তই ব্যর্থ, সেইরূপ ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত হইলেই সকল কর্ম্ম শুদ্ধ হয়, ও জ্ঞান, যোগ, তপাদি সকল সাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে—নচেৎ সমস্তই মৃত ও জড়তুল্য অসার ও অশ্রদ্ধেয়। মৃতের পক্ষে যেমন কোনও পথ্যাদি সেবনের প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ মায়াহত বা চিরমৃত জীবের পক্ষে, যাহার সংযোগ ব্যতীত সঞ্জীবিত হইবার উপায়ান্তর নাই,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধনভক্তি রূপ সুপথ্য বা অমৃত সেবনের প্রথম প্রবৃত্তি বা উন্মুখতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, অতঃপর তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

(ক্রমশঃ)

মধুর বাঙ্‌লা

শ্রীকালী কিঙ্কর ঘোষ।

মধুর মধুর বঙ্গ। মধুর মধুর বাঙ্গালী জাতি,—
মধুর হৃদয়ে আপনি যাদের স্ফুরয়ে প্রেমের ভাতি!
মধুর বঙ্গ-কাননে ফুটিছে মধুর কুসুমকলি,
চির ফলবান তরু-লতা বনে মধুর সুফল কলি,!
নটিনী তটিনী কুঞ্জ তড়াগ গৌরপূজনরতা;
বাঙ্‌লা, তোমার ঘাটে মাঠে শুধু গৌরপ্রেমের কথা।
প্রণমি মধুর বঙ্গ, লুটাও তোমার মধুর রজে;
এতটুকু ঠাঁই মাগি আমি দেবি, তোমার গুপ্তব্রজে।
মধুরে দুলিছে তব কাশবন, মধুরে নাচিছে শাখী,
চির মধুময় তব ফল জল; কী মধুর পশু-পাখী!
মধুর গগণে মধুর চাঁদিমা উজলে মধুর রাতি,
সারা দিনমান মধুর তপন শ্রীগোরার প্রেমে মাতি'।
মধুর আলোক, মধুর আঁধার, মধুর সকাল সাঁঝ্;
মধুর নদীর বাঁকে বাঁকে ফুল গুল্ম বরষে লাজ।
বক্ষে তোমার প্রেমের নদীয়া, চক্ষে প্রেমের ধার,
বিশ্ব তোমার মধুর রাগিণী গাহিতেছে অনিবার।
তোমার নদের চরণ ধোয়াতে গঙ্গা আসিয়া নামি'
কোন কাল হতে সাধিছে গোরার পদ-দরশন-কামি'।
তোমার যে গোরা, গোরার যে তুমি, নমি নদীয়ার ভূমি,
মধুর নদীয়া তোমার বঙ্গ, কতই মধুর তুমি!
মধুর বাঙালী-কণ্ঠ, মধুর বাতাস-পুষ্প-গন্ধ!
জ্ঞান-গর্ব্বের শত চক্ষুতে জগৎ যখন অন্ধ,—
তোমারি মধুর নদের চন্দ্র নামায়ে জ্ঞানের ভার
প্রেমের পাথার উথলিয়া দিল,—ছুটিল অহঙ্কার।
জ্ঞান-গর্ব্বীরা পাগলের মত,—শিশুটির মত যেন—
গাহিল, নাচিল, কাঁদিল; হাঁসিল, কে বলিবে হায় কেন?
তোমারি মধুর ভবনে শুনেছি শ্রীল শ্রীবাসের ঘরে,
শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমহাপ্রকাশ,—তোমারি মাটির 'পরে।

যখন যবন ভারতে বসিল ভারতের রাজাসনে,
বিশ্বের রাজে পাইলে বঙ্গ, আপন শ্রীঅঙ্গনে।
তোমারি মাটিতে বাস করি মাগো, কলুষিতে বুঝি তোমা ;
নিজগুণে আজি তা'র' অভাগারে নিজগুণে কর ক্ষমা।
কৃপা কর, বল তোমার গোরার কখনো কি দয়া হ'বে
তা না হলে হায় এ অধম জনে কে আর তারিয়া লবে ?
তব ভূমে মোর প্রথম শয়ন, তোমারি ভূমির 'পর—
শেষের শয়ন হয় যেন মোর আরো এক মাগি বর।
জয় জয়দেব, জয় জয় তব প্রেমিক চণ্ডীদাস,
জয় তব ব্যাস, নর নরোত্তম, মধুর কৃষ্ণদাস
বঙ্গ ভাষার প্রথম দেখা গো, বড়িয়া মধুর ভাবে ;
বিশ্বের ভাষা আভাসে মাতিল,—সন্ধান কোথা পাবে ?
মাধুর্য্যরস কেবলি যেন গো বঙ্গ-ভাষার একা,
বানীর আসরে উচু ঠাঁই পাক্ তব পাগলের লেখা।
তোমার মাটীর সাধনা ফুটাল কলির কল্মষ নাশি'
শ্রীগোরাচাঁদের অপার করুণা ; ষড় ঋষি—প্রেম বাঁশি
নিখিল বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিল বৈষ্ণব-দর্শন।
জগা-মাধায়ের চির উদ্ধার নিতাইর শ্রীচরণ।
গোলোকের লীলা ভূলোকে আনিলা জগৎ-জনের তরে'
মানুষের কত ভাগ্য। নিমাই আসিল নরের ঘরে।
প্রেমিক উদাস নিতাই ঠাকুর উদার ভাবের বানে
ভাসাইয়া দিল বিশ্ব-ভুবন,— বিশ্বের কল্যানে।
ভগবৎ-কথা ভগবানই জানে ;—রাধা-ভাবে গোরাচাঁদ
স্বরূপাস্বাদে মাতিয়া মাতাল, ভাঙ্গিল প্রেমের বাঁধ।
পৃথিবীর ধন-সম্পৎ হারা, তবু কত লোভনীয়
তব আত্মিক সম্পদ্ মাগো ! গোরার করুণামিয়।
প্রতি কিছুতেই রয়েছে ছড়ান। তোমারি গোরাবতার।
মধুর বাঙ্লা, মধুর ! মধুর ! নমি তোমা বার বার।

জীবের মনুষ্য জন্ম—৫

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

পুণ্য ভারত ভূমিতে দেবদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও অধিকাংশ লোক দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধুকৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্য জড় পুরুষকার বলে জাগতিক সম্পদ্ ও প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াও আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্যমান হইয়াও থাকে, এবং প্রতিভাবলে জড় বিজ্ঞানের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়াই থাকে। এতদবস্থায় সে অভিমান বশতঃ আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনের দিগ্ দর্শনও করিতে চাহে না, কিন্তু সুখপ্রাপ্তির আশায় জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে আজীবন দুঃখ-নিবৃত্তি করিয়াই বৃথা কালক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহার একটি দুঃখ নিবৃত্ত হইতে না হইতে নূতন নূতন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। পঞ্চদশী বেদান্তকার বলিয়াছেন—

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বা প্রতিক্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ ভারবাহী শ্রমজীবী যেমন শিরে গুরুভার বহন করিতে শিরঃপীড়া পাইলে ভারটি শিরোদেশ হইতে নামাইয়া স্কন্ধে আরোপিত করিয়া থাকে এবং স্কন্ধদেশে বেদনা অনুভূত হইলে পুনরায় তাহা শিরে ধারণ করে, ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্যের দুঃখের সকল প্রতিকারও ঠিক সেইরূপ—একটি দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহাকে আর একটি দুঃখ আগে স্বীকার করিতে হয়। যেদিন সৌভাগ্য-ক্রমে সাধুকৃপা লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে, সেইদিন হইতেই তাহার সকল দুঃখ-ভার আপনিই যথার্থ অপনোদিত হইয়া যাইবে।

একমাত্র যে বস্তু জানিতে পারিলে জীবের আর কিছুই জানিবার বাকি থাকে না, সেই শ্রীভগবচ্চরণের অজ্ঞতা-হেতু ভগবদ্ভজন-বিমুখ মনুষ্য জড়-বিজ্ঞানবলে সব জানিয়াও কিছুই জানে না। দেহ-দৈহিকাদি ব্যবহারিক জগৎ ও স্বার্থসম্বন্ধে আপনাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞ মনে করিলেও সে আপনাকেই জানে না, জগৎ বা স্বার্থ কি করিয়া জানিবে? অনিত্য মায়িক জগতের যথার্থ-স্বরূপ, নিজের নিত্য ও যথার্থ স্বরূপ, এবং পরমার্থ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির সকল প্রয়াসই তাহার কেবল বিড়ম্বনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই শ্রীল প্রেমানন্দ দাস বড় দুঃখেই গাহিয়াছেন—

হরি না জানিয়া লাখ জান যদি
সে জানা কেবল ছাই। ইত্যাদি

"কস্মিন্ বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি," শ্রীসনকাদি মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"গোপী-জন-বল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি" (শ্রুতি)

অর্থাৎ "যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন অখিলং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি", এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানলাভ হইলেই ঘট-পটাদি অখিল মৃন্ময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া যায়, সেইরূপ এক শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ জানিতে পারিলেই নিজের ও অপরের যথার্থ স্বরূপ এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তই যথার্থরূপে জানা হইয়া যায়। একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণ জানার ফলেই সকল অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া জীবের অখিল দুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি সংসাধিত হইয়া থাকে, অন্য কোনও উপায়েই তাহা সম্ভবপর নহে।

যে ব্যক্তি সূর্য্য দেখে না, সে নিজেকে দেখেনা, অন্যকেও দেখিতে পায় না এবং অন্ধকারেই মগ্ন থাকে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে দেখে না, সে নিজেকেও দেখে না, অন্যের স্বরূপও দেখিতে পায় না এবং মায়ার কুহকে নিমজ্জিত থাকিয়া বিবিধ দুঃখভোগই করিয়া থাকে। সূর্য্য দেখিতে পাইলে নিজেকে দেখিবার জন্য বা অন্ধকার দূর করিবার

জন্য যেমন কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তদুভয় বিনা প্রযত্নে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবজ্জ্ঞান লাভ হইলেই বিনা সাধনে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং দুঃখেরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবজ্জ্ঞানে জীবের অনাদি ভগবৎ-বিস্মৃতি দূর হইলেই মায়িক দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয় এবং মায়াকৃত সকল কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বেরও অবসান হইয়া যায়। জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; এই ঔপাধিক কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানই তাহার সকল দুঃখের কারণ। একমাত্র কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির সম্যক্ নিবৃত্তিই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি আর কিছুতেই হইবার নহে।

শ্রীভগবজ্জ্ঞানে জীবের স্বরূপগত অজ্ঞান দূর হইলেই নিজের যথার্থ স্বরূপ, অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণদাস-স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি যুগপৎ সংসাধিত হইয়া যায়; কারণ শ্রীভগবজ্জ্ঞানে পরমানন্দঘন শ্রীভগবানের রূপ গুণ ও লীলা-মাধুর্য্যাদির অনুভব ত থাকেই, অধিকন্তু নিজের নিত্যদাস স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হেতু তাঁহার সহিত নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধেরও অনুসন্ধান ও অনুভব হইয়া থাকে। এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধের আস্বাদন-সমন্বিত উল্লাসময় জ্ঞানই প্রেম নামে অভিহিত হয়। শ্রীভগবৎপ্রেম শ্রীভগবজ্জ্ঞানেরই অপর পর্য্যায় মাত্র, কারণ এই জ্ঞানে নিজ নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপের উপলব্ধি হইলেই মমতাতিশয় যুক্ত হইয়া প্রেমের লক্ষণ—সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণ-সেবায় তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। প্রেমলাভ হইলেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণে সেবা প্রাপ্তির অধিকার লাভ হয়। প্রেমানন্দ ও সেবানন্দই পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই জ্ঞানকে সম্বিতের সার এবং প্রেমকে হ্লাদিনীর সার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিদংশের শক্তি সম্বিৎ এই জ্ঞানে প্রধানরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার সদংশের শক্তি সন্ধিনী এবং আনন্দাংশের শক্তি হ্লাদিনীর যোগ ইহাতে থাকেই। সেইরূপ প্রেমেও হ্লাদিনী শক্তি প্রধানরূপে থাকিলেও সন্ধিনী ও সম্বিতের সংযোগ থাকে। অতএব এইজ্ঞান ও প্রেম দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে, দুইটিই নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু—জড় পদার্থ নহে, এবং শ্রীভগবান্ উভয়েরই আশ্রয় হইলেও প্রেম তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণেরই সর্ব্বস্ব; উভয়েই স্বপ্রকাশ বস্তু, সাধুকৃপা হেতু শুদ্ধা-ভক্তি যাজনে সাধকের হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞান ও প্রেমলাভ একমাত্র শুদ্ধাভক্তি যাজনসাপেক্ষ, এবং সাধুকৃপা বলেই বহির্মুখ জীব শুদ্ধ ভক্তিযোগ আশ্রয়ের সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আদিগুরুরূপে স্বীয় নাভিকমল হইতে উৎপন্ন শ্রীব্রহ্মাকে এই জ্ঞান, প্রেম ও তদুভয় প্রাপ্তির উপায় সাধন-ভক্তিযোগ দিয়া বলিয়াছিলেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ভাগ ২।৯।৩০

হে ব্রহ্মণ্! আমার অপ্রাকৃত রূপ গুণাদির জ্ঞান পরম গুহ্য; আমি তোমাকে অনুভবের সহিত সেই জ্ঞান, অতি গোপনীয় প্রেমভক্তি, এবং সেই প্রেমভক্তিরই অঙ্গ সাধনভক্তি, যাহা হইতে ঐ জ্ঞান ও প্রেমভক্তি লাভ হয়, তৎসমুদয় বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া তাহা গ্রহণ কর।

শ্রীভগবান্ এই জ্ঞানকে পরম গুহ্য বলিয়াছেন, কারণ এই জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি হইতে অতি শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিকর॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ গুণাদির অনুভবের সহিত তাঁহাকে প্রিয়তম বলিয়া বুঝাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞানাদি এই জ্ঞানেরই পরিবার। অর্থাৎ শ্রীভগবান্কেই কেবল সর্ব্বব্যাপী চিৎসত্তা বলিয়া বুঝিবার নাম ব্রহ্মজ্ঞান, এবং তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্যামী চিৎসত্তা বলিয়া বুঝিবার নামই পরমাত্মজ্ঞান; সুতরাং এই সকল জ্ঞান ভগবজ্জ্ঞানেরই পরিকর মাত্র। জড় বিজ্ঞান তুচ্ছ ও নগণ্য জ্ঞান মাত্র। যোগসাধনে দেহে অহন্তা ও দৈহিক বিষয়ে মমতা-ভ্রম দূর হইলে জীবের যে শুদ্ধ চিৎকণ স্বরূপ-জ্ঞান হয় তাহাকেই আত্মজ্ঞান কহে। শ্রীভগবজ্-

জ্ঞান লাভ হইলে এই সকল কোন জ্ঞানই অজ্ঞাত থাকে না, সেইজন্য শ্রীভগবজ্জ্ঞানকেই পরমগুহ্যজ্ঞান বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগ ১।২।১১

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্গণ যে অদ্বয় জ্ঞান বা অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই পরতত্ত্ব বস্তুই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একই পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ মাত্র। এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব বস্তুই কেবল-জ্ঞান সাধনে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ চিৎসত্তা-স্বরূপ ব্রহ্মরূপে, যোগ সাধনে সর্ব্বান্তর্যামী কিঞ্চিদ্বিশেষ চিৎসত্তাস্বরূপ পরমাত্মরূপে এবং ভক্তি সাধনে সম্পূর্ণ-সাবশেষ চিদ্বিগ্রহ ষড়ৈশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি মহামাধুর্য্যসমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী ও যোগীর প্রয়োজন কেবল দুঃখ নিবৃত্তি, সুতরাং জ্ঞান ও যোগসাধনে পরতত্ত্বের চিৎসামান্য সত্তায় নিজেদের ক্ষুদ্র সত্তা লয় করিয়াই তাঁহারা চিরশান্তি লাভ করেন; পরতত্ত্বের পরানন্দ ভোগের অবসর তাঁহাদের আর হয় না। তাঁহারা স্ব স্ব মতানুসারে ভগবদ্ধামবিগ্রহাদি ও ইদংকারাস্পদ বিশ্বাদি সমস্তই ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মায়াশক্তির কার্য্য মনে করিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দ্বিতীয়ত্বাভাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রয়োজন নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধি শ্রীভগবচ্চরণের সেবাপ্রাপ্তি, তাঁহার শুদ্ধা ভক্তি সাধনের ফলে ঐ অখণ্ড পরতত্ত্বই সচ্চিদানন্দঘন ভক্তবৎসল শ্রীভগবদ্রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তাঁহাকে নিত্যসেবা দান করিয়া স্বীয় রূপগুণলীলাদির অচিন্ত্যানন্ত মাধুর্য্যাস্বাদন করাইয়া থাকেন। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্তেরই এই চরম সৌভাগ্যলাভের অধিকার হয়। অতএব শুদ্ধভক্তিসাধনে পরতত্ত্বের যে জ্ঞানলাভ হয় সেই জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, স্বপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু শুদ্ধ ভক্তিসাধনেই কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং সাকল্যে সাধকের অপরোক্ষানুভূতির বিষয় হইয়া থাকেন। শাস্ত্রও শ্রীভগবান্‌কে "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্," "কৃষ্ণায় পরমাত্মনে," "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং," "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং," "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা শ্রীভগবানেরই ব্রহ্ম-পরমাত্মতার উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্‌কেই মূল পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্যই শাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসক-জ্ঞানী হইতে পরমাত্মোপাসক যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং যোগী হইতে ভগবদুপাসক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

(গীতা ৬.৪৬-৪৭)

আদিদেব আদি-ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা শ্রীব্রহ্মা এই মূল পরতত্ত্ব শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অনুভব-সমন্বিত সম্যক্‌জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সহিত শ্রীভগবচ্চরণের আস্বাদন ও সেবা-প্রাপ্তির উপায় অতি রহস্য প্রেমভক্তি, এবং সেই প্রেমভক্তি-প্রাপ্তিরও উপায় সাধন-ভক্তি স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখকমল হইতে চতুঃশ্লোকী ভাগবতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বপুত্র শ্রীনারদকে এই জ্ঞান, প্রেমভক্তি ও সাধন-ভক্তি উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীনারদের উপদেশে পরব্রহ্ম-ধ্যানতৎপর বিশুদ্ধহৃদয় মহামুনি শ্রীবেদব্যাস ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মল ও নিশ্চল চিত্তে এই জ্ঞান ও প্রেম, তদুভয়ের অন্তরায় মায়া, এবং তদুভয়প্রাপ্তির সাধন ভক্তিযোগ সম্যক্ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়াই হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের অর্থই শ্রীবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ অনুভূতি এবং তাহাই তিনি বিস্তারিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তমাত্রেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধপাবনভক্তি-যাজনের ফলেই সেই অনুভূতি সম্যক্‌লাভ করিয়া থাকেন। সেই অনুভূতি সংক্ষেপতঃ এই যে—

(১) সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাশ্রয় ও অদ্বিতীয় মূল পরতত্ত্ব,

(২) তাঁহারই অঙ্গজ্যোতিঃ তরল সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত, জ্ঞানী জ্ঞানসাধনে সেই নির্ব্বিশেষ বিভু চিৎসত্তায় সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন।

(৩) তাঁহারই অংশ পরমাত্মা সর্ব্বজীবহৃদয়ে অন্তর্যামী

কিঞ্চিদ্বিশেষ নিয়ন্তৃ চিৎসত্তারূপে বিরাজমান। বহু জলপাত্রে একই সূর্য্যের যেমন বিভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় সেইরূপ একই পরমাত্মা প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। যোগী যোগসাধনে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়েন।

(৪) একই বিগ্রহে তাঁহার অনন্ত প্রকাশ, অংশ, কলা ও বিলাসমূর্ত্তি অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধামে বিদ্যমান, এবং মায়াবদ্ধ জীবোদ্ধারাদি-হেতু সময়ে সময়ে সেই সেই মূর্ত্তিতে লীলাসহ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন।

(৫) তাঁহার অনন্তশক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি এবং তটস্থা বা জীবশক্তি এই তিনটি প্রধানা শক্তি। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি তিন ভাগে বিভক্তা—তাঁহার সদংশের শক্তির নাম সন্ধিনী, চিদংশের শক্তির নাম সম্বিৎ এবং আনন্দাংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী। সন্ধিনী-শক্তির সারাংশের নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। শ্রীভগবানের বিগ্রহ, তাঁহার পিতামাতা-দাস-সখাদি পার্ষদ এবং তাঁহার গোলোক ও অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রভৃতি সকলই বিশুদ্ধ-সত্ত্বের মূর্ত্তি। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বই স্বপ্রকাশিকাশক্তি, ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে তথায় তাঁহার প্রকাশ হয়। জ্ঞানশক্তির নাম সম্বিৎ, সম্বিৎশক্তি জীবে সঞ্চারিত হইলে কৃষ্ণভগবত্তা জ্ঞান লাভ হয়। হ্লাদিনীশক্তির সারাংশ প্রেম নামে অভিহিত, প্রেমের ঘনীভূতা মূর্ত্তি শতকোটি ব্রজবিলাসিনী, এবং মহাভাব প্রেমের মূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীরাধারাণী। শ্রীভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণের সহিত অনন্ত মূর্ত্তিতে স্ব স্ব ধামে নিত্য লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং স্বয়ং তিনি তাঁহার নিত্যধাম শ্রীগোলোকে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য চারি রসের পার্ষদগণের সহিতই নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীরাসাদি লীলাই তাঁহার সর্ব্বলীলামুকুটমণি। সেই লীলার সেবালাভই জীবশক্তির সৌভাগ্যের সীমা।

(৬) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও তত্রস্থ জীবদেহাদি তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য। জীবশক্তি অস্বতন্ত্রা, তাঁহার মায়াশক্তি কিম্বা স্বরূপশক্তির অধীন বলিয়া তটস্থা নামে অভিহিত হয়। নিত্যমুক্ত জীব তাঁহার পার্ষদগণের সহিত নিত্যধামে তাঁহার সেবাসুখ আস্বাদন করিয়া থাকে, নিত্যবদ্ধ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার মায়াশক্তির অধীন হয় এবং মায়িক দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞানবশতঃ মায়ারই কার্য্য অনন্ত সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জীব স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য, অল্পজ্ঞ ও নিত্য-নিয়ম্য এবং সংখ্যায় অনন্ত; শ্রীভগবৎসেবাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে শাস্ত্র ও সাধুরূপে আসিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও সাধুকৃপায় স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়াই মায়াবদ্ধ জীব শুদ্ধাভক্তি-সাধনে মায়াতিক্রম এবং শ্রীভগবচ্চরণে জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিয়া নিত্যসেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। শুদ্ধাভক্তি সাধনেই শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ হইতে সাধকহৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রেম শ্রীভগবানেরই আস্বাদ্য, প্রেম লাভ হইলেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণে সেবাধিকার লাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রেমলাভই মায়াবদ্ধ জীবের আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-যাজনের ফলেই ভক্তচিত্তে এই সুসিদ্ধান্তসম্বলিত তত্ত্বসমূদয় সম্যক্‌প্রকারে অপরোক্ষানুভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ সাধন-ভজনের মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে জ্ঞান ও প্রেমলাভ, এবং অজ্ঞান ও দুঃখ নিবৃত্তি তাহার অবান্তর ফলরূপে আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। শ্রীসূতমহাশয় শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

> বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
> জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
>
> ভাগ ১।২।৭

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বাসুদেবের দাস্য-সখ্যাদি সম্বন্ধযুক্ত শুদ্ধভজনের ফলে শুষ্কতর্কাদির অগোচর ভগবদ্রূপ-গুণ-লীলামাধুর্য্যানুভবময় নিরুপাধিক জ্ঞান সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, এবং বিষয়ান্তরে আশু বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সকল অজ্ঞান ও দুঃখ আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

শুদ্ধ সাধন-ভক্তি যাজনের ফল এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকহৃদয় সম্যক্ আর্দ্রীভূত হইয়া শ্রীভগবানে দাস্য-সখ্যাদি-সম্বন্ধযুক্ত মমতাতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে শ্রীভগবদ্রূপগুণ-লীলা-মাধুর্য্যানুভব-ময় জ্ঞানের এই অবস্থাই প্রেমসংজ্ঞা লাভ

করিয়া থাকে। প্রেম লাভই জীবের চরমপুরুষার্থ-শিরোমণি, কারণ প্রেমলাভ হইলেই প্রেমবান্ ভক্তের সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণে সেবাপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর সাক্ষাৎ সেবায় অধিকার লাভ হয়। শ্রীভগবচ্চরণের সাক্ষাৎ সেবাই জীবের পরমানন্দ-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রেমের প্রভাবেই সাক্ষাৎ-সেবাপ্রাপ্তি হয় বলিয়া প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। জীবের এতাদৃশ সৌভাগ্যলাভ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিযাজনসাপেক্ষ বলিয়া শাস্ত্রকার শুদ্ধাসাধনভক্তিকেই অভিধেয়-তত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীভগবচ্চরণের কেবল সেবার জন্যই তাঁহারই অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও লীলাকথাদির কায়মনোবাক্যে সেবা করার নামই শুদ্ধভক্তিযোগ। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধ্যাদি-প্রাপ্তিকামনারূপ-কৈতবশূন্য বলিয়াই এই ভজনকে শুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভক্তি বা ভজন শব্দ ভজ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ভজধাতুর অর্থই সেবা করা; সুতরাং সাধকাবস্থার সাধনভক্তি এবং সিদ্ধাবস্থায় প্রেম-ভক্তি দুইই শ্রীভগবানের সেবা, পার্থক্য কেবল অপক্ক ও পক্ক অবস্থায়। এইজন্যই শুদ্ধভক্তের সাধনই সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তিনি সেবার জন্যই সেবারূপ সাধন করিয়া থাকেন, আর কিছুই চাহেন না; সেবাই তাঁহার চরম-পুরুষার্থ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র শুদ্ধভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সকল উপাধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যাভিলাষিতাবর্জ্জিত ও জ্ঞানকর্ম্মাদি-আবরণশূন্য হইয়া কেবল আনুকূল্যসেবাপরতার সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপ শ্রীভগবানের সেবা করার নামই শুদ্ধাভক্তি।

শ্রীভগবন্নাম, শ্রীবিগ্রহ ও লীলাকথা শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, সুতরাং এইসকল স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু সাধকের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; কিন্তু সাধক সাধুকৃপাবলে সেবোন্মুখ হইলেই ইঁহারা কৃপা করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ নাম ও নামীর ভেদাভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সাধকের প্রাকৃতেন্দ্রিয়সমূহের বিষয় নহে, কিন্তু শুদ্ধভজনে প্রবৃত্ত হইলে ইঁহারা সাধকের জিহ্বাদিতে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে—সাধু-কৃপাবলে শুদ্ধসাধনভক্তি আশ্রয় করিবার প্রবৃত্তি হইলেই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি কৃপা করিয়া সাধকের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সমূহকে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন।

শুদ্ধসাধনভক্তি সাধারণতঃ নবলক্ষণা বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে সেই নয়টি লক্ষণ বলিয়াছিলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ভাগ ৭।৫।১৮

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামরূপগুণ ও লীলাময় বাক্যের শ্রবণ ও কীর্ত্তন, নামরূপগুণলীলার স্মরণ, শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদির পাদসেবা, পূজা, নমস্কার, দাস্যাভিমান, সখ্য, এবং দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে নিবেদন—ইহাই সাধনভক্তির নব লক্ষণ বা অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তিযোগ শাস্ত্রে বর্ণিত থাকিলেও অস্মদ্দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুই কৃপাপূর্ব্বক ইহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া ভাগ্যহীন কলিহত জীবকে এতাদৃশ সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনিই এই সাধনভক্তি বিস্তার-পূর্ব্বক ইহার গুরুপাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্টি অঙ্গ আমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সাধনভক্তির বহু কিম্বা এক অঙ্গ সাধনের ফলেই শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ অবশ্য-ম্ভাবী এবং তদনন্তর সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণে সেবালাভ হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে—বহির্মুখ মনু-

ন্মের কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুসঙ্গ লাভ হইলে শ্রীভগবচ্চরণভজনে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, এবং সাধু-কৃপাবলেই সে শুদ্ধসাধনভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনের ফলে তাহার অনর্থরাশি অর্থাৎ ভজনের সকল বাধা বিঘ্ন ক্রমশঃ দূর হইয়া যায়, এবং ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি যথাক্রমে প্রকটিত হইয়া থাকে। এতদবস্থায় তাহার মন আদি একাদশ ইন্দ্রিয় বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ণ-মাত্রায় ভগবদ্ভজনোন্মুখতা লাভ করে, এবং চিত্ত হইতে কামনাবাসনাদি সমূলে বিদূরিত হইলে সেই সম্যক্ বিশুদ্ধ চিত্তে যথাকালে ভাব ও প্রেমের উদয় হয়। শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ হইলেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণের সেবা-প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগ-বানের স্বরূপশক্তির কৃপায় তাহার প্রাকৃত দেহের অভ্য-ন্তরেই শ্রীভগবৎ-সেবোপযোগী চিদ্দেহের গঠন হয়। যথাকালে তাহার প্রাকৃতদেহের পতন হইলে যোগমায়া-কর্ত্তৃক সে শ্রীভগবানের প্রকটলীলায় প্রবেশলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধপার্ষদগণের আনুগত্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণ-সেবায় অধিকার লাভ করে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণে সেবা-লাভই জীবের মনুষ্যজন্মের সফলতার পরাকাষ্ঠা এবং শ্রীমন্মহা-প্রভু জগতে জানাইয়াছেন যে—শ্রীরাধামাধবের যুগলসেবাই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি। সেই কেশশেষাদ্যগম্যা শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা লাভের এই সাধন শ্রীমন্মহাপ্রভুই কৃপা করিয়া আমাদিগের সুলভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত শুদ্ধাভক্তিসাধনকেই "মধুর-বৃন্দাবিপিনমাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার" বলিয়া পদকর্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় এই শুদ্ধা সাধনভক্তির দুইটি প্রকার দেখাইয়াছেন—(১) বৈধী ও (২) রাগা-নুগা। বৈধী সাধনভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন—

রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ যাঁহা-দের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই তাঁহারা কেবল শাস্ত্রাজ্ঞা পালনের নিমিত্ত যে পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তি যাজন করেন তাহাকে বৈধী সাধনভক্তি কহে।

রাগানুগা সাধনভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—

রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসীজনেরই ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা বা রাগ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই রাগময়ী কৃষ্ণভক্তিই রাগাত্মিকা নামে উক্ত হইয়াছে। এই ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনকেই রাগানুগা ভক্তি কহে। রাগানুগা সাধনভক্তিযাজনে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই, কেবল কোন এক ব্রজপার্ষদের ভাবপ্রাপ্তিতে লোভহেতু তাঁহার আনুগত্যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা-ভাবনাই এই ভক্তির লক্ষণ। বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে ইহাতে দুই প্রকার সাধন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

অর্থাৎ রাগানুগা সাধনভক্তিতে বাহ্য ও অভ্যন্তর দুই সাধন যুগপৎ যাজন করিতে হয়। বাহ্য সাধকদেহ দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন এবং মনে মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ ভাবনা করিয়া সেই দেহ দ্বারা নিজাভীষ্ট নিত্যসিদ্ধ-ভক্তের আনুগত্যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা ভাবনা করিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই রাগানুগা সাধনভক্তি যাজনের ফলেই অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ এবং অনতিবিলম্বে তচ্চরণের সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের পুরুষার্থের চরম পরাকাষ্ঠা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, ব্রজলীলায় তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূতা মূর্ত্তি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা-রাণীর প্রেমসেবায় তাঁহারও লোভ হয় বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই সেবাসুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং অনুষঙ্গে

কলিহত জগৎ জীবকে রাগানুগা ভজন দ্বারা শ্রীরাধামাধবের মধুর লীলায় আত্মসমর্পণ করাইয়া কেশশেষাদির অগোচর সেই যুগলসেবাসুখ লাভের সাধন দান করিয়া থাকেন। গোলোকে তিনি নিত্য প্রেমরস আস্বাদন করেন এবং ব্রহ্মার একদিনে একবারমাত্র ভূলোকে ব্রজলীলা প্রকট করিয়া সেই প্রেমরসেরই নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। ব্রজলীলায় রাগমার্গের ভক্তি প্রচারণের ইচ্ছা থাকিলেও সাধারণে তাহার সন্ধান পায় না, কারণ ব্রজে গো-গোপ-গোপীর প্রেমরস আস্বাদনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তি হয় না এবং তাঁহাদের ও তাঁহার মাধুর্য্যাস্বাদনে পরিতৃপ্তি হয় না; সুতরাং বহিরঙ্গের মধ্যে প্রেমবান্ ভক্তগণ ব্যতীত আর কাহারও সাক্ষাৎ সে সৌভাগ্য লাভ হয় না।

প্রেমের পরিপাকের পরাবধি মহাভাব; প্রেম কেবল ব্রজভূমিতেই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এই কয়টি কক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক মহাভাবরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। উৎকর্ষতার তারতম্যে ব্রজপার্ষদগণেই স্নেহাদিক্রমে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম ব্যক্ত হইয়া থাকে। মহাভাব-প্রেম শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণেরই নিজস্ব সম্পত্তি এবং অধিরূঢ়-মহাভাবের মাদনাখ্য পরাৎপর স্বরূপের আশ্রয় একমাত্র শ্রীরাধারাণী; একমাত্র শ্রীরাধারাণীই সেই প্রেমের সেবাসুখ সম্যক্ আস্বাদন করিতে সমর্থা। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজাতীয় প্রেমেরই বিষয় এবং বিষয়জাতীয় সুখই তাঁহার আস্বাদ্য হইলেও তিনি বিষয়রূপেও সেই সেই আশ্রয়জাতীয় সুখও কথঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল শ্রীরাধারাণীর এই মাদনাখ্য মহাভাবের তিনি আশ্রয় হইতে পারেন না বলিয়াই শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই মহাভাব প্রেমের সেবায় যে সুখসিন্ধু উদ্বেলিত হয় তাহার ধারণযোগ্য আধার একমাত্র শ্রীরাধারাণী, তিনিই কেবল সে তরঙ্গের বেগ ধারণ করিতে পারেন। স্বয়ং শ্রীভগবানেরও সে বেগ ধারণের সামর্থ্য নাই বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোমকূপে রক্তোদ্গমাদি যে সকল দৈহিক বিকার উপস্থিত হয় স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর তাহা হয় না।

শ্রীরাধারাণীর এই প্রেমসেবা-সুখের পরম চমৎকারকারী আস্বাদন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষাতীত বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎবাসীকে ইহার সন্ধান দিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহারই কৃপায় কলিহত জগৎজীব রাগানুগা সাধন-ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীরাধামাধবের যুগললীলার সেবাসুখ লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্বে জগতে কেবল ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিধিভক্তিই প্রচলিত ছিল, বিধিভক্তিতে তাঁহার শ্রীনারায়ণাদি অংশ-স্বরূপের ভজন ফলে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় লাভপূর্ব্বক সাধকের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিই চরম পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজে আচরণ করিয়া সাধনভক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ শ্রীনামসংকীর্ত্তন জগতে প্রবর্ত্তন করেন, এবং দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য চারিভাবেই তাঁহার স্বয়ংরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য সেবালাভের সাধন শুদ্ধা-ভক্তিমার্গ জগতে অবিচারে প্রচার করেন। তিনিই জানাইয়া দেন যে—শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রয়ে রাগানুগা সাধন-ভক্তি যাজনের ফলে শ্রীরাধামাধবের শ্রীরাসাদি নিভৃত নিকুঞ্জলীলায় সেবালাভই জীবের সৌভাগ্যের পরমতম চরম পরাকাষ্ঠা। পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ তাই গাহিয়াছেন—

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা,
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল হইয়া মন।
এ ভব সংসারে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া,
কেমনে গড়িয়াছে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তিসাধন-পথ-প্রদর্শন কেবল পরবর্ত্তী জীবের জন্য, তাঁহার প্রকট সময়ে তিনি সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়াই যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছেন তাহাকেই নামের সহিত প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি অপরাধের বিচার না করিয়াই নামের মুখ্যফল প্রেম

নামের সহিতই দান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

বাহুতুলি হরি বলি প্রেম দিঠে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

তাঁহার অপ্রকটকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়েই শুদ্ধা ভক্তি যাজনের ফলে অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, গৌরচরণাশ্রয়ী মহাভাগ্যবান্ মাত্রেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্যের নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাঙ্গ বিহ্বল সে হয়॥

আমরা শাস্ত্রপ্রমাণসহ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে—কলিযুগ সর্ব্বদোষের আকর হইলেও সাধনের সুলভতা ও সৌকর্য্য হেতু কলিযুগই চতুর্যুগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। সকল কলিযুগেই শ্রীভগবান্ যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম নাম প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মার একদিনের দ্বিসহস্র কলিযুগের মধ্যে কেবল একটি মাত্র কলিযুগে স্বয়ং শ্রীভগবান্ দ্বাপর-লীলাবসানে শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের এতাদৃশ সৌভাগ্যদান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কলিযুগই সেই ধন্য কলিযুগ, সুতরাং ইহার বিশেষত্ব বর্ণনাতীত। পরিপূর্ণ করুণাসাগর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অবিচারে এতাদৃশ করুণা-বিতরণে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেইজন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীল প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার যৎ-কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

ভব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি॥
হাঁসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

প্রেমের অবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্দ্ধ-চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে আপামর সাধারণে নাম ও প্রেম বিতরণ করিয়াই চণ্ডালাদি নীচ জাতির অস্পৃশ্যতা পরিবর্জ্জনের যথার্থ পথ দেখাইয়াছেন, অমর বৈষ্ণবকবির পূর্ব্বোক্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ। আধুনিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আন্দোলন যাহা সমগ্র ভারত ভূমিকে আলোড়িত করিতেছে. সেটি কেবল কলির প্রভাবই বুঝিতে হইবে। এই প্রাণহীন অহিতকর প্রয়াস কখনই সফল হইবার নহে, কারণ ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমাচার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখিয়াই যে উপায়ে অস্পৃশ্যতা দূর করিয়াছেন একমাত্র সেই ভক্তিপথ আশ্রয় ব্যতীত কোন কালেই পুণ্য ভারত-ভূমি হইতে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের ইহাও বিশেষ অনুধাবনের বিষয় যে—সাধারণতঃ কলিযুগের পরমায়ু ৪৩২০০০ বৎসর, কিন্তু বর্ত্তমান কলির কেবল ৫০০০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে, অথচ এখনই শাস্ত্রবর্ণিত কলির শেষের ভয়ঙ্কর লক্ষণসমূহই আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে—নাস্তিকতার প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করিয়া পুণ্য-ভারতভূমিতেও দেখা দিয়াছে। আমাদের ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ এই সকল উৎপাত কলির "মরণ কামড়" বলিয়াই বুঝিতে হইবে—বর্ত্তমান বিশিষ্ট কলিযুগের পরমায়ুঃ প্রায় শেষ হইয়াছে এবং কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমযুগ আগত-প্রায়, তাঁহার শ্রীমুখের আশ্বাস-বাণীই আমাদের একমাত্র ভরসা। তিনি বলিয়াছেন—

পৃথিবীর মধ্যে যত আছে দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

অতএব আধুনিক বিষম সমস্যার দিনে আমাদিগের সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের জয়গান ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ (ক্রমশঃ)

বৃষভানুর প্রতি রাইজননী

[শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী]

কি হল! কি হল! কি দেবা পাইল,
কি ব্যাধি ঘিরিল ভেবে না পাই,
ওগো মহারাজ! বুকে হানি বাজ
হ'ল পাগলিনী বুঝি বা রাই।
ধরণীর ধূলি দুই হাত তুলি
কভু মাখে বাছা সোণার অঙ্গে,
ভাসি আঁখিজলে হাসি হাসি বলে
"বঁধু-পদরজ" নয়নভঙ্গে।
সাঝের আকাশে চাহি মৃদু হাসে
"বঁধু-আঁখিতারা" বলিয়ে ধায়,
নেহারি যমুনা "বঁধুর করুণা"
বলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িতে চায়।
দখিন পবন করি পরশন
আবেশে বিবশ বিভল পারা,
তুলসী গন্ধে কাঁদে আনন্দে
কমললোচন পলক হারা।
ইন্দু-উদয়ে লাজে সারা হয়ে
চেপে ধরে বুকে আঁচল খানি;
ঘন দরশনে চঞ্চল মনে
নেচে ওঠে বাছা কেন না জানি।
হেরিলে শ্যামলী "এস এস" বলি
কোলে তুলি কত সোহাগ করে,
হেরি কাল সখী বলে—"নীলমণি
জ্বলিতেছে তার মাথার পরে।"
শূন্য-নয়নে দূর বন পানে
চেয়ে থাকে রাই বোবার মত,
দেখে লাগে ভয় কি জানি কি হয়
মায়ের পরাণে ওঠে যে কত।
কি হল আমার সোণার বাছার,
তারে কোন্ দেবা করিল ভর?
কর আয়োজন করি তরপণ
হৃদয় রুধিবে ঘুচাব ডর।

বন্দী

[প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা]

তুমি আমার প্রাণের বঁধু আমি তোমার আদরিণী।
তোমার রসের রূপখানি অই আমি কিগো নাহি চিনি
সকল সোহাগ ভুলি তুমি
লুকাও সে কোন ফুলের বনে।
কোন গগনে গহন-তলে কোন সাগরে সঙ্গোপনে।
দিগ্ দিগন্তে খুঁজি প্রাণে পাই না
তোমার কোন দিনই।
তোমার স্মরণ সোনার স্বপন শরণ শুধু মোর
নয়নজলে ভাসি করি দুখের নিশি ভোর।
আসার আশার আভাস বুকে বহি অনুদিনই।
আজ্ কে প্রাণের পুষ্পদলে চপল মধু পেয়ে,
পেয়েছি আর পরাণ ধরি দিবনাকো ছেড়ে,
বাঁধি সাধের সুখের সুধা মধুরসের ফেরে
চির-জীবন রাখব্ যত চতুরতা জিনি।

ধ্বন্যালোক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।]

অবিবক্ষিত বা তিরস্কৃতবাচ্য আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণেও দৃষ্ট হয়; যথা,

রবিসংক্রান্ত সৌভাগ্যস্তুষারাবৃতমণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥'

পঞ্চবটীর হেমন্তবর্ণনপ্রসঙ্গে ইহা শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি। ইহার সরলার্থ এই যে, সূর্য্যের দ্বারা যাহার সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহার মণ্ডল হিমকণাবৃত, সেই চন্দ্রমা নিশ্বাস (বায়ু) দ্বারা অন্ধ বা অস্পষ্ট দর্পণের মত প্রকাশিত হইতেছে না। অর্থাৎ হেমন্ত-নিশীথে হিমপাত হেতু চন্দ্রমণ্ডল অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছে—উহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ মলিন হইয়াছে। যেমন স্বচ্ছ দর্পণ নিশ্বাস দ্বারা মলিন হয়, সেইরূপ বিমল চন্দ্রও হিম দ্বারা ম্লানকান্তি ধারণ করিয়াছে।

"অন্ধ" শব্দে যাহার দৃষ্টি উপহত হইয়াছে, বুঝাইতেছে। যে জন্মান্ধ তাহার দৃষ্টিও গর্ভে উপহত হইয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তি সম্মুখেও দেখিতে পায় না, এইজন্য সেখানে অন্ধার্থটীর অত্যন্ত তিরস্কার সম্ভব নহে।

এখানে কিন্তু আদর্শে অন্ধত্বটী আরোপিত হইলেও সম্ভব হইতেছে না। এখানে অন্ধ শব্দটী পদার্থ স্পষ্টীকরণে নষ্টদৃষ্টিগত অসমর্থতাকে নিমিত্ত করিয়া আদর্শে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অস্পষ্টতাই প্রতিপাদন করিতেছে। অর্থ এই যে—যেরূপ দৃষ্টি নষ্ট হইলে পদার্থ স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ আদর্শের মলিনতা-নিবন্ধন অস্পষ্ট হওয়ায় উহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণে অসামর্থ্যই সূচিত হইতেছে।

ইহা দ্বারা চন্দ্রের-কান্তিহীনতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভট্টনায়ক এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'ইব' শব্দটীর যোগে এখানে গৌণতা দেখান হয় নাই। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় শ্লোকার্থটী পরিস্ফুট হয় না। আদর্শ ও চন্দ্রের সাদৃশ্যই 'ইব' শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। 'নিশ্বাসান্ধ' পদটী আদর্শের বিশেষণ। 'ইব' শব্দটী অন্ধার্থরূপে যোজিত হইলে আদর্শ চন্দ্রমা উদাহরণস্থানীয় হয়। এইরূপ যোজনা অত্যন্ত কষ্টকল্পনাময়ী। নিশ্বাসের দ্বারা অন্ধের মত আদর্শ ও আদর্শের মত চন্দ্র এইরূপ অর্থও ক্লিষ্ট।

জৈমিনীয় মীমাংসা-সূত্রে এইরূপ শব্দের যোজনা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে উহা অত্যন্ত মাধুর্য্য-বিঘাতক হয়। এখানে 'অন্ধ' শব্দটী অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যের উদাহরণ। শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ইহাই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য।

অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির দুইটী ভেদ ধ্বন্যালোকে উল্লিখিত আছে—

'অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্।
অবিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধা মতম্'॥

অর্থাৎ বাচ্যার্থ যদি অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়, তবে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য, এবং বাচ্যার্থ অত্যন্ত তিরস্কৃত হইলে বা বাচ্যার্থের বোধ না হইয়া অপরার্থ প্রতীত হইলে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথমটীর উদাহরণ রূপে ধ্বন্যালোকে একটী শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার মর্ম্মার্থ বোধে বিষয়টী সুগম হইবে বলিয়া উহা প্রকাশিত হইল। যথা—

স্নিগ্ধশ্যামলকান্তিলিপ্তবিয়তো বেল্লদ্বলাকা ঘনা।
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ
কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বং সহে।
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হাহা হা দেবি ধীরা ভব॥

অর্থাৎ জলসম্বন্ধহেতু সরস, যুবতী-বণিতার মত অসিতবর্ণের কান্তিময় মেঘমালা দ্বারা নভোমণ্ডল বিচ্ছুরিত হইয়াছে ও সেই শ্যামলবর্ণধারী বলাহক-সমূহে পবনোৎকর্ষ ও হর্ষহেতু চলমান বলাকা বা শুভ্র পক্ষিসকল প্রকাশিত হইয়াছে। আকাশ দুরালোক ও মেঘাবৃত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে না ও দিক্‌সকলও দুঃসহ, যেহেতু সূক্ষ্ম-জলকণা-

বহুল করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এখানে 'বায়ু' শব্দের বহুবচন দ্বারা উহাদের মন্দমন্দত্ব ও অনিয়ত চারিদিকে গমন সূচিত হইয়াছে। যদি বলা যায় কোন গৃহায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন কর, সেইজন্য বলা হইতেছে মেঘের সখা ময়ূরসমূহ আনন্দে ষড়্জসংবাদী মধুর কেকাধ্বনি করিতেছে। মেঘোদয়ে নৃত্যশীল শিখীকুল মেঘের কথা দুঃসহরূপে স্মরণ করাইয়া বিরহব্যথা প্রদান করিতেছে। এইরূপ উদ্দীপন বিভাব দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের বিপ্রলম্ভ বা বিরহ উদ্বোধিত হইতেছে। আশ্রয়-অবলম্বন ও বিষয়-অবলম্বন, এই দ্বিকোটিস্থা রতিই রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ সময় শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা সীতাকে মনে মনে ধারণ করিয়া নিজ বৃত্তান্ত বলিতেছেন ;—এইরূপ যথেষ্ট বিরহ দুঃখ হউক, আমি সেই কঠোর হৃদয় রাম,—সকলই সহ্য করিব। এখানে রাম শব্দার্থের ধ্বনিবিশেষে অবকাশ প্রদান করিতেই 'কঠোরহৃদয়' পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে 'রাম' শব্দ দ্বারাই দশরথকুলোদ্ভবত্ব, কৌশল্যাস্নেহপাত্রত্ব, বাল্যচরিত ও জানকীলাভাদি অন্য ধর্ম্মসমূহ অবশ্যই সূচিত হইত। এইরূপে হৃদয়ে নিহিত ও প্রগাঢ়স্মরণাবেশনিবন্ধন বিবিধ চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষীভাবিতা, বিরহবিধুরা প্রিয়াকে শ্রীরাম বলিতেছেন :—বৈদেহি ! এই বিরহ কিরূপে সহ্য করিবে ? হায়, হায়, দেবী ধৈর্য্য ধর। এখানে 'রাম' শব্দে ব্যঙ্গ-ধর্ম্মান্তরপরিণত নামীকেই বুঝাইবে কিন্তু নামমাত্র নহে। ব্যঙ্গ ধর্ম্মান্তর এখানে রাজ্য হইতে সীতার নির্ব্বাসনাদি অসংখ্য বলিয়া উহা শব্দের অভিধাবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সেই অসংখ্যধর্ম্মসমূহ যদি ক্রমেও অভিব্যক্ত হইত, তথাপি উহা এককালীন বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হওয়ায় বিচিত্র-আস্বাদন দানে ও সাতিশয় সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইত না। কিন্তু ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা 'রাম' শব্দটী সহৃদয়ের নিকট বিচিত্র আস্বাদনময় প্রপানক-রসে (সরবৎ) ধূপ, গুড়, মোদক স্থানীয় হইয়া অপূর্ব্ব রমণীয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে উদ্ধৃত আছে।

সাহিত্যদর্পণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রয়োজন-লক্ষণায় ফলের ধর্ম্মিগত ভেদের উদাহরণ স্বরূপ এই শ্লোকটীই প্রদত্ত হইয়াছে।

এখানে অত্যন্ত দুঃখসহিষ্ণুরূপ ধর্ম্মী শ্রীরামে দুঃখ-সহনীয়তারই আধিক্য প্রতীত হইতেছে।

ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে—সীতার প্রতি সাধারণ ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে তদীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারাদির কথা কতই উদিত হইতেছিল ও কত দুঃখই না তিনি সহ্য করিতেছিলেন।

ধর্ম্মান্তর প্রয়োজনটী প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গার্থরূপ সূচনাই এখানে উৎকর্ষের হেতু বুঝিতে হইবে।

এখানে বাচ্যার্থটী প্রধান নহে ; কিন্তু তদ্দ্বারা যে অন্য একটী নিগূঢ় অর্থ সহৃদয় হৃদয়ে নিবেদিত হইয়াছে তাহাই শ্লোকটীর মুখ্যার্থ ও প্রাণ। 'রাম' শব্দই শ্লোকের সর্ব্বস্ব। শ্রীমৎ অভিনব গুপ্তাচার্য্য এইরূপ মর্ম্মই তদীয় ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাটীর নাম 'লোচন' উহা অন্বর্থনামা। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

'কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ'

অর্থাৎ চন্দ্রিকা নাম্নী ধ্বন্যালোকের অপর প্রাচীন ব্যাখ্যা ছিল কিন্তু লোচন (চক্ষু ও ব্যাখ্যা) না থাকিলে চন্দ্রিকা দ্বারাও কি আলোক অর্থাৎ (ধ্বনিবৃত্তি) প্রকাশিত হয় ? সেইজন্য অভিনব গুপ্তপাদ লোচন উন্মীলন করিয়াছেন।

এব বিনাশে সাম্য দ্বারাই কাব্যের চারুতা ঘটিয়া থাকে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কোন প্রিয়াবিরহীর উক্তিটী উদ্ধৃত আছে। বর্ষাকালে মেঘোদয়ে তদীয় প্রিয়াস্মৃতি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল ও মেঘকে এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যথা—

'আক্রন্দাঃ স্তনিতৈর্বিলোচনজলান্যশ্রান্তধারাম্বুভি-
স্তদ্বিচ্ছেদভুবশ্চ শোকশিখিনস্তুল্যাস্তড়িদ্বিভ্রমৈঃ।
অন্তর্মে দয়িতামুখং তব শশী বৃত্তিঃ সমৈবাবয়ো
স্তৎ কিং মামনিশং সখে জলধর ত্বং দগ্ধুমেবোদ্যতঃ।'

অর্থাৎ হে সখে জলধর ! তোমার ও আমার উভয়েরই দশা সমান। তবে কেন তুমি আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ? দেখ আমার প্রিয়াবিরহনিবন্ধন যে

উচ্চ-ক্রন্দন ও বিলাপ, তাহার তুল্য তোমার গর্জ্জনধ্বনি। আমার চক্ষে জল, তোমারও অবিরাম জলধারা বর্ষিত হইতেছে। বিরহনিবন্ধন আমার শোকানলতুল্য তোমার চপলাবিলাস দৃষ্ট হয়। আমার হৃদয়ে প্রিয়ার মুখমণ্ডল সতত জাগিয়া আছে, তোমার মধ্যেও সেই বদনসদৃশ শশী লুক্কায়িত অর্থাৎ বর্ষায় চন্দ্র মেঘাবৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে রসনির্ব্বাহক হৃদয়ের একতানতা সূচিত হইয়াছে।

হেতু-শ্লেষের উদাহরণ রূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লিখিত আছে। উপমা ও হেত্বলঙ্কারসমূহের প্রাচুর্য্য দ্বারা এখানে শ্লেষ অনুগৃহীত হইয়াছে; যথা:—

'রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়া গুণৈ-
স্ত্বামায়ান্তি শিলীমুখাঃ স্মরধনুর্মুক্তাঃ সখে মামপি,
কান্তাপাদতলাহতিস্তবমুদে তদ্বন্মমাপ্যাবয়োঃ
সর্ব্বং তুল্যমশোক কেবলমহং ধাত্রা সশোকঃ কৃতঃ'।

অর্থাৎ অশোক-তরুর লোহিত পল্লব দর্শনে কোন বিরহী নায়কের ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। সেইজন্য এখানে পল্লবরাগই উদ্দীপনবিভাব। তিনি বলিলেন—'হে অশোক! তুমি পল্লবসমূহদ্বারা রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছ; আমিও প্রিয়ার প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা তাহার প্রতি রক্ত (অনুরক্ত) হইয়াছি। তোমার নিকট ভ্রমরগণ আগমন করিতেছে, আমার প্রতিও কন্দর্পধনু হইতে শরসকল মুক্ত হইয়াছে। কান্তার পদাঘাত তোমার আনন্দবিধান করে (সুলক্ষণা সুন্দরী রমণীগণের পদাঘাতে অশোক-তরু মঞ্জরিত হয় ইহা চিরন্তনী কবি-প্রসিদ্ধ), সেইরূপ আমারও। হে অশোক, আমাদের সকল বিষয়েই সাম্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু বিধাতা আমাকে সশোক (শোকাকুল) করিয়াছেন ইহাই প্রভেদ।

এখানে শ্লেষ প্রবৃত্ত হইয়াও ব্যতিরেক অলঙ্কার অভি-প্রায়ে পরিত্যক্ত হইয়া বিপ্রলম্ভ রসই পোষণ করিতেছে। এখানে যে দুইটী অলঙ্কার সন্নিপাত ঘটিয়াছে তাহাও নহে। ইহা যে নৃসিংহবৎ শ্লেষব্যতিরেক-লক্ষণ অন্য অলঙ্কার-বিশেষ, তাহাও নহে কিন্তু সঙ্করালঙ্কারই প্রকারান্তরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কারণ যেখানে শ্লেষবিষয়ক শব্দে প্রকারান্তরে ব্যতিরেক প্রতীত হয় তাহাই সঙ্করের বিষয়। সেইজন্য শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য ব্যাখ্যায় বলেন—'একত্র হি বিষয়ে অলঙ্কারদ্বয়ে প্রতিভোল্লাসঃ সঙ্করঃ' অর্থাৎ এক বিষয়ে দুইটী অলঙ্কারে যে প্রতিভার উল্লাস তাহাই সঙ্কর। অলঙ্কার সকলের অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশ্রণেই পূর্ব্বোক্ত অলঙ্কার উৎপন্ন হয়। এখানে শ্লেষ অনুগ্রাহ্য বা অঙ্গী ও অন্যান্য অলঙ্কার অঙ্গ বা অনুগ্রাহক। এই শ্লোকে 'সশোক' শব্দ দ্বারা ব্যতিরেক আনীত হইয়া শোকের সহিত উৎসুক, নির্ব্বেদ, চিন্তা প্রভৃতি বিরহ-পরিপোষক ব্যাভিচারী ভাবসমূহ প্রকাশের অবকাশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ধ্বন্যাত্মভূত শৃঙ্গার অলঙ্কার কিরূপে অঙ্গস্থানীয় হইয়া সৌন্দর্য্য বিধান করে, তাহার উদাহরণ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকগতঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরম্
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী।'

ইহা শকুন্তলার মিলনাভিলাষী দুষ্মন্তের উক্তি। হে মধুকর! এইরূপ অভীষ্ট-বিষয়ে আমরা চাটু নিপুণ হইয়াও, অভিরাম বস্তু লাভে আয়াসমাত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকি কিন্তু তুমি অনায়াসে সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাক। আমরা কিরূপে এই শকুন্তলার কটাক্ষপথের পথিক হইব, কি প্রকারে এই অনিন্দ্য-সুন্দরী আমাদের গূঢ়অভিপ্রায়-প্রকাশক গোপন-প্রণয়বচন শ্রবণ করিবে, কি করিয়াই বা তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহসা অধর চুম্বন করিব, এইরূপ আমাদের মনোমধ্যে যে সকল অনন্ত অভিলাষ নিলীন আছে, সেই সকল তোমার পক্ষে অযত্নে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শকুন্তলার আকর্ণবিশ্রান্ত, ভ্রমর-ভয়ে কম্পিত নয়নদ্বয় নলিন-বোধে ভ্রমরটী স্পর্শ করিতেছে ও কাণের নিকট রহস্যকথা কহিবার ছলেই যেন গুঞ্জন করিতেছে কারণ নয়ন যুগল পদ্মদলের মত কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ভ্রমরের নীলোৎপল-ভ্রান্তি অপসারিত হইতেছে না। স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য হইতে ভয়কাতরা শকুন্তলার সরস বিম্বফলসম রতি আধারভূত, বিকশিত-

অরবিন্দ-কুবলয়ের সুরভিযুক্ত মধুর অধরামৃত ভ্রমর পান করিতেছে। সেইজন্য দুষ্মন্ত তাহার ভাগ্য প্রশংসা করিয়া নিজের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। ইহার লক্ষণ এই,—স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য বর্ণনং যৎ' অর্থাৎ যাহা স্বভাবের বর্ণন তাহাই স্বভাবোক্তি

এখানে ভ্রমরের স্বভাবই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যে কিন্তু ভ্রমর স্বভাবে উক্তি যাহার, এইরূপে 'ভ্রমর স্বভাবোক্তিব' সমাস করিয়া রূপক-ব্যতিরেক অলঙ্কার বলিয়া থাকেন—শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ইহাই ব্যাখ্যার মর্ম্ম। অঙ্গীরূপে শ্লেষ প্রতিপাদিত না হইলেও উহা অবসরে কিরূপে কবিগণ দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তাহার উদাহরণ শ্রীহর্ষ প্রণীত রত্নাবলী নাটিকা হইতে ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত আছে, যথা :—

উদ্দামোৎকলিকা বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা-
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতিমুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্

অর্থাৎ এস্থলে রাজা উদয়ন্ শ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা উদ্যানলতাকে সকামা বিরহিনী রমণীরূপে বর্ণন করিতেছেন।

লতাপক্ষে '—এই লতিকাটী উৎকটভাবে উদ্গত কলিকাসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে মলিনকান্তি ধারণ করিয়াছে। সেই অবসরেই উহা বিকশিত হইয়া বারম্বার বসন্তবায়ুস্পর্শে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে।

অদ্য অন্যনারীর মতই মদন বৃক্ষসহ এই উদ্যানলতিকা দেখিতে দেখিতে নিশ্চয়ই দেবীর (বাসবদত্তার) মুখ কোপরঞ্জিত করিব।

নারীপক্ষে—উৎকণ্ঠা দ্বারা বিমলিনবর্ণা, বিরহে ক্ষীণা হইয়া লব্ধজৃম্ভা মন্মথকৃত অজস্র-লোচন ঘন ঘন নিশ্বাস দ্বারা খেদসূচনাকারিণী কামাতুরা নারীর মত, ইত্যাদি।

এখানে উপমা শ্লেষ ভাবী ঈর্ষা মানাখ্য বিপ্রলম্ভ সূচনা পূর্ব্বক তদনন্তর বর্ণাভিমুখ্য প্রতিপাদন করিয়াছে। এইরূপে উহা রসের প্রমুখীভাব-দশায় গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা, রাজা সাগরিকার সহিত প্রেমালাপে নিযুক্ত হইলে বাসবদত্তা আগমনপূর্ব্বক তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধা হইবেন, এইরূপ মানাখ্য-বিপ্রলম্ভ রসের সূচনা করিয়া ভাবী অঙ্গী বা প্রধান অর্থান্তরই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'ধ্রুব' শব্দটীও বিশেষরূপে ভাবী ঈর্ষার অবকাশ প্রদান করিতেছে। এই শ্লোকটী সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চতুর্থ পতাকা স্থানের উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে

উত্তমরূপে রসপুষ্টির জন্য কবি কালিদাস তদীয় মেঘদূত কাব্যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার অঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :—শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং

গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি'।

অর্থাৎ বিরহী যক্ষ বলিতেছেন,—'হে ভীরুস্বভাবে, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গুলতাসমূহে তোমার অঙ্গের সুরভি ও সৌকুমার্য্য, ভীতা হরিণীগণের চপল-দৃষ্টিতে তোমার চাহনি, বিমলিন চন্দ্রে তোমার পাণ্ডুর গণ্ডকান্তি, ময়ূরসমূহের পুচ্ছে তোমার কেশকলাপ, তরঙ্গিনীর সূক্ষ্ম মৃদু তরঙ্গসমূহে ভ্রূবিলাস যত্নপূর্ব্বক কোনরূপে জীবনধারণার্থ দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু হায় কি দুঃখ, একত্র তোমার সাদৃশ্য কোথাও নাই। অর্থাৎ একস্থানে তোমার সাদৃশ্যের অভাব নিবন্ধন আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া সকল স্থানে গমন করে ও কোথাও একস্থানে ধৈর্য্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে মানুষের হৃদয় কাতর হইয়া থাকে, সে কখনও সর্ব্বস্ব একস্থানে ধারণ করে না

এখানে প্রিয়ায় অধ্যারোপিত উৎপ্রেক্ষার অনুপ্রাণক সাদৃশ্য প্রথম হইতে উপক্রান্ত হইয়া শেষে পরিসমাপ্ত হইয়াও বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষক হইয়াছে। এইরূপে উহা রসাভিব্যক্তির হেতু হইয়াছে। সেই সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু লক্ষ্য ;—ইহাই শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

প্রিয়ঙ্গুলতার পাণ্ডুরকান্তি ও কণ্টক থাকায় যক্ষের কান্তার সাদৃশ্য উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। কারণ তিনিও বিরহে পাণ্ডুরবর্ণ, কৃশতা ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি ধারণ করেন। চন্দ্রের সহিত কপোলদেশের সাদৃশ্য ও পাণ্ডুর বর্ণাংশে শিখীর পুচ্ছভারে কেশের দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য্য-সাদৃশ্য অধ্যারোপিত হইয়াছে। এই সাদৃশ্যটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাচ্য না হইয়া বিশেষ রসাবহ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঁশরী

শ্রীমতী হেমলতা দেবী

(১)

কোথা হতে বাঁশী তুমি এসেছ হেথায় ?
কৃষ্ণমুখ চুম্বিছ কোন্ তপস্যায় ?
যে অধর-সুধা লাগি কত ঋষি কত যোগী
সেজেছেন বৈরাগী অনুরাগী হায় ।
কৃষ্ণমুখ চুম্বিছ কোন্ তপস্যায় ?

(২)

কিবা পুণ্য করেছিলে বসি একলে ?
চুম্ব রাধারমণের মুখ-কমলে ।
মুখ-পদ্ম-সুধা যত পান কর অবিরত,
বংশী-বয়ান-করে বাজ বিরলে,
কোন্ পুণ্য করেছিলে বসি একলে ।

(৩)

মাগিয়া লয়েছ বর গোবিন্দ চরণে ।
শ্রীকরকমলে থেকে চুমিব বদনে ।
মুর দৈত্য যেই কালে বীণাপাণি হরে নিলে,
মুরবধি মুরারি যবে আনিলা ভবনে
মাগিয়া ল'য়েছ বর তাঁহার চরণে ॥

(৪)

বাণী প্রতি শাপ তবে দিলা নারায়ণ,
দৈত্যমায়া বুঝিলেনা কিসের কারণ ?
যাও দেবী ! সে কারণে জন্ম লভ বৃন্দাবনে,
দেবী হয়ে মোহ তব মর্ত্ত্যের মতন,
মর্ত্ত্য ধামে যাও তুমি আমার বচন ॥

(৫)

আজিকে সে শাপ তব হইয়াছে বর ।
তাই বুঝি মুরারির চুমিছ অধর ॥
নাদ রূপে বেজেছিল যখন গোলোকে ছিলে
মনোমদ সুরে এবে বাজ ব্রজপুর ।
হাসি কালা ধরে তব অধরে অধর ॥

চণ্ডীদাস ও ভাবী গৌরচন্দ্র*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মহাপ্রভুর এই অবস্থা এর চেয়ে শতগুণে। চৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলা-খণ্ডের প্রথম দুই তিনটী দীর্ঘ অধ্যায় ভরিয়া প্রভুর শ্যাম-রূপের ধ্যান আর 'বিরলে' এবং বৈষ্ণবসঙ্গে এবং সর্ব্ব-লোকসমক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হওয়ার জীবন্ত বর্ণনা আছে—

পাদপদ্ম তীর্থের তাইতে প্রভু নাম।
অঝোরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ-বলি কাঁদিতে লাগিলা বহুতর।
চৈতন্য ভাগবত। মধ্য।১ম।

কালার বরণ হিরণ পিঁধন যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া সব সখী জনে জনে।
ধরিয়া সবার গলা কাঁদে বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ কোথা বন্ধু সব বলহ সত্বর।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত।
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত ॥
চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ১ম।

ওথা আনি পিয়া মোরা পাছে আছে ভূতা।
কাঁপ কাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা।
নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে।
বায়ুজ্ঞান করি লোক বলে বাঁধিবারে ৷
কেহ বলে ইথে অন্ন ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥
চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ২য়।

(ললিতা) নিশ্বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি হয়েছ এমনি কহনা কি লাগি শুনি।

আথে ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি।
নানা মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি।
এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও পানি।
গদাধর বলে আই দেখিলা আপনি।
চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ২য়।

অকথন বেয়াধি সে কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমিতে লোটায় ॥
পুছয়ে কাতর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
প্রভু বোলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন ॥
এত বলি শ্বাস ছাড়ে পুন পুন কাঁদে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাগো নাহি বাঁধে ॥
চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ১ম।

কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।
যত শুনি শ্রবণে সকলি কৃষ্ণ-নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই তাই বোঁলো সর্ব্বথায় ॥
চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ১ম।

অবিরত বহে নয়নে নীর,
নিলাজ পরাণ না রহে থির।
লোচনে বহয়ে শত শত নদী ধার (চৈঃ ভাঃ)
থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের নীর (নরোত্তম)
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে। (গোবিন্দদাস)

---

* প্রিয় লেখক মহোদয়! আগে আপনার প্রবন্ধের ফুটনোটে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যাহার করিতেছি। অতঃপর বাঙ্গলা অনুবাদযুক্ত যে কোন প্রবন্ধাংশ সাদরে শ্রীপত্রিকায় স্থান পাইবে। ইতি—
ভাঃ সঃ।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
রাত্রি নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥
চৈতন্যভাগবত।

কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা সদাই চমকে চিত॥
কাহারে কহিব কথা কে বুঝিবে দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
চৈতন্যচরিতামৃত।

কানু-পরসঙ্গ বিনা তিলেক না জীয়ে।
আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে (নরোত্তম)
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
ব্যর্থানি মেহংখান্যখিল্যেন্দ্রিয়ানাত্তাং। চরিতামৃত।
নারীর যৌবন জোয়ারের পানী
গেলে সে ফেরে না আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার।
শতবৎসর পর্য্যন্ত নারীর জীবন অন্ত
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন যাহে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি (চরিতামৃত)
মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
ক্রুর শঠের গুণ ডোরে হাতে গলে বাঁধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে।
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে। চরিতামৃত।
সই দৈবে হ'ল হেন মতি
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীতি রীতি।
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে (চরিতামৃত)

অকথ্য-বেদনা সই সহনে না যায়।
যে কহে কানুর নাম ধরে তার পায়।
যে বৈষ্ণবঠাকুরে দেখেন বর্ত্তমানে।
তাহারেই জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ কোনখানে।
চৈতন্যভাগবত।

মথুরা নগরের যত নাগরীর
পিরীতির ধারে ধার।
তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত।
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন (চরিতামৃত)
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইয়া আনন্দ ভরে,
শিরীষ-কুসুম-কোমলিনী।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়। চৈতন্যভাগবত।
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।
পদাবলী।

সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত।
এবে যায় না রহে পরাণ। (চরিতামৃত)
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥

* *

সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়।
নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥
হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া।
চৈতন্যভাগবত।

চণ্ডীদাসের নায়কের পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর যে বর্ণনা আছে, তাহার অনেক কথার সঙ্গে গৌরাঙ্গের অনেক অনেক বর্ণনা মিলিয়া যাইবে। চণ্ডীর অষ্টমঅধ্যায়ে সপ্তমাতৃকার বর্ণনায় ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাণী, কুমার আর কৌমারী, বিষ্ণু আর বৈষ্ণবী প্রভৃতির যেমন ভেদ এবং অভেদ—তেমনি বুঝিতে হইবে, একই রূপ; কিন্তু পুরুষ আর রমণী। যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্বদেব তচ্ছক্তিঃ।

কিবা দিয়া অমিয় ছাকিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা তনু,
আকুল কুলবতী নারী। পদাবলী।

নবীনা কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
ঢল ঢল প্রেমমণি কিয়ে থির-দামিনী
ঐছন বরণক আভা। (পদাবলী)

চলনভঙ্গী অতি সুরঙ্গী
দারুণ চাহনী তার।
গমন নটনলীলা বচন সঙ্গীতকলা
মধুর চাহনি আকর্ষণ। (পদাবলী)
করিবর শুণ্ডিক কনক ভূষণ যে সাজে।
বাহুর হেলন দোলন দেখি করী শুণ্ড কিসে লাগি!
(লোচনদাস)

সকল অঙ্গ মদন-রঙ্গ
হসিত বদনে চায়।
রঙ্গ বিনা নাহি অঙ্গ ভাব বিনা নাহি সঙ্গ
রসময় দেহের গঠন। (পদাবলী)

কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে।
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় গুঁজেছে চাপার ফুল।
কুঁদ মালতীর মালা বেড়া ঝুঁটা। (লোচনদাস)
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত।
কপাল মাঝে ভুবনমোহন ফোঁটা॥ (লোচনদাস)

সুতরাং চণ্ডীদাসে শ্রীগৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের উজ্জ্বল আলোকাভাস আমরা নিশ্চিতরূপেই পাইতেছি। কিন্তু শুধু তাই নয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্মের যে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সাধনসম্পত্তি শ্রীপাদগোস্বামিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও চণ্ডীদাসে অনতিস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কাব্য আধুনিক বাংলা কবিতার মত অলীক কল্পনা-বিলাস মাত্র নহে। চণ্ডীদাসের চিত্ত রূপ-রস-ভাব-বস্তু লইয়া ব্যাপ্রিয়মান ছিল। চণ্ডীদাসের কবিতা চণ্ডীদাসের ক্রমবিকাশিত ভাবনানানুসঙ্গিনী হইয়া বিকশিত হইয়াছিল। এই জন্যই চণ্ডীদাস 'মহাজন' বলিয়া খ্যাত।

বৈষ্ণব-সাধনার দুইটী পথ। একটীর নাম বিধিমার্গ। আর একটী রাগমার্গ। একটী শাস্ত্রানুসারিণী নীতি-পথানুগামিনী। আর একটী স্বতঃপ্রবাহিত ভাবতরঙ্গ-রঙ্গিনী। বাউল কবি গান করে—

আমি শ্যাম প্রেমের চাতকী হই,
আমায় কৃষ্ণনাম শুনাও লো প্রাণসই।
আমি কি সুখে বা ঘরে রই।
শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই,

ইহা শুদ্ধ-রাগের কথা। কৃষ্ণ কালো কি গোরা, ভাল কি মন্দ ভাবিবার অবসর নাই। প্রাণ কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু চায় না। বাউলের গানে আছে—

যার মনে করেছে বাসা কালো বরণ পাখী।
তার জ্ঞান মন হারিয়ে দিয়ে প্রাণ দিবার কি বাকি।

চণ্ডীদাসের জীবনে ও তাহার কাব্যে এই বিশুদ্ধ-রাগানুগা ভক্তিসাধনটী যেমন করিয়া উজ্জ্বল ও নির্ম্মলভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর প্রকাশের পূর্ব্বে কোথাও তেমন সাধনার নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুরাগপ্লাবনে সমস্ত দেশ ডুবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এ বস্তু একেবারে দুর্লভ ছিল। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সুদূর দক্ষিণের একটী বিরল উদাহরণ। অনুরাগের একটী অপ্রত্যাশিত উন্মত্ত তুফান। বিদ্যাপতির কবিতা শুধুই কাব্য। আর কিছু নয়, কৃষ্ণ নায়ক রাধা নায়িকা—এইমাত্র। জয়দেব রসিক সাধক, কিন্তু তাঁর প্রাণের অনুরাগ তিনি রাধাকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তাহা বিশ্বমানবের ভাবভূমির উপর দিয়া প্রবাহে বাহিত হয়ে গেল না। চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেমে বিশ্বের সকল মানব মানবীর হৃদয়ের আনন্দ কৃষ্ণানুরাগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। নরনারীর প্রেম আপন-হারা হইয়া রাধা-কৃষ্ণের অমৃত প্রেমের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। রাধাকৃষ্ণপ্রেম নরনারীর প্রণয়প্রবাহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া স্পর্শ করিয়া ধন্য করিল, সুধাস্রোতে পরিণত করিল। বৃন্দাবন আসিয়া সংসারের বুকের মধ্যে প্রবেশ করিল। সারি সারি যাইয়া ব্রজের সীমায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাই কৌতুকী কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন বৃন্দাবনে ঈশ্বর-মানুষে মিলিত হইয়া রয়? নরনারীর যে প্রাকৃত প্রেম, তাহার নিগূঢ় অন্তরপথে প্রবাহিয়া চলিয়াছে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাগতরঙ্গিনী।

আবার রাধাকৃষ্ণের দিব্যরাগস্রোতস্বিনীর উত্তরপ্লাবনপ্রান্ত দিয়া নরনারীর প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এই মহাসত্য চণ্ডীদাসের নয়নে প্রকাশিত হইল, চণ্ডীদাস তাই সহজ-মানবধর্মের প্রেমধারাটীর পরিত্যাগপথে কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান না করিয়া, ঐ প্রেমধারাটীকেই শ্যাম সরোবরাভিমুখে চালাইয়া লইয়া গেলেন। রজকিনী রামীকে প্রাণদিয়া ভালবাসিয়া সেই উদ্দীপনার আলোকে এই সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন। তাই চণ্ডীদাস রামীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥

চণ্ডীদাস এই যে ভাবতরঙ্গিনী আবিষ্কার করিলেন, ইহা দুই বিভিন্ন ধারায় দুই বিভিন্ন পথে চলিল। একটী নরনারীর স্থূল যৌনসম্পর্ক আশ্রয় করিয়া, কতক তান্ত্রিকের কৌলাচারাদি এবং কতক বৌদ্ধ অনীশ্বরবাদাদি ধারণার সহিত মিশিয়া সহজিয়া সাধনায় পরিণত হইয়া-গেল। নানাপ্রকার উৎকট হঠযোগক্রিয়াদি আনিয়া জোটাইয়া 'বাউলেরা' একটা বিকট গণ্ডগোল সৃষ্টি করিল। চণ্ডীদাসের বিশুদ্ধ অনুরাগ ধর্ম সাধনের নানা জুগুপ্সিত বিকার ঘটিল। অন্য ধারাটী অনাবিল স্বচ্ছ হইয়া আসিয়া মহাপ্রভুর নির্মলোজ্জ্বল পরম পবিত্র কৃষ্ণানুরাগ মন্দাকিনীতে মিলিত হইয়া অমৃত হইয়া গেল।

এই বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুরাগরাজ্যে কৃষ্ণ কমনীয় কন্দর্প। তিনি—

চাড় গোপীর মনোরথে   মনমথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।

শুধু তাই নয়। তিনি—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম-গায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন,
(চরিতামৃত)

চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা গীতিকায় আছে—

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন-বীজ॥

প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক-স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প হয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥

এই রাগের ভজন-প্রণালী স্বভাবতঃই ব্রজলোকানুসারিণী। দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য এই চারিটী ব্রজের ভাব-সম্বন্ধ। ব্রজ কিশোরীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর-রসের অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা-ভাবের ব্যাপার, ইহারা সকলেই পরকীয়া নায়িকা পররমণী বলিয়া প্রতীয়মানা, প্রকৃত পক্ষে সম্বন্ধটী—

আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
ব্রহ্মসংহিতা।

ব্রজাঙ্গনারা সকলেই পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের আনন্দ-প্রেম-রূপিণী হ্লাদিনীশক্তিকল্পলতিকার বিবিধ কুসুম। কিন্তু—

সো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।

কারণ,—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। (চরিতামৃত)

এই যে ব্যাপারটী এবং ব্যক্তিগত ভগবৎসাধনায় যে ইহার নিগূঢ় যোগ আছে, মানুষ যে সত্য সত্যই ব্রজগোপীর ভাবানুগত হইতে পারে, চৈতন্যলীলায় যাহা পরিস্ফুট-ভাবে প্রমাণিত হইল, তাহ চণ্ডীদাস উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই গাহিয়াছেন—

পরকীয়া ধন সকল প্রধান যতন করিয়া যেই,

আবার বলিয়াছেন—

রতি পরকীয় যাহারে কহিয়ে
সেই সে আরোপ সার।

'আরোপ' মানে কোনো ব্রজবালিকার মধুররতি ভাবখানি আপন জীবনে আরোপ করিয়া সাধন করা। চণ্ডীদাস রামীকে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই রামীর ভাবই আপনাতে আরোপ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ভাবিতেন—রামীই আমি, এই ভাবসিদ্ধি ছিল তাহার উদ্দেশ্য।

বাশুলী কহিছে কহিব কি
মরিয়া হইবে রজককন্যী।

অর্থাৎ দেহান্তে ব্রজকিশোরীস্বরূপিণী রজককন্যা রামীর ভাবের দেহ মন প্রাণ লাভ করিব। মধুররসের অপর নাম শৃঙ্গার-রস। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যমের অষ্টমে দেখানো হইয়াছে শৃঙ্গার রস সকলের শ্রেষ্ঠ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্ত এই প্রেম হ'তে
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।

চণ্ডীদাস শিখাইয়াছেন—

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।
এই সে রস নিগূঢ় ধন্য
ব্রজবিনা ইহা না জানে অন্য।

চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে বলিয়াছেন,—

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হ'তে হয় এই লীলার বিস্তার,
সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়,
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁহা যেই করে অনুগতি
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,

সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকব প্রণয়রস ঘরে,
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে।

কৃষ্ণরসসরোবরে ডুবিতে হইলে শ্রীরাধার এবং তাহার সঙ্গিনীগণের 'প্রজা' অর্থাৎ অনুগতা অনুচরা হইতে হইবে। চণ্ডীদাস রজকিনীকে বলিয়াছে—

তুমি সে মন্ত্র তুমি সে তন্ত্র তুমি উপাসনা-রস।

ইহারও ঐ অর্থ। কারণ—

সে দেশের রজকিনী হয় অধিকারী,
রাধিকার স্বরূপ তার প্রাণ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই মিথ্যা পুরুষাভিমান অন্তরে স্থান দেন না। বহির্ব্যবস্থায় কর্ম্মকলাপ, উদ্যম উৎসাহ তেজোবল সামর্থ্য সমস্তই পুরুষের মত হইবে, কিন্তু প্রাণের অন্তরতম ভাবটী হইবে রমণীর। নিত্যধ্যানে যে স্বরূপের সন্ধানটী থাকিবে তাহা হইবে একটী উজ্জ্বলরাগময়ী কিশোরীর। ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় আছে—

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাব।

এই যে নিগূঢ়-বৈষ্ণব-আদর্শটী ইহা চণ্ডীদাসই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন।—

এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে।

মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবসাধনাপদ্ধতির আরও অনেক ব্যাপার চণ্ডীদাস হইতে দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু এখানে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎকার কথোপকথনাদি হয়, তখন মহাপ্রভু হরিনামের মাহাত্ম্য উল্লেখ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি হরিনামের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কিবা মন্ত্র দিলা গুরো কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥

গুরুদেব উত্তরে হরিনামের প্রভাব বর্ণনা করিয়া নামতত্ত্ব বলিলেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখি তারে॥

চণ্ডীদাসের কাব্য গভীর ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহা এই বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের ভাব ক্রিয়াভাবনাদি প্রণালী প্রসঙ্গেই ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণকে বিষয় করিয়া নায়ক-নায়িকার প্রণয় ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল, বিদ্যা ছিল, ভাষা-ছন্দের অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল; উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারজ্ঞান ছিল; তাই তিনি অতি সুন্দর ও সুললিত কবিতা লিখিয়াছেন। এ কবিতায় কোনো দিব্যপ্রকাশ নাই; রসতত্ত্বের কোনো বিশেষ উদ্ভাসন নাই। বিশ্বমানব-প্রাণের সহজ এবং সনাতন সুর ঝঙ্কার হইতে বাজিয়া উঠে নাই। মহাপ্রভু যে বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন, তাহাতে কেহ প্রশ্ন করে না। যে গুণি-গণের মধ্যে 'কর্ণামৃত' আর 'বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই মনোরম পদগুলি যে তাঁহাকে আনন্দ দান করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ" যেন প্রাকৃত নায়িকার প্রাণের কথা, তাহাই যে তাঁহার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধিকার প্রাণের কথা হইয়া গিয়াছিল। প্রভুর পার্ষদগণও প্রথম তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

রসসাগরের গভীরতম তলদেশ হইতে মুক্তাপ্রবালরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চণ্ডীদাস জগৎকে দান করিয়াছেন। বিদ্যাপতি সেই সরোবরের অরুণকিরণরঞ্জিত তরঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের দোষ

(২)

[শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ]

অমানিশার নিবিড় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পূর্ণ-চন্দ্রমার বিশদ চন্দ্রিকারাশি প্রকাশ পাইলে কি বিস্ময়কর আনন্দ উপস্থিত হয়, মানুষ তাহার ধারণা করিতে না পারিলেও কল্পনা করিতে পারে। সচরাচর মানবের নিকট এই জাতীয় বিস্ময়কর ব্যাপার উপস্থিত হয় না; কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান্ ঈদৃশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন, তাহার সংবাদ পাওয়া যায়। এইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার রসের প্রাণ; ইহা হইতে আনন্দের অভিব্যক্তি। শ্রীভগবান্ রসময়, রসিকশেখর—রসো বৈ সঃ। রসবর্ষণ করিয়া ভক্তকে তৃপ্ত ও পুষ্ট করাই তাঁহার স্বভাব। রসবর্ষণের নিমিত্ত তাঁহার লীলা। অসম্ভব বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, রস সৃষ্টি করিবার স্বতঃসিদ্ধ শক্তিসমূহের তিনি একমাত্র আশ্রয়। লৌকিক-ব্যাপারে ও অসম্ভব সম্ভাবিত হয় যে দৈবশক্তিযোগে, তাহা তাঁহার নিজস্ব। এই হেতু তিনি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয় হইলেও তাঁহার ভগবত্তার হানি হয় না।

> ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
> তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন॥
> গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥
>
> কূর্ম্মপুরাণ।

"ঐশ্বর্য্যযোগহেতু শ্রীভগবান্‌কে বিরুদ্ধার্থ বলা হয় তথাপি সেই পরমেশ্বরে কোন দোষারোপ করা যায় না। তাঁহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসকলের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে।" বেদান্তসূত্রকারও বলিয়াছেন—

> সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

"ঈশ্বরে বিভুত্ব, মধ্যমত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মসকলের একত্র সমাবেশ প্রতিপন্ন হয়।"

সংবাদ

শ্রীশ্রীকুঞ্জের মামলা

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে—শ্রীকুঞ্জসম্বন্ধীয় মামলায় উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হয় নাই বলিয়া মহারাজ সত্যপাল সিংহ যে মামলা বৈষ্ণবদের উপর উপস্থিত করিয়াছিলেন, মথুরা জজকোর্টে পরাস্ত হওয়ায় হাইকোর্টে পুনর্বিচারের জন্য তাঁহার আপিল করিয়াছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, উক্ত মামলায় হাইকোর্টে বৈষ্ণবগণ ডিক্রী পাইয়াছেন। শীঘ্রই স্বত্বসম্পর্কীয় মূল মোকর্দ্দমা মথুরা জজ্‌কোর্টে উঠিবে। প্রকাশ পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি, আর দাস বৈষ্ণবগণের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

শ্রীশ্রীভাগবত পাঠ

ভারতপ্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামি মহোদয় ৭৯ বেচ্‌চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে দত্তবাড়ীতে অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ও পরে রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ৫২ সার্পেন্‌টাইন লেনে ভাগবতকথামৃত পরিবেশনে ভক্তগণের হৃদয়ে অসীম আনন্দের বিধান করিতেছেন। আশা করি ভক্তগণ এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবৎপারায়ণ মহোৎসব।

বিগত ২২শে মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৮শে মাঘ পর্য্যন্ত ৭ দিন পরমপূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামি মহোদয়ের মাতা গোস্বামিনী ১৬১নং হ্যারিসন রোডস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবৎপারায়ণ দান করিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই পাঠ করিয়াছিলেন। এই শ্রীপারায়ণে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। উৎসবান্তে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সুমধুর লীলাকীর্ত্তনে সমাগত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন। ৩০শে মাঘ এই উপলক্ষে ভূরি-ভোজনে বহুলোককে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল

বৈষ্ণব-সংবাদ

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

কলিকাতা, হাওড়া এবং পূর্ব্ববঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ভুবনবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে বিগত ১১ই পৌষ রবিবার (১৩৩৯ সাল) প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় কিশোরগঞ্জে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর একটি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী এবং প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী উক্ত শাখা সাম্মলনীর নিয়ামক হইয়া আমাদের সম্মিলনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছেন এবং অত্রস্থ মুন্সেফ ভাগবতোত্তম শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। আশা করি দেশবাসী সমস্ত সাধু-বৈষ্ণবগণের এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন-প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে যোগ্যতা লাভ করিব।

এই নবজাত সম্মিলনীর সেবকগণের চেষ্টায় বিগত ১৯শে মাঘ বুধবার দিবসে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসাকের বাড়ীতে এবং বিগত ২৬শে মাঘ বুধবার দিবসে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বসাকের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর তারকব্রহ্মনাম-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিবেদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক কিশোরগঞ্জ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী।

শ্রীশ্রীউদ্ধব-সংবাদ

বন্দে তাং মাতরং দেবীমজ্ঞানধ্বান্তনাশিনীং
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদানেন চক্ষুরুন্মিলিতং যয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাং ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

রসিকশেখর ও পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ অনাবিল প্রীতিরসের ধাম শ্রীব্রজ ছাড়িয়া শ্রীমথুরা যাইলেন কেন ? এবং যদিও যাইলেন, তবে কংসবধ করিয়া ব্রজে আসেন নাই কেন ? ব্রজবাসিগণই বা শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিবা-রজনী মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়াও মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন নাই কেন ? এই সকল সংশয়ের মীমাংসা প্রথমতঃ হওয়া প্রয়োজন ।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপটী প্রেমাধীন । যাহার যে পরিমাণ ও যে জাতীয় প্রেম, সেই প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুসারে তিনি অধীন হইয়া থাকেন । যগুপি শ্রীলব্রজবাসিগণের প্রেম যেমন একদিকে নিরুপাধি, তেমনই অপরদিকে পরিমাণগত উন্নত এবং সেই বিশুদ্ধ বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ রসিকশেখর-নামের সাফল্য বিধান করিয়াছেন, তথাপি তিনি মথুরা-বাসী যাদবগণের প্রেমে উদাসীন হইতে পারেন না। তন্মধ্যেও জনক-জননী শ্রীল বসুদেব-দেবকীর প্রেমবশ্যতা পরিত্যাগে অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই শ্রীবসুদেব দেবকী কংসকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া কতই না যাতনা ভোগ করিতেছেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীল ব্রজবাসিজনের জাতি ও পরিমাণগত সর্ব্বপ্রকারে উন্নত প্রীতিরস আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীল বসুদেব-দেবকীর প্রতি উদাসীন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-গুণের ব্যাঘাত ঘটিত। তিনি বড়প্রেম পাইলেও ছোট প্রেমের প্রতি উদাসীন হয়েন না, এটা তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম । এদিকে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবান্ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন বলিয়াই কংস-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়ায় ছদ্মবেশে হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কুরু-পাঞ্চাল কেকয় প্রভৃতি দেশে গুপ্তভাবে বাস করিতে-ছেন। এবং তাঁহাদের পত্নীগণও প্রচ্ছন্নরূপে দেশদেশা-ন্তরে আত্মসংগোপন করিয়া বাস করিতেছেন। এমন কি শ্রীবসুদেব মহাশয়ের অষ্টাদশপত্নীমধ্যে কেবল শ্রীদেবকী-দেবীই শ্রীল বসুদেব মহাশয়ের নিকটে ছিলেন। শ্রীল রোহিণীদেবী রজনীযোগে শ্রীল বসুদেব মহাশয় কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে প্রেরিত হইয়া শ্রীব্রজে বাস করিতেছেন। অন্য ষোড়শটী পত্নী দেশ দেশান্তরে গুপ্তভাবে ছিলেন। এই প্রকার যাদবগণের দুঃখরাশি চিন্তা করিয়া দীন-দয়াদ্র-করুণাম্বুধি-ভক্তজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ যদি শ্রীমথুরায় যাইয়া কংসকে বধ করত শ্রীল বসুদেব দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মোচন না করিতেন, এবং পরমভক্ত যাদবগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণকে দেশদেশান্তর হইতে মথুরায় আনিয়া তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও শরণাগতজনপালকত্ব গুণের উপরে রাশি রাশি দোষের আরোপ হইত। এই অভি-প্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজ হইতে শ্রীমথুরাপুরে আগমন করেন।

মথুরায় আসিয়া প্রথমতঃ ভক্তদ্বেষী-অসুররাজ-কংসকে নিহত করিয়া শ্রীল বসুদেব-দেবকীকে কারাগার হইতে মোচন করেন। শ্রীকৃষ্ণ একাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রজে ছিলেন, তৎপর নরলীলার দৃষ্টিতে উপনয়নের কাল অতিবাহিত হয়

জ্ঞাতি, এই যাদবগণও আপনাদের সম্বন্ধেই আমার সুহৃদ, অর্থাৎ বান্ধব। আমি সুহৃদ্ যাদবগণের সুখ সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে যাইবেন বলিয়া নিজে প্রতিশ্রুত আছেন, এইজন্য শ্রীব্রজরাজও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে আহ্বান্ করেন নাই। শ্রীল ব্রজবাসিজনও এইজন্যই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসেন নাই।

শ্রীগুরুগৃহ হইতে মথুরায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বহুল বিচার করিতে লাগিলেন,—আমার বিরহে অতিশয় কাতর পিতামাতা ও কান্তাগণের সান্ত্বনা দিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়! যদ্যপি তাহাদের দুঃখনিবৃত্তির হেতু আমি ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারে না, তথাপি সম্প্রতি কথঞ্চিৎ দুঃখশৈথিল্যের জন্য আমারই প্রতিনিধি-রূপে কাহাকেও পাঠাইয়া সান্ত্বনা দিব। কিন্তু এমত উপযুক্ত পাত্রই বা মথুরায় কে আছে? অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, এই মথুরাতে অনেক যাদবগণই আছেন এবং সকলেই ন্যূনাধিক ভাবে আমাতে প্রেমবান্। তাহা হইলেও বিশুদ্ধ-প্রেমবান্ শ্রীলব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দিতে পারে, এমন উপযুক্ত পাত্র অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না। একমাত্র উদ্ধবই আমার প্রতিনিধি হইবার কথঞ্চিৎ যোগ্য। বিশেষতঃ উদ্ধব সর্ব্ববিষয়ে সুবিচক্ষণ বটে, কিন্তু প্রীতিরসবিচারে অপক আছে; আমাকেও শ্রীল ব্রজবাসি-দিগের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইয়া অনেক দিনই দূরে দূরে থাকিতে হইবে। অথচ রসিকভক্তসঙ্গ বিনা এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যেহেতু এই একাদশবর্ষকাল পর্য্যন্ত শ্রীল ব্রজবাসিজনার বিমল প্রীতিরস আস্বাদনে বিভোর ছিলাম, এখন গৌরব-বুদ্ধিতে সম্ভ্রান্ত-প্রীতিরসের পাত্র যাদবগণের সঙ্গে কেমন করিয়া সময় কাটাইব? তাই শ্রীউদ্ধবকেই বিমল-প্রীতিরসের আস্বাদন শিক্ষা করাইবার জন্য শ্রীল ব্রজদেবীগণের নিকটেই পাঠান কর্ত্তব্য মনে করি। যেহেতু আমিও যাহাদের নিকটে বিশুদ্ধ প্রীতির রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছি, উদ্ধব-কেও তাহাদের নিকটে শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইব। কারণ শ্রীউদ্ধব সর্ব্বপ্রকারেই উপযুক্ত। এই অভিপ্রায়ে তত্রাত্য শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকে গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥

শ্রীকৃষ্ণের মনের সঙ্কল্প এই যে—উদ্ধব আমা হইতে কোন অংশে ন্যূন নয়, যেহেতু প্রাকৃত-বিষয়ের দ্বারা তাহার চিত্ত কখনও ক্ষোভিত হয় না। অতএব উদ্ধব আমার অপ্রকট-সময়েও লোকসকলকে মদ্বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করতঃ এই মর্ত্ত্যলোকেই অবস্থান করুক্।

শ্রীমথুরাতে দুইটী উদ্ধব ছিলেন। একটী শ্রীবসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র। অপরটী শ্রীবসুদেবেরই অপর-ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র, এবং দুই উদ্ধবই পরমপণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে দেবভাগের পুত্র উদ্ধবই শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর-তর কৃপাসৌভাগ্য বিভূষিত ছিলেন, এবং তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ যেমন ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যে নিষেবিত, শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়ও তেমনই ষড়্‌বিধ অসাধারণ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাহাই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে দশমের ছয়চল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন—

বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বয়সে ভাবে ও গুণে, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ যাদবগণের সম্মত ছিলেন। অর্থাৎ সকল যাদবই তাঁহার বচন ও আচরণকে অত্যন্ত আদর করিতেন। এই গুণ থাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ প্রণয়িজনমাত্রের স্বভাব এইযে, যাহারা অত্যন্ত গাঢ়-প্রীতির পাত্র, তাহাদের বিরহেও তাহাদেরই উদ্দামগুণের কথা সকলের মুখে শ্রবণ করিতে পারিলে বিরহদুঃখের ভিতরেও একটা আনন্দবিশেষ লাভ করিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন, "উদ্ধব যদি ব্রজে যাইয়া ব্রজবাসিজনার বিশুদ্ধ প্রীতি-রীতি দেখিয়া চমকিত ভাবে তাহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করে এবং মথুরায় আসিয়া যাদবসভায় সেই শ্রীব্রজবাসিজনের প্রেমমহিমা কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সকল যাদবগণেরই উদ্ধবের বাক্যে আদর ও শ্রদ্ধা হইবে। তাহা হইলে সকল যাদবের মুখেই ব্রজবাসিজনার প্রণয়মহিমা শুনিতে পাইব। তাহাতে

আমার এ দুরন্ত বিরহবেদনার ভিতরেও একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন হইবে।" উদ্ধবের দ্বিতীয় গুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। কারণ একদিকে তিনি যেমন গাঢ় বিশ্বাসের পাত্র, তেমনই অপর দিকে বুদ্ধিনিপুণ। যখন শ্রীকৃষ্ণও সঙ্কটে পরিয়া কিংকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া থাকেন, সে সময়ে শ্রীউদ্ধবই তাঁহাকে গুপ্তযুক্তি প্রদান করেন। একথা কেহ মনে করিতে পারেন, "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবার শঙ্কট কি? বিশেষতঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তি যাঁহাকে সতত সেবা করিতেছেন, তাঁহার আবার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ভাব কিরূপে ঘটিতে পারে?" উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যাহার প্রেম আছে সে যত বড়ই হউক্ না কেন তারই সঙ্কট আছে। যেমন জীব দেহে প্রেম করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি পদে পদেই শঙ্কট আছে। তেমনই শ্রীভগবানের ভক্তবিষয়ক প্রেম আছে বলিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার শঙ্কটও আছে। যখন জরাসন্ধকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ রাজগণ নিজ উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, আবার সেই সময়েই শ্রীল যুধিষ্ঠির মহাশয়ও রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রনের জন্য শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত-পালকতাগুণে ও ভক্তবাৎসল্যগুণে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরিলেন। তখন শরণাগত রাজবর্গকেও উপেক্ষা করিতে পারেন না, অথচ ভক্তপ্রবর শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজের নিমন্ত্রণও উপেক্ষা করিতে পারেন না। সেই সময়ে উভয়সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে কিংকর্ত্তব্য-বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে গুপ্তকার্য্যের যুক্তি প্রদান করেন বলিয়া বিরহব্যাকুল ব্রজবাসিজনকে সুদৃঢ় যুক্তি দেখাইয়াও সান্ত্বনা দিতে পারিবেন, এইগুণেও শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন।

তৃতীয়গুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের দয়িত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষের পাত্র। যে কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন করিতে পারা যায়, সেই কৃপালঙ্কারে তিনি বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়া ব্রজবাসিজনের হৃদয়ে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন দান করিয়াছিলেন, যাহাতে এত দুরন্ত বিরহেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার স্ফূর্ত্তি হইত।

চতুর্থগুণ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, অর্থাৎ শ্রীউদ্ধবের অসঙ্কোচ প্রেম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "সাখা" পদবী দান করিয়াছেন। যেগুণে তিনি শ্রীল ব্রজদেবীগণের চরণ-সমীপে উপস্থিত হইতে এবং শ্রীল ব্রজদেবীগণও তাঁহার সহিত অসঙ্কোচে রহস্য-প্রেম-প্রসঙ্গ করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

বহিরঙ্গ লোকদৃষ্টিতেও শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের পঞ্চমগুণ বর্ণন করিতেছেন—বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব এমত মেধাবী ছিলেন, যাহাতে শ্রীবৃহস্পতি কোন শিষ্যের দ্বারা তাঁহাকে অধ্যয়ন না করাইয়া নিজেই অধ্যয়ন করাইয়াছেন। বৃহস্পতির শিষ্য, এইকথা উল্লেখ করার আর একটী মর্ম্মার্থ ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি সনকসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে ও শ্রীসনক-সম্প্রদায়ে বক্তৃশ্রোতৃ-সম্বাদে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবৃহস্পতির নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যতদিন শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রসতত্ত্ব-জ্ঞানে অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। ইহা দ্বারা শ্রীউদ্ধব মহাশয় যে রসিকভক্ত ছিলেন, তাহাই প্রকাশ করা হইল। তাঁহার এই গুণ ছিল বলিয়াই, তিনি যাঁহাদের বিশুদ্ধ-প্রেম-উদ্ভাসিত-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত প্রতিপদে পরাজিত হইতেন, সেই বিশুদ্ধ- প্রমবতী ব্রজরামাগণের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠগুণ—তিনি বুদ্ধিসত্তম। অর্থাৎ বুদ্ধিমান সাধুসমাজের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" এইরূপ চতুরভক্তগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। উদ্ধব শব্দটীর শ্লেষার্থ সাক্ষাৎ উৎসব, অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ উৎসব। তাঁহার মূর্ত্তিখানি এমনই আনন্দ উল্লাসময় ছিল যে, অতি দুঃখের সময়েও তাঁহাকে যে দেখিত, তাহারই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ পাইত।

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ।
গৃহিত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥

যে সমস্ত ভক্ত—হে কৃষ্ণ। তুমি ভিন্ন আমার আর

অন্য কোন আশ্রয় নাই, এবং তোমার করুণা ভিন্ন অন্য কোন সাধনের ভরসাও নাই এইরূপে অকিঞ্চন ভাবে এবং 'হে প্রভো! তুমি আমাকে বাহ্য-আন্তর অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর' এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, অথবা যাঁহারা মুখে বলেন 'শ্রীকৃষ্ণ হে! আমি তোমার', এবং হৃদয়েও সেই প্রকারেই দৃঢ়নিশ্চয়তা পোষণ করেন ও দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসভূমি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই সকল সাধারণ শরণাগত জন-মাত্রেরই নিখিল দুঃখ দূর করেন বলিয়া যিনি শ্রীহরি নামে খ্যাত, এবং ভক্তগণের দুঃখদর্শনে যিনি পরম কাতর হইয়া পড়েন, সেই ভক্তজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ প্রেমিক ব্রজবাসিজনগণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কেবলমাত্র শ্রীউদ্ধবকে পরে বর্ণিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। যেহেতু শ্রীমান উদ্ধব পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন।

শ্রীউদ্ধবের আরও অসাধারণ গুণ এই যে, তিনি শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। অতি শৈশবে নিজ জননীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রেমে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এক সময়ে তিনি নিজ জননীকে বলিয়াছিলেন, "মা! আমাকে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি দাও না! আমি তাঁহাকে লইয়া খেলা করিব।" তাঁহার জননীও নিজ শিশুপুত্রের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগময়ী কথা শুনিয়া একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া দেন। উদ্ধবও সেই মূর্ত্তি লইয়াই বাল্যলীলায় সেবা করিতেন। কখনও কাপড় পরিধান করাইতেন, কখনও মার নিকট হইতে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া সাজাইতেন। কখনও বা ভাল ভাল খাবার জিনিষ সেই মূর্ত্তির নিকটে সাজাইয়া দিয়া ছলছলনেত্রে প্রেমবাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতেন, "তুমি খাইতেছ না কেন? তোমাকে খাওয়াইবার জন্য আমি মার নিকট হইতে এত খাবার জিনিষ আনিয়া-দিলাম, তুমি না খাইলে যে আমি খাইব না।" এইরূপ-ভাবে প্রীতিমাখা কত কথা বলিতেন। এইজন্যই তিনি অন্যত্র চিত্ত আসক্ত হইবে এই আশঙ্কায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। অপর দিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাতৎপর ভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সেবাই শ্রীউদ্ধবের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল। অথচ একান্তভাবে ভগবৎ-সেবা করিয়াও মনে শ্রীকৃষ্ণসুখ-সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধি সঙ্কল্প ছিল না। এই অভিপ্রায়ে তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নিম্নলিখিত মহিমাটী বর্ণিত হইয়াছে—

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥

"শ্রীউদ্ধব যখন পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্য-খেলায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা রচনা করিতে নিজ মাতা কর্ত্তৃক প্রাতঃকাল-উচিত ভোজনের জন্য আহূত হইয়াও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না; বাল্যবয়সেও শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় তাঁহার এতাদৃশ আবেশ-বিশেষ ছিল।" এই প্রমাণে শ্রীউদ্ধবের শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি এবং সেবা-তৎপরতা দেখান হইয়াছে। এতগুণের শ্রীউদ্ধবকেও কোনও নির্জ্জন স্থানে লইয়া নিজ দক্ষিণ করে তাঁহার দক্ষিণ করটী ধারণ করিয়া গাঢ় প্রীতিমুদ্রায় নিজ অভীষ্ট প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীউদ্ধবের হৃদয়েও আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার মানসে, ছল ছল নেত্রে ব্রজে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের করটী ধারণ করিয়া নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া কথা-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তখন প্রীতি-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব উভয়েরই কর কাঁপিতেছিল, এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া উভয়েরই কর সিক্ত হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপাল-চম্পুগ্রন্থে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার একটু আভাস এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, সেই প্রকার আমার পুত্র ব্রহ্মা, গুণাবতার মহাদেব, অগ্রজ বলদেব, ভার্য্যা লক্ষ্মী এমন কি আমার এই শ্রীমূর্ত্তিও সেইরূপ প্রিয়তম নহে। যাদবগণের মধ্যে তুমি বহুপূর্ব্বক ব্রজবাসি-জনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এমন কি আমা হইতেও ব্রজকে তোমার গভীরতর অনুরাগ [illegible] শিক্ষা করি-

য়াছি। যেহেতু আমি এমত নির্ম্মল প্রেমভূমি ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি মথুরায় থাকিয়াও ব্রজবাসিদিগের প্রতি অনুরাগ বহন করিতেছ। অতএব যাদবগণের মধ্যে একমতে তোমাকেই আমার হিতৈষী বান্ধব বলিয়া মনে করি। হে উদ্ধব! যে "আমার ব্রজবাসিজনার" প্রতি কিছুমাত্র আদর-বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করে, তাহাদিগকে আমি মরমের বান্ধব বলিয়া মনে করি। অতি কঠিনচিত্ত হেতু যখনই আমি ব্রজবাসিদের কোন কথা-প্রসঙ্গ করি, তখনই দেখিয়াছি—তোমার চিত্ত গলিয়া যায় এবং শরীরে ঘর্ম্ম ও নেত্রে অশ্রুর উদ্গম হইয়া থাকে; কি বলিব, আমি যদি কঠিনচিত্তই না হইব, তবে ব্রজবাসিগণের প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র আমার বুক ফাটিয়া যায় না কেন? সেইজন্য তোমাকে নির্জ্জনে দেখিয়া আজ আমার হৃদয়মধ্যস্থিত শূলের মত মরমের দুঃখ বলিতেছি। এই দুঃখের মূল উৎপাটন করা অতি কষ্টসাধ্য। তুমি একথা জান যে—ভক্তের আকারধারী বৈরীর নিকটেও আমার এত হৃদয় আবদ্ধ হইয়া থাকে। রাক্ষসী পূতনাই তাহার সাক্ষিণী। আরও বলিতেছ, যে জননী ব্রজেশ্বরী আমাকে সতত প্রাণের মত লালন ও পালন করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় স্নেহে আমার এই মূর্ত্তিটী পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তিনি আমার মঙ্গলের জন্য খাইতে, শুইতে, স্নান করিতে কত উদ্বেগ পাইয়াছেন। এমন কি তিনি আমাকে সুশান্ত করিবার জন্য বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মা মনে করিতেন—যাহাতে এই বালক বাল্যকালে স্বেচ্ছাক্রমে মনের চাপল্য প্রাপ্ত না হয়, তাহার জন্য মা আমাকে একবারমাত্র বন্ধন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু সেই গুণে তাঁহার চরণে নিত্য বাঁধা আছি। সেই সকল কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইতেছে। একথাও থাক্, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যে সজলনয়নে আমাকে সেই বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি সর্ব্বদা সেই চরণে বাঁধাই আছি। হা! ইহাই আশ্চর্য্য যে—কি বন্ধনে কি মোচনে আমি সর্ব্বদাই সেই পিতৃমাতৃচরণে বদ্ধ আছি। আমি যাহাদের নয়নগোচরে উপস্থিত [illegible] সুখের অবধি থাকিত না, আমার মুখের কথাটী শুনিলে যাঁহারা আনন্দ-সাগরে ডুবিতেন, আমি ভোজন করিলে যাঁহারা অপার তৃপ্তি লাভ করিতেন, আমিই যাঁহাদের প্রাণ, হে উদ্ধব! জানিনা আমাকে হারাইয়া কেমন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন? অহো! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমি সত্বর আসিব বলিয়া যে আশ্বাসবাণী দিয়াছিলাম, সেই আশ্বাসবাণীতেই তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন। হা ধিক্! দুর্দ্দৈববলে আমার সেই আশাবাণী নিরর্থক হইল।

পিতামাতার কথা থাক্। ব্রজের সখা এবং স্বজনবর্গ, ভৃত্যগণ, ধেনুসকল, হরিণাদি জীববৃন্দ এ সকলেরই আমিই একমাত্র পরমপ্রিয়, আমায় দেখিলে তাহারা বাঁচে, না দেখিলে তাহারা মরে এ কথা কে বিশ্বাস না করিবে? যেহেতু সেই ভগবান্ ব্রহ্মাও আমাকে বলিয়াছিলেন,—

"যদ্ধামার্থ সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে"

আমি মনে করি আমার প্রতি প্রেমই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন সেই পিতামাতা প্রমুখ ব্রজবাসিজন বিম্বস্থানীয়। আর এই মথুরাপুরবাসী যাদবগণ তাহাদেরই প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। এ বিষয়ে আমার অনুভবই অভ্রান্ত-প্রমাণ। যদি ভাগ্যবশতঃ কেহ বিম্ব অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে প্রতিবিম্বদর্শন করিলে বিম্বের কথাই হৃদয়ে উদ্দীপন হইয়া থাকে। সেই গোকুল যদ্যপি এইরূপ প্রেমাস্পদ, তথাপি সুহৃদ্বর্গ যাদবগণের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হইয়া সম্প্রতি ব্রজে যাইতে পারিতেছি না। এই কারণেই তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে সেই ব্রজে গমন কর; এবং যাইয়া নির্জ্জনে আমি তোমাকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছি, তাহাই বিচার করিয়া প্রত্যেক লোকের প্রতি সুখবর্ষণ কর। এবং তুমি এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকেও সুখদান কর।

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য! পিত্রোর্ণঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥

হে উদ্ধব! তুমি ব্রজে যাও, আমাদের পিতামাতার যদ্যপি আমা ভিন্ন সুখের হেতু অন্য কিছুই হইতে পারে না, তথাপি নিজের বহু চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সুখসম্পাদনের জন্য যত্নবান্ হইও। আমার রাশি রাশি

সৌভাগ্যের ফলে এতাদৃশ অতুলনীয় নিরাবিল স্নেহময় ও স্নেহময়ী পিতামাতা পাইয়াছিলাম, কারণ আমি স্বয়ং ভগবান্, আমার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলে সম্ভ্রান্ত না হইয়া নিজ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে কে সমর্থ হইতে পারে? একমাত্র পিতামাতা ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী আমার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য বিশ্বরূপাদিদর্শন করা সত্ত্বেও "মোর পুত্র" এই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় সম্বন্ধ লইয়া আমার সহিত ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমার সর্ব্বোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যেরও ক্ষমতা নাই যে, তাঁহাদের বিশুদ্ধ বাৎসল্যের কিছুমাত্র শৈথিল্য সম্পাদন করিতে পারে। তাই আমি এমত বিশুদ্ধ স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনক জননী লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেছি। এই অভিপ্রায়েই মূলে "নঃ" এই বহুবচনটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথবা হে উদ্ধব! সেই শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী যখন আমার ও অগ্রজ বলদেবচন্দ্রের পিতা-মাতা, তখন তুমি আমার সখা বলিয়া তোমারও তাঁহারা পিতা-মাতা, দেখিও যেন পর মনে করিও না। যদ্যপি অগ্রজ শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর ঔরস ও গর্ভজাত পুত্র নহেন, তথাপি রসের গাঢ় আবেশে পুত্র বলিয়াই অভিমান করেন। এই কথা বলিয়া শ্রীউদ্ধবের ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর চরণে গাঢ় অনুরাগ বৃদ্ধি করাইলেন। আর গোপীগণের আমার বিয়োগজনিত মনঃপীড়া যাহা হৃদয়ে দৃঢ়-গ্রন্থিরূপে সংলগ্ন আছে, সেই গ্রন্থির কিঞ্চিৎ শৈথিল্য সম্পাদন করিও। কিন্তু তাহাদের নিকটে কোনও চাতুর্য্য প্রকাশ করিও না। নিজ চাতুর্য্য প্রকাশ করিলে প্রতি পদে পদে তাহাদের নিকটে পরাজিত হইবে। কারণ তাহারা চতুরার শিরোমণি। যাহাদের চাতুর্য্যের নিকটে আমি পর্য্যন্ত প্রতিপদে পরাজিত হইয়াছি। তাহাদের নিকট তোমার চাতুর্য্য যে বিফল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তবে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি যে, যতগুলি কথা তাহাদের নিকটে বলিবে, তাহা "আমারই বাণী" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিও। তাহা হইলে ব্রজরামাগণ গাঢ়-প্রণয়-স্বভাবে আর কোন বিতর্ক উপস্থিত করিবে না। তাহাদিগের মনঃপীড়া-গ্রন্থির শৈথিল্য সম্পাদন ভিন্ন কোন প্রকারেও প্রীতিসাধন করিতে পারিবে না। যেহেতু আমাকে হারাইয়া তাহারা এই ত্রিলোকের কোন স্থানে প্রিয় বলিয়া কোন বস্তু আছে বলিয়া মনে করিতে পারে না। হে উদ্ধব! তোমার দেহখানি সাক্ষাৎ শান্তির মূর্ত্তি। যে জন বহুল অশান্তির সময়ও তোমার দেহখানি দর্শন করে, তাহারও বিপুল শান্তির উদয় হয়। এই সময়ে আমার বিরহে অশান্ত ব্রজবাসিগণ তোমার এই মূর্ত্তিখানি দর্শন করিলেও অনেকটা শান্তি পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কথার প্রসঙ্গ করিবামাত্র তাহাদের প্রেমমহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ॥

হে উদ্ধব! সেই ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্কল্পাত্মক মন আমাতেই অবস্থিত। আমাভিন্ন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষে সঙ্কল্প নাই, এমন কি তাহারা অশেষ দুঃখরাশিতে প্রপীড়িত হইয়াও কখনও নিজদুঃখ-পরিহারের ইচ্ছা করে নাই। তাহারা আমার প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় রাশি রাশি দুঃখকেও বরণ করে। কিন্তু আমার অপ্রাপ্তি-সম্ভাবনায় রাশিরাশি সুখকেও অতি তুচ্ছবুদ্ধিতে উপেক্ষা করিয়া থাকে। আমিই তাহাদের প্রাণ। প্রাণ বিনা যেমন দেহের প্রতি আদর থাকে না, তেমনই আমা ভিন্ন তাহারা নিজ নিজ দেহের প্রতি পর্য্যন্ত আদরবুদ্ধি রাখে না, অধিক কি দেহের অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিতে তাহাদের সামর্থ্য নাই। প্রাণ বিনা দেহের যেমন কোনই চেষ্টা প্রকাশ পায় না। তেমনই যে দিন হইতে আমি ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় আসিয়াছি, সেই দিন হইতে তাহারা স্নান ভোজন শয়ন প্রভৃতি দেহধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আমারই জন্য পতি, পুত্র, মাতা, ইহলোক ও পরলোকের সুখাপেক্ষা প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছে। অথবা "মন্মনস্কাঃ" আমাতে সম্পূর্ণ মানস-সঙ্গম থাকাতে বাহ্য সর্ব্ব প্রীতিসম্পাদক পদার্থে তাহাদের অনাদর-বুদ্ধি। আমিই তাহাদের প্রাণ, এইজন্য অন্তরীন অর্থাৎ মানস সর্ব্ব প্রিয়পদার্থে উপেক্ষাবুদ্ধি পোষণ করে। "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ" তাহারা যে আমারই জন্য পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছে, [illegible] অভিপ্রেত

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩৯ | সপ্তম সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা

(শ্রীগুরুবৈষ্ণব [illegible])

জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানবমাত্রের দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি নাই, এবং লৌকিকী ও শাস্ত্রার্থ-অবধারণজা শ্রদ্ধাও আছে। পণ্ডিতম্মন্য কতকগুলি কুতার্কিক কুতর্ককুঠারে সেই শ্রদ্ধার মূল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্‌ই স্বয়ং অথবা কোনও মহাপুরুষে শক্তিসঞ্চার করিয়া সেই শ্রদ্ধার ণ রক্ষা ও পোষণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ সংখ্যার সাধনা পত্রিকায় "শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক রাধাগোবিন্দ নাথ বাবু যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যাঁহারা দীক্ষিত এবং দীক্ষাগ্রহণের জন্য উন্মুখ তাহাদের হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। তিনি বিদ্যাবাচস্পতি হইয়াও কেন এইরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা জানি বৈষ্ণবপত্রিকা পাঠ করিলে শ্রীগুরু বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানে গাঢ় শ্রদ্ধাই লাভ হইয়া থাকে, এবং যাহার শ্রদ্ধা আছে তাহার হৃদয়ে প্রচুরতর দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া দেয়। এখন দেখিতেছি—[illegible]র বিপরীত অবস্থাই আনিয়া দিবার জন্য সম্পাদকের লেখনী-চালনা। তবে অবশ্য শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করতঃ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে যে বিষময় ফল ফলিয়া থাকে, তাহাও সম্পাদক মহাশয় প্রকট করিয়া দেখাইলেন; এইভাবে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে শিক্ষালাভ করিলাম। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত দালালবাজার নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার রায় বি,এ মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণবগণ বিশেষ সুখী হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এই প্রবন্ধটী যে আসুরিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতম্মন্য আবেশে লিখিত. হইয়াছে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। যে পাঠকপাঠিকা এই প্রবন্ধটী পড়িবেন, তিনিই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ইহা কেবল যথেচ্ছাচারিতা-ভাবোচ্ছ্বাসে লিখিত। যে সকল সৌভাগ্যবান্ জীবের শ্রীগুরুচরণ-প্রসাদ-সৌরভে হৃদয়খানি সুবাসিত, এই প্রবন্ধটী তাহাদের হৃদয়ে শ্রীগুরুচরণের প্রতি অবিশ্বাসরূপ পূতিগন্ধই সঞ্চার করিতেছে। কোনও একটী বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, গ্রন্থের আদ্যন্ত সমালোচনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা যে আবশ্যক, বিশ্বা-

বাচস্পতি মহাশয় বোধ হয় নিজ পাণ্ডিত্য-আবেশের স্রোতে তাহা একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটীর যে যে অংশ বৈষ্ণবগণের মনে বেদনা দিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিয়া সেই সেই অংশের সিদ্ধান্ত যে দোষদুষ্ট হইয়াছে তাহাই ক্রমে দেখান যাইতেছে।

(১) "যদি কেহ কাহারও নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া নিজেই শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতে থাকেন"।

উত্তর। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলেন—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা" * * * *

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ"

* * * *

পর হইতে, নিজ হইতে, অথবা পরস্পর-সমালোচনা হইতেও গৃহব্রতিগণের শ্রীকৃষ্ণে মতিলাভ হইতে পারে না. যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের চরণরজের দ্বারা নিজের অভিষেক প্রার্থনা না করিবে। এই সকল প্রমাণে বেশ বুঝা যায়—শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও শ্রীমহৎ-কৃপাভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না, যেমন শ্রীসত্যভামা ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীনামের গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু একটী শ্রীতুলসীপত্রে শ্রীকৃষ্ণনাম লিখিয়া তুলাদণ্ডের একপার্শ্বে তুলিয়া দিয়া অপর পার্শ্বে খুব ছোট একটী মৃণ্ময়ী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তুলিয়া দিলে, সেই তুলসীপত্রে লিখিত শ্রীকৃষ্ণনামই লঘু হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে শ্রীসত্যভামার প্রেমভক্তি-শক্তির সাহিত্যজন্যই শ্রীনাম পরিপূর্ণ-নিজশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীনাম পরিপূর্ণ-শক্তিযুক্ত হইলেও শ্রীমহতের মুখ হইতে শ্রবণ করিলেই শ্রীনাম নিজশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(২) "নন্থ ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচী-করণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্ত মুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি তত্র তদপেক্ষা নাস্তি। "যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি" এই অংশের দৃষ্টান্ত যথা—শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ। বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈবহি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা। ইতি। এবং সাধ্যসিদ্ধাদিপরীক্ষামপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে। যথোক্তং মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ। সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতাঃ। তন্ত্রান্তরে নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য [illegible]দীনৈব শোধয়েৎ। ইতি। সনৎকুমার[illegible]য়াম্—[illegible] সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ। [illegible]গোপালেষু ন যোদ্ধব্যং [illegible]কালে [illegible] সর্ব্বেঃ [illegible] তথাশ্রমেষু নারীষু নানাবর্ণজন্মতেষু। দাতা কালানামভি-বাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষ ইত্যাদি।

"তথাপি" হইতে "মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি" এই অংশের দৃষ্টান্ত—মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব-কল্প্যতে॥ ইত্থমেবাভিপ্রেতঃ শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে—অস্মিন্ লোকেঽথবা অস্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টাযোগা প্রযুক্তাশ্চ পুংসা শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে। তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগ্ উপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ উপায়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥

তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থাঃ আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ। অতএব উক্তরপাদে—শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে—মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি-বিধিবদ্ ঋষে। তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ॥ ইতি॥

পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ভক্তি-সন্দর্ভের ২৮৪ তম বাক্যের এই স্থানটী সাধনা পত্রিকায় উদ্ধৃত করিতে গিয়া নিজ মতের বাধক বলিয়াই উহার আসল ২টী

কথা উল্লেখ করেন নাই। (১) "উচ্যতে" (২) "তথাপি"। এই দুইটী অর্থ বিপরীতভাবে জনসাধারণের সম্মুখে এমনভাবে ধরিয়াছেন যে—যাহাতে সাধারণ মানব বিজ্ঞলেখকের মতের পক্ষ সমর্থন করিয়া অত্যাবশ্যক দীক্ষা-বিধিকে অনাদর করিতে পারে এবং তাহাতে পরমার্থিক-জগতে ঘোরতর সর্বনাশ হইতে পারে। এই আশঙ্কাতেই কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। (ক) এই "উচ্যতে" ও "তথাপি" শব্দদুইটী নিরর্থক নহে। কারণ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ পরম দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি নিরর্থক কোন শব্দ ব্যবহার করেন না। শ্রীষট্সন্দর্ভগ্রন্থে দেখা যায়, যখনই "নন্" পদ উল্লেখ করিয়া কোনও পূর্বপক্ষ স্থাপন করেন, তখন তাহার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থকর্তার তাৎপর্য্য পূর্বপক্ষের সমর্থনে কিম্বা খণ্ডনে তাহা সকলেই বুঝেন। "উচ্যতে" শব্দদ্বারা পূর্বপক্ষের সম্বন্ধে যে তাঁহার নিশ্চয়ই কিছু বলিবার আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। "উচ্যতে" পদটী কর্তৃপদ; উহা প্রদর্শিয়া সিদ্ধান্ত-পক্ষের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। [illegible] নিশ্চিত [illegible] সরলভাষায় লিখিতেছি। কোন বাদী এইরূপ [illegible] করিতে পারেন যে—শ্রীভগবানের যত মন্ত্র আছে, সকলগুলি মন্ত্রই শ্রীভগবানের নামময়; বিশেষতঃ সেই সকল নাম "নমঃ", "স্বাহা", "স্বধা" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অলঙ্কৃত। যেমন "কৃষ্ণায় নমঃ" গোবিন্দায় স্বাহা" "হরয়ে স্বধা" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ এবং ঋষি প্রভৃতিও ঐ মন্ত্রে শক্তিবিশেষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং ঐ সকল মন্ত্রে এমনি এক অচিন্ত্যশক্তিবিশেষ আছে, যাহাতে শ্রীভগবানের সহিত সাধকের দাস্যাদি কোনও একতর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার কেবল অর্থাৎ "নমঃ" শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত না হইয়া ও নিরপেক্ষভাবে শ্রীভগবানের সহিত সকল নামই পরমপুরুষার্থ-প্রেমফলপর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ। অতএব শ্রীভগবানের নিখিল নাম হইতেও অধিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া দীক্ষাদির অপেক্ষা হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন—"উচ্যতে" অর্থাৎ এই প্রশ্নের খণ্ডনের জন্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে। যদ্যপি মন্ত্রের স্বরূপসামর্থ্য বিচার করিলে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি প্রায়শঃ অর্থাৎ হাজারের ভিতরে ৯৯৯ জনেরই বহির্মুখতা-স্বভাবে দেহাদিসম্বন্ধে কদর্য্য শীল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত। তাহাদিগের সেই কদর্য্য-আচরণ ও চিত্তের বিক্ষেপ বিদূরিত করিবার জন্য ত্রিকালদর্শী শক্তিমান্ ঋষিগণ এই অর্চনমার্গে কোন কোনও স্থানে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অতএব মন্ত্রসামর্থ্য-বিচারে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষদুষ্ট দেহাভিমানী জীবের দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য "অপেক্ষা নাই ও আছে" এই দুইটী পক্ষেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। "তত্র" নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ জীবে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। "যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি" এই অংশের দৃষ্টান্ত রামার্চন-চন্দ্রিকা হইতে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন;—নিখিল বৈষ্ণবমন্ত্রের মধ্যে শ্রীরামমন্ত্রই [illegible] এবং [illegible] হইতেও কোটি কোটি গুণ অধিক সামর্থ্যযুক্ত। হে বিপ্রেন্দ্র! তাঁহার সামর্থ্য এই যে—দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা ও ন্যাসবিধি বিনাও কেবল জপমাত্রেও সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে, এবং সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতির পরীক্ষা করিবার অপেক্ষাও কোথাও শোনা যায় না। মন্ত্রদেব-প্রকাশিকাতেও উল্লেখ করা আছে যে—সৌরমন্ত্র এবং নরসিংহ প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপের যে সকল বৈষ্ণবমন্ত্র আছে, তাঁহাদের সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতির বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তন্ত্রান্তরেও উল্লেখ আছে যে—নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপে এবং প্রসন্নতা-প্রচুর ভগবানের ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধ প্রভৃতি শোধন করিবার প্রয়োজন নাই। সনৎকুমার-সংহিতাতেও উল্লেখ আছে যে—হে নারদ! সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি গোপাল-মন্ত্রে নাই; যেহেতু শ্রীগোপালমন্ত্র স্বয়ংপ্রকাশ। অন্যত্রও উল্লেখ আছে—সর্ববর্ণে, সর্বাশ্রমে, সকল নারীতে ও সকলযোনিজাত-ব্যক্তিতেই যে জন শ্রীগোপালমন্ত্রদান করেন, তাঁহার ভক্তি-

বাঞ্ছিত ফলসকল পূর্ব্বেই দান করিয়া থাকেন। "তথাপি" হইতে "মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি" এই অংশের দৃষ্টান্ত ব্রহ্মযামলে উল্লেখ আছে—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি পঞ্চরাত্রিবিধি অতিক্রম করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির অনুষ্ঠানে উৎপাৎই উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে পৃথিবীদেবীও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। মানব মাত্রের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গললাভের জন্য তত্ত্বদর্শিঋষিগণ যে সকল উপায় দেখাইয়াছেন এবং নিজেরাও অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিধি যাঁহারা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী হইলেও সেই-সকল আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত আছেন বলিয়া অতিসুখে মঙ্গললাভের উপায় লাভ করিয়া থাকেন। সেই সকল বিধি অমান্য করিয়া যে পাণ্ডিত্যাভিমানী জন স্বয়ং প্রজ্ঞা-বলে স্বতন্ত্র বিধি অবলম্বন করেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত বিষয় ফলপ্রদানে অসমর্থ এবং আরব্ধ অনুষ্ঠানও পুনঃ পুনঃ ব্যভি-চারী হইয়া থাকে। অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণনারদ-সংবাদে শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—"যে জন আমার ভক্ত এবং বিধিপূর্ব্বক আমার প্রতিমার সেবা করে, হে ঋষি-প্রবর! স্বপ্নেও তাহার কোন প্রকার বিঘ্ন হয় না। যেহেতুক সেজন সর্ব্বপ্রকারেই ভয়ের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ইত্যাদি। এই সকল উল্লিখিত প্রমাণের মধ্যে বিশেষ বিচার এই যে—যদ্যপি মন্ত্রের সামর্থ্য খুবই উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি অনাদি-ভগবদ্বৈমুখ্য-দোষে—দেহাদির প্রতি সম্বন্ধ স্থাপন করায় জীব কদর্য্যশীল হইয়া পড়িয়াছে। "কদর্য্যশীল" শব্দের অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারই বুঝিতে হইবে। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জীবের নিত্যসেব্য ও জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক। অথচ এই সেব্য-সেবক-সম্বন্ধটী নিত্যই আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ বিস্মৃত হওয়ায়, মায়াময় দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গের ও দেহসম্বন্ধান্বিত ব্যক্তির ও পদার্থের সেবা করে বলিয়া জীব কদর্য্যশীল হইয়াছে।

স্ত্রী যদি নিজপতির সেবা পরিত্যাগ করিয়া—পরপুরুষের সেবা করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে যেমন কদর্য্যশীলা বলা যায়,—জীবের পক্ষেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন—"দীক্ষা গ্রহণের অপেক্ষা নাই, এবং অপেক্ষা আছে"—এই উভয়বিধ মতের কোনও রূপ সমাধান শ্রীজীব করেন নাই—এইরূপ উক্তিতে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপাদের যথেষ্ট অমর্য্যাদাই করা হইয়াছে; কারণ তিনি একদিকে যেমন নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ, অপরদিকে তেমনি লৌকিকরীতিতে দার্শনিক-পণ্ডিত-শিরোমণি। তিনি পণ্ডিতের মতই সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার সমাধান করিতে কি বাকী রহিল? যেহেতুক "তত উভয়মপি নাসমঞ্জসম্" অর্থাৎ প্রায়শঃ মানবমাত্রের দীক্ষাদির অপেক্ষা আছে—তাহা তো তিনি নিজেই বলিলেন। অর্থাৎ যাঁহাদের নিত্য-ভগবদুন্মুখতা আছে তাঁহাদের দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। তিনি আরও একটী অতিমাত্র অভিনব কথার অবতারণা করিয়াছেন এই যে—অর্চ্চনমার্গেই দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা আছে, অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে দীক্ষার অপেক্ষা নাই। এই স্থানের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কদর্থের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে—অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গের দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াও অনুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে, কিন্তু অর্চ্চন-অঙ্গে অদীক্ষিত জনের অধিকার নাই। এই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন—অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাদির অপেক্ষা আছে। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়—"শ্রীভগবতা সমম্ আত্ম-সম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাংচ" এবং ২।৮৩ বাক্যে—"তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ" এই দুই বাক্যের ব্যাখ্যা যেন চোখ মুদিয়াই করিয়াছেন। এই দুইটী স্থানই সম্বন্ধানুগা-ভক্তির একমাত্র জীবনী-শক্তি। কারণ শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি-সম্বন্ধ না হইলে সেবা-লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিলেন—শ্রীনারদ প্রমুখ মহাভাগবতগণের অনুষ্ঠিত ভক্তি-পথের অনুসরণ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনের ইচ্ছা করিলে শ্রীগুরুচরণই তাহার অভীষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিবেন। তাহা হইলে এই অক্ষর হইতেই আমরা সুস্পষ্টরূপেই পাইতেছি যে—শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি কোনও এক বিশেষ সম্বন্ধ মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের দ্বারাই হইয়া থাকে; এবং শ্রীগুরুচরণই ঐ সম্বন্ধবিশেষ সম্পাদন করিয়া

থাকেন। ২।৮৪ বাক্যেও মন্ত্রই যে ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহাও উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ঘোরতর অভিমানাবেশ-কুজ্ঝটিকার-আবরণে পড়িয়া—এই সকল বাক্যের মর্ম্মার্থ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। নিজে তো শ্রীশ্রীগুরুচরণসেবাতে যে কি অপূর্ব্ব আস্বাদন, তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেনই, অন্যকেও বঞ্চিত করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তসম্প্রদায়ের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন—তাহা ভাবিতে গেলে বুক কাঁপে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও "আকৃষ্টিঃকৃতচেতসাং" শ্লোক ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়া ছাপাইয়া ইহা হইতেও অধিকতর সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াচেন। পূর্ব্বে-প্রাণের সাধ মিটাইয়া শ্রীবৈষ্ণবনিন্দা করিয়া ভক্ত-সম্প্রদায়ের শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি অনাদর-বুদ্ধি আনাইবার চেষ্টা লইয়াছেন, এইক্ষণ শ্রীগুরুচরণের প্রতিও যাহাতে অনাদর-বুদ্ধি আসে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ধন্য শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদকত্তা! ইহার পরে হয় তো দেখিতে বা শুনিতে পাইব যে—শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহের উপরও অনাদর-বুদ্ধি ঘটাইবার প্রযত্ন লইয়াছেন! ভূরি ভূরি বৈষ্ণব-নিন্দার ফল অবশ্যই ফলিবে। তবে একটী উপকার এই হইল যে—ভজন-সম্প্রদায়ি-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে—শ্রীবৈষ্ণবনিন্দার ফলে জীবের কতদূর দুর্গতি ঘটিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি-সাধকের হৃদয় শ্রীগুরুকৃপা স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে সিঞ্চিত না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—শ্রীগৌরগোবিন্দ ভজন করিয়া যে অপার আনন্দসিন্ধু, তাহার একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুকৃপা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের উচ্ছ্বাসময়ী বাণী পাঠকপাঠিকাগণের আস্বাদনের জন্যে নিম্নে উল্লেখ করা গেল।—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মনের আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয়-কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥
করিনু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি তোমার ব্যবহার॥
রাধাপদ-সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত!
শ্রীরাধারমণ সহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ প্রেমরীত॥
কালিন্দীর কূলে যাই সখীগণে ধাওয়া ধাই
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীরহাম্বির হিয়া ব্রজভূমি সদা ধেয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় শ্রীপাদ বীরহাম্বির মহারাজ যে শ্রীগুরুকৃপায় উদ্ভাসিত আস্বাদন-সিন্ধুতে ডুবিয়া এই উচ্ছাসময়ী ভাষা উদ্গার করিয়াছেন, তাঁহার একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারেন নাই বলিয়াই শ্রীগুরুচরণের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধানলে নিজেও জলিতেছেন, এবং অন্যকেও জ্বালাইবার প্রযত্ন লইয়াছেন। যেহেতু—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরাবপি"॥

যতদিন পর্য্যন্ত রাশি রাশি পাপে চিত্ত মলিন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতেও সদ্বুদ্ধি আসিতে পারে না। সাধকের হৃদয় পাপমলিন কি না তাহা পরিচয় করিবার মাপকাঠি-স্থানীয় শ্রীগুরুতে ও শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি। যখন দেখিবেন "হা শ্রীগুরু" বলিতে হৃদয় বিগলিত হইতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে—হৃদয়খানি অপরাধ-রাশিতে মলিন আছে। শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিতেও ততদিন পর্য্যন্ত পারিবেনা যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে পরাভক্তির উদয়ের অনুপাতে শ্রীগুরুচরণে পরাভক্তির উদয় না হইবে। তাহারই জন্য শ্রীপাদজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে যথা তথা"॥

যাঁহার যে পরিমাণ নিজ ইষ্টদেবে ভক্তি আছে সেই পরিমাণেই যদি শ্রীগুরুচরণে ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই এই বর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথরূপে তাহার হৃদয়ে প্রকাশ

পাইয়া থাকে। আমরা একটী সাধারণ-কথা শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি "যেজন নির্ব্বংশ হইবে, তাহার নাস্তিই মরে আগে"। তেমনি যেজন ভক্তি-রসে বঞ্চিত হইবে, তাহার প্রথমতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে অবজ্ঞাবুদ্ধি আসে। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের উক্তিতে এইরূপই বুঝায়—"শ্রীগুরু পদাশ্রয় না করিয়া শ্রীহরি-নামাশ্রয়েই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, অর্থাৎ শ্রীহরিনামাশ্রয়-কারীর দীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র অর্চ্চনা করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা আছে; অর্চ্চনা বিনা ভক্তির কোনও একটি অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলেই যখন পরমপুরুষার্থ প্রেমলাভ হইয়া থাকে, তখন অর্চ্চনের অনুরোধে দীক্ষাগ্রহণের কি আবশ্যকতা আছে?" এইরূপে ভাষাগুলি ভক্তি সাধকগণের বক্ষঃস্থলে যেন শেলাঘাত করিতেছে। "যদ্যপি" পদ উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ যাহা পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, সেইটীকেই সিদ্ধান্তপক্ষরূপে বুঝিয়া সম্পাদক মহাশয় বিদ্যাবাচস্পতি নামের সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন। "শ্রীহরিনাম হইতেই আমি সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি প্রেমলাভে ধন্য হইব, শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিবার কি প্রয়োজন আছে?" এইরূপ ধারণাকেই শ্রীগুরুর অবজ্ঞা বলিয়া ষষ্ঠস্কন্ধের ২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহোদয় বিশেষ যুক্তির সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। "অন্যে নামাপরাধাস্তু সন্তত নামকীর্ত্তনাদিভিরেব শাম্যন্তীতি। যে চ নামাপরাধিনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতাঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্তিমন্তঃ কিন্তুনাশ্রিতগুরুচরণত্বাদদীক্ষিতা-স্তেঽপি বৈষ্ণবশব্দেনৈবাভিধীয়ন্তে। তথাহি বৈষ্ণব ইতি "সাস্য দেবতেতি সূত্রে" "নানাভক্তিরিতি" সূত্রে নানা চ সিদ্ধত্বাতো যে দীক্ষয়া দেবতীকৃতবিষ্ণবো যে চ ভজনীয়ীকৃতবিষ্ণবস্তে উভে অপি ব্যপদেশান্তর-রাহিত্যাদ্ বৈষ্ণবা এবেতি তেষামপি ন স্যান্নরকপাতাদি পূর্ব্ববদিতি কেচিদাহুঃ নৈতৎ সুসঙ্গতম্। যতো নৃদেহমাদ্যমিত্যাদৌ গুরুকর্ণধারমিত্যুক্তেঃ গুরুং বিনা ন ভগবন্তং সুখেন প্রাপ্নুবন্তি-অতস্তেষাং ভজনপ্রভাবেনৈব জন্মান্তরে প্রাপ্তে গুরু-চরণাশ্রয়ণাদেব সত্যাং ভক্ত্যা ভগবৎ প্রাপ্তির্ভবত এব ভয়াদিরয়ং ব্যবস্থা। যে গো-গর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষে-স্তেন্দ্রিয়া ন সদা চারয়তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদি-রীত্যা গৃহীতহরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি। নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন চ কিং যে গুরুকরণ-শ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণ-মহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদ-পরাধক্ষয়ে শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রপ্নোতীতি।

অন্য সকল নামাপরাধ কিন্তু অনবরত নামকীর্ত্ত-নাদি দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে সকল নামাপরাধি-গণ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন কিন্তু শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করেন নাই বলিয়া অদীক্ষিত তাহারাও বৈষ্ণব বলিয়াই অভিহিত; যেহেতুক "বিষ্ণু দেবতা যাঁর" এই সূত্রে "নানাভক্তি" এই সূত্রে যাঁহারা দীক্ষাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে দেবতা করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভজনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে ভজনের বিষয় করিয়াছেন—এই দুই প্রকার ভক্তই বৈষ্ণব, যেহেতু তাঁহাদের অন্য কোনও সংজ্ঞা নাই। এইজন্য যাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ হয় নাই অথচ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন করিতেছেন, তাঁহাদেরও নরকপাতাদি হইবে না কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে। যেহেতুক—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকটীতে শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধার-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণধার ভিন্ন যেমন সাগর পার হওয়া যায় না, তেমনি শ্রীগুরু বিনা ভবসাগর সুখে পার হওয়া যায় না, অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে সুখে

লাভ করা যায় না। অতএব তাঁহাদের ভজন-প্রভাবেই শ্রীগুরুচরণাশ্রয় লাভ করতঃ ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাইতে পারিবে; অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না। এই কথা বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, ও সাধু-সজ্জনগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। অথচ অজামিল শ্রীগুরুচরণাশ্রয় না করিয়াও অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছে—ইহা শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে। অতএব এই বিরোধ পরিহারের জন্য এস্থানে এইরূপ ব্যবস্থাই বুঝিতে হইবে,—যাহারা সকলগুলি ইন্দ্রিয়কে গরু-গাধার মত সর্ব্বদা বিষয়েতেই বিচরণ করায়, "কে ভগবান্! ভক্তিই বা কি! গুরুই বা কি!" ইহা স্বপ্নেও জানে না; কিন্তু নামাভাসাদি-রীতিতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছে, অথচ অজামিলাদির মত অপরাধশূন্য, তাহাদেরই শ্রীগুরুচরণাশ্রয় বিনাও উদ্ধার হইবে। অর্থাৎ দাস্যাদিভাবশূন্য প্রীতিসামান্য লাভ করিয়া শ্রীভগবানের ধামে বাস করিতে পারিবে কিন্তু শ্রীহরিকেই ভজন করিতে হয় এবং ভজনই শ্রীহরির [illegible] দিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছিলেন এই বিবেকবিশেষ থাকা সত্ত্বেও—

"নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ মন্ত্র, দীক্ষা, সৎক্রিয়াঃ ও পুরশ্চর্য্যার কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া রসনা-স্পর্শমাত্রই প্রেমফল দান করিয়া থাকেন; এই প্রমাণ এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্তের দ্বারাও "আমার গুরুকরণ পরিশ্রমে কি প্রয়োজন? শ্রীনামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে" এইরূপ মনে করিলে কিন্তু অবজ্ঞা-লক্ষণ মহাপরাধই হইবে, এবং সেই অপরাধ জন্য তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু সেই জন্মেই হউক্ বা জন্মান্তরেই হউক্ সেই গুরু-অবজ্ঞাপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের এই সিদ্ধান্তেও কি বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয়ের চক্ষু ফুটিবে না? সম্পাদক মহাশয় যে ভক্তিবিরুদ্ধ অসভ্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, পাঠক-পাঠিকাগণের চোখের নিকট সেই কয়েকটী ভাষা উপস্থিত করিতেছি। সুতরাং শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণে অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ইষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। বাচস্পতি মহাশয়ের এই ভাষায় কি এরূপ বুঝায় না যে—কেহ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যেন বড়ই বপর হইয়া তাহার চরণে শরণাগত হইয়াছে, আর তিনি তাহাকে অভয়-প্রদান করিতেছেন। আর যে সকল দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃই বুঝায় শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয় করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণকে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। বাচস্পতি মহাশয় বোধ হয় শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থখানির প্রতি সুদৃষ্টিপাত করেন নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে যৌথিকী এবং অযৌথিকী বিচার প্রকরণে "গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বং" এই শ্লোকে উহার অনুসন্ধান অবশ্যই পাইতেন। যেস্থানে তাঁহারা পূর্ব্বে গোপাল-উপাসক ছিলেন এইরূপ উল্লেখ করা [illegible] সেস্থানে [illegible] উপাসনার মুখ্য ও মূলাবধি গুরুপদাশ্রয় করিয়াই উপাসনা করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত করিবার অবসর কোথায়? তিনি আরও একটি নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন যে—'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনদ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাধকের অভীষ্ট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই'। সম্পাদক মহাশয়ের চোখের ঠুলি কি একেবারেই খুলিবেন না? ২৮৩ বাক্যে ও ২৮৪ বাক্যে যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ উল্লেখ করিয়াছেন—"শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষম্ দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষন্তিঃ" আর "শ্রীভগবতা সমসাম্যসম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদকাশ্চ" একই বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়া "দীক্ষাবিধানের দ্বারাই যে শ্রীভগবানের সহিত দাস্যাদি বিশেষ সম্বন্ধ জাগিয়া থাকে এবং ঐ সম্বন্ধ যে শ্রীগুরুচরণ-কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয়", তাহাতো সুস্পষ্ট-রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, আবার শ্রীগোস্বামিপাদ কিরূপ-ভাবে উল্লেখ করিবেন? বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় কিন্তু "শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং সম্বন্ধবিশেষম" এই দুইটী পদের বিশেষ্যবিশেষণ ভাব রক্ষা না করিয়া "গুরুচরণসম্পাদিত

পরবী” “দীক্ষাবিধানেন” এই তৃতীয়ান্তপদের বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার ব্যাখ্যায় “গুরুচরণসম্পাদিত দীক্ষাবিধানের দ্বারা” এইরূপ উল্লেখ আছে। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কর্মান্ত “গুরুচরণসম্পাদিতং” পদটীকে করণান্ত “দীক্ষাবিধানেন” পদটীর সহিত অন্বয় করিতে কোনই বাধা রহিল না। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই এসব ভজন পাই
প্রেমভক্তি সখী অনুচরী।

এই সকল অক্ষরগুলি কি সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয় নাই? আরও একটী বিষয় বুঝিতে বিশেষ ভুল করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসি-মুনিগণের হৃদয়ে শ্রীমদনগোপালদেবের মাধুর্য্য প্রচুরতর ভাবে উদ্দীপ্ত হওয়ায় তাঁহারা যে লজ্জিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, তাহা কি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমদনগোপালদেবের প্রতি অনুরাগবিশেষ ছিল বলিয়াই? অথবা শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবামাত্র উদ্দীপন হইয়া উঠিল? ইহাও বোধ হয় জানা নাই—যে বস্তু যাহার হৃদয়ে যতটা পরিমাণে স্ফূর্ত্তি থাকে, সেই সাদৃশ্যবস্তুর অবলোকনে সেই পরিমাণেই উদ্দীপন হইয়া উঠে। অতএব শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার পূর্ব্ব হইতেই সেই মহর্ষিগণ শ্রীমদনগোপালদেবের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যে মাতোয়ারা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সংশয় করিবার আছে কি? শ্রুতিগণের দৃষ্টান্ত যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অত্যন্তই অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর ও তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকর তাহা শ্রীনন্দব্রজবাসিগণকে যখন শ্রীগোলোকদর্শন করাইলেন, তখন দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীনন্দব্রজবাসিগণ দেখিলেন যে—মূর্ত্ত শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন। “কৃষ্ণঞ্চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ” অথচ ঐ শ্রুতিগণই জাগতিক সাধকগণের হিতার্থে মূর্ত্তরূপে সত্যলোকেও বিদ্যমান আছেন। “বেদাঃ যথা মূর্ত্তিধরা স্ত্রিপৃষ্ঠে”। অতএব তাঁহাদের দীক্ষা-গ্রহণের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? আর কয়েকদিন পর হয় তো দেখিতে বা শুনিতে পাইব শ্রীরাধিকাও তো দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন! পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে বিদ্যাবাচস্পতির বাহাদুরী না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে “শ্রীহরিনাম দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা করে না” এই মতের সমর্থন করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুইটী স্থান উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এক অর্থের অন্যার্থ-কল্পনা করিয়া বিশেষ অনর্থ ঘটাইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

ডাক

(প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা)

অমন করি আমায় কে সে ডাকে।
কোন কাননে কোন ভুবনে কোন গগনে থাকে।
স্বপ্নে কিবা জাগরণে গৃহের কোণে পথে বনে,
শুনি আভাস ক্ষণে ক্ষণে প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে।
কোথায় কুসুম-কুঞ্জ-খানি, কোমল করুণ-মঞ্জুবাণী।
প্রাণের পটে কি রং আনি রসের ছবি আঁকে।
বুকের তলে গোপন-স্মৃতি জাগায় মোহন গহন গীতি।
কিসের সুরে মানস নিতি আকুল করি রাখে।
অমন করি আমায় কে সে ডাকে!

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

[১৪]

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

নিরতিশয় দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন বাক্‌শক্তিহীন আহত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছুই চাহিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, উপযুক্ত পথ্যাদিপ্রয়োগে তাহাকে সবল ও সুস্থ করিয়া তুলিবার আশায় তৎসমীপে অপেক্ষা করিয়া থাকার সেই পর্য্যন্তই সার্থকতা আছে,—যে পর্য্যন্ত তাহাতে জীবনী-শক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ—পথ্যাদি সেবনের কিঞ্চিৎ উন্মুখতা পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু মৃতের পক্ষে পথ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে কোনও উন্মুখতা বা চেষ্টাশীল হইবার আর কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অতিশয় স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-বন্ধুগণও তদবস্থায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন, ইহাই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবের জীবত্ব অনাদিকাল হইতে মায়াকর্ত্তৃক হত হওয়ায়, জীবত্বহীন জীবমাত্রেই বাস্তবিকপক্ষে মৃত; সুতরাং মৃতের পক্ষে স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা—সাধনভক্তিরূপ নির্গুণ পথ্যাদি সেবনের জন্য স্বাভাবিক উন্মুখতা সম্ভবপর নহে; অতএব কিঞ্চিন্মাত্রও সেবোন্মুখ হইলেই স্বপ্রকাশ সাধন-ভক্তি কৃপা করিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্পা হইলেও, মায়া-হত জীবের পক্ষে ভক্তিদেবীর এতাদৃশী মহতী কৃপাকে বরণ করিয়া লইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; যে হেতু মায়ামৃত জীবের পক্ষে শবাসনের শবের ন্যায় অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার প্রকাশ সম্ভবপর হইলেও, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাধন-ভক্তি-সেবনে উন্মুখতারূপ স্বাভাবিক জীবন-লক্ষণের স্বতঃ প্রবৃত্তি অসম্ভব। এইরূপে মায়াহত জীবের দুর্দ্দৈবসীমা, এইস্থলে শ্রীভগবানের কৃপার সীমাকে অতি-ক্রম করিলেও, সেই দয়াময়ের দয়ার সীমাও অনন্ত। তাই যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশার অপেক্ষা না করিয়া, স্নেহ ও কৃপাশীল আত্মীয়-পরিজনও তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া থাকে,—মায়াহত জীব-মাত্রেই যথার্থরূপে তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, জীবের প্রতি ভগবৎকরুণা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ ও কৃপার ন্যায়, এই খানেই অবসান প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি মায়ামৃত জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতার আর কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মৃতের প্রতি তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণের ব্যবহারের মতই জীবকে চিরপরিত্যাগ করিতে পারি-তেন; কিন্তু স্বরূপভ্রষ্ট জীবের এই শোচনীয় দুর্গতির সীমা অপরিসীম হইলেও, তদীয় অনন্ত করুণার কিরণ জালে জীবের সেই দুর্দ্দৈবের অপার অন্ধকার রাশিকেও অতিক্রম পূর্ব্বক, স্বীয় কৃপাবেষ্টনী মধ্যে পুনরায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। মায়াকর্ত্তৃক জীবকে নিহত দেখি-য়াও শ্রীভগবান্ নিরস্ত হয়েন নাই; তিনি "মৃতসঞ্জীবনী" সম্প্রযোগে মায়ামৃত জীবকে সঞ্জীবিত করিয়া, "সাধন-ভক্তিসুধা" সেবনে তাহার উন্মুখতা আনয়ন পূর্ব্বক, নিগুণা-সাধন-ভক্তি-পথ্যের পরিণতাবস্থা যাহা,—যথাক্রমে সেই "প্রেম-ভক্তি" বা ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসার উদয় করাইয়া, মৃত জীবকে এইরূপে অমৃতত্ব প্রদানের সহিত আত্মবরণ করিতেছেন।

মৃতকে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে "মৃতসঞ্জীবনী" প্রয়োগের কথা লৌকিক-জগতে শ্রুতিগোচর হইলেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; এবং কদাচিৎ বা পরিদৃষ্ট হইলেও সে জীবনলক্ষণ স্বাভাবিক জীবন না হওয়ায়, সে "মৃত-সঞ্জীবনী"ও যথার্থ নহে; উহাতে মৃতেরই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতার সাময়িক বিকাশ হয় মাত্র; কিন্তু যাহার প্রয়োগে জীবের স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ হয়, যাহার সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব অফুরন্ত—অনন্ত মধুময় জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যর্থ মৃতসঞ্জীবনীর অপর নাম "মহৎ-কৃপা"।

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে মহৎ-কৃপার লেশ-মাত্রও সংযোগ ঘটিলে, তৎপরমুহূর্ত্ত হইতে জীবের স্বাভাবিক জীবনধারা প্রবাহিত হইতে থাকে; জীবত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে "সাধন-ভক্তি" সেবনের জন্য জীব-হৃদয়ে যে উন্মুখতা—যে চেষ্টাশীলতার বিকাশ হয়, জীবা-ত্মার সেই স্বাভাবিক সজীবতার অপর নাম "পুরুষকার"।

ধন, ধান্য, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাদি সগুণ বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদের যে উৎসাহ—যে কর্ম্মতৎপরতা, তাহা নিগুর্ণ জীবধর্ম্মের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া, সেই অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা, ব্যবহার জগতে "পুরুষকার" নামে কথিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা কখনই "পুরুষকার" পদবাচ্য হইতেই পারে না; যেহেতু "পুর্ষু শেতে ইতি পুরুষঃ"—অর্থাৎ যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহরূপ পুরসকল-মধ্যে শায়িত থাকেন—অবস্থান করেন, তাঁহার নাম "পুরুষঃ"; সুতরাং দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মাই পুরুষপদবাচ্য। আবার সেই "পুরুষস্য কৃতিঃ" অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়া বা চেষ্টা যাহা, তাহারই নাম "পুরুষকার"। আত্মাই পুরুষ; অতএব নিগুর্ণ আত্মার নিগুর্ণ বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা,—উহাও নিগুর্ণ বলিয়া, আত্মার সেই স্বাভাবিক চেষ্টাশীলতাই যথার্থ "পুরুষকার"। সগুণ বা জড়ীয় বিষয়ের নিমিত্ত অবিদ্যা বা জড়তায় অভিভূত আত্মার যে অস্বাভাবিক চেষ্টাশীলতা, তাহা সগুণ বা জড় বলিয়া, ভগবৎসম্বন্ধ বর্জ্জিত সেই সকল চেষ্টাশীলতাকে জড়ীয় দেহেন্দ্রিয়াদির আস্ফালন বা জড়ত্ব ভিন্ন, "পুরুষকার" নামে অভিহিত করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অবিদ্যা কর্ত্তৃক দেহাত্মবোধ-রূপ "মূলে ভুল" উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের অস্বাভাবিক জীবন-প্রবাহের আগাগোড়া সমস্তই ভ্রমময় করিয়া তুলিয়াছে।

"মহৎ-কৃপা" রূপ মৃতসঞ্জীবনীর অমোঘ স্পর্শলাভের পরক্ষণ হইতে জীবের যথার্থ জীবন-স্পন্দন আরম্ভ হয়, এবং তাহারই ফলে বলহীন্ বা হতবল জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ্য সেবনের উন্মুখতা সম্ভব হয়। ভক্তিসেবো-ন্মুখতারূপ জীবের যথার্থ পুরুষকার জাগ্রত হইলেই তখন কৃত-সঙ্কল্পা ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় স্বয়ংই জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধনরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই প্রকারে নিগুর্ণা ভক্তি-সুধা অনুসেবনের দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীভগবৎসেবা প্রাপ্তির পূর্ণ লালসা বা প্রেমোদয়ে, জীবের পক্ষে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার বা "মহামিলন" সংঘটিত হইয়া থাকে। একমাত্র মহৎ-কৃপাকেই ভক্তিসেবনে উন্মুখতার বা ভগবৎপ্রেমের মূল কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"—(শ্রীচরিতামৃত)। মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর সংযোগ ব্যতীত মায়ামৃত জীবের পক্ষে অপর কোন প্রকারে স্ব-প্রকাশ চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীর পদরজও স্পর্শ করিবার পক্ষে কোনও চেষ্টাশক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। যেখানেই শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নিগুর্ণ ভক্ত্য-ঙ্গের কোনও সংযোগ পরিদৃষ্ট হইবে, তাহার মূলে, বর্ত্তমান বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জানিত বা অজানিত যে কোন ভাবে হউক মহৎকৃপা—ভক্তকৃপা সঞ্চারের সুসংবাদ অবশ্য নিহিত থাকিবেই। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।"—(চরিতামৃত)।

যে জীবের ভাগ্যে কণমাত্রও মহৎ-কৃপামৃতের সংস্পর্শ-লাভ ঘটিয়াছে তৎকালে মর্ত্ত্য বা মরলোকের মৃত-স্তূপের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলেও সেই জীব, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আর মৃতের মধ্যে গণ্য নহে; তাহার যথার্থ জীবন-নিশ্বাস তৎকালে যতই অল্পাকারে প্রবাহিত হউক্, সেই জীবকে সঞ্জীবিত বলিয়াই জানিতে হইবে। বড়শী-বিদ্ধ ও মুক্ত মীন, একই জলাশয়ে—একই প্রকারে অবস্থান করিলেও বড়শীবিদ্ধ মৎস্যকে যেমন শীঘ্র বা বিলম্বে হউক্ জলাশয় হইতে উঠিতেই হইবে; পরিজন দ্বারা সংবৃত হইয়া অপরাপর মুক্তমীনের মত তৎকালে জলমধ্যে বিচরণশীল হইলেও তাহাকে যেমন ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ যে জীব, মহৎকৃপা রূপ বড়শী দ্বারা একবার সংবিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে তাহাকে ভব-জলাশয়ে অপর সাধারণ জীবের মত একই প্রকারে অবস্থিত দেখা যাইলেও, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক্ সংসার পাথার হইতে তাহার উদ্ধারলাভ অনিবার্য্য। মহৎ-কৃপা-বিমুক্ত জীবের সহিত আপাততঃ তাহার আচরণ ও বিচরণ প্রায় একই প্রকারের লক্ষিত হইলেও, মহৎ-কৃপাবিদ্ধ সেই জীবকে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধৃত বলিয়াই জানিতে হইবে। তাই মহৎকৃপা-মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শলাভ ব্যতীত যাহা অন্য কোনও কারণ হইতে সঞ্জাত হয় না,—সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা, সাধন-ভক্তিসেবনের সামর্থ্য যেখানে যে কোন ভাবে পরিলক্ষিত হইবে, তৎকালে তাহার সংসারপাশ বিমুক্তির কোনও লক্ষণ প্রকাশ না

পাইলেও, যথাকালে ও যথাক্রমে সেই জীবের ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি অনিবার্য্য জানিয়া ও তাহার সেই অনাগত সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া, শাস্ত্র, সেরূপ জীবকেও বার বার সম্মান প্রদান করিতে বিরত হয়েন নাই ;—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

অর্থাৎ—পরিহাস ও উপহাসাদিতেও যাহাদের মুখ হইতে শ্রীভগবন্নাম স্ফুরিত হয়, তাহারা কৃতার্থ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকেও নমস্কার।

মহৎকৃপা-সিঞ্চিত জীবের, জড়স্তূপের অভ্যন্তর হইতে বিমুক্ত হইয়া, চিদানন্দের চির-জ্যোৎস্না শীতল স্বদেশের দিকে অনন্তজীবন লাভ করিবার জন্য যে ক্রমিক অভিসরণ,—তাহার গতি, কেবলমাত্র "অপরাধ" ভিন্ন অপর কোনও বিরুদ্ধশক্তিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইতে পারে না। "আরাধনা" যাহা হইতে "অপগত" হয়—দূরীভূত হয়, তাহাই "অপরাধ"। ভজন-বিষয়ে শিথিলতা বা এক কথায় ভজন-শৈথিল্যই অপরাধের বিষময় ফল। "সেবাপরাধ" ও "নামাপরাধ" ভেদে উক্ত অপরাধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ হইলেও তন্মধ্যে নামাপরাধই সাধনভক্তিসেবনে উন্মুখতার পক্ষে—প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের পক্ষে সর্ব্বাধিক অনর্থকর। নামাপরাধ সকলের মধ্যে আবার মহতের নিকট—বৈষ্ণবের নিকট—ভক্তের নিকট অপরাধই ভজনপথের প্রধানতম অনর্থ বলিয়া, উহার অপর নাম "মহদপরাধ"। অপরাধের সারমর্ম্ম এই যে, ভক্তি ও ভক্তজনের সম্বন্ধে নিন্দা ও অবজ্ঞাদি হইতে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাদের গৌরব ও সম্মান সর্ব্ববিষয়ে যথাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভজনে যে প্রবৃত্তি, তদ্বিষয়ে পুরুষকারের অপ্রয়োগ জনিত অক্ষমতাই অপরাধ।

সংসার-ব্যালাক্রান্ত জীব যে ভক্তিকল্পতরুমূল অবলম্বনে তাহার ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়া সম্পূর্ণ ভয়রহিত ও পরমানন্দিত হইবে, অসর্কতা নিবন্ধন সেই আশ্রয়তরু মূলে নিজেই "অপরাধ" রূপ কুঠারাঘাত করিলে তাহাতে যে কি পরিমাণ অনর্থপাতের সম্ভাবনা, স্থিরভাবে চিন্তা-দ্বারাই তাহা অনুভব করিবার বিষয়। যে জীবের সহিত কোন প্রকার ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগ দেখা যাইবে, তাহারই মূলে মহৎকৃপার বিদ্যমানতা যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি মহৎকৃপা সংযোগের পরক্ষণ হইতে প্রেমোদয়ের দিকে ক্রমিক অগ্রগতির যদি কোনও প্রতিরোধ অনুভূত হয়, তাহা হইলেও সুনিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে, ভক্তি-লতিকা কুঞ্জে "অপরাধ" রূপ মত্ত কুঞ্জরের অবশ্যই প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে।

মায়াবিনীর রূপার কাঠির স্পর্শে, পাতাল পুরীর বিনিদ্রা কুমারী, যেমন তদন্বেষণপর রাজকুমারের সোণার কাঠির স্পর্শনে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসে ; পরে করপল্লবে নয়ন মার্জ্জন পূর্ব্বক, ঘুমঘোর কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের অনুপম মাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা কুমারী যেমন তদীয় রাতুলচরণে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ মহা"মায়া"বিনীর "অবিদ্যা" নামক রূপার কাঠির স্পর্শে "সংসার" মায়াপুরে চেতনাহত জীব, তদন্বেষণপর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক "মহৎ-কৃপা"রূপ সোণার কাঠি স্পর্শনে সচেতন হইয়া "পুরুষকার" বা আত্মশক্তি রূপ উত্থান লাভ করে ; অতঃপর "সাধন ভক্তি" পাণিতলে চিত্তরূপ নয়নমার্জ্জনপূর্ব্বক, "অনর্থঘোর" কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীব্রজরাজকুমারের অনুপম মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তদীয় চিরশান্তিময় সুশীতল চরণকমলে আত্মবরণ পূর্ব্বক জীবত্বের পূর্ণাহুতি প্রদানে সমর্থ হয়। ভক্তত্বই জীবের জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির ফল।

স্বয়ম্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ বলিয়া, ভগবৎকৃপা হইতেই জগতে মহৎ-কৃপামৃতের সমুদ্ভব হইলেও, ভগবান্, ভক্তি ও ভক্তজনের একাত্মতা বশতঃ ("তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ") এবং স্বতন্ত্র ভগবানেরও ভক্তি ও ভক্তপরতন্ত্রতা নিবন্ধন ("ভক্তিবশঃ পুরুষো") । ("অহং ভক্তপরাধীনো") ভক্তিকৃপা ও ভক্তকৃপাকে স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে। ভক্তি-দেবী স্বতন্ত্র ভাবে জীবকে কৃপা করিতে উদ্যতা হইলেও তৎকালে মায়াহত জীবের তৎসেবনে উন্মুখতার অভাব বশতঃ ভক্তকৃপা বা মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে জীবত্বহত জীব, সঞ্জীবিত হইয়া, তদনন্তর ভক্তি সেবনে সমর্থ হয় ; অতএব স্বতন্ত্র মহৎকৃপাকেই ভগবদ্ভক্তির "জন্মমূল" বলিয়া জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবর্ষাণ

(ভ্রমণ)

[শ্রীরাধানাথ কাবাসী]

আমরা গত ৮ই আশ্বিন কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০ই আশ্বিন বর্ষাণে পৌছিয়াছিলাম। বর্ষাণ অতি ক্ষুদ্র সহর। এই স্থান শ্রীশ্রীরাধারাণীর পিত্রালয়—শ্রীবৃষভানু রাজার আবাসস্থান। কলিকাতা হইতে ট্রেণে উঠিয়া হাতরাসে গিয়া নামিতে হয় এবং তথা হইতে গাড়ি বদল করিয়া মথুরা জংসন ষ্টেশনে যাইতে হয়। সেখান হইতে টোঙ্গা বা একা গাড়িযোগে মথুরা সহরে আসিয়া মোটর বাসে (Motor Bus) আরোহণ করিয়া বর্ষাণে যাওয়া যায়। মথুরা হইতে বর্ষাণ ৩০।৩২ মাইল দূরে ইহার মধ্যে মথুরা হইতে ছাতা পর্য্যন্তও ১৮ মাইল বেশ ভাল পাকা রাস্তা। এই ছাতা গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকগণ সহ গোচারণ করিতে করিতে রাখালরাজা হইয়াছিলেন; এবং শ্রীবলদেব প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রাখালবালকগণ রাজপার্ষদরূপে বিরাজ করিতেছিলেন; আহা মরি! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন সে কি এক অপূর্ব্ব অপার্থিব শোভা হইয়াছিল! এই স্থানেই "রাখালরাজা" পাইয়াছিলেন ও মস্তকে ছত্র ধরা হইয়াছিল বলিয়া তদবধি এই গ্রামের নাম ছাতা হইয়াছে। এই ছাতা হইতে বর্ষাণ ১২।১৪ মাইল দূর; ইহা কাঁচা রাস্তা; আমাদের দেশে কাঁচা রাস্তা দিয়া মোটর চলা সম্ভবপর নহে, কিন্তু সেখানে চলে; কেবল বৃষ্টি হইলে এক দিন কি দুই দিন বন্ধ থাকে, তবে বর্ষা দেশে খুব কমই হয়। মথুরা হইতে বর্ষাণে যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে।

বর্ষাণ কি মনোরম স্থান—এখানে আসিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত স্থানই ত মনোরম, কিন্তু বর্ষাণ আবার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলিয়া মনে হয়। এখানে সর্ব্বপ্রধানা দর্শন হইতেছেন শ্রীরাধারাণী। অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। পাহাড়ের গা দিয়া বরাবর সিঁড়ি রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীমন্দির এত উচ্চে যে, উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়; তবে সকল কষ্ট, সকল জ্বালা দূরীভূত হয়—যখন আমাদের প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধারাণীকে পিতৃগৃহে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে স্বীয়-প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলিত হইয়া বিরাজ করিতে দেখা যায়। আর যখন সেই সুরম্য প্রকাণ্ড মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি করা যায়, তখন নিম্নের স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিলে প্রাণ একেবারে জুড়াইয়া যায়—তখন মনে হয় এরূপ প্রাণজুড়ান স্থান পৃথিবীতে আর কুত্রাপি নাই। এই উচ্চস্থান হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীনন্দগ্রাম, যখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐ সেই নন্দ বাবার বাড়ী, ঐ সেই নন্দনন্দনের বিচিত্র লীলাভূমি ইত্যাদি কথা মনে উঠিয়া হৃদয় আনন্দে নাচিতে থাকে। আর এই মন্দিরের উপরে উঠিলে স্মরণ করাইয়া দেয়—সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শশিশেখরের সেই অতুলনীয় অমৃতময় পদটী, যাহাতে প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের গলা জড়াইয়া তাঁহার সখা তাঁহাকে বলিতেছেন:—

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে, ঘন বিজুরী সঞ্চরে,
মেঘরুচি-বসন-পরিধানা।
যত যুবতী-মণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি,
কোই নহি রাইক সমানা॥
ভাই! বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সাগরী, সুজল ইহ নাগরী,
ধনিরে ধনি ধন্ত তুয়া ভাগি॥
দিবস অরু যামিনী, রাই অনুরাগিনী,
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি॥
প্রতিদিবস নূতনা, রাই মৃগীলোচনা,
অতএ তুহুঁ উহারি অনুরাগী॥

রতন অট্টালিকা, উপরে বসি রাধিকা,
হেরি হেরি অচল পদ পাণি।
রসিক-জন-মানসে, হরিগুণ-সুধারসে,
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

অবশ্য এতাদৃশ সুবিমল আনন্দ-উপভোগ পশুপ্রকৃতি এ নরাধমের ভাগ্যে ঘটে নাই, তবে এ সমস্ত অপার্থিব বস্তু দর্শন করিয়া ভক্ত-হৃদয় স্বতঃই আনন্দে নাচিয়া উঠে ইহা অনুমান করিয়াই লিখিতেছি। কিন্তু বর্ষাণ দেখিয়া সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, আমাদের মাঠ-ঘাটের ভাব একরূপ, আর এখানে মাঠঘাটের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ—দেখিলেই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়, আর তখন ভক্ত-হৃদয়ে লীলার উদ্দীপনা করিয়া দিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে।

শ্রীরাধারাণীর মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ অতি মনোরম স্থান। এখানে সকলে এই মন্দিরকে শ্রীজীর মন্দির বলেন, আবার কেহ কেহ প্রিয়াজীর মন্দির বলেন, কেহ কেহ বা লালীজীর মন্দির বলেন। আমরা যেমন ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েকে খোকা ও খুকী বলিয়া ডাকি, ইঁহারা সেইরূপ লালা ও লালী বলিয়া ডাকেন। এখানকার ব্রজবাসীরা শ্রীরাধারাণীকে কোটী-প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া জানেন এবং সকলেই তাঁহাকে নিজের ঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে করেন। এখানে সকলের মুখে কেবল শুনুন—রাধে রাধে; এবং কি আশ্চর্য্য, মুসলমানেরও মুখে শুনিলাম রাধে রাধে। আমাদের দেশে নমস্কার করিতে হইলে দণ্ডবৎ বা প্রণাম বা নমস্কার বলিয়া থাকে, কিন্তু এখানে বলে রাধে রাধে। কি সুন্দর নিয়ম, প্রত্যেক কার্য্যেই শ্রীভগবানের নাম। এখানে নিজে কিছু ভজন সাধন না করিলেও আপনাআপনিই ভজন হইয়া যায়—প্রথমতঃ শ্রীধামে বাসই ভজনের একটী প্রধান অঙ্গ, তদুপরি প্রতিনিয়তই শ্রীব্রজবাসি-দর্শন, শ্রীবৈষ্ণব-দর্শন, ভগবদ্দর্শন, নাম-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ, দণ্ডবৎ, পরিক্রমা, রসোদ্রেক, প্রসাদ-চরণামৃত গ্রহণ ইত্যাদি ভজনের অঙ্গ-সকল স্বতঃই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

শ্রীজী অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর মন্দির হইতে পাহাড়ের উপর দিয়া একটু গেলেই জয়পুর মহারাজার মন্দির। কি প্রকাণ্ড মন্দির, কি সুন্দর! এরূপ মন্দির দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তৎপরে পাহাড়ের উপর এক মাইল নামিয়া গেলেই গহ্বর বন। এখানে অনেক বৈষ্ণব সাধুর বাস। এইখানে আরও উচ্চ পাহাড়ের উপর ময়ূরকুঠী সে স্থানে উঠিতে একটু বেগ পাইতে হয়। তথায় শ্রীকৃষ্ণকে ঘেরিয়া ময়ূরগণ নৃত্য করিয়াছিল বলিয়া তাহার ময়ূরকুঠী নাম হইয়াছে। এই পরম নির্জ্জন স্থানেও একজন বৈষ্ণব সাধু রহিয়াছেন দেখিলাম। এরূপ জন-মানবশূন্য স্থানে আমাদের ন্যায় কাহাকেও একরাত্রি থাকিতে হইলে বোধ হয় আতঙ্কেই মরিয়া যাইতে হয়; আর কৃষ্ণগতপ্রাণ সাধুগণ তথায় কি নির্ভীকভাবেই বাস করিতেছেন—যাঁহারা শমনদমন শ্রীভগবান্‌কে অনুক্ষণ হৃদয়ে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথা হইতে আসিবে? সেখান হইতে নীচে নামিয়া চিক্‌শালী গ্রাম দিয়া আবার বর্ষাণে আসিলাম। এই চিক্‌শালী গ্রাম চিত্রা-সখীর জন্ম স্থান। চিত্রা সখী হইতেছেন অষ্ট সখীর মধ্যে একজন।

বর্ষাণ সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীভানুকুণ্ড। ইহা শ্রীবৃষভানু বাবার পুষ্করিণী। এখানে পুকুরকে কুণ্ড বলে। ভানুকুণ্ডের আর একটী নাম ভানুখোর। এখানকার ব্রজবাসীরা ভানুখোরই বলিয়া থাকেন। এই ভানুকুণ্ডের তীরে কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব থাকেন, বর্ষাণের ভিতরেও কয়েক-মূর্ত্তি থাকেন—তাঁহারা সকলেই ভজনানন্দী—সকলেই মাধুকুরী করিয়া জীবনধারণ করেন। একমূর্ত্তি বৈষ্ণবের সহিত দুই তিন দিন বিভিন্ন দিকে বর্ষাণে মধ্যে মাধুকুরী করা দর্শন করিলাম—শ্রীবৈষ্ণবগণ যে কি কষ্ট করিয়া মাধু-কুরী করেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়, তথাচ তাঁহাদের কোনও কষ্টবোধ নাই। সকলেই প্রায় রাত্রেই মাধুকুরী করেন। অন্ধকার রাত্রে দুর্গম পল্লীর মধ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মাধুকুরী করা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা না দেখিলে বুঝান যায় না। কিন্তু যাঁহার ব্রজে বাস তাঁহার পক্ষে ইহা এরূপ অমূল্য ধন—এরূপ প্রিয় বস্তু যে, তাঁহারা কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করেন না—এখানে যেমন দুরন্ত গ্রীষ্ম, তেমনই দুরন্ত শীত, কিন্তু সে দিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই, তাঁহারা সে কষ্ট অবাধেই সহ্য করিতেছেন—

সকলেরই এক চরম লক্ষ্য ব্রজপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবে, জীবন ও জন্ম সার্থক করিবে। পরমানন্দময় শ্রীনন্দনন্দকে যাঁহারা ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় যে আনন্দময়, কষ্ট তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবে কি প্রকারে—তাঁহাদের কি কষ্টের অনুভূতি থাকিতে পারে? আমরা এখানে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ খাদ্য সামগ্রী দ্বারাও পরিতৃপ্ত হইতে পারি না, আর তাঁহারা ব্রজের সেই মোটা, শুকনা রুটী ব্যঞ্জনাদি কোনও প্রকার উপকরণ ব্যতিরেকে কেবল শুধু শুধু খাইয়াও কি আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন?

এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জিনিষ হইতেছে শ্রীব্রজবাসী ও শ্রীব্রজমায়ীগণের স্বর্গীয় হৃদয় ও অলৌকিক ব্যবহার। শ্রীঠাকুর মহাশয় যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

বৰে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।

তাহা এই ব্রজমায়ীগণের ভাব দেখিলে তাঁহার এই অসাধারণ প্রার্থনার সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি করা যায়। বস্তুতঃ পরম সৌভাগ্য, কোটী কোটী জন্মের সুকৃতির ফলে ব্রজে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। বৃষভানুপুর অর্থে বর্ষাণকে বুঝাইতেছে। এখানকার ব্রজমায়ীগণকে দেবী বলিলেও বোধ হয় তাঁহাদের অবমাননাই করা হয়—তাঁহারা দেবী অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহাদের সরল প্রকৃতি, নম্র ব্যবহার, মিষ্ট ভাষা ও হাস্য মুখ দেখিলে যে হৃদয়ে কি আনন্দ হয়, তাহা আর কি বলিব। ব্রজবাসিগণেরও এইরূপ মধুরভাবাপন্ন প্রকৃতিও এইরূপ হাস্যবদন—তাঁহারা নিজের এতাদৃশ দরিদ্র অবস্থাতেও কেমন সন্তুষ্ট—হৃদয়ে কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, কোনওরূপ ভোগবিলাসের দিকে লক্ষ্য নাই—শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মই সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এরূপ অমায়িক লোক আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ এখানে প্রায় সকলেই ঐরূপ। এরূপ দরিদ্র অবস্থাতেও তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে মাধুকরী ভিক্ষা দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন—বরং অত্যন্ত আনন্দের সহিত, অত্যন্ত যত্নের সহিত দিতেছেন এবং কতবার উঠিয়া উঠিয়া দিতে হইতেছে তাহাতেও বিরক্তি বোধ নাই। ইঁহাদের শ্রীচরণ-দর্শন ভাগ্যের কথা বটে। আহীরী গোপগণকেও দর্শন করিলাম—তাঁহারা আরও দরিদ্র এবং যেরূপ কষ্টে বাস করেন, তাহা আমাদের দেশে কল্পনাতীত; অথচ তাঁহারাও ঠিক ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ঐরূপ হাসিমুখেই সকলকে মাধুকরী দিতেছেন—কষ্টের অনুভব তাঁহাদের যেন আদৌ নাই।

এখানে শ্রীবৃষভানু বাবার মন্দিরও দর্শনীয়। একদিকে বৃষভানু বাবা ও অন্যদিকে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা, মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন—কি অপরূপ শোভা! এতদ্ভিন্ন আরও দুই চারিটী মন্দির আছেন।

এই ক্ষুদ্র স্থানেও দুইটী ভাল ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার কুয়ার জল বেশ ভাল, তবে অনেক নীচে। এখানে তরকারীপত্র তেমন কিছু পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই একরূপ চলে। এ স্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভাল। সহরের বাহিরে চতুর্দ্দিকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম—সেখানকার খোলা বাতাসে বেড়ান বড়ই তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সহর হইতে চতুর্দ্দিকে ৪।৫ মিনিট গেলেই খোলা ময়দান।

বর্ষাণ হইতে ১।০ মাইল উত্তরে প্রেম সরোবর। এই স্থানে শ্রীবৃষভানু বাবার পুষ্পবাটিকা বা পুষ্পোদ্যান বিদ্যমান ছিল। এখানে মথুরার লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠের শ্রীশ্রীগোপাল জীউর সুরম্য মন্দির শোভা পাইতেছে। তথা হইতে ১।০ মাইল উত্তরে শ্রীসঙ্কেত। এই সঙ্কেতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়। এখানে একটু উচ্চস্থানে শ্রীরাধারমণের মন্দির। নীচে শ্রীসঙ্কেতবিহারী বা বিহারীজীর মন্দির। বিহারীজী নিজ প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাসহ বিরাজ করিতেছেন। বড় দর্শনধারী মূর্ত্তি—দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। সেখান হইতে ২৷০ মাইল দূরে শ্রীনন্দগ্রাম; নন্দগ্রামের অপর নাম নন্দীশ্বর। এখানে উচ্চ পাহাড়ের উপর শ্রীনন্দবাবার মন্দির। অতি মনোরম স্থান। উপরে উঠিতে বরাবর বেশ ভাল সিঁড়ি আছে। শ্রীমন্দিরের মধ্যে দিব্য সিংহাসনে একদিকে শ্রীনন্দ বাবা, অপর দিকে মা যশোদা ও মধ্যে শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন; কি অপরূপ শোভা—সে শোভা দেখিলে আর চোখ ফিরান যায় না—ভক্তজন-মনোহর মূর্ত্তিতে যেন ভুবন আলো করিয়া দুই ভাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমন্দিরও অতি সুন্দর এবং তথা হইতে নীচে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যও অতি

সুন্দর। মন্দির হইতে নীচে নামিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে সামান্য একটু গেলেই শ্রীপাবন-সরোবর। এই পাবন-সরোবরের যে কীদৃশ মহিমা, তাহা কে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবে? শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

পাবনং পাবনং সাক্ষাদ্দুরিতানাং মহাসরঃ।

অর্থাৎ পাবন সরোবর নামে মহাসরোবরে স্নান করিলে, ইনি মানবগণের নিখিল পাপ দূরীভূত করিয়া থাকেন।

পরমারাধ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বলিয়াছেন :—

জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি পাবন-সরোবর।

যে পাবন সরোবরে শ্রীনন্দনন্দন সাক্ষাৎ জলকেলি করিয়াছেন, তাহা যে কি পদার্থ তাহা বর্ণনা করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পরম পাবন শ্রীচরণ-কৃপায় আমার ন্যায় হতভাগ্য পশুর ভাগ্যেও যে পাবন সরোবরে স্নান ঘটিয়াছে, তাহা শ্রীসরোবরেরই অপার করুণার নিদর্শনই জ্ঞাপন করিতেছে। ধন্য শ্রীপাবন-সরোবর! তোমার জয় হউক—এ অধম মহাপাপী তোমার পবিত্র জলে স্নান করিয়া আজ ধন্য হইল। পাবন-সরোবরের শোভাই বা কি মনোরম! সরোবরের চতুর্দ্দিকে পাথর দিয়া অতি উচ্চ করিয়া পরম সুন্দররূপে বাঁধান, মধ্যে মধ্যে পাথরের ঘাট। সরোবরের জল উপর হইতে অনেক নীচে। সরোবরের তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজনের কুটীর এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মন্দির বিদ্যমান। শ্রীনন্দগ্রামও পরম মনোরম স্থান। এখানেও কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আছেন। দুইটী বড় ধর্ম্মশালা আছে।

নন্দগ্রাম হইতে দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীযাবট গ্রাম। যাবটকে ব্রজবাসীরা যাব্ বলিয়া থাকেন। যাবট যাইতে মধ্যস্থানে শ্রীকদম্বখণ্ডী দর্শন হয়। তথায় শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীর বিরাজমান। তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্তই ময়দান—অনেক দূর পর্য্যন্ত জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, অথচ সেই দুর্দ্দান্ত নির্জ্জন স্থানে এক মূর্ত্তি অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা একাকী বাস করিতেছেন। ইঁহারা কি কখনও মনুষ্য হইতে পারেন—দেবতারাও ঈদৃশ বৈষ্ণবের পদধূলির যোগ্য নহেন।

যাবটে শ্রীরাধারাণীর শ্বশুরবাড়ী। এখানে একটু উচ্চস্থানে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির বিরাজ করিতেছে। শ্রীরাধারাণী শ্বশুরালয়েই স্বীয় প্রাণবল্লভসহ বিহার করিতেছেন, আর জটিলা কুটিলা ও আয়ান ঘোষ পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া নীরবে তাহা দর্শন করিতেছে। এই রাধাকান্তের মন্দিরের নিকটেই পাবন গঙ্গা, তাহাতে স্নান করিয়া ধন্য হইলাম। মন্দির হইতে নীচে নামিয়া অল্প একটু দূরে অন্য দিকে শ্রীকিশোরীবট—তথায় শ্রীকিশোরী কুণ্ড বিদ্যমান। কুণ্ডের তীরে কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব থাকেন। এই স্থান শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ লীলাস্থল...এখানে যুগল মিলন কি মধুর, কি আনন্দপ্রদ! শ্রীরাধিকার নামানুসারেই এই কুণ্ডের নাম কিশোরীকুণ্ড—ইহা তাঁহার নিজেরই কুণ্ড এবং ইহার তীরেই নিজ প্রাণনাথসহ ভুবন-বিমোহন লীলা। এই সমস্ত নিত্যলীলা ত প্রত্যহই সাক্ষাৎ হইতেছে, তবে তাহা মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভাগ্যেই দর্শন ঘটিয়া থাকে। এতাদৃশ সুকৃতিশালী মহৎ ব্যক্তি অতি বিরল ও দুর্ল্লভ হইলেও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দর্শন পাওয়াও ত বহুজন্মের পুণ্যফল। যাবটও অতি মনোরম স্থান, যদিও অতি ক্ষুদ্র একটী গ্রামমাত্র। যাবটের মহিমা কি বর্ণনাতীত নহে? পূজ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন—

যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়?

যিনি নিখিল বৈষ্ণবের মস্তকমণি, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, যিনি জন্মপরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ ধন্য করিয়াছেন, সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীযাবট সম্বন্ধে যে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতেই যাবটের মাহাত্ম্য স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছে।

বর্ষাণ হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে উঁচ্গ্রাম। ইহাও লীলাস্থান। গ্রামটী অল্প উচ্চ পাহাড়ের উপর। এখানে শ্রীদাউজীর মন্দির ও দোহনীকুণ্ড দর্শন করিয়া ধন্য হইতে হয়। শ্রীব্রজধামের ত সর্ব্বত্রই লীলাস্থল—সকল স্থানই মনোরম। শ্রীব্রজলীলার অপার মহিমা বর্ণন

করিতে কে সক্ষম হইবে? কোথায় কত লীলা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই—সর্ব্বত্রই প্রাণ জুড়ান স্থান।

ইহাই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় যে, শ্রীব্রজধাম যাইয়া অধিকাংশ লোকই শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু উপরোক্ত সুপ্রথিত লীলাস্থলগুলি দর্শন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য—দর্শন করিলে পরমানন্দ লাভ হইবে।

জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়, জয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয়, জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয়—যঁাহাদের পতিত পাবন শ্রীচরণ কৃপায় মাদৃশ অতি বড় অধম ঘৃণিত জীবের ভাগ্যেও শ্রীব্রজধাম দর্শন ঘটিয়া থাকে।

বসন্তে মধ্যাহ্ন লীলা

(শ্রীগোপীনাথ বসাক)

নন্দীশ্বরপুরে অঙ্গনে সখাগণে ঘন ঘন ফুকারত হোরি।
গিরিকন্দরে শ্যামসুন্দর শুনি শুনি মিলতহি সুন্দরি ছোড়ি॥
হোরিক রঙ্গে তরঙ্গিম তনু মন সখা সঞে নিকষই বনে।
তৈখনে রাজকুমারি লই যশোমতি সমাদরে ভেটই ভবনে॥
আবেশে আওল ঘর কীর্ত্তিদা কোলে লই মঙ্গল কাহিনী পুছাই
তৈখনে দাসীগণ সাঝ সিনান লাগি উবটন আনল সাজাই॥
সিনান সিঙ্গার করি মিলি সব সহচরি সাজল পূজন-সুছন্দে।
উলসিযুবতিকুল ঘর সঞে নিকষল ঢুড়ইতে আন পরবন্ধে॥
গোবর্দ্ধনগিরি কুণ্ডতীর গহনে মধু মাধব রতিবীরে।
জিতে মনমথরণে রচই সো মনোরথে সমরক-রঙ্গ-আবীরে॥
কুঙ্কুম পরাগ সুবাস ফুল নির্য্যাস ফাগু উড়াওত ভোরি।
ইঙ্গিতে বারি সেবইতে হেরি তৈখন গোপীনাদস ভেলচৌরি॥

জীবের মনুষ্যজন্ম—৬

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে অদ্বয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত-শক্তিমান শ্রীভগবানের তিনটি প্রধানা শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ না থাকিলেও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যপ্রভাবে তাঁহার শক্তিসমূহ তাঁহার স্বরূপে অভিন্ন ভাবে থাকিয়াও তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি একই বিগ্রহে স্বয়ং এবং অংশ বিলাসাদি অনন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য গোলোকাদি অনন্ত ধামে স্বরূপশক্তিরই মূর্ত্তি পিতামাতা প্রেয়সী প্রভৃতি পার্ষদগণের সহিত নিত্য অশেষ প্রকার লীলারস আস্বাদন করেন। তাঁহার আনন্দাংশের শক্তি হ্লাদিনীর সার প্রেম। পার্ষদগণের প্রেমরসই তাঁহার আস্বাদ্য—অধিকারি অনুসারে তাঁহাদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই চতুর্ব্বিধ রসেরই বিবিধ প্রেম-সেবা তিনি আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং পার্ষদগণও তত্তৎ রসে তাঁহার সেবা করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন।

শ্রীভগবানের অসংখ্য চিৎকণ জীবশক্তি উন্মুখ ও বহির্ম্মুখ ভেদে দ্বিবিধা। নিত্যোন্মুখ জীব তাঁহার স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে প্রেম ও সেবোপযোগী চিন্ময় দেহ পাইয়া তাঁহার পার্ষদগণের সহিত তাঁহার নিত্য সেবাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ জীবকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্যই তাঁহার বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তি দ্বারা জগৎসৃষ্ট্যাদি লীলার প্রয়োজন হয়। বহির্ম্মুখ জীবের ভগবৎবিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ মায়া তাঁহার চিৎকণস্বরূপ আবরণ করিয়া নিজেরই কার্য্য জড়দেহাদিতে তাহার অহন্তা ও মমতাবুদ্ধি ঘটাইয়া দেয়। মায়াবদ্ধ জীব তদবস্থায় জড় ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা অনিত্য জড় বিষয় ভোগ করিয়া অনন্ত সংসার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারই বিষয়ভোগ বাসনা ক্ষয় করাইয়া তাহাকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ নিজের অংশস্বরূপ দ্বারা মায়িক জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।

শ্রীগোলোকে স্বয়ং শ্রীভগবানের আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই মূল সঙ্কর্ষণের অংশ মহাবৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের মহাসঙ্কর্ষণ, এবং মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ সর্ব্বজীবের আশ্রয় মহাবিষ্ণু। গোলোকাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম পরব্যোমে অবস্থিত, পরব্যোমের বাহিরে সিদ্ধলোক, এবং সিদ্ধলোক কারণার্ণব দ্বারা বেষ্টিত। মায়ার স্থিতি কারণার্ণবের বাহিরে। মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। জড়া মায়া তাঁহা হইতে চিদাভাস পাইয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব-সমন্বিত স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়। মহাবিষ্ণুরই অংশ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ীরূপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় নাভিকমল হইতে শ্রীব্রহ্মাকে আবির্ভূত করেন, এবং ব্রহ্মাদ্বারাই তিনি অনন্ত ব্যষ্টি জীবদেহাদির বিশেষ সৃষ্টি কার্য্য সমাধান করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ ক্ষীরোদকশায়ীরূপে প্রতি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী হইয়া জগৎপালন করিয়া থাকেন এবং তাঁহা হইতেই শ্রীরুদ্র উৎপন্ন হইয়া জগতের সংহার করিয়া থাকেন।

বহির্ম্মুখ জীবমাত্রই মায়ানির্ম্মিত স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে তিনটি পৃথক্ দেহে আবদ্ধ। পঞ্চীকৃত পাঞ্চভৌতিক স্থূলইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন দেহ, অপঞ্চীকৃত-পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ জীবের ভোগসাধন দেহ, এবং কেবল অজ্ঞানাবরণই জীবের কারণ দেহ। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের অবয়ব সম্বন্ধে বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন :—

পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত-ভূতজাত সূক্ষ্মদেহ জীবের ভোগসাধন দেহ।

এই সূক্ষ্ম দেহ কারণ দেহের আবরণ এবং স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহের আবরণ। সূক্ষ্মদেহ অপঞ্চীকৃতভূতজাত বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। পঞ্চীকৃত ভূতজাত স্থূলদেহই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্থূলদেহের অবয়ব সমূহকেই আমরা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি, কিন্তু সেগুলি যথার্থ ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়-গোলোক মাত্র। সূক্ষ্মদেহস্থিত ইন্দ্রিয়-বর্গের সহিত সংযোগ থাকে বলিয়াই এই গোলোকগুলি দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ জীব কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল তিনটি দেহেই আত্মাভিমান করিলেও তাহার জাগ্রদবস্থায় স্থূল দেহের, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহের এবং সুষুপ্তিতে কারণদেহেরই অনুভূতি হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহের দ্বারা বিষয়-গ্রহণ করিয়াই জীব সূক্ষ্মদেহে ভোগ করিয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে মনঃকল্পিত সূক্ষ্মবিষয়ই ভোগ হয়, এবং কারণদেহে কোনও ভোগ নাই। বহির্মুখ জীব কর্ম্মফলের অধীন; প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই তদুপযোগী স্থূল দেহ লাভ করে, এবং একটি প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে সেই স্থূল দেহের পতন বা মৃত্যু হয়, ও অন্য প্রারব্ধ ভোগের জন্য সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ লইয়া জীব অন্য স্থূলদেহে জন্ম লাভ করে। জীবের স্থূল দেহই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকারযুক্ত, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও নষ্ট হয় না, সূক্ষ্মদেহস্থ মনেই জন্মজন্মান্তরের বাসনারাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মদেহ নষ্ট হইলেও বাসনা থাকিয়া যায়, কেবল মুক্তি লাভেই জীবের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ নষ্ট হইয়া স্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক চতুরশীতিলক্ষ প্রকার জীব দেহের মধ্যে মনুষ্যদেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেহ, কারণ মনুষ্যদেহই একমাত্র সাধকদেহ এবং তদ্ভিন্ন আর সকল দেহই ভোগ-দেহ মাত্র। মনুষ্যদেহই শ্রীভগবানের বিশিষ্ট সৃষ্টি, এই দেহেই তিনি বিবেক বা বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছেন, যদ্দ্বারা কেবল মনুষ্যদেহধারী জীবই আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ হইয়া থাকে। এই দেহেরই বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি দ্বারা কেবল বিষয়-ভোগের জন্য মায়াবদ্ধ জীব পুণ্য পাপাদি যে কোন কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম্মফলের অধীন হইয়া মৃত্যুর পর সেই সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য দেবতীর্য্যগাদি স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ বহির্মুখ জীবের ভোগের জন্য চতুরশীতি লক্ষ প্রকার দেহের মধ্যে মনুষ্য-দেহ সৃষ্টি করিয়াই আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ এই দেহই সর্ব্বথা ভজনানুকূল—এই দেহ দ্বারা ভজন সাধন করিলে তাঁহার জীব তাঁহাকে জানিতে পারিবে ও তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে। এই জন্যই তিনি শাস্ত্র গুরু ও অন্তর্যামীরূপে মনুষ্যদেহধারী জীবকেই স্বচরণোন্মুখ হইবার সহায়তা করিয়া থাকেন, এবং তাহাকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্যই তিনি স্বয়ং এবং অবতাররূপে পুনঃ পুনঃ এই মায়িক জগতে তাহার নিকট অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মায়াবদ্ধ জীব বহু সৌভাগ্যের ফলে মনুষ্যদেহ লাভ করিলেই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মপালন-পূর্ব্বক মায়ামুক্ত হইয়া শ্রীভগ-বচ্চরণ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই মনুষ্য অধিকারানুসারে আশ্রয় করিয়া থাকে। সকাম কর্ম্মের ফলে বিষয়ভোগ-বাসনাসঞ্চয়হেতু পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ লক্ষণ অনন্ত সংসার দুঃখ ভোগ হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধনে মায়ামুক্ত হইলেও শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধ ভগবদ্ভজনের নিমিত্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির বিনিয়োগই মনুষ্যজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, কারণ তাহাই জীবের চরমপুরুষার্থ সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণের সেবা প্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

দেবতাদুর্ল্লভ এই মনুষ্য দেহের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎরূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য লাভ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যদেহের বাগিন্দ্রিয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সহিত আলাপন ও তাঁহার সমক্ষে তাঁহার গুণগান করিবার সামর্থ্য লাভের উপযুক্ত এবং মনুষ্যেরই হস্তদ্বয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণসেবা-লাভে সামর্থ্য

লাভ করিতে পারে। জীবের চরমতম পরম পুরুষার্থ এই সামর্থ্য লাভ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিযাজনসাপেক্ষ।

মনুষ্যদেহের একাদশ ইন্দ্রিয়ই ভগবদ্ভজনের সম্পূর্ণ উপযোগী—মনুষ্যের মন শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ, মনুষ্যের চক্ষু শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদি দর্শন করিতে, মনুষ্যের কর্ণ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিতে, মনুষ্যের নাসিকা শ্রীভগবচ্চরণের তুলস্যাদির গন্ধ গ্রহণ করিতে, মনুষ্যের রসনা শ্রীভগবৎ-প্রসাদ সেবন করিতে, মনুষ্যের ত্বক্ শ্রীভগবৎপ্রসাদি-চন্দনাদিদ্বারা লিপ্ত হইতে, মনুষ্যের বাক্, শ্রীভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতে, মনুষ্যের হস্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদির সেবা করিতে এবং মনুষ্যের চরণ শ্রীভগবদ্ধামাদিতে গমনের জন্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। মনুষ্যের পায়ু ও উপস্থ এই দুইটি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ও পরম্পরা ক্রমে শ্রীভগবদ্ভজনের সহায়তা করিতে সমর্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহির্মুখ মনুষ্য সাধুকৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া ইহার একটিও করিতে পারে না, অধিকন্তু প্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগের জন্যই তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে নিযুক্ত করিয়া প্রাকৃত রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের সকলগুলিতেই আসক্ত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধনই করিয়া থাকে। শ্রীস্বামিপাদ তাই বলিয়াছেন—

কুরঙ্গো মাতঙ্গঃ পতঙ্গো ভৃঙ্গো মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

অর্থাৎ কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চ জাতীয় জীব এক একটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইয়াই যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু বহির্মুখ মনুষ্য তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়েই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সর্ব্বনাশ যে অবশ্য ভাবী তাহার আর কি কথা।

শ্রীমৎ প্রহ্লাদ এই হতভাগ্য মনুষ্যের দুরবস্থা নিজের উপর আরোপ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে শুনাইয়াছেন—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

ভাগ ৭।৯।৪০

হে অচ্যুত! একদিকে আমার অবিতৃপ্তা জিহ্বা আমাকে মধুরাদি রস ও গ্রাম্যবার্ত্তাদির প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে শিশ্ন কামিনীসম্ভোগার্থ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রকার কোন দিকে ত্বক্, কোন দিকে উদর; কোন দিকে কর্ণ, কোন দিকে নাসিকা কোন দিকে চঞ্চল নয়ন এবং কোন দিকে বা অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আমাকে সতত আকর্ষণ করিতেছে। অহো! বহুপত্নীবিশিষ্ট গৃহপতিকে যেমন তদীয় পত্নীগণ স্ব স্ব কক্ষাভিমুখে প্রত্যেকে আকর্ষণ করতঃ অবসন্ন করে, আমার ইন্দ্রিয়গণও আমাকে ঠিক সেই অবস্থাপন্ন করিয়াছে। এখন আমি তোমার অভয় চরণ স্মরণ করিবার অবকাশও পাই না।

শ্রীভগবান সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

গীতা ২।৬৭

অর্থাৎ যদি কাহারও মন অসংযত হইয়া স্বেচ্ছাচারী একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে, তাহা হইলে ঐ একটি ইন্দ্রিয়ই অনবহিত নাবিকের বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় সেই মনুষ্যের বুদ্ধিকে বিষয়-বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। সুতরাং ভগবদ্ভজনবিহীন হতভাগ্য বহির্মুখের মন বিষয়াবিষ্ট প্রতি ইন্দ্রিয়েরই অনুগমন করিয়া তাহাকে যে পশু হইতেও অধিক দুরবস্থাপন্ন করিবে তাহার আর কি কথা!

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গমন করিলে যেমন পশ্চিমদিক্‌স্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, সেইরূপ যাহার চিত্ত বিষয়াবিষ্ট, তাহার পক্ষে শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীভগবচ্চরণ ব্যতীত সকল দিকেই দুরবস্থার সীমা নাই।

বহির্মুখ মনুষ্য প্রারব্ধবলে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইলেও তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীভগবান্‌কে তাহাই শুনাইয়াছেন—

নির্জিত্য দিক্‌-চক্র মভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পূরুষ ঈশ নীয়তে॥

ভাগ ১০।৫১।৫১

হে ঈশ! দিগ্বিজয়ী পুরুষ মহারাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সমরাজন্যবর্গকর্তৃক বন্দিত ও যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিশ্চিন্ত হইলেও কুৎসিৎ কামচরিতার্থতার জন্য কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়াই জীবন যাপন করে। কামিনীগণ তাহাকে ক্রীড়ামৃগ অর্থাৎ পোষা বানরের মত ইচ্ছামত নাচাইয়া থাকে।

বহির্মুখ মনুষ্য ধনকুবের হইলেও অর্থ-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ অর্থই তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে। অর্থের জন্য সে সর্ব্বদা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছেন—

কোন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥

ভাগ ৭।৬।১০

অর্থাৎ বহির্মুখ মনুষ্য অর্থকেই নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং প্রাণপাত করিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। চোর অর্থের জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করে, ভৃত্য প্রাণ-বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জনে প্রস্তুত হয়—সৈনিক-ভৃত্য অর্থের জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়া থাকে, এবং বণিক অর্থোপার্জ্জনজন্য সমুদ্রযাত্রাদি করিয়া অনেক সময়েই প্রাণ হারাইয়া থাকে।

মনুষ্যের অর্থোপার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মাচরণ, কিন্তু বহির্মুখ মনুষ্য কেবল বিষয়-সুখ ভোগের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, এবং যাহারা অতিশয় দুর্ভাগ্যবান তাহারা কেবল অর্থের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করে, নিজের ভোগের জন্যও নহে। শ্রীকরভাজন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্॥

ভাগ ১১।৫।১২

অর্থাৎ মনুষ্যের ধনের একমাত্র উৎকৃষ্ট ফল ধর্ম্ম, মনুষ্যের ধনের প্রয়োজন কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য। ধর্ম্মাচরণদ্বারাই মনুষ্য অপরোক্ষজ্ঞানের সহিত পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং পরিণামে মোক্ষ কিম্বা শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া চিরকৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। অহো! চক্ষু থাকিতেও অন্ধপ্রায় বহির্মুখ মানবগণ নিজদেহের অনতিক্রমণীয় মৃত্যুর প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ ক্ষণভঙ্গুর দেহের সুখের জন্যই কেবল বৃথা অর্থব্যয় করিয়া থাকে।

মনুষ্য প্রারব্ধবলে মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যহেতু সাধুকৃপা লাভ করিলে তাহার একাদশ ইন্দ্রিয়ই শ্রীভগবচ্চরণভজনে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইতে পারে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ এতদ্বিষয়ে আদর্শ-শিরোমণি। শ্রীশুকদেব মহারাজ অম্বরীষের অসাধারণ সাম্রাজ্যের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ ইত্যাদি।

ভাগ ৯।৪।২০

অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ যেরূপে স্বীয় অমাত্যবর্গকে বিভিন্ন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ যেরূপে তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া পালন করিয়াছিল, তিনি সেই রূপেই তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গকে বিভিন্ন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গও অমাত্যবর্গের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া পালন করিয়াছিল।' তিনি প্রধান ইন্দ্রিয়

মনকে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের স্মরণেই নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, বাক্য ভগবদ্গুণাদি বর্ণনে, কর হরিমন্দির মার্জ্জনে, কর্ণ ভগবৎকথাশ্রবণে, চক্ষু ভগবদ্বিগ্রহ ও ধামাদি দর্শনে, ত্বক্ ভগবদ্ভক্তদেহালিঙ্গনা দিতে, নাসিকা ভগবচ্চরণার্পিত তুলসীর গন্ধগ্রহণে, রসনা ভগবৎপ্রসাদান্ন গ্রহণে, মস্তক ভগবৎ ও ভক্তচরণ বন্দনে, এবং কামনা কেবল শ্রীভগবচ্চরণসেবার জন্যই নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ও যাহাতে শ্রীভগবচ্চরণে অহৈতুকী রতিলাভ করিতে পারেন তাহাই তাঁহার ঐকান্তিকী বাসনা ছিল। দেবতাদুর্ল্লভ মনুষ্যদেহের ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহার নিকটেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

দেবদুর্ল্লভ নরদেহের এই সর্ব্বথা ভগবদ্ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয়বর্গ ভগবদ্ভজনবিহীন হইলে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দুর্ভাগ্য বহির্মুখ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহা শ্রীশৌনক ঋষি অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

বিলে বতোরুক্রম বিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ভাগ ২।৩।২০
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা॥ ২।৩।২১
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥২।৩।২২
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥ ২।৩।২৩

অর্থাৎ মনুষ্যের যে কর্ণদ্বয় হরিগুণগাথা শ্রবণ না করে তাহা গ্রাম্যবার্ত্তারূপ কালভুজঙ্গেরই আশ্রয় হইয়া থাকে, গ্রাম্যবার্ত্তাই ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার প্রাণসংহার করিয়া থাকে। যে দুষ্টা জিহ্বা হরিগুণগান করে না, সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র, বৃথা কলরব দ্বারা কাল-ভুজঙ্গকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে মস্তক মুকুন্দচরণে নত হয় না, সে মস্তক রাজমুকুটে শোভিত হইলেও কেবল তাহার ভারস্বরূপই হইয়া থাকে, তাহাই তাহাকে সংসারসিন্ধুগর্ভে অধিকতর নিমজ্জিত করিয়া দেয়। যে হস্তদ্বয় হরিপূজা করে না তাহা কাঞ্চনকঙ্কনভূষিত হইলেও শববাহুতুল্য, দেবপিত্রাদিগণ অশুচিজ্ঞানে তদ্দত্ত জলাদি গ্রহণ করেন না। যে নয়ন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না তাহা ময়ূরপিচ্ছতুল্য, তদ্দ্বারা মনুষ্য নিজের উদ্ধারপথ দেখিতে না পাইয়া সংসারকণ্টকক্ষেত্রেই পতিত হয়। যে পদদ্বয় ভগবদ্ধাম ও মন্দিরাদিতে গমন করে না, তাহা বৃক্ষমূলতুল্য, যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাহা কেবল কুঠারাঘাতেই ছিদ্যমান হইবে। যে ব্যক্তি নিজের মরণধর্ম্মশীল সর্ব্বাঙ্গে ভক্তপাদরেণু ধারণ না করে এবং যে বিষ্ণুপদলগ্ন তুলসীর সম্মানপূর্ব্বক গন্ধগ্রহণ না করে সে জীবদ্দশায়ও শবতুল্য, তাহাকে প্রেতশরীর-বিশিষ্টের ন্যায় দেখিয়া সাধুগণ ভীত হইয়া তাহার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

শ্রীশৌনকঋষি বহির্মুখ মনুষ্যের ভগবদ্ভজনবিমুখ ইন্দ্রিয়গ্রামকে মহানর্থকারী বলিয়া এইরূপে নিন্দা করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি এইরূপ হতভাগ্য ব্যক্তির প্রতি যথোপযুক্ত দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
ভাগ ২।৩।১৯

অর্থাৎ ভগবদ্ভজনবিহীন ইন্দ্রিয়বর্গ মনুষ্যকে পশু হইতেও অধম করিয়া দিয়া থাকে, তাহার সকল সদ্গুণ হরণ করিয়া তাহাকে এরূপ দোষের আকর করিয়া দেয় যে, পশুগণের মধ্যেও সে সকল দোষ একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই ঋষি বলিয়াছেন—যে দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তির কর্ণপথে শ্রীভগবানের পতিতপাবন নামটি পর্য্যন্ত কখন প্রবেশ করে নাই সে পশুগণের মধ্যে কুক্কুর, শূকর ও উষ্ট্রেরও স্তবের পাত্র। সে কুক্কুরের মত বান্তাশী—বমনভোজী, অর্থাৎ সাধুগণ যে বিষয় ঘৃণিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই তাহার অভিরুচি, এবং সে কুক্কুরের

মত্ত বৃথা কলহপর ও জ্ঞাতিদ্রোহী। কুকুরের এই তিনটি দোষ ছাড়া তাহার আরও শত শত দোষ থাকে, কিন্তু কুকুরের প্রসিদ্ধ গুণ সকলের মধ্যে তাহার একটিও থাকে না। সুতরাং সে কুকুরের স্তবের পাত্রই হইয়া থাকে। এইরূপে শূকর ও উষ্ট্রও তাহাকে স্তব করিয়া থাকে। এই সকল পশু মনে করে যে এই ব্যক্তি মনুষ্য হইয়াও একাধারে কুকুর, শূকর ও উষ্ট্র হইতেও অধমতম পশু।

শ্রীশৌনক ঋষি বলিয়াছেন যে, এইরূপ হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন ধারণই বৃথা। তিনি অতিশয় খেদের সহিতই বলিয়াছেন—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥

ভাগ ২।৩।১৮

অর্থাৎ জীবন ধারণ স্থাবর বৃক্ষও করিয়া থাকে, শ্বাসগ্রহণ অচেতন ভস্ত্রাও করিয়া থাকে, এবং আহার বিহার গ্রাম্যপশুও করিয়া থাকে। ভগবদ্ভজন-বিমুখ হতভাগ্য মনুষ্যের এতদ্ব্যতীত কোনও বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় না বলিয়া তাহার মনুষ্যজীবন ধারণ সর্ব্বথৈব বৃথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা হইতে,
রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকর্ত্তৃক লিখিত)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥

পূর্ব্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞান তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এইক্ষণ প্রেমকে রহস্যতত্ত্ব বলা হইল কেন? তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যেমন মহাভূতসকল ভৌতিক পদার্থে অপ্রবিষ্ট হইয়াও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ কিয়দংশে যেমন মৃত্তিকা ঘটাদিতে অনুপ্রবিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে ঘট হইতে পৃথক ভাবে বাহিরে অবস্থিত, তেমনই আমি প্রাকৃত লোকের অতীত শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামে নিত্য বিদ্যমান আছি বলিয়া প্রেমিক প্রণতভক্তগণের হৃদয়ে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্টের মতই প্রকাশ পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় মহাভূতসকল যেমন অংশভেদে ভৌতিকপদার্থে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, দার্ষ্টান্তিকস্থানীয় আমি কিন্তু প্রকাশভেদে প্রেমিক প্রণত ভক্তগণে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি। অর্থাৎ একপ্রকাশে শ্রীবৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে বিদ্যমান আছি ও অপর-প্রকাশে প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকি। এস্থানে মাত্র প্রবেশ ও অপ্রবেশ অংশই মহাভূতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত নহে। কারণ মহাভূতসকল আংশিক প্রবিষ্ট এবং আংশিক অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠ ও প্রেমিক ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীভগবানে অংশাংশী ভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলে এই প্রকারে সেই প্রেমিক ভক্তগণের ভগবংবশকারিণী প্রেমভক্তিই রহস্য নামে অভিহিত—ইহাই সূচিত হইল। এই অভিপ্রায়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে শ্রীব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা-
ভাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ॥
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি॥
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যিনি নিখিলগোলোকবাসীর জীবনস্বরূপ হইয়াও

মহাভাবাখ্যপ্রেমরস-বিভাবিতা হ্লাদিনীশক্তির অধীষ্ঠাত্রী-রূপা স্বকীয়া শ্রীলব্রজসুন্দরীগণের সহিত গোলোকেই নিত্যবাস করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। সাধুসকল প্রেমকজ্জলরঞ্জিতভক্তিরূপ-বিলোচনে যে অচিন্ত্যগুণ ও স্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরকে হৃদয়েও দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করিতেছি। এই দুইটীর মধ্যে প্রথম প্রমাণটীতে শ্রীগোবিন্দের গোলোকে নিত্যবিহার দেখান হইয়াছে, দ্বিতীয়টীতে প্রেমিকভক্তহৃদয়ে স্থিতির সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। অথবা সেই ভৌতিকপদার্থে মহাভূতসকল যেমন বাহিরে ও ভিতরে অবস্থিত তেমনই আমিও প্রেমিক ভক্তগণের অন্তরে মনোবৃত্তিতে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়-বৃত্তিতেও প্রকাশ পাইয়া থাকি। যে পরমানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ প্রেমের আবির্ভাব হইলে ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবদ্‌বিষয়ে অনন্যবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই প্রেমই আমার রহস্য। প্রেমের উদয় হইলে যে সর্ব্বথা অনন্যবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে তাহাই বলিয়াছেন।

দেশ করিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞার অনুক্রমেই উপদেশ করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ শ্রীধরস্বামিপাদ রহস্যপদের প্রেম বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং উপদেশের ক্রমানুসারে এইশ্লোকে প্রেমপরব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। তাহা না হইলে ব্যাখ্যায় ক্রমভঙ্গদোষ ঘটে—আরও বুঝিবার বিষয় শ্রীগোস্বামিপাদ দৃষ্টান্তপক্ষে "নতেষু" এইরূপ ছিন্নপদ রাখিয়াছেন দার্ষ্টান্তিক-পক্ষে নএর সহিত তেষু এই পদের অছিন্ন পদ রাখিয়া, অর্থাৎ "ন তেষু" প্রণতজনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি দার্ষ্টান্তিক পক্ষেও ছিন্নপদ করিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে জ্ঞানরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমিও মহাভূতগণের মত সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে একাংশপুরুষরূপে প্রবিষ্ট, সর্ব্বাংশে অপ্রবিষ্ট কারণ সসীমবিশ্বে অসীমআমার প্রবেশ সর্ব্বথা অসম্ভব। যেমন একটি চড়াই পাখীর বাসায় বৃহৎ শকুন পাখীর প্রবেশ হইতে পারে না, আমার সম্বন্ধেও তেমনই বুঝিতে হইবে। এইরূপ "নএর" সহিত "তেষু" পদটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যাখ্যা করিলে "জ্ঞান"রূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের এই শ্লোকে "জ্ঞান"রূপ অর্থে অভিপ্রায় নাই। যেহেতু "অহমেবাস-মেবাগ্রে" শ্লোকেই জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। যে পরমদুর্লভবস্তু দুষ্ট ও উদাসীনজনের দৃষ্টিনিবারণের জন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদন করা হয় তাহাকেই রহস্যতত্ত্ব বলে। যেমন মহামূল্য চিন্তামণি সম্পুটাদিদ্বারা আবরণ করিয়া রাখা হয়, তেমনি "প্রেম" বস্তুটীকেও সাধারণ দৃষ্টান্তদ্বারা আবরণ করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং"।

যে বস্তু অদেয় ও বিরলপ্রচার, সেই বস্তুকেই চোখের আড়ে রাখা হয়। অথচ যে বস্তু মহৎ সেই বস্তুই অদেয় ও বিরলপ্রচার হইয়া থাকে। এই প্রেমভক্তির মহত্ত্ব ও বিরলপ্রচারকতা "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্মনভক্তি-যোগম্"। শ্রীভগবান্ যতদিন পর্য্যন্ত প্রেমলাভের জন্য গাঢ় উৎকণ্ঠা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তগণকে মুক্তি দেন বটে কিন্তু প্রেমভক্তি দান করেন না।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥

ষষ্ঠস্কন্ধে পরীক্ষিতমহারাজ শ্রীশুকমুনিকে কহিলেন—হে মহামুনে! কোটী কোটী মুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, আবার কোটী কোটী সিদ্ধ মহাপুরুষের মধ্যে নিষ্কাম, প্রশান্তচিত্ত, নারায়ণ-সেবাপরায়ণ ভক্ত সুদুর্লভ। "ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী" তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—মুক্তি হইতেও প্রেম-ভক্তি গরীয়সী। ইত্যাদি বহুস্থানে প্রেমভক্তির মহত্ত্ব এবং দুর্লভত্ব বলা আছে। স্বয়ং শ্রীভগবান্ও পরমভক্ত অর্জ্জুন এবং উদ্ধবের নিকটে কণ্ঠোক্তিতে প্রেমভক্তির রহস্যত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।" "সর্ব্বগুহ্যতমংভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ"। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার সর্ব্ব গুহ্যতম মহাবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। "সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি" হে উদ্ধব! যদ্যপি প্রেমভক্তিতত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয় তথাপি তোমার নিকট আমি বর্ণন করিব। ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণও প্রেমভক্তিরহস্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মাও শ্রীনারদের নিকটে এই রহস্যতত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতং।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু॥
যথা হরৌ ভগবতিনৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয়॥

হে নারদ! এই ভাগবতাখ্যপুরাণ শ্রীভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন। তুমি ইহার বিস্তার কর, আর আমার নিকটে একটী সঙ্কল্প কর যে—জগৎকে এমতভাবে উপদেশ করিবে যে, যাহাতে মানবমাত্রের অখিলাধার, সর্ব্বাত্মা, ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হয়। এই সকল প্রমাণে প্রেমভক্তির রহস্যত্ব নিঃসন্দেহরূপেই প্রকাশ পাইয়াছেন। শ্রীপাদ স্বামিচরণও "রহস্য" শব্দের "ভক্তি" করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের দোষ

(৩)

[শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ]

যখন তিনি মোহযুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তখনও তাঁহাতে ঈশ্বরোচিত সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি বর্ত্তমান ছিল। তদ্দ্বারা মহামায়াবী ব্রহ্মার মায়াজাল ভেদ করিলেন।

এস্থলে মুগ্ধতা ও সর্ব্বজ্ঞতার সহাবস্থিতি প্রতিপন্ন হইল। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বহুধর্ম্ম যুগপৎ শ্রীভগবানে অবস্থান করে। তাঁহার অচিন্ত্যপ্রভাবে বিরুদ্ধধর্ম্ম-সকলের সহাবস্থিতি সম্ভব হয়। অনন্তশক্তির আশ্রয় হইলেও লীলাময় ভগবান্ যুগপৎ সকল শক্তি প্রকাশ করেন না, তাহাতেই লীলা-সৌষ্ঠব রক্ষিত হয়. লীলা-পরিপাটী রক্ষার্থে যখন যে শক্তি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তখনই সে শক্তি প্রকাশিত হয়। সে সময় অন্যশক্তির অনভিব্যক্তি দেখিয়া তাহার অভাব কল্পনা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অপূর্ণতা মনে করা অসঙ্গত।

শ্রীভগবানের যাবতীয় লীলা প্রেমপরতন্ত্ররূপেই ব্যক্ত হয়। যেহেতু,—

ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠর শ্রুতি।

"ভগবান্ ভক্তির বশ।" ভক্তচিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত লীলা।

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
পদ্মপুরাণ।

"আমি ভক্তবিনোদনের নিমিত্ত, বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকি।"

ভক্তি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিপাক বিশেষ। স্বরূপ শক্তির নিয়ন্ত্রণেই তাঁহার গুণ সকলের 'প্রকাশাপ্রকাশ সিদ্ধ হয়। এইহেতু কখনও তাঁহাতে কোন গুণ যদি ব্যক্ত না হয়, তবে তাহা দোষের বিষয় হইতে পারে না।

যদি অন্তশক্তি পরাহত হইয়া তাঁহার শক্তি ব্যক্ত না হইত, তবে তাহা দোষের বিষয় বলিয়া গণ্য হইত, যেমন কোন ব্যক্তি নাচিতেও জানেন গাহিতেও জানেন; তিনি কোন সভায় কেবল গানই করিলেন, স্বেচ্ছায় নৃত্য হইতে বিরত রহিলেন; ইহা দোষের বিষয় হয় না। কিন্তু সেই সভায় কোন নৃত্য বিশারদের উপস্থিতি নিবন্ধন নিজ নৃত্য-নৈপুণ্যের অভাব চিন্তা করিয়া লজ্জা পাইবার ভয়ে যদি বিরত থাকিতেন, তবে দোষের বিষয় হইত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন লীলার প্রাগুক্ত মুগ্ধতা লীলানুরোধে ব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া দোষের বিষয় হয় নাই। পরন্তু মুগ্ধ বালক-রূপে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে মহৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়া বিস্ময়রসাপ্লুত করিয়াছিলেন; অদ্যাপি ভক্তগণ সেই লীলা আস্বাদন করিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হয়েন।

তন্দ্রাখেদ পরিশ্রম—সখাগণের সহিত ক্রীড়া সময়ে শ্রীকৃষ্ণের তন্দ্রাখেদশ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। যাহার সম্বন্ধে বোধ থাকে যে, 'ইহার স্বভাব আমার মত' তাহার সহিত সখ্যভাব সম্ভব, বিরুদ্ধস্বভাব দুই জনের সখ্যভাব জন্মিতে পারে না। সখাগণের তন্দ্রাখেদ শ্রম-বোধ আছে, শ্রীকৃষ্ণের যদি তাহা না থাকে, তবে তাঁহারা তাঁহাকে আপনার মত ভাবিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে পারেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি প্রেম বশ। সখ্যপ্রেম প্রভাবে তাঁহার তন্দ্রাখেদ-শ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, তমোগুণের কার্য্য রূপে নহে। তাহাতে সখ্য-রস পুষ্ট হইয়াছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণকে পল্লব শয্যায় শোয়াইয়া, ব্যজনাদি সেবা করিয়া, সখাগণ যে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। সুতরাং ইহাও শ্রীভগবানের ভক্তবিনোদন-স্বভাবের কার্য্য বলিয়া ভগবত্তার হানিকর নহে।

ভ্রম ও লোলতা—বাৎসল্যরস পুষ্ট করিয়াছে। কৌমারলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তজনকে গৃহজন মনে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া কিয়দ্দূর অনুসরণ করিবার পর যখন অন্তজন বলিয়া বুঝিতেন তখন মুগ্ধ ভীত জনের মত তাড়াতাড়ি আসিয়া মায়ের কোলে ঝাপাইয়া পড়িতেন; তাহাতে মায়ের কত আনন্দ!

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়াপ্লুবন্তৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাং।
দত্বাস্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদং॥

শ্রীভা. ১০।৮।২৭

"শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মাতা নিজ নিজ সন্তানকে বাহুদ্বয় দ্বারা স্নেহসহকারে আলিঙ্গন করিয়া বাৎসল্যভরে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইতেন। বালকদ্বয় পঙ্ক ও অঙ্গরাগে পরম শোভিত হইয়াছিলেন। স্তন পান করিতে করিতে তাঁহারা মনোহর ঈষদ্ধাস্য করিতেন। তখন অল্প কয়টী দন্ত শোভিত (তখনও সমস্ত দন্তোদ্গম হয় নাই) মুখশোভা নিরীক্ষণ করিয়া জননী-যুগলের আনন্দের অবধি থাকিত না।"

শ্রীকৃষ্ণের লোলতা—চাঞ্চল্যও জননী ব্রজেশ্বরীর সুখের হেতু হইয়াছিল। ব্রজমহিলাগণ চাঞ্চল্যের কথা নিবেদন করিলে,—

ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ।

শ্রীভা, ১০।৮।২২

"শ্রীকৃষ্ণের চাঞ্চল্যের কথা বারংবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেও যশোদা কেবল হাস্যমুখী হইলেন, তাঁহাকে ভৎসনা করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না।"

শিশুপুত্রের চাঞ্চল্য মাতাপিতার সুখের কারণ হয়। বাৎসল্য রসের ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত বাৎসল্য প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণে ভ্রম ও লোলতা ব্যক্ত হইয়াছে। এতদুভয়ও তাঁহার ভক্তসুখদ স্বভাবসঞ্জাত এবং স্বরূপশক্তি প্রেমভক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া ভগবত্তার হানিকর নহে।

মদ—হর্ষকৃত চিত্তবিকার। আনন্দনিধি শ্রীকৃষ্ণে তাহা স্বভাবতঃ বর্ত্তমান আছে। লীলানুক্রমে পূর্ণ কৈশোরে তাহার আবির্ভাব অত্যধিক। বিশেষতঃ দিন-শেষে গৃহাগমন সময়ে প্রেয়সীগণের দর্শনে তাহা নিরতিশয় রূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রেয়সীগণ আনন্দ-চিন্ময় রস প্রতি-ভাবিতা—প্রেমের প্রতিমা—তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহাদের দর্শনে হর্ষজনিত চিত্ত বিকার উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে তাঁহার প্রেমাধীনতাই

ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-বিহ্বল হইয়া প্রেয়সীগণের দর্শনের নিমিত্ত নানাভঙ্গিতে ইতস্ততঃ নেত্রার্পণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাদের কান্ত ভাব উল্লসিত হইয়াছিল; তাহা হইতে মধুর রসের পুষ্টি।

মাৎসর্য্য—ইন্দ্রের উৎকর্ষ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব-সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসীকে রক্ষা করিয়া ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার পর তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইন্দ্র ভগবৎপরিকর ব্রজবাসিগণের প্রতি নির্ম্মম দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার শোচনীয় অধোগতির সম্ভাবনা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করা সত্ত্বেও কোন দণ্ড দান না করায়ও শ্রীকৃষ্ণের মহা ক্ষমাগুণ ব্যক্ত হইয়াছে। গর্ব্বরূপ চিত্তমালিন্য দূর করিয়া ইন্দ্রকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরতিশয় কারুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

হিংসা—পূতনাদির বধে শ্রীকৃষ্ণে হিংসাদোষ আছে বলিয়া সংশয় জন্মে। পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বকাসুর, অঘাসুর, কংসাদি যাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সংহার করিয়াছেন, তাহারা নিরতিশয় দুরাত্মা, লোকপীড়ক, হিংস্রপ্রকৃতি, সাধুদ্রোহী ছিল। এ সকলকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, নিজ ভক্তগণকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দোষ হইতে পারে না, পরন্তু জীবহিতৈষিতা ও ভক্তবাৎসল্য গুণের পরিচায়ক। আর পূতনাদির সদ্গতি বিধান করিয়া তাহাদের প্রতিও অশেষ কারুণ্য প্রকটন করিয়াছেন।

অসত্য—শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ভক্ষণ লীলায় যে অসত্যবাদিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অচিন্ত্য ভক্তবশ্যতা গুণ ব্যক্ত হইয়াছে। মৃত্তিকা ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি হয় বলিয়া, মা ব্রজেশ্বরী তাহা করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। জননীর অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়াছেন ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সত্যস্বরূপ, সত্যবাক্ হইয়াও বলিয়াছিলেন, "মা, আমি মাটী খাই নাই।" পরমার্থে তাঁহার বাক্য সত্য হইয়াছিল; তিনি মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন নাই, ভক্ষণ—বাহিরের বস্তু উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করান। যে মৃত্তিকাভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই মৃত্তিকার সহিত নিখিলবিশ্ব নিয়ত তাঁহার উদরে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলে ব্রজেশ্বরী তাঁহার মধ্যে নিখিল বিশ্ব দর্শন করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে মৃত্তিকা ভক্ষণের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সত্য।

তত্ত্ব দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলেও, কৌমার লীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ভয়েই মৃদ্ভক্ষণ অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতেই পরম লাভ। শ্রীভগবান্ আত্মারাম, আপ্তকাম, অনন্তশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তাঁহাকে না পাইলে জীবের চরম চরিতার্থতা সম্ভবপর নহে। অথচ জীবের তাঁহাকে কাছে পাইবার শক্তি নাই, তাঁহাকে নিজসমীপে আকর্ষণ করিয়া আনয়নও জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাঁহারও জীবের কাছে কোন প্রয়োজনে আসিবার আবশ্যকতা নাই, এই অবস্থায়ও জীবের তাঁহাকে পাইতে হইবে; পাইবে কিরূপে? যদি এমন কেহ সমর্থ থাকেন যে, যিনি শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া জীবের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন, তবে জীব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পাইতে পারে। এই লীলায় দেখাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্ববশীকারক হইলেও প্রেম পরবশ। যাহা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, প্রেমাধীনতা বশতঃ তাহাও করিয়া থাকেন। শ্রীযশোদার প্রেমাধীনতা বশতঃ সত্যস্বরূপ হইয়াও তাঁহার সন্তুষ্টির নিমিত্ত মিথ্যা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। ইহা হইতে জগৎকে তিনি দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব হইলেও প্রেম দ্বারা জীব তাঁহাকে পাইতে পারে। ভক্তবশ্যতাময়ী যাবতীয় লীলাদ্বারা তিনি এই মহতীশিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন।

জরাসন্ধ বধে ছলপূর্ব্বক যে মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বশ্যতা ব্যক্ত হইয়াছে।

আকাঙ্ক্ষা—দামবন্ধন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরীর স্তনপানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে

তাঁহার স্বতঃ তৃপ্ততার হানি হয় বলিয়া দোষ। এস্থলেও দোষ গুণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের আনন্দ দুই প্রকার—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ। স্বরূপশক্ত্যানন্দ প্রেমানন্দ। তিনি স্বরূপানন্দ হইতে প্রেমানন্দকে অধিক মনে করেন। যথা—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

শ্রীভা, ৯।৪।৬৪

শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠদেব দুর্ব্বাসাঋষিকে বলিয়াছেন "আমার ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার স্বরূপকেও চাই না।" তাঁহার স্বরূপ অখণ্ড অনন্ত-পরমানন্দ। যিনি সেই স্বরূপ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আনন্দী হইয়া থাকেন—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। (তৈত্তিরীয়শ্রুতি-ব্রহ্মানন্দবল্লী।) শ্রীভগবান যদি ভক্তহৃদয়স্থিত প্রেমানন্দাস্বাদনে বঞ্চিত হয়েন, তবে এমন আনন্দময় স্বরূপের প্রতিও তাঁহার অনাদর উপস্থিত হয়। প্রেমানন্দ কেবল ভক্তের হৃদয়েই আছে। ভক্তের কাছে তিনি সেই প্রেমানন্দেরই আকাঙ্ক্ষা করেন। স্তনদানে সন্তানের প্রতি জননীর অপরিসীম বাৎসল্য ব্যক্ত হয়। সেই বাৎসল্য প্রেম আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যশোদার স্তনপানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর, সন্তান আগ্রহ সহকারে স্তনপান করিলে জননীর আনন্দের সীমা থাকে না। ভক্ত-সুখ-সর্ব্বস্ব, শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরসবতী জননীকেও ইহা দ্বারা পরমানন্দ দান করিয়াছিলেন। অপিচ, তিনি ভক্তহৃদয়-স্থিত যে প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীরই পরিপাক-বিশেষ। ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার কৃপাশক্তি যোগে সেই পরিপাকবিশেষ সিদ্ধ হয় বলিয়া, যশোদার বাৎসল্য রসাস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার স্তনপানের আকাঙ্ক্ষা করায় শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃ সতৃপ্ততার হানি হয় নাই।

ক্রোধ—দামবন্ধন লীলায় ব্রজেশ্বরীর স্তনপানে বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্তনপানে গাঢ় আবেশ ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রেম-পারবশ্যেরই নিদর্শন। যে ভগবান্ ভক্তহৃদয়স্থিত প্রেমানন্দের আস্বাদন না পাইলে স্বরূপানন্দেও তৃপ্ত হয়েন না, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যশোদার বাৎসল্য প্রেম আস্বাদনে আবেশ থাকা বিচিত্র নহে। সুতরাং ক্রোধ শ্রীকৃষ্ণের দোষ নহে, ভক্ত-বশ্যতাগুণেরই দ্যোতক। অন্য কোন কোন স্থলেও যে শ্রীকৃষ্ণে ক্রোধাভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও তদীয় ভক্ত-বশ্যতা গুণের কার্য্যবিশেষ বুঝিতে হইবে।

আশঙ্কা অর্থাৎ বিতর্ক—ব্রহ্মমোহন লীলার প্রারম্ভে ব্রহ্মা গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিতর্ক করিয়াছিলেন "তাহারা কোথায়?" লীলামুগ্ধতানিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণে এই বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।" "মোহ দোষ" খণ্ডন প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হইয়াছে, এসম্বন্ধেও তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

বিশ্ববিভ্রম—শ্রীভগবানের সৃষ্টি লীলার ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি, তাহাতে মহাপ্রলয়ে বিলীনজীব ও জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহার সৃষ্টি লীলাই বিশ্ববিভ্রম বা জগদাবেশ। শ্রীধ্রুব মহাশয় বলিয়াছেন—

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি।

শ্রীভা, ৪।৯।৭

"হে ভগবন্! অনেক গুণশালিনী মায়াদ্বারা মহদাদি অশেষপদার্থ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে সে সকলে প্রবেশ পূর্ব্বক, কাষ্ঠের বিভিন্নতায় এক অগ্নি যেমন নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমন আপনি এক হইলেও বিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।"

অনাদিবহির্ম্মুখজীব, সৃষ্টিলীলাপ্রবাহে পতিত হইয়া সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবদুন্মুখতা লাভের অবসর প্রাপ্ত হয়। যদি সৃষ্টি লীলার অভিব্যক্তি না হইত, তাহা হইলে অনাদি বহির্ম্মুখ জীব, অনন্তকাল বহির্ম্মুখই থাকিয়া যাইত; তাহাদের অখণ্ড অনন্ত পরমানন্দবস্তু শ্রীভগবান্‌কে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। তাহাদের যথার্থ

সুখলেশ প্রাপ্তিরও কোন আশা ছিল না। সুতরাং যে বিশ্ববিভ্রম হইতে নিখিল জীবের প্রতি তাহার উদার কারুণ্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে তাঁহার দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? মোহবশে যে জগদাবেশ তাহা দোষের বিষয়। শ্রীভগবান্ স্বীয় চিচ্ছক্তিতে দেদীপ্যমান থাকিয়া, জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারুণ্য বশতঃ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপের কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না। সুতরাং বিশ্ববিভ্রম দোষ না হইয়া গুণেই পর্য্যবসিত হইল।

আর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি জীবদেহ পীড়নকে যে আত্মপীড়ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অসামান্য দয়ার পরিচয়। দয়ালু ব্যক্তি অন্যের দুঃখে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া, আপনাতেও সেই দুঃখ অনুভব করেন। এ স্থলেও শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে তদ্রূপ মনে করিতে হইবে। শ্রীভগবানের অনন্ত দয়ার কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না; সেই দয়াবশে এইরূপ বলা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত নহে।

অপিচ, তাঁহার সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির স্পর্শেই অন্য সকলের চৈতন্য। তিনি পূর্ণ, অখণ্ডজ্ঞান বলিয়া যতকিছু অনুভূতি, সকলেরই মুখ্য আশ্রয় তিনি, এই হেতু তিনি জীবদেহ পীড়নকে আত্মপীড়ন বলিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয়ত্ব ধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক্ দিয়া বিচার করিলেও বিশ্ব-বিভ্রম তাঁহার দোষ নহে, মহাগুণ।

বিষমত্ব—ভক্ত পক্ষপাতিত্ব তাঁহার বিষমত্বের নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণে সাম্য ও বৈষম্য যুগপৎ অবস্থান করে বলিয়া বিষমত্ব দোষাবহ নহে। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৩

"আমি সর্ব্বজীবের পক্ষে একরূপ; আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করি।"

তিনি পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন; সকলের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী ও কর্ম্মফল প্রদাতা। ইহাতে তাঁহার কোন ইতর বিশেষ নাই। সমস্ত জগতের তিনি একমাত্র আশ্রয়—তাঁহাতেই সমস্ত জগতের স্থিতি, নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া তিনিই অবস্থান করিতেছেন। ইহাতেও তাঁহার সর্ব্বত্র সাম্য প্রতিপন্ন হয়। তবে 'তাঁহাতে ভক্তগণ থাকেন, তিনি ভক্তগণে থাকেন'—এই কথা যে বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—ভক্তগণ যেমন তাঁহাতে আসক্ত তিনিও তেমন ভক্তগণে আসক্ত। অগ্নি হিম নিবারণ করে,—সকলেরই করে; তবে যে অগ্নিসেবা করে—অগ্নির নিকট অবস্থান করে, তাহারই শীত নিবৃত্ত হয়, যে দূরে থাকে তাহার হয় না। ইহাতে অগ্নির কোন দোষ নাই; যে সেবা করে না তাহারই দোষ। স্বাশ্রিত জনের আনুকূল্য করিবার স্বভাব শ্রীভগবানে আছে, যে তাঁহাকে আশ্রয় করে না, সে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ভক্ত পক্ষপাতিত্বকে শ্রীভগবানের দোষ বলা যায় না।

আর, জীববিশেষকে যদি তিনি ভক্ত হইবার অধিকার দিতেন, তবে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ অর্পণ করিবার অবসর ছিল। তিনি সকল জীবকেই ভক্ত হইবার অধিকার দিয়াছেন। পক্ষী—ভক্তি করিয়া ভক্ত গরুড়, জটায়ু। বানর—ভক্তি করিয়া ভক্তরাজ হনুমান। ভল্লুক—ভক্তি করিয়া ভক্ত জাম্বুবান্। সর্প—ভক্তি করিয়া ভক্ত বাসুকী। রাক্ষস—ভক্তি করিয়া ভক্ত বিভীষণ। অসুর—ভক্তি করিয়া ভক্ত প্রহলাদ, বলি। মানব—ভক্তি করিয়া ভক্ত অম্বরীষাদি। দেবতা—ভক্তি করিয়া ভক্ত বৃহস্পতি। এইরূপ দেখা যায়, সর্ব্বজীবকে তিনি ভক্ত হইবার অধিকার দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে বৈষম্য কোথায়? আবার ভক্তপদ দান করিবার সময় তিনি কাহারও পূর্ব্বকার্য্য বিচার করেন না; বৈষয়িক ব্যাপারে কাহাকে কোন পদ দান করিবার সময় নিয়োক্তা তাহার পূর্ব্বশিক্ষা, চরিত্রাদির অনুসন্ধান করেন, শ্রীভগবান্ সে সকল কিছুর অপেক্ষা করেন না, অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও ভক্তপদ প্রার্থনা করিলে, তাহাকে তাহা দান করেন। পুতনা তাহার সাক্ষী। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাঁহার বৈষম্য

দোষের সূচক নহে। পরন্তু, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাঁহাতে আছে বলিয়াই, জীব ভক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সঙ্কুল সংসার-সাগর পার হইয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়। এইরূপে ভক্তপক্ষপাতিত্বগুণ নিখিল জীবের পরম হিতকর। এইহেতু শ্রীভগবানের বিষমত্ব ও মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই মহাগুণ নিরতিশয়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পরাপেক্ষা—শ্রীভগবান্ ভক্ত ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। অসত্যদোষ বিচার প্রসঙ্গে এই অপেক্ষার হেতু নিরূপণ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ হইয়াও, প্রেমানন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের অপেক্ষা রাখেন। এই প্রেমানন্দ তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাতে অপূর্ণতা সূচক পরাপেক্ষা দোষের প্রসক্তি হয় না। যাহা কাহারও নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করিলে, সেই পরাপেক্ষা তাহার পক্ষে দোষের বিষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে যে আনন্দ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার কৃপাযোগে, ভক্তহৃদয়ে প্রেমানন্দরূপে পরিণত হয়, এই হেতু, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাপেক্ষা দোষ বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহাতে ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি ষোলটী দোষ আছে বলিয়া যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপে সকলই অনন্ত কল্যাণ গুণরত্নাকর তাঁহার মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। এই সকল গুণ দ্বারা তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন। কেবল তাহা নহে, আত্মারাম মুনিগণ তাঁহার এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম সমাধিতে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজন করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

শ্রীভা, ১।৭।১০

"আত্মারাম মুনিগণের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাকৃত দেহাত্মভিমান) না থাকিলেও, তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্তপুরুষগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন।"

তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥

"সতত হরিভক্ত প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহদাখ্যান অধ্যয়ন করেন।"

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুতনামোক্ষণাদি-সূচক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রহ্মসমাধি ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত দোষ গুণ বিচারের সমর্থ হইবার স্পর্দ্ধা কাহারও আছে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহাদি যদি দোষ বলিয়া বুঝিতেন, তবে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে বিহ্বল হইতেন না। আর, বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায়ও তাহা কীর্ত্তন করিতেন না।

অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণে মোহাদির স্থিতি লবণাকর ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। লবণাকরে যাহা পতিত হয়, তাহাই লবণাক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মোহাদি অন্যত্র দোষরূপে খ্যাত হইলেও, গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে সে সকল মহাগুণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সম্বন্ধে তিনি মোহাদি অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তের জয় এবং স্বীয় পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার এই জয়ে আমরা উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবকগণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

করুণা নিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চালিতাবাগান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরে মহা-সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামে ৪টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীপ্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীপ্রভুসন্তান ও শ্রীআচার্য্যসন্তানগণই সম্পাদন করিয়াছেন। অনেক উপাধিধারী সুব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতীও ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় যদ্যপি অত্যন্তই অসুস্থ তথাপি উল্লাসের আবেগে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিলেন। দশাহকালব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সুবক্তা প্রভুপাদগণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ভক্তিজীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এতদিনের পর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ যে সম্প্রদায়ের "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের এই উক্তিটী জীবনীশক্তি, সেই সম্প্রদায়ের মূল প্রচার ও আচার কার্য্যের আশ্রয় স্থানীয় সেই শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা, পূজাদি বিনা যেন প্রাণশক্তিহীন দেহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের মত বলিয়াই মনে হইত; বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত, ভক্তিপ্রাণ ধনীযুবকের বিশেষ উদ্যোগেই এই উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামধন্য শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধিবাস ও অহোরাত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বরাহ নগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব চলিতেছে। আশা করি এইরূপ মাঝে মাঝে শ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান চলিলে ভক্তিজীবন ভারতবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ৫২ নং সারফেন্টাইন লেনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পাঠ শেষ করিয়া পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি. আর দাশ সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস মাসব্যাপী শ্রীভাগবত কথা বলিবার জন্য তথায় যাইতে-ছেন। পুনরায় তথা হইতে ফিরিয়া সারফেন্টাইন্ লেনে উক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর বাটীতেই দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভাগবত কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ৩নং চুনাপুকুর লেনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রাতে শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে ২ স্থানে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দোষের সূচক নহে। পরন্তু, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাঁহাতে আছে বলিয়াই, জীব ভক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সঙ্কুল সংসার-সাগর পার হইয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়। এইরূপে ভক্তপক্ষপাতিত্বগুণ নিখিল জীবের পরম হিতকর। এইহেতু শ্রীভগবানের বিষমত্ব ও মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই মহাগুণ নিরতিশয়-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পরাপেক্ষা—শ্রীভগবান্ ভক্ত ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। অসত্যদোষ বিচার প্রসঙ্গে এই অপেক্ষার হেতু নিরূপণ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ হইয়াও, প্রেমানন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের অপেক্ষা রাখেন। এই প্রেমানন্দ তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাতে অপূর্ণতা সূচক পরাপেক্ষা দোষের প্রসক্তি হয় না। যাহা কাহারও নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করিলে, সেই পরাপেক্ষা তাহার পক্ষে দোষের বিষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে যে আনন্দ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার কৃপাযোগে, ভক্তহৃদয়ে প্রেমানন্দরূপে পরিণত হয়, এই হেতু, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণের পরা-পেক্ষা দোষ বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহাতে ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি ষোলটী দোষ আছে বলিয়া যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপে সকলই অনন্ত কল্যাণ গুণ-রত্নাকর তাঁহার মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। এই সকল গুণ দ্বারা তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন। কেবল তাহা নহে, আত্মারাম মুনিগণ তাঁহার এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম সমাধিতে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজন করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥
শ্রীভা, ১।৭।১০

"আত্মারাম মুনিগণের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাকৃত দেহাভিমান) না থাকিলেও, তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্তপুরুষগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন।"

তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ॥

"সতত হরিভক্ত প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহদাখ্যান অধ্যয়ন করেন।"

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুতনামোক্ষণাদি-সূচক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত দোষ গুণ বিচারের সমর্থ হইবার স্পর্দ্ধা কাহারও আছে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহাদি যদি দোষ বলিয়া বুঝিতেন, তবে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে বিহ্বল হইতেন না। আর, বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীপরীক্ষিৎ মহা-রাজের সভায়ও তাহা কীর্ত্তন করিতেন না।

অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণে মোহাদির স্থিতি লবণাকর ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। লবণাকরে যাহা পতিত হয়, তাহাই লবণাক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মোহাদি অন্যত্র দোষরূপে খ্যাত হইলেও, গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে সে সকল মহাগুণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সম্বন্ধে তিনি মোহাদি অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তের জয় এবং স্বীয় পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার এই জয়ে আমরা উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবক-গণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

করুণা নিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতিনঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চালিতাবাগান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরে মহা-সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামে ৪টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীপ্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীপ্রভুসন্তান ও শ্রীআচার্য্যসন্তানগণই সম্পাদন করিয়াছেন। অনেক উপাধিধারী সুব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতীও ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় যদ্যপি অত্যন্তই অসুস্থ তথাপি উল্লাসের আবেগে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিলেন। দশাহকালব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সুবক্তা প্রভুপাদগণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ভক্তিজীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এতদিনের পর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ যে সম্প্রদায়ের "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের এই উক্তিটী জীবনীশক্তি, সেই সম্প্রদায়ের মূল প্রচার ও আচার কার্য্যের আশ্রয় স্থানীয় সেই শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা, পূজাদি বিনা যেন প্রাণশক্তিহীন দেহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের মত বলিয়াই মনে হইত; বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত, ভক্তিপ্রাণ ধনীযুবকের বিশেষ উদ্যোগেই এই উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামধন্য শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধিবাস ও অহো-রাত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বরাহ নগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব চলিতেছে। আশা করি এইরূপ মাঝে মাঝে শ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান চলিলে ভক্তিজীবন ভারতবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ৫২ নং সারফেন্টাইন লেনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পাঠ শেষ করিয়া পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস মাসব্যাপী শ্রীভাগবত কথা বলিবার জন্য তথায় যাইতে-ছেন। পুনবার তথা হইতে ফিরিয়া সারফেন্টাইন্ লেনে উক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর বাটীতেই দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভাগবত কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ৩নং চুনাপুকুর লেনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রাতে শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে ২ স্থানে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দোষের সূচক নহে। পরন্তু, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাহাতে আছে বলিয়াই, জীব ভক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সঙ্কুল সংসার-সাগর পার হইয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়। এইরূপে ভক্তপক্ষপাতিত্বগুণ নিখিল জীবের পরম হিতকর। এইহেতু শ্রীভগবানের বিষমত্ব ও মত্তাগুণে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই মহাগুণ নিরতিশয়-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পরাপেক্ষা—শ্রীভগবান্ ভক্ত ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। অসত্যদোষ বিচার প্রসঙ্গে এই অপেক্ষার হেতু নিরূপণ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ হইয়াও, প্রেমানন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের অপেক্ষা রাখেন। এই প্রেমানন্দ তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাতে অপূর্ণতা সূচক পরাপেক্ষা দোষের প্রসক্তি হয় না। যাহা কাহারও নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করিলে, সেই পরাপেক্ষা তাহার পক্ষে দোষের বিষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে যে আনন্দ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার কৃপাযোগে, ভক্তহৃদয়ে প্রেমানন্দরূপে পরিণত হয়, এই হেতু, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণের পরা-পেক্ষা দোষ বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহাতে ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি ষোলটী দোষ আছে বলিয়া যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপে সকলই অনন্ত কল্যাণ গুণ-রত্নাকর তাঁহার মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। এই সকল গুণ দ্বারা তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন। কেবল তাহা নহে, আত্মারাম মুনিগণ তাঁহার এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম সমাধিতে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজন করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

শ্রীভা, ১।৭।১০

"আত্মারাম মুনিগণের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাকৃত দেহাত্মভি-মান) না থাকিলেও, তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভি-সন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্তপুরুষগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন।"

তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ॥

"সতত হরিভক্ত প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহদাখ্যান অধ্যয়ন করেন।"

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুতনামোক্ষণাদি-সূচক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত দোষ গুণ বিচারের সমর্থ হইবার স্পর্দ্ধা কাহারও আছে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহাদি যদি দোষ বলিয়া বুঝিতেন, তবে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে বিহ্বল হইতেন না। আর, বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীপরীক্ষিৎ মহা-রাজের সভায়ও তাহা কীর্ত্তন করিতেন না

অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণে মোহাদির স্থিতি লবণাকর ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। লবণাকরে যাহা পতিত হয়, তাহাই লবণাক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মোহাদি অন্যত্র দোষরূপে খ্যাত হইলেও, গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে সে সকল মহাগুণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সম্বন্ধে তিনি মোহাদি অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তের জয় এবং স্বীয় পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার এই জয়ে আমরা উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবক-গণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

করুণা নিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতিনঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চালিতাবাগান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরে মহা-সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামে ৪টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীপ্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীপ্রভুসন্তান ও শ্রীআচার্য্যসন্তানগণই সম্পাদন করিয়াছেন। অনেক উপাধিধারী সুব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতীও ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় যদ্যপি অত্যন্তই অসুস্থ তথাপি উল্লাসের আবেগে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিলেন। দশাহকালব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সুবক্তা প্রভুপাদগণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ভক্তিজীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এতদিনের পর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ যে সম্প্রদায়ের "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের এই উক্তিটী জীবনীশক্তি, সেই সম্প্রদায়ের মূল প্রচার ও আচার কার্য্যের আশ্রয় স্থানীয় সেই শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা, পূজাদি বিনা যেন প্রাণশক্তিহীন দেহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের মত বলিয়াই মনে হইত; বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত, ভক্তিপ্রাণ ধনীযুবকের বিশেষ উদ্যোগেই এই উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুনামধন্য শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধিবাস ও অহো-রাত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বরাহ নগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব চলিতেছে। আশা করি এইরূপ মাঝে মাঝে শ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান চলিলে ভক্তিজীবন ভারতবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ৫২ নং সারপেন্‌টাইন লেনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পাঠ শেষ করিয়া পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি. আর দাশ সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস মাসব্যাপী শ্রীভাগবত কথা বলিবার জন্য তথায় যাইতে-ছেন। পুনরায় তথা হইতে ফিরিয়া সারপেন্‌টাইন্ লেনে উক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর বাটীতেই দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভাগবত কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ৩নং চুনাপুকুর লেনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রাতে শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে ২ স্থানে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দোষের সূচক নহে। পরন্তু, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাঁহাতে আছে বলিয়াই, জীব ভক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সঙ্কুল সংসার-সাগর পার হইয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়। এইরূপে ভক্তপক্ষপাতিত্বগুণ নিখিল জীবের পরম হিতকর। এইহেতু শ্রীভগবানের বিষমত্ব ও মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই মহাগুণ নিরাতশয়-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পরাপেক্ষা—শ্রীভগবান্ ভক্ত ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। অসত্যদোষ বিচার প্রসঙ্গে এই অপেক্ষার হেতু নিরূপণ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ হইয়াও, প্রেমানন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের অপেক্ষা রাখেন। এই প্রেমানন্দ তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাতে অপূর্ণতা সূচক পরাপেক্ষা দোষের প্রসক্তি হয় না। যাহা কাহারও নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করিলে, সেই পরাপেক্ষা তাহার পক্ষে দোষের বিষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে যে আনন্দ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার কৃপাযোগে, ভক্তহৃদয়ে প্রেমানন্দরূপে পরিণত হয়, এই হেতু, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাপেক্ষা দোষ বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহাতে ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি ষোলটী দোষ আছে বলিয়া যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপে সকলই অনন্ত কল্যাণ গুণ-রত্নাকর তাঁহার মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। এই সকল গুণ দ্বারা তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন। কেবল তাহা নহে, আত্মারাম মুনিগণ তাঁহার এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম সমাধিতে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজন করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥

শ্রীভা, ১।৭।১০

“আত্মারাম মুনিগণের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাকৃত দেহাভিমান) না থাকিলেও, তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্তপুরুষগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন।”

তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ॥

“সতত হরিভক্ত প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহদাখ্যান অধ্যয়ন করেন।”

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুতনামোক্ষণাদি-সূচক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত দোষ গুণ বিচারের সমর্থ হইবার স্পর্দ্ধা কাহারও আছে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহাদি যদি দোষ বলিয়া বুঝিতেন, তবে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে বিহ্বল হইতেন না। আর, বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায়ও তাহা কীর্ত্তন করিতেন না।

অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণে মোহাদির স্থিতি লবণাকর ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। লবণাকরে যাহা পতিত হয়, তাহাই লবণাক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মোহাদি অন্যত্র দোষরূপে খ্যাত হইলেও, গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে সে সকল মহাগুণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সম্বন্ধে তিনি মোহাদি অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তের জয় এবং স্বীয় পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার এই জয়ে আমরা উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবক-গণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

করুণা নিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতিনঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চালিতাবাগান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরে মহা-সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামে ৪টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীপ্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীপ্রভুসন্তান ও শ্রীআচার্য্যসন্তানগণই সম্পাদন করিয়াছেন। অনেক উপাধিধারী সুব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতীও ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধিকাকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় যদ্যপি অত্যন্তই অসুস্থ তথাপি উল্লাসের আবেগে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিলেন। দশাহকালব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সুবক্তা প্রভুপাদগণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ভক্তিজীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এতদিনের পর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ যে সম্প্রদায়ের "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের এই উক্তিটী জীবনীশক্তি, সেই সম্প্রদায়ের মূল প্রচার ও আচার কার্য্যের আশ্রয় স্থানীয় সেই শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা, পূজাদি বিনা যেন প্রাণশক্তিহীন দেহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের মত বলিয়াই মনে হইত; বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত, ভক্তিপ্রাণ ধনীযুবকের বিশেষ উদ্যোগেই এই উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামধন্য শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধিবাস ও অহো-রাত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বরাহ নগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব চলিতেছে। আশা করি এইরূপ মাঝে মাঝে শ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান চলিলে ভক্তিজীবন ভারতবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ৫২ নং সারপেন্টাইন লেনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পাঠ শেষ করিয়া পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস মাসব্যাপী শ্রীভাগবত কথা বলিবার জন্য তথায় যাইতে-ছেন। পুনরায় তথা হইতে ফিরিয়া সারপেন্টাইন্ লেনে উক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর বাটীতেই দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভাগবত কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ৩নং চুনাপুকুর লেনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রাতে শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে ২ স্থানে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দোষের সূচক নহে। পরন্তু, ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাঁহাতে আছে বলিয়াই, জীব ভক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সঙ্কুল সংসার-সাগর পার হইয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়। এইরূপে ভক্তপক্ষপাতিত্বগুণ নিখিল জীবের পরম হিতকর। এইহেতু শ্রীভগবানের বিষমত্ব ও মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই মহাগুণ নিরাতশয়-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

পরাপেক্ষা—শ্রীভগবান্ ভক্ত ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। অসত্যদোষ বিচার প্রসঙ্গে এই অপেক্ষার হেতু নিরূপণ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপানন্দে পূর্ণ হইয়াও, প্রেমানন্দাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের অপেক্ষা রাখেন। এই প্রেমানন্দ তাঁহার স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাতে অপূর্ণতা সূচক পরাপেক্ষা দোষের প্রসক্তি হয় না। যাহা কাহারও নাই, তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের অপেক্ষা করিলে, সেই পরাপেক্ষা তাহার পক্ষে দোষের বিষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে যে আনন্দ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার কৃপাযোগে, ভক্তহৃদয়ে প্রেমানন্দরূপে পরিণত হয়, এই হেতু, প্রেমানন্দের নিমিত্ত ভক্তাপেক্ষাকে শ্রীকৃষ্ণের পরা-পেক্ষা দোষ বলিয়া গণ্য করা যায় না; ইহাতে ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণে মোহাদি ষোলটী দোষ আছে বলিয়া যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এইরূপে সকলই অনন্ত কল্যাণ গুণ-রত্নাকর তাঁহার মহাগুণে পর্য্যবসিত হইল। এই সকল গুণ দ্বারা তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন। কেবল তাহা নহে, আত্মারাম মুনিগণ তাঁহার এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম সমাধিতে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজন করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
শ্রীভা, ১।৭।১০

"আত্মারাম মুনিগণের হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাকৃত দেহাত্মাভিমান) না থাকিলেও, তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্তপুরুষগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন।"

তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ॥

"সতত হরিভক্ত প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহদাখ্যান অধ্যয়ন করেন।"

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুতনামোক্ষণাদি-সূচক শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রহ্ম-সমাধি ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মত দোষ গুণ বিচারের সমর্থ হইবার স্পর্দ্ধা কাহারও আছে কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহাদি যদি দোষ বলিয়া বুঝিতেন, তবে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে বিহ্বল হইতেন না। আর, বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীপরীক্ষিৎ মহা-রাজের সভায়ও তাহা কীর্ত্তন করিতেন না।

অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণে মোহাদির স্থিতি লবণাকর ন্যায়ে বুঝিতে হইবে। লবণাকরে যাহা পতিত হয়, তাহাই লবণাক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মোহাদি অন্যত্র দোষরূপে খ্যাত হইলেও, গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে সে সকল মহাগুণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত সম্বন্ধে তিনি মোহাদি অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তের জয় এবং স্বীয় পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার এই জয়ে আমরা উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবক-গণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

করুণা নিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতিনঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে চালিতাবাগান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরে মহা-সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ নামে ৪টী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীপ্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীপ্রভুসন্তান ও শ্রীআচার্য্যসন্তানগণই সম্পাদন করিয়াছেন। অনেক উপাধিধারী সুব্যাখ্যাতা পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতীও ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গ..লকৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় যদ্যপি অত্যন্ত অসুস্থ তথাপি উল্লাসের আবেগে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চৈঃস্বরে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন হইয়াছিলেন। দশাহকালব্যাপী এই উৎসবের অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সুবক্তা প্রভুপাদগণ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ভক্তিজীবন ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত করিয়াছিলেন। এতদিনের পর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ যে সম্প্রদায়ের "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে" শ্রীপাদ রূপগোস্বামি চরণের এই উক্তিটী জীবনীশক্তি, সেই সম্প্রদায়ের মূল প্রচার ও আচার কার্য্যের আশ্রয় স্থানীয় সেই শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীবিগ্রহের সেবা, পূজাদি বিনা যেন প্রাণশক্তিহীন দেহের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের মত বলিয়াই মনে হইত; বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত, ভক্তিপ্রাণ ধনীযুবকের বিশেষ উদ্যোগেই এই উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বনামধন্য শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন-রসিক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধিবাস ও অহো-রাত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বরাহ নগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাঠ বাড়ীতে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব চলিতেছে। আশা করি এইরূপ মাঝে মাঝে শ্রীউৎসবের অনুষ্ঠান চলিলে ভক্তিজীবন ভারতবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ৫২ নং সারাফেন্‌টাইন লেনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পাঠ শেষ করিয়া পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ সাহেবের বিশেষ আগ্রহে ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস মাসব্যাপী শ্রীভাগবত কথা বলিবার জন্য তথায় যাইতে-ছেন। পুনরায় তথা হইতে ফিরিয়া সারফেন্‌টাইন্ লেনে উক্ত শ্রীযুক্ত সন্তোষবাবুর বাটীতেই দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভাগবত কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামি মহোদয় ৩নং চুনাপুকুর লেনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে প্রাতে শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্নে ভবানীপুরে ২ স্থানে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কথা, এমন কি প্রীত্যাস্পদ-দেহোত্থিত-সুখদুঃখভোক্তা নিজ আত্মার প্রতি পর্য্যন্ত তাহারা অপেক্ষাশূন্য। অথবা আমার সঙ্কল্পাত্মক মনটী যে ব্রজসুন্দরীগণে সর্ব্বদা অবস্থিত, অর্থাৎ তাহারা আমার সঙ্কল্পের মুখ্য বিষয়। অধিক কি তাহারাই আমার প্রাণ। তাহাদিগকে ছাড়িয়া মথুরায় আছি বটে, কিন্তু কোনও কার্য্যে আমার প্রোৎসাহ নাই। কেবল মাত্র সাধুগণকে পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং সাধুবিদ্বেষী অসুরগণকে বিনাশ করা আমার স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। তাই সুপ্তব্যক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার মত অনুসন্ধানে ও অনভিনিবেশে সকল ক্রিয়াই করিতেছি বটে, কিন্তু কোন ক্রিয়াতেই আমার সুখোল্লাস বা আবেশ নাই। ব্রজে ব্রজরামাদের সঙ্গে সাধারণ-ক্রিয়াতেও এমন কি একটী কুসুম চয়ন করিয়াও যে সুখ পাইতাম এবং তাহাদের পরিহাস-বচনে ও প্রণয়কোপোত্থিত ভর্ৎসনে আমার হৃদয় যে আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত, এস্থানে রাশি রাশি গৌরব-মাখা স্তুতিতেও আমি সে আনন্দের কোটী অংশের একাংশও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যদি বল—সেই ব্রজসুন্দরীগণেই তোমার পরিপূর্ণ মানস-সঙ্কল্প কেন? তাহারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ভাবময় বাক্যে বলিতেছেন "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ"। আমারই সুখের জন্য তাহারা দেহ, গেহ, ইহকাল, পরকাল, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্নান, ভোজন প্রভৃতি এবং মানস-সুখ, আত্মসুখ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় অনুরাগের আবেশের আবেগে আমাকেই ভজন করিতেছে। আমাকেই তাহারা প্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। কখনও বাহ্য-বিষয়-সমূহকে প্রিয় বলিয়া জানে না। এমন কি অন্তরঙ্গ-প্রিয় নিজ প্রাণকেও তাহারা প্রিয়তম বলিয়া জানে না। কেবল-মাত্র আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম প্রিয়তম বলিয়া জানে। যেহেতু আমার বিরহে তাহারা নিজের প্রাণধারণের প্রতি আদর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই প্রাণ হইতেও নিরুপাধি-প্রীত্যাস্পদ আত্মা বলিয়া আমাকেই জানে, কখনও দেহাভিমানী আত্মাকেও আত্মা বলিয়া জানে না। যেহেতু আমার বিরহে আত্মাকেও শূন্যের মত বলিয়া মনে করিতেছে। অর্থাৎ আমার বিয়োগ অবস্থায় তাহাদের আত্মাতে প্রীতিমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

"মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ" এই দ্বিতীয় চরণে দয়িত, প্রেষ্ঠ ও আত্মা এই তিনটী পদ উল্লেখ দ্বারা ইহাই জানাইলেন যে—তাহারা আমাকেই পতিরূপে নিশ্চয় করিয়াছে। হে উদ্ধব! জনশ্রুতিতে তুমি যাহা শুনিয়াছ যে—তাহাদের অন্য পতি আছে, সেইটী লোকাপবাদ মাত্র। আমিই তাহাদের পারমার্থিক পতি। তাহারাও নিজমুখে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ভ্রমরের নিকট বর্ণন করিবে।

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥

হে উদ্ধব! যে কোন জাতি, যে কোন বর্ণ, বা যে কোন আশ্রমেই থাকুক্ না কেন, যাহারা আমার সুখের জন্য ইহলোক, পরলোক, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাল, মন্দ সমস্তই ত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি, ইহাই আমার স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। সাধারণ ভক্তের পক্ষে যদি এই কথা হয়, তবে যে ব্রজসুন্দরীগণ আমারই সুখের জন্য নিজ নিজ দেহ, প্রাণ, আত্মাকেও উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত-দেবগণের সতত ধ্যেয় হইয়াও সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি—সে সকল কথা আর কি বলিব।"

এইজন্য আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মতঃ ॥

এই ভূতলে বৈধী ও অনুরাগী আমার বহুসংখ্যক ভক্ত আছে, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে উদ্ধব! যাহারা দিবানিশি আমারই বিরহজনিত মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত, তাহারা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিতেছে বলিয়া আমিও সর্ব্বদা মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত। যদি কাহারও বুকের ভিতরে বিস্ফোটক থাকে, তবে বিস্ফোটকের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত, কেবল তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলে যেমন তাহাকে সুখী করা যায় না; তেমনই সেই মর্ম্মপীড়িতা ব্রজরামাগণ আমার বুকের ভিতর অহর্নিশ বাস করিতেছেন। যতক্ষণ তাহাদের মর্ম্মপীড়ার উপশম করা না হইতেছে, ততক্ষণ কোন উপায়েই আমার সুখবিধান কেহই করিতে পারিবে না। অথবা তাহারা যে পতি প্রভৃতি লোক এবং ভোজনাদি দেহধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা

যাহা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সেই পরিত্যক্ত পত্যাদি-লোক, ভোজনাদি দেহধর্ম্ম এবং লজ্জাদি সাধ্বীধর্ম্ম প্রভৃতি পর্য্যন্ত আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহাতে সেগুলি রক্ষা হয় তজ্জন্য যত্নবান হই। যখন তাহাদের পরিত্যক্ত বিষয়গুলিই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি, তখন সাক্ষাৎ তাহাদিগকে যে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, তাহা আর কি বলিব ?

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্য-বিহ্বলাঃ ॥

হে উদ্ধব! তুমি মনে করিতে পার যে—তোমাতেই যাহাদের পরিপূর্ণ মানস-সঙ্কল্প এবং তুমিই যাহাদের প্রাণ ও তোমার জন্যই যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম পতি পিতা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত তোমাকে সর্ব্বদা লাভ করিয়াই আছে। অতএব তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—যতক্ষণ তাহারা অন্তর্ম্মনা হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু যখন তাহাদের বাহ্যানুসন্ধান হয়, তখন আমার বিরহে পরম ব্যাকুল হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহারা গোকুলের স্ত্রী, আমার দর্শনই তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র কারণ তাহাদের স্বভাব অনির্ব্বচনীয়। তাহারা আমার দর্শন-সময়ে নেত্রের যে নিমেষ পতিত হয়, তাহাও সহিতে না পারিয়া পক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে পর্য্যন্ত যোগ্য সৃজন জানে না ভাবিয়া "জড় তপোধন" বলিয়া কত অভিসম্পাত করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, তাহারা আমারই বুকের উপর মুখখানি রাখিয়াও অনুরাগের চরম কক্ষা প্রেমবৈচিত্ত্যভাবে বিরহোন্মত্তা হইয়া কত দৈন্য কত প্রলাপ করিয়া থাকে। সেই ব্রজসুন্দরীগণ এক্ষণে আমাকে চক্ষের নিকটে পাইতেছে না। এমন কি ব্রজের কোন স্থানেই আমি নাই, ব্রজ হইতে বহুদূরে মথুরায় আছি, "চিরদিবস ভেল হরি রহল মথুরা পুরী" এই স্মরণ করিয়া বিরহজনিত-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছে। আমি এ স্থান হইতেই তাহাদের সকল অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কেবল মূর্চ্ছিতা হইতেছে তাহাই নহে, তাহার সঙ্গে লালাস্রাব প্রভৃতি অপস্মার-নামক সঞ্চারিভাবেরও উদগম হইতেছে। অহো কষ্ট! আমার ভাবনা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না। আমার ভাবনা অতি অল্প সময় করে, বহুসময়ে মূর্চ্ছিতাবস্থায় কাটায়। এই জন্যই ব্রজরামাগণ দিবাভাগে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে যান, সেই নিকট প্রবাসরূপ-বিরহেও তাহারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই বলিয়াছে—

কুঞ্জগতিং গমিতা ন বিদামঃ,
কশ্মলেন কবরং বসনং বা।

১০।৩৫।১৭

"হে সখিগণ! প্রিয়তম চিরসুন্দর চিরমধুর শ্যামসুন্দরের অদর্শন আমাদিগকে জড়তা প্রাপ্তি করায়; যে দুঃখে আমরা কবর ও বসনের অনুসন্ধান লইতে পারি না।" সেই গোকুলরমণীগণের আমি কতদূর প্রিয়তম, তাহা আমি ভাষা-দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। দেহাভিমানী জীবের দেহই মমতাস্পদ সর্ব্ব প্রিয়-বস্তু হইতে অধিক প্রিয়, আবার দেহ হইতে আত্মা অধিক প্রিয়তর। সেই প্রিয়তর আত্মা যদি কাহারও বহুল হয়, সেই আত্মাগণের প্রিয়তম যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে আমি সেই গোকুলললনাগণের প্রিয়তম। সেই প্রিয়তম আমি এখন গোকুলললনাগণের নয়নসমীপে ত নাইই, ব্রজেও না, তাহাদের পক্ষে অতিদূরে মথুরায় আছি"। শ্রীকৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসভরে শ্রীউদ্ধবকে সম্বোধন করিতেছেন,—হে অঙ্গ! অর্থাৎ তুমি আমার অঙ্গতুল্য প্রিয়, তাই তোমার নিকটে গোপীপ্রেম-রহস্য বর্ণনা করিতেছি। পূর্ব্বে যখন আমি ব্রজে ছিলাম, তখন তাহারা কোন প্রকারে বাহিরের লোকের নিকটে উদ্দাম-ভাব সম্বরণ করিয়া থাকিত, কিন্তু এখন আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি ভাবিয়া লোক হইতে কোন সঙ্কোচ না থাকায় তাহাদের সেই উদ্দাম-ভাব সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সেইজন্য ব্রজে যাইতে আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে, কারণ আমার প্রতি গোপীগণের গুপ্তপ্রেম-রহস্য সকলেই জানিতে পারিয়াছে।

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥

হে উদ্ধব! সেই ব্রজললনাগণের প্রতি দশমী-দশারও (মৃতিদশা) আশঙ্কা হইতেছে। মনে হইতেছে যেন তা

তাহারা আর অধিক দিন বাঁচিবে না। বর্ত্তমানে অতি-আয়াসেই প্রাণধারণ করিতেছে। তাহাদের বিরহসন্তপ্ত-দেহে প্রাণ আর থাকিতে চায় না। অতিকষ্টে তাহারা প্রাণ ধরিয়া আছে। এরূপভাবে আর কতদিন প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ? যদি বল কোন্ আয়াসে তাহারা প্রাণ ধারণ করিতেছে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"কথঞ্চন" কোনও প্রকারে প্রাণধারণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই আয়াসটীর কথা অত্যন্ত লজ্জায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছেন না। কারণ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সত্যসঙ্কল্প, সত্যবচন ও সত্যপ্রতিজ্ঞরূপে জানেন। নিজে ব্রজ হইতে আসিবার সময় "আমি সত্বর আসিব" এইরূপ যে আশ্বাসবাণী ব্রজসুন্দরী গণের নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই "শ্রীউদ্ধব আমাকে কি মনে করিবে" এই ভাবিয়া লজ্জায় প্রথমতঃ সেই কথাটী বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলেন, অবশেষে অন্যগতি না দেখিয়া বলিলেন "প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ" হে উদ্ধব! আমি ব্রজ হইতে আসিবার সময়—আমার বিরহে ব্যাকুলা ও মূর্চ্ছিতা ব্রজসুন্দরীগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দৌত্যকর্ম্ম-সুনিপুণ মধুমঙ্গলের দ্বারা আমি যে সকল আশ্বাসবাণী দান করিয়াছিলাম, সেই সকল আশ্বাসবাণীকে আশ্রয় করিয়া এ দুরন্ত বিরহানলে মর-মর-অবস্থাতেও তাহারা "আমি আবার ব্রজে যাইয়া—তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় নানা বিচিত্র বিলাসরাশিতে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিব" এই আশাতেই জীবন-ধারণ করিতেছে। আসিবার সময় যে আশ্বাসবাণী তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তাহার প্রকারও তোমার নিকট বলিতেছি।—

যখন অক্রূর রথখানিকে প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া অপ্রচলিত পথে ব্রজললনাগণের দৃষ্টির অগোচরে চালিত করিয়াছিল, তখন তাহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িয়াছিল। আমিও তাহাদের অবস্থা-দর্শনে চোখের জল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, তখন আমার অঙ্গ হইতেও অনবরত ঘর্ম্মজল বিনির্গত হইতেছিল। সে সময় আমি যদি পুনরায় ব্রজে আসিব বলিয়া স্বীকারসূচক পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা না দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণ থাকিত না। যত্তপি সে সময় লিখিবার সাধন অন্য কিছুই ছিল না, তথাপি নয়নাশ্রুতে বিগলিত নেত্রকজ্জলের দ্বারা এবং ঘর্ম্মজলে সিক্তিত কুঙ্কুমরাগে আমি ব্রজাঙ্গনার নিকটে যেমন পত্র লিখিতেছিলাম, তাহারাও তেমনই নিজ হৃদ্বাষ্প-উদ্ধার করত পত্রী লিখিয়াছিল। প্রথমতঃ আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য—

> আয়াস্যাম্যাশু হত্বা তমধিমধুপুরং
> কংসমপ্যস্তি দূরম্,
> বৎসাঘা-ঘাতধাম্নঃ পুরমপি কিমদ-
> স্তৎপ্রিয়াঃ কুত্র দুঃখম্।
> কিন্ত্বন্যৎ প্রার্থিতং যদ্ভবদভিরুচিতং
> তদ্বিধত্তপ্রসত্ত্যা,
> প্রাণে প্রাণেশ্বরীভির্ম্ময়ি কিমপি পরং
> হন্ত! মন্তব্যমস্তঃ॥

হে প্রেয়সীগণ! মধুপুরের অধিপতি কংসকে বধ করিয়া আমি সত্বরই আসিব। বৎস-বক প্রভৃতি অসুরগণকে যে দেহের দ্বারা বিনাশ করিয়াছি, সেই দেহখানির স্বপমেধুপুরীও অনেক দূর নয়, এবং কংসকে বিনাশ করাও কষ্টসাধ্য নহে। অতএব এ বিষয়ে তোমাদের দুঃখ করিবার কি আছে? ইহা ভিন্ন তোমাদের অভিরুচিত-বিষয় যাহা থাকে, তাহা প্রসন্নচিত্তে আমার নিকটে প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের প্রাণ, তোমরা আমার প্রাণের ঈশ্বরী। অতএব তোমাদের মনের একান্ত অভিলষিত-বিষয় জানাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ করিবার কিছুই নাই। আমার এইরূপ পত্রী পাইয়া তাহারা যে উত্তর দিয়াছিল তাহাও শ্রবণ কর—

> গচ্ছন্নেষ ত্বমদ্য স্ফুরসি দয়িত! ভোঃ!
> কংসঘাতিং বিধায়,
> স্বীকর্ত্তুং রাজতাং তৎ কথমথভবতা-
> দাগতিস্তে ব্রজায়।
> তস্মাদস্মাভিরর্থ্যং তদিদমিহভবাং-
> স্তত্র নানা বিরাজ-
> ত্তীর্থে সর্ব্বার্থদে নঃ স্মৃতিমনুদদতা-
> মঞ্জলীনাং ত্রয়াণি॥

হে প্রিয়তম! অদ্য তুমি মথুরায় যাইয়া কংসকে বিনাশ করতঃ সেই দেশের রাজত্ব স্বীকার করিবে। তাহা হইলে তোমার পক্ষে গোচারণের মাঠ এই ব্রজে পুনর্ব্বার আগমণের সম্ভাবনা আমরা কিরূপে করিতে পারি? কেহ কি কখনও রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার গাভী চরাইতে ইচ্ছা করে? অতএব আমাদের এইটীই তোমার নিকটে একান্ত প্রার্থনা—"মথুরায় নানা তীর্থ আছে এবং প্রত্যেকটী তীর্থই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ; তোমাকে আমরা এতদিন-পর্য্যন্ত যে প্রীতি করিয়াছি, তাহার প্রতিদান-স্বরূপে সেই-সকল মহাতীর্থে আমাদের কথা স্মরণ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিও। আমি বিরহবিধুরা ব্রজললনাগণের এই প্রকার পত্রী পাঠ করতঃ যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহাও শ্রবণ কর;—

নালং মে রাজ্যলিপ্সা কথমপি বলতে
নির্ম্মমে তত্র সত্যং,
কংসং হত্বা যদূনাং সুখমভিবলয়-
ন্নস্মি চায়াতকল্পঃ।
বদ্ধঃ স্যাৎ কৃষ্ণসারঃ সপদি বিধিবশা-
ত্তর্হি কিং পার্থিবাদে-
র্ম্মানস্তস্মিন্ সুখায় প্রভবতি ন বনং
নাপি কান্তানুসঙ্গঃ॥

হে প্রিয়াগণ! আমার হৃদয়ে কখনও রাজ্যলিপ্সা নাই। আমি তোমাদের নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি—"কংসকে বিনাশ করিয়া যদুগণের সুখসম্পাদন করতঃ আমাকে পুনরায় ব্রজে আগতপ্রায় বলিয়াই জানিও"। যেমন যদি কোন একটী কৃষ্ণসার মৃগ দৈববশতঃ কোন রাজার হাতে বাঁধা পড়ে তাহা হইলে সেই রাজা প্রভৃতি তাহার যে আদর ও লালন-পালন করে, তাহা যেমন বন্ধন-প্রস্ত কৃষ্ণসারের (হরিণের) সুখের কারণ হয় না, এমন কি বন বা কান্তাসঙ্গও তাহার দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, আমার পক্ষেও সেইরূপ মথুরায় রাজা হওয়া ও রাজগণের আদর গৌরব পাওয়া এবং সেইস্থানের কান্তাসঙ্গও সুখহেতু হইতে পারে না। আমার এইরূপ পত্রীর প্রত্যুত্তরে তাহারা যাহা লিখিয়াছিল তাহাও শ্রবণ কর;—

বৃন্দং ক্রীড়াবনানাং বহুবিধ-মণ্ডিতো
হপ্যস্তি তত্রাথ রাজ্ঞাম্,
কন্যা বহ্ব্যোপি কান্তাস্তব বিভববশা-
দ্ভুদ্রবিষ্যন্তি ধন্যাঃ।
তত্তল্লাভে মনস্তে কথমিহ ভবিতা-
স্মাসু বা কিং তপোভি-
র্লব্ধে ভোগে বিচিত্রে পুনরপিতনুমা-
নীহতে বন্যবৃত্তীঃ॥

"হে প্রিয়তম! তুমি যে মথুরায় যাইতেছ, সেই মথুরাতেও বহুপ্রকারের বিহার ও উদ্যানরাশি আছে, এবং তথায় তুমি রাজপাটে বসিবে বলিয়া বহু বহু সৌভাগ্যবতী রাজকন্যাগণও মিলিত হইবে। সেই বিলাস-উদ্যান এবং রাজকন্যাগণকে পাইয়া কেমন করিয়া গ্রাম্যা আমাদিগের প্রতি তোমার সঙ্কল্প স্থির থাকিতে পারে? বহুতপস্যার ফলে বিচিত্র ভোগ উপস্থিত হইলে কোন্ দেহাভিমানী মানব বন্য-বৃত্তির কথা স্মরণ করে?" হে উদ্ধব। আমি তাহাদের এই প্রকার নিরাশ-উক্তিময় পত্রখানি পাইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম তাহাও অবধান কর।—

সত্যং তাঃ কেলিবন্যা বিদধতি লষিতং
সর্ব্বতঃ সত্যমেব,
ক্ষোণীপালাদিকন্যাঃ পরমগুণগণ
স্তোত্রভাজঃ স্ফুরন্তি।
সত্যং কুর্ব্বে ত্রিলোকী মম নহি রতিদা
নাপি তত্রস্থ রামা,
যদ্বদ্বৃন্দাবনং মে তদনুগতরমা
যদ্বদেতা ভবত্যঃ॥

হে প্রেয়সীগণ! মথুরায় সেই বিহারবনসমূহ অভীষ্ট বস্তু দান করে, ইহা প্রকৃত সত্য; সেখানে রমণীয়গুণসমূহ-দ্বারা প্রশংসনীয় নৃপনন্দিনীগণ বিরাজ করিতেছে, তাহাও মিথ্যা নহে; কিন্তু আমি তোমাদিগের নিকট সত্যে আবদ্ধ রহিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন যে প্রকার আমার চিত্তহরণ করে এবং সেই বৃন্দারণ্যনিবাসিনী চিরপ্রিয় ব্রজসুন্দরী তোমরা আমার যেরূপ প্রিয়া, মধুপুরী-বিপিনের ও রাজকন্যাগণের

কথা কি বলিতেছ? ত্রৈলোক্যের প্রীতিদায়ক সুরমণীয় কাননসমূহ এবং অনিন্দ্য-সুন্দরী-রমণীগণও আমার সেরূপ প্রীতিসম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

প্রিয় উদ্ধব! আমার পত্রীখানি পাইয়া আমার মথুরাগমনে তাহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিরহ জ্ঞাপন করিয়া যে সন্দেশ পাঠাইয়াছিল তাহা শ্রবণ কর।

সা তে সর্ব্বাঙ্গশোভা বত।
সমধিগতা যেন নেত্রেণ যেন
শ্রোত্রেণাশ্রাবি বংশী সমগমি-
বপুষা যেন চ স্পর্শলক্ষ্মীঃ।
তেনৈবালক্ষি দূরং গমনমবগতং
তেন সন্দিষ্টমুগ্রম্।
তেন স্বং বিপ্রলব্ধং বচিতমিতি হহা!
জীবিতং ধিগ্ বিধিং ধিক্॥

হে শ্রবণনয়নস্পর্শসুখবিধায়িন্! যে নয়ন দ্বারা তোমার চিরমধুর সর্বাঙ্গের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, তোমার বেণুগীতি-মাধুর্য্য যে শ্রবণ দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে, নিখিল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধায়িনী তোমার স্পর্শ-সুন্দরী আমাদিগের যে অঙ্গের আশা বৃদ্ধি করিয়াছে, হে প্রাণ-প্রিয় এখন আমরা সেই নয়ন-দ্বারা তোমার দূর গমন, শ্রবণ দ্বারা তোমার নিষ্ঠুর ব্রজত্যাগপ্রসঙ্গ এবং এই দেহের দ্বারাই তোমার সর্ববিজ্ঞপ্তি-সঙ্গসুখ-বিরহ অনুভব করিতেছি। হায় হায়! আমাদের জীবনে ধিক্ এই বিচ্ছেদবিধাতৃ বিধাতাকেও ধিক্।

আমি তাহাদিগের পত্রের উত্তরে আমার হৃদয়ের কথা যাহা তাহাদিগকে অশ্রুসিক্ত করে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম, তাহাও তোমাকে বলিতেছি।

যেয়ং দৃষ্টির্ম্ময়া বঃ স্থবিপরিকলনাৎ
কৃষ্যতে যা শ্রুতির্ব্বাগ্।
দূরস্থাব্রচ্যতে যা তনুরপি মিলনা-
দ্দব্যতে সব্যপেক্ষম্।
যদ্বেতাস্তত্র তত্র প্রতিকৃতি-
কৃতয়ে ন স্বধীনা মম স্যু-
স্তর্হ্যেতাঃ স্বৈরিণীর্ব্বা কথমহমহহ
প্রাণসখ্যঃ সহেয়॥

অয়ি প্রাণসখিবৃন্দ! তোমাদিগের শোভাদর্শন হইতে আমি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং যে কর্ণকে বাক্যের অগোচর করিতেছি, এবং যে দেহকে মিলন হইতে উৎ-কণ্ঠার সহিত দূরীকৃত করিতেছি, যদি এই ইন্দ্রিয়সকল তত্তৎ বিষয়ে প্রতিনিধি করিবার জন্য আমার অধীন না হয়, তবে হে প্রাণসখিগণ! কিরূপে আমি এইসকল দৃষ্টি-দিগকে স্বাধীন করিয়া সহ্য করিতে পারিব?

হে উদ্ধব! আমি আসিবার সময় তাহাদিগকে এই-প্রকার আশাবাণী দিয়াছিলাম। তাহাতেই এই দুরন্ত-বিরহেও তাহারা প্রাণধারণ করিতেছে। সেই শ্রীব্রজ-ললনাগণ আমারই বল্লবী। যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ গোপজাতি আমার তাহারাই নিত্য প্রেয়সী। তাহাদের যে অন্য পতি আছে, সেটী কেবল লোকাপবাদমাত্র। যেহেতু তাহারা আমারই স্বরূপশক্তির মধ্যে মুখ্যাহ্লাদিনীশক্তিরই অধি-ষ্ঠাত্রীরূপা। তাহাদের তনুখানি কর্পূরবাসিত-জলের মত মহাভাবাখ্য—প্রীতিরসে সুবাসিত। স্বরূপ ভিন্ন অন্যত্র স্বরূপশক্তির প্রবৃত্তি ঘটিতে পারে না। অঘটনঘটনপটীয়সী চিচ্ছক্তির পরিণতি—লীলার সহায়কারিণী—যোগমায়া আমারই ইচ্ছায় ইহাদিগকে পরবধূরূপে লোকসমাজে প্রতীতি মাত্র করাইয়াছে। নিত্যলীলাদৃষ্টিতে ও স্বরূপ-তত্ত্ববিচারে ইহাদের পরবধূত্ব কখনও ঘটিতে পারে না। অথচ পরকীয়া-ভাব ভিন্ন ইহাদের অনুরাগের পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয় না। যেমন ঘোড়দৌড়ের সময় কোন ঘোড়ার কতদূর বুকের বল, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার অজ্ঞাতভাবে পথে একখানি কাষ্ঠ ফেলিয়া দেওয়া হয়। যে ঘোড়ার গতি সেই কাষ্ঠে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেই ঘোড়ারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কুলবধূগণের পক্ষে অতি দুস্ত্যজ ধর্ম্মবাধা অতিক্রম করাতেই অনুরাগের পরাবধির প্রকাশ পাই-

য়াছে। যদি ইহারা পরবধূরূপে লোকে প্রতীত না হইত, তাহা হইলে অসঙ্কোচে মুখে যাহা আসে, তাহাই আমাকে বলিতে পারিত না; দানলীলা-প্রসঙ্গই তাহার প্রমাণ। যথা "কোন গুণে তোমার সনে পীরিতি করিব হে কানাই! তুমি রাখাল আমি রাজার ঝি, এ কথা শুনিলে লোকে বলিবে কি? রূপেতে ভ্রমর, গুণে ননী-চোর, ধনেতে ধবলী, বসতি গাছে। কেন ঘনায়ে ঘনায়ে আসিছ কাছে?" শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত দানলীলা গ্রন্থখানি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,—শ্রীব্রজসুন্দরীগণ পরিহাস রসে উদ্দাম উচ্ছাসময়ী ভাষাতে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদনে নিমজ্জিত করিতেছেন। প্রীতিজাতির একটী স্বভাব এই যে—প্রণয়িজনের সহিত অসঙ্কোচে কথা বলিতে না পারিলে হৃদয়ে একটী বেদনা থাকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই লঘুতোষণীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"পরদারতা চাস্যাং বাগনির্গলতা-প্রকটনায়" অর্থাৎ অনর্গল বাক্য বলিবার জন্যই ইহাদের পরদারতা প্রকাশ পাইয়াছে"। এস্থানে একটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল পিতামাতা ও কান্তাগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু জ্যেঠা খুড়া সখা ও দাসগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোনও উপদেশ করিলেন না কেন? তাহার উত্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণীতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথা,—যদ্যপি নিখিল ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবান্, তথাপি তাঁহাদের প্রীতির মধ্যে তিনটী বিভাগ আছে—উৎকণ্ঠাপ্রধান, বিশ্রম্ভপ্রধান ও বিবেকশূন্য। তন্মধ্যে কান্তা ও বৎসলগণের শ্রীকৃষ্ণে উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতি। সখাগণের বিশ্রম্ভপ্রধানা এবং ব্রজবাসী পশু বৃক্ষ প্রভৃতি সকলের বিবেকশূন্যা রতি। উৎকণ্ঠাপ্রধান-রতিমান্‌গণের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেও স্ফূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। আবার বিশ্রম্ভপ্রধানা রতির স্বভাবে সখাগণ তাঁহার স্ফূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন। যাঁহাদের বিবেকশূন্যা রতি তাঁহারা স্বানুভবানন্দে বিরহের অনুসন্ধান লইতে পারেন না। সেইজন্য উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতির আশ্রয় পিতামাতা ও কান্তাদিগকেই সান্ত্বনা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যেমন একটী গৃহস্থের বাটীতে অনেক লোক থাকিলেও দুর্ভিক্ষের সময় মূলকর্ত্তাকে ডাকিয়া প্রচুর ভোজ্য দান করিলে তাহার অন্ন জীবিগণকেও আহার্য্য দেওয়া হয়, তেমনই নিখিল বৎসলগণের মূল আশ্রয় ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী শ্রীনন্দ ও যশোদাকে সান্ত্বনা দিলেই বাৎসল্যের অনুজীবি খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি সকলকেই সান্ত্বনা দেওয়া হইবে। এজন্য পিতামাতা ব্যতীত খুড়া জেঠা প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ররূপে সান্ত্বনা দিবার আদেশ করিলেন না। সখাগণ স্ফূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎকার মনে করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলে তাঁহাদের আবেশের উপর আঘাত দেওয়া হইবে। অতএব শ্রীউদ্ধবের নিকটে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলেন না। যাঁহাদের বিবেকশূন্যা-রতি, তাঁহারা স্বানুভবানন্দে বিভোর আছেন। সুতরাং তাঁহাদের আবেশে আঘাত দেওয়া হইবে বলিয়া সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাদের কথা উদ্ধবকে কিছুই বলিলেন না।

হে উদ্ধব! মাতাপিতা ও ব্রজরামাগণকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আমি বহুবার অনেক সতর্কদূত পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার কথিত উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিচাতুর্য্য অবলম্বনে ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণের ভাববিরুদ্ধ হওয়ায় কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য এবং আমার সখা, সুতরাং তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বলিলাম, তুমি সেইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য ও ভাব রক্ষা করিয়া আমার বিরহসন্তপ্ত ব্রজজনদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে ব্রজে গমন কর।

প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ নিগূঢ় গম্ভীরতাময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ও চিরপ্রার্থিত ব্রজ ও ব্রজরাজ চরণদর্শনের নিমিত্ত গমন করিবার আদেশ পাইয়া স্বভাবসুন্দর অপার আনন্দে উৎসবময় শ্রীমান্ উদ্ধব সপ্রেম-গদগদকণ্ঠে যুক্তহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে চিরসুহৃদ! যদ্যপি বীণাদি বাদ্যযন্ত্র স্বয়ং কখনও রাগের সহিত গীতক্রমবিশিষ্ট এবং স্বয়ং তালাদি যুক্ত হয় না, তথাপি সুগায়কসংসর্গে বাদ্যযন্ত্র সেই সেই স্বরতালাদি গুণ অবলম্বন করিয়া মহাজনদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। সেইরূপ আমি নিজে গুণহীন হই-

সেও আপনার উপদেশবাণী অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া স্বভাবমধুর ব্রজবাসিগণের চরণে নিবেদন করিতে প্রয়াসী হইব। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুক্তহস্ত উদ্ধবের প্রতি ব্রজগমনের শক্তি প্রেরণা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দাদা শ্রীবলরামের নিকট মাতাপিতার সুখসম্পাদনের জন্য শ্রীমান্ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইতেছি এই কথা শ্রবণ করাইলেন। উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবলদেবকে অবনতমস্তকে ব্রজগমনের আদেশ প্রাপ্তির ইচ্ছায় প্রণাম করিলেন। দাদা শ্রীবলরামচন্দ্র কৃষ্ণ ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া মা শ্রীরোহিণী দেবীর চরণে উদ্ধবকে প্রণত করাইলেন। মা রোহিণী-দেবী উদ্ধবের ব্রজ গমনের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজের মাধুর্যাময় আস্বাদন স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় বিচলিত হইলেন ; এবং নিজ অশ্রুবিধৌত করযুগল-দ্বারা শ্রীমান উদ্ধবের মস্তক স্পর্শনপূর্ব্বক গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রজ গমনের নিমিত্ত আদেশ দান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে নিজবস্ত্রঅলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ব্রজে পাঠাইলেন।

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন। হে উদ্ধব! অগ্রজ বলদেবচন্দ্রের সহিত আমার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত অতিশয় দূরতর প্রদেশ অবন্তীনগর গমন বৃত্তান্ত যদি পরস্পরায় ব্রজে প্রচারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের একান্তসুখান্বেষী ব্রজবাসিবৃন্দ আমাদের দূরগমন-সংবাদে যদি অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কোন স্থানই দূর এবং নিকট হইতে পারে না এইরূপ নিজ সিদ্ধান্ত-অনুরূপ যুক্তি-দ্বারা তাঁহাদিগের মনের বেদনা অপসারিত করিও।

শিশুকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবানিরত উদ্ধব নিজপ্রভুর এইরূপ আজ্ঞা লাভ করিয়া নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ দাসের 'প্রভু সেবাই' মূল সম্পত্তি। সেই সেবার প্রকার অনেক আছে। তন্মধ্যে নিজ প্রভুর আদেশ পাইয়া তাঁহার সেবা করাই অধিকতর লাভ। তন্মধ্যেও শ্রীব্রজবাসিজনার সেবা করিবার সৌভাগ্য-লাভে নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক-ভক্তসেবার শ্রেষ্ঠতাই "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। নিজপ্রভুর এইরূপ আদর-মাখা আবেগভরা আদেশটী পাইয়া শ্রীউদ্ধবের আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। বহুদিবসের জন্য নিজপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া অতি আকুল পিপাসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে যদ্যপি সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তম্ভিত হইয়াছিল, তথাপি দাসের নিজপ্রভুর সেবাই মুখ্যকর্ত্তব্য-বিবেচনায় পুরের বাহির হইয়াছিলেন। যখন পুরীর বাহিরে আসিলেন, তখন একদিকে পুরীর শোভা ও অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অখণ্ড-মাধুর্য্যের ধাম শ্রীব্রজের শোভায় শ্রীউদ্ধবকে আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু উভয় আকর্ষণের মধ্যে বলপূর্ব্বক মাধুর্য্যধাম শ্রীব্রজের আকর্ষণই জয়লাভ করিয়াছিল। কারণ পূর্ব্বে সাধারণ-জনশ্রুতিতে শ্রীব্রজবাসিজনার শ্রীহরিতে পরিপূর্ণ রতির সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের দর্শন-লালসায় নিজে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীহরির মুখ হইতেও সেই সংবাদ পাইয়া ব্রজবাসিবৃন্দকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আরও অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। যদ্যপি ভক্তাগ্রণী উদ্ধবের পক্ষে বিশুদ্ধ প্রেমধান ব্রজে পদব্রজে গমনই ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষায় অনুকূল হইত, তথাপি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কোনই সংবাদ না পাইয়া বিরহে ও অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর পিতামাতাকে ও কান্তাগণকে সত্বর সংবাদ দিবার প্রয়োজনে স্বর্ণরথে আরোহন করিয়াই ব্রজে চলিলেন। যাইবার সময় স্বর্ণরথ ও মনোরথ উভয়ের মধ্যে মনোরথই গতিতে জয়লাভ করিয়াছিল, এই অভিপ্রায়েই মূলশ্লোকে "প্রযযৌ" ক্রিয়াটী প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রকৃষ্ট প্রকারে গমন করিয়াছিলেন। যাহার নিকটে গমন করা হয়, তাঁহারই বিষয়ে গাঢ়তর সংকল্প করিতে করিতে যাওয়াই "প্রকৃষ্ট যাওয়া"। আর সঙ্কল্পশূন্য-মানসে গমনই নিকৃষ্ট গমন। তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের মনে নানারূপ সঙ্কল্প হইতেছিল। উদ্ধব ভাবিতেছিলেন' যাঁহাদের নাম করিতে করিতে আমার প্রভু প্রেমে অধীর হইতেছিলেন, জানিনা,

তাঁহাদের প্রেমের জাতি কি? আর পরিমাণই বা কত? এই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবান্ যাদব ত বহুলই আছেন, কিন্তু কাহারও প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ত এরূপ অধীর হইতে দেখি নাই। অধিক কি শ্রীল বসুদেব-দেবকীর প্রতিও প্রভুর এপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায় না। সেই ব্রজজন কি আমাকে দেখিয়া আদরপূর্ব্বক চরণসমীপে বসাইবেন? এবং তাঁহারা কি অসঙ্কোচে নিজ নিজ প্রাণের ভাব ও মনের গোপন বেদনা আমার নিকট প্রকাশ করিবেন? আমি কি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ আপ্যায়িত করিতে পারিব? এই-প্রকার সঙ্কল্পের আবেশে উদ্ধব ব্রজের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতিমাত্র প্রচার ছিল! কিন্তু শ্রীব্রজে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রত্যেকটী বৃক্ষ শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদ্দর্শন করাইতে লাগিল। শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে তখন আনন্দ-উৎসবের আর অবধি ছিল না। মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এই সেই বৃন্দাবন এই সেই বৃক্ষসমূহ যাহার তলে আমারই প্রভু বসিয়া ফল ভোজন করিতেন। দারুণ রবির কিরণে উত্তেজিত হইয়া নিজ সখাগণসঙ্গে এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শান্তিলাভ করিতেন। কখনও সখাগণের সহিত বাল্য-ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া এই বৃক্ষমূলে সখা-দ্বারা রচিত নব নব পল্লব-শয্যায় বিশ্রাম করিতেন। যখন ধেনুগণ তৃণ-লোভে তৃণমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দূরগামী হইত, তখন এই সকল বৃক্ষমূলে ত্রিভঙ্গললিতঠামে দাঁড়াইয়া সেই সকল ধেনুর নাম লইয়া বাঁশী বাজাইতেন। ধন্য ব্রজের তরুলতা! যাহারা ব্রহ্মাদিদেবগণের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণকেও অনায়াসে নিকটে পাইয়া নানাবিধ সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে স্থিতিকালে দর্শন এবং স্পর্শনরূপ সুগন্ধিজলে যে বৃক্ষসকলকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণবিরহসময়েও তাহাদের সেই সকল সংস্কার-জনিত আবেগ বিলুপ্ত না হওয়ায় পুষ্পফলে সুশোভিত ছিল। অপর যে সকল পক্ষী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুভবানন্দে মাতিয়াছিল, এখন শ্রীকৃষ্ণ বিরহসময়েও তাহারা সেই-সকল লীলাগান করিয়া উদ্ধবকে তাৎকালিকরূপে শ্রবণ করাইতেছিল।

প্রাপ্তোনন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ॥

রথশোভা ও নিজশোভায় সুশোভিত শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল নন্দমহারাজের ব্রজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হইলেন। তখন বন হইতে যূথে যূথে ধেনুগণ ব্রজে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সকল ধেনুগণের খুররেণুরাশিতে রথখানি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সেই সকল গোখুর রেণুরাশিতে ধূসরিত হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কারণ ঐ সকল রেণু শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে অতিশয় ধন্যতম। ঐ রেণু ব্রহ্মা-শঙ্কর-লক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায়-বিনাশের জন্য নিজ নিজ শিরে ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজে প্রবেশ করিবামাত্রই শ্রীউদ্ধব সেই সম্পদে বিভূষিত হইলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য অস্ত না গেলে ও গোধূলি সমূহে রথখানি আবৃত না হইলে উদ্ধব অন্য ব্রজবাসীর নয়নগোচর হইয়া পড়িতেন এবং ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর চরণসান্নিধানে মিলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িত. কারণ সকল ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ঘিরিয়া রাখিতেন। সেই জন্যই শ্রীলীলাশক্তির প্রেরণায় অন্যের অলক্ষিতরূপে উদ্ধব শ্রীলব্রজরাজের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবেশ-সময়ে আরও অনেক সুমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধোভারেণ বৎসকান্॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভি র্গোবৎসৈর্ম্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বলরাময়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভি-র্গোপীভি র্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্।
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্॥

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ চৈত্র—১৩৩৯ অষ্টম সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব দাস

"এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণে ভক্তি করেন প্রকাশ॥"

একবার উচ্চারিত কৃষ্ণনামে সর্ব্বপাপ নাশ হয়, এবং যে সাধনভক্তি হইতে প্রেম পাওয়া যায়, সেই সাধনভক্তিটীকেও প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত আনুকূল্যের কৃষ্ণানুশীলনরূপা শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি ক্রমে চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তিকেই প্রকাশ করিয়া দেন এই পয়ারের কি এইরূপ অর্থ নয়? তাহা হইলে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় প্রভৃতি ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির উদ্গম হইবে—এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার কি আছে? যদি শ্রীনাম করিতে করিতে দীক্ষা গ্রহণাদির জন্ম প্রবৃত্তির উদ্গম না হয় তবে বুঝিতে হইবে শ্রীনাম তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইতেছেন না।

বাচস্পতিমহাশয় এই পয়ারটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেটী বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের টীকা করিয়াছেন—গর্ব্বেই আদি লীঃ ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদের উক্তিকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"চেতো দর্পণ" এই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

অর্থাৎ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপময় সংসারবাসনা নষ্ট হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি ও সর্ব্বভক্তি সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্তির উদ্গম হয়। তাহা হইলে—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়

এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির সহিত আর "চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম" এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে কিনা? তাহাও বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় ভাবিয়া দেখিবেন। ইনিই নাকি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ব্যাখ্যাতা! ধন্য—কালের প্রভাব! শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৩ বাক্যে

শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রের যে প্রমাণটী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়—এই সম্পাদক মহাশয়ের স্বজাতীয়াকার লোককেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহাদের শ্রীগুরুচরণে, শ্রীগুরুচরণদত্ত জপ্যমন্ত্রে ও পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি নাই তাহাদের বাক্য সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করিবে। বাচস্পতি মহাশয় যে ২৮৩ বাক্যের প্রমাণে—কেবল অর্চ্চনের জন্যই দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা দেখাইবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন, সেই ২৮৩ বাক্যেরই উপসংহারে শ্রীগোস্বামীপাদ এই প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আশা করি ভক্তিসন্দর্ভখানি খুলিয়া দেখিবেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণকে যে উপদেশামৃত দান করিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায়—

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তংমনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।"

যাঁহার মুখে "কৃষ্ণ" এই নামটী আছে তাঁহাকে মনের দ্বারা আদর করিবে। আর যদি তিনি দীক্ষিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে করশিরঃ সংযোগ, পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গরূপ ত্রিবিধ প্রণামই করিবে। তাহা হইলে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ কি না জানিয়াই এই নামাশ্রয়ীর ও দীক্ষিত বৈষ্ণবের সম্মানের ন্যূনাধিক্য ব্যবস্থা করিয়াছেন? বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় আরও একটী সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া নিজে অ—পূর্ব্ব রসিকতাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনামগ্রহণ করিয়া যদি আবার দীক্ষা গ্রহণ করে তাহা হইলে শ্রীনামের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। তাহা হইলে কি যেজন শ্রীনাম গ্রহণ করিবে, সে জন কি শ্রীমহাপ্রসাদ পাইবে না? এবং যদিও পায় তাহা হইলে কোনও ভক্তের বাড়ীতে কিম্বা কোনও আখড়ায় প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা রাখিবে? কারণ বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ থাকিলেই তাহার পূজা করিতে হইবে, পূজা করিতে হইলেই মন্ত্রের প্রয়োজন হইবে, মন্ত্রের প্রয়োজন হইলেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে, দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলেই শ্রীগুরুর প্রয়োজন হইবে, শ্রীগুরুর প্রয়োজন হইলেই তাঁর সেবা করিতে হইবে ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে, আদেশানুবর্ত্তী হইলেই নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, তাহা হইলেই নিজে নিজে বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি প্রচার করা যাইবে না। এই অভিপ্রায়েই কি দীক্ষার একান্ত আবশ্যকতা উড়াইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—যিনি সুপ্রতিষ্ঠ ও সুমর্য্যাদ হয়েন, তিনি কি অন্যের মর্য্যাদার লঘুতা করেন? অথবা নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই অন্যের মর্য্যাদা অধিকরূপে রক্ষা করেন? শ্রীনামের বহুলতর সুমর্য্যাদা আছে বলিয়াই তিনি অন্য অঙ্গভক্তির মর্য্যাদা না করিলে অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেই জন্যই "সতাং নিন্দা" প্রভৃতিকে নামাপরাধরূপে উল্লেখ করা হইয়াছেন। আমি তো ভক্তির কোনও অঙ্গেরই মাহাত্ম্য কম দেখিতে পাই না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে—

"সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ"।

যাঁহারা সাধুসঙ্গরূপ সৌভাগ্যের ফলে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রবণ করিবার সময়েই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণও বশীভূত হইয়া থাকেন। এই প্রকার ভক্তির প্রত্যেকটী অঙ্গেরই প্রভূত সামর্থ্যবিশেষ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছেন। বিস্তার ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যই এই যে এক অঙ্গের মহিমাধিক্য শ্রবণ করিয়া অন্য অঙ্গের অনাদর করিলে অপরাধই হইয়া থাকে। ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৯ বাক্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ উল্লেখ করিয়াছেন—"একস্য ফলাতিশয় সামর্থ্য প্রসংশয়ে—তরস্য নিত্যত্বনিরাকরণযোগাৎ" অর্থাৎ এক অঙ্গে অতিশয় সামর্থ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া অন্য অঙ্গের নিত্যত্ব হানি করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্যই শ্রীল গোস্বামিপাদ "শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ" অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব মহাজন শ্রীনারদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সাধনমার্গের অনুসরণকারী সাধক মাত্রের দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ উল্লেখ করিয়া দীক্ষা গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সদাচারও দেখাইয়াছেন।

এইক্ষণ দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃত, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতেছে।

শ্রুতি—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" সেই পরতত্ত্বের অনুভবের লালসায় বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মানুভবী সদ্গুরুকেই আশ্রয় করিবে। এই শ্রুতিটী নিয়মদ্বারা অপূর্ব্ববিধি। এই বিধি উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই ২৮৪ বাক্যে শ্রীল গোস্বামিপাদ "ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি" অতএব সেই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ অবশ্য সদ্গুরুর পাদাশ্রয় করিবে এই বিধিকে উপেক্ষা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ" যিনি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই সেই পরতত্ত্ব জানেন।" নৈষাতর্কেণ মতিরাপণেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ'। তর্কের দ্বারা এই মতি লাভ করিতে পারা যায় না, সদ্গুরুর উপদেশেই সুন্দর অনুভব করিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রমাণ যথা—

"প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং" "তস্মাৎগুরুংপ্রপদ্যেত"

"মদভিজ্ঞং গুরুংশান্তমুপাসীতমদাত্মকম্"

"নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা"

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা"॥

এই সকল প্রমাণ কি অর্চ্চনমার্গের জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে? বাচস্পতি মহাশয় তো শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এই "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোকেরই অবিকৃত অর্থে যে দুইটী পয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় কি তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন জানি না।

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে—পায় কৃষ্ণের চরণ॥

ইত্যাদি রাশি রাশি প্রমাণ থাকা সত্বেও কেন যে সম্পাদক মহাশয়ের এই সকল কুমতি উপস্থিত হইল বুঝিতে পারি না। ২৮৩ ও ২৮৪ বাক্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রাকরণিক নহে, অর্থাৎ মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয় করার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের প্রকরণ নহে। কিন্তু আনুসঙ্গিকভাবে উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপদাশ্রয় প্রকরণে শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু ও মন্ত্রগুরুভেদে তিন প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রবণগুরু, সম্বন্ধে জাতি, বর্ণ, ও আশ্রমের কোনও বিচার নাই। যেইজন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইবেন, তিনিই শ্রবণগুরু হইতে পারিবেন। শিক্ষাগুরু সম্বন্ধেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। তবে শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ এবং দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রগুরুর সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ২১০ বাক্যে "অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেদপরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়োব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগ নাপি কর্ত্তব্যঃ।" অতএব অর্থাৎ শ্রুতিতে "যস্যদেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" অর্থাৎ যাহার নিজ ইষ্টদেবে যেমন পরিমাণে ভক্তি, সেই পরিমাণে ভক্তি যদি নিজ শ্রীগুরুদেবে থাকে, তাহা হইলে সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই কথিত বিষয়গুলি হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া শ্রীমন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয় করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য এ বিষয়ে তো কোনও সংশয়ই নাই। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন "সুতরামেব"। এই ভাষাটী যে কত অবশ্য কর্ত্তব্যতা বোধক—তাহা কি সম্পাদক মহাশয়ের বোধ-বিষয় হইবে না? এই পরমার্থ মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয় ব্যবহারিক গুরু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে লেখিয়াছি—শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিতে না পারিলেই শ্রোতা ও পাঠকগণের হৃদয়ে একটা তুমুল আন্দোলন আনিয়া দেয়। সে দোষটীও যথাবিধি শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া অধ্যয়ন না করিলে অনিবার্য্য। পুনর্ব্বার ২১২ বাক্যে বলিতেছেন—"ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশিগুরাবিত্যাহ—যস্য সাক্ষাৎভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।" অতএব অর্থাৎ কর্ম্মিগণেরই যখন নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পরমার্থিভক্তগণের ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুতে যে ভগবদ্দৃষ্টি করিতে হইবে—এ বিষয়ে তো সংশয়ই নাই।

যাহার সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে ও জ্ঞানদীপপ্রদ শ্রীগুরুতে মনুষ্য-রূপ অসদ্‌বুদ্ধি আছে তাহার সমস্ত অধ্যয়ন হস্তীস্নানেরই মত বিফল। এইরূপ রাশি রাশি প্রমাণ ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকত্ব খণ্ডন করা উন্মত্তের মত প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় বলেন—

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে।*
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥
গুরুমুখ পদ্ম বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য-জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা-বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত।
শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু অধমজনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

শ্রীগুরুচরণকমল "অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা বিশুদ্ধভক্তির নিকেতন"। অর্থাৎ যেমন কাহারও কোনও একস্থানে নিবাস থাকে; প্রয়োজনানুসারে স্থানান্তরে যাতায়াত করে, তেমনি বিশুদ্ধভক্তির শ্রীগুরুচরণই নিজ নিকেতন। কিন্তু ঐ চরণে শরণাগত কোনও জীবকে প্রেমধনে ধনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাহারা ঐ শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাহারা ঐ বিশুদ্ধভক্তি কখনই লাভ করিতে পারে না। তবে যে কোন কোনও ব্যক্তিতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় বিনাও ভক্তি পরিলক্ষিত হয় সেটী সাত্ত্বিক উচ্ছাস মাত্র। "বন্দো মুঞি সাবধান মনে" "আমি" শ্রীগুরুচরণ দাস। "সাবধান মনে" অর্থাৎ ইনিই আমাকে মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবামৃত আস্বাদন করাইয়া শ্রীরাধাপদদাসী অভিমান দান করিতে সমর্থ এবং শ্রীগৌর পদারবিন্দে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া দিবেন—এইরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক "তোমারই চরণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে" এইরূপ মানস সঙ্কল্পে তাঁহারই চরণকমলে মাথাটী রাখি। "যাঁহার প্রসাদে ভাই" হে ভ্রাতঃ! শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণকমলসেবা পাইবার জন্য মনের উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারিক মায়াময় সম্বন্ধ ছেদনে অসমর্থ" এইরূপ দুর্গতি দর্শনে যিনি কাতর হইলে অনায়াসে এই মায়াময় সম্বন্ধের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়,—তাঁহারই নাম "এ ভব তরিয়া যাই", এই "যাই" পদটী অসমাপিকা-ক্রিয়া, অর্থাৎ তরিয়া যাইয়া "কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হনে" অর্থাৎ যাঁহার প্রসন্নতায়—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারা যায়। এই স্থানে "শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি" পদের অর্থে শ্রীকৃষ্ণ নাম মাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, গুণ মাধুর্য্য, পরিকরমাধুর্য্য ও লীলা মাধুর্য্য, আস্বাদনই বুঝিতে হইবে। বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীনাম গ্রহণ করিলেও শ্রীগুরুকৃপা ভিন্ন শ্রীনামের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারা যায় না। মূলহীন বৃক্ষ যেমন শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি "গুরুকৃপা ভজনের মূল" শ্রীলঠাকুরমহাশয়ের এই উক্তি থাকায় শ্রীগুরুকৃপারূপ বিশুদ্ধভক্তির মূল অভাবে ভক্তি-কল্পলতিকাও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণও ১০৮০।৪৩ শ্লোকে শ্রীদামবিপ্রকে বলিয়াছেন—"গুরোরনুগ্রহে নৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে" হে সখে! শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহেই মানব পূর্ণতা ও প্রকৃষ্ট শান্তি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয়ও অসুর বালকগণকে বলিয়াছেন—"হে ভ্রাতৃগণ! কর্ম্মবীজ পরিহারের সুখময় অব্যর্থ উপায়—"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ"। শ্রীগুরুচরণ শুশ্রূষারূপা ভক্তির দ্বারা অক্লেশে শ্রীভগবানে রতিরূপা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে—৭।১৫।২৫-২৬ শ্লোকে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসাজয়েৎ॥

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধী শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর শৌচবৎ ॥"

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে রজস্তমঃ গুণকে পরাজয় করিতে পারা যায়, আবার উপশমাত্মক সত্ত্বগুণের দ্বারা বিক্ষেপাত্মক সত্ত্বগুণকে পরাভব করা যায়, কিন্তু, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকলকেই একমাত্র শ্রীগুরুচরণে অকপট ভক্তি-প্রভাবে মানব অনায়াসে পরাজয় করিতে পারে। যাহার সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে ও জ্ঞানদীপপ্রদ শ্রীগুরুতে মনুষ্যদৃষ্টিতে অসৎবুদ্ধি আছে, তাহার নিখিল শাস্ত্র শ্রবণ হস্তীস্নানেরই মতব্যর্থ। ঐ স্থানের ২৭ শ্লোকেও বলিয়াছেন—

"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরে বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রিঃ লোকা যং মন্যতেনরং ॥"

হে যুধিষ্ঠির! সাধারণ লোক যাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করে, এই গুরুদেব নিশ্চয়ই প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক সাক্ষাৎ-ভগবান। যোগেশ্বরগণ এই শ্রীগুরুদেবেরই চরণযুগল সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের আংশিক করুণা শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণাদির আংশিকরূপে এবং পরিপূর্ণ করুণায় পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন হইবে। এই অভিপ্রায়েই ১১।৩ অধ্যায়ে ভাগবত ধর্ম্মশিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র বলিয়াছেন,—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্ম দৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥"

সেই শ্রীগুরুচরণ সমীপে "শ্রীগুরুদেবই ঈশ্বর এবং তিনিই পরমপ্রিয়" এই আবেশে ভাগবত ধর্ম্মসকল শিক্ষা করিবে। ঐ শ্রীগুরু চরণে নিরভিমানে অকপটভাবে মনের অনুকূল সেবা করিবে। অকপটভাবে শ্রীগুরুচরণ সেবা করিলে শ্রীভগবান্ এমনই সুপ্রসন্ন হয়েন যে তিনি সেই শ্রীগুরুসেবককে অন্য কিছু দান করিয়া আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না বলিয়া নিজে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবার ফলে অন্তরে ও বাহিরে অনবরত শ্রীগোবিন্দের স্ফূর্ত্তিলাভে অধিকারী হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—"কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে"। "শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য" শ্রীগুরুদেব শ্রীমুখে যে আদেশ করেন অর্থাৎ "তুমি সাধকদেহে শ্রীনিতাই চাঁদের দাস, সিদ্ধদেহে শ্রীরাধা পদদাসী" এই বাক্যের সহিত "হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির সঙ্কল্পের সহিত একত্ব রক্ষা করিবে এইস্থানে কোথাও পাঠ দেখা যায়—"হৃদে করি মহাশক্য" অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখপদ্ম বাক্য মহাসামর্থ্যযুক্ত। তিনি যে আদেশ করিলেন "তুমি শ্রীরাধাপদদাসী" ইত্যাদি। ঐ আদেশবাণীর এমনি একটা ক্ষমতা আছে সাধক যদি অকপট ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ আদেশের বলেই তিনি শ্রীরাধাপদদাসী হইতে সমর্থ হইবেন। "আর না করিহ মনে আশা" শ্রীগুরুচরণাদিষ্ট বিষয় ভিন্ন অন্য কোন সঙ্কল্প হৃদয়ে করিতে নাই। "শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা" শ্রীগুরুচরণে রতিটী লাভ করিতে পারিলেই সাধক মনে মনে বুঝিবেন যে 'আমি নিখিল প্রাপ্য বস্তুর মধ্যে উত্তমপ্রাপ্যবস্তু লাভ করিয়াছি। যাঁহার প্রসাদে সকল আশা অর্থাৎ শ্রীনিতাই চাঁদের দাসত্ব ও শ্রীরাধাপদদাসীত্ব-আবেশে শ্রীগৌর গোবিন্দের সেবামৃত আস্বাদন লাভ করিতে পারা যায়। "চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত" শ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণকমলে সাধকের নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানই চক্ষুদান। যে শ্রীগুরুদেব সেই সম্বন্ধ জ্ঞানটী হৃদয়ে উদ্ভাসিত করিয়া দেন, তিনিই জন্মজন্মের প্রভু। অর্থাৎ সাধক জন্মেও তিনিই আরাধ্য, সিদ্ধজন্মেও তিনিই আরাধ্য! কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির কেবল মাত্র সাধক জন্মেই শ্রীগুরু-চরণের সহিত সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ভক্তিরসিকগণের শ্রীগুরু-চরণের সহিত সাধক ও সিদ্ধ এই উভয় অবস্থাতেই নিত্য সম্বন্ধ। এই অভিপ্রায়েই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥

* * * *

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হৈয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর
মনের বাসনা পূর্ণ কর এই বার ॥

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা গুণ গাও রাত্র দিনে ।
নরোত্তমের বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুঁয়া বিনে

আ মরি মরি! শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের নিজ গুরু শ্রীরঘুনাথ প্রভুর কৃপামৃত আস্বাদনে কি উচ্ছাসময়ী বাণী! এই সকল মহাজনগণের মহাশক্তিপূর্ণ বাণীবিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যাহাদের প্রাণ হা শ্রীগুরু! বলিয়া কাঁদিয়া উঠে না, তাহাদিগের হৃদয়কে বজ্র হইতেও কঠিন বুঝিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল উক্তিতে সাধক ও সিদ্ধ এই উভয়বিধ অবস্থাতেই ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণে যে নিত্য সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ যে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হয় না তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে

(ক্রমশঃ

বর

। শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ ।

দূরে থেকে তোমা ভাবিনু যেমন
আমি নিজ ভাবে অহরহ,
কাছে এসে তুমি ভুল ভেঙ্গে দিলে
ওগো কিছু তার তুমি নহ ।
তুমি কী উদার! কত বড়!
আমার কী দোষ এতটুই ভাবে
করি' এতটু যাদেরে গড়
আজি যদি নাথ ভেঙ্গে দিলে বাঁধ
ছড়ায়ে পড়িব আমি
কত ভাল তুমি! কিছু ভাবি নাই
চির দর্শন কামি'।
দূরে ছিনু যবে ভাবিনু তোমায়
আমি যাচিব অনেক বর,—
যত কথা আছে সকলি কহিব
আগে কাছে পেয়ে, তার পর।
তুমি পূর্ণ করিয়া হিয়া
আসিলে যখন অধীনার পাশে
সবি ভুলে গেল তব প্রিয়া।
তুমি মোর বর কহিলে শুনেছি,
"কী চাহ কহ আমারে।"
তুমি গো যখন তোমাকেই দেছ
সে কিছু চাহিতে নারে।
তুমি সকল চাওয়ার পারে!

জীবের মনুষ্যজন্ম—৭

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

শ্রীভগবচ্চরণভজনবিমুখ বহির্ম্মুখ মনুষ্য নিজের জড়দেহে আত্মবুদ্ধি এবং তদ্দেহানুকূল জড়বিষয়েই মমতাবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞ পশুবৎ বৃথা জীবনধারণ করিয়া থাকে, ভক্ত ও ভগবানের সন্ধান পর্য্যন্তও জানে না। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুনপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ভাগ ১০।৮৪।১৩

অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য জড়দেহেই যাহার আত্মবুদ্ধি এবং অনিত্য পুত্রকলত্রাদিতেই যাহার মমতাবুদ্ধি সেই মনুষ্যাধমেরই কেবল পার্থিব প্রতিমাদিতেই দেবতাবুদ্ধি এবং নদ্যাদিজলেই তীর্থবুদ্ধি হইয়া থাকে, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণের প্রতি তাহার অণুমাত্রও মমতা বা তীর্থবুদ্ধি হয় না। সে ব্যক্তি মনুষ্য হইয়াও গাভীগণের তৃণাদিভারবাহক গর্দ্দভ অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তে মমতাবুদ্ধি না করিয়া কতিপয় অতি ঘৃণার্হ উপাদানের সমষ্টি জড়দেহেই মমতাবুদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীভগবান্‌কে সেই কথাই শুনাইয়া বলিয়াছেন—

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোম নখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতি বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

ভাগ ১০।৬০।৪৫

হে প্রভো! সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ তোমার পাদকমলের মকরন্দমাধুর্য্য পৌরাণিকগণকর্তৃক সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে নারী তাহার কণামাত্রেরও আঘ্রাণ কখনও পায় নাই, সেই বিমূঢ়াই জীবদ্দশাতেও শবতুল্য পুরুষদেহকে কমনীয় কান্তবুদ্ধিতে ভজন করিয়া থাকে। প্রাকৃতদেহ-মাত্রই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, লোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ; বাহিরের আচ্ছাদন না থাকিলে দৌর্গন্ধ্যাদিদ্বারা আকৃষ্ট কোটি কোটি মক্ষিকা ও কীটাদিদ্বারা সর্ব্বদাই পরিব্যাপ্ত থাকিত।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই বাক্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে জগতে ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য নিজের জড়দেহেই অহন্তা এবং সেই দেহের অনুকূল পিতা, মাতা, পতি, পুত্রাদির জড়দেহেই মমতাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সুখে কালযাপন করিতে চাহে। তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও ব্যবহার কেবল দেহে দেহে, স্বরূপে কাহারও কোন সম্বন্ধ বা ব্যবহার নাই। বহির্ম্মুখ জীবের দেহমাত্রই জড় ও বীভৎস-স্বভাব, এবং কতিপয় ঘৃকারজনক উপাদানের সমষ্টি মাত্র। এতাদৃশ ঘৃণাস্পদ দেহ যাঁহার সম্বন্ধহেতু জীবিত থাকিয়া কমনীয় বলিয়া বোধ হয় এবং যাঁহার সম্বন্ধ-বিচ্যুতি ঘটিলেই অস্পৃশ্য শবে পরিণত হইয়া পচিয়া গলিয়া যায়, তাঁহার সহিত বহির্ম্মুখ জীবের কোনই সম্বন্ধ বা ব্যবহার নাই। যাঁহার পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, পতিত্ব ও পুত্রত্বাদিহেতু পিতা, মাতা, পতি পুত্রাদির জড় দেহসকল পিতা মাতা পতি পুত্রাদি পদবাচ্য হয়, তাঁহার সহিতই জীবের যে একমাত্র অনাদি ও নিত্য-সম্বন্ধ, ভজনবিহীন বহির্ম্মুখ মনুষ্য বিমূঢ়তাহেতু তাহার সন্ধানও করিতে পারে না। একমাত্র তাঁহারই সহিত জীবের স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী স্বরূপভূত নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সম্বন্ধ, তাঁহাকে ভুলিয়াই বহির্ম্মুখ জীবের ঐ সকল স্বরূপভূত রস সংসার-মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় নিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ নিত্যবদ্ধ জীবকে পথের সম্বল স্বরূপ এই কয়টি রস দিয়া থাকেন, এই রস কয়টি আশ্রয় করিয়াই তাঁহার জীব তাঁহাকে ভজন করিবে এবং তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অপব্যবহার করিয়া সে নিঃসম্বল হইয়া যায় এবং অনন্ত সংসার মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। নিজের দেহের অনুকূলবুদ্ধিতে পিতা, মাতা, পতি, পুত্রাদির দেহের সহিত এই সকল রসের সম্বন্ধ কেবল বীভৎস রসেই পরিণত হইয়া তাহার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যেদিন বহির্মুখ মনুষ্য সাধুকৃপা লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে সেইদিন হইতেই সে পিতা, মাতা, পতি, পুত্রাদির নিঃস্বার্থ সেবায় তৎপর হইতে পারিবে, এবং সেইদিন হইতেই সে বুঝিতে পারিবে যে পিতা, মাতা, পতি, পুত্রাদির কেবল নশ্বর দেহের সহিতই যে তাহার সকল সম্বন্ধ বা ব্যবহার তাহা নহে, তাহার বাস্তবিক সম্বন্ধ ও ব্যবহার একমাত্র ঐ সকল দেহেরই অন্তঃস্থিত শ্রীভগবানের সহিত। প্রাকৃত পিতা, মাতা, পতি, পুত্রাদির দেহের বাহ্যসম্বন্ধের সহিত শ্রীভগবৎসম্বন্ধের কোন বিরোধও হয় না। কেবল প্রাকৃত পদার্থদ্বয়েরই সত্তা ও সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধভাব বিদ্যমান। নৈয়ায়িকের ভাষায় তাহাকেই অন্যোন্যাভাব কহে; অর্থাৎ আমি যে স্থানটিতে আছি সেখানে আর কেহ থাকিতে পারে না, আমার সহিত আমার স্ত্রীর যে সম্বন্ধ আর কাহারও সে সম্বন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে যেখানে আমি ঠিক সেই খানেই তিনি থাকেন, বস্তুতঃ তিনি সেখানে না থাকিলে আমি থাকিতেই পারি না, এবং আমার স্ত্রীর সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাঁহারও তাহার সহিত তদপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ঠিক সেই সম্বন্ধই নিত্য বিদ্যমান। আমার সহিত আমার স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল বাহ্য ও ক্ষণস্থায়ী—দুই দিনের জন্য মাত্র, শ্রীভগবান্‌ই তাহার নিত্য ও যথার্থ পতি।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় শ্রীশ্রীরাস-লীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধে ঔপপত্য সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে নিরসনপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥
ভাগ ১০।৩৩।৩৫

অর্থাৎ এই গোপীগণের, তাঁহাদের পতিসকলের এবং দেহধারী সকলেরই যিনি অন্তরে তাহাদের বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টা হইয়া সতত বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই ব্রজমণ্ডলে লীলা-বিগ্রহে ব্রজগোপীগণকে বাহিরে আলিঙ্গন কিম্বা তাহাদের রহস্য বহির্গাত্র দর্শন করিলে তাঁহার কি ঔপপত্য দোষ স্পর্শ হইতে পারে? তিনিই সকলের একমাত্র নিরু-পাধিপ্রেমাস্পদ যথার্থ পতি। মধুর রসের বিষয় একমাত্রই তিনি। বিশেষতঃ ব্রজদেবীগণ সচ্চিদানন্দঘন তাঁহারই আনন্দাংশের শক্তি হ্লাদিনীরই ঘনীভূতা মূর্ত্তি, তাঁহা হইতে অভিন্নস্বরূপা হইয়াও লীলাহেতু নিত্যপ্রেয়সীরূপে পৃথক্ হইয়া থাকেন, এবং লীলারস আস্বাদন নিমিত্ত উভয়ের এই ঔপপত্যভাবের কেবল মাত্র প্রতীতি তাঁহারই শ্রীযোগমায়া শক্তি কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র পুরুষ, এবং জীবমাত্রই তাঁহারই প্রকৃতি। তিনিই যথার্থ পতিশব্দবাচ্য, প্রাকৃত পতিমাত্রই পতিম্মন্য—নকলপতি মাত্র। শ্রীভগবদ্বুদ্ধিতে প্রাকৃত পতির নিঃস্বার্থসেবা না করিতে পারিলে প্রাকৃত পতিই বাস্তবিক উপপতিপদবাচ্য-যোগ্য হইয়া থাকে। কেবল নিজের জড়দেহের অনুকূলবুদ্ধিতে ব্যবহারিক পতির জড়দেহের সেবা পাতিব্রত্যধর্ম্ম নহে, কারণ স্ত্রীজাতির প্রতিজন্মেই ব্যবহারিক পতি পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, কিন্তু একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই তাহাদের যথার্থ পতিরূপে সকল জন্মেই ঠিক থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুকৃপা লাভ করিয়া একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া জানিতে পারিলেই স্ত্রীলোকের যথার্থ সতীত্ব রক্ষা হইয়া থাকে এবং আর কখনও নকল পতির অধীন হইতে হয় না। সেই স্ত্রীই যথার্থ সতী যিনি পরমাত্মবুদ্ধিতে নিজ পতির সেবা করিতে পারেন, নতুবা প্রতিজন্মে পৃথক্ পৃথক্ পতির ভজন করিয়া ব্যভিচারদোষ-দুষ্টা হইতে হয়।

শ্রীরাসলীলার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বংশীধ্বনিদ্বারা শ্রীব্রজ-গোপীগণকে যমুনাপুলিনে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি উপেক্ষাময় বাগ্‌বিলাসপ্রয়োগপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্যাদিধর্ম্মই পালনীয়, অতএব তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাগমনই কর্ত্তব্য। ব্রজদেবীগণ তাঁহার কথাতেই তাঁহাকে পরাজয় করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

যৎপত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥
ভাগ ১০।২৯।৩২

হে অঙ্গ! পতিপুত্রসুহৃদাদির সেবাই যে স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম বলিয়া ধর্মজ্ঞশিরোমণি তুমি আমাদিগকে উপদেশ করিলে, আমরা ত প্রতিক্ষণে তাহাই সম্যক্ পালন করিতেছি। শাস্ত্রমতে ধর্মোপদেষ্টা আচার্য্যের সেবাই প্রথমে কর্ত্তব্য, সেই আচার্য্য যদি স্বয়ং পরমেশ্বর হয়েন তাহা হইলে তাঁহার সেবাই যে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার আর কি কথা, কারণ সকল ধর্মোপদেশেরই মূল লক্ষ্য একমাত্র পরমেশ্বর! আমরা কি জানি না যে তুমিই সেই পরমেশ্বর এবং তুমিই সকল দেহধারীর আত্মার আত্মা—পরমাত্মা, সকলেরই একমাত্র যথার্থ প্রেষ্ঠ ও বন্ধু—তোমারই সাক্ষাৎ সেবা লাভের জন্যই শাস্ত্র পতিপুত্রাদির সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন? অধিকন্তু শাস্ত্র যে পতি-পুত্রাদির সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ততক্ষণই যতক্ষণ তুমি পরমাত্মরূপে তাহাদিগের দেহে বিদ্যমান থাক, নতুবা শাস্ত্র তাহাদিগকে গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া নদীতটে মুখে অগ্নিসংযোগ করিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বধর্মফলরূপ পরমাত্মার সেবা করিলেই যখন পতিপুত্রাদির সেবা-সিদ্ধি হয়, তখন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ সেই পরমাত্মা তোমাকে পাইয়া তোমার সেবা ছাড়িয়া তোমার সেবার প্রতিকূল পতিপুত্রাদির কেবল দগ্ধমুখ জড়দেহের সেবায় কি লাভ হইবে? এক পতিব্রতা রমণীর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য ধর্মের অলৌকিক মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি প্রত্যহ পতিসেবা সম্পাদন না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। দৈববশে পতি প্রবাস গমনোদ্যত হইলে সাধ্বী পতির অনুমত্যনুসারে তাঁহার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তির নিত্য-সেবায় নিযুক্তা হইলেন। কিছুকাল পরে পতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখনও কি সতী তাঁহার মূল পতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিরই সেবা করিবেন? অতএব যতদিন মূল পতির দেখা সাক্ষাৎ নাই ততদিনই কেবল পতির মৃণ্ময় মূর্ত্তিকেই পতিবুদ্ধিতে সেবা করা কর্ত্তব্য। সেই মূলপতি তোমাকে পাইয়া এখন আর আমাদের মাটীর পতির সেবায় প্রয়োজন নাই।

শ্রীব্রজদেবীগণের এই বাক্য সাধকজগতে ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্যলাভ হইলে ব্যবহারিক পতিপুত্রাদির সেবায় অভিনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে। ব্যবহারিক পতিপুত্রাদির সেবা ত্যাগ করিবার অধিকার আমাদিগের নাই; আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণার্থে কেবল তাহার অভিনিবেশটাই আমরা ত্যাগ করিতে পারি, এবং যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্যলাভের অধিকার হইবে তখন পতিপুত্রাদি স্বয়ংই আমাদিগকে ত্যাগ করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা মূল পতিপুত্রাদিরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া কেবল মৃণ্ময় পতিপুত্রাদির সেবাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া যাই, এবং সে সেবায় সকলের পরিতুষ্টি-সাধন অসম্ভব বলিয়া দুঃখের উপর দুঃখই ভোগ করি। পিতা, মাতা, পতি-পুত্রাদি সকল দেহেই জীবাত্মা পৃথক্ পৃথক্, সকলের পৃথক্ রূপে সেবা করিয়া সমভাবে পরিতুষ্টি-সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবান্ সকল জীবাত্মার এক পরমাত্মা, সকল দেহেই বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে জীবিত রাখেন; তাঁহাকে সৌভাগ্যক্রমে জানিতে পারিয়া সেবাদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারিলেই আর আর সকলেই সমগ্র জগতের সহিত পরিতুষ্ট হইয়া যায়। তাই দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
ভাগ ৪।৩১।১৪

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলেই জলসেচন করিলে তাহার পত্র, পুষ্প, স্কন্ধ, ভুজ ও শাখা সকলই তৃপ্তিলাভ করে, মূল-সেচন বিনা তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নিষেচন নিষ্ফলই হইয়া থাকে, এবং ভোজনের দ্বারাই যেমন ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তিসাধন হয়, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ে অন্ন লেপন করিলে কোন ফল হয় না, সেইরূপ সকলেরই মূলস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কেই সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারিলে আর সকলেই স্বতঃই পরিতুষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের তুষ্টি-সাধনের পৃথক্ প্রয়াসের আবশ্যকতাই হয় না।

একমাত্র সাধুকৃপাবলে শুদ্ধা সাধনভক্তি যাজনের ফলেই আমরা শ্রীভগবান্‌কে মূল পতিপুত্রাদিরূপে নিখিল আশ্রিতাশ্রয় ও সকলেরই একমাত্র সুহৃদ্ ও প্রিয়তম বলিয়া জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকি। আমার আসন্ন-মৃত্যুকালে ব্যাবহারিক পতিপুত্রাদি অমঙ্গলাশঙ্কায় যাঁহার সুমঙ্গল নামটি শুনাইয়া আমাকে আমারই গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে, তিনিই কেবল সেই দুঃসময়েও আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিবেন না, এবং আমার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য আমাকে যখন দেহান্তরে যাইতে হইবে তখনও তিনি আমার সহিত মাতৃগর্ভেও প্রবেশ করিবেন। কর্ম্মফলে আমি বিষ্ঠাকৃমি হইলেও তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। এইরূপে অনাদিকাল হইতে আমার অলক্ষিতে তিনি অনবরতঃ অণুমাত্র ব্যবধান না রাখিয়াই আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যখনই আমি বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইব অমনি তিনি আমাকে দেখা দিবেন—আমি যে তাঁহারই এবং তিনি আমারই! শ্রুতি মাতা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি বাক্যে এই সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবান্ নারায়ণকে বলিয়াছেন—

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ুংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ॥

ভাগ ৫।১৮।১৯

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্॥

ভাগ ৫।১৮।২০

হে প্রভো! তুমিই সকলের ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা, অতএব তুমি সকলেরই পতি। স্ত্রীগণ নানাব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার আরাধনা করিয়া আবার অন্য প্রাকৃত পতি তোমার নিকট হইতেই প্রার্থনা করিয়া লইয়া থাকে। এই বিমূঢ়াগণের তাদৃশ অস্বতন্ত্র পতিগণ তাহাদের পুত্র ধন বা পরমায়ুর রক্ষা বিধানে কখনই সমর্থ নহে।

এই বিমূঢ়াগণ পতিশব্দের অর্থই জানে না—"পাতীতি পতিঃ", অর্থাৎ যিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন তিনিই যথার্থ পতিশব্দবাচ্য। যে ব্যক্তি নিজেকেই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে সে আবার অপরকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? যিনি অকুতোভয়, অর্থাৎ যাঁহার কাহা হইতেও কোন ভয়ের কারণ নাই, এবং ভয়াতুর মাত্রেরই সর্ব্বথা রক্ষাবিধানে সামর্থ্য বিদ্যমান, তিনিই যথার্থ পতি। পালকরূপ সেই যথার্থ পতি কেবল একমাত্র তুমিই। তুমিই সকলের পরমাত্মা, অতএব তুমিই সকলের নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। তোমাকেই ভাববিশেষে পতিরূপে পাইলে কাহারও আর পাইবার কিছুই বাঁকি থাকে না।

জগতে ব্যবহারিক পতিদেহধারী গৃহস্থ মনুষ্যও সাধুকৃপা-লব্ধ শুদ্ধ সাধনভক্তি-যাজনের ফলে পত্নীর দেহে ভোগ্যবুদ্ধি ও নিজের পুরুষাভিমান সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত রাগানুগ ভজনে অচিরাৎ সিদ্ধি-লাভ করিয়া শ্রীভগবান্‌কেই নিত্য পতিরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন।

জগতে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধই সকল বন্ধন ও অনর্থের মূল। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর আসক্তিত্যাগই ভক্তিপথে প্রথমাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলনে যে রসের অনুভূতি হয় তাহাই এই আসক্তির মূল কারণ। প্রাকৃত রসশাস্ত্র ইহাকেই শৃঙ্গার রস আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন—

শৃঙ্গস্তু মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুক
উত্তম প্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে।

শৃঙ্গ শব্দের অর্থ মন্মথোদ্ভেদ, মদনকৃত চিত্তবৈকল্যের নামই মন্মথোদ্ভেদ। এই চিত্তবৈকল্যের আগমনে যে একটা রস আস্বাদন হয় তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধাদি উত্তম-স্বভাব হইলে শৃঙ্গাররস পদবাচ্য হয়। অধর্ম্ম-সম্বন্ধাদি যুক্ত হইলে তাহাকে শৃঙ্গারাভাস কহে। এই রসকেই শাস্ত্র আদিরস, শুচিরস, উজ্জ্বল রস বা মধুররস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জগতের আদি—সৃষ্টি এই রসে। এই রস কাহাকেও শিখাইতে হয় না। পশু, পক্ষী, কীট-

পতঙ্গাদি তির্য্যগযোনি অন্য কোনও রসের অধিকারী নহে, কিন্তু জীবমাত্রেরই এই রস পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ," অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ই রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রও শ্রীভগবান্‌কেই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার বা মধুর এই পঞ্চবিধ রসই মুখ্য রস, তন্মধ্যে সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই তিনটিই প্রধান। ব্রজলীলায় শ্রীভগবান্ এই তিনটি রসেরই বিষয় হইয়া তত্তৎ রসের আশ্রয়স্বরূপ পার্ষদগণের তত্তৎ রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শৃঙ্গার রসই রসরাজ; শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীশুকদেব "পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ মদনমোহন মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রাকৃত মদনের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এবং স্ত্রীদেহ পাইয়া তাঁহার সম্ভোগ-লালসায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীভগবানের এই মূর্ত্তিকেই "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলিয়াছেন। প্রাকৃত মদন তাঁহারই শক্তি সঞ্চারিত জীব—পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বহির্ম্মুখ দেহাভিমানি-জীব-হৃদয়ে শৃঙ্গ অর্থাৎ চিত্তবিকৃতি উৎপাদন করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার প্রেরণা করে। শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত মদন রূপে বহির্ম্মুখ জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তথা হইতে প্রাকৃত মদন তিরোহিত হইয়া যায় এবং সে হৃদয়ে তাঁহারই প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। বহির্ম্মুখ জীব বহু সৌভাগ্যবলে সাধুকৃপা লাভ করিয়া এই চরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। সাধুকৃপালব্ধ জীবহৃদয়েই অপ্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত শৃঙ্গ অর্থাৎ চিত্তবিকৃতি উৎপাদন করিয়া নিজেরই ইন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছার প্রেরণা করেন, এবং তাহাতে উভয়ের যে রস আস্বাদন হয় তাহাই অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রস। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই জীবহৃদয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার প্রেরণা করিয়া তাহাকে মাতাইয়া দেন এবং নিজেও মাতেন। আর প্রাকৃত মদন স্ত্রী ও পুরুষের মন পরস্পর জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই মাতাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দেয়। অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-লাভ হইলে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির প্রীতি-সাধনের বিন্দু-মাত্রও আবশ্যকতা থাকে না, তখন ঐ বিশুদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা সর্ব্বাত্মভাবে তাঁহারই সেবালাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া জীব সৌভাগ্যের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া যায়।

অণুচৈতন্য জীবস্বরূপে এই অপ্রাকৃত রস অণুপরিমাণে বিদ্যমান, অণু হইলেও তাহাই বিভু শৃঙ্গাররস-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অতি লোভনীয়। নিত্যমুক্ত জীব তাহার অণু-পরিমিত রস তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই বিভু রসের আশ্রয় হইবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং তাঁহাকেই সেই রসের বিষয় করিয়া তাঁহার সেবা-প্রাপ্তিহেতু তাঁহার সহিত অখণ্ড ও অনন্ত রস-ভোগের অধিকারী হইয়া থাকে। শৃঙ্গার-রস-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবা লাভই জীবের সর্ব্ব-সাধ্য-শিরোমণি।

অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসে অপ্রাকৃতশৃঙ্গার-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায় সেই ইন্দ্রিয় লাভ হয়। সে ইন্দ্রিয় সর্ব্বথা পরিপূর্ণ-স্বভাব, জড় ইন্দ্রিয়ের মত তাহার পরিপূরণের আবশ্যকতা থাকে না, কেবল ভগবৎ-সেবাই তাহার প্রয়োজন। শ্রীভগবৎসেবোপযোগী দেহের প্রতি অঙ্গ শ্রীভগবানের প্রতি অঙ্গের সেবার জন্যই লালায়িত হয়, আর কিছুই চাহে না। সাধকাবস্থায় সাধুকৃপায় সাধকের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিতেই সেই অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির আবেশ হইয়া থাকে, এবং সাধনবলে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি ক্রমশঃ নির্জ্জিত ও নিরস্ত হইয়া যাইলে সেই দেহেন্দ্রিয়াদিই সিদ্ধদেহরূপে থাকিয়া যায়।

বহির্ম্মুখ জীব শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়াকৃত জড়-দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি করিলেই প্রাকৃত মদন তাহার মনোধর্ম্ম প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এবং তাহার আত্মধর্ম্ম বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রসবিন্দু অভিভূত হইয়া প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসে অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায় কলুষিত হইয়া যায়। শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়াই মায়াবদ্ধ জীব তাহার বিষম সংসার পথের সম্বল স্বরূপভূত শৃঙ্গারাদি রসবিন্দুসমূহ স্ত্রী-পুত্রাদি-সংসার-মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় নিক্ষেপপূর্ব্বক নিঃসম্বল হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব-কবি শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া তাই গাহিয়াছেন—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুত মিত রমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিণু অব মঝু হব কোন কাজে।

মায়াবদ্ধ স্ত্রীপুরুষদেহধারী জীবমাত্রই তাহাদের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ শৃঙ্গাররসবিন্দু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছায় কলুষিত করিয়া পরস্পর জড়দেহের সম্বন্ধেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলে তাহাদের হৃদয় হইতে প্রাকৃত শৃঙ্গাররসও ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া কেবল ঐ কলুষিত রসের ব্যবহারটাই থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় বহির্মুখ জীব প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের কেবল ব্যবহার লইয়াই উন্মত্ত হইয়া থাকে এবং ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইয়া অধঃপতনের শেষসীমায় উপনীত হয়। এইরূপ দুরবস্থাপ্রাপ্ত জীবও কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সাধুকৃপালাভ করিলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে যে—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

ভাগ ৭।৯।৪৫

শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন যে—হে প্রভো! তুচ্ছ মৈথুনাদিসুখহেতু কেহ কখনও সুখী হইতে পারে নাই। কণ্ডূতি নিবারণের জন্য করদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে ক্ষণিক অনুকূল বেদন অনুভূত হইয়া পরক্ষণেই জ্বালাযন্ত্রণাদি দুঃখের উপর দুঃখই ভোগ হয়। মৈথুনাদি সম্ভোগেচ্ছা একপ্রকার কণ্ডূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কণ্ডূতির ন্যায়ই তাহা অতি দুঃখপ্রদ এবং দুঃসহ। কামুক ব্যক্তিগণ অলংবুদ্ধিপূর্ব্বক তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কণ্ডূতিবেগ সহ্য করাই যেমন কণ্ডূতি হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়, এবং কোন কোন ধীর ব্যক্তিই কেবল তাহা সহ্য করিতে পারে, সেইরূপ কোন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধুকৃপাহেতু তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া ধীরপদবাচ্য হইলেই এই অতি দুঃসহ ও অতিদুঃখপ্রদ কামবেগ সহ্য করিয়া কামের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি পতঙ্গ যেমন তুচ্ছ রূপের লালসায় আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, মায়াবদ্ধ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যও তুচ্ছ প্রাকৃতশৃঙ্গাররসের লালসায় আকৃষ্ট হইয়া দুর্দ্দর্ষ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় আত্মঘাতী হইয়া থাকে। মনুষ্যের অধঃপতনকেই শাস্ত্র যথার্থ আত্মহত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাহেতুই মনুষ্য পশু হইতে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভ হইলেই মায়াবদ্ধ মনুষ্য মায়াতিক্রমপূর্ব্বক অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের অধিকারী হইয়া থাকে। এই পরম পবিত্র রসের উদয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায়, এবং নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অণুমাত্রও প্রয়োজন থাকে না; অধিকন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্মরণ পর্য্যন্তও ন্যক্কারজনক হইয়া যায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গলাভের ফলেও প্রাকৃতশৃঙ্গাররসাসক্তচিত্ত মনুষ্য পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাহার কলুষিত রসও শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্ব্বক স্ত্রীভাবে তাঁহার ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন লৌহত্ব পরিহারপূর্ব্বক সুবর্ণে পরিণত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ পাইলে মনুষ্যের কলুষিত প্রাকৃত শৃঙ্গাররসও ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা পরিহারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসে অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় পরিণত হইয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিয়া দেয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুষ্যতি।
নীচস্পর্শে সুরাভাণ্ডে কূপাদিজল মিশ্রিতে॥

অর্থাৎ গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী হইলেও গঙ্গাজল নীচস্পর্শে সুরাভাণ্ডে ও কূপাদিজলে মিশ্রিত হইলে অপবিত্র হইয়া যায়। সেইরূপ এই পরমপবিত্র চিন্ময় শৃঙ্গাররসবস্তুও আমাদিগের বহির্মুখতা সুরাভাণ্ডে পড়িয়া, নীচ ঘৃণ্য জড়দেহ স্পর্শ পাইয়া এবং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভরসা এই যে শাস্ত্র একথাও বলিয়াছেন—

"অগাঙ্গমপি গাঙ্গেয়ং গঙ্গায়াং পতিতং যদি"।

অর্থাৎ অপবিত্র কূপাদিজলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে পবিত্র গঙ্গাজলে পরিণত হইয়া ত্রৈলোক্যপাবন হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই কলুষিত রসও যদি শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি শ্রীমাধবের শ্রীচরণে সমর্পিত হয় তাহা হইলে তাহাও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কলুষরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় পরমপবিত্র অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসে

পরিণত হইয়া আমাদিগের চরম কৃতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সৈরিন্ধ্রী শ্রীকুব্জা কেবল নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শে তাঁহার প্রাকৃতশৃঙ্গার-রসাসক্ত দেহেন্দ্রিয় অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের অধিকারী হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়সেবোপযোগী হইয়াছিল। শ্রীকুব্জাদেবী সাধারণী নায়িকা হইলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণরতি সাধুকৃপাসাপেক্ষা নহে, কারণ তিনি লীলার পরিকর মধ্যে গণনীয়া। মিথিলা-নগরবাসিনী বেশ্যা পিঙ্গলা সাধু শ্রীদত্তাত্রেয় ঋষির কৃপায় অল্পক্ষণেই নির্ব্বেদ লাভপূর্ব্বক শৃঙ্গাররসমূর্ত্তি শ্রীমাধবের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার উচ্ছাসবাণীই শ্রীমদ্ভাগবতে পিঙ্গলাগীত নামে প্রসিদ্ধা। তিনি বলিয়াছেন—

> সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
> বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
> অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
> মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা॥ ভাগ ১১ ৮.৩১
> যদাস্থিভি নির্ম্মিতবংশ বংশ্য-
> স্থূণং ত্বচা রোম নখৈঃ পিনদ্ধম্।
> ক্ষরন্নবদ্বারমগার মেতদ্
> বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা॥ ১১.৮.৩৩
> বিদেহানাং-পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
> যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ॥ ১১।৮.৩৪
> সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
> তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা॥ ১১।৮।৩৫

হায়! আমার অন্তর্হৃদয়েই আমার এই যে রতিপ্রদ নিত্য-পতি নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি মদ্দত্ত রতিতুষ্ট হইয়া আমাকে প্রচুর বিত্তও দিতে পারেন, কারণ তিনি লক্ষ্মীরও পতি। তাঁহাকে ছাড়িয়া, হায়, আমি এতদিন কেবল দুঃখ ভয়, আধি, শোক ও মোহপ্রদ এবং কামপূর্ত্তিদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ তুচ্ছ পাপ-পতিরই ভজন করিয়াছি!

আমি এতাবৎকাল এই অতি বীভৎস বিষ্ঠাগৃহ নরদেহ-কেই স্বভোগ্য শৃঙ্গাররস বলিয়া জানিয়াছি। খড়ের চালাঘর যেমন বংশ সমূহের সন্নিবেশে নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ এই নরদেহও পৃষ্ঠদেশস্থ দীর্ঘ-অস্থি এবং পার্শ্ব ও হস্তপদাদির অস্থিসমূহের সন্নিবেশে রচিত হইয়াছে। ইহা চর্ম্ম, রোম ও নখাদিদ্বারা আচ্ছাদিত, ইহা কেবল বিষ্ঠামূত্রাদি দ্বারাই পরিপূর্ণ, এবং ইহার নবদ্বার হইতে ঐ বিষ্ঠা মূত্রাদি অনবরতই ক্ষরিত হইতেছে। হায়, ধিক্ আমাকে! আমা ভিন্ন কোন কামিনী কান্তবুদ্ধিতে এই বিষ্ঠাগৃহের সেবার জন্য লালায়িত হয়?

হায়, হায়! এই মিথিলানগর বিজ্ঞ বিদেহগণের বাসস্থান, এই সুবিশাল নগরে একা আমিই কেবল বিবেকহীনা মূঢ়া! কারণ, এই যিনি নিজের পরমানন্দঘন স্বরূপ দানে কখনও চ্যুত হয়েন না তাঁহাকে ভুলিয়া অসতী আমি তাঁহা হইতে অন্য অতি তুচ্ছ কামভোগ ইচ্ছা করিয়া থাকি।

ইনিই দেহধারী জীবমাত্রেরই অত্যন্ত সুহৃদ্, প্রেষ্ঠতম ও নিরুপাধিপ্রেমাস্পদ অন্তর্যামী পতি। অতএব আমি এইক্ষণ হইতেই তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত নিত্য-রমণ করিব।

শ্রীপিঙ্গলাগীতি উজ্জ্বলরসপ্রার্থী সাধকের প্রাতঃস্মরণীয়া এবং প্রাকৃতশৃঙ্গাররসাসক্তচিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই ইহা মহৌষধিস্বরূপে নিত্য সেবনীয়া। শ্রীপিঙ্গলার মত সাধুকৃপা-লাভের সৌভাগ্য আমাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত হইলেও তাঁহার এই পূর্ণ-নির্ব্বেদময়ী ও ইদংপদনির্দ্দিষ্ট চরম অনুভূতি-পূর্ণা বাণীর আলোচনায় আমাদিগের হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে—চতুরশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক এই পুণ্যভারতভূমিতে দুর্লভতম মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মূঢ়মতি আমিই কেবল প্রাকৃত রসসমূহের লালসায় উন্মত্ত রহিলাম, হায়! আমার দুরদৃষ্টে সাধুকৃপাকণালাভেরও কি একেবারেই সম্ভাবনা নাই? ধিক্ আমাকে!

> মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
> পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

ক্রমশঃ

ধ্বন্যালোক

)

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ।

রূপকাদি অলঙ্কার প্রতীত হইলেও যে স্থানে বাচ্যের ব্যঙ্গ্য প্রতিপাদনমুখে চারুতা প্রকাশিত হয়, তাহা ধ্বনির বিষয়ীভূত নহে। সেইরূপ দীপকাদি অলঙ্কারে উপমা প্রাপ্ত হইলেও ব্যঙ্গ্যপর রূপে চারুতা অভিব্যক্ত না হওয়ায় তাহা ধ্বনি বলিয়া কথিত হয় না। এ বিষয়ে ধ্বন্যালোকের কারিকাটী এই :—

'অলঙ্কারান্তরস্যাপি প্রতীতৌ যত্র ভাসতে।
তৎপরত্বং ন বাচ্যস্য নাসৌ মার্গো ধ্বনের্মতঃ'॥

২।২৮

ইহার উদাহরণ রূপে এই শ্লোকটী উল্লিত আছে :—

'চন্দ্র ময়ূখৈর্নিশা নলিনী কমলৈঃ কুসুমগুচ্ছৈর্লতা
হংসৈঃ শারদ শোভা কাব্যকথা সজ্জনৈঃক্রিয়তে গুর্বী'।

অর্থাৎ চন্দ্রকিরণাদি ব্যতীত নিশা প্রভৃতির পরম সৌন্দর্য্য লাভ হয় না। সাধুগণেরও কাব্যকথায় অনুরাগ বিনা সাধুজনতা প্রকাশ লাভ করে না। চন্দ্র কিরণ দ্বারা নিশার সম্বন্ধে যে ভাস্বরত্ব, সুখসেব্যত্বাদি যাহা কিছু কৃত হয়, কমলসমূহ দ্বারা নলিনীর শোভা, পরিমল, সম্পত্ত প্রভৃতি, কুসুমগুচ্ছ দ্বারা লতায় যে মাধুর্য্য ও মনোহরত্ব প্রভৃতি, হংসগণ দ্বারা শারদীয় শোভার শ্রুতিসুখকরত্ব, যাহা কিছু অভিব্যক্ত হয়, তৎসমুদায় সাধুজনগণকর্ত্তৃক কাব্যকথার সম্বন্ধে কৃত হয় অর্থাৎ সাধুজন দ্বারাই কাব্যরস যথাযথ আদৃত হইয়া জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

ইহাই দীপকালঙ্কার বলে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কথা শব্দে ইহাই বুঝায়, যে কাব্যের কোন কোন সূক্ষ্ম বিষয় দূরে থাক্, সাধুজন বিনা 'কাব্য' এই শব্দটীও নাশ প্রাপ্ত হয়। সেই সাধুগণ বিদ্যমান থাকিলে সুন্দর কাব্যও বিরাজ করে। সাধুগণ দ্বারা কাব্যে নিগূঢ় শব্দ সকল এরূপে বিন্যস্ত হয় যাহাতে উহা সকল লোকের আদরের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপে এখানে দীপকেরই প্রাধান্য কিন্তু উপমার নহে। এই শ্লোকটীতে উপমা থাকিলেও বাচ্যালঙ্কার মুখেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় কিন্তু ব্যঙ্গ্যালঙ্কারমুখে নহে। সেই জন্য বাচ্যালঙ্কার মুখে কাব্য ব্যপদেশ ন্যায়সঙ্গত।

যেখানে কিন্তু ব্যঙ্গপর রূপে বাচ্যের ব্যবস্থান সেখানে ব্যঙ্গমুখে কথনই যুক্তিযুক্ত। যথাঃ—

প্রাপ্ত শ্রীরেষ কস্মাৎ পুনরপি ময়ি তং মন্থখেদং বিদধ্যা
ন্নিদ্রামপ্যস্য পূর্ব্বামনলসমনসো নৈব সংভাবয়ামি।
সেতুং বধ্নাতি ভূয়ঃ কিমিতিচ সকল দ্বীপনাথানুযাত
স্ত্বয্যায়াতে বিতর্কানিতি দধত ইবাভাতি কম্পঃপয়োধেঃ॥

অর্থাৎ ইনি লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, তবে কি কারণ আমাতে সেই পূর্ব্বের মন্থন দুঃখ বিধান করিবেন? সর্ব্বদা উদ্যমশীল ঈদৃশ পুরুষের পূর্ব্বকালের নিদ্রাও সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি না। সকল রাজগণ আনুগত্য স্বীকার করিলেও পুনর্ব্বার কি তিনি সেতুবন্ধন করিবেন? এই রূপ নানা বিকল্প, তুমি আগমন করিলে সমুদ্রের মনে যেন উদিত হইয়া তাহার কম্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গমালা সাধারণতঃ উদ্বেলিত হইয়া উঠে ও তাহার বক্ষে কম্পন দৃষ্ট হয়। সেই কম্পটী সন্দেহালঙ্কার দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে।

কোন অনন্ত সৈন্য পরিবেষ্টিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী নরপতিকে পূর্ণচন্দ্রোদয় কালে দর্শন করিয়া সমুদ্রের ভয়ে কম্প উপজাত হইয়াছিল। সন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষার সংকর বা মিশ্রণ হেতু সঙ্করালঙ্কার বাচ্য ও তদ্দ্বারা সেই নৃপতির বাসুদেবরূপতা ধ্বনিত হইতেছে। এখানে ব্যতিরেকালঙ্কার প্রতিভাত হইতেছে কারণ সেই পূর্ব্ব বাসুদেব স্বরূপটী আধুনিক নহে। উহা অতন হওয়ায় ভগবানও যে শ্রীলাভ করিয়াছেন তাহা আলস্য দ্বারা' নহে কিন্তু সকল দ্বীপাধিপতি বিজয় দ্বারাই।

এখানে যে সন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষার অনুপপত্তি হেতুই

রূপকালঙ্কার আক্ষিপ্ত হইতেছে তাহাও নহে কারণ যে যে অকপট জয়লাভ বাসনা দ্বারা আক্রান্তচিত্ত হইয়া শ্রী লাভ করিয়াছে, সেই সেই জন আমাকে মন্থন করিবে, এই রূপকধ্বনি স্পষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শব্দব্যাপার বিনা এই শ্লোকে অর্থ সৌন্দর্য্য বলে রূপকালঙ্কার উপলব্ধ হয় না বলিয়া রূপকধ্বনিই সিদ্ধ হইতেছে।

শব্দ শক্তিদ্বারা যে কাব্যে সাক্ষাৎ ভাবে বাচ্য অলঙ্কার ও দুইটী বস্তু ও তদর্থ প্রতিভাত হয়, উহা শ্লেষের বিষয় কিন্তু যেখানে শব্দশক্তি দ্বারা অলঙ্কার প্রকাশিত হয়, কিন্তু বস্তুমাত্র প্রকাশিত হয় না, তাহাই শব্দশক্তি হইতে উত্থিত ধ্বনির বিষয়।

শ্লেষের উদাহরণ ; যথা—

'যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরাঽস্ত্রীকৃতো
যশ্চোদ্বৃত্ত ভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোঽধারয়ৎ।
যস্যাহুঃ শশিমচ্ছিরোহর ইতি স্তুত্যং চ নামামরাঃ
পায়াৎ স স্বয়মন্ধকক্ষয়করস্ত্বাং সর্ব্বদোমাধবঃ'॥

এই শ্লোকটী শ্লিষ্টশব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ও শ্রীশিবপক্ষে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে :—যে অজাত বা নিত্য সনাতন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা বাল্যক্রীড়াকালে দৈত্যশ্রেষ্ঠ বলিজয়ী ভীমকায় বিশিষ্ট শকটাসুর নিহত হইয়াছিল, যিনি অমৃত হরণকালে মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি গর্ব্বিত কালিয়া নাগকে দমন করিয়াছিলেন, যিনি শব্দে লীন হইয়া আছেন, (রবলয়—রবে=শব্দে লয়ো যস্য, 'অকারো বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতিঃ—লোচন ব্যাখ্যা), যিনি অগ বা শ্রীগিরিরাজ ও গা বা পাতালগত ভূমি ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম ঋষিগণ স্তুতি করিয়া রাহুর শিরশ্ছেদক বলিয়া থাকেন—(শশিনং মথ্নাতি কিপ্—রাহুঃ। তস্য মূর্দ্ধাপহারকঃ) সেই ভক্তিমুক্তি প্রভৃতি অশেষ অভীষ্ট ফলদাতা বিষ্ণু, যিনি অন্ধকদেশবাসীগণের মধ্যে দ্বারকায় (ক্ষয়ো=নিবাসঃ) বাস করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে রক্ষা করুন্।

'অন্ধকক্ষয়কর' এই শব্দটীর অন্যার্থও হইতে পারে, যথা মৌষলে ঐষীকাভিস্তেষাং ক্ষয়োবিনাশো যেন কৃতঃ অর্থাৎ যিনি অন্ধকবাসীগণকে মুষলে কাশতৃণ সমূহ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীশিবপক্ষে :—যে নিত্য স্মরহর মহাদেব ত্রিপুরাসুর দহনকালে বিষ্ণুর শরীরে শর ঘাত দান করিয়াছিলেন, মদাবিষ্ট ভুজঙ্গসমূহই যাঁহার হার ও বলয়স্থানীয়, যিনি মন্দাকিনীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, ঋষিরা যাঁহাকে স্তুতি করিয়া চন্দ্রমৌলি ও হর, এইনামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যে ভগবান্ স্বয়ংই অন্ধকাসুরের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, সেই উমাধব বা উমাপতি সর্ব্বদা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এখানে দ্বিতীয় বস্তু মাত্রই প্রতীত হইতেছে কিন্তু অলঙ্কার নহে, এই জন্য ইহা শ্লেষের বিষয়। ইহাই শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

এখানে 'ধ্বস্তমনোভবেন' শিবপক্ষে 'ধ্বস্ত ও মনোভব' এই দুইটী শব্দ দ্বারা ও হরিপক্ষে ধ্বস্তং, অনঃ (শকটং) অভব, এই তিনটী শব্দের সন্ধিবশতঃ এক প্রকার পদ উৎপন্ন হইয়া দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিতেছে, সেই জন্য ইহা সভঙ্গ-শ্লেষ।

'অন্ধকক্ষয়ঃ' ইত্যাদি স্থলে উভয় পক্ষেই অন্ধক শব্দ সমান, সুতরাং এখানে অভঙ্গ শ্লেষ হইয়াছে। এই দ্বিবিধ শ্লেষের একবাক্যে সন্নিবেশ হওয়ায় এই শ্লোকটী সভঙ্গ অভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ স্থানীয়। ধ্বনির বিষয়টী শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত প্রণীত 'রসগঙ্গাধর' নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দ্বারা দেখান যাইতে পারে। যথা :—

'স্মৃতাঽপি তরুণাতপং করুণয়া হরন্তী নৃণা
মভঙ্গুরতনুত্বিষাং বলয়িতা শতৈর্বিদ্যুতাম্।
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটসুরদ্রুমাবলম্বিনী
মদীয় মতিচুম্বিনী ভবতু কাঽপি কাদম্বিনী'।

অর্থাৎ যাহা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াও মানবসকলের প্রখর সংসার তাপ করুণাপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, যাহা অবিনশ্বর তনুকান্তিশালিনী শত শত অচলা চপলার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও যাহা শ্রীকালিন্দীতীরবর্ত্তী কদম্বতলাশ্রয় পূর্ব্বক বিরাজিত, এইরূপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক মেঘ আমার বুদ্ধিকে চুম্বন করুক্। ইহাই শ্লোকটীর সরলার্থ।

ব্যঙ্গার্থটী পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ নাগেশ ভট্ট তদীয় 'গুরুমর্ম্মপ্রকাশ' টীকায় যেরূপ অপূর্ব্ব কাব্যকলা-কৌশল

সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই ভাবচ্ছায়াবলম্বনে এখানে উল্লিখিত হইল।

অভীষ্ট বস্তুর প্রতিবন্ধকরূপ অমঙ্গল নিবারণার্থ শৃঙ্গার রসের আলম্বন বিভাব ও তাহার দেবতা রূপে স্বীয় ইষ্ট দেবতাত্মক বস্তু নির্দ্দেশরূপ সমুচিত মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য এবং শিষ্য শিক্ষার্থ ও ব্যাখ্যাকার ও শ্রোতার মঙ্গলের জন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় গ্রন্থারম্ভে এইরূপ শ্লোক প্রকাশ করিতেছেন।

কাদম্বিনী বা মেঘপঙ্‌ক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই নিরূপিত হইতেছেন। তিনি বিলক্ষণ শ্যামবর্ণ ও মেঘমালা হইতে কার্য্যকরী বলিয়া মেঘরূপে এখানে অধ্যাস বা যাহার যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে তাহার আরোপ হয় নাই।

'কাপি' শব্দে মেঘের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে থাকিলেও তাহা হইতেও অধিক ফলদায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধা কাদম্বিনী হইতে ব্যতিরেক বোধিত হইতেছে। সেইরূপ 'মেঘ মতির বিষয়ীভূত হউক' প্রার্থনায় লোট্ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্লোকটীতে তিনটী বিশেষণ ব্যতিরেকের পোষক। প্রসিদ্ধ লৌকিক মেঘ দৃষ্ট বা বর্ষণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সূর্য্য সন্তাপ ভিন্ন অন্য সময়ের তাপ কোন ব্যক্তি বিশেষের হরণ করিয়াছে কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে তিনকালে সকলের তাপ হরণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত মাধুর্য্য কাদম্বিনী রূপ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে স্মৃত হইলেই সকল লোকের প্রখর তাপ করুণা পূর্ব্বক নিঃশেষে হরণ করিতেছেন—হরণ করিয়াছেন বা করিবেন নহে। ইহাই বর্ত্তমান ক্রিয়া পদ প্রয়োগের সার্থকতা। স্মৃত হইলেই যখন এইরূপ ঘটিয়া থাকে, দৃষ্ট হইলে যে ঐরূপ করেন তাহা বলাই বাহুল্য। আরও দেখা যায়, সেই প্রাকৃত মেঘ ক্ষণভঙ্গুর তনুকান্তি বিশিষ্ট ক্ষণপ্রভা দ্বারা বেষ্টিত কিন্তু এই অপ্রাকৃত শ্যামঘন চিরকাল স্থায়ি শরীরকান্তি বিশিষ্ট তড়িল্লতা সদৃশী শত শত গোপাঙ্গনাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে বিজড়িত। 'সুরদ্রুম' শব্দে সাধারণতঃ কল্পবৃক্ষ বুঝায় কিন্তু এখানে নীপতরুই বুঝাইবে কারণ কদম্বতলই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বিহার স্থল। শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় 'মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে' ইত্যাদি। কাদম্বিনী শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। উহা দ্বারা কদম্ব কেশরের মত বর্ণ বিশিষ্টা শ্রীরাধাও অভিহিত হইতে পারেন ও বিদ্যুৎরূপে তদীয় পরিচারিকা ব্রজদেবীগণই বুঝায়। এইরূপে এখানে ব্যতিরেক, রূপক অতিশয়োক্তির অঙ্গাঙ্গিভাবে সঙ্কর অলঙ্কার প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ ধ্বনির শ্রেষ্ঠ ও অপূর্ব্ব উদাহরণ রসশাস্ত্রে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

যাঁহারা ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধ্বন্যালোক ও তাহার ব্যাখ্যা লোচন, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, মম্মটাচার্য্যের কাব্যপ্রকাশ ও নাগোজী ভট্টকৃত 'প্রদীপোদ্দ্যোত' 'রসগঙ্গাধর' ও সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি রসশাস্ত্র দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার কৌস্তভে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী রস-ধ্বনিই কাব্যের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামি মহোদয়ের নাটকাদি ধ্বনি ও অনু-ধ্বনিতে সমলঙ্কৃত। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলারস যথাযথ আস্বাদন করিতে হইলে ধ্বনি তত্ত্বের অন্ততঃ সামান্য জ্ঞানও প্রয়োজনীয়। এই মর্ম্মেই বোধ হয় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

'রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার।
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার'।

অন্ত্যঃ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দশম দশা

(কবিতা)

শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ

শ্রীরাধা সুন্দরী বসিয়াছিলেন
শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় ;
বর-মালাটিরে 'জপ মালা' করি'
"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" জপি' তায়।
সখীগণ সব আছিলেন রত
বাসর সাজার কাযে ;—
শ্রীরাধাই শুধু ভাবনা তাদের
সতত হিয়ার মাঝে।

প্রতি কিছু শব্দে ভাবি' পদ শব্দ,
শ্রীরাই আসন 'পরে ;
কহিতেছিলেন, "আসিল কী সখি,
নাগর আমার ঘরে ?"
তখনি আবার ভরম ভাঙিয়া
দিতেছিলা কেহ বলি' ;—
"নয়, নয়, রাই ! বায়ুর ঝাপট
গেল গাছ দিয়া চলি'।"
অথবা, "তখনি বিশাখা উঠিয়া
গিয়াছিলা ওইখানে ;
ফিরিলা এখনি পদশব্দ তার
শুনিলা বুঝিবা কানে।"
কখন বা "কই ? কিছু নাই, তুমি
পাইলা কেমনে শব্দ ?"
কেহ কয় হাসি', "ভালবাসি', শ্যামে
আপনি হইলে জব্দ।"
* খণ্ড মেঘ যদি ঢাকিল বিভা, সে
ভাবিল 'আসিছে কালা' ;
কিম্বা যদি আলো প্রকাশি' উঠিল
ভাবে 'কালা-রূপ-আলা'।

ভ্রমর যদি বা মধু আশে কভু
বসিল গাহিয়া গাছে।
শ্রীরাই ভাবিলা, "শ্রীশ্যামের বাঁশী
বাজিছে কোথায় কাছে।"
সখীগণ মনে প্রবোধিলা কত
"মান কিছুক্ষণ মন ;
এখনি আসিবে হেথা শ্যামচাঁদ
বিদ্যুতে মিলিবে ঘন।
বিনোদিনী পাশে হেরি' কেলেসোনা
কতই করিব নৃত্য ;
আনন্দ-পাথার উথলি' উঠিবে
উল্লাসে ভরিবে চিত্ত।"

এমনি ভাবেতে গেল কতক্ষণ
সখীরা করমরতা।
কোন কিছু আর শুনা নাহি যায়
বন্ধ শ্রীরাধার কথা।
কোন সখী ভাবে, "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বুঝি'
ধরেছে রাইএর গলা,—
তাই বুঝি নাহি বাহিরয় কথা ;
—কৃষ্ণে প্রীতি কী অচলা !
আর কেহ ভাবে মনে মনে জপে
শুনিতে পাবে কে বলি'।
কেহ ভাবে, আর বলাবলি নাই,
ভাবিতেছে গলাগলি।
নমি নরলীলা ! প্রণমি মানুষ !
তুমি গো কতই বড় !
জগতের প্রভু লীলাছলে আসি'
উজলিলা যার ঘর।

একজন গোপী রাধা-পাশে গিয়া
হইয়া গেলেন স্তব্ধ ;
মড়াটির মতো পড়ি' আছে রাই
বদনে নাহিক শব্দ।
সাধের সে হার পড়ি' আছে দূরে
অঙ্গুলি জপিছে নাহি ;
কহিলা, "শ্রীরাধে ! ফেলি' দেছ' মালা?"
রাই দেখিল না চাহি'।
কাছে আসি' দেখে অনুভব করি'
বহেনাক' তার শ্বাস
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি উঠিলা গোপিকা,
"হ'য়ে গেছে সর্ব্বনাশ !
আয়, আয়, তোরা, কে আছিস্ কোথা
রাধা বুঝি আর নাই।
এই নাকি তার কপালে আছিল?
কী হ'ল ! কী হ'ল, হায় !"

অম্‌নি সখীরা যে যেখানে ছিল
ছুটিয়া আসিল কাছে।
কেহ কয়, "আর নাই রাই ;" কেহ
কহিল, "এখনো আছে।"
বলে কেহ, "হায়, নিস্পন্দ শরীর
হাতে নাহি নাড়ী পাই।"
অন্য কেহ কাঁদে, "অত্যল্প বয়সে
চলি' গেলে ছাড়ি' রাই?"
কেহ কহে, "তার স্বর্ণতুল্য কান্তি
হইয়া গিয়াছে কাল ;
সর্ব্ব অঙ্গখানি হয়েছে বিকৃত,
মরণেও যেন ভাল।"
আর জন কাঁদে, কোথা গেলে রাই
অকূলে ফেলিয়া মোরে?
এই কী কপালে লিখিলি রাধার
নিঠুর মরণ ওরে !
রাধার অভাবে যাইব কোথায়?
কেমনে দেখা'ব মুখ?

এই হ'ল শেষে অকালে যে রাধে,
ভেঙে দিলে মোর বুক।
তুমি ছিলে তাই, ছিলাম বাঁচিয়া
আমার ত কেহ নাই।
চির কাঙ্গালিনী তোমার কৃপায়
পাইনু এ ব্রজে ঠাঁই।"

এক গোপী কন্, "ঠাকুদ্দার কাছে
মন্ত্র শিখেছিল দাদা ;
থাকিলে এখনি সে মন্ত্রের বলে
বাঁচিতে পারিত রাধা।
ব্রজেন্দ্রের না কি কাজ ছিলনাকো'
দ্রাবিড়ে পাঠা'ল তাঁরে !
কোথায় দ্রাবিড় কোথায় গোকুল
রাধাতো জীয়া'বে নারে।
ক্রোধে কোন গোপী কহিলা "এবার
দেখা পাই, কেলেসোনা,
ঘুচাব তোমার সকল ভাঁড়ামি
ঘাটে মাঠে আনা গোনা।
এত দিন খুব করেছি খাতির
নন্দ-মহারাজে চেয়ে।
মোদের শ্রীরাধা যে সে জন নহে,
বৃষভানুরাজ-মেয়ে।
"তুমি, তুমি" করি' মরে গেল রাধা
দেখিলে না চোখ চাহি' ;
তোমার ব্যারামে কী করিল রাই
কিছুও কী মনে নাহি?
হায়রে ধরায় এমন পুরুষ
জল ঢালো তার মুখে।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'রে মরে গেল রাই ;
মরিলাম সেই দুখে।"
কহে আর জন, "ছি ছি ব্রজগোপী,"
রাধারে চিনিলি নারে
অমঙ্গল কথা মরণের কথা
কেন কহ বারে বারে?

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ চন্দ্র ছিল
শুধু গোলোকের ধন।
শ্রীরাধার প্রেমে নরলীলা-ক্রমে
পবিত্রিলা বৃন্দাবন।
রাধা ও কালার স্বকীয়া প্রকৃতি
ভাসে কৃষ্ণ-প্রেম-নীরে।
জনমে মরণে রহি' ধরা-জীবে
তাহার বুঝিবে কী রে ?"
এক গোপী কয়, "দেখিয়াছি রাই
শ্যামনামে ওঠে, বসে,
'শ্যাম' 'শ্যাম' ব'লে হাসে, কাঁদে, নাচে,
ডুবিয়া আপন রসে।"
অন্য জন বলে, "হাঁ, হাঁ, দেখি বটে
কোন কিছু হ'লে বাধা
শ্রীকৃষ্ণের নাম ঔষধ তাহার;
কৃষ্ণের কেবল রাধা।
এস সব সখী মিলি' একবার
গাহি 'রাধাশ্যাম' জয়।
তা হ'লে হয় ত বাঁচিবে শ্রীরাধা
অন্য আর কিছু নয়।"

আর জন তাহে কহিলা কাঁদিয়া
"এমন কী ভাগ্য আছে ?
আবার আমরা পাইব রাধায়
মরিলে মানুষ বাঁচে ?"
তখনি কহিলা আর জন সখী,
"শ্রীরাই মানুষ নহে।
কেন ভুলে যাও ? জীবেতে ঈশ্বরে
কত যে প্রভেদ রহে !
ভগবানে নাই দেহ-দেহী ভেদ
ঈশ্বরে সম্ভব সব।
কৃষ্ণ ভগবান্, শ্রীরাধা ঈশ্বরী,
কা বা জানি তার, ক'ব।
মানুষী হইয়া ঈশ্বরী শ্রীরাই
ধন্য পুণ্য ব্রজধাম।
বিলম্ব ক'রোনা জীয়াতে রাধায়
গাহ 'রাধাশ্যাম' নাম।"
তার পর যত সখীগণ মিলি'
গাহে 'রাধাশ্যাম নাম'।
শ্রীরাধা উঠিয়া পুছিলা, "সখি রে !
এসেছে কী মোর শ্যাম ?"

দীক্ষার কথা

(প্রোফেসর সাহা)

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু আমাদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি যে শ্রীহরিনামেই সর্ব্বসিদ্ধি, দীক্ষাগ্রহণের কোনো আবশ্যকতা নাই, এই প্রকার অশ্রদ্ধেয় মত প্রচার করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও ও ক্ষুব্ধ হইলাম। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকায় এই দুর্মতের ভ্রম প্রদর্শন করা হইতেছে, আমাদের আনন্দের বিষয়। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত এবং ভক্তবৈষ্ণবগণের মুহূর্ত্তের ফুৎকারে রাধাগোবিন্দবাবুর এই বিভ্রান্তবিচারবুদ্বুদ শূন্য আকাশে মিলাইয়া যাইবে, এবিষয়ে ভাবিবার বিশেষ কিছু নাই।

সত্য, তত্ত্ব, শাস্ত্র, শতলক্ষ মহদনুভব, যুগযুগান্তরাগত আম্নায়প্রবাহ, সুপ্রতিষ্ঠিত সার্ব্বজনীন বিশ্বাস এবং লক্ষ লক্ষ সাধক সজ্জনগণের গৃহীত ব্যবহারপদ্ধতির বিরুদ্ধে একজন শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া একটা যা-তা কথা লিখিয়া বসিলেন, আর অমনি শত শত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং অনিষ্টভাজন হইলেন এবম্প্রকার কোনো আশঙ্কা আমাদের নাই। রাধাগোবিন্দবাবুর মত একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি একটা ভ্রমাত্মক মত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া নিজের খ্যাতির গুরুতর ক্ষতি করিলেন এবং খানিক

সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইলেন, ইহাই আমাদের মর্মান্তিক দুঃখ। কারণ আমরা রাধাগোবিন্দবাবুকে ভালবাসি এবং ভক্তি করি।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ তথাকথিত বিজ্ঞানবুদ্ধিবাদিগণের অনেক কঠিন এবং কুৎসিত কুসংস্কার আছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে একটী প্রধান কুসংস্কার এই— দীক্ষা জিনিষটা নির্ব্বোধজনগণের জন্য। গুরু আবার কি? আমিও যে মানুষ গুরুও সে মানুষ। তার বুদ্ধিটা বড়, আমার বুদ্ধিটা কিছু না, ইহা মনে করিবার কি সন্তোষজনক হেতু আছে? ধর্ম্মসাধনা আমার নিজের স্বাধীনচেষ্টার উপর নির্ভর করে। অন্যে কি আমারে ধর্ম্ম গিলাইয়া দিবে?—ইত্যাদি একটী অসচ্চিন্তাধারা বি, এ, এম, এ উপাধিধারিগণের মনোভূমির উপর দিয়া এখনো অবাধে প্রবাহিয়া যাইতেছে। রাধাগোবিন্দবাবু সে শ্রেণীর লোক নন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুললিত-উপাধি ললাম-ললাটে ধারণ করিয়া যাঁহারা বাহির হন, তাহাদের প্রায় সকলেরই ঐ প্রকার উন্মার্গগামিনী বুদ্ধি থাকে। রাধাগোবিন্দবাবুর সর্ব্বপ্রকার সাধন ভজন সদাচার এবং শাস্ত্রাধ্যয়ণের কোনো গোপন তলে উক্ত কুসংস্কারের একটা চারা বাঁচিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা আশাকরি ওঁর বহুশাস্ত্রবিত্তাশস্ত্রের কোনো একখানিতে এই বিষাক্ত কণ্টকবৃক্ষটী অচিরাৎ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

শাস্ত্রবিচারাদি সমালোচনার কোনো অনধিকার চর্চ্চা করিব না। একটী দুটি সাদাসিধা সাধারণ বুদ্ধির কথা এখানে বলিব। দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি—দীক্ষা অনাবশ্যক এই দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া। তারপর অনেক দিন গিয়াছে দীক্ষা আবশ্যক কি না, এই সংশয় লইয়া। কলেজের অধ্যাপকগণের কাছে নানাপ্রকার শুনিয়াছি— দীক্ষা ফিক্ষা বাজে লোকের জন্য, বুদ্ধিমানের জন্য নয়। সে কথাটা কখনো অবিচারে মানিয়া লই নাই। ভারতবর্ষের সাধুসজ্জনগণের মুখে দীক্ষার উপকারিতা এবং শক্তি মহিমাদির কথা শুনিলে মনে করিতাম—ওটা এদেশের চিন্তাপদ্ধতি অর্থাৎ tradition; বাইবেল পড়িতে পড়িতে একদিন পাইলাম—স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট মহাপুরুষগণের নিকট জর্দ্দননদীর তীরে দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। ভাবিলাম এখানে তো ভারতের প্রচলিত রীতি নাই। এখানেও সেই দীক্ষা! আর সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার (এবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই) যীশু এই দীক্ষা ভিক্ষা করিতেছেন। দীক্ষার বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার আমার ছিল, তাহাতে প্রথম ধাক্কা লাগিল এইখানে। দৈবক্রমে ইহার অল্পদিন পরেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদীশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের বিবরণও পাঠ করিলাম; আমার কুসংস্কারের আগাগোড়া পড়িয়া কাঁপিয়া উঠিল, পড়িল না, একেবারে শিথিল হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও দীক্ষা! অবশ্য ইহা জগৎশিক্ষায়; শ্রীমহাপ্রভু যে পরম প্রেমাবতার এ ধারণা তখন মোটামুটি হইয়াছে। তারপরে যখন যে সাধুর কাছে বসিয়াছি, যাঁহারি উপদেশ শুনিয়াছি, তাঁহারি মুখে শুনিয়াছি—দীক্ষা চাইই। দীক্ষা না হইলে কিছুই হইবে না।

যখন যে গ্রন্থই খুলিয়াছি, তাহাতেই পাইয়াছি—শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য, শ্রীগুরুর কৃপাশক্তি। সংসারসাগর পার হইবার অন্য উপায় নাই। অজ্ঞানতিমিরান্ধ-নয়নে দিব্য জ্ঞানালোক ফুটাইতে একমাত্র গুরুই সমর্থ। পরব্রহ্মপদ প্রদর্শন করাইবার শক্তি একমাত্র গুরুর। কোন্ স্মরণাতীত যুগে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ এই সত্য দর্শন করাইয়াছিলেন।—

> তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
> সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
> তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
> প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
> যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং
> প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।
>
> মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ১।২।১৩

দ্বারকাধামে শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীসুদামবিপ্রকে, ব্রহ্মবিত্তম প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে, শ্রীগুরুর বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা ত সূর্য্যালোকবৎ প্রস্ফুটোজ্জল;—

> নস্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ।
> যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাম্ তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।

ভাঃ। ১০।৮০।৩৩-৩৪

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন, ইহ মনুষ্যজন্মনি তত্রাপি বর্ণাশ্রমবত্ত্বে সতি যে ময়া গুরুণা গুরুরূপেণ বক্তৃ।বাচা উপদেশমাত্রেণ অঞ্জঃ সুখেনৈব ভবার্ণবং তরন্তি ইতি জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। এসব কথা এবং এইরূপ শত শত কথা সম্পাদক মহাশয় হয় ত শত শত বার পাঠ করিয়াছেন। তবু কেন যে তিনি এই প্রকার ভ্রান্তিপথে চলিয়াছেন—তাহা শ্রীগুরুদেব ভিন্ন কেহই জানেন না। গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত কেহ পরমপদ প্রাপ্তি দূরের কথা, কোনো প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহার উদাহরণও সুদুর্লভ। গুরুমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, গুরুপদ সেবন করেন নাই, অথচ কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর, সংসারের কোনো বন্ধন নাই, এমন যদি কেহ থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক বার গুরুপদরজোঽভিষেক লাভ করিয়াছেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", গুরুকৃষ্ণ একবস্তু এই তত্ত্ববিজ্ঞান গুরুকৃপাবলে বহুবার লাভ করিয়াছেন। তাই এ জন্মে আর গুরুর অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। নতুবা তুমি ধ্রুবই হও আর প্রহ্লাদই হও, ব্যাসই হও, শুকই হও, আর সূতই হও, গুরুপদপল্লব ব্যতীত ভবসিন্ধু তরিতে পারিবে না। গুরুপদাশ্রয় যাহারা পাইয়াছেন তাদের পক্ষে "ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং। পরং পদং যৎ বিপদাম্ ন তেষাম্।"

মনুষ্য মাত্রের সংসারবন্ধনের মূল, দুঃখজন্মজরামরণাদির একমাত্র কারণ, দুরন্ত (অহং বুদ্ধি) ভাগবতের ভাষায় "মমহংকরণাত্মবন্ধনম্"। এই বন্ধন ছিন্ন করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই অহমিকাসুরকে বধ করিবার জন্য তুমি যত উপায়ই অবলম্বন কর না কেন, দেখিবে কেমন করিয়া কোন ছলে এই মায়াবী অসুর সেই উপায়কে অবলম্বন করিয়াই কোন্ কৌশলে তোমার অন্তরের মাঝখানে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে। "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ" ইহা যে মানুষের ঘটে তাহা অহমিকার প্রবঞ্চনায়। তুমি তোমার ছায়াকে যেমন অতিক্রম করিতে পার না, তেমনি তোমার আত্মস্বরূপবৎ প্রতীয়মানা অহংবুদ্ধিকেও অতিক্রম করিতে পার না। তবে কি এই রজস্তমোময় অহঙ্কারবন্ধন ছেদনের কোনোই উপায় নাই? একমাত্র উপায় আছে, শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণ। অহংবুদ্ধির পরিহারপ্রচেষ্টাই ধর্ম্মসাধন। গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত ইহার আরম্ভই হইতে পারে না। গুরু কে? গুরু ভগবানই। তবে ভগবানেরই আশ্রয় লইব, গুরুর আবশ্যক কি? ভগবান্কে তুমি পাচ্ছ কোথায়? "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" গুরুকে ছাড়িয়া দিলে ভগবদাশ্রয় একটা কথার কথা হইয়া পড়ে—আকাশে সৌধনির্ম্মাণের মত। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্। তোমার বন্ধুটীকে যেমন করিয়া তুমি ধর, এই 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম'কে তেমন করিয়া ধরা কি সম্ভব?

কিন্তু এই "অদ্বৈতমচিন্ত্যমনন্তমনাদিরূপম্" ব্রহ্মবস্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন অনাদিকাল হইতে। তোমাকে চোখে চোখে রাখিতেছেন। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, তোমার সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য, তোমাকে ভালবাসিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল। পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যেরূপে তোমার প্রেমে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন, সেই রূপই গুরুরূপ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং "সেই পদ" যাঁহার তিনি ভিন্ন সেই পদ কে দেখাইতে পারে? সেই গুরুবস্তুকে কেমন করিয়া চিনিয়া লইব? তাঁহাকে চক্ষু বুজিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। চাই বিশ্বাস-বল চাই, চিত্তের একাগ্রতা, চাই আত্মসমর্পণের আগ্রহ। এই মানস-সম্পদ লইয়া তুমি যাঁহার আশ্রয় লইবে, যাঁহার চরণে চিরকালের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিবে, ভালমন্দ, সদসৎ, পণ্ডিতমূর্খ, বিচার করিবে না। কেবল বলিবে যে, তুমি যেই হও, তুমিই আমার ঠাকুর, তুমিই আমার প্রভু, আমার স্বামী, আমার সকল কল্যাণ তোমারই চরণে। আমার জীবনমরণের অধীশ্বর তুমি, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার হইলাম। এইভাবে তুমি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তিনিই তোমার গুরু হইবেন। অর্থাৎ তাঁহারই ভিতর তৎক্ষণাৎ তোমার অনন্তকালের বান্ধব শ্রীগুরুদেব প্রকাশিত হইবেন। তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই আছেন।

যে কোনো মানবরূপ সাধকের কাছে তুমি আত্মনিবেদন কর, সেই আধারেই তিনি আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু যিনি তোমার গুরু হইলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির আধারে শ্রীগুরু অভিব্যক্ত হইয়া তোমার সম্বন্ধে প্রকাশিত হইলেন, তাঁহার প্রতি তোমার যদি কখনো অবজ্ঞা-বুদ্ধির উদয় হয়, যদি মনের সামান্যানুরোধে তাঁহার প্রতি তোমার অনাদর-মতি হয়, তবে তোমার অপরাধের সীমা থাকিবে না। তোমার জীবন অধঃপাতে যাইবে। তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে—তোমার গুরু-দৈবতাত্মত্বের কখনো কোনো হানি না হয়। তাই স্বয়ং শ্রীভগবানই তোমাকে শিখাইতেছেন—

আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ
নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত
সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। (ভাঃ। ১১।১৭।২৭)

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা দীক্ষা গ্রহণ না করি, ততদিন পর্য্যন্ত গুরুদেব অনভিব্যক্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে অনুক্ষণ বিদ্যমান থাকেন। দীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যই অকৃত থাকে। পারমার্থিক জীবনের আরম্ভ হয় না। পরমেশ্বরের সঙ্গে অর্থাৎ অনন্ত অমৃত বস্তুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধই স্থাপিত হয় না। মর্ত্ত্যজীবনে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা নিয়ত মৃত্যুর অধিকারেই বাস করিয়া থাকি। দীক্ষা গ্রহণের পরক্ষণ হইতে আমরা অমৃতপথের পথিক হই। গুরুই আমার অমৃতত্বদানের ঈশ্বর। শ্রুতি যে বার বার করিয়া জানাইতেছেন—"প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি", তাহা গুরুর কৃপাশক্তির প্রভাবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। যিনি আমার গুরু, তিনি বহির্ব্বিচারে অতি অকর্ম্মণ্য লোক হইলেও আমার পক্ষে পরমজ্ঞানময়, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ; তাঁহাকে আমি চিন্তা করি—

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজম্।
বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপম্।

এইরূপে। তিনি যদি যবনী-মদিরাদিরও সেবা করেন তথাপি তিনি আমার পক্ষে নিত্যানন্দ জ্যোতিঃ স্বরূপ। বিশুদ্ধচিত্ত নির্ম্মলান্তঃকরণে ঐকান্তিক আগ্রহে দীক্ষাগ্রহণ করিলে, তন্মুহূর্ত্ত হইতেই জ্ঞান হইবে—আমার গুরুই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ। জন্মজন্মান্তরে ইনিই আমার প্রভু ছিলেন। গুরুর গুণ-দোষের সমালোচনা অসম্ভব হইবে। গুরুর প্রতি অহেতুক অনুরাগ অনুভূত হইবে। দীক্ষার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল গুরুর অনুসন্ধান, ভবিষ্যদ্-গুরুর দোষগুণের বিচার বিবেচনা চলিতে থাকিবে। দীক্ষা হইল—তৎক্ষণাৎ এই সমস্তের অবসান হইল। তখন কেবল শ্রদ্ধাভক্তি প্রেমসেবা আনুগত্য। ইহার ব্যভিচার যেখানে সেইখানেই পতন; এই যে দীক্ষা এই দীক্ষার আবশ্যকতা নাই ইহা যিনি প্রচার করিবেন, তাঁহার মানসিক-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ হইবে। অথবা বুঝিব তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানালোকিত বুদ্ধির কোনো বিকৃতি ঘটিয়াছে।

অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ যতই জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন করুন না কেন, তাঁহাদের বিদ্যায় কখনও বিজ্ঞানবিধিসামঞ্জস্যময়-ঐক্যসংস্থান হইবে না। তাঁহাদের সকল বিদ্যা ছিন্ন ভিন্ন বিশৃঙ্খলভাবে লক্ষ্যহীন কল্পনার আকাশে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইবে। ঘনিষ্ঠহেতুপরম্পরাযুক্ত সুসঙ্গত অধ্যাত্ম-সেতুশৃঙ্খলা কখনো গড়িয়া উঠিবে না। অন্তর্জ্জীবনে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধবতী "সূত্রে মনিগণাইব" একথা কখনো সম্ভব হইবে না। তাহাদের জ্ঞান কখনো বিজ্ঞানে পরিণত হইবে না। তাহারা মনের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অধ্যবসায়শালিনী বুদ্ধির সীমায়ও স্থিতিলাভ করিতে পারিবে না। সংকল্পবিকল্পের ভাঙ্গাগড়া তাহাদের জীবনে কখনো শেষ হইবে না। সুখের মরীচিকা পার হইয়া আনন্দের আলোকোদ্ভাসিত অমৃত-তরঙ্গিণীর তীরে তাহারা কখনো পৌঁছিতে পারিবে না। "স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" সেই যে প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ মনোরম কুসুমিত কুঞ্জকানন রাজ্য চিরদিনই তাহাদের অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবে। চিরদিনই তাহারা অহঙ্কার-ময় তমোবুদ্ধির অজস্র কল্পনাজালাবরণে অবরুদ্ধ থাকিবে। এই সব কথা বহুদিন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া লিখিলাম, কেহ অস্বীকার করিলে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইব না।

মানব মাত্রের পক্ষে দীক্ষা আবশ্যক—একান্ত আব-

শুক। দীক্ষা প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি। বিজ্ঞানসঞ্জীবনী আশ্চর্য্য সামর্থ্যময়ী শক্তি। কবিতার ভাষায়—

সঙ্গীতে পুরি দিল শৃঙ্খলাহীন মোরে
সুন্দর করি সব সঙ্গতিমান্।

*   *   *

ছিন্ন জীবনে নব গ্রন্থি
পুনঃ যে নিপুণ করে রচনা করিয়া দিল
কে সে সুকুমার কবিশঙ্গী?

তিনি দীক্ষাদাতা গুরু। গুরুমন্ত্রেদীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত বিচ্ছিন্ন জীবনকে সুসঙ্গত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার আর অন্য উপায় নাই। ইহা ধ্রুব সত্য। দীক্ষা অনাবশ্যক—এই বোধ নিদারুণ কুসংস্কার। এই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে শত শত অগণিত গুণযুক্ত যুবকজীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—অনুক্ষণ দেখিতেছি। শাস্ত্রবিদ্ সদাচারসম্পন্ন কোন ব্যক্তি এই দুরন্ত দুর্ম্মতির সমর্থন করিতেছেন দেখিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি-গণের পরিতাপের আর সীমা থাকে না।

শ্রীগোষ্ঠ লীলা

(শ্রীরাধিকা মোহন সাহা ভক্তিভূষণ লিখিত)

পদাবলী লেখক মহাজনগণ শ্রীভগবানের ব্রজলীলা সম্বন্ধে অনেক শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন এবং তদনুসারে পদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে গোষ্ঠলীলা একতম শ্রেণী। বর্ত্তমান সময়ে লীলা-গায়কগণ যে সকল পালা গান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে গোষ্ঠলীলার পালা সুপ্রসিদ্ধ। পদকল্পতরু ও পদসমুদ্রে গোষ্ঠলীলার অনেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পদ হইতে পদাবলীগায়কগণ কতিপয় পদ সংগ্রহ করিয়া এক একটী বিষয়ে পালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপে জন্ম, গোষ্ঠ দান, নৌকাবিলাস, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, খণ্ডিতা, মান, মাথুর ইত্যাদি বহু পালার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা এই পালাগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে একপ্রকার পদে পালা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নহে। এসম্বন্ধে কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পদসমুদ্র ও পদকল্পতরু হইতে মনোনীত করিয়া প্রতি পালাতেই অল্প সংখ্যক গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থে সকলগুলি সমান আকার না হই-লেও প্রধান প্রধান গানগুলি প্রায় সকল গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন [illegible]তেই রসের ক্রমোৎকর্ষ-বিচারপূর্ব্বক পদবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায় না। এই-রূপ বিচারপূর্ব্বক পদবিন্যাস না থাকায় রসগ্রাহী শ্রোতা-দের পক্ষে গীতশ্রবণ সময় সময় আনন্দের পরিবর্ত্তে ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত আমার নিবেদন এই যে, রসগ্রাহী ভক্তগণের মধ্যে যদি কেহ সরস সুমধুর পদাবলী-গুলি ভিন্ন ভিন্ন পালার জন্য সংগ্রহ করিয়া রসের ক্রমোৎ-কর্ষ বিচারপূর্ব্বক গানগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রত্যেক পালার লক্ষণাদি-বিচার, প্রত্যেক পদস্থ দুরূহ শব্দের অর্থ এবং প্রত্যেক পদের রসাস্বাদনময়ী ব্যাখ্যা দিয়া প্রধান প্রধান পালাসমন্বিত একখানি লীলাগান-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত করেন তবে রসিক ভাবুক ভক্তগণের পক্ষে পরম উপকার হইতে পারে। পদাবলীর পদসমূহে প্রায়শঃই এমন বহুল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐসকল শব্দের অর্থ অনেক স্থানেই বুঝিতে পারা যায় না, সংস্কৃতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও উহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, অভিধানেও প্রাকৃত বা ব্রজবুলি প্রভৃতি ভাষার শব্দার্থ প্রদত্ত হয় না। অর্থবোধ না হইলে কেবল আন্দাজে সুচারুরূপে পদের রসাস্বাদন হইতে পারে না।

ইহার উপরে আর একটী প্রধান কথা এই যে [illegible]

সাহিত্য বঙ্গদেশের এক বিপুল কাব্য-সম্পদ্। রচনার লালিত্যে, শব্দ-অলঙ্কার ও অর্থ-অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও রসের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদকাব্য জাগতিক সাহিত্যে একেবারেই অতুলনীয়। সর্ব্বোপরি কথা এই যে, উহা লৌকিক সাহিত্য নহে কিন্তু অলৌকিক। উহা বিলাসের তরঙ্গে কামকৌতুকরঙ্গেও চপল নহে, অথবা কেবল ললিত-লাবণ্যপূর্ণ পদ-বিরচনের তরল পার্থিব পদসাহিত্যের সরিৎপ্রবাহও নহে। উহা সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়-নিহিত প্রেমভক্তির সমুজ্জল, ও সুমধুর সমুচ্ছ্বাস, উহা যখন সুরতালে ভক্তের মধুর কণ্ঠে গীত হয়, তখন উহা শ্রীব্রজরসোপাসনা-মন্দিরে ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীবৃন্দাবনের প্রবেশাধিকার প্রদান করে এবং প্রেমিক ভক্তের হৃদয়কে রসিক-শেখরের আনন্দ চিন্ময়রসে অভিসিক্ত করিয়া মহামাধুর্য্য-মহার্ণবে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। এই অবস্থায় উহাকে গান বলিতে হয় বলুন, সুললিত কাব্য বলিতে হয় বলুন, কিন্তু আমি এই পদাবলী-গানকে ব্রজরস-উপাসনার মহামন্ত্র বলিয়াই মনে করি। আমার এই ক্ষুদ্র নিবেদনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়া যদি কোন ভাবুক অভিজ্ঞ ভক্ত এই প্রণালীতে একখানি লীলাগানগ্রন্থ বিরচন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান শ্রোতৃবর্গের হৃদয়েও গানশ্রবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য জাগিয়া উঠিবে। গায়কগণও সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া গান করিলে নিজেরা কৃতার্থ হইবেন এবং শ্রোতৃবর্গকেও কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন। পদাবলির অধিকাংশ পদেই প্রগাঢ় ভাবরস ও ধ্বন্যাত্মক শব্দবিন্যাস সম্পদ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের কোনটীতে বা ললিত লাবণ্যময় সুমধুর শব্দালঙ্কার-প্রাচুর্য্যের মধ্যেও প্রগাঢ় ভাব নিহিত আছে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে শ্রীল গোবিন্দদাসের পদাবলী উল্লেখযোগ্য আবার কোনটীতে অতি সরল সহজ প্রসাদগুণাত্মক গ্রাম্য-ভাষায় বিরচিত প্রেমভক্তির সমুচ্চ ভাবরসের প্রকটিত বা লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য পরিদৃষ্ট হয় ইহার উদাহরণ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলী। আমরা এস্থলে গোষ্ঠলীলার একটী সরল ও সহজ, সরস ও সুমধুর পদের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। গত মাঘ মাসে বাসন্তী পূর্ণিমার অবসানে পণ্ডিতবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামিসিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের ভবনে শ্রীভাগবত-পারায়ণ-অন্তে যে কীর্ত্তনানন্দময় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, আমি সৌভাগ্যক্রমে সে স্থানে প্রবেশ-অধিকার পাইয়াছিলাম। সকাল বেলায় ৮টা বাজিতে না বাজিতে শ্রীগোবিন্দের গোষ্ঠলীলা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। গায়ক ছিলেন কীর্ত্তনাচার্য্য মধুরকণ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমৎ নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়। শিক্ষিত ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কতিপয় গায়কও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশকালপাত্রের বিচারে অতি নগণ্য আমি সেখানে যে প্রবেশ-অধিকার পাইয়াছিলাম, ইহা আমার প্রকৃতই সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। এইস্থলে যে কয়েকটী পদগান হইয়াছিল, সে সকল গুলিই আমার হৃদয়ে আনন্দের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল তথাপি উহার একটীপদে আমার ন্যায় অভক্তকেও আনন্দে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। সেই পদটী হইতেছে এই :—

যায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গো।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পায়, রহি রহি চলি যায়
পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গো॥
বুঝি উহার কেহ আছে, আসিতেছে পাছে পাছে
তাতেই চায় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে গো।
শ্রীদাম টানে বনপানে, রাণী টানে ঘর-পানে,
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো॥
যদি ব্রজের বালক হ'তাম, তবে উহার সঙ্গে যেতাম,
মাঝে যেতাম নাচিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে গো।
হায় আমরা কি করিলাম, নবনী পাসরি এলাম,
খানিক রাখতেম ননী দেখায়ে দেখায়ে দেখায়ে গো॥
রবি বড় তাপ দিছে,— চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে,
অলকা তিলক যায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে ভাসিয়ে গো।
হেন মনে উঠে দয়া, মেঘ হয়ে করি ছায়া,
তাহার ছায়ায় যেতো জুড়ায়ে জুড়ায়ে জুড়ায়ে গো॥
এমন বান্ধব কেহ থাকতো, কথার ছলে খানিক রাখতে,
দেখতেম নয়ন ভরিয়ে ভরিয়ে ভরিয়ে গো
যায় নাগর বন পানে, অতি বিষাদিত মনে,
[illegible]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পদটী যেমন সরল ও সহজ তেমনই সরস ও সুমধুর। শ্রীগোবিন্দের লীলায় বয়সাদির বিচার লৌকিক প্রথায় চলে না। লোকে কথায় বলে "কৃষ্ণ কেমন?" ইহার উত্তরে বলা হয়,—"যার মন যেমন।" কংশের রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ যখন পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতের শ্লোকটী এই:—

মল্লানামশনির্নৃনাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড্ বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

ঠিক এই ভাবাত্মক আর একটী শ্লোক—

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের দ্বিতীয়-খণ্ডে দৃষ্ট হয় যথা,—

মল্লৈঃ শৈলেন্দ্রকল্পৈঃ শিশুরিতরজনৈঃ
পুষ্পচাপোঽঙ্গনাভিঃ
গোপৈস্তু প্রাকৃতাত্মা দিবি কুলিশভৃতা
বিশ্বকায়োঽপ্রমেয়ঃ।
ক্রুদ্ধঃ কংসেন কালো ভয়চকিতদৃশা
যোগিভির্ধ্যেয়মূর্ত্তি-
দৃষ্টো রঙ্গাবতারো হরিরমরগণা-
নন্দকৃৎ পাতু যুষ্মান্।

গোষ্ঠলীলায় আমরা ব্রজ-উপাসনার পঞ্চরসই দেখিতে পাই। ইহাতে বাৎসল্য-রসময়ী মা যশোদার বাৎসল্য-রসের অমিয় ধারা প্রথমেই প্রবাহিত হয়; তৎপরে সখ্যরসের আরম্ভ; বলদেব ও শ্রীদাম-আদি সখাগণ অতিকষ্টে মা যশোদার কোলের ধন ভাই কানাইকে মায়ের কোল হইতে গোষ্ঠে গমনের জন্য বাহির করিলেন। এই রাখালদের সঙ্গোপনে পথে ও গোষ্ঠে শ্রীভগবানের যে লীলা হইয়াছিল, তাহাই সখ্যরসের নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে গোষ্ঠে যাওয়ার সময়ে যাবটের পথদিয়া যাইতে-ছিলেন। এই সময়ে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হন, এই দর্শনের ফলে মধুররসের হাবভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। দাস্যরস, সখ্যে বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বনের বিহঙ্গ-গণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুর রবে আকৃষ্ট হইয়া কেবলই শান্তভাবে নয়ন মুদিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুর ধ্বনি শ্রবণ করেন ইহাই শান্তরস। ফলতঃ গোষ্ঠলীলায় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের নানা-বিধ ভাবরসের আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন॥

মিলনে

[শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামি কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ]

কেন সখি এমন নিঝুম নাহি কি গো কোনো কাজ।
ওঠো গাঁথো মালা কুঞ্জের দ্বারে এসেছে নাগররাজ।
দুঃখের রজনী গিয়াছে ফুরায়ে এ যে নবসুখ-নিশি।
বাসন্তী বায়ে কাঁপে ফুলবন হাসে পূর্ণিমাশশি॥
কদম্ববনে পাপিয়াবধু সে ডাকিতেছে পিয় পিয়।
যমুনা নাচিছে পাইয়া আজিকে বঁধুর চরণামিয়॥
শুকসারী মিলি তমালবৃক্ষে তুলিয়াছে মধু তান।
কুঞ্জতরুতে শুন ঐ সখি ভ্রমরের কল গান॥
এ মধু নিশিথে সবার পরাণ ছেয়ে গেছে গানে গানে।
তুমি কেন শুধু বিরস বদনে বসে আছ নির্জ্জনে।
সাজাও কুঞ্জ ফুল-চন্দনে রচিয়া তাহারি নাম।
উঠ ত্বরা করি ঐ বুঝি দ্বারে আসিল আমার শ্যাম॥

...র স্বরূপ ও স্বধর্ম

(১৫)

[শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী]

মহৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শে মায়াহত জীবের জীবত্ব ও তৎসহ প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলে, কেবল সেই জীবের পক্ষেই নির্গুণা সাধন-ভক্তি সেবনের উন্মুখতা বা চেষ্টাশীলতা সম্ভব হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে উহা সম্ভব হয় না। "সাধন-ভক্তি'র অনুসেবন দ্বারা জীবের অন্তরে "সাধ্যভক্তি" বা প্রেমের উদয় হইলে তখনই শ্রীভগবৎসেবাপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ লালসা জাগ্রত হয়, এবং যাহার অব্যর্থ ফলস্বরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার সংসিদ্ধ হইয়া জীবের জীবত্ব পূর্ণ সার্থকতাকে বরণ করিয়া, চিরকৃতার্থ হইয়া যায়। একই পূর্ণেন্দু যেমন মেঘজালে আবৃত, কিয়দাবৃত ও অনাবৃত অবস্থাভেদে ত্রিবিধ প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই নির্গুণা ভক্তি, জীবহৃদয়ে স্ফুরিত হইবার পর, চিত্তের অমার্জ্জিত, কিঞ্চিৎ অমার্জ্জিত ও পরিমার্জ্জিত অবস্থাত্রয় ভেদে "সাধনভক্তি", "ভাবভক্তি" ও "প্রেমভক্তি"রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন;—

"সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

একই চিদানন্দশক্তির পরমসারভূতা ও নিত্যসিদ্ধা ভক্তি প্রধানতঃ উক্ত ত্রিবিধাকারে প্রকাশিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা ভক্তির বিকার বা পরিবর্তন নহে; পৃথিবীর গতির পরিবর্ত্তনে যেমন সূর্য্যেরই পরিবর্ত্তন এবং উহা যথা-ক্রমে বালারুণ, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ও সন্ধ্যার রক্তরবির রূপা-ন্তরে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের জড়ত্ব হইতে জড়ত্বের ক্রমবিকাশ অনুসারেই ভক্তির বিকাশভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র; অতএব ভক্তিই ভক্তির কারণ হওয়ায়, ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বের হানি হয় না। একই নির্গুণা ভক্তি, প্রথমে সাধন রূপে জীবের সেবনীয়া হইবার

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, পুরুষ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাহাকে নব লক্ষণা ভক্তি কহে।

সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধনভক্তি-সিদ্ধান্তের সার একত্র চয়ন করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অতি সুস্পষ্টরূপে চারি ছত্রে তাহা বর্ণন করিয়াছেন; যথা—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

তাৎপর্য্য—ভজনের মধ্যে নববিধ সাধনভক্তিই শ্রেষ্ঠ; কৃষ্ণ-প্রেমোদয় করাইয়া, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে এই সাধনভক্তি মহাশক্তি ধারণ করেন। এতাদৃশী সাধন-ভক্তি সকলের মধ্যে আবার শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ মহা-সম্পদের অধিকার সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবলক্ষণা ভক্তির অন্তর্গত "শ্রবণ", "কীর্ত্তন" ও "স্মরণ" এই ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণাদির ন্যায়, তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনামেরও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ অনুশীলন, উক্ত সাধনভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়া নববিধ সাধনভক্তির সহিত একই উচ্চ আসনে—একই উচ্চ সম্মানে সাধন-জগতে সম্পূজিত

[illegible]

জনক—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্, সেই নামকীর্ত্তন—নামাশ্রয়কে নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য প্রদানপূর্ব্বক, সর্ব্বোচ্চ আসনোপরি সংস্থাপিত করিয়া, অতি সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রচার করিলেন,—

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।"

নিখিল সাধনভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ই যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তিনি শুধু এই কথাই প্রচার করিলেন তাহা নহে, কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরি কলিকবলিত জগৎকে ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে,—

"নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥"

অর্থাৎ কেবল নিরপরাধে নামাশ্রয় হইতেই যথাক্রমে পূর্ণরূপে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গসকল সমুদিত হইয়া থাকেন। রাজা গমন করিলে যেমন রাজ-আমাত্যগণও আপনিই তাঁহার অনুগমন করেন, তেমনি নামাশ্রয়রূপ সাধনভক্তি-রাজের আবির্ভাবে অপর ভজনাঙ্গসকল যথাক্রমে ও যথাকালে সাধকের ইন্দ্রিয় দ্বারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

উক্ত নবলক্ষণা ভক্তির যে কোনও একটি অথবা একাধিক অঙ্গ, মহৎকৃপা-সঞ্চারিত জীবের পক্ষে প্রথমে সামান্যাকারে গৃহীত হইয়া উহাই যথাকালে ও যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তজন।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গসাধন॥

(শ্রীচরিতামৃত)

নবলক্ষণা ভক্তির সকল অঙ্গই যে যথাক্রমে প্রেমোদয় করিবার পক্ষে সমান শক্তিসম্পন্ন, শ্রীচরিতামৃতোক্ত নিম্নোদ্ধৃত ভক্তবাক্য দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে;—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

অর্থাৎ—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণ করিয়া, শুকদেব কীর্ত্তন করিয়া, প্রহ্লাদ স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মীদেবী তদীয় চরণকমলের সেবা করিয়া, পৃথু তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, অক্রুর তাঁহার বন্দনা করিয়া, কপিরাজ তাঁহার দাস্য, অর্জ্জুন সখ্য, এবং সর্ব্বস্বের সহিত আত্মাকে নিবেদন করিয়া বলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেমন মূল হইতে কাণ্ড ও কাণ্ড হইতে শাখ, প্রশাখাদির উদ্গম হইয়া পরিশেষে পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয়, তেমনি মহৎকৃপারূপ ভক্তিমূল হইতে নবলক্ষণা ভক্তিলতার উদয় হইয়া, তাহা ক্রমশঃ "শ্রদ্ধা" ও "সাধুসঙ্গ" নামক সোপানদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক, "ভজনক্রিয়া" রূপ তৃতীয়স্তরে সমারূঢ় হইলে, ঠিক তৎপ্রারম্ভ হইতেই "সাধনাঙ্গ"রূপ বহু শাখা প্রশাখাদি দ্বারা উহা ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া, যথাকালে অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত "নিষ্ঠা" "রুচি" ও আসক্তি" স্তর অতিক্রমণ পূর্ব্বক, "ভাবভক্তি" ও পরিশেষে "প্রেমভক্তি"রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নবধা "ভক্ত্যঙ্গ" হইতে তৃতীয়স্তরে তৎশাখাদিস্বরূপ যে "সাধনাঙ্গের" উদ্গম হয়, তাহা বহুবিধ হইলেও, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে উহা "শ্রীগুরুপাদাশ্রয়" আদি করিয়া প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংখ্যা রহিত সাধনাঙ্গকে চতুঃষষ্টি সংখ্যায় সংখ্যাত করিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন;—

"বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধনভক্তির নববিধ ভক্ত্যঙ্গ হইতে কালে যে সাধনাঙ্গ সকলের উদ্গম হয়, তাহা বিবিধাঙ্গে বহু বিস্তার লাভ করিলেও, সেই "সাধনাঙ্গ" সকলের মধ্যে সার বা প্রধান অঙ্গ যাহা তাহারই কিছু (৬৪ প্রকার অঙ্গ) সংক্ষেপে কহিতেছি।

ভক্তিমূল হইতে প্রেমরূপফলের ক্রমিক অভ্যুদয় প্রণালী নিম্নোক্ত প্রকার হইয়া থাকে;—

একই অখণ্ডিতা ও চিদানন্দময়ী ভক্তি, "সাধনভক্তি"

"[illegible]" ও "[illegible]" [illegible]

সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি ও ভাবভক্তি হইতে প্রেমভক্তির উদয় হয়। অহৈতুকী মহৎ-কৃপাপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে, প্রথমে সাধনভক্তি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি আবার "ভক্ত্যঙ্গ" ও "সাধনাঙ্গ"ভেদে দ্বিবিধা। শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন রূপে ভক্ত্যঙ্গও আবার নববিধ। মহৎকৃপা সঞ্চারিত জীবের পক্ষে প্রথমে নববিধ ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একধিক অঙ্গের গ্রহণ সামর্থ্য লাভ হইলে তৎসেবনোন্মুখ জীবের পক্ষে উহা প্রথমে সামান্যাকারে—অনিষ্টিতভাবে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। [যাহা বিশেষ নিয়মাদি বা সঙ্কল্পাদি দ্বারা প্রকৃষ্টভজনরূপে অনুষ্ঠিত নহে এবং যাহা যদৃচ্ছাক্রমে আচরিত, তাহাকেই "সামান্যাকার" ও তদ্বিপরীত যাহা তাহাকে "বিশেষাকার" নামে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।]

সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের এক বা একাধিক অঙ্গের সেবন করিতে করিতে, উহা সাধন-স্তরের "শ্রদ্ধা" নামক প্রথম সোপানারূঢ় হইলে, তদবস্থায় সেই জীবের পক্ষে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভজনাদি নিখিল পরমার্থ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে থাকে; তদনন্তর "সাধুসঙ্গ" নামক দ্বিতীয় ভূমিকায় সমাগত জীব, সাধুভক্তগণের অনুসন্ধান পূর্ব্বক, তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিয়া ও তাঁহাদিগের সঙ্গ ও সদুপদেশাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় প্রকৃষ্ট ভজনে অভিলাষযুক্ত হয়েন। মহৎ-কৃপা লাভের পর হইতে "সাধুসঙ্গ" নামক সাধনায় দ্বিতীয়স্তর পর্য্যন্ত এই সীমায় অবস্থিত জীবকে "প্রবৃত্ত-ভক্ত" নামে নির্দ্দেশ করা হয়। অতঃপর "ভজন-ক্রিয়া" নামক সাধনার তৃতীয় সোপান। এই স্তর প্রাপ্ত হইলে ভক্তিদেবী কৃপা পূর্ব্বক সেই জীবের নিকট "সাধনাঙ্গ"রূপে ক্রমে প্রকাশিত হয়েন। এই স্তরে সমাগত হইবার পর হইতে প্রকৃষ্ট ভজন-সাধনের আরম্ভ হয় বলিয়াই ইহাকে ভজনক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। "শ্রীকৃষ্ণ-পাদাশ্রয়" হইতে চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের প্রথম দশটি অঙ্গ, তৃতীয়স্তরে সমারূঢ় জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভজনের প্রারম্ভ-স্বরূপ উদিত হয়েন। অতঃপর সমষ্টিরূপে অবশিষ্ট সাধনাঙ্গ ...প্রধান প্রধান অঙ্গসকলের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন, এই নবাঙ্গ, তখন সামান্যাকার হইতে বিশেষাকার প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহা তৎকালে সাধনাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং তদবস্থায় এই নববিধভক্তি আর সামান্যাকারে থাকেন না; এই অবস্থায় কেবল "সাধনাঙ্গের" প্রকাশ হওয়ায়, সমুদয় সাধনাঙ্গই বিশেষাকারে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে; এবং সেই প্রকৃষ্ট ভজন হইতেই অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত যথাক্রমে "নিষ্ঠা" "রুচি" "আসক্তি" ও "ভাব" নামক স্তরচতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। "ভজনক্রিয়া" নামক তৃতীয় স্তর হইতে "ভাব" নামক ষষ্ঠ স্তরের অন্তর্গত জীবকে "সাধক-ভক্ত" নামে নির্দ্দেশ করা হয়। "ভাব" স্তরের নামই ভাবভক্তি; ইহা সাধন-ভক্তির পরিপক্কাবস্থা। এই স্তরে সমারূঢ় সাধক-ভক্তের পক্ষে ভক্তিদেবী ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি প্রভৃতি অনুভাব-সকল উদয় করাইয়া, তদনন্তর "প্রেম" নামক পঞ্চম-পুরুষার্থরূপে সেই জীবহৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। প্রেমভক্তি সংপ্রাপ্ত জীবকেই "সিদ্ধভক্ত" বলা হয়। মহৎ-কৃপা রূপ মূল হইতে ভাবরূপ ফুল ও প্রেমরূপ ফল-সম্বলিতা ভক্তি-লতার ইহাই সংক্ষিপ্ত উদয়ক্রম। উক্ত ভক্তিলতিকা আবার "রাগভক্তি" ও "বৈধভক্তি" ভেদে দ্বিবিধ-লক্ষণান্বিতা, এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ ভাবযুক্তা হয়েন। শ্রীভগবানের রূপ-গুণাদিতে লোভপ্রবর্ত্তিত ভক্তিকে "রাগভক্তি" ও "শ্রীভগবানই ভজনীয়" ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্র-শাসন-প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে "বৈধ-ভক্তি" বলা হয়। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞান" ও "মাধুর্য্যজ্ঞান" ভেদে উক্ত ভক্তি পুনরায় দ্বিবিধা হইয়া থাকেন। যে ভগবদ্ভক্তি, কেবল শ্রীভগবৎসেবা বাসনা ব্যতীত, ভোগ অথবা মোক্ষাদি বাসনা দ্বারা স্পৃষ্টা নহেন, এবং যাহা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান-সাধনাঙ্গের দ্বারা মিশ্রিতা নহেন, তাঁহাকেই শুদ্ধা বা উত্তমা ভক্তি কহে। সম্পূর্ণ গুণ-সম্বন্ধশূন্যা বলিয়া শুদ্ধাভক্তির অপর নাম নির্গুণাভক্তি; সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার ও তৎসেবনই যাহার মুখ্যফল।

উক্ত ভক্তিই আবার সত্ত্বাদিগুণসম্বন্ধযুক্তা হইলে

তাহাকে সগুণা ভক্তি কহে। সগুণা-ভক্তি সকামা ও নিষ্কামা ভেদে দ্বিবিধা। সকামাভক্তি তামস অথবা রাজস হইয়া থাকে; আর্ত্ত, অর্থার্থী প্রভৃতি ইহার অধিকারী; এবং পার্থিব বা স্বর্গাদি সুখভোগ ইহার ফল। সকামাভক্তি সাত্বিকী হইলে, উহা ভোগবাসনার পরিবর্ত্তে মোক্ষবাসনা-যুক্ত হওয়ায়, তখন উহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়; মুমুক্ষুগণই উহার অধিকারী। মোক্ষবাসনা-যুক্ত নিষ্কাম ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান অথবা যোগ দ্বারা মিশ্রিতা হইলে উহা যথাক্রমে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও যোগমিশ্রা ভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারের সহিত সদ্যোমুক্তি, এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল—পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি বাঞ্ছাদির সংযোগে এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনাঙ্গের সংমিশ্রণে একই ভক্তির বিভিন্ন প্রকার তারতম্য হইলেও, মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী—রাগাত্মিকা—মধুরভাবযুক্তা—ব্রজরামাগণের অনুসারিণী শুদ্ধাভক্তিই সর্ব্বভক্তি-সার ও সর্ব্বভক্তি-শিরোমণি। নিখিল ভক্তি-ধারার ইহাই মূল উৎস-স্বরূপিণী পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-মহাপ্রভু হইতে এই সমুন্নত উজ্জ্বল-রসাত্মক প্রেমভক্তি প্রতিকল্পে একবার করিয়া জগতের উপর বিপুলভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে।

যে ভক্ত যাদৃশী ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, সেই ভক্ত-কর্ত্তৃক কৃপাসঞ্চারিত জীব-হৃদয়েও তাদৃশী ভক্তিরই বিকাশ হইয়া থাকে। পুনরায় যদি সেই জীবের প্রতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্ত-কৃপা সঞ্চারিত হয়, তবে আবার সেই জীবেই পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তির উদয় সম্ভব হয়।—ইহাই জানিতে হইবে।

নবলক্ষণা ভক্তির এক বা একাধিক অঙ্গ প্রথমতঃ সামান্যাকারে অনুশীলন দ্বারা, তাহা হইতে যথাকালে বিবিধ সাধনাঙ্গ প্রকাশ পাইয়া অনর্থ-নিবৃত্তির সহিত নিষ্ঠাদি ক্রমে একই প্রকারে কিরূপে ভাব পুষ্প ও প্রেম-ফলের অভ্যুদয় ঘটে, তাহার সংক্ষিপ্ত প্রণালী প্রদর্শিত হইল। ইহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের সকল অঙ্গেরই প্রেমোদয় সামর্থ্য একই প্রকার ও প্রেমোদয় ক্রম একই রূপ ইহাই স্থিরীকৃত হইলেও, একই শ্রেষ্ঠতম আসনোপরি সংস্থাপিতা নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া যখন এই কলিঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জগতে, স্বয়ং কলিপাবনাবতার—বেদময় পুরুষ শ্রীশ্রীগৌরহরি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে, তখন অতঃপর আমাদিগকে আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, নববিধা ভক্তির শ্রেষ্ঠতম আসনেরও উপর, আবার নামাশ্রয়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কোনও এক বিশেষ গৌরবময় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ কি হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

সই

[শ্রীসন্তোষকুমার পাল]

সই, শুনিবি স্বপন মোর?
তখনো রজনী হয়নি ভোর,
মোর চোখে ছিল ঘুম-ঘোর!
মনে হ'ল যেন যমুনার তীরে
শুনি বেণু-রব দাঁড়াইনু ফিরে,
নবঘনশ্যাম পুরুষ-রতন
নয়নে পড়িল মোর,
সই, সেই মোর চিত-চোর!

সই, শুনিবি বেদন মোর?
আমার নয়নে ঝরিছে লোর,
থেকে থেকে সেই সুর বাজে কাণে,
ক্ষণে ক্ষণে সেই রূপ জাগে প্রাণে,
কি বলিস্ তোরা, কি যে করি আমি-
জানিনা দিব্য তোর,
সই, একি হ'ল বল্ মোর?

সই, করিবি উপায় মোর?
আনিয়া দিবি শ্যামসুন্দর?
মোর ঘুচা'বি যাতনা ঘোর?
কিছু নাই মোর, কি দিব তাহারে!
দুঃখিনী রাধার কিবা আছে হাঁরে?
আমার বলিতে আমি আছি শুধু—
দিব তাই পদে ডোর,

নামনৃত্য

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

ওই যে ধরা সূর্য্যদেবে করে প্রদক্ষিণ
নাচায়-নাচে ঘোরায়-ঘোরে এমি প্রেমাধীন।
অনন্ত কাল অসীম ব্যোমে গতির নাহি ছেদ
নাচের তালে তাল কাটেনা নাহি বিরাম খেদ।
আলোর ঝারা অঙ্গে ঝরে, আনন্দে টল্‌মল্‌
নাথের সাথে সাধ মেশে তাই বিহ্বল পাগল।
ওগো আমার প্রেমের হরি! হিয়ায় এসে নিজে
গড়ো আমার জপ-মালা তোমার নাম-বীজে।
অশ্রু-সূতে গাঁথো আমার প্রেমের জপ-দাম
ঘুরুক্ আঙ্গুল গুণে গুণে "হরে কৃষ্ণ রাম।"
মনের সাথে এই রসনা রসুক্ নাম-রসে,
মন্ত্র তোমার হৃদ্‌ যন্ত্রে চলুক্ প্রেমবশে।
ওগো আমার প্রেমের রবি! আমি তোমার দাসী
তোমার আলোয় তোমায় ঘিরে ঘুরতে ভালবাসি।
বাজাও তব মোহন বেণু, নাচো তুমি হরি!
সেই নাচেতে নাচন আমার জাগুক্ দেহ ভরি।
নাচুক্ আমার পাগল হিয়া, নাচুক্ আমার মন,
নাচুক্ আমার ভাব-লহরী আনন্দ-মগন।
জিহ্বা আমার উঠুক্ নেচে নামের রসে ভোর,
নাচুক্ আমার করাঙ্গুলে জপ-মালার ডোর!
নাচুক্ আমার শ্বাসে শ্বাসে তোমার নাম গান,
রোমের প্রতি রন্ধ্রকূপে নেচে উঠুক্ প্রাণ,
নাচুক্ আমার চোখের তারা, ঊর্দ্ধে নাচুক্ হাত,
নাচুক্ আমার চরণ দুটির প্রতি পদপাত।
ঠোঁটে আমার নাচুক্ হাসি নিতে তোমার নাম,
আনন্দেরি অশ্রু চোখে ঝরুক্ অবিরাম।

সংবাদ

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী ১৩ই চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চৈত্রমাস পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুত পি, আর, দাস মহোদয়ের বাটীতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের আনন্দবিধান করিয়াছেন।

বিগত ২২শে চৈত্র মেদিনীপুর জেলার টুলা গ্রামে (তমলুক পরগণা) একটী বৈষ্ণবসভার অধিবেশন হইয়াছিল! আমাদের শ্রীপত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনাদিমোহন গোস্বামি কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয় এই উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সভায় বৈষ্ণবগণের উন্নতি-বিধায়ক কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমরা ২৩নং ক্যানিংষ্ট্রীট্ মিত্র ব্রাদাসের বাঙ্গলা পকেট ডায়েরী দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। ডায়েরী খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। তবে মূল্য বর্ত্তমান সময় অনুযায়ী বিবেচনা করিলে কিছু অধিক হইয়াছে মনে হয়। আমরা আশাকরি পুনঃপ্রকাশের সময় ইহার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

রামধনমিত্রলেন গ্রোবনার্ষারী হইতে একখানি সুরঞ্জিত ক্যালেণ্ডার উপহার পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্॥
তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ॥
ভোজিতং পরমান্নেন সম্বিষ্টং কশিপৌ সুখম্
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥

ঋতুমতী ধেনুগণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বৃষসকল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছে। ধেনুসকল উধোভারে (ওলান) ইতস্ততঃ নিজনিজ বৎসগণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। অতিশয় শুক্লবর্ণ বৎসসকল ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান করিতেছে। গোপগণ গোদোহন করিতে করিতে "বাছুরী ছাড়িওনা" "বাছুরী ছাড়ো" "আমার নিকট এস" "আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও" "তাড়াতাড়ী কর, তাড়াতাড়ী কর" "না, না তাড়াতাড়ী করিতে হইবে না" "গোদোহনের ভাণ্ড লইয়া যাইস" "এই দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড লইয়া যাও" ভাণ্ডটী আমার হাতে দাও" "আমার হাত হইতে ভাণ্ডটী লইয়া যাও" এইরূপ বিবিধ শব্দ করিতেছেন। আবার তন্মধ্যে গোদোহনের শব্দে শ্রীব্রজ মুখরিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা-গোপী-ভিন্ন অন্য বিশ্রম্ভপ্রধানা রতিমতী গোপীগণ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমঙ্গল তৃণাবর্ত্ত-বধাদি লীলাগানে ও শ্রীদামাদি সখাগণের সখ্যসমুচিত-লীলাকথায় শ্রীব্রজ একদিকে যেমন সুশোভিত, তেমনই অপর দিকে মুখরিত হইতেছিল। যাঁহারা অলঙ্কারাদিতে-বিভূষিত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতেছিলেন, তাঁহারা যে কৃষ্ণপ্রেয়সী নহেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন। যথা, "মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ" অর্থাৎ তাঁহারা উৎকণ্ঠা-প্রধানা রতিমতী হইলে অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা হইতেন না। সখাগণ গোচারণ করিয়া উল্লাসভরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নিজ নিজ গৃহে আগমন করিতেছিলেন।

এইরূপে শ্রীব্রজের লৌকিক শোভা বর্ণন করিয়া এক্ষণে বৈদিক শোভাও বর্ণন করিতেছেন।

নিত্য হোমাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি ও সূর্য্যের আরাধনা হইতেছিল, নব নব তৃণগ্রাস দিয়া গোসকলের এবং মধুর বচন ও সৎকারাদি দ্বারা অতিথি-ব্রাহ্মণ-পিতৃলোক ও দেবলোকের আরাধনা হইতেছিল। গৃহস্থগণের পক্ষে পিতৃলোক প্রভৃতির অর্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য, তবে বৈষ্ণবগণের পক্ষে সেই পিতৃলোক প্রভৃতির আরাধনা বৈষ্ণব-বুদ্ধিতেই করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা তর্পণ-প্রভৃতি করিতে হয়।

যদ্যপি নিখিল মহাভাগবতগণের ও পরমারাধ্য শ্রীল-ব্রজবাসিগণের বিধির অধীনতা নাই, তথাপি শ্রীভগবান্ যেমন বিধিকিঙ্কর না হইয়াও বিবিধ কর্ম্ম করেন, এবং সেইটী যেমন তাঁহার লীলাবিশেষ, সেই প্রকার ব্রজবাসিগণের পক্ষেও বুঝিতে হইবে। এইরূপ বর্ণনের দ্বারা ব্রজ-বাসিগণের বৈশ্য আভীর দ্বিজত্ব দেখান হইল। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়েও শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছেন "কুরু দ্বিজাতিসংস্কারম্" অর্থাৎ আমরা বৈশ্য সুতরাং আমার বালকদুইটার দ্বিজাতি-সমুচিত সংস্কার করুন।

এইক্ষণ শ্রীব্রজরাজের গৃহমধ্যস্থ শোভা বর্ণন করা হইতেছে। শ্রীউদ্ধবমহাশয় ব্রজবাসিগণের প্রতিগৃহদ্বার মাল্যদ্বারা এবং গৃহাভ্যন্তর দীপশিখায় সুশোভিত দেখিয়াছিলেন। প্রতিপ্রকোষ্ঠে সুগন্ধ ধূপসকল জ্বলিতেছিল, সৌরভে সম্মুখস্থিত পথ পর্য্যন্ত আমোদিত হইতেছিল।

শ্রীব্রজের বহিঃপ্রদেশের শোভা বর্ণিত হইতেছে। সে স্থলের প্রত্যেকটী বৃক্ষলতা প্রস্ফুটিত-পুষ্পসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইতেছিল। পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের গুঞ্জনে ও বৃক্ষের শাখায় শাখায় উপবিষ্ট কোকিল প্রভৃতি সুগায়ক পক্ষিসকলের কাকলীরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল। বৃন্দাবনের সরোবরসকল প্রস্ফুটিত পদ্মবনের সৌরভে এবং হংসকারণ্ডব সমূহের উল্লাস-ধ্বনিতে অতিশয় মনোরম শোভাবিশিষ্ট ছিল।

এস্থলে এইটী বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, যদ্যপি তৎকালে শ্রীব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখসাগরে নিমগ্ন ছিল, তথাপি 'শ্রীমান উদ্ধব আমার ব্রজের শোভা দর্শন করুক্', শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রেরিতা হইয়া যোগমায়া নির্ব্বেদ বিষাদ ও দৈন্য প্রভৃতি দুঃখার্ত্ত ব্রজের বিরহবিধুর

প্রকাশটীকে গোপন করিয়া, চাপল্য ও উৎসাহাদির দ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণসংযুক্ত ব্রজের প্রকাশবিশেষটী প্রথমতঃ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে দেখাইয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীমান্ উদ্ধব রাজপথ অতিবাহিত করিয়া ব্রজরাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রথসহ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে সারথিরূপে নিজের একটী সেবক সঙ্গে লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া ব্রজরাজের অন্তঃপুর-সম্মুখবর্ত্তি-প্রদেশে বেদীর উপর উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে অন্ধকার অতিশয় গাঢ় না হওয়ায় একটী লোক বসিয়া আছে তাহা লক্ষিত হইতেছিল। ব্রজরাজের অন্তঃপুরে ব্রজবাসিগণ প্রবেশ করিতেছিলেন, বাহিরেও আসিতেছিলেন, সেই গতাগতি-সময়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে দর্শন করিয়া গোপগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের মত রূপ বেশ কেশ ভূষণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবিশেষ উদয় হইয়াছে, তাহারা অনুভব দ্বারাই বস্তুপরিচয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল যে, এই বেদীর উপরে যে বসিয়া আছে সে যদি কৃষ্ণই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হইত, ইঁহার দর্শনে তাদৃশ সুখানুভব করিতেছি না কেন? আর যদি অন্য ব্যক্তিই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণের রূপ, বয়স ও বস্ত্র ইহাতে কিরূপে আসিল? যাহা হউক্ আমরা শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর চরণে এই অতিথির সংবাদ জানাই, তাঁহারা অবশ্যই অপরিচিত পরিচিতের সংশয় দূর করিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া সেই গোপগণ ব্রজরাজ-সকাশে এই সংবাদ বর্ণন করিলে ব্রজরাজ মথুরা হইতে উদ্ধবের আগমনই স্থির করিয়াছিলেন। স্বয়ং বহিঃপ্রদেশে আগমন করিয়া শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীমান্ উদ্ধবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ উদ্ধবও শ্রীল ব্রজরাজকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে শ্রীল ব্রজরাজ দুই বাহুদ্বারা চরণ হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধবকে চোখের জলে সিক্ত করিলেন। সেই সময়ে শ্রীউদ্ধব ভক্তিসুলভ দৈন্যে দুইটী হাত জোড় করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ তাঁহার সেই অঞ্জলী গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণজননীর নিকটে উপস্থিত করাইয়া "ইনিই শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদা" এইরূপ পরিচয় করাইয়াছিলেন। এবং শ্রীযশোদাকেও বলিলেন "ইনিই কৃষ্ণের সহচর শ্রীমান্ উদ্ধব"। তখন শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল ব্রজেশ্বরীর চরণে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ মনোহর বিনয়ের সহিত দুই হাত জুড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন; তৎপরে শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী নিজ পরিজন দ্বারা সেই শ্রীউদ্ধবকে কৃষ্ণের অনুচর ভক্ত, অতএব অতিপ্রিয়জন জানিয়া তাঁহার আরাধনা করাইয়াছিলেন। সেই ব্রজরাজদম্পতি উদ্ধবকে "অতিথি নারায়ণ সম" এই বুদ্ধিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রিয়জন এই উভয় প্রকারে 'অধোক্ষজ ধারণায়' যথোচিত মর্য্যদা করাইয়াছিলেন। অনন্তর উৎকৃষ্ট পায়সান্ন দ্বারা ভোজন করাইলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে যে দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ব্রজবাসিজনমাত্রের সমস্ত পাকগৃহ অমার্জ্জিত, অলিপ্ত, তৃণপত্র-ধূলিরাশিতে পরিপূর্ণ এবং সুতাতন্তুদ্বারা (মাকড়সার সূত্রে) ব্যাপ্ত হইয়াছিল; পরস্পর প্রতিবেশীজনদত্ত দধি, দুগ্ধ, তক্র, প্রভৃতির দ্বারায় কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছিলেন। অতএব যদ্যপি রন্ধনাদির সম্ভাবনা ছিল না তথাপি ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন যে "আমার গৃহে সমাগত উদ্ধব ক্ষুধা দ্বারা অবসাদ প্রাপ্ত না হউক্"। তাঁহাদের এই সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া কোন একটী ব্রাহ্মণপরিজন বস্ত্র তণ্ডুল ও দুগ্ধের দ্বারা মাত্র একজন পুরুষের ভোজনোপযোগী পরমান্ন পাক করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারাই শ্রীমান্ উদ্ধবকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ভোজনান্তে পথাগমনজন্য শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবকে বলিলেন "বৎস! পথাগমনশ্রম অপনোদনের জন্য এই পালঙ্কে শয়ন্ কর। আমার এই ভৃত্য তোমার পদ ও গাত্র সম্বাহন করিয়া দিউক্"। শ্রীল ব্রজরাজের আদেশপ্রাপ্ত উদ্ধব সেই প্রকারই করিলেন। তৎপর শ্রীনন্দমহারাজ বিরহদুঃখের বৃদ্ধি আশঙ্কায় প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কুশলপ্রশ্ন করিতে ভীত হইয়া প্রশ্নের ভূমিকারূপে শ্রীবসুদেবের কুশলপ্রশ্ন করিয়াছিলেন।

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥
দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুজঃ স্বেন পাপ্মনা
সাধূনাং ধর্ম্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥
অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥

শ্রীলব্রজরাজ উদ্ধবের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইয়া সম্বোধন করিলেন,—হে মহাভাগ! অর্থাৎ তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সর্ব্বদা থাকিবার সৌভাগ্যলাভে যথার্থ যোগ্য, আমরা কিন্তু তাদৃশ সৌভাগ্যলাভে অযোগ্য বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছি। মহাভাগ সম্বোধনের ধ্বনিতে এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। হে উদ্ধব! আমার পিতা পর্জ্জন্য গোপ মহাশয় আমার ও বসুদেবের বাল্যবয়সে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধিতে-আমারই মত তাহাকেও একসঙ্গে পালন করিতেন। তুমি বোধ হয় জান, আমার পিতামহ দেবমীঢ় নামে যাদব দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী ক্ষত্রিয়া অপরটী বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন ও বৈশ্যাগর্ভে আমার পিতা পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "মাতৃবদ্বর্ণশঙ্করঃ" এই শাস্ত্ররীতি অনুসারে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীশূরপুত্রই বসুদেব। অতএব বসুদেবের সহিত আমার কেবল ভ্রাতৃসম্বন্ধই নহে কিন্তু শৈশবে একসঙ্গে "খেলুয়া" বলিয়া সখা-সম্বন্ধও আছে। সেই সখা বসুদেব সম্প্রতি রাম গদ প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কুশলে আছে ত? এবং সেই বসুদেবের অন্যান্য সুহৃদ্ যাদবগণ যাহারা কংসভয়ে ভীত হইয়া কোশলাদি রাজ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কি সম্প্রতি মথুরায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে? আহা! বসুদেব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কংসকর্ত্তৃক কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া কতই না যাতনা পাইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীনারায়ণের প্রসাদে সেই কারাগৃহবাস-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। বড়ই সৌভাগ্যের কথা, পাপবুদ্ধি কংস নিজপাপে অনুজবর্গের সহিত মরিয়াছে। নাইবা মরিবে কেন? যে পাপমূর্ত্তি কংস সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ যাদবগণের প্রতি রাশি রাশি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, সেই পাপে তাহার মরণ অনিবার্য্য। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বিনাশ করিয়াছেন এইরূপ উল্লেখ না করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ করিবার সামর্থ্য-বিষয়ে পিতার অসম্ভব-বুদ্ধি। দেখ উদ্ধব! যাদবগণ সদাচারনিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়াই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় যাইবার জন্য অনুমোদন করিয়াছিলাম। কারণ শ্রীনারায়ণপ্রসাদে আমাদের বিপৎকালে কৃষ্ণের ভিতরে নারায়ণীশক্তির মাহাত্ম্য হয় বলিয়া সেই সেই বিপৎকালে কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সাধু যাদবগণের বিপদ্ দেখিয়া নিজের দুঃখের গণনা না করিয়াও তাঁহাদের কল্যাণার্থে কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলাম এবং তথায় রাখিয়া হতাশজীবন লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলাম। আচ্ছা উদ্ধব! আমরা পরম্পর শুনিতে পাইয়াছি, অতি বালক সেই রামকৃষ্ণ উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবার জন্য অতি দূরদেশ অবন্তীনগরে গিয়াছে, এবং অতি দুঃখময় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। আহা! যাহারা দণ্ডে সাতবার না খাইলে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত, তাহারা কেমন করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছে? এবং পায়ে হাঁটিয়া অতদূরদেশ অবন্তীপুরে গিয়াছে? সে কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ কি, মথুরায় আসিয়া যাদবসভায় মিলিত হইয়াছে! হে উদ্ধব! যে নবজলধর শ্যাম চিরকাল আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিয়াছিল, সেই কৃষ্ণপিতা আমার কথা কি স্মরণ করে? যে যশোদা অষ্টম মাসে প্রসূত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণের দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিয়া থাকে, হে বৃষ্ণিপ্রবর! তোমার নিকটে কখনও কি সে তার সেই মায়ের কথা স্মরণ করে? তাহার মাতৃগোত্রে ও পিতৃগোত্রে সম্বন্ধান্বিত যাহারা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সৌহার্দ্দের কথা কি কখনও তাহার হৃদয়ে জাগে? অতিবাল্যবয়সজন্য যাহাদের সহিত মিলিত না হইতে পারিলে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িত, সেই সকল সখাগণের প্রতি নিজজন-ভাব কি হৃদয়ে পোষণ করে? কৃষ্ণ

নিজের প্রতিনিধিরূপে যে সকল সখাগণকে গো-রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিত, সেই সকল সখাগণের কথা কি ভোজনকালে স্মরণ করে? যে ব্রজের নিখিলবস্তু কৃষ্ণ-সুখের জন্য অর্পিত হইয়াছে এবং নিজেও আত্মসুখদুঃখের প্রতি গণনা না করিয়া যে ব্রজের সুখসম্পাদনে সতত ব্যাকুল থাকিত, সেই ব্রজের কথা কি কখনও তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়? আমরা সকলেই জানি কৃষ্ণ ব্রজের প্রত্যেকটী ধেনুকে নিজ হইতেও অধিক বলিয়া মনে করিত এবং নিজকরে তৃণগ্রাস ধরিয়া তাহাদিগকে পোষণ করিত সেই সকল ধেনুগণের কথা কি তাহার মনে আছে? যে বৃন্দাবিপিন নয়নপথে উদিত হইলে কৃষ্ণ ভোজন পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইত,—এক্ষণে কৃষ্ণ কখনও কোন প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে করে কি? আহা! যে গিরিরাজকে ছত্রাকারে ধারণ এবং যাহার প্রত্যেকটী স্থান নিজ চরণ-চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত করিয়াছিল, এইক্ষণ সেইসকল স্থান যে তাহার বিরহে বৃথা হইয়াছে ইহা কি তাহার অনুভব করিবার অবসর আছে?

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্॥
দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা॥
স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ॥
সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্॥

হে উদ্ধব! কৃষ্ণ বর্ত্তমান্ সময়ে যে প্রকার দুস্তর চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, এই অবস্থায় তাহার আমা-দিগকে স্মরণ করিবার অবসর দেখিতে পাই না। আমার রামকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল তখন কোন চিন্তাকার্য্যের ভার তাহাদিগকে দিতাম না। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের ঘটনা যে কংস নিহত হওয়ায় তাহার পত্নী "অস্তি" ও "প্রাপ্তি" নিজ পিতা জরাসন্ধের নিকটে কৃষ্ণের নামে নানা কুৎসা-কথা বলিয়া তাহাকে এমন কুপিত করিয়া তুলিয়াছে যে, জরাসন্ধ প্রভৃতি মহারথি অসুররাজগণ কৃষ্ণের প্রতি প্রচুর দৌরাত্ম্য করিবার জন্য বদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে যাদবগণকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, এই বিষম চিন্তায় কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কংসকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যে সকল যাদব দেশ-দেশা-ন্তরে গুপ্তভাবে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই সেই দূরদেশ হইতে মথুরায় আনিয়া সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চিন্তায় বিব্রত হইয়াছে। এত দুরন্ত চিন্তার ভিতরে আমা-দিগের কথা কিরূপে মনে রাখিতে পারে, এইজন্য তোমার নিকট এইসকল প্রশ্ন করিলাম।

এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীউদ্ধব কহিলেন—হে ব্রজরাজ! মেধাবী ও কৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই আপনা-দের কথা স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু আপনাদের নিকটে বলিয়াছিলেন "জ্ঞাতিং বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্। অর্থাৎ সুহৃদ্ যাদবগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া জ্ঞাতি আপনাদিগকে দর্শন করিতে যাইব।" সুতরাং তিনি সত্বরই ব্রজে আসিতেন, কিন্তু কার্য্যানু-রোধে ব্রজে আসিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে। উদ্ধবের এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া শ্রীব্রজরাজ কহিলেন—সে যদি সর্ব্বদাই আমাদের কথা স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের মুখ্য ফলরূপ তাহার একবার ব্রজে আগমন, যাহা সর্ব্বদাই আমরা মুখ্য প্রিয়তম বলিয়া মনে করি সে বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। গোকুলপালক গোবিন্দ স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিবার জন্য কি ব্রজে আসিবে? ইহারা সকলেই যে তাহার অদর্শনে মণিহারা ফণির মত পাগল হইয়া পড়িয়াছে। হে উদ্ধব! ব্রজে এমন কেহই নাই যে জন আমার পুত্র কৃষ্ণকে প্রাণকোটী হইতে অধিকতর প্রীতি না করে। এই প্রকার নিজ নিজ ব্রজবাসিদিগকে দেখিবার জন্য তাহার ব্রজে অবশ্যই আসার প্রয়োজন, বিশেষতঃ গোকুল রক্ষার জন্য সে নিজে কত রাশি রাশি দুঃখ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ ব্রজে আসিয়া ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দিবার আশা আর মনে পোষণ করি না। কেবলমাত্র তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিবার জন্য একবারও কি ব্রজে আসিবে? আহা মরি মরি! এই

দুরন্ত-বিরহ-মহাব্যাধিতে ব্রজবাসিজনার কি যে অনির্ব্বচনীয় সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। নিজ বন্ধুবান্ধব মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে যেমন তাহাকে দেখিতে আসা বন্ধুজনের অবশ্য কর্ত্তব্য, তেমন ভাবেও কি কৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিবে না? ব্রজবাসিদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহারা আর বেশী দিন বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যদি ইহারা মরিয়া যায়, তাহা হইলে এ জীবনে তাহার সহিত ব্রজবাসিদিগের আর দেখা হইবে না। সেও ব্রজবাসিদিগের চির-অদর্শন-জনিত দুঃখে মর্ম্মাহত হইবে।

হে উদ্ধব! বিরহব্যাকুলিত প্রাণ তাঁহার মুখখানি দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করে। আহা! যে মুখে সুন্দর নাসিকা, সুন্দর হাসি, সুন্দর চাহনি, সেই মুখখানি আবার কখন কি দেখিতে পাইব? সেই মুখমাধুর্য্যের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীনন্দমহারাজ যেন মোহদশাই প্রাপ্ত হইতেছিলেন। নিজের বাঁচিবার প্রতি আশা খুবই শিথিল হওয়াতে আরও অধিকতর ভাবে মর্ম্মাহত হইলেন। অনেকক্ষণ পর যেন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নিজেদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে আত্মসুখদুঃখের দিকে না তাকাইয়া শত শত স্নেহবিশেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিজ সান্ত্বনার জন্যই যেন সেই সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যতই তাঁহার স্নেহের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—অহো! পরম-বাল্যকাল হইতেই আমাদিগকে বারংবার নানা বিপদ হইতে সে রক্ষা করিয়াছে—তাহা তোমার নিকট এক দুই করিয়া কতই বা বর্ণনা করিব? যেদিন কালীয় নাগের মাথায় নাচিতেছিল,—সেইদিন রাত্রিতে কালীয় হ্রদের উপকূলে একটী বনের ভিতরে আমরা সকল ব্রজবাসী যখন নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময় চতুর্দ্দিক হইতে দাবানল আসিয়া আমাদিগকে পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত ব্রজবাসিগণকে রক্ষার জন্য নিজের দুঃখের দিকে না চাহিয়া সেই বিস্তৃত দাবানল ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহার সেই প্রকার ব্যবহারে অগ্নির মনে এমনি করুণার উদয় হইল যে, দাহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুধার মত সন্তর্পণ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিল। তখন সকল ব্রজবাসীর মনেই ত্রিকালদর্শী গর্গাচার্য্য মহাশয়ের "নারায়ণসমো গুণৈঃ" কথাটী জাগিয়াছিল। এই প্রকার দেবরাজ ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষ, বৃষাসুর, সর্পাকৃতি অঘাসুর, অম্বিকাবনের অজগর সর্প প্রভৃতি হইতে আমাদের কত কত বার রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল বিপদ সাধারণ নহে। অন্যান্য মরণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ হইতেও কত কত বার রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল বিপদ যখন উপস্থিত হইত, তখন ব্রজবাসীর মধ্যে কেহই আর প্রাণে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করিতে পারিত না, কিন্তু কৃষ্ণের কারুণ্যাদি প্রভাবে ও নিরুপাধি-প্রেমাস্পদাদি স্বভাবে সেইসকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। সেই সকল প্রভাব ও স্বভাব কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমরা সকল ব্রজবাসীই তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। হে উদ্ধব! অনেকেরই পুত্র হয় বটে কিন্তু এত গুণের পুত্র কেহ কোথাও পাইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছ কি? আমি আবার বজ্র হইতেও এত কঠিনহৃদয় যে, এত গুণের পুত্রকে নিজ হাতে ঘরের বাহির করিয়া মথুরায় রাখিয়া আসিয়াছি। এবং শূন্যপ্রাণে ঘরে আসিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। এই প্রকারে নিজ পুত্রের মাধুর্য্য ও প্রভাব স্মরণ করিয়াও চিত্তের স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীব্রজরাজ অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে নিজের প্রাত্যহিক দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! আমার এইটীই প্রাত্যহিক দুঃখ যে, পূর্ব্বে তাহার মুখচন্দ্রস্মরণসুখেই আমার সকল সন্তাপের শান্তি হইত, কিন্তু বর্ত্তমান আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃই তাহার মুখচন্দ্রস্মরণই সর্ব্বসন্তাপের কারণ হইয়াছে। কৃষ্ণের সেইসকল দাবাগ্নিভক্ষণ প্রভৃতি প্রভাবময় চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে স্নানভোজনাদি দেহকৃত্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মত—অননুসন্ধানে ও অনভিনিবেশে কেবল সংস্কারের বশে স্নান-ভোজনাদি কৃত্য চলিতেছে। আহা! যখন কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন যে ভঙ্গীতে নেত্রদুটির দুই ভাগ আমার চরণে ও একভাগ আমার মুখে অর্পণ করিয়া চাহিত

এবং আমার নিকটে যেমন করিয়া হাসিত ও আমার সহিত মধুর ভঙ্গীতে যেমন করিয়া কথা বলিত, সেই সেই চাহিবার ও হাসিবার এবং কথা বলিবার ভঙ্গী আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া—মর্ম্মস্থান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে; তাহাতে মনে হয় উদ্ধব! আমি বুঝি আর জীবনে বাঁচিব না,—আর বুঝি তাহার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব না! তাহার সেই-সকল চাহনি, হাসনি ও মধুর ভাষা প্রভৃতি প্রত্যেক ভঙ্গী-তেই অসাধারণ স্নেহভরা থাকিত। আহা! আমার কৃষ্ণ যখন নিজ জননী ব্রজেশ্বরীর নিকটে যাইত, তখন কত আব-দার, কতই না চাপল্য প্রকাশ করিত। আবার যখন আমার নিকটে আসিত, তখন কত সুশান্তভাবে গাম্ভীর্য্যযুক্ত স্নেহভরা ব্যবহার করিত! কখনও সম্পূর্ণভাবে আমার মুখের পানে চাহিত না। সেই সকল কথা মনে পড়িয়া হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি কখনও ভাবি নাই যে, এত সত্বর সুখের আলো হইতে আমাকে শোকান্ধ-কারে পড়িতে হইবে।

হে উদ্ধব! হয়ত তুমি মনে করিতে পার, "নিজগৃহে বসিয়া থাকাতেই পুত্রের কথা আপনার অধিকভাবে স্মরণ হইতেছে। সেই হেতু তাহাকে ভুলিবার জন্য নিজেই যদি গোপালন করিতে করিতে যমুনাতীরাদিতে ভ্রমণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেকটা পরিমাণে পুত্রের কথা ভুলিয়া শান্তি পাইতে পারিবেন বলিয়া মনে করি।" হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তাহাতেও কোন প্রতিকার হয় নাই, বরঞ্চ গৃহ হইতে বাহির হইলে আরও অধিক পরিমাণে, পুত্রের কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনাই অনুভব করিয়া থাকি। কারণ যমুনার তীর, পর্ব্বতের গহ্বর, শিখর, উপত্যকা, বনপ্রদেশ প্রভৃতি যে যে স্থানে কৃষ্ণ বিহার করিয়াছেন, সে সমুদয় স্থানগুলিই অদ্যাপি মুকুন্দপদচিহ্নে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। এই গোকুলের এমন কোনও স্থান নাই যেখানে আমার কৃষ্ণ বিহার করে নাই। আবার এমন স্থান নাই যে স্থলে আমার শ্যামসুন্দরের পদচিহ্ন নাই। পৃথিবীদেবীও যেন নিজ বিভূষণরূপে নিজবক্ষে অদ্যাপি সেই সকল পদচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই পদ-চিহ্নগুলিও এত মনোহর যে দর্শন করিবামাত্র প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে কৃষ্ণউদ্দীপন করিয়া দেয়। সুতরাং সেই পদচিহ্ন-গুলি দেখিবামাত্র মর্ম্মস্থানে এতই বেদনা উপস্থিত হয় যে, মনে হয় "হে পদচিহ্ন! তোমরা এখনও এখানে অবিকৃত রহিয়াছ, কিন্তু আমার পুত্র কৃষ্ণ কোথায়?" এই ভাবে আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ি, এবং সেখান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিবার সামর্থ্যও আমার থাকে না। কেবল হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। আমি কোন স্থানে কোন প্রকারেই "সোয়াস্তি" লাভ করিতে পারিতেছি না। আমার পক্ষে ঘর বন উভয়ই সমান হইয়াছে। যখন ঘরে আসি, যে ঘরের দিকে তাকাই, সেই ঘরই আমার হৃদয়ে কৃষ্ণের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। কারণ এমন কোন গৃহ নাই যেগৃহে আমার কৃষ্ণ বিহার করে নাই। কোন স্থানে না যাইয়া কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল অন্ধের ন্যায় গৃহে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা ভিন্ন চিত্তশান্তির কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না। হে উদ্ধব। যেদিন শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে উমাধবের পূজা করিবার জন্য অম্বিকাবনে গিয়াছিলাম, সেদিন রজনীতে একটী প্রকাণ্ড অজগর সর্প আমায় গ্রাস করিয়াছিল। তখন আমি কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হইব এই ভয়ে পুত্র কৃষ্ণকে ডাকায় কৃষ্ণ গর্গাচার্য্য কথিত "নারায়ণ সম" প্রভাবে সেই সর্পবদন হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া সেই হইতে তাহাকে আমি "মুকুন্দ" বলিয়া ডাকি।

মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা।।
কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ।।
তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্।।
প্রলম্ব-ধেনুকারিষ্ট-তৃণাবর্ত্ত বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতা হতা যেনেহ লীলয়া

শ্রীল ব্রজরাজ এইরূপে নিজপুত্রের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে পুনরায় হঠাৎ মাধুর্য্য স্ফুরণ হওয়ায় কোন প্রকা-রেই চিত্তের স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারিয়া, মনে মনে

ভাবিলেন, পুত্রবুদ্ধিতে কৃষ্ণের প্রতি আমার অতুলনীয় স্নেহই এত দুঃখের মূল হেতু, এই আশঙ্কায় স্নেহ আচ্ছাদন করিবার আশায় বিশ্লেষ বিশেষময় প্রীতিজাতির স্বভাবেই হউক্ অথবা তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছায়ই হউক্ পুনর্ব্বার তাঁহার অলোকসামান্য প্রভাবের কথা স্মরণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে, গাঢ় প্রীতির স্বভাব এই যে—বিরহ অবস্থায় প্রিয়জনের মাহাত্ম্য অধিকরূপে স্ফুরণ করাইয়া দেয়। এইজন্য শ্রীব্রজরাজ রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! আমার মনে হয়—রাম এবং কৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহে। ইহারা কোনও দেবশ্রেষ্ঠ হইবে। নিজ ইচ্ছাবশতঃ দেবগণের কার্য্য সাধনের জন্য অর্থাৎ কংসাদি অসুরগণকে বধ করিতে নিজ ইচ্ছায় এবং আমার ও বসুদেবের সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের গৃহে জন্ম স্বীকার করিয়াছে। ইহারা কর্ম্মাধীন জীবের মত নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। হে উদ্ধব! আমি এই পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহাধীন হইয়াছি বলিয়া আমার প্রতি বিষয়ী বুদ্ধিতে কুদৃষ্টি করিও না। কারণ কৃষ্ণ ও বলদেব সাধারণ মনুষ্য নহে, যেহেতু মহানুভব শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় এই রামকৃষ্ণকে সুর ও মুনিগণের ধ্যেয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহাদের দুইজনের প্রভাব তোমরা এবং আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। ভাবিয়া দেখ, যে কংস দশসহস্র হস্তীর বল নিজ অঙ্গে ধারণ করিত, সেই কংসকে মঞ্চ হইতে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া যেরূপে বিনাশ করিয়াছে, সাধারণ মানুষে কি এইরূপ ক্ষমতা কখনও সম্ভবে? আরও দেখ, সেই কুবলয়াপীড় হস্তীকে এবং অম্বষ্ঠ নামক অসুরকে ও চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লবৃন্দকে সর্ব্বসমক্ষে অবহেলাক্রমে বিনাশ করিয়াছে। সেই মহাদেবের ধনুখানিকে—মত্তহস্তী যেমন ইক্ষুদণ্ডকে বিদলিত করে তেমনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়াছে। মৃগাধিপতি সিংহ যেমন পশুগণকে বিদ্রাবিত করে, তেমনি ভাবে সে সকল অসুররাজগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিল। যে ধনুখানিকে ভঙ্গ করিয়াছিল, সে ধনুখানিও সাধারণ নয় তাহার দৈর্ঘ্য তিন তাল অর্থাৎ ১৮০ হাত পরিমাণ ছিল। অথচ ধনুখানি খুব জীর্ণ ছিল তাহাও নহে। এই ব্রজ মধ্যে ৭ বৎসর বয়সে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সপ্তাহকাল একস্থানে দাঁড়াইয়া বামহস্তে অনায়াসে ধারণ করিয়াছিল। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত, বক প্রভৃতি যে সকল অসুরগণ নিজ অসাধারণ প্রভাবে দেব ও অসুরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, সেই সকল অসুরগণকে আমার পুত্র কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়াছে।

> ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
> অত্যুৎকণ্ঠোঽভবত্তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ॥
> যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
> শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥'

শ্রীল ব্রজরাজ এইরূপ নিজপুত্রের ঈশ্বর-সমোচিত প্রভাব স্মরণ করিতে করিতে অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিতে লাগিলেন—হে উদ্ধব! যদ্যপি তাহাদের এইপ্রকার অসামান্য প্রভাবে তাহাদের প্রতি পরমেশ্বর ভাবই পোষণ করা উচিত, কিন্তু আমার হৃদয় তাহাদের প্রতি পুত্রবুদ্ধিতে কেবল স্নেহকোমলতাই পোষণ করিতেছে। কোনও প্রকারেই তাহাদিগকে ঈশ্বর ভাবিবার আমার ক্ষমতা নাই। হায়! আমার মনোবেদনার কথা তোমাকে আর কি বলিব? আমার মনে হয়—নবনীত প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের ভিতরেও কাঠিন্য আছে; কিন্তু আমার হৃদয়ে রামকৃষ্ণের প্রতি যে অতুলনীয় স্নেহ তাহার ভিতরে কাঠিন্যের লেশমাত্রও নাই। তাহাতেই আমি সর্ব্বদা কাতর হইয়া পড়িতেছি! এই ত্রিভুবনে এমন কাহারও সামর্থ্য নাই, যে আমার রামকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি কিছুমাত্রও শিথিলিত করিতে পারে। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল ব্রজরাজের কণ্ঠরোধ হইল এবং নয়ন দুটী জলে পরিপূর্ণ হইল। হায়! এমন কে আছে যে ব্রজরাজের পুত্রবাৎসল্য জন্য কাতরতার কথা ভাষায় বর্ণন করিতে পারে? শ্রীব্রজরাজের ক্রমশঃ নিশ্বাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। সুতরাং অন্য কোনও প্রসঙ্গ করিবার সামর্থ্য থাকিল না। ব্রজরাজ পুত্রপ্রেমের আবেগে এত প্রচুরতর নিজ পুত্রের

ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াও তাঁহার বসুদেবের মত সম্বন্ধজ্ঞানের কিছুমাত্রও শৈথিল্য ঘটিল না এবং অনুরাগও সঙ্কুচিত হইল না।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীনন্দ গাম্ভীর্য্যের বলে ধৈর্য্য ধরিয়া লৌকিক-রীতি অবলম্বনে উদ্ধবকে আতিথ্যে সম্মান করিতে, সম্যক্ দর্শন করিতে, পরিচয় করিতে, কুশল-প্রশ্ন করিতে এবং কৃষ্ণের প্রভাবময় চরিত্র বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমাতা শ্রীযশোদা কিন্তু অধৈর্য্য-সিন্ধুর ঘূর্ণিপাকে উন্মজ্জন-নিমজ্জনবতী হইয়া সেই সমুদয় কিছুই করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন না। যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শত শত ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইয়াও "আমি পুত্রমুখ দর্শন বিনা অন্য কিছুই দেখিব না"—এইরূপ সঙ্কল্পে প্রত্যেকের নিকটে অন্ধের মত চক্ষু মুদিয়াই থাকিতেন। যখন শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের নিকট নিজপুত্রের প্রভাবময় চরিত্র বর্ণন করিতেছিলেন, তখন নিজপুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে—পুত্রস্নেহে—স্তন হইতে মেঘমুক্ত জলধারার মত দুগ্ধবর্ষণে এবং নয়ন হইতে বিগলিত শোকাশ্রুধারায় স্তনোপরিস্থিত বসন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আহা! মরি! মরি! ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহের মহিমার কত গুরুত্ব! ঐশ্বর্য্যময়-চরিত্র-শ্রবণেই এইভাব,—সৌন্দর্য্যাদিময়-মাধুর্য্য-শ্রবণে না জানি মায়ের কি অবস্থা ঘটিত? এখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স একাদশ বর্ষ, তথাপি পুত্রস্নেহে স্তন হইতে মেঘের জলধারার মত দুগ্ধবর্ষণ হইতে লাগিল। এই সকল অবস্থার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়—মা ব্রজেশ্বরীর, 'পুত্রবুদ্ধিতে' কৃষ্ণের প্রতি যে স্নেহাতিশয্য তাহা স্বভাবসিদ্ধ। সাধারণ জননীর মত—জন্যজনকসম্বন্ধে আগন্তুক নহে।

দয়াল নিতাই চাঁদ

(শ্রীগোপীনাথ বসাক)

শীতল কর-কমল-বর কোমলজিনি নবনীরে
তাপিত তনুপর যবহি দেল।
যুগহি যুগ পরিবর্ত্তন জাত তাপ তৈখন
নিমেষ-মাহা নিশেষ জনু ভেল॥
কি পেখনু নিতাই চাঁদে করুণা নিরুপাধিয়া।
অশেষ অপরাধী কিয়ে নিন্দুক কিয়ে দাম্ভিক
কিয়ে আতুর বধির মুক আঁধিয়া॥
করুণা রসে ঢর ঢর চলই গোরা আবেশে
অরুণ দিঠে গলত প্রেমধারা।
বিচার নাহি দেয়াদেয় সমুখে যাক পেখই
হৃদয়ে টানি বোলত গোরা গোরা॥
অগতি নীচ পতিত কিয়ে কিয়ে যবন চণ্ডাল
যাকর গুণে পাবন নামধারী।
সনকাদিক সেবনরসে জগত-জনে ভাসাওল
গোপীভাব-লালসা মাহা ভারি॥

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | বৈশাখ—১৩৪০ | নবম সংখ্যা

জীবের মনুষ্যজন্ম—৮

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

মায়াবদ্ধ মনুষ্য সাধুকৃপালাভে বঞ্চিত হইলে ভগবদ্ভজন-বিমুখ হইয়া তাহার দেহের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে চাহে না, অধিকন্তু ঐ নশ্বর ও জড়-দেহের পুষ্টিসাধন জন্য জীবহিংসা করিয়া নরকেই পতিত হয়। শ্রীনারদ বলিয়াছেন :—

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমি বিড্ ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥

ভাগ ১০।১০।১০

দেহ নরদেব বা ভূদেব বাচ্য হইলেও, অর্থাৎ রাজদেহ বা ব্রাহ্মণদেহ হইলেও, মৃত্যুর পর তাহার তিন প্রকার অবশ্যম্ভাবী পরিণামই দৃষ্টিগোচর হয়—পুত্রাদি কর্ত্তৃক দগ্ধ না হইলে কৃমিতে পরিণত হয় কিম্বা কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠায় পরিণত হয়; আর যদি পুত্রাদি কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ভস্মেই পরিণত হয়। এই তিনটি ভিন্ন দেহের আর পরিণাম নাই। এতাদৃশ অবশ্যম্ভাবি-পরিণামশীল দেহরক্ষার জন্য যাহারা প্রাণী সকলকে উৎপীড়িত করে তাহারা কখনই নিজের মঙ্গলবিধানে সমর্থ হয় না, কারণ জীবহিংসাই নরকগমনের প্রধান সোপান।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য তাহার ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর, এরূপ আস্থা স্থাপন করে যে দেহের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুরও প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে চাহে না। শ্রীবসুদেব কংস মহারাজকে বলিয়াছিলেন :—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥

ভাগ ১০।১।৩৮

হে বীর! জন্মগ্রহণকারী জীবমাত্রেরই দেহের সহিত মৃত্যুও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্যই হউক কিম্বা শতবৎসর পরেই হউক মৃত্যুই প্রাণিবর্গের সর্ব্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্যের দেহ পতনোন্মুখ হইলেও সে তদ্দ্বারা বিষয়ভোগ সম্পাদনই করিতে চাহে, আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিতেও চাহে না। শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

কোঽর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন

ভাগ ১১।১০।২০

অর্থাৎ মৃত্যুই যখন মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সকল সময়েই তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে এবং একদিন নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে, তখন এমন কি বিষয়ভোগ আছে যাহা তাহাকে সুখী করিতে পারে? যে ব্যক্তি বধস্থানে নীত হইয়াছে তাহার নিকট কি পায়সপিষ্টকাদি তুষ্টিপ্রদ হইতে পারে? কিন্তু ভগবদ্ভজনবিহীন মনুষ্য এতই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন যে আসন্ন মৃত্যু সময়েও বিষয়ভোগসুখই তাহার বাস্তবিক তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট পশু ছাগই বলি-দানের পূর্ব্বক্ষণেও নৈবেদ্যভোজনে প্রবৃত্ত হয় এবং ছাগী দেখিলে তাহার প্রতি ধাবিতও হয়। ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্যের এই পশু হইতে কোনও বিশিষ্টতা নাই!

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য তাহার পূর্ব্বোক্ত পরিণামশীল দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেই তুচ্ছ দেহে এরূপ প্রীতিস্থাপন করে যে সে কিছুতেই সে দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না। প্রারব্ধদোষে নরকে যাইলেও নারকী দেহের উপরও তাহার সেই একরূপই প্রীতি হইয়া থাকে। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন :—

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাং স্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়া বিমোহিতঃ॥

ভাগ ৩.৩০।৫

অর্থাৎ জীব নারকীয় যোনিতে গমন করিলে যন্ত্রণাময় নারকদেহও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, কারণ ভগবন্মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি যে তাদৃশ নিকৃষ্ট যোনিতেও জীব তদুচিত আহার ও স্ত্রীসঙ্গাদি ভোগে পরিতৃপ্ত হয়।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য যে দেহের উপর মমতাবুদ্ধি করিয়া থাকে তাহার যথার্থ স্বামী যে কে তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। শ্রীনারদ তাই বলিয়াছেন :—

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥

ভাগ ১০।১০।১১

যে দেহের সংরক্ষণার্থ মায়াবদ্ধ জীবের এতাদৃশ যত্ন সেই দেহটি কাহার? দেহ কি অন্নদাতার বা জন্মদাতার বা মাতার বা মাতামহের, অথবা ক্রেতার বা বলবান্ রাজাদির, কিম্বা অগ্নি বা কুকুরের? দেহটি যে ইহাদের মধ্যে কাহার সম্পত্তি তাহা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য স্ত্রীপুত্রস্বজনবান্ধবাদিতেই মমতাস্থাপন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যে কেবল ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যামাত্র তাহা সে বুঝিয়াও বুঝে না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥

ভাগ ১১।১৭।৫৩

অর্থাৎ এ জগতে স্ত্রীপুত্র-স্বজনবান্ধবাদির সমাগম কেবল পান্থশালায় বা প্রপায় বিভিন্ন দিক্ হইতে সমাগত পথিকগণের পরস্পর সমাগমের মত। ঐ পথিকগণ কেহ কাহারও সহিত সম্বন্ধান্বিত না হইলেও ক্ষণকালের একত্র মিলন জন্য পরস্পর পরিচিত হইয়া থাকে! এ জগতে পুত্রকলত্রাদির সঙ্গমও ঠিক সেইরূপ। বিশ্রাম ব জলপান প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই পথিকগণ যেমন আপন আপন গন্তব্যপথেই চলিয়া যায়, কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, এই সংসারে পুত্রকলত্রাদিও সেইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ সিদ্ধ হইলেই ছাড়িয়া চলিয়া যায়, যাইবার সময় বলিয়াও যায় না। স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অনুবর্ত্তী হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মনুষ্যের মমতাস্পদীভূত পরিজনবর্গও তাহার ক্ষণস্থায়ী দেহেরই অনুগমন করে এবং দেহ নষ্ট হইলেই তাহাদের সম্বন্ধেরও নাশ হইয়া যায়। শ্রীগরুড়পুরাণ এই তত্ত্বই অতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন :—

যথা হি পথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রাম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥

অর্থাৎ আতপতপ্ত পথিকগণ যেমন কোন এক বৃক্ষ-ছায়া আশ্রয় করিয়া বিশ্রাম করে এবং বিশ্রামের পর নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করে, এই সংসারে জীবগণের সঙ্গমও ঠিক সেইরূপ। যেমন মহাসমুদ্রে পতিত কাষ্ঠখণ্ড-দ্বয় তরঙ্গাঘাতে অনবরতঃ বিতাড়িত হইয়া কখনও পরস্পর

মিলিত এবং কখনও বা বিশ্লিষ্ট হয়, এই সংসারে জীব-সকলের সমাগমও ঠিক সেইরূপ। অনুরূপ প্রারব্ধবশে জীব সকল একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর প্রারব্ধকর্ম্মফল ভোগ করে, এবং ভোগাবসানেই অন্যত্র অন্য প্রারব্ধ ভোগের জন্য গমন করে। এতদ্ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে কাহারও সহিত কাহারও নাই।

সহস্র চেষ্টা ও উপদেশ সত্ত্বেও লোকের দিঙ্‌মোহ যেমন সহজে নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু সূর্য্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের ফলেই তাহা দূর হইয়া প্রকৃত দিগ্‌জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমুদায় বহির্ম্মুখ মনুষ্য সহস্র চেষ্টা ও উপদেশ সত্ত্বেও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু একমাত্র সাধুকৃপাবলে ভগবচ্চরণোন্মুখ হইলেই তৎসমুদায় তাহার সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবচ্চরণ প্রসাদেই জীবের সকল হৃদয়গ্রন্থি ও সংশয় সমূহ সম্যক্‌রূপে সংচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অন্য কোনও উপায়ে এই দুরতিক্রমণীয়া মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় এতৎপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করিয়াছেন :—

শূরসেন প্রদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাঁহার অতুলপ্রভাবে ধরণী কামধেনুর ন্যায় তদীয় যাবতীয় অভিলাষই পূরণ করিতেন। কিন্তু বহুভার্য্যা সত্ত্বেও অনপত্যতা নিবন্ধন তিনি হৃদয়ে কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। একদা মহর্ষি অঙ্গিরা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলে মহারাজ চিত্রকেতু তাঁহাকে তাঁহার হৃদয়ের বেদনা জানাইয়াছিলেন। ঋষি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট চরু তাঁহার পট্টমহিষীকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, হে নরনাথ! এতদ্দ্বারা তোমাকে হর্ষ-শোকপ্রদ একটি পুত্র প্রদান করা হইল। ঋষি প্রস্থান করিলে রাজমহিষী যথাসময়ে গর্ভধারণ ও এক অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রপ্রাপ্তিতে রাজার আনন্দের সীমা রহিল না, বালকের মঙ্গল কামনায় তিনি পর্য্যাপ্তের ন্যায় বিপ্রাদিকে বিবিধ সামগ্রী প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পুত্রবতী মহিষীর সৌভাগ্য দর্শনে তাঁহার সপত্নীগণ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া কিয়ৎকাল পরে ঐ বালককে বিষপ্রদান পূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিল। প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুহেতু মহারাজ চিত্রকেতু ও তন্মহিষী শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। উভয়ে মৃতপুত্রের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং সমগ্র জনসমূহ শোকে ও মোহে হতজ্ঞান হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি অঙ্গিরা দেবর্ষি নারদ সহ তথায় উপনীত হইলেন, কিন্তু শোকবিহ্বলতাহেতু চিত্রকেতু তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ঋষি রাজা চিত্রকেতুকে বিবিধ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছেন তাহার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ তাহা কি চিন্তা করিয়াছেন? জলপ্রবাহবেগে বালুকাসমূহ যেমন পরস্পর মিলিত হয় এবং পুনরায় বিযুক্ত হইয়া কোথায় কোনটি গিয়া পড়ে, কেহ তাহার অনুসন্ধান রাখে না, সেইরূপ প্রচণ্ড কালের বেগে দেহধারী জীব পরস্পর কখন কে কাহার সহিত মিলিত হয় এবং কখন কেন বিশ্লিষ্ট হয়, কে তাহার নিরূপণ করিতে পারে?

এইরূপ বহু উপদেশেও রাজা কিঞ্চিন্মাত্রও আশ্বস্ত হইলেন না দেখিয়া ঋষি তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, হে নরনাথ! আপনি একজন রাজর্ষি, আমি পূর্ব্বে যখন আপনার গৃহে আগমন করি তখন আপনাকে পরম জ্ঞানের উপদেশ দিবারই আমার অভিলাষ ছিল; কিন্তু আপনার পুত্রলাভের প্রবল বাসনা দেখিয়া আপনার পুত্রৈষণাদি দূর করিবার জন্যই আপনাকে হর্ষশোকপ্রদ এই পুত্রটি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম। সম্প্রতি পুত্রলাভের পরিতাপ আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। কেবল পুত্র কেন, দারাপত্যধনগৃহাদি সকলই যে অনিত্য ও অশোচ্য, তাহা আপনার অবধারণ করা একান্ত বিধেয়।

এতাদৃশ উপদেশ বাক্যেও যখন রাজার শোকাপ-নোদন হইল না তখন দেবর্ষি নারদ স্বীয় যোগবলে মৃত-শিশুর কলেবরে জীবাত্মাকে আনয়ন করতঃ বলিলেন, হে জীব! তোমার বিরহ জন্য শোকে একান্ত কাতর ত্বদীয়

পিত্রাদি স্বজনবর্গের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর এবং পূর্ব্ববৎ এই দেহ আশ্রয় করিয়া জীবিতের ন্যায় আচরণ কর। জীব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন :—

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেব তির্য্যঙ্ নৃযোনিষু॥
বন্ধুজ্ঞাত্যারিমধ্যস্থমিত্রোদাসীন বিদ্বিষঃ।
সর্ব্বএব হি সর্ব্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ॥

ইত্যাদি। ভাগ ৬।১৬।৫

অর্থাৎ এই ব্যক্তিগণ কোন জন্মে আমার পিতামাতা প্রভৃতি হইয়াছিলেন? আমি ত স্বীয় কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেব পশু ও মনুষ্যাদি বিবিধ যোনিতে বারংবার পর্য্যটন করিতেছি, আমার জন্মপরিগ্রহের ত ইয়ত্তা নাই!

দেখুন, বন্ধু, জ্ঞাতি, অরি, মধ্যস্থ, মিত্র, উদাসীন এবং বিদ্বেষি-ভেদে যত প্রকার ভাবের পরিচয় জগতে পাওয়া যায় সমস্তই মনুষ্যের অতি চঞ্চল সম্বন্ধনিষ্ঠ। অতএব ইহারা সাম্প্রতিক সম্বন্ধে বন্ধু বা জ্ঞাতি বলিয়া যেমন আমার মৃত্যু-হেতু শোক করিতেছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধে শত্রু বলিয়া আনন্দই বা কেন না করেন? জন্মান্তরের শত্রুই ত পুত্ররূপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, সদ্গুণবান্ পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখাধিক্যহেতু লোকেও ঐ পুত্রকেই শত্রু আখ্যা দিয়া থাকে।

মণিকাঞ্চনাদি ধনসমূহ স্বরূপত বিনষ্ট না হইয়া নিরন্তর হস্তান্তরিত হওয়ায় মানবগণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধই যেমন অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ যাহার সহিত যাহার যতকালের জন্য যেরূপ প্রয়োজন সে ততকালের জন্য কেবল প্রয়োজন সমাপ্তি পর্য্যন্তই সম্বন্ধ রাখিয়া পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্ত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রাদির দেহের সম্বন্ধ বিচ্যুত করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণেই পিতাপুত্র সম্বন্ধও বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না। জীবচৈতন্যের কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, কাহাকেও তিনি অনুকূল বলিয়া বন্ধু ভাবেন না, বা প্রতিকূল বোধে শত্রু ভাবেন না। শত্রু-মিত্রাদি ভাব মায়ার বৃত্তি বুদ্ধিরই কার্য্য, জীব কেবল তাহার সাক্ষীমাত্র। অবিদ্যাবশে তাহাতেই অধ্যাসহেতু জীবের ঐ সকল অনিত্য ও অতিদুঃখপ্রদ ভাবের সম্বন্ধ রচিত হইয়া থাকে মাত্র।

জীবাত্মার পূর্ব্বোক্তাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ চিত্রকেতু জ্ঞাতিবন্ধুগণ সহ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাদের দুস্ত্যজ শোক মোহ ও ভয়প্রদ স্নেহ শৃঙ্খল ছিন্ন হইল। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পুত্রশোক পরিত্যাগ করিলে জীবাত্মা প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারা তখন মৃতবালকের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহারাজ চিত্রকেতু পঙ্কপূর্ণ সরোবর হইতে হস্তীর অব্যাহতি লাভের ন্যায় অন্ধকূপ সদৃশ ভীষণ গৃহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় পরাবিদ্যা লাভ করিয়া ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি সপ্তাহকাল মাত্র সেই বিদ্যা অভ্যাস ও মন্ত্রজপের ফলে শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মায়াতিক্রম পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবলি মহারাজ শ্রীবামনদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া
মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ।

ভাগ ৮।২২।৯

হে ভগবন্! বহির্ম্মুখ মনুষ্য যাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া চিরকাল প্রীতি করিয়া থাকে সেই দেহ যখন পরিণামে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিত থাকে, তখন তদ্দ্বারা তাহার কি প্রয়োজন-সিদ্ধি হইতে পারে? পুত্রকলত্রাদি স্বজন অপেক্ষা বহির্ম্মুখ মনুষ্যের প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মত তাহার শত্রুও আর কেহ নাই। কারণ ইহারাই স্বজনবেশে প্রকৃত দস্যুর ন্যায় আচরণ করিয়া তাহার ধন, ধর্ম্ম ও আয়ুঃ হরণ করিয়া থাকে। মনুষ্যের ধনের একমাত্র ফল ধর্ম্ম, কেবল ধর্ম্মাচরণেই মনুষ্য কৃতার্থ হইয়া থাকে। সেই ধন বহির্ম্মুখ মনুষ্য অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদির নিমিত্তই গ্রহাবিষ্টের ন্যায় অকাতরে বৃথা ব্যয় করিয়া থাকে। অতএব স্বজনগণ ছায়া

তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? ভার্য্যাই বহির্ম্মুখ মনুষ্যের জন্মমরণরূপ সংসারপ্রবাহের মূল হেতু, অতএব ভার্য্যায় তাহার কি প্রয়োজন? বহির্ম্মুখের গৃহ কেবল স্বকৃত কারাগৃহ মাত্র, সেই গৃহেই বা তাহার কি প্রয়োজন? ইহাদের সেবা করিয়া বহির্ম্মুখ মনুষ্য কেবল বৃথা আয়ুঃক্ষয়ই করিয়া থাকে। তোমার চরণারবিন্দভজনানুকূল্য ব্যতীত এই সকলের কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনেই করি না।

ভগবদ্ভজনবিমুখ বহির্ম্মুখ মনুষ্যের সকল অনর্থের মূল স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গহেতুই সে নিরন্তর শোক, মোহ ও ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্ত্রীসঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গকেই অধিকতর অনর্থকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
ভাগ ১১।১৪ ৩০

হে উদ্ধব! তুমি নিশ্চয় জানিও যে কামিনী ও কামুকের সহবাসে মনুষ্যের যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন ঘটিয়া থাকে সেরূপ অন্য কোনও বিষয়ের সংসর্গে ঘটে না। বিশেষতঃ স্ত্রীসঙ্গী কামুকের সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, সেই নরপশুই মনুষ্যকে লজ্জা, ভয় ও প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগ করাইয়া নরকের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

ভগবদ্ভজনবিমুখ বহির্ম্মুখ মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গই ধনলোলুপতার একমাত্র কারণ। কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটিই জগতের সকল শোক মোহ ও ভয়ের কারণ হইলেও, কামুক ও ধনলোলুপ ব্যক্তির তাহাতেই এতাদৃশ অভিনিবেশ হয় যে সে তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই প্রয়োজনীয় আছে বলিয়া জানে না এবং দেখিতেও পায় না। এই একই জগৎ ত্রিবিধ মনুষ্যের নিকট ত্রিবিধ অভিনিবেশের বিষয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ।
জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্॥

পরমার্থী ধীর ব্যক্তি সাধুকৃপা বলে ভগবদ্ভজননিষ্ঠ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ভগবন্ময়ই দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ কেবল জগন্নাথকেই ধরিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ ধনলোলুপ ব্যক্তির নিকট সমগ্র জগৎ কেবল ধনময় বলিয়াই প্রতীত হয় এবং যে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে সে কেবল ধন ও ধনার্জ্জনের উপায় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না কামুক ব্যক্তির নিকটেও জগৎ কেবল কামিনীময় বলিয়াই প্রতীত হয় এবং সে যে দিকেই চায় কেবল কামিনী ও কামিনীলাভের উপায় ভিন্ন আর কিছুই দেখে না। কামুক ও ধনলোলুপ ব্যক্তির কামিনীকাঞ্চনে যে অভিনিবেশ হয় তাহা কেবল দুঃখ-সঙ্কুল মায়িক মনোবৃত্তি মাত্র; আর ভগবদ্ভজননিষ্ঠের ভগবদভিনিবেশ পরমানন্দময়ী চিচ্ছক্তির বৃত্তি, সাধুকৃপাবলেই সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে—পশ্চিমদিক্স্থিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য পূর্ব্বদিকে যাইলে যেমন তাহা পাওয়া যায় না, সেইরূপ সর্ব্বদুঃখপ্রভব কামিনী কাঞ্চনাদি বিষয়ে যাহার অভিনিবেশ তাহার পক্ষে পরমানন্দময় ভগবচ্চরণাভিনিবেশ সুদূর-পরাহত।

ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গই যেমন সকল অনর্থের মূল হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবৎসঙ্গিসঙ্গই তাহার সকল পুরুষার্থের মূল হইতে পারে। কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে তাহার সাধু ভক্তের সঙ্গলাভ হইলেই সে ভগবচ্চরণোন্মুখ হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ চরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তির পথ তাহার পক্ষে সুগম হইয়া যায়। তাই শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। ভাগ ৫।৫।২

অর্থাৎ সাধুসেবাই মনুষ্যের বিবিধা মুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গই সংসার ও নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া শিষ্টগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভজনবিহীন মনুষ্য যতদিন সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভজনোন্মুখ না হয় ততদিন সে স্ত্রীপুত্রধনজন এবং বিশেষতঃ দেহ রক্ষার জন্য নিরন্তর শোক মোহ ও ভয়াদি দ্বারা অভিভূতই হইয়া থাকে। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চলোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ ভাগ ৩।৯

হে দীনবন্ধো! মানবগণ যে পর্য্যন্ত আপনার অভয় চরণে শরণ না লয় সেই পর্য্যন্তই তাহাদের স্ত্রীপুত্রবন্ধু ধন ও দেহাদির রক্ষণে ভয়, বিয়োগে শোক, পুনরায় প্রাপ্তির জন্য স্পৃহা, অতিশয় স্পৃহাবশতঃ পরিভব, পরিভব সত্ত্বেও পুনরায় বিপুল তৃষ্ণা, এবং কোনপ্রকারে কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্তি হইলেই তাহাদের উপর মমতাস্থাপন করিয়াই তাহারা অখিল দুঃখের কারণ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভগবদ্ভজনবিহীন মনুষ্যের পদে পদে বিবিধ ভয় থাকিলেও মৃত্যুভয়ই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভীষিকাপ্রদ। যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা প্রভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার আর মৃত্যুভয় থাকে না। শ্রীশৌনক ঋষি বলিয়াছেন :—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥
ভাগ ২।৭।১৭

অর্থাৎ সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদয় হইয়া ও অস্ত যাইয়া দেহধারী জীবমাত্রেরই আয়ুঃ হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনে কালযাপন করেন কেবল তাঁহারই আয়ুঃ তিনি হরণ করেন না। একটি ক্ষণ বা নিমেষমাত্রকাল ভগবচ্চরণভজনের ফলেই তাঁহার সমগ্র আয়ুঃ সফল হইয়া যায়, এবং তিনি ভক্তিদেবীর কৃপায় যথাসময়ে পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয়ায়ুঃ হইয়া যান। তাঁহার প্রাকৃত দেহপতন কর্ম্মফলবশে হয় না বলিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং মৃত্যুভয়ও তাঁহার থাকে না।

সাধুকৃপাবলে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই মনুষ্যের সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়, তাঁহাকে আর কর্ম্মচক্রের অধীন থাকিতে হয় না বলিয়া মৃত্যুযন্ত্রণারূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। কেবল কর্ম্মচক্র কেন, ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্যকে কালচক্রেরও অধীন আর থাকিতে হয় না। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন :—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। ৩।২৫।৩

হে শান্তরূপে! মৎপরায়ণ ব্যক্তি কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, আমার কালচক্র তাহাকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না।

শ্রীঅজামিলোদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীযমরাজও নিজের অধিকার জ্ঞাপন করাইবার জন্য দূতগণের প্রতি আদেশ করিয়াছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণু-কৃত্যান্॥
ভাগ ৬।৩।২৯

হে দূতগণ! যাহাদের জিহ্বা কখন ভগবন্নামগুণাদির কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত কখন ভগবচ্চরণারবিন্দের স্মরণ করে নাই, এবং যাহাদের মস্তক একদিনও "কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অবনত হয় নাই, তাদৃশ ভগবদ্ভজনবিহীন অসৎ ব্যক্তিগণই আমার দণ্ডার্হ, তোমরা কেবল তাহাদিগকেই এই যমালয়ে আনয়ন করিবে।

যোগীন্দ্র শ্রীকবি মহারাজ নিমিকে বলিয়াছেন :—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥
ভাগ ১১।২।৩৩

অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর মায়িক দেহগেহাদিতে অহন্তামমতাবুদ্ধিহেতু মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও ভয়সঙ্কুল হইয়া থাকে, কারণ কাল ও কর্ম্মকৃত বিঘ্নাদি দ্বারা সে সর্ব্বদা অভিভূত। শ্রীভগবচ্চরণোপাসনাই তাহার সকল ভয় হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। ভগবদুপাসনা দ্বারাই সর্ব্ববিধ ভয় নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়; শ্রীভগবান্ নিজে ভক্তের সকল বিঘ্ন ও উদ্বেগ দূর করিয়া দেন।

ভগবদ্‌ভজনবিমুখ মনুষ্য ভগবদ্‌ভজন ব্যতিরেকে অন্য কোনও সাধনে কাল ও কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না বলিয়া মৃত্যুভয় তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। তাই শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদ-
টন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈ র্বিবদন্তু যোগৈ
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

কৃচ্ছ্র তপশ্চরণই কর কিম্বা ভৃগুপতনে প্রাণত্যাগ কর, তীর্থপর্য্যটন কর কিম্বা বেদাদি অধ্যয়ন কর, যজ্ঞ কর কিম্বা যোগ অভ্যাস কর, মৃত্যু অতিক্রম এক শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন আর কিছুতেই হইবে না।

কাল ও কর্ম্ম শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অঙ্গ, শ্রীভগবান্ মায়া কাল ও কর্ম্মের নিয়ন্তা। সুতরাং মায়া, কাল ও কর্ম্ম দুরতিক্রমণীয় হইলেও কেবল ভগবদ্ভজনেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ভগবদ্ভজনবিমুখ মনুষ্য মায়া, কাল ও কর্ম্মের অধীন বলিয়া তাহাকে কালবিধ্বস্ত মায়িক সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের যে সুখ-দুঃখ ভোগ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা কর্ম্মজন্য নহে বলিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। ভক্তের কদাচিৎ দুঃখভোগ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহা কেবল ভগবদ্দত্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কারণ ভক্তের ভজনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত স্বপ্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর শ্রীভগবান্ কদাচিৎ ভক্তকে বিপদাদি দুঃখ দিয়া থাকেন। এই বিপদ্ হেতু ভক্ত ভগবচ্চরণে অধিকতর গাঢ় অভিনিবেশ লাভ করিয়া পরমানন্দই ভোগ করেন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা দুঃখপ্রদ বলিয়া বোধ হইলেও ভক্তের নিকট তাহা যথার্থ সুখপ্রদই হইয়া থাকে। সেই জন্যই ভক্তের বিপদাদি ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির সহায়তা করে বলিয়াই তাহা তাঁহার অতিশয় বাঞ্ছনীয়, যে বিপদে ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি সুলভ হয়, তাহা অপেক্ষা মনুষ্যের আর কি অধিক সম্পদ্ হইতে পারে? শ্রীকুন্তীদেবী এইজন্য শ্রীভগবানের নিকট বিপদরাশিই প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীদেবকী মাতা শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে বলিয়াছেন—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥ ভাগ ১০।৩।২৭

হে সর্ব্বকারণকারণ! মরণধর্ম্মশীল জীব মৃত্যুরূপ কালসর্প ভয়ে ভীত হইয়া সাধনবলে স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পলাইয়া যাইয়াও নির্ভয় হইতে পারে না। কিন্তু যদি কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়হেতু মহৎ-কৃপালব্ধ ভক্তিসাধনে তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে; কারণ তোমার চরণকমল হইতে মৃত্যু অতিদূরে অবস্থিত।

শ্রীভগবান্ নিজেও সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
গীতা ৮।১৬

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকবাসীই পুনঃপুনঃ জন্মমরণশীল, কেবল মাত্র আমাকে পাইলে আর এই মরণধর্ম্মশীল সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইলে ভক্তের যে সকল ভয় দূর হইয়া যায় তাহার ত কথাই নাই, সে চরণে একবার মাত্র শরণ লইতে পারিলেই যথেষ্ট, কারণ তিনি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥
(শ্রীরামায়ণম্)

অর্থাৎ যে একবারও আমার শরণাগত হইয়া "আমি তোমারই" বলিয়া অভয় যাচ্ঞা করিতে পারে, আমি তাহাকে চিরকালের জন্যই অভয় দিয়া থাকি। আমার ব্রতই এই।

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তির প্রভাবে ভজননিষ্ঠ ভক্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন লাভ করেন, সুতরাং শ্রীমৎ প্রহ্লাদের মত তাঁহার অনলে, ভূধরে, সলিলে, হস্তিপদ-

তঁলে বা কালকূট বিষে কোথাও কোন ভয়ের কারণ থাকে না—ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাহার সকল ভয়ই স্বয়ং দূর করেন।

শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ভাগ ১১।২৯।৩৪

অর্থাৎ প্রতিক্ষণ মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য যখনই তাহার সমস্ত কাম্য ও নিত্তনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সেইক্ষণ হইতেই আমার ইষ্টেচ্ছা হেতু সে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপশক্তির কৃপায় প্রেমলাভ করে এবং যথাসময়ে আমার নিত্য চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হইয়া আমার সেবাসুখ ভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে॥

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তির ষড়্বিধ অঙ্গ শ্রীগোস্বামিচরণেরা দেখাইয়াছেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিঃক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

অর্থাৎ ভজনের যাহা কিছু অনুকূল তাহার গ্রহণে এবং যাহা কিছু প্রতিকূল তাহার বর্জ্জনে দৃঢ়নিশ্চয়, শ্রীভগবান্ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, শ্রীভগবান্‌কেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকরণ, আত্মনিবেদন এবং দৈন্যজ্ঞাপন, এই ছয়টি শরণাপত্তির লক্ষণ।

শরণাপত্তির ছয়টি অঙ্গের মধ্যে আত্মনিবেদনই প্রধান অঙ্গ। এই আত্মনিবেদন আর কিছুই নহে, কেবল যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দেওয়া মাত্র—তাঁহার দেওয়া জিনিষ তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত করিলেই তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল। তাহা না করিয়া বহির্ম্মুখ মনুষ্য এই দুর্লভ নরদেহ কুৎসিৎ বিষয়-ভোগ-বাসনা চরিতার্থতার জন্য নিযুক্ত করিয়াই পশু হইতেও অধিকতর দুরবস্থাপন্ন হয়। শ্রীভগবান মনুষ্যকে এই অমূল্য দেহ দিয়াছেন তাঁহার ভজনের জন্য, তাঁহার ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত—এই দেবদুর্লভ দেহের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই দেহ তাঁহার ভজনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই মনুষ্যের সকল ভয়ের মূল দেহভীতি বিদূরিত হইয়া যায়, কারণ দেহরক্ষার ভার, যাঁহার দেহ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তখন সে নিশ্চিন্ত হয়। শ্রীগোস্বামিচরণেরা তাই বলিয়াছেন—

চিন্তাং কুর্য্যান্নরক্ষায় বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

আমি আমার ধনী প্রতিবেশীর সেবা করিয়াই সুখে কালযাপন করিতাম। আমার প্রতিবেশী গোপজাতি, আমার উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও কৃপা। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুগ্ধলোভে তাঁহার সেবাসুখ ছাড়িয়া তাঁহার একটি গাভী আমি আত্মসাৎ করিয়াছিলাম ফলে গাভীর তৃণসংগ্রহাদি নিমিত্ত আমাকে অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইল। অবশেষে গাভী প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া আমি যাঁহার গাভী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে ঐ গাভীটি আমার সম্মুখে বিচরণ করিলেও তাহার জন্য আমার কোনও ভাবনাই নাই, যাঁহার গাভী তিনিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন। আমার কৃপালু প্রতিবেশী পুনরায় আমাকে তাঁহার সেবাসুখদানে কৃতার্থ করিয়াছেন!

আমার একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁহার এই দেহদ্বারা তাঁহারই সেবা করা, দেহরক্ষা করা না করা তাঁহার কার্য্য। আমি সে কার্য্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, এবং তাঁহার জিনিষ নিজের ভোগে নিযুক্ত করিয়া নিজের করিয়া লইলে আমার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করা হইবে। নিজের করিয়া লইলেও আমি তাহা রক্ষা করিতে পারি না, কেবল লাঞ্ছিতই হই। এই দুর্ল্লভ দেহদ্বারা কেবল তাঁহার সেবা করিলেই আমার মিথ্যা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান দূর হইবে এবং আমার যথার্থ স্বরূপ—কৃষ্ণদাসস্বরূপ স্ফূর্ত্তি পাইবে। সেই সেবার ফলেই 'এই মর্ত্ত্যদেহের পরিবর্ত্তে এক নিত্য চিন্ময় দেহ পাইয়া চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোগোপগোপীসহ শ্রীগোপীনাথের নিত্য সেবাসুখ ভোগের অধিকারী হইব, এবং আমাকে ভয়ের মুখ আর কখনও দেখিতে হইবে না!

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুবিভাগ

(শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত)

ইতিপূর্ব্বে আমরা আত্মকৃতার্থতা লাভের জন্য শ্রীগুরু-চরণের মাহাত্ম্যসিন্ধুর এক কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে আমরা শ্রীগুরুদেবের বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা প্রথমতঃ শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের আনুগত্য অনুসারে কিছু প্রকাশ করিব। তিনি বলেন, শ্রীগুরুদেব প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—যথা মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু। যিনি উপাস্য-দেবতার মন্ত্র প্রদান করিয়া, তাঁহার সহিত সাধকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন, তিনিই মন্ত্রগুরু। এই মন্ত্রগুরুকে শ্রীভগবানেরই একটী প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে কৃতার্থ করেন। এই কথাটী শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নিকটে বলিয়াছিলেন যথা,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীভাঃ ১১।১৭।২৭

"হে উদ্ধব! আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিও। আচার্য্যের প্রতি কখনও অবজ্ঞা বুদ্ধি করিওনা কিম্বা মর্ত্ত্যজীববুদ্ধিতে কখনও অসূয়া ভাব পোষণ করিও না। যেহেতু শ্রীগুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তিখানি নিখিল দেবতার অধিষ্ঠান স্বরূপ।" এই বাক্যে "আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিও" এই কথা দ্বারা শ্রীভগবানই যে জগতে গুরুরূপে প্রকটিত তাহা প্রমাণিত হইল এই মন্ত্রগুরুর আবার দুইটী ভেদ। একটী সমষ্টি গুরু ও অন্যটী ব্যষ্টিগুরু। যে শ্রীগুরুদেব আমাদের মত দুর্গতজীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমা-দেরই মত মানব স্বরূপ ও পার্থিব ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন, তিনি ব্যষ্টিগুরু। এই ব্যষ্টিরই সমষ্টিভূত আর একটী মূর্ত্তি আছেন। তিনি সমষ্টিগুরু নামে অভিহিত। শ্রীভগবন্মূর্ত্তির বামপার্শ্বে সিংহাসনের নিম্নভাগে এই সমষ্টি গুরুদেবের স্থিতি। তিনি দ্বিনেত্র দ্বিভুজ ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, ব্যাখ্যামুদ্রাশোভিত হস্তপদ্ম। এই শ্রীগুরু-মূর্ত্তির ধ্যানই শাস্ত্রাদিতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীব্যষ্টি গুরুদেবের অভিমানই ইহাতে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতিয়তঃ শিক্ষাগুরু। এই শিক্ষাগুরু আবার দুই-ভাগে বিভক্ত। প্রথম অন্তর্য্যামী রূপ, দ্বিতীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপ। ইঁহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামীরূপে জীবের হৃদয়ে ভজনীয় বিষয়ের স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার তিনিই সাধুভক্তরূপে জীবকে শিক্ষা দান করেন। এস্থলে ভগবদ্ভক্তগণকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে বর্ণন করিবার হেতু এই যে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা ভক্তজন হৃদয়ে বিরাজিত আছেন, অতএব ভক্তগণ শ্রীভগ-বানের অধিষ্ঠান স্বরূপ। এই জন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠান-গুলিও শ্রীভগবানের স্বকীয় কর্ম্মরূপে অভিহিত।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও এই ভাবেই শ্রীগুরুতত্ত্বের বিভাগ করিয়াছেন। তবে তাঁর বাক্য হইতে আরও একটী বিভাগ পাওয়া যায়। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা শ্রবণ গুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট হইতে ভক্তি বা ভগবদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করা যায় তিনি শ্রবণগুরু। আর যিনি শ্রীভগবানের ভজন প্রণালী শিক্ষা দেন তিনি ভজন-শিক্ষাগুরু। যিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের কর্ম্মবিদ্যাপ্রদ গুরু, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ যাঁহার নিকটে সাবিত্রী-দীক্ষাগ্রহণ করিয়া উপবীত হয়েন এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বা শ্রবণ-গুরু উভয় আখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রবর্ত্তকগুরু বলিয়া অন্য একটী বিভাগ করেন, আমরা তাঁহাকে শ্রবণগুরুর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন "অথ শ্রবণগুরুভজনশিক্ষা-

গুর্ব্বোঃ প্রাধিকমেকত্বমিতি।" কিন্তু "এবম্ভূতগুরোর-ভাবাৎ যুক্তিভেদ বুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ।" শ্রবণগুরু এবং ভজন শিক্ষাগুরু প্রায়ই একজন হইয়া থাকেন। কারণ উপযুক্ত শাস্ত্রও ভজনাভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ হইলে শাস্ত্র জ্ঞানলাভের জন্য বা ভজনশিক্ষা করিবার জন্য আর নানাস্থানে যাইতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ বশতঃ যদি এবম্ভূত শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় না পাওয়া যায়, তবে বাধ্য হইয়া শিক্ষাগুরু ও ভজনগুরুর বহুত্ব প্রয়োজন হয়। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি যথা,—

ন হ্যেকস্মাদ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥
১১।৯।৩১

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা নানা প্রকারে তাঁহাকে নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং একজন গুরুর নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞান কখনও স্থিরতর রূপে নির্ণীত হয় না। এজন্য বহু গুরুদেবের প্রয়োজন। তবে এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, নিজ উপাস্য তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যই স্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্ত স্বজাতীয়াশয় বিশিষ্ট বিভিন্ন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য। অন্য সম্প্রদায়ী বা বিরুদ্ধমতাবলম্বী গুরুদেবগণের আনুগত্যে জ্ঞানলাভ ত হয়ই না, অধিকন্তু নানা অপরাধে পতিত হইতে হয়।

শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু সম্বন্ধেই এ সকল ব্যবস্থা। দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু কিন্তু একজনই হইবেন। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদও বলেন যে "মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব"। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনিমিমহারাজের প্রতি শ্রীআবির্হোত্র যোগেন্দ্রের একটি বাক্য উল্লেখ করিতেছি। যথা,—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
১১।৩।৯

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার নিকটেই মন্ত্রবিধিশাস্ত্র শ্রবণ করিতে হয়। এস্থলে "আচার্য্যাৎ" এই একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। এ কারণ এক-বার দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সেই শ্রীগুরুকে পরিত্যাগ করা মহাপরাধ জনক। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন,—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥"

যিনি মন্ত্রদীক্ষার গুরুকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি কলুষিত, তাঁর দ্বারা দৌরাত্ম্যই প্রকাশ পায়, এবং গুরুকে ত্যাগ করার পূর্ব্বেই প্রথমতঃ তাঁর শ্রীভগবান্‌কে ত্যাগ করা হয়। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীগুরু নামক প্রবন্ধে যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়াছি।

এক্ষণে এই মন্ত্রদীক্ষা প্রদানে কে অধিকারী, তাহা আলোচনা করিবার জন্য পদ্মপুরাণ ও নারদ পঞ্চ-রাত্রোক্ত কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। যথা,—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥

এই সকল বাক্যের ভাবার্থ যথা,—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, নিত্য শ্রীভগবানের পূজাপরায়ণ এবং মহাভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবার যোগ্য। মহদ্বংশসম্ভূত যাজ্ঞিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হয়েন, তবে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন। যদ্যপি কোন স্থানে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া যায়, তবে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রও গুরু হইতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রসম্মত বিধি। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বপ্রকার অর্থই বিনষ্ট হয়। ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য করা সর্ব্বথা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি নিজে হীনবর্ণ হইয়া উচ্চ জাতীয়কে কখনও দীক্ষা প্রদান করিবে না। নিজ নিজ জাতীয় অথবা তাহা হইতে নিম্ন-

জাতীয়কেই দীক্ষা প্রদান করিবার অধিকার আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে তাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবেই এই বিধি।

শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একজন হইলেই ভাল। কিন্তু যদ্যপি সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ-বিষয়ে সম্যক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং নিখিল সন্দেহ নিরসন সমর্থ গুরুদেব না পাওয়া যায়, তবেই ভজনীয় বিষয়ে বিবিধপ্রকার সন্দেহ নিরসনের জন্য কিম্বা ভজন সম্বন্ধীয় নিখিল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য একাধিক গুরুদেবের চরণাশ্রয় করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ইহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তবে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এক শ্রীদীক্ষাগুরুদেবের চরণাশ্রয়েই সকল বিষয় লাভ করিতে পারেন, তবে আর তাঁর অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না।

এক্ষণে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর অধিকারিত্ব সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। শ্রবণগুরু বা শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে কোন জাতি বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। এ জাতীয় উপদেষ্টাগণের কথা দূরে থাক, বৈষ্ণবমাত্রেরই জাতি বিচার পরম অপরাধ জনক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে একটী মাত্র শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিলেই যথেষ্ঠ হইবে বলিয়া মনে করি। ইতিহাস সমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

ভগবদ্ভক্ত যদি শূদ্র বা ব্যাধ অথবা চণ্ডাল জাতীয়ও হয়েন, তবে তাঁহাকে যথাযুক্ত মর্য্যাদা না দিয়া যদি জাতিত্ব অনুরূপ হীনদৃষ্টি করা হয়, তবে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হইবে। অতএব শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে জাতিবিচার করা যে কর্ত্তব্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামিপাদও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বাক্য স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন,—

কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য পরংগুরুং।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসংসারসাগরম্॥

শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে অথবা ভজন শিক্ষা করিতে যিনি অভিলাষী, তিনি উপদেষ্টার জাতি চরিত্র ও আচরণ বিচার না করিয়াই তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহাই শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা। তবে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু সরস ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্যজ্ঞ হওয়া উচিত। যেহেতু এবম্ভূত গুরুমুখে শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করিলে বিবিধ দোষদুষ্ট ব্যক্তিও সত্বর শ্রীভগবানে উন্মুখতা লাভ করে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেই কথার প্রতিধ্বনি দিতেছেন।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

আজকাল কেহ কেহ নিজে শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দিতে দুঃসাহসী হইতেছেন। তজ্জন্য প্রমাণরূপে এই পয়ারটী প্রয়োগ করেন। কিন্তু এ পয়ারটি যে দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে নহে, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিবার অবসর পান না। ইহা স্বার্থান্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর রায় রামানন্দের নিকটে শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণ-প্রসঙ্গে শ্রীকাশীমিশ্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নিজেদের দৃষ্টান্তস্থানীয় করেন। কিন্তু চিন্তা করা উচিত যে ঠাকুর মহাশয়ের ও তাঁহাদের যোগ্যতার মধ্যে তারতম্য কতদূর। এ বিষয়ে যথেষ্টরূপে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে গিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিতে চাহি না। আজকাল বিপ্লবের যুগ। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রমতাবলম্বী হইয়া নব নব ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন। আমরা এখানেই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। বারান্তরে শ্রীগুরু-পূজা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার আশা রহিল।

উজ্জ্বল আদর্শ

(শ্রীবিনয়কুমারী দেবী)

যাবট পুরের নিভৃত-কক্ষে
বৃষভানু রাজ-সুতা ;
কৃষ্ণ অদর্শনে হারায়ে চেতনে
ধরাতলে নিপতিতা।
স্বর্ণলতা প্রায় ভূমেতে লুটায়
বিদরে হৃদয় দেখি ;
আনিতে চেতন করে সযতন
নিকটে যতেক সখী।
মূর্চ্ছা অবসানে করুণ ক্রন্দনে
বৃষভানু রাজবালা
পাষাণ দ্রবিয়া তুলিছে যে ধ্বনি
ধরিয়া সখীর গলা ;—
বরষার দিনে বাহিরে যেমন
বরষার ধারা পড়ে ;
গৃহের ভিতরে নয়নে তাহার
ততোধিক বারি ঝরে ;—
"সখি ! কি করিব ! কোথায় পাইব
সেই ব্রজরাজ সুতে ?
কেবা আনি দিবে মুরলী বদন
আমার সে প্রাণনাথে !
কাহারে কহিব এ দুঃখের কথা
কে বুঝিবে মোর দুঃখ !
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা যে আমার
ফাটিয়া যাইছে বুক !"
এমন করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি ;
স্থির, চর, ঝুরে কাঁদে !
তাপে ত্রিভুবন অস্থির, তাপিত,
সেই সকরুণ খেদে।

হেন ভাষা নাই বর্ণিতে তার সে
গভীর বেদনা রাশি ;
উপমা তাহার আছয়ে কেবল
গম্ভীরায় গৌর শশী।
তাহা ছাড়া আর পুরাণ, বেদ যত
সব হার মানিয়াছে
একটি সরলা, কিশোরী, অ লা,
এই গোপবালা কাছে।
আর বেশী কিবা, গৌরবে, আদরে,
প্রভু শ্রীশচী নন্দন
পুনঃ পুনঃ গাহি এ বেদনা কথা
নিজেকে মানিল ধন্য।
বার বর্ষ ধরি গম্ভীরা মন্দিরে
কান্দিয়া কান্দিয়া,
এ অনুপম সুধা আস্বাদি আপনি
প্রসাদ গিয়াছে রাখিয়া
জীবগণ তরে প্রাণ নিয়া আর
কান নিয়া যেবা যায় ;
যাবট পুরের সেই ঝঙ্কার
সেখানে শুনিতে পায়।
বিপ্রলম্ভ রসের এমন উজ্জ্বল
আদর্শ সম্মুখে ধরি
রেখেছে মোদের, তথাপি এ প্রাণ
গলিলনা তাহা হেরি !
কঠিন, কুলিশ, হৃদয় আমার !
দাসী হইয়া তার ;
এক কণা প্রাণে পরশ হলনা
তাহার এ হাহাকার।

শ্রীরূপসনাতন*

[শ্রীবামাচরণ বসু]

নিখিলশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ
লোকানাম্ হিতকারিণৌ ত্রিভুবনেমান্যৌ শরণ্যাকরৌ
রাধাকৃষ্ণভজনানন্দেনমত্তালিকৌ
বন্দেরূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

বৈষ্ণবমহাজনগণ যাঁহাকে সাক্ষাৎ গৌরপ্রেম মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রীপাট খেতুরীর মহামহোৎসবে সম্মিলিত গৌরপার্ষদ ও গৌরভক্তবৃন্দ যে পরমহাপুরুত্রয়কে তিন প্রভুর অভিন্ন প্রকাশ বলিয়া এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ তিঁহো হয়
ঐছে হইলা তিনের প্রকাশ ॥

সেই তিনের মধ্যে যিনি প্রধান যাঁহার বিরহে ঠাকুর নরোত্তম গাইয়াছেন—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কাঁহা গেলা আচার্য্য ঠাকুর" ॥

সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় গঠনকর্ত্তা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভজনপদ্ধতি ও সাধনসম্পত্তির বিধানকর্ত্তা শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু পরমমহাকৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্য সর্ব্বাগ্রে সম্প্রদায়াচার্য্য ষড়গোস্বামীকে বন্দনা করিয়াছেন, সেই অষ্টক হইতে শ্রীরূপসনাতন প্রমুখ গৌরপার্ষদগণের পরিচয় আমরা অনেকটা জানিতে পারি। জনসাধারণের অবগতির জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রতিপ্রার্থনায় তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া সহজ বাংলায় গাইয়াছেন—

* সে আজ দশবৎসরের কথা হইল সর্ব্বতীর্থ মুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে আদেশ আসিল "শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুগণের অপূর্ব্ব কারুণ্যময় জীবনী শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ করুন। ঐ বৈষ্ণবাদেশ প্রতিপালনার্থ উপকরণ সংগ্রহ করিতে শ্রীপাট রামকেলি প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলাম, কিছু কিছু তথ্যও সংগৃহীত হইল, কিন্তু নিজের অযোগ্যতা বুঝিয়া উক্ত গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। শ্রীরূপসনাতনের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অধুনা নানাপ্রকার অপ্রীতিকর আলোচনা হইতে থাকায় পরম কারুণিক দয়াল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে, তাই পাত্রাপাত্র অবিচারে এই মহা অযোগ্য অধমের প্রতি পুনরপি এই সিদ্ধভক্তগণের মহাবৈচিত্র্যময় চিত্র অঙ্কনের কড়া হুকুম হইয়াছে। নিতাইগৌর প্রেমে পাগল কিন্তু প্রভু, অর্থাৎ সর্ব্ব সমর্থ। কাককে গরুড় করিতে পারেন। সেই ভরসায় এই অতি গভীর দুরবগ্রহ কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম, সাধুগুরু বৈষ্ণব কৃপাই আমাদের সম্বল।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীলপ্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন শ্রীরূপসনাতনপ্রমুখ আচার্য্যগণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীভাগবত পাঠের প্রথমে তাঁহাদের বন্দনা ভক্তিভরে গদগদভাবে করিয়া তবে পুথির ডোর উন্মোচন করেন। সেই সিদ্ধ প্রভুগণের অচিন্ত্য কৃপাতেই শ্রীভাগবত পাঠকালে শ্রীল প্রাণগোপাল প্রভুর রসনা হইতে মধুরাদপি মধুর ব্রজরসের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, ব্রজরসিক শ্রোতৃগণ সেই মধুর লীলামৃতাস্বাদনের লালসায় ছুটাছুটি করেন। সম্প্রদায় গুরু ব্রজপ্রেম পরিবেশনের মূল ভাণ্ডারী শ্রীরূপসনাতনের প্রতি অমর্য্যাদা প্রচারিত হওয়ায় সাধুবৈষ্ণবহৃদয়ে প্রকৃতই ব্যথা লাগিয়াছে, প্রভুপাদকেও ব্যথিতহৃদয়ে কয়দিন যাবৎ তদ্বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি।

জয় রূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীবগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

আবার শ্রীরূপসনাতনের বিশেষ কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

জয় সনাতনরূপ প্রেমভক্তি রসকূপ
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
যাহার প্রসাদে লোক পাশরিল সব শোক
প্রকট কল্পতরু জনু।
প্রেমভক্তি রীতি যত নিজগ্রন্থে বেকত
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে প্রেমানন্দে ভাসে চিতে
যুগল মধুর রসাশ্রয়॥
যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ বান যেন হেম
হেন ধন প্রকাশিল যারা
জয় রূপসনাতন দেহ মোরে প্রেমধন
সে রতন মোর গলে হারা॥

সাধকের যাহা প্রয়োজন তাহা সমস্তই এই ছয় গোঁসাইর, বিশেষতঃ শ্রীরূপসনাতনের কৃপায় সুলভ হয়। যাহা কিছু ভজনবিঘ্ন ও অনর্থ তাহাত নিবারিত হয় সাধকের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেমধন তাহাও সম্প্রাপ্তি হয়। ইহাই হইল আসল মঙ্গলাচরণ।

প্রেমভকতি মহারাজ উক্ত ঠাকুর মহাশয় সাধককে আরো সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, কেবল যাঁহারা ঐ ছয় গোস্বামীকে আচার্য্য স্বীকার করেন তাঁহারাই সর্ব্বথা আমাদের সেব্য, তদিতরজনকে আমরা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ ভজননিষ্ঠা। তবে কেহ কেহ ইহাকে গোঁড়ামি মনে করেন এবং উক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ গৌরপার্ষদগণকে প্রাকৃতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে অনাদর এমন কি কদর্থ না করিয়া নিজেদের আত্মগরিমা প্রকাশ করেন, আমরা সেই উপাধিমণ্ডিত পণ্ডিতমন্য মহাত্মাগণকে সবিনয়ে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" যে বিদ্যা কৃষ্ণকে চিনাইয়া জানাইয়া তদনুগত করিয়া দেয় তাহাই হইল বিদ্যা। সেই বিদ্যায় যিনি বিভূষিত কৃষ্ণতত্ত্ব, পরিকরতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, রস তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুরিত হয়। তখন তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়—

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি জানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।

কিন্তু অহঙ্কারস্ফীত পণ্ডিতগণের নিকট ভাগবততত্ত্ব বা ভক্তচরিত্র সমাচ্ছন্ন, তাহা ত শ্রীভগবদ্বাক্যেই আমরা পাইয়াছি "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"। শ্রীজগন্নাথের দ্বারপণ্ডিত, পণ্ডিতকুলকেশরী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চিত্রে আমরা এই রহস্য ভালরূপে দেখিয়াছি। প্রাকৃত বিদ্যামদে মত্ত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম কলিযুগে ভগবদবতার হইবার কথা নহে, এইরূপ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রথমে প্রত্যক্ষ ভগবানের ভগবত্তাকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, নিজেই আচার্য্যের আসনে সমাসীন হইয়া প্রচ্ছন্ন ভগবানের নিকট কত প্রকারে জ্ঞানগরিমা জাহির করিলেন, শেষে যখন ঐ নবীন সন্ন্যাসীর কৃপা নামিল তখনই আত্মগ্লানিতে ও নিজের ক্ষুদ্রত্বে মরিয়া গেলেন, সন্ন্যাসীবেশধারী ভগবানের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া কত ক্রন্দন করিলেন শেষে তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকপুরুষপুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

সাধারণের চক্ষে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও আমি এতদিন মোহান্ধই ছিলাম, এক্ষণে প্রভুর কৃপাঞ্জনে আমার চোখের ধাঁধা গিয়াছে এখন আমি বেশ বুঝিয়াছি ইনিই সেই বেদবর্ণিত নিরঞ্জন পুরাণপুরুষ। অধুনা অচৈতন্য জগতে চৈতন্য সঞ্চার করিবার জন্য শরীরধারী হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি ইঁহাকে সামান্য মানব জ্ঞানে কত না কদর্থ না করিয়াছি, ইনি কৃপাম্বুধি, তাই আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন। আমার মন নানা শাস্ত্রপাঠে বিক্ষিপ্ত তাহা যেন

গাঢ়রূপে ইহাঁর চরণসুধাপানে নিমগ্ন থাকে ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।

ভগবান্‌কে ধরা বরং সহজ কিন্তু দৈন্যাবরণে সমাচ্ছন্ন ভক্তকে চেনা অত্যন্ত সুকঠিন। চক্ষু কৃপাঞ্জনে বিচ্ছুরিত না হইলে ভক্তকে ধরা যায় না।

শ্রীরূপসনাতনের দীনতাও অবর্ণনীয়। শ্রীসনাতন বলিতেছেন—

ন প্রেমা, শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্য মূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥

এই দৈন্যাত্মক শ্লোক "আমার সজ্জাতি পর্য্যন্ত নাই" ইহাই শ্রীসনাতনের নিজের কথা, ইহাকে (Criterion) বুনিয়াদ্ করিয়া যিনি শ্রীরূপসনাতনের জাতি নির্ণয় করিতে যাইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে খারিজ করেন, তাঁহাকে মতিভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলিব? শ্রীরূপসনাতন অনেক স্থানে ঐরূপ দৈন্যোক্তি বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
মোরে প্রভু কৃপা করি না করিহ স্পর্শন"।

যাঁহারা এই বৈষ্ণবী ভাষার যথার্থ অবগত নহেন তাঁহাদিগকে "নিমাই গৌর দুই ভাই"* এই মত বুঝাইতে শুনিয়াছি শ্রীরূপগোস্বামীকে নীচ জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করাকেও আমরা সেইরূপ গবেষণা বুঝিব।

* একদা রেলের গাড়ী মধ্যে জনৈক খ্যাতনামা বেদান্তবাগীশ উপাধিধারী পণ্ডিত বেশ গম্ভীরভাবে পার্শ্বস্থশ্রোতৃগণকে বুঝাইতেছেন শচীর পুত্র দুইটী, নিমাই গৌর দুই ভাই। আপনি ইহা কোথায় পাইলেন প্রশ্ন করিতে কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিলেন কেন, চরিতামৃতেই দেখিয়াছি—একবার শচীর পুত্রের নাম নিমাই বলিতেছে আবার অন্যত্র দেখিতে পাই শচীর পুত্রের নাম গৌর, তবে দুই পুত্র হলো না।

শ্রোতৃবৃন্দ আর উচ্চবাচ্য না করিয়া পণ্ডিতজীকে দণ্ডবৎ করিলেন।

আমরা ঐ জাতীয় পণ্ডিতমহাশয়গণকে অনুরোধ করি যে—তাঁহারা যেন একটুকু নিবিষ্টচিত্তে প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি ভালভাবে আলোচনা করিয়া এইরূপ সাংঘাতিক অভিনব মত প্রচার করেন, নচেৎ রায়বাহাদুর প্রাচীন সাহিত্যিক জলধরবাবু গবেষণার (গো+এষণা অর্থাৎ গোরু খোজা) যে অর্থ করেন তাহাই হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী নিজেদের বংশপরিচয় সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা এবং ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিবেন যে শ্রীরূপসনাতন পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ণাটীয় বৈদিক ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ভরদ্বাজগোত্রীয় মহামহিমান্বিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইহাদের পূর্ব্বতন সপ্তমপুরুষ শ্রীসর্ব্বজ্ঞজগদ্‌গুরু, যেমন নিখিল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ব্যবহার জগতেও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি কর্ণাটদেশের নরপতি ছিলেন। ইনি ১১ বৎসর রাজ্য করিয়া লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাটের অধীশ্বর হয়েন ১৩০৮ শাকে অনিরুদ্ধ দেহরক্ষা করেন। তাহার দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুইপুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর রাজসিংহাসন জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। কনিষ্ঠ শ্রীমান্ হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া পিতৃসিংহাসন্ অধিকার করিয়া লয়েন। রূপেশ্বর পরাজিত হইয়া পিতৃমিত্র গৌড়বাদসাহের আশ্রয় পাইবার আশায় সপরিজনে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সঙ্গে কিছু মূল্যবান্ রত্নাদি ও ৮জন অশ্বারোহী প্রহরী লইয়া আইসেন। উল্লেখ আছে তিনি কিছুকাল গৌড়বাদসাহের মন্ত্রীত্ব করেন, ১৩৫৫ শাকে রূপেশ্বরের পরলোকগমনের পর তৎপুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরস্থিত নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং ধর্ম্মালোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। পদ্মনাভের ১৮টী কন্যা ও ৫টী পুত্র জন্মে পুত্রদের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ মুরারি ও মুকুন্দ। কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় সাবেক যশোহর জেলার অধীনে চন্দ্রদ্বীপে ফতুয়াবাদ গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই মুকুন্দের পুত্র হইলেন কুমারদেব। কুমারদেবের ৫টী পুত্র, তন্মধ্যে তিন জনের নাম আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই। ইহাঁরাই হইতেছেন

শ্রীসনাতন শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ। বল্লভের পুত্র হইলেন মহাদার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামী "সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব।

শব্দকল্পদ্রুমের সঙ্কলয়িতা স্যার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরও ইহাঁদিগকে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পাঠকগণের পরিতুষ্টির জন্য নিম্নে তাঁহাদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই, সেই বাজে কচ্‌কচি লইয়া আমাদের এবারের প্রবন্ধ লিখিত হইল, এতদ্দ্বারা বাদিগণের সুমতি হইলে তাঁহারা বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। পরমারাধ্য প্রভুপাদের ও ভক্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাশীর্ব্বাদ হইলে আমরা বারান্তরে সেই সিদ্ধমহাপুরুষগণের লীলা-চরিত্র আলোচনা করিয়া ধন্য হইব!

(ক্রমশঃ)

——:০:——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব দাস

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষার কথা দূরে থাকুক, শ্রীহরেকৃষ্ণ নামও শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন, "গণনবিধিনা কীর্ত্তয়তভোঃ" অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ" এই কলিযুগের মহামন্ত্র গণনবিধি-অনুসারে কীর্ত্তন কর। যাহাতে বিধির অপেক্ষা আছে, তাহাতে শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণেরও অপেক্ষা আছে। কারণ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ না করিলে জপের বিধি কিরূপে জানিতে পারিবে? এই অভিপ্রায়েই শ্রীবৈষ্ণবদাস কৃত শ্রীগুরুবন্দনায় বর্ণন করিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু
অদ্‌ভুত যাকর প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির বর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেওল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি অগতি অসত মতি যো জন
নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
তাহে করত উপদেশ।
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে মতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥ ১॥

এই বন্দনায় শ্রীগুরুদেবই যে যাচিয়া শ্রীহরিনাম দান করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ ২।৫৬ বাক্যে বলেন—"ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতঞ্চেৎ মহামাহাত্ম্যং" এই নামরূপাদি শ্রবণ ও শক্তিযুক্ত মহাপুরুষের মুখ হইতে উচ্চারিত হইলেই মহামাহাত্ম্যাতিশয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। অদ্যাপি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সদাচারও দেখা যায় যে শক্তিযুক্ত শ্রীগুরু-দেবের মুখ হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রথাটী আধুনিক নহে, বহুকাল হইতেই চলিয়া আসি-তেছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্ত্রদীক্ষা দিবার পূর্ব্বে ৪ বার কর্ণে শ্রীমহামন্ত্র অর্পণ করিয়া তৎপরে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দান করিবার ব্যবস্থা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে।

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় একটু খুব বড় ভুল করিয়া-ছেন—শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ যে কথাটা "যদ্যপি" পদ উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়াছেন, সেইটিকেই সিদ্ধান্ত-পক্ষরূপে বুঝিয়া ভজনসম্প্রদায়ের একটা গুরুতর অনিষ্ট ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ বলেন—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদি-বদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্যাদীনা মেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনার-দাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধ বিশেষং দীক্ষাবিধা-নেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়া মর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব"।

যদিও শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির মত অর্থাৎ পঞ্চ-রাত্রাদিতে অর্চ্চন না করিলে রাশি রাশি দোষের কথা যেমন উল্লেখ করা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেইরূপ অর্চ্চনা না করিলে রাশি রাশি দোষের কথা উল্লেখ করেন নাই। কারণ অর্চ্চনাদি বিনাও শরণাপত্তি প্রভৃতি বিবিধ ভক্তি-অঙ্গের

মধ্যে কোনও একটি ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারাও পুরুষার্থ বস্তু ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আছে। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু এই পক্ষটিকেই বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্তপক্ষরূপে "সাধনা" পত্রিকায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনর্থ ঘটাইয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ কিন্তু সেই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—"তথাপি শ্রীনারদপ্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণের অনুষ্ঠিত ভক্তিপথের যাঁহারা অনুসরণ করেন, দীক্ষাগ্রহণের বিধি অনুসারে শ্রীগুরুচরণ-কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীভগবানের সহিত দাস্য, সখ্য প্রভৃতি কোনও এক সম্বন্ধ বিশেষ প্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা ঐ সম্বন্ধ বিশেষ লাভের কামনায় দীক্ষাগ্রহণ করিলে অর্চ্চন অবশ্য করিবেনই। এ স্থানে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণের অক্ষরে যে সারস্য আছে তাহা ধীমান্ পাঠকপাঠিকাগণের সুখবোধের জন্য কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিলেন—"শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ দীক্ষাবিধি দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং শ্রীগুরুচরণই শ্রীভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধবিশেষ সম্পাদন করিয়া দেন। ইহা তো সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সাধারণজনও ইহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারে। "সম্বন্ধবিশেষ" পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাও জানাইলেন যে দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা কেবল শ্রীনামাশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে "শ্রীভগবান্ আমার আরাধ্য বা সেব্য, আমি তাঁহার আরাধক বা সেবক" এইরূপ সাধারণ সম্বন্ধমাত্র স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু দাস্য, সখ্য প্রভৃতি শ্রীভগবানের সহিত বিশেষসম্বন্ধ দীক্ষাবিধি ভিন্ন এবং শ্রীগুরুচরণকৃপাভিন্ন লাভ করিতে কখনই পারিবে না, ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝাইয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ যেমন দার্শনিক পণ্ডিতচূড়ামণি, তেমনি দার্শনিকরীতি অনুসারে সংক্ষেপে সার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে আরও একটী বুঝিবার বিষয় এই যে—ভক্তির অঙ্গের মধ্যে "সাধু বর্ত্মানুবর্ত্তনং" নামে একটী বিশেষ ভক্তি অঙ্গ আছেন। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় অবশ্যই এই ভক্তি অঙ্গের সংবাদ জানেন। তাহা জানা সত্ত্বেও শ্রীপাদজীবগোস্বামীচরণের সিদ্ধান্ত পক্ষটীকে কেন যে অনাদর করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই এই মোটা কথাটা জানেন যে—আইন হইতেও নজীরের জোড় অধিক। শাস্ত্রও বলেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অর্থাৎ মহাজনগণ যে সাধন পথে ভগবানের চরণকমল সেবাসম্পদ লাভ করিতে পারিয়াছেন, ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের সেই সাধন পথটী সর্ব্বদা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ পুরাণান্তরের বচন তুলিয়া দেখাইয়াছেন—

"সমৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষগণ যে ভজন-পথ অবলম্বন করিয়া বিনা পরিশ্রমে অর্থাৎ অনায়াসে কিম্বা সুখে এই মায়াময় জগৎ হইতে শ্রীহরির জগতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই সন্তাপ-বর্জ্জিত নিখিল কল্যাণ হেতু ভজনপথের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। মহাজনগণ অনুষ্ঠিত ভজনপথ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য মানবগণপ্রদর্শিত ভজনপথের অনুসরণ করিলে আপাততঃ মধুর ও সুখসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও ভবিষ্যতে বহুল বিঘ্নরাশিতে অভিভূত হইতে হইবে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের "শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ" শ্রীনারদ প্রভৃতি পূর্ব্বমহাজনগণ অনুষ্ঠিত ভজন-পথের অনুসরণকারিগণ কর্তৃক অর্চ্চন অবশ্যই করা কর্ত্তব্য, এই অক্ষরে পূর্ব্বপ্রদর্শিত সিদ্ধান্ত পক্ষটীকেও পোষণ করিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণ করাও যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্য, তেমনি দীক্ষিতমাত্রের অর্চ্চন করাটীও অবশ্য-কর্ত্তব্য, ইহাও "অর্চ্চনং অবশ্যং ক্রিয়েতৈব" এই বাক্যে—"অবশ্য" এবং "এব"কার এই দুইটি পদ উল্লেখ করিয়া অর্চ্চনের অবশ্যকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করেন নাই কি? "অবশ্য" এবং "এব" কারের অর্থ সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই বুঝিতে পারেন। এমনভাবে সিদ্ধান্তপক্ষ থাকা সত্ত্বেও কেন যে দীক্ষাগ্রহণের এবং অর্চ্চনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উড়াইয়া দিবার জন্য, বিদ্যাবাচস্পতিমহাশয় কোমর বাঁধিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। তবে এই মাত্রই বুঝি যে বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে ঘোরতর পাণ্ডিত্যাভিমান জন্মিয়াছে, এবং

তাহারই ফলে ভক্তি অঙ্গের অমর্য্যাদা করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ভক্তির অনন্ত অঙ্গের মধ্যে যে সকল অঙ্গের অকরণে শাস্ত্র প্রত্যবায় উল্লেখ করেন, সেই সকল অঙ্গের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করাইয়াছেন। অর্থাৎ সেইসকল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে অপরাধই জন্মিয়া থাকে। তবে যে দেখিতে পাওয়া যায়—

এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উঠে প্রেমের তরঙ্গ॥

এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে—রুচিবিশেষে ভক্তির কোনও একটি অঙ্গকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া অন্য যে সকল ভক্তি অঙ্গ অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্র—দোষের কথা উল্লেখ করেন, সেই সকল ভক্তি অঙ্গকে যথাশক্তি ও যথাসম্ভব মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন। কারণ কেবল একঅঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে কোনও প্রকারেই বৈষ্ণবতা রক্ষা পাইতে পারে না। যেমন যদি কেহ শ্রীহরিনাম পরায়ণ হয়েন, কিন্তু শ্রীতুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করেন না, তাহা হইলে কেবল নামাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন না। যেহেতু পদ্মপুরাণে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে যে—

যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যা তুলসী কাষ্ঠমালিকা।
ক্ষণমাত্র পরিত্যাগাৎ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥

যেমন যজ্ঞোপবীত নিত্যধার্য্য, তেমন তুলসীমালিকাও নিত্যই ধারণ করা কর্ত্তব্য। ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করিলে বিষ্ণুকে দ্রোহ করা হয়। অন্যত্রও দেখা যায়—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাং।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

যাঁহারা তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মালা ধারণ করে না, তাহারা শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাদের নরকদুঃখের নিবৃত্তি নাই। এই প্রকার শ্রীতিলক, শ্রীএকাদশী, মহাপ্রসাদভোজন প্রভৃতি বহুল অঙ্গ অনুষ্ঠান না করিলে বৈষ্ণবতার বিপরীত বিষ্ণুদ্রোহিতাই ঘটিয়া থাকে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবা সম্বন্ধে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে ভক্তিসন্দর্ভে বহুল বিচারই উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি ২৩৭ বাক্যে দেখাইয়াছেন, যদ্যপি শরণাগতিদ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সু ও সমর্থ ব্যক্তি ভগবৎভক্তিশাস্ত্রের উপদেষ্টা এবং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষ সেবা করিবে। যেহেতু শ্রীগুরুচরণ প্রসাদই নিজ নিজ নানাপ্রকার অপ্রতিকার্য্যদুস্ত্যজ-অনর্থ বিনাশে এবং শ্রীভগবানের পরম-অনুগ্রহ প্রাপ্তি বিষয়ে মূল কারণ। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন—

ভজিলে ভজন নহে
গুরুকৃপা ভজনের মূল।

এই অভিপ্রায়ে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যেও উল্লেখ আছে যে—"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ" সাধকের কামক্রোধাদি নানাবিধ অপ্রতিকার্য্য বিঘ্নরাশি বিনাশের উপায়রূপে পৃথক্ পৃথক্ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এ সমুদয় বিঘ্নরাশিই শ্রীগুরুচরণ ভক্তিপ্রভাবে সাধক অক্লেশে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বামনকল্পে শ্রীব্রহ্মবাক্যেও দেখা যায়, "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং। গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্যতুষ্টোহরিঃ স্বয়ং॥" শ্রীগুরুতে এবং মন্ত্রে কোনও ভেদ নাই, যেহেতু যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু। আবার শ্রীগুরুতে এবং শ্রীহরিতেও কোন ভেদ নাই; যেহেতু যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। অতএব যাঁহার প্রতি শ্রীগুরু প্রসন্ন, স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েন। অন্যত্রও দেখা যায়, "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥ হরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিতে হইবে। অতএব নিত্যই শ্রীগুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। যেমন অন্য শাস্ত্রেও শ্রীপরমেশ্বর নিজমুখেই বলিয়াছেন—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতিহ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥" প্রথমে কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। যাহারা এইরূপে পূজা করে, তাহারাই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যেজন ইহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহার পূজা

সর্ব্বথাই পণ্ডশ্রম। অতএব নারদ পঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে যে—"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিত্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুং। পূজয়েৎ বাঙ্‌মনঃ কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥" যে জন শ্রীভগবত্তত্ত্বোপদেষ্টা বৈষ্ণব গুরুকে বিষ্ণুর মত জানেন, এবং কায়বাক্যমনে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই বৈষ্ণবশব্দে অভিহিত। "শ্লোকপাদস্য বক্তাঽপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিপুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥" যে জন শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকের এক চরণও উপদেশ করেন, তিনি সর্ব্বদাই পূজ্য, আর যে জন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্ররূপে স্বরূপ প্রদান করেন, তিনি যে সর্ব্বদাই পূজ্য তাহাতে আর কথা কি? পদ্মপুরাণে দেবহূতি স্তুতিতেও দেখা যায়, "ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ॥" আমার শ্রীহরিতে যেমন ভক্তি তাহা হইতে শ্রীগুরুতে যদি অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই ফলে শ্রীহরি আমাকে দর্শন করান। শ্রীপাদ জীবগোস্বামি চরণ এই সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"তস্মাদন্যভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অতএব শ্রীগুরুচরণে যাঁহার অবিচলা ভক্তি আছে, তাহার অন্য ভগবদ্ভজনেরও কোন অপেক্ষা নাই। এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভক্তির অন্য কোনও অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীনাম কীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথাদি শ্রবণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই গুরুপাদসেবীর অনিষ্টের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে শ্রীএকাদশীব্রত প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—এক অঙ্গ ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অন্য অঙ্গভক্তির অপকর্ষ করিলে অপরাধই ঘটিবে।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী

(শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ)

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয় পার্ষদ শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদের নাম বিশ্ববিশ্রুত। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তদীয় অপূর্ব্ব জীবনচরিত সকলেরই সুবিদিত। তাঁহার পরিচয় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় কৃত শ্রীলঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষে এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে; যথা,—

'যশ্চিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকর প্রভাভরমতীত্যোবানয়োর্ভ্রাজতো
যত্তুল্যত্বপদং যতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ

অর্থাৎ শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর মিত্র বলিয়াই শ্রীপাদ রঘুনাথদাস পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধামাধবের প্রেমসাগরের তরঙ্গসমূহে বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করিতেন। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে শ্রীরূপসনাতন জগতে অনুপম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, শ্রীরঘুনাথদাস তাঁহাদেরও তুল্য পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও তদীয় জীবনবৃত্তান্ত কিছু কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। সামান্যতঃ তাঁহার জীবন তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যখন শ্রীমৎ রঘুনাথদাসরূপে তিনি সংসারাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন অথচ তদীয় হৃদয়ে বৈরাগ্যবহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়টী প্রথম বিভাগের অন্তর্গত

বা তাহাই তদীয় আদিলীলারূপে কথিত হইতে পারে। শ্রীমৎ রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই সংসারে উদাসীন। তাঁহার পিতৃকুলে তিনিই একমাত্র বিপুল সম্পত্তির ভাবী অধিকারী, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে বিরাগ সহজাত। তদীয় পিতৃদেব শ্রীগোবর্দ্ধনদাস তাঁহাকে সংসারে রাখিবার মানসে অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় চিত্ত কামিনীকাঞ্চনে পূর্ব্ববৎ অনাসক্তই ছিল।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন, সেই সময় শ্রীমৎ রঘুনাথ তদীয় শ্রীচরণদর্শনে প্রথম আগমন করেন। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে পতিত হইলেন ও তিনিও অত্যধিক কৃপাভরে পাদস্পর্শ করিলেন। দুই জনার মধ্যে যেন বহুযুগের পরিচয়। শ্রীমৎ রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধনদাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেবা করিতেন, সেই জন্য তাঁহার প্রসাদে শ্রীমৎ রঘুনাথ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীরঘুনাথ পাঁচসাত দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্দর্শন লাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তথা হইতে নীলাচলে গমন করায় শ্রীমৎ রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া বারম্বার নীলাচলে পলায়ন করিতে যত্নবান্ হওয়ায় তদীয় পিতা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাত্রিদিন পাঁচজন রক্ষক, চারিজন ভৃত্য ও দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় শ্রীমৎ রঘুনাথের হৃদয়ে অত্যধিক দুঃখ উপজাত হইয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শান্তিপুরে পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া তদীয় পিতার নিকট এইরূপ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন,—

'আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন'॥

এইরূপ বাক্য শুনিয়া তদীয় পিতৃদেব শ্রীরঘুনাথের তত্ত্বাবধাননিবন্ধন বহুলোক ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে উপহার দিবার জন্য বহুদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। সাত দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া কিরূপে রক্ষকগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নীলাচলে তিনি গমন করিবেন এই কথাই শ্রীরঘুনাথ নিরন্তর চিন্তা করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দান ছলে এইরূপ উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছিলেন,—

'স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাবে তারে কে রাখিতে পারে?

এইরূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ মত বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে থাকিলে তদীয় পিতামাতা সন্তোষ লাভ করিলেন ও তাঁহার রক্ষণ বিষয়েও তাঁহারা কিছু শিথিল হইলেন।

এ দিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এই সংবাদ যখন রঘুনাথ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার সমীপে গমন করিতে উদ্যম করিলেন।

এই সময় বৈষয়িক ব্যাপারেও শ্রীরঘুনাথের বিশেষ বুদ্ধিচাতুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য দাসের সহিত ম্লেচ্ছ বিচারপতির বৈষয়িক কলহের নিষ্পত্তি শ্রীমৎ রঘুনাথই করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্ত তাঁহার একাগ্রবুদ্ধি যেদিকে প্রধাবিত হয় সেই বিষয়েই সাফল্য লাভ করে। সেই সময় তদীয় জ্যেষ্ঠতাত ২০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া ১২ লক্ষ রাজস্ব বা কর প্রদান করিতেন। ইহা হইতেই শ্রীমৎ রঘুনাথ কিরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে

পালিত হইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হোক্ এইরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে শ্রীরঘুনাথ দ্বিতীয় বৎসরে গৃহত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া রাত্রে পলায়ন করিলেন কিন্তু তদীয় পিতার লোক কর্তৃক ধৃত হইলেন। এইরূপ বারম্বার পলায়ন করিয়াও তিনি সফল-মনোরথ হইলেন না। সেই সময় তদীয় মাতা পিতাকে বলিয়াছিলেন,—

'পুত্র বাতুল হইল রাখহ বাঁধিয়া'।

তদুত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে ইন্দ্রের সম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার মত স্ত্রী বন্ধন করিতে পারিল না, তাহাকে ইহলোকে বন্ধন করিতে পারে, এমন কোন দ্রব্যই নাই। রজ্জুর বন্ধন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে অসমর্থ—কারণ যাহার যাহা প্রারব্ধকর্ম্ম তাহা তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে পাগলকে কেহই গৃহে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় শ্রীমৎ রঘুনাথ মনে কিছু বিচার করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিলেন ও তিনি প্রণাম করিলে শ্রীপাদ তদীয় মস্তকে চরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে 'চোরা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এইটুকু মনে হয় যে বহুদিন হইতেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জীবন ও ধন-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহার অনুমতি বিনাই যেন চুরি করিতে শ্রীমৎ রঘুনাথ প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ইহাই যেন বাক্য-নিহিত নিগূঢ় পরিহাস রস। আর সেইজন্য শ্রীপাদ তাঁহাকে নিকটে পাইয়া সমুচিত দণ্ড বিধানপূর্ব্বক তদীয় ভক্তগণকে দধি চিড়া সেবন করাইতে আদেশ করিলেন।

শ্রীমৎ রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ আনন্দচিত্তে নিজগৃহে লোক পাঠাইয়া মহোৎসবের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনাইলেন ও মহাসমারোহে ও আনন্দে সেই উৎসব সম্পন্ন হইলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ধ্যান দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে উৎসবে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। অসংখ্য ভক্তের সেবা ও আনন্দ বিধানই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। অদ্যাপি প্রতিবৎসর পানিহাটি গ্রামে এই মহামহোৎসবের স্মৃতি ভাগবতগণ দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে পুলিনে ভোজনের স্মৃতিসুখ হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরমানন্দিত হইলেন ও ভোজনান্তে আচমন করিয়া তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও স্বীয় অধরামৃত শ্রীমৎ রঘুনাথকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীমৎ রঘুনাথের জীবনে এক অভি-নব অঙ্ক আরব্ধ হইল। এই স্থানে তাঁহার প্রতি শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের কৃপাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ প্রদান করিয়া বলিয়া-ছিলেন,—

'চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন'।

পরদিন প্রভাতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নিজগণসহ বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলে শ্রীমৎ রঘুনাথ তাঁহার শ্রীচরণে নম-স্কার করিলেন ও শ্রীল রাঘব পণ্ডিত দ্বারা এই মর্ম্মে নিবেদন করাইলেন যে তিনি বামন হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র লাভে ইচ্ছা করিতেছেন। অনেকবার গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সমীপে গমন করিবার সংকল্প করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। তিনি যদি কৃপা করেন তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে তিনি শ্রীচৈতন্য চরণকমলে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হন!

ইহা শুনিয়া শ্রীপাদ মধুর হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন যে এই রঘুনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যও শ্রীচৈতন্য কৃপায় তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ চরণ-কমলের গন্ধমাত্রও যাহার লাভ হয়, তাহার ব্রহ্মলোকের সুখও অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সকল ভক্তকে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়া স্বয়ং তিনি শ্রীমুখে বলিলেন,—

'তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন,
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে,
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে।

নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন ;
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ'।

শ্রীমৎ রঘুনাথ শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের সহিত যুক্তি করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের ভাণ্ডারীর হাতে একশত মুদ্রা ও সাত তোলা স্বর্ণ প্রদান করিয়া তাহাকে একথা এখন ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিলেন। তদনন্তর শ্রীপাদের সঙ্গীয় অসংখ্য বৈষ্ণবগণের যথাযোগ্য সেবার নিমিত্ত শ্রীরঘুনাথ বহু অর্থ প্রদান করিলেন। এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপালাভে ধন্য হইয়া শ্রীরঘুনাথ গৃহে আগমন করিলেন। এখান হইতে তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন পথে চালিত হইল। ইহাই শ্রীমৎ রঘুনাথের মধ্যলীলার প্রারম্ভ বলা যাইতে পারে ও শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরসুন্দরের চিরলোভনীয় ও মধুময় আনন্দসঙ্গ লাভ করিয়া নীলাচলে ষোড়শ বৎসর কাল অবস্থান পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের মধ্যলীলার অন্তর্গত।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীরঘুনাথ দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতেন। সেইস্থানে তদীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষণার্থ প্রহরীগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য শ্রীমৎ রঘুনাথ রাত্রেও কোনরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেন না। প্রতিবৎসরই গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিতেন, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের সহিত গমন করিলে ধৃত হইবেন বলিয়া সে আশাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। দৈবযোগে এই সময় একদিন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও রঘুনাথের মন্ত্রগুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য রাত্রিশেষে রঘুনাথের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন যে তদীয় ঠাকুরের সেবক ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, সে যাহাতে সেবা করে তজ্জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে রঘুনাথকে আদেশ করিলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। তখন রক্ষকগণ নিদ্রিত। মধ্যপথে আসিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ তদীয় গুরুদেবের বাক্যানুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহাকে গৃহ গমন করিতে প্রার্থনা করিলেন। এই ছলে তিনি গুরুদেবের নিকট আজ্ঞা লইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ইহাই তাঁহার পক্ষে দৈবপ্রেরিত সুবর্ণ সুযোগ। এখন কেহ রক্ষকাদি নাই। অতএব ইহাই পলায়নের উপযুক্ত সময়। পশ্চাতে কেহ আগমন করিতেছে কিনা দেখিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের চরণ-চিন্তা করিয়া রাজপথ ত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বৈশাখের অভিসারে

(শ্রীগোপীনাথ বসাক)

আজু মম অন্তর তরল সজনি।
বৈশাখের খরতাপে তাপিত এ তনু-মন
শীতল কৃত সিতরজনী॥
তপন-তনয়া-তীর তীরথ সুশীতল
সুসেবিত মলয়সমীরে।
বিকশিত হসিত কুসুম-সুষমারাশি
মোহে মদন মহাবীরে॥
সৌরভে সব দিগবিদিগ সুগন্ধিত
গুমরি ভ্রমরি করে গান।
উনমত কোকিল তমালশাখে ঝঙ্কারে
বিপুল পুলকে ভরে প্রাণ॥
বিদগধ রসিক-নাগর-বর-শেখর
শ্যামল কোমল শীতলাঙ্গে।
চন্দন ঘনসার সুসার-পিরিতি সারে
বেনামূলে মাখব রঙ্গে॥
মরকত দরপণ লাবণিতে বনি বনি
চন্দক চন্দন সাজ।
রভস-বশম্বদ মদন-মোহন হেরি
মত্ত মদন পাবে লাজ॥
প্রেম-কনক-গিরি গিরিধারি বিলসব
হেরি পরিসর স্মর-কেলি।
কুসুম-সুনির্য্যাসে বাসিত শীতল বারি
কর্পূর পুরি দিব ঢালি॥
চল চল সজনি রজনী বড় সুখময়
অভিসর স্মর-জয়ি কুঞ্জে।
প্রেমভাবিত-তনু যৌবনে নিধুবনে পুরয় গোপী-আশপুঞ্জে

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের পাঠাবলম্বনে
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্য ও তাহার অঙ্গ এই চারিটী বিষয় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই চতুঃশ্লোকীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য এই তিনটী বিষয় ক্রমে "অহমেবাসমেবাগ্রে" "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েৎ" "যথা মহান্তি ভূতানি" এই তিনটী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞাত ৪টী পদার্থের মধ্যে "রহস্য" শব্দের অর্থ প্রেমভক্তি, এবং তাহার অঙ্গ শব্দের অর্থ সাধন-ভক্তি। এস্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত টীকাতেও "রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা", অর্থাৎ রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং অঙ্গশব্দের অর্থ সেই প্রেমভক্তি প্রাপ্তির উপায়রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিশুদ্ধ সাধনভক্তি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া—

কালেন নষ্টাঃ প্রলয়েবাণীয়ং বেদসংহিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! প্রলয়কালে বিশুদ্ধভক্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিল না বলিয়া এই জগতে বেদের মুখ্য আদেশবাণীরূপ এই ভক্তি অপ্রকাশিত ছিল। আমি সৃষ্টির প্রথমে যে আদেশবাণীতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্মের উপদেশ আছে, সেই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। এই ভগবদুপদেশ বাক্যানুসারেও চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" ইত্যাদি শ্লোকে সাধনভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থানেও পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্লোকটী উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাখ্যা যথা—আত্মা ভগবান্ যে আমি সেই আমার প্রেমরূপ রহস্যতত্ত্ব অনুভব করিতে যেজন ইচ্ছা করে, সেইজন শ্রীগুরুচরণের নিকট এতাবন্মাত্রই জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জিজ্ঞাস্যবিষয়টী কি, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন যে একই বস্তু অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে, ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে পাওয়া যায় তন্মধ্যে অন্বয়মুখে প্রাপ্তি যথা—৩।২৫।৪৪ শ্লোকে—

এতাবানের লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং ॥

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজজননীকে কহিলেন, হে মাতঃ! তীব্রভক্তিযোগে চঞ্চল মন আমাতে অর্পণ করিলেই স্থির হইয়া থাকে। এইটিই ইহলোকে মানব-মাত্রের নিঃশেষ মঙ্গলপ্রাপ্তি! শ্রীভগবদ্গীতাতেও—

মন্মনাভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্বিষয়ক সঙ্কল্পযুক্ত ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে প্রণাম কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। আমি তোমারই নিকটে শপথ করিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—এইরূপ ভজন করিতে করিতে তুমি অবশ্যই আমাকে পাইবে, এ বিষয়ে আমি প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন রহিলাম। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তুমি অন্য যে কোনও সাধন পথেই যাও, আমার সহিত তোমার দেখা হইবে না। তুমি হয় তো ভুক্তিতে, সিদ্ধিতে অথবা মুক্তিতে অর্থাৎ স্বরূপানন্দ আস্বাদন-আবেশে ডুবিয়া থাকিবে, আমার কথা তোমার মনেও পড়িবে না। আমি কিন্তু তোমাকে প্রীতি করি বলিয়া তোমাকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করি। যদি এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমাতে ও তোমাতে নিত্যসম্বন্ধ সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিবে; এবং আমাকে পাইয়া তুমি সুখী হইবে ও তোমাকে পাইয়া আমি সুখী হইব। এই বিশুদ্ধ ভক্তিপথই আমার প্রাপক।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবদ্গীতায় অন্বয়মুখে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমসযোগীন্দ্রও নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন, যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

হে রাজন্! দ্বিতীয় পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজঃসত্ত্বগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য ও কেবল তমোগুণে শূদ্র এই চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই পুরুষের জঘন দেশ হইতে গার্হস্থ্য, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বাণপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস, এই চারিটী আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজের জনকপুরুষ পরমেশ্বরকে ভজন করে না, কিন্তু অবজ্ঞাই করিয়া থাকে, তাহারা নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই দুইটি শ্লোকে যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করে না, তাহাদের দোষের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

হে অর্জ্জুন! দুষ্কৃতি মূঢ় মায়ায় বিলুপ্ত জ্ঞান আসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভজন না করিলে প্রচুরতর নিন্দাদ্বারা ভগবদ্ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি—
বার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈক সারম্।
তাবজ্জরামরণ জন্মশতাভি ঘাত—
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥

এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যেজন অশেষ আস্বাদনের মুখ্য সারবস্তু বিষ্ণুভক্তি কথা-সুধারস সেবা করে না, সেই জন বহু বহু জন্মে দেহধারণ করিয়া জরা-মরণ, জন্ম-শত দুঃখভোগ করিয়া থাকে, পদ্মপুরাণে কোথাও কোথাও এরূপ দেখা যায়। এই প্রকার দোষ কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে ভগবদ্ভক্তির সংবাদ যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় সেইটি দেখাইয়া যে পদার্থটি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা পাওয়া যায়, সেই পদার্থটি শ্রীগুরুচরণ-সমীপ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কোন বস্তুটি পাওয়া যায়—তাহাই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বকর্ত্তায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকরণে, সর্ব্বদ্রব্যে, সর্ব্বক্রিয়ায়, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একে একে প্রমাণের দ্বারা দেখাইতেছেন। সমস্ত শাস্ত্রে যে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে; যথা—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥

সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ বলেন, এই মহাঘোর জন্মমৃত্যু সমাকুল সংসারে বাসুদেবের পূজাই সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধারকারী; এই প্রমাণে সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীভগবদ্ভজনেরই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেখান হইল। সর্ব্বশাস্ত্রেও যে শ্রীভগবদ্ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে ২।২।৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্মকাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যথা ভবেৎ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা নিখিলবেদ তিনবার বিচার করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে—নিখিল বেদ, যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে রতির উদয় হয়, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা নিখিলবেদের শ্রীভগবদ্ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব দেখান হইল। তেমনি স্কন্দপুরাণেও উল্লেখ আছে যে—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া মুখ্যরূপে ইহাই সুনিষ্পন্ন হইল যে সর্ব্বদাই শ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখেও "পারং গতোঽপি বেদানাং" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইবে যে—সর্ব্ববেদবিৎ হইয়াও যেজন জনার্দ্দন শ্রীহরিতে ভক্তিহীন, তাহার সমুদায় অধ্যয়ন পণ্ডশ্রম মাত্র। এই বিষয়গুলি পরে দেখান হইবে। এখানে সকলেই যে শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতেঅধিকারী, তাহাই দেখান হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৪৬ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ শীল শিক্ষা
তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমুশ্রুতধারণা যে॥

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, এমন কি যাহাদের পাপেই উৎপত্তি, সেই বেশ্যাপুত্র প্রভৃতিও যদি অদ্ভুত পরাক্রম শ্রীহরি যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, সেই ভগবদ্ভক্তগণের স্বভাব অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ভগবানের তত্ত্ব জানিতে ও তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন। অধিক কি—হংস, গজ, শুক, শারী, সর্প প্রভৃতিও যদি ভক্তসঙ্গে তাঁহাদের আচার ও স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিতে ও মায়া উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহা হইলে যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীভগবানের নামরূপ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি করে, তাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব জানিবে ও মায়া উত্তীর্ণ হইবে এ বিষয়ে সংশয় করিবার অবসর কোথায়? এই প্রমাণে সকলেই যে ভগবদ্ভজনে অধিকারী তাহাই দেখান হইল। গরুড়পুরাণেও উল্লেখ আছে—

কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্ত চেতসাম্।
ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনঃ জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥

ভগবান্ শ্রীহরিতে চিত্তসমর্পণ করিতে পারিলে কীট, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানী মানবগণের যে ঊর্দ্ধগতি হইবে তাহাতে আর সংশয় করিবার কি আছে? সদাচার, দুরাচার, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিরক্ত, বিষয়াসক্ত, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্তিসিদ্ধ, ভক্তিতে অসিদ্ধ, ভগবৎ পার্ষদতাপ্রাপ্ত এবং নিত্যপার্ষদ প্রভৃতিতে সাধারণ ভাবে ভক্তির ব্যাপ্তি দেখা যায় বলিয়াও এই ভক্তির সর্ব্বত্র অধিকার আছে। তন্মধ্যে সদাচার নিষ্ঠে এবং দুরাচারেরও যে ভক্তির অধিকার আছে তাহাই—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

দুষ্কর্ম্মরত সুদুরাচারও যদি অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া আমাকে ভজন করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে—ইহা আমার সাক্ষাৎ আদেশ। যেহেতু সেইজন সুদুরাচার হইলেও হৃদয়ে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছে। অতি সত্বরই সে জন ধর্ম্মজীবন হইবে এবং নিরন্তর দুষ্কর্ম্ম হইতে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যেজন আমার অনন্যভক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়াছে তাহার কখনও নাশ নাই। যদি অসদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও শ্রীহরিভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়,—তাহা হইলে সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি যে অধিকারী হয় এ বিষয়ে আর কি বলিব? "অপিচেৎসুদুরাচারঃ" এই শ্লোকস্থ "অপি" শব্দে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী এ বিষয়ে ১১।১১।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রীমুখেই আদেশ করিয়াছেন। "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাঽথ যে বৈমাং যাবান্‌যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেনতেমেভক্ততমামতাঃ॥" হে উদ্ধব! যাহারা দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দাদিরূপে আমাকে জানিয়াই হউক, অথবা না জানিয়াই হউক কেবল ব্রজরাজ নন্দনাদিরূপে নিজের অভীপ্সিত দাস্যাদি ভাবের মধ্যে একতরভাবেই আমাকে ভজন করিতেছে, কিন্তু কখনও অন্যভাবে ভজে না, তাহাদিগকে কিন্তু আমি ভক্তোত্তম বলিয়াই মনে করি। এই প্রমাণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এই দুই প্রকার ব্যক্তিতেই ভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। অন্যত্র "হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।" অর্থাৎ দুষ্টচিত্তগণও যদি শ্রীহরিকে স্মরণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরি তাহাদিগের সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন।

ইত্যাদি প্রমাণে পাপীগণেরও হরিভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিষয়বিরক্ত ও বিষয়াসক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই যে ভক্তি-অনুষ্ঠানে অধিকারী সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৪ ১৭ শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে যথা—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগলভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।" হে উদ্ধব! আমার ভক্ত ভক্তিপ্রারম্ভে বিষয়রাশিকর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়াও প্রায়শঃ সমর্থা ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না। এই প্রমাণে বিষয়াসক্ত জনেও ভক্তির অধিকারিতা দেখান হইয়াছে। অতএব বিষয়বিরক্ত জন যে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। "বাধ্যমানোঽপি" এই শ্লোকস্থ "অপি" শব্দের দ্বারা এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। মুমুক্ষু ও মুক্তপুরুষে যে ভক্তির বৃত্তি আছে, তাহাই এই নিম্ন শ্লোকে দেখাইতেছেন—"মুমুক্ষবো ঘোররূপাং হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥" অর্থাৎ শ্রীসূতগোস্বামিচরণ কহিলেন, হে শৌনক! অবিদ্যাবন্ধন হইতে যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্ষু মানবগণ ঘোরমূর্ত্তি ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেবতান্তরের প্রতি কোনও প্রকার দোষদৃষ্টি করেন না। এই ১.২।২৬ শ্লোকে মুমুক্ষুজনের হরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" "হে শৌনক! অহঙ্কাররূপ চিজ্জড়ের গ্রন্থি হইতে নির্মুক্ত আত্মারাম মুনীশ্বরগণও শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।১০ শ্লোকের প্রমাণে মুক্তপুরুষেও শ্রীহরিভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। যেজন ভক্তিতে অসিদ্ধ অর্থাৎ অজাতরতি, এবং ভক্তি-সাধনে যে জন সিদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ হরিতে রতি লাভ করিয়াছেন এই উভয়বিধ অধিকারীতেও ভক্তির বৃত্তি আছে। যথা—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

শ্রীশুকমুনি ৬।১।১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন, হে রাজন! বাসুদেবপরায়ণ কোন কোনও মহানুভবগণ কেবলা-ভক্তির প্রভাবে, ভাস্কর যেমন কুজ্ঝটিকা বিনাশ করে, তেমনি নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে অজাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল। "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ, ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ" শ্রীহরিযোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে কহিলেন, হে রাজন! ত্রিভুবন প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ও শ্রীহরিচরণগতজীবনদেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাঁহার লবনিমেষার্দ্ধ কালের জন্যও চিত্ত কখনও বিচলিত হয় না, সেই জন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১১।২।৫১ শ্লোকপ্রমাণে জাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎপার্ষদদেহপ্রাপ্ত ভক্তজনেও ভক্তির বৃত্তি দেখা যায়। যথা—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

৯।৪।৬৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঋষিপ্রবর শ্রীদুর্ব্বাসাকে কহিলেন, হে মুনিবর! আমার সেই সকল নিষ্কামভক্তগণ আমার ভক্তির প্রভাবে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য নামক চারিটী মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহারা সেই চারিটী মুক্তির মধ্যে একটীর প্রতিও ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাহারা আমার সেবানন্দে বিভোর থাকেন বলিয়া ঐ মুক্তিসকলের প্রতি সততই তাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যখন তাহারা পরমানন্দস্বরূপ মুক্তির প্রতিই আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন কালবিনষ্ট পদার্থের প্রতি যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না এবিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। এই প্রমাণে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ ভক্তজনে ভক্তির বৃত্তি দেখান হইল। নিত্য পার্ষদগণে ভক্তির বৃত্তি যথা—

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু—
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ

শ্রীব্রহ্মা ৩।১৫।২২ শ্লোকে দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! যে স্থানের সরোবরসকলের জল অতিস্বচ্ছ ও অমৃততুল্য স্বাদু, এবং তটসকল প্রবালময়, লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্ত্তী নিজবনে উপবেশন করিয়া দাসীগণের সহিত তুলসীদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিতেছেন; সেই অর্চ্চন সময়ে সরোবর জলে সুকুঞ্চিতসুন্দরকুন্তলাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত নিজ শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মনে করেন—শ্রীভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমার মুখচুম্বন করিতেছেন। লক্ষ্মীর হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রমাণে নিত্যসিদ্ধা শ্রীলক্ষ্মীরও শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। সকল বর্ষে, সকল ভুবনে ও সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং সেই বর্ষ, ভুবন, ও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে অষ্ট-আবরণ আছে, সেই সকল আবরণে অবস্থিত জনগণও যে শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত আছেন। ইহাদ্বারা সর্ব্বদেশে শ্রীহরিভক্তির বৃত্তি বুঝিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বকরণে ভক্তির বৃত্তি দেখা যায়, যথা—

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরে বাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে।

আনন্দের সহিত মানসোপচারে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া মহাভাগ্যবান্ মানবগণ অবাঙ্মনসগোচর সেই শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণে অন্তঃকরণদ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনার সংবাদ পাওয়া যায়। এইপ্রকার বচনে নিশ্চয় বাহিরিন্দ্রিয়, মন ও বচনের দ্বারাও তাহার উপাসনা করিলে শ্রীহরিভক্তি সিদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্বদ্রব্যে ভগবদ্ভক্তির উপযোগিতা যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

হে অর্জ্জুন! যেজন ভক্তিযুক্ত চিত্ত হইয়া ভক্তিতে সংগৃহীত পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে অর্পণ করে, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তপ্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি ভোজন করিয়া থাকি।

সর্ব্বক্রিয়াতে যে ভগবদ্ভক্তির বৃত্তি আছে তাহার প্রমাণ ১১।২।১২ শ্লোকে যথা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

শ্রীপাদ দেবর্ষি শ্রীবসুদেব মহাশয়কে কহিলেন, হে বসুদেব! ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পর নিজে পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে, অথবা যেজন ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহাকে প্রশংসা করিলে, তৎক্ষণাৎ বিশ্বদ্রোহীজনসমূহকেও দেহাবেশ হইতে বিমুক্ত করিয়া শ্রীভগবানের চরণে আবিষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীভগবদ্গীতাতে ও সর্ব্বক্রিয়াতে ভগবদ্ভক্তির বৃত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

যিনি ৪০ বৎসরেরও অধিককালব্যাপী নিখিলভগবদ্ধামের চূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বাস করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে শ্রীবৃন্দাবনবাসী গৃহস্থ ও উদাসীন বৈষ্ণববৃন্দ অভীষ্ট শ্রীলীলামৃত আস্বাদনে আপ্যায়িত হইতেন, যিনি ক্ষণকালও লীলাকথামৃত-শ্রবণকীর্ত্তনবিনা অতিবাহিত করিতে অসমর্থ হইতেন, "তব কথামৃতং" গীতিটী যাঁহার জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ হইয়াছিল, সেই মহানুভব শ্রীল মাধবদাস বাবাজী মহারাজ গত ১৮ই বৈশাখ সোমবার সপ্তমী তিথিতে বেলা ঠিক তিন ঘটিকার সময় আমাদের মাংসময়ী দৃষ্টির অগোচরে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি-উদ্ভাসিত সদ্গুণরাশির বর্ণনে লেখনী

অসমর্থ। তাঁহার নিকটে কোনও শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিও উপস্থিত হইলে শ্রীহরিলীলাকথামৃত-আস্বাদনে সব শোকতাপ ভুলিয়া অপার শান্তিসুরধুনীতে ডুবিয়া আসিতেন। তাঁহার বিমল প্রীতিমাখা ব্যবহারে কোনও সম্প্রদায়ের লোকই শান্তি ও সুখ না পাইয়া আসিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের একটী মুখ্য সঙ্কল্পই ছিল যে—অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যক্তিমাত্রকেই ভালবাসিতে হইবে। শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের দাসের স্বভাবই জগৎকে ভালবাসা। কারণ—"নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে।

অহর্নিশি গৌরাঙ্গের গুণ গায় সুখে॥"

এই বাণীটী তাঁহার মুখে সর্বদাই আমরা শুনিতাম। তিনি ব্যবহারিক কথা-প্রসঙ্গেও আধুনিক বা প্রাচীন কোনও ভক্ত-চরিত্র অথবা কোনও লীলা-কথার প্রসঙ্গ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে অপার ভক্তিরসে ডুবাইতেন। যাঁহারা যাঁহারা অল্পসময়ও তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহারা সকলেই ইহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বনমালী রায় রাজর্ষি বাহাদুর তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার ঘোষ বি, এ মহোদয় বাবাজী মহারাজের অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়জন ছিলেন। বাবাজী মহারাজের যাহাকিছু মনের কথা প্রাণের ব্যথা—সকলই উক্ত কামিনীবাবুর নিকটে অকপটে খুলিয়া বলিতেন। এমন কি—প্রাণে যখনই যে কোনও লীলা কথার আস্বাদন হইত, তখনই শ্রীযুক্ত কামিনীবাবুকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত কামিনীবাবুর পরিবারস্থ বালক-বালিকাগণও বাবাজী মহারাজকে অতি অন্তরঙ্গ আপনজন বলিয়া জানিত। আজ সেই বাবাজী মহারাজের অভাবে শ্রীযুক্ত কামিনীবাবু তো সব শূন্যময় দেখিতেছেনই, তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা সকাতরে প্রার্থনা করি—পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাদের প্রতি কৃপারসবর্ষণে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করুন। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের প্রতি বাবাজী মহারাজের একটা অতুলনীয় অনাবিল গৌরববর্জ্জিত প্রীতিমাখা ভ্রাতৃস্নেহ ছিল। ঐ স্নেহটীর ভিতরে প্রীতি মিশ্রিত থাকায় সময়ে সময়ে বেশ অভিমানেরও সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যাইত। কখন কখনও প্রণয়-রোষভরে শ্রীল প্রভুপাদকে মধুমাখা ভর্ৎসন করিতেও তিনি কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। তিনি বলিতেন "আমি বড়ভাই, ছোটভাইয়ের দোষ দেখিলে ভর্ৎসন করিব না কেন? আমি ও নিত্যানন্দদাস, প্রভুপাদও নিত্যানন্দদাস, আমাদের এই সম্বন্ধ পারমার্থিক, অতএব নিত্য-সত্য"। এইভাবে প্রভুপাদের প্রতি সততই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতেন। সেই বিশুদ্ধ ভাবের প্রভাবে নির্য্যাণসময়ে নিজসঙ্কল্পঅনুরূপ সৌভাগ্যলাভে সকল বৈষ্ণব-সমাজকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। প্রভুপাদ যখন পাটনায় প্রধানতম ব্যারিষ্টার, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ সাহেবের অনুরোধে তথাকার শ্রীহরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবতকথা-প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১০ই বৈশাখ তারিখে বাবাজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে একখানি সুদীর্ঘ পত্রে নিজের সাময়িক অবস্থা বিজ্ঞাপন করেন, এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত পি, আর দাশসাহেবকেও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া—আনন্দ উচ্ছাসভরে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। সেই পত্রের ভিতরে শ্রীল প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রখানি পাইয়াই ১৩ই বৈশাখ শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। সেই সময়ে লীলাকীর্ত্তনগায়কপ্রধান শ্রীযুক্ত গণেশদাশজীও পাটনাতেই শ্রীহরিসভায় লীলাকীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত দাশ সাহেবকে শ্রীযুক্ত গণেশদাশ-কীর্ত্তনীয়াসহ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাবাজী মহারাজকে লীলাকীর্ত্তন ও লীলাকথাপাঠ শ্রবণ করাইবার অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত দাশ সাহেব যাতায়াত ও পাথেয় ভার গ্রহণে নিজে আনন্দোচ্ছাসভরে সম্মতি প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৪ই বৈশাখ প্রাতে কীর্ত্তনীয়া গনেশদাসজীর সহিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ বাবাজী মহারাজের সহিত মিলিত হয়েন। তখন যদ্যপি তাঁহার

শয্যা হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, তথাপি আনন্দোচ্ছাস-ভরে কতই প্রীতিমাখা সুমধুর প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণন করা চলে না। সেই দিবসই অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা হইতে ৭৷৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাস-লীলার ৩২ অধ্যায়ের "ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ" এই শ্লোক হইতে "তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ" এই দুটি শ্লোক ৪ দিন পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীগণেশদাসজী রূপানুরাগ ও "রূপাভিসার" লীলাকীর্ত্তন করিয়া সমবেত বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে অপার আনন্দরসপ্রবাহে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ ব্যাধির তাড়নায় কেবলই বলিতেন, "শ্রীজীব আমায় ধর", "বড় গোসাঞি আমায় ধর"। সেবক-সেবিকাগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি ছয় গোস্বামিকেই সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি।" দুরন্ত-ব্যাধির যাতনায় মন প্রাণেশ্বরীর চরণ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, এই ভয়েই শ্রীজীব সনাতন গোস্বামিকে মনটী ধরিয়া প্রাণেশ্বরীর চরণে রাখিতে বলিতেছি।" পঞ্চম দিবসে যখন প্রাণ-নিষ্ক্রামণের সময় উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত বৈষ্ণবগণ সমকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ।" এই শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ঘর হইতে শ্রীআঙ্গিনায় বাহির করিয়া শ্রীসেবাকুঞ্জের ও শ্রীযমুনাপুলিনের শ্রীরজের উপরে রাখা হইল। এমত সময়ে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগণেশদাসজী শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন, "প্রভুপাদ! আমি বাবাজী মহাশয়ের সঙ্কল্প জানি। তিনি আপনার কোলে মাথা রাখিয়াই দেহ-ত্যাগের অভিলাষ পোষণ করেন"। শ্রীল প্রভুপাদ এই কথাটী শ্রবণ করিয়া যখনই মাথাটী কোলে তুলিয়া লইলেন, তখনই বাবাজী মহাশয় এক অলৌকিক ও অব্যক্তভাবে দুইটী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখনকার সেই চাহনীর ভঙ্গীতে সকল বৈষ্ণবই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে যে অভীষ্টবস্তু উপভোগ করিতেছিলেন, এইক্ষণ চক্ষুঃ মেলিয়া সাক্ষাৎ সেই বস্তু দর্শন করিতেছেন, তাহা ভিন্ন কখনই এই প্রকার চাহনি হইতে পারে না। তখন চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তি ও আনন্দ-মাখা স্বরে শ্রীহরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সকল বৈষ্ণবের হৃদয়েই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যানের কথা স্মরণ হইতে লাগিল; সকলকেই দেহত্যাগ করিতে হইবে বটে, কিন্তু এইরূপভাবে দেহত্যাগ প্রায়শঃ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামির কোলে মস্তক দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় শৃঙ্গারবটের শ্রীসদানন্দ প্রভুপাদ, বামদিকে শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী নিতানন্দবংশ্য শ্রীযতীন্দ্রলাল গোস্বামী, তাঁহার পার্শ্বে শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গোস্বামী, তৎপার্শ্বে তাঁহার পুত্র তাহারই সম্মুখে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিবার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী বেদান্তরত্ন প্রভৃতি অনেক আচার্য্যসন্তান, বনবাসী ও শ্রীবৃন্দাবনবাসী বহু উদাসীন ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ আর্ত্তি ও আনন্দমাখা হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে খোল করতালের সহিত :—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ—
হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।"

এই নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তুমুল সেই শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবমণ্ডলী মধ্যেও শ্রীসেবাকুঞ্জ ও পুলীনের রজের উপরে এবং প্রভুপাদের কোলে মাথাটি রাখিয়া জড়ীয় জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন; তখন বেলা ঠিক ৩ তিনটা, তৎপরে রসিক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহভাজন শ্রীমান্ সীতানাথ ঘোষ আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার পর তাঁহার শ্রীগুরুপাট শৃঙ্গারবট হইতে এবং শ্রীগোপীনাথের মন্দির হইতে শিরোপা আনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥
যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥
এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥
যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবিশ্য মনো বিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যখন মথুরা হইতে ব্রজে আসিতেছিলেন তখন পথে পথে ভাবিতেছিলেন, যাঁহাদের স্নেহাতিশয়ের কথা বর্ণন করিতে করিতে আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এত বিহ্বল হইয়াছিলেন, না জানি সেই শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রস্নেহের জাতি ও পরিমাণ কি প্রকার হইবে! এখন সেই নিরন্তর আকুলতামাখা গাঢ়স্নেহ দর্শন করিয়া উদ্ধব মনে মনে ভাবিতেলাগিলেন,—অহো! আমার কি সৌভাগ্য! যেহেতু এতাদৃশ অনাবিল স্নেহের আধার সেই ব্রজরাজব্রজেশ্বরীকে সাক্ষাৎ দুটী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু ইহাদিগকে আমি কিরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি? কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিনা ইহাদের কাল অতিবাহিত করা অত্যন্তই অসম্ভব। অথচ আমার প্রভুর ব্রজে আগমন এবং ইহাদেরও মথুরাতে গমন অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিতেছি। ইহাদের স্বাভাবিক স্নেহের যদ্যপি কোন প্রকার হানি অথবা গ্লানি সম্ভবপর নয়, তথাপি যদি কোন প্রকারে একটুকুও স্থগিত করিতে পারি, তাহা হইলে ইঁহারা দু'জনা এই দুরন্ত শোক-সাগর তরিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইতে পারেন। অন্য কোন প্রকারে এই দুরন্ত শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখি না। অথচ এই স্নেহের আবেগ ও তাঁহার পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁহার প্রতি ইহাদের প্রেম, মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা নিজের মহত্ত্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে স্থগিত হইতে পারে না। সেই তত্ত্ব-মহিমা পরিচয় করাইবারও উত্তম অবসর পাইয়াছি। যেহেতু স্বয়ংই আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অলোক-সামান্য প্রভাব বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন, কোন দেবশ্রেষ্ঠ আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ তাঁহার মহিমা বর্ণন করাতে আমার পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আমি এখন বেশ বুঝাইতে পারিব, তাঁহারা ত মানুষ নহেনই, এমন কি দেবশ্রেষ্ঠও তাহাদের নিকট তুচ্ছ, সাক্ষাৎ ভগবান্ই আপনাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সৌভাগ্যের অবধি নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া যদি পুত্রসম্বন্ধের কথঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিতে পারি, তাহা হইলেই আকুলতার আংশিক হ্রাস ঘটিবে, ইহা ভিন্ন আর সান্ত্বনা দিবার কি উপায় আছে? কারণ জনসাধারণ পুত্রের জন্য যদি ব্যাকুলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই উপদেশ করা যাইতে পারে যে,—মায়াময় পুত্রের জন্য কেন বৃথা মায়াময় শোক করিয়া মোহজালে পতিত হইতেছ? এই জগতে কাহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ নাই, কেবল আগন্তুক মনঃকল্পিত সম্বন্ধমাত্র। পথে যাইতে যাইতে যেমন পথিকে পথিকে একটা ভালবাসা জন্মে, তাহার পর পরস্পর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে আর সেই ভালবাসার সম্বন্ধ থাকে না তেমনই এই সংসার পথে ভ্রমণকারী জীবের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মে তুমি কোথায় ছিলে, তোমার পুত্রই বা কে ছিল, ইহা যেমন স্মরণ নাই, তেমনই তোমার যে পুত্র চলিয়া গেল সেই পুত্র দেহান্তর গ্রহণ করিয়া তোমার কথা একেবারেই ভুলিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। তুমিও দেহভঙ্গের পর অন্য দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিবে, এবং অন্যের প্রতি পিতা-পুত্রাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে, এ জন্মের সকল সম্বন্ধ একেবারে ভুলিয়া যাইবে। অতএব মায়াময় স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্বন্ধ স্থাপন কর, তাহা হইলে আর তোমার কোন দিনও এই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। আর এই অসহনীয় সন্তাপও তোমাকে ভোগ করিতে

হইবে না। সুতরাং এই মায়াময় পুত্রের জন্য রোদন ত্যাগ করিয়া দিনরাত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে পারিলেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে।

কিন্তু যে শ্রীনন্দযশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্যই অনবরত কাঁদিতেছেন তাঁহাদের রোদনের আবেগ কি উপায়ে স্থগিত করিতে পারা যায়? কারণ শাস্ত্রে যত প্রকার কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াছেন, সকল উপদেশের সার তাৎপর্য্য, আকুল আবেগে শ্রীকৃষ্ণের জন্য মরম কাঁদা।

শ্রীল ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর নিখিল পুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল আবেগে মরমের ক্রন্দনটী স্বভাবসিদ্ধ। এই জন্য শ্রীউদ্ধবমহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদা উচিত নহে, এরূপ উপদেশ আমি কিরূপে করিতে পারি? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর প্রেম-মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা যদি বিশুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞান কথঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এত আকুলতাময় আবেগ থাকিবে না। কিন্তু এস্থলে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজরাজব্রজেশ্বরীর দুঃখদর্শন করিয়া দুঃখাংশ প্রকাশ করেন নাই। তাহার কারণ শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাংশেরই স্ফূর্ত্তি প্রধানরূপে ছিল। ব্রজরাজব্রজেশ্বরীর অনুরাগের মহিমাংশেরই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাকুলতার অংশ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। যদি ব্যাকুলতার অংশ স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে ব্রজরাজব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দিবার অনধিকারী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্রজে পাঠাইতেন না। তাঁহাদের অনুরাগের মহিমাংশ স্ফূর্ত্তিও শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের মনে নিম্নলিখিত প্রকারেই হইয়াছিল। শ্রীল নন্দ ও যশোদা যাঁর প্রতি অনুরাগ বহন করিতেছেন, তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর। তন্মধ্যেও স্বরূপে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ আবির্ভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই মূল আশ্রয়তত্ত্ব। যে স্থানে অনুরাগটী স্থাপন করিলে, অনুরাগের কোন প্রকারে বিষয়গত কিছুমাত্র ন্যূনতা থাকে না, সেই বস্তুতে এই অনুরাগটী করিয়াছেন। আবার যে অনুরাগটী করিয়াছেন, সেই অনুরাগেরও বিশেষণ দিতেছেন "পরমম্" অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীউদ্ধব পরম আনন্দ-আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রজরাজব্রজেশ্বরি! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় বর্ত্তমান জগৎ তাঁহার মহাভক্তগণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেশ, নগর, গ্রাম, আকর প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ভক্তগণ প্রকট হইয়াছেন। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ভক্তগণরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বিশ্বের মধ্যে শ্রীনারদপ্রমুখ, এমন কি ব্রজবাসিগণ পর্য্যন্ত যে সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জন আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনারা দুইজন শ্রেষ্ঠতম, এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদিগকে নিখিল ভগবৎপরিকর হইতে অতিশয় সম্মান দান করিতেছেন। আপনাদের প্রীতিগর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমরা সকলে গর্ব্বিত। কারণ যত যত ভগবৎস্বরূপ এই বিশ্বে আসয়ালীলা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিকরবৃন্দের মধ্যে আপনাদের মত অনাবিল আকুলতামাখা প্রীতিমান্ কেহই আসিয়া ছিলেন না, এবং আসিবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব আপনাদের প্রীতির গর্ব্বেই আমাদের অতিশয় গর্ব্ব। যেমন যূথের মধ্যে একজন মহাবলিষ্ঠ থাকিলে, সেই যূথস্থ সকলেই গর্ব্বানুভব করে, আমরাও তেমনই; আপনারা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, তিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—মহাবিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষাবতার সমূহেরও পরমাশ্রয়। অধিক কি বলিব, পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ প্রভৃতি হইতেও মহত্তম প্রকাশস্বরূপ। যেহেতু পরব্যোম নাথ শ্রীনারায়ণ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ বটেন, কিন্তু তাঁহাতে পূর্ণ মাধুর্য্যের অভাব আছে। আপনার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ স্বরূপেও অসমোর্দ্ধ-অদ্ভুত-অনন্ত ঐশ্বর্য্যে এবং সর্ব্বমনোহরতা প্রধান ধর্ম্মমাধুর্য্যে সর্ব্বথা পরিপূর্ণ। পরম উপাদেয় পরম দুর্ল্লভ পরমভাগ্য দুষ্প্রাপ্য যত বস্তু আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত বস্তুর একমাত্র পরমাশ্রয়। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে আপনারা পুত্র-ভাবে বশীভূত করিবার মতি লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ আপনাদের বিশুদ্ধ বাৎসল্যে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সততই নিজকে সর্ব্বপ্রকারে অধীন বলিয়া মনে করেন। আপনাদের সৌভাগ্য-মহিমা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। এমত দুর্লভতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের নিকট সর্ব্বদা হাত-জোড় করিয়া আছেন, এই রামকৃষ্ণ দুই ভাইই বিশ্বের বীজ

(নিমিত্ত কারণ) ও যোনি (উপাদান কারণ)। (যে কারণটী কার্য্যোৎপাদন করিয়া কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকে, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে, যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার। যে কারণ কার্য্যোৎপাদন করিয়া কার্য্যের সহিত মিলিত থাকে তাহাকে উপাদান কারণ বলে; যেমন ঘট-কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা।)

হে গোপরাজ! হয়ত আপনি মনে করিতে পারেন যে এই বিশ্বের নিমিত্তকারণরূপে পুরুষ এবং উপাদান-কারণ রূপে প্রকৃতিকেই সকলে জানে, রামকৃষ্ণ কিরূপে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইবে? তাহারই উত্তরে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিলেন—এই রামকৃষ্ণই সেই পুরুষ ও প্রকৃতি। কারণ যিনি পুরুষ সংজ্ঞায় অভিহিত তিনি রামকৃষ্ণের অংশস্বরূপ, প্রকৃতিও রামকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। অর্থাৎ স্বরূপের বাহিরে কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম প্রকৃতি অথবা মায়া। এই মায়াশক্তি স্বরূপবহির্ম্মুখ জীবের ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। রামকৃষ্ণই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া নিখিল-ভূতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, অথচ সেই সকল মায়িক-পদার্থে কখনও লিপ্ত হয় না। নিজ চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়াপ্রভাব স্থগিত করিয়া নিজ অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন। বিশুদ্ধ জীবস্বরূপেরও নিয়ামক রাম-কৃষ্ণ। অধিক কি বলিব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপকে সাধক-হৃদয়ে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে তাঁহারাই সমর্থ। অর্থাৎ যে সাধকের প্রতি রামকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের আবির্ভাব করান, সেই জ্ঞানসাধকই ব্রহ্মস্বরূপের, সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন সাধনশক্তিপ্রভাবে কেহই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে সত্যব্রত মহারাজকে শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছিলেন,—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥"

৮।২৪।৩৮

হে রাজন্! আমার বিভুত্বই পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত, এবং সেই তত্ত্বটি আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত। অর্থাৎ সেই বিভুতত্ত্ব আমার অনুগ্রহেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তুমি সম্যক্ প্রশ্ন দ্বারা নিজহৃদয়ে আমার সেই বিভুত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপটী যে অনুগৃহীততত্ত্ব এবং শ্রীভগবান্ যে অনুগ্রাহক তত্ত্ব তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্রীরামকৃষ্ণ যদ্যপি আপনাদের পুত্ররূপে আবিভূত হইয়াছেন, তথাপি ইঁহারাই পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, এবং রাম নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের মূল অব-তারী। যদ্যপি এই বিশ্বকার্য্যে কারণরূপে প্রকৃতি, পুরুষ ও কালকেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি সেই তিনটীই শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে পুরুষ, প্রকৃতি বা কাল জগতের কারণ হইতে পারে না। কারণ তাহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতৎত্রিতয়ন্ত্বহম্॥

১১।২৪।১৯

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে বিশ্বকার্য্যের প্রকৃতি উপাদান, পুরুষ নিমিত্ত ও গুণক্ষোভক কালকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল আমা-হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। কারণ পুরুষ আমার অংশ, প্রকৃতি আমার শক্তি, কাল আমার বিশ্বকার্য্যের অভিব্যক্তি করিবার ক্ষমতাবিশেষ। পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"

হে অর্জ্জুন! এই নিখিল বিশ্ব আমি একাংশের দ্বারা ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেরও ভগবান্ই যে একমাত্র আশ্রয় তাহাও শ্রীগীতায় দেখাইয়াছেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"

হে অর্জ্জুন! আমি অমৃত, অব্যয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয়। এইরূপ উপদেশ করা সত্ত্বেও শ্রীব্রজ-রাজ ব্রজেশ্বরীর চিত্তে কিছুমাত্রও প্রসন্নভাব দেখিতে

না পাইয়া পুনর্ব্বার কৈমুত্যন্যায়-অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রাম-কৃষ্ণ দুইভ্রাতাকে পৃথক্‌রূপে বলিয়াছিলেন এইক্ষণ দুইয়ের অভেদে বর্ণন করিতেছেন।

হে গোপরাজ! প্রাণিমাত্র প্রাণবিয়োগ কালে ক্ষণকালের জন্যও যদি কেবল মাত্র মনটী শ্রীকৃষ্ণে সমাবিষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে কর্ম্মাশয় দগ্ধ করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকে, এবং সেই পরমপদ লাভে তাহার কালবিলম্ব হয় না। তখন শ্রীভগবানের পার্ষদস্বরূপ লাভ করে বলিয়া নিজেও অর্কবর্ণ অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ হইয়া থাকে এবং অন্যকেও প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে, এবং ঐ পার্ষদ-স্বরূপটী চিচ্ছক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বলিয়া একই সময়ে বহুস্থানে অভিব্যক্তিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এস্থানে বিশেষ জানিবার বিষয় এই যে—মূল শ্লোকে "মনো বিশুদ্ধং" এই পদটীর উল্লেখ থাকায় কেহ হয়ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার অবসর পাইয়া থাকেন, যে মনের ভিতরে অন্য কোনরূপ বাসনা নাই এমন মন যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে তাহা হইলে পরমাগতি লাভ করিবে, কিন্তু অন্য বাসনাযুক্ত মন তাঁহাতে অর্পণ করিলে পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ যে মনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাসনা ভিন্ন অন্য কোন বাসনা স্থান পায় না, সে মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণেই সমাবিষ্ট থাকে। সুতরাং শ্লোকে "ক্ষণং সমাবিশ্য" উক্তিটীর কোনই সার্থকতা রক্ষা পায় না। সেই জন্য বিশুদ্ধ শব্দের অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহিত্য-শূন্যরূপ অর্থই সুসঙ্গত। অর্থাৎ কেবল মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ-কেই স্মরণ করিতেছে কিন্তু মুখে "কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে না, হস্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন আনুকূল্য করে না। কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছে না" এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে "মনোঽবিশুদ্ধং" এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অবিশুদ্ধ মনও যদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে তাহা হইলেও পরমাগতি লাভ করে।

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তোনিতরাং মহাত্মন্।
কিম্বাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্॥
আগমিষ্যাত্যদীর্ঘেন কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রো র্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং।
যদাহবঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥
মা খিদ্যতাং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥

আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণে অতিশয়রূপে এতাদৃশ পুত্র-ভাবময় অনুরাগবিধান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণে বুকভরা এতাদৃশ অনুরাগ আপনাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এই জন্য আপনারা যথার্থ মহাত্মা। যে শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের এতাদৃশ গাঢ় অনুরাগ, তিনি অখিলতত্ত্বের আত্মা, (আশ্রয়) এবং হেতু। এই জগতে যত তত্ত্ব আছে সেই সকল তত্ত্ব—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা আধ্যাত্মিক। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ আধিদৈবিক। ইন্দ্রিয়গোলক আধি-ভৌতিকসর্গনামে অভিহিত। এই তিনটী সর্গই পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গোলক দর্শনকার্য্যে সক্ষম হয় না। আবার গোলক না থাকিলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতাও সেইরূপ কার্য্য-সম্পাদনে অক্ষম হইয়া থাকে। এইজন্য এই তিনটী সর্গই পরস্পরাপেক্ষী। যেমন ইট্ কাঠ চুন সুরকীর পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতার একত্র সম্মিলন করিয়া দিবার জন্য কোন এক যোগ্য মানবশক্তির অপেক্ষা করে, তেমনই আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিসর্গের শক্তির সম্মি-লন করাইয়া কার্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করাইবার জন্য আশ্রয় তত্ত্বের অপেক্ষা আছে। সেই আশ্রয়তত্ত্বের নিয়মন ভিন্ন এ ত্রিসর্গের কেহই কিছু করিতে পারে না। এইজন্য শ্রুতিও বলেন "ন প্রাণে নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণতু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" অর্থাৎ প্রাণ

বা অপান বায়ুদ্বারা কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় সেই তত্ত্বটীই আশ্রয় বা নিয়ামক তত্ত্ব। সাধারণ ভাবে যত্তপি পরমাত্মাকেই জীব ও প্রকৃতির কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদির আশ্রয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মাপুরুষতত্ত্বেরও পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামিপাদও দশম-স্কন্ধের "কথিতো বংশ বিস্তারঃ" এই প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন।

"দশমে দশমং লক্ষ্যং আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং।
ক্রীড়াদ্যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে"॥

এই দশমস্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি এই নব আশ্রিত পদার্থের মূল আশ্রয়মূর্ত্তি পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বর্ণিত হইবেন। তিনি গোপজাতি ও ক্ষত্রিয়জাতিরূপ যদুকুল-সিন্ধুতে নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীউদ্ধবমহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে অখিলতত্ত্বের আত্মারূপে উপদেশ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিল কার্য্যের পরম্পরারূপে হেতু, কিন্তু সাক্ষাৎরূপে এই বিশ্বের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ নিজের অংশ পুরুষদ্বারাই এই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যের হেতু হইয়া থাকেন, সাক্ষাৎরূপে নিজ প্রেমবান্ ভক্তগণের সহিত স্বরূপানুবন্ধি লীলারসে আবিষ্ট আছেন।

হয়ত আপনি মনে করিতে পারেন যিনি অখিলতত্ত্বের আশ্রয় ও হেতু তিনি নারায়ণ। সে নারায়ণ চতুর্ভুজ, আমার পুত্র কৃষ্ণ দ্বিভুজ-মনুষ্য-আকার। তাহা হইলে আমার পুত্র মনুষ্যাকার কৃষ্ণ কেমন করিয়া নিখিলতত্ত্বের আশ্রয় হইতে পারে?

তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—

যিনি নিখিল নিমিত্ত ও উপাদান কারণের মূল কারণ, তিনিই মনুষ্যাকার। অর্থাৎ এই নরাকৃতি স্বরূপটীই নিখিল-কারণের মূল-কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম। এই অভি-প্রায়েই শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ভাঃ ৭ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে ৭৫শ শ্লোকে এবং ঐ স্কন্ধেরই ১০ম অধ্যায়ে ৪৮শ শ্লোকে একই শ্লোক অবিকৃতরূপে শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষা-
দগূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥

হে রাজন্! এই লোকে তোমরাই বহুল ভাগ্যবান্। যেহেতু মনুষ্যলিঙ্গ গূঢ় পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎরূপেই তোমাদের গৃহে বাস করিতেছেন বলিয়া জগৎপবিত্রকারী মুনিগণ সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন।

এই দুই শ্লোকে সর্ব্বদর্শী শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ নরাকৃতি স্বরূপটীকে গূঢ় পরব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই-একটী শ্লোক দুই স্থানে অবিকৃতরূপে উল্লেখ থাকাতে পরম-ব্রহ্ম যে নরাকৃতি তাহাই বিশেষরূপে অবধারণ করান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই যে নিখিল কারণের মূলকারণ সেই বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতাতেও উল্লেখ করা আছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। এবং তিনি সকলের আদি, তাঁহার আদি কেহই নাই। এবং তিনি নিখিল কারণের কারণ। অন্য সকল কারণ সাপেক্ষ্য, আর শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ কারণ। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে ১০।১৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

সর্ব্বেষামপিবস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্॥

হে রাজন্! নিখিল সদ্বস্তুর সত্তা উপাদানকারণে অবস্থিত। যেমন ঘটের সত্তা মৃত্তিকার সত্তা অবলম্বনে, মৃত্তিকার সত্তা পৃথিবীর সত্তা অবলম্বনে, পৃথিবীর সত্তা জলের সত্তা অবলম্বনে, জলের সত্তা তেজের সত্তা অবলম্বনে, তেজের সত্তা বায়ুর সত্তা অবলম্বনে, বায়ুর সত্তা আকাশের সত্তা অবলম্বনে, আকাশের সত্তা অহঙ্কার তত্ত্বের সত্তা অব-লম্বনে, অহঙ্কারত্ত্বের সত্তা মহত্তত্ত্বের সত্তা অবলম্বনে, মহৎতত্ত্বের সত্তা প্রকৃতির সত্তা অবলম্বনে, প্রকৃতির সত্তা

পুরুষসত্তা অবলম্বনে, পুরুষের সত্তা পরমপুরুষের সত্তা অবলম্বনে, পরমপুরুষের সত্তা ভগবৎসত্তা অবলম্বনে, ভগবৎসত্তা স্বয়ং ভগবানের সত্তা অবলম্বনে। এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অতএব নিখিল নিমিত্তকারণ ও নিখিল উপাদান কারণের একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণ। আপনারা সেই শ্রীকৃষ্ণেই পুত্রভাবময় গাঢ় অনুরাগ ধারণ করিয়াছেন। আপনাদের সৌভাগ্য-মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর মহিমাতিশয় কীর্ত্তন করাতেও কিছুমাত্র চিত্তের শান্তি না হইয়া প্রত্যুত তাঁহাদের হৃদয়ে অনুতাপই উপস্থিত হইয়াছিল। হে বৎস উদ্ধব! তুমি অতীব বুদ্ধিমান্ বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তোমার কথা-প্রসঙ্গে বুঝিলাম, তুমি অতিশয় মুগ্ধ। যেহেতু আমাদিগকেও তুমি স্তব করিতেছ। হা ধিক্! হা ধিক্! এতাদৃশ গুণার্ণব পুত্র যাহার গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক মন্দভাগ্য, অধম, দুঃখী ত্রিভুবনমধ্যে আর কে আছে?

এইরূপ শ্রীব্রজেশ্বরের উক্তি আশঙ্কা করিয়া, এবং নিজ হৃদয়েও ঐ ভাব কিঞ্চিৎ স্পর্শ করায় শ্রীমান্ উদ্ধব এই প্রকার আশ্বাসবাণী বলিতে লাগিলেন,—"হে গোপরাজ। আপনার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ও সত্যবচন বলিয়াই অচ্যুত নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাদের অবিচলসঙ্গমরূপ প্রিয়বিধান করিবেন। অর্থাৎ আপনাদের সঙ্গে অদীর্ঘকাল মধ্যেই মিলিত হইয়া আপনাদের নিকটেই থাকিবেন। আপনাদের প্রীতিবিধান করিতে তিনি একান্তই বাধ্য। যেহেতু আপনারা তাঁহার পিতা ও মাতা। পিতৃভাবময় মহাপ্রেমে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া পুত্রাভিমানী করাইয়াছেন। অর্থাৎ আপনারা যেমন তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ পুত্রভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, তেমনই তিনিও আপনাদের প্রতি অকপট পিতৃমাতৃভাবে পরম আবিষ্ট আছেন। যেহেতু তাঁহার স্বভাব, তাঁহাকে যে ভক্ত যেমন ভাবে ভজে, তিনিও তাহাকে তেমনই ভাবে ভজিয়া থাকেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ হইয়াও ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করা তাঁহার স্বভাব।

শ্রীউদ্ধবের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজরাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ আবার ফিরিয়া ব্রজে আসিবে, এরূপ বিশ্বাস কিছুতেই করিতে পারিতেছি না।" ব্রজরাজের এইরূপ আশয় বুঝিতে পারিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব, ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ হৃদয়ে যে পিতৃমাতৃভাব পোষণ করেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য এবং মথুরা হইতে ব্রজে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হওয়ার কারণ দেখাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে সকল যাদবগণের বিরোধী কংসকে বিনাশ করিয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া যে বলিয়াছিলেন,—

> যাত যূয়ং ব্রজং তাত। বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
> জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্ যাদবগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিয়া—আমার স্নেহে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত জ্ঞাতি আপনাদিগকে দেখিতে যাইব। এই বাক্য এখনও তিনি সত্যবিধান করিতেছেন। অর্থাৎ আমাদের নিকটে ব্রজে আসিবার কথা উল্লেখ করিলে আমরা বলিয়া থাকি—হে প্রভো! আপনার আর ব্রজে যাওয়া হইবে না" তাহাতে তিনি ছল ছল নেত্রে আমাদের নিকট শপথ করিয়া বলেন, "হে উদ্ধব। আমি নিশ্চয়ই ব্রজে যাইব"। এইরূপ আশ্বাসবাণী দেওয়াতেও শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী কিছুতেই "সোয়াস্তি" লাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ মনে মনে অনুতপ্ত হৃদয়ে আক্ষেপই করিতে লাগিলেন। হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের দৌভাগ্যের কি এতই প্রাবল্য? যাহা সত্যবচন পুত্র শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজে আগমনে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এইরূপে ক্ষিন্নমানস ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রতি সম্বোধন করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,—হে মহাভাগ্যবান্ ও মহাভাগ্যবতী ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরি! নিজ নিকটে কৃষ্ণকে দর্শন করুন। আর খেদ করিবেন না। তিনি প্রাণিমাত্রের হৃদয়মধ্যে কাষ্ঠের ভিতরে যেমন আগুন থাকে, সেইরূপে নিত্য বিদ্যমান্ আছেন। এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত শ্রীল ব্রজেশ্বরী চক্ষু মুদিয়াই উদ্ধবের সকল কথা

শুনিতেছিলেন। কোন কথাই তাঁহার মানসভাবের অনুকূল হইতে ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন উদ্ধব যে সকল তত্ত্বের কথা বলিতেছে এ সকল তত্ত্ব কি আমরা জানি না? শ্রীনারায়ণই মূল আশ্রয়তত্ত্ব। তিনিই সর্ব্ব-কারণের কারণ। কৃষ্ণ ত আমার দুগ্ধপোষ্য বালক। ক্ষুধায় নবনীত দিতে একটু বিলম্ব হইলে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িত। একদিন দধিমথন করিবার সময় আমার কোলে বসিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে অতৃপ্ত অবস্থায় তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গৃহান্তরে গমন করিলে সে বিশ্বসংসার আঁধার দেখিয়া দধিমথন-গাগরী স্ফোটন ও নবনীত হরণ করিয়া ভোজন করিয়া-ছিল। যিনি ভগবান্ তিনি পূর্ণকাম, তাঁহার বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা নাই। তাঁহার চরণ যে ধ্যান করে তাহারও হৃদয়ে ক্রোধ ও চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি থাকে না। আমার পুত্র কৃষ্ণ যেমনই ক্রোধী তেমনই চোর, তেমনই চঞ্চল। উদ্ধব ছেলে মানুষ সেই জন্য রজ্জুতে সর্পের মত একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করিয়া কথা বলিতেছে। অর্থাৎ শ্রীনারা-য়ণের ধর্ম্ম আমার পুত্র কৃষ্ণে আরোপ করিয়া বর্ণন করিতেছে। এই ভাবিয়াই শ্রীউদ্ধবের প্রতি এযাবৎ দৃষ্টি-পাত করে নাই। যখন উদ্ধব বলিলেন যে, তিনি ব্রজে আসিবেন বলিয়া আমাদের নিকট শপথ করেন। এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া উদ্ধবের প্রতি চাহিলেন বলিয়াই উদ্ধব দুইজনকে মহাভাগ্যবান্ ও মহাভাগ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

তখন ব্রজরাজ বলিলেন, হে উদ্ধব! তুমি যে বলিলে অদীর্ঘকাল মধ্যে কৃষ্ণ ব্রজে আসিবে সেই দিনের আর কতদিন বাকী আছে! কল্য কি পরশ্ব? অথবা পঞ্চম বা দশম দিনে আসিবে নিশ্চয় করিয়া বল। সম্প্রতি প্রাণ আর এই দেহে থাকিতে চায় না। কোন্ আশ্বাসে প্রাণ রক্ষা করিব? আর যদি একান্তই কৃষ্ণ না আসে, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বল। দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাউক্। কেন আর সেই প্রাণ-নিরোধ-কষ্ট ভোগ করি? শ্রীল নন্দমহারাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব মহা-শয় নিজ হৃদয়ে তখন পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি এ সঙ্কটে কি উপায় অবলম্বন করি? কারণ প্রাকৃত-পুত্রবিয়োগে যাহারা কাতর হয় তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া যায় যে, "হে ভ্রাতঃ! কেন সাংসারিক মোহে নিমগ্ন হইতেছ? মিথ্যা পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তি অনর্থের কারণ। ইহাতে কেবলই অশান্তিই ভোগ করিবে। অতএব এই প্রাকৃত পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আসক্তি স্থাপন কর"। কিন্তু যাহার পুত্ররূপী ভগবানেই এতাদৃশ গাঢ় আসক্তি, সেই নন্দ মহারাজকে আমি কোন ভাষায় প্রবোধ দান করিব? অথচ বসু-দেবের মত ইহার শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাবটি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-উপদেশে শিথিল করিতে পারিলাম না। বরঞ্চ যতই আমি পর-মেশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করি ততই ইঁহাদের পুত্রের প্রতি অনুরাগের গাঢ়তাই বৃদ্ধি হয়। ইঁহারা মনে করেন "হা ধিক্! প্রাকৃত পুত্রকেই যদি গৃহে খেলা করিতে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহারই পিতামাতা দুঃখে মরিয়া যায়। আমাদের অতিশয় ভাগ্যবশতঃ পরমেশ্বর গৃহাঙ্গনে খেলা করিত, আমাদের ক্ষণকাল আদর স্নেহমাখা লালন না পাইলে খেদ করিত। নিজগৃহে সেই পুত্রকে না দেখিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব? আমাদিগকে শত শত ধিক্! যেহেতু তাদৃশ পুত্র হইতেও বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।" ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর মনের নিষ্ঠা এই জাতীয়।

দেবকী-বসুদেব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য অনুভব করিলে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্র নহে, আরাধ্য-বস্তু। এই জাতীয় ঈশ্বরভাবে তাহাদের পুত্রভাব সঙ্কো-চিত হওয়ায় তাহাকে আলিঙ্গন ও লালনাদি করিতে আশঙ্কা করেন। কেবল এই ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীরই শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ গাঢ় মমতাবন্ধন, তাহা নহে কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও ইঁহাদের প্রতি মমতাগ্রন্থি অতি সুদৃঢ়। কারণ আমি আসিবার সময় তিনি ইঁহাদের প্রতি গাঢ় মমতায় এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, নিজহস্তে আমার হাতখানি ধরিয়া "আমাদের পিতামাতার আমার বিরহজনিত বেদনা দূর করিয়া সুখসম্পাদন কর।" এইরূপে আদেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নেত্রে অশ্রু এবং শ্রীঅঙ্গে কম্পনাদি প্রেমবিকারও

প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহাত আমি নিজের চক্ষেই দেখিয়াছি ও স্বকর্ণে শুনিয়াছি। সপ্তাহকাল গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপগণ ব্রজরাজসভায় বলিয়াছিলেন,—

"দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং।
নন্দ! তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥"

হে নন্দ! তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসীর দুস্ত্যজ অনুরাগ। অর্থাৎ আমরা স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু তোমার পুত্রের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারি না। কেবল আমাদেরই তোমার পুত্রের প্রতি এতাদৃশ গাঢ় অনুরাগ তাহাই নহে, তোমার পুত্রেরও আমাদের সকল ব্রজজনের প্রতি এতাদৃশ দুস্ত্যজ গাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়"। তাঁহাদিগের এইরূপ উক্তির কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি এবং এখন সেকথা আমার মনেও পড়িতেছে। এখন যদি আমি পুনর্ব্বার মথুরায় যাইয়া কল্য বা পরশ্ব দিবস শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসি তাহা হইলে কংসভার্য্যা "অস্তি" প্রাপ্তির কথায় কুপিত জরাসন্ধ যদি মথুরায় আগমন করে, তবে বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণকে কে রক্ষা করিবে? যদি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণই পুনর্ব্বার মথুরায় চলিয়া যান তাহা হইলে এই সকল ব্রজবাসী প্রাণে মরিবে। আবার যদি 'চারি পাঁচ বৎসর পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন" এইকথা ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীকে বলি, তাহা হইলে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ ইঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িবে। অথচ চারি পাঁচ দিন পর আসিবেন এই প্রকার মিথ্যা বচনের দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেও সেই কয়েক দিন পর 'আমার কথা মিথ্যা হইল" এইটী বুঝিয়া ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিবেন। কারণ আমি জানি সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ত্যাগ করিয়া ব্রজে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এ সঙ্কটে আমি কি উপায় অবলম্বন করি? এত ভাবিয়া অবশেষে অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া লৌকিক-শোক উপশমের রীতি অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে গোপরাজ! দাম বন্ধন, মৃদ্‌ভক্ষণ, প্রভৃতি লীলাতে মাতা শ্রীযশোদাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকত্ব অনুভব করিয়াছেন। যদ্যপি তিনি সর্ব্বত্রও সর্ব্বদা কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নির মত অন্যের অলক্ষিতরূপে বিদ্যমান্ আছেন, তথাপি যাহাদের তাঁহাকে প্রেমভক্তি নাই, তাহারা তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। আপনাদের দুইজনার কিন্তু সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আছে বলিয়া হৃদয়ের মধ্যেও সৎ রূপেই বিদ্যমান্ আছেন। নয়ন মুদিলেই তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পাইবেন। অতএব বাহিরে দেখিবার জন্য অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন দেখি না তথাপি যদি আপনাদের তাঁহাকে বাহিরে দেখিবার অপেক্ষা থাকে। তাহা হইলে শীঘ্রই বাহিরেও দেখিতে পাইলেন। অথবা প্রাণিমাত্রের হৃদয়াভ্যন্তরে কাষ্ঠে অগ্নির মত যেমন পরমাত্মা অবস্থান করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের দুইজনার নিকটে ব্রহ্মহ্রদে আপনাদিগকে যে গোলক নামে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই গোলকে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদাই আপনাদিগকে দেখিতেছেনই। আপনারাও মনে মনে তাঁহাকে দর্শন করুন। চক্ষুদ্বারাও সত্বরই দেখিতে পাইবেন ব্রজের অপ্রকট প্রকাশ শ্রীগোলকে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপীগণ সঙ্গে নিত্যবিহার করিতেছেন, সেই বিষয়ই এইরূপ উপদেশে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা॥
নমাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি নদেহো জন্ম এবচ॥
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥

"চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করুন" শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এইরূপ উপদেশ শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী অসম্ভব মনে করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের প্রেম বিশুদ্ধ মধুর্য্যাবগাহী। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন "হৃদয়ের মধ্যে অতবড় কৃষ্ণ কিরূপে থাকিতে পারে? ইহা যে অত্যন্ত অসম্ভব। হৃদয়কোষে পরমাত্মার সত্তা আছে, ইহা অতি সত্য। কিন্তু কৃষ্ণহৃদয়ে আছে, ইহা সর্ব্বথাই অসম্ভব। তবে নয়ন মুদিলে কৃষ্ণের কথামাত্র স্মরণ হয়।" এইরূপে নিজদেহে

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০ | দশম সংখ্যা

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

(১৬)

[শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী]

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা বশতঃ ("অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ") আনুকূল্যে নামীর অনুশীলনের ন্যায়, আনুকূল্যে তন্নামের অনুশীলনও সেই একই ভগবদনুশীলন—কৃষ্ণানুশীলন-রূপা ভক্তি হইলেও, একই শ্রীভগবৎ স্বরূপের "নামী" রূপে প্রকাশ হইতে "নাম" রূপে প্রকাশে কৃপাধিক্যের কথা শাস্ত্রে স্পষ্টই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ বা পাপাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আবার যে নরাধম এমন শ্রীহরির নিকট (অর্থাৎ নামীর নিকট) অপরাধী হয়, যদি সেই ব্যক্তি কখন নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নামপ্রভাবে ভগবদপরাধ হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। নাম সর্ব্বমঙ্গলময়—সর্ব্বোপকারক; অতএব এতাদৃশ নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে নিশ্চয়ই যে অধঃপতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও কৃপার আধিক্যে নামী হইতেও যে নামের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে তদ্বিষয়ক শাস্ত্রমর্ম্ম আমাদিগকে সুবিদিত করাইবার জন্য জীবহিতৈকব্রত শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে লিখিয়াছেন,—

বাচ্যং বাচকমিত্যুনেতি ভবতোনাম স্বরূপদ্বয়ং।
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে॥
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাত্তবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোপিহি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥

অর্থাৎ হে নামন্! বাচ্য অর্থাৎ বিভূচৈতন্যাত্মক শ্রীবিগ্রহ (অর্থাৎ নামী) এবং বাচক অর্থাৎ "কৃষ্ণ" "গোবিন্দ" "রাম" ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাম,—আপনার এই দুইটি স্বরূপ জগন্মণ্ডলে শোভা পাইতেছে; কিন্তু আমি তদীয় বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচক স্বরূপকেই অধিক করুণাময় বলিয়া বিবেচনা করি; যেহেতু জীব বাচ্য বা নামীর নিকট কৃতাপরাধ হইয়া বাচক বা নাম-স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ মাত্রেই নিরপরাধ হইয়া নিত্যানন্দসাগরে নিমগ্ন হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—নামীর নিকট কৃতাপরাধ ব্যক্তি নামীর আশ্রয়ে সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু তদবস্থায় নামের আশ্রয় লইলে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে; অতএব নামী অপেক্ষা নাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার এতাদৃশ পরমকরুণাময় নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে যদিও সে ব্যক্তির পক্ষে অধঃপতিত হওয়া ভিন্ন অপর কেহই রক্ষক বা নিবারক নাই, শাস্ত্র উক্ত শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি সেই জীবকে অনন্যোপায় দেখিয়া অনন্ত কৃপালু "নামই" তাহার গতি বিধান করিয়া থাকেন; যথা—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

অর্থাৎ যাহারা নামাপরাধে অপরাধী, নাম সকলই তাহাদের সেই অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে অবিশ্রান্ত নাম-কীর্ত্তনে সকল প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নাম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অনুসারে যখন স্পষ্টই শ্রীনামী হইতে শ্রীনামে কৃপাশক্তির অধিক প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তখন আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন রূপ নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামীর অনুশীলন অপেক্ষা তন্নামের অনুশীলনে যে অধিকতর কৃপাবিস্তারের সুসংবাদ নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মায়াহত জীবের পক্ষে নির্গুণা ভক্তির কোন অঙ্গই গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না,—যে পর্য্যন্ত মহৎ-কৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর সংস্পর্শ লাভ না ঘটে। অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহৎ-কৃপা প্রভাবে প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা আত্মবল জাগিয়া উঠে বলিয়াই, কেবল সেই জীবের পক্ষে প্রথমে সাধনভক্তির অন্তর্গত নবধা ভক্ত্যঙ্গের কোনও এক বা একাধিক অঙ্গ সামান্যাকারে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, এবং তাহা হইতে যথাকালে সাধনাঙ্গের উদ্গমের সহিত যথাক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

যষ্টিবিহীন পঙ্গুর পক্ষে স্বশক্তিপ্রয়োগে অসহায়তানিবন্ধন পথাতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও, যষ্টিপ্রাপ্ত পঙ্গুর পক্ষে যেমন তৎসহায়তায় স্বশক্তি প্রয়োগে পথাতিক্রম করা সম্ভব হয়, সেইরূপ মহৎ-কৃপাবিরহিত জীবের পক্ষে সাধনভক্তিপথের কোনও সন্ধান-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেও, মহৎ-কৃপারূপ যষ্টিপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে তৎ সাহায্যে ভক্ত্যঙ্গসেবনে উন্মুখতা বা প্রকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগের সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে; সেই জাগ্রত আত্মশক্তি দ্বারা তখন সাধনপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। আবার প্রাপ্তযষ্টি পঙ্গুর পক্ষে পথাতিবাহন সম্ভবপর হইলেও, যেমন অবিরত নিজ চেষ্টাশীলতা দ্বারাই উহা অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু যানারোহনে সেই পথ অতিক্রম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, উহা যেরূপ তদপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ মহৎ-কৃপা সংযোগের পর জীবের পক্ষে প্রথমে নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয় লইয়া সাধনপথে যেভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, অপর ভক্ত্যঙ্গের সহিত নামাশ্রয়ে বা প্রথমে কেবল নামাশ্রয়ে, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া তদপেক্ষা সহজ ও সুখকর হইয়া থাকে। পথ চলিয়া যাইতে হইলে যথাক্রমে যে যে স্থান দিয়া ও যে সকল দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়, যানারোহনে গমন করিলেও যেমন ঠিক সেই সেই স্থান ও সেই সকল দৃশ্যাবলীই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ নামাশ্রয় ভিন্ন অন্য ভক্ত্যঙ্গ, বা নামাশ্রয়ের সহিত অপর ভক্ত্যঙ্গ অথবা কেবল নামাশ্রয় হইতে প্রেমোদয়ের ক্রম বা প্রণালী একই প্রকার হইলেও, পথ চলিয়া যাওয়ায় যেমন "যাইতে হয়" এবং যানারোহনে যাওয়ায় যেমন "লইয়া যায়" অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে নামাশ্রয় রূপ ভক্ত্যঙ্গের ইহাই সুমহান্ বৈশিষ্ট্য। শ্রীনামী স্বরূপ হইতে শ্রীনাম-স্বরূপের কৃপাধিক্য হইতে এই বৈশিষ্ট্য সংঘটিত হইয়া থাকে। নামাশ্রয়ীকে নাম "শ্রদ্ধাদি" ক্রম ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া "লইয়া যান"; আর নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গাশ্রয়ীর পক্ষে যথাকাল সমুদিত হইলেই "শ্রদ্ধাদি" ক্রম ও শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের ভিতর দিয়া "যাইতে হয়"। সাধন পথে এই যাইতে পারিবার শক্তি বা প্রকৃষ্ট পুরুষকারের

প্রয়োগ যদিও মহৎকৃপাপ্রভাবেই জীবের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তথাপি সন্তরণপটু কোনও ব্যক্তির পক্ষে সন্তরণ দ্বারা বিস্তীর্ণ জলাশয় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব না হইলেও তরণীর সহায়তা লাভ করিতে পারিলে তাহা যেমন অত্যন্ত সহজ ও সুখকর হয়, সেই প্রকার প্রথমতঃ অপর ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয়রূপ সন্তরণপটুতা অপেক্ষা নামাশ্রয়-রূপ তরণীর সহায়তা লাভ করা যে বিস্তীর্ণ সাধন নদী উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ তাহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামাশ্রয়রূপ ভক্ত্যঙ্গের এই মহান্ বিশিষ্টতার জন্যই শ্রীচরিতামৃতকারের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ—

> "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
> কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
> তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
> নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

নামাশ্রয়ীর পক্ষে অপর "ভক্ত্যঙ্গ" বা গুরুপাদাশ্রয় ও দীক্ষাদি "সাধনাঙ্গ" আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই, এরূপ মনে করা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে; যেহেতু নাম হইতে প্রেমোদয় হইলেও অপর ভক্ত্যঙ্গ হইতে প্রেমোদয়ের ন্যায়, উহা যথাক্রমেই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গাদি ও গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সকলকেই উক্ত ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে। "ভক্ত্যঙ্গ" হইতে "সাধনাঙ্গের" উদ্গম হয় বলিয়া, কারণস্বরূপ ভক্ত্যঙ্গের কার্য্যই সাধনাঙ্গ। কার্য্যকেই কারণের অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু কারণ কখন কার্য্যাপেক্ষী হয় না; সেই জন্যই কারণ-স্থানীয় শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সামান্যাকার অনুশীলনে কার্য্য-স্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা নাই;—"দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে;"—কিন্তু দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের পক্ষে তৎকারণস্থানীয় শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অপেক্ষা আছে। নামাশ্রয় দীক্ষা "মন্ত্র" প্রাপ্তিরও কারণ বলিয়া নাম—"মহামন্ত্র"। আবার ভক্ত্যঙ্গ যেমন গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনাঙ্গের কারণ, তেমনি সাধনাঙ্গও আবার অনর্থ-নিবৃত্তি-নিষ্ঠাদি ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ; —"প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।" সুতরাং প্রথমে সামান্যাকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনে দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের অপেক্ষা না থাকিলেও, সাধনাঙ্গ আবার যে ভাব ও প্রেমভক্তির কারণ,—সেই ভাব ও প্রেমভক্তিরূপ কার্য্যের পক্ষে তৎকারণস্থানীয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গের, অবশ্যই অপেক্ষা আছে।

অপর ভক্ত্যঙ্গের ন্যায় নামাশ্রয় হইতেও একই ক্রমে —একই প্রণালীতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ জীবের পক্ষে "ইচ্ছা" ব্যতীত "ক্রিয়া" বা চেষ্টাশীল হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির ও ইচ্ছা হইতেই ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গের আশ্রয় লাভ হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে যথাকালে যে "সাধনাঙ্গ" ও ক্রমশঃ ভাব ও প্রেমভক্তি রূপ কার্য্যের প্রকাশ হয়, তাহা জীবের প্রকৃষ্ট পুরুষকার বা চেষ্টাশীলতার ফল হইলেও, নামাশ্রয় ভিন্ন অপর ভক্ত্যঙ্গসেবী জীবে, শ্রদ্ধাদি ও সাধনাঙ্গাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাকালে যে বাসনা ও চেষ্টাশীলতা লক্ষিত হয়, তাহা মহৎ-কৃপা দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্বকৃত চেষ্টাশীলতা; কিন্তু নামাশ্রয়ীর পক্ষে সেই ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতা "স্বকৃত" না হইয়া "নামকৃত" হওয়ায়, অপর ভক্ত্যঙ্গ দ্বারা সাধনপথে জীবকে চলিতে হয়, আর নাম নিজ আশ্রিত জনকে সাধনপথে লইয়া চলেন; নববিধা ভক্তির মধ্যে নামাশ্রয়ের ইহাই সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। স্বকৃত ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, বৃক্ষে যেমন কোনও এক ইচ্ছা কর্ত্তৃক যথাকালে ও যথাক্রমে শাখা, পত্র, পুষ্পাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ নামাশ্রয় হইতে নামকৃত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে ক্রিয়াশীলতার বিকাশ হয়, তৎফলে জীবের পক্ষে যথাক্রমে ও যথাকালে শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ সকলও কালে ভাব ও প্রেমভক্তির উদ্গম হইয়া থাকে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুমুখাব্জবিনির্গত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন;—

> "সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
> চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥”

অর্থাৎ নাম-সংকীর্তন—নামাশ্রয় হইতে পাপক্ষয় ও অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া, চিত্তশুদ্ধি বা শ্রদ্ধাদি ক্রমের সহিত সর্ব্বভক্তি=নববিধ ভক্ত্যঙ্গ ও সাধন=সাধনাঙ্গ-সকলের উদ্গমের পর, উহা যথাক্রমে প্রেমোদ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির সহিত কৃষ্ণ-সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জমান ভক্তকে প্রেমামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকেন। নামাশ্রয় হইতে কেবল যে শ্রদ্ধাদিক্রমে—সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদ্গম হয় তাহাই নহে,—নববিধ ভক্ত্যঙ্গের পূর্ণ বিকাশ, নামাশ্রয় হইতেই সহজে সম্ভব হইয়া থাকে; তাই স্বয়ং নামী কর্তৃক নামের এই বিজয়বার্ত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে,—

“নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।”

যথাকালাবধি নামাশ্রয় করিয়াও যদি অপর ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গাদি গ্রহণ করিবার জন্য জীবহৃদয়ে নামকৃত ইচ্ছা ও চেষ্টাশীলতার কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে “নামাপরাধের” বিদ্যমানতা অবশ্যই বুঝিতে হইবে;—

“হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। (বহুদিন)
তবু যদি নহে প্রেম (শ্রদ্ধাদি-ক্রমে) নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥”

পরম করুণাময় শ্রীনাম-স্বরূপও যে অপরাধ সংঘটিত হইলে, সেই অপরাধী জীবের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ কৃপাবিস্তারে কুণ্ঠিত বা বিরত হয়েন, তাহাকেই নামাপরাধ কহে। শাস্ত্রে যে দশবিধ নামাপরাধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। (শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ, শক্তি ও নামাপরাধাদি সম্বন্ধে “শ্রীনামচিন্তামণি” গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।)

(১) সাধুনিন্দা; (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন; (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা; (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে “ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বা প্রশংসামাত্র” এইরূপ মনন; (৬) প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন বা কুব্যাখ্যা; (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি; (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন; (৯) শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ; (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অপ্রীতি।

[উক্ত সাধু, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অপরাধ ঘটিলে যেস্থলে অপরাধ ঘটিয়াছে প্রথমে তৎসমীপেই বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা কর্ত্তব্য; তাহাতে অকৃতকার্য্য বা অসম্ভাবনা ঘটিলে, সেই স্থলেই অনন্যোপায় জীব, নামের শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয়—নামকীর্ত্তন করিলে, নামের কৃপায় উক্ত নামাপরাধ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।]

উক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক, নামকে নিরন্তর সুপ্রসন্ন রাখা আবশ্যক। নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামের আরও একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নামাপরাধ ঘটিলে তৎপ্রশমনার্থ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইয়া, (অপর ভক্ত্যঙ্গ বা সাধনাঙ্গের নহে) একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে, সেই অপরাধ হইতেও উদ্ধার লাভ করা যায়;—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—যদি কোন প্রকার অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তন করিয়া একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

সাধনপথে অগ্রসর হইবার কালে অনবধানতাবশতও নামাপরাধ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় এবং নামাপরাধ ঘটিলে নামাশ্রয় ভিন্ন তৎপ্রতীকারের অপর কোনও উপায় না থাকায়, নববিধ ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকারেও পরম উপকারক বলিয়া, নাম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ শ্রীভগবন্নাম যে জীবের পক্ষে অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের পূর্ব্বে, অপর ভক্ত্যঙ্গ আশ্রয়ের সহিত এবং সাধনাঙ্গাদির মধ্যে,—এক কথায় প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধ, সকল অবস্থায়—সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করা যে একান্তই আবশ্যক তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীহরিনামাশ্রয় বর্জ্জিত যে অন্য কোনও স্বতন্ত্র ভজন-সাধন নাই,

একথা সর্ব্ব ভজন-সাধনের নির্ণায়ক শাস্ত্রই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয়ে)

শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের জনক ও মহোপদেশক শ্রীশ্রীগৌরহরি স্বয়ং উক্ত শ্লোকের যে প্রকৃত অর্থ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে— অন্ততঃ এই বর্ত্তমান যুগে, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলের— সর্ব্বজীবের পক্ষে নিরপরাধে নামাশ্রয় করা যে শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য,—তাহা বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

"দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপ আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাই নাই নাই তিন, তিনে এবকার॥"

কলিপাবনাবতার—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরহরি যে কেবল নামোপদেশ দ্বারাই জগতে তাঁহার শ্রেষ্ঠদানস্বরূপ নাম-প্রচার কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন তাহা নহে ; তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতকে নামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করাইয়া, সমহিমা নামোপদেশ প্রদান ও অবাধে সর্ব্ব জীবকে শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনামতত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান, কলিতমসাচ্ছন্ন জগতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যবিদ্ সুধিবৃন্দও সহর্ষে ও সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন ;—

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

অর্থাৎ—যাহা কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় না, যাহা তপস্যা, ধ্যান, ও অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা জানা যায় না,— যাহা বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ত্ব ও স্তুতি দ্বারাও লাভ করা যায় না, এবং যাহা শ্রীগোবিন্দপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও অলভ্য,—সেই নিগূঢ় প্রেম যাঁহার অবতার হইলে, স্বয়ং "নাম" মাত্র হইতেই প্রকাশ হইয়াছিল, সেই গৌরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যিনি বিদ্যুৎ- বরণা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা বিমণ্ডিত, সেই স্বয়ং কৃষ্ণ-স্বরূপ পরম-কারুণিক—কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও তৎপ্রচারিত শ্রীকৃষ্ণনামই বর্ত্তমান্ যুগে শ্রেষ্ঠতম উপাস্য ও শ্রেষ্ঠতম উপাসনা।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(শ্রীভাগবতে—১১।৫।২৯)

(ক্রমশঃ)

ছবি

[শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা]

কনক-দর্পণে আঁকা ঘনশ্যাম ছবি।
অমৃত-সরসী-নীরে বিম্বিত রবি।
গোপন প্রাণের রূপ যেন সে অমনি।
কিবা রাগ-রমণীয় দেখলো রমণী।
কামিনী কামনা, ভবে আর কোন নাই
জীবন-যৌবন দিব ওই শুধু চাই।
থাক্ স্বামী-সুত সুখ শত শুভযোগ।
ভেসে যাক স্বরগের সুধা-সম্ভোগ।
অই ছবিখানি বুকে চাহি এঁকে নিতে।
এই রাগ-রঞ্জন চাহি সদা চিতে।
শত ধন্য এ জীবন যদি কভু লভি
কনক দর্পণে আঁকা অই শ্যামছবি।

শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ)

বনপথে পদব্রজে এইরূপে পঞ্চদশ ক্রোশ একদিনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথ সন্ধ্যা বেলা কোন গোপের বাসস্থানে বিশ্রাম করিলেন। তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া গোপ দুগ্ধ আনয়ন করিল। শ্রীমৎ রঘুনাথ তাহাই পান করিয়া শয়ন করিলেন। এ দিকে তাঁহার রক্ষকগণ গৃহে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীযদুনন্দনের গৃহে অনুসন্ধান লইতে যাইয়া নিরাশ হইল। রঘুনাথ যে পলায়ন করিয়াছেন সে সংবাদ দাবানল সদৃশ লোকমুখে অতি দ্রুতবেগে প্রসারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার পিতা মনে করিলেন যে তদীয় পুত্র নিশ্চয়ই গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে গমন করিয়াছে। সেইজন্য তিনি লোক দ্বারা শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে নাই। ইহাতে তাঁহার পিতামাতা সবিশেষ চিন্তিত হইলেন।

এদিকে শ্রীমৎরঘুনাথ সেই পূর্ব্বোক্ত গোপগৃহ হইতে প্রভাতে উঠিয়া ছত্রভোগ নদী পার হইয়া কুগ্রাম দিয়া গমন করিলেন। সমস্ত দিবস উপবাস ও পথশ্রমজনিত কোন ক্লেশই তিনি অনুভব করিলেন না, কারণ তাঁহার অখণ্ড মন শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দে লগ্ন ছিল। সেই জন্য দেহ দৈহিক ধর্ম্মের দ্বারা তিনি অভিভূত হন নাই। কখনও পথে ফলমূলাদি গ্রহণ, কখনও দুগ্ধপান, কখনও বা রন্ধন দ্বারা, যখন যেরূপ সম্ভব হইত তদ্রূপেই তিনি কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া দ্বাদশ দিনে নীলাচলে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মাত্র তিন দিন পথে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্দর্শন নিমিত্ত শ্রীমৎ রঘুনাথের ঈদৃশ তীব্র উৎকণ্ঠা ও দেহ গেহ বিস্মৃতি সহকারে প্রণয়াবেগে গমন স্বতঃই ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত প্রেমবিহ্বল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীরাসে অভিসারস্মৃতি উদ্দীপিত করে; এইরূপই ন্যায়সঙ্গত। কারণ যিনি ব্রজলীলায় শ্রীরতি-মঞ্জরি, তিনিই গৌরলীলায় শ্রীমৎ রঘুনাথ। সেইজন্য নিত্যলীলাপরিকরের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাতে বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যের নাই।

যাহাহোক্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তদীয় স্বগণসহ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীমৎরঘুনাথ তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমুকুন্দদত্ত তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণকৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, যেহেতু উহা তাঁহাকে বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিল। তদুত্তরে শ্রীরঘুনাথ বলিলেন যে—তিনি শ্রীকৃষ্ণকৃপা জানেন না, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদীয় কৃপাই অনুভব করেন। বহুদিন অনাহার, অনিদ্রায় শ্রীরঘুনাথের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া পরম স্নেহভরে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুত্র ও সেবক স্বরূপে অঙ্গীকার করিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন।

শ্রীস্বরূপও তদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রস্নানে লইয়া যাইতে গোবিন্দকে আদেশ করিলেন ও যাহাতে কিছুদিন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ভালরূপে হয় সেজন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন। ভক্তগণ রঘুনাথের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-মধুর ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া গোবিন্দের নিকট আগমনপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিলেন। এইরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে ভক্তগণ তাঁহার সেবা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেও শ্রীরঘুনাথের মন ভোগীর মত অনায়াসলব্ধ প্রসাদ গ্রহণে সম্মত হইল না।

পাঁচ দিন এইরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তদনন্তর তিনি সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্ত সাধারণ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মত অবস্থান করিতেন। শ্রীজগন্নাথ সেবকগণ রাত্রে গৃহে গমনকালে মহাপ্রসাদবিক্রেতা সকলের নিকট কৃপা করিয়া বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রসাদ প্রদান করিতেন। তাহারা ঐ প্রসাদ অন্নার্থী বৈষ্ণবগণকে দান করিতেন। রঘুনাথ তদ্রূপ ভিক্ষাবৃত্তিই ভজনের অনুকূলজ্ঞানে অঙ্গীকার করিলেন। গোবিন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু এ সংবাদ জানিয়া অন্তরে পরমানন্দই লাভ করিলেন, কারণ সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই বৈরাগীর কর্ত্তব্য। কোনও রূপে ভিক্ষা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করা বিধেয়। যে বিরক্ত হইয়া অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, তাহার ভজন সিদ্ধ হয় না ও শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাই লাভ হয়।

একদিন শ্রীরঘুনাথ স্বরূপগোস্বামি মহোদয় দ্বারা স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। তিনি দৈন্যের খনি, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে "স্বরূপের রঘু" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, সেইজন্য স্বয়ং প্রভুর নিকট নিবেদন করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিলেন। ইহাতে শ্রীপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—'স্বরূপের মত সাধ্যসাধনতত্ত্ব আমিও জানি না। ইনিই তোমার উপদেষ্টা। তথাপি আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধাবিশেষ থাকে তবে সংক্ষেপে এ বিষয় তোমার নিকট বলি —

'গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে;
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে;
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে'।

ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদগার্ণ উপদেশামৃত— ইহার সবিশেষ তত্ত্ব শ্রীপাদ স্বরূপের দ্বারা বিবৃত হইয়াছিল। এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রণাম করিলে প্রভু তাঁহাকে কৃপালিঙ্গন দান করিয়া পুনর্ব্বার স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে প্রতিবৎসর গমন করিতেন। সেই উৎসবে আনন্দ-নর্ত্তন ও কীর্ত্তন দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।

সেই সময় শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথের নিকট তদীয় পিতৃদেব যে তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন সে বিষয় বলিলেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ যখন চারিমাস অন্তে নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রঘুনাথের পিতা পুনর্ব্বার শ্রীশিবানন্দের নিকট তদীয় পুত্রের অনুসন্ধান লইতে পাঠাইয়া তাঁহার পরিচয় এইরূপ পাইয়াছিলেন।

'শিবানন্দ কহে, তিঁহো হয় প্রভুস্থানে,
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে?
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ;
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম' ইত্যাদি।

শ্রীমৎ রঘুনাথ অহোরাত্র শ্রীনামকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসমীপে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্যাচরণে বিশ্ব বিস্মিত হয়। অঙ্গে পরিধেয় বসন বা দেহের আহার কিছুরই তাঁহার অপেক্ষা ছিল না। তিনি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্ত অবস্থান করেন। যদি কেহ স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করেন তাহাই গ্রহণ করেন; তাহা না হইলে উপবাসী থাকেন।

শ্রীশিবানন্দের মুখে এইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই লোক শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের নিকট যথাযথ বর্ণন করিলেন, ইহাতে শ্রীমৎ রঘুনাথের পিতামাতা বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের পরম আদরের ধন একমাত্র পুত্র অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াও এরূপ কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন, ও তাঁহারা সুখস্বাচ্ছন্দে আছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের। সেইজন্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পুত্রের নিকট চারিশত মুদ্রা, দুটী ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণ শ্রীশিবানন্দের স্থানে শ্রীরঘুনাথের পিতা প্রেরণ করিলেন। শিবানন্দ বর্ষান্তরে নীলাচলে গমন করিবার সময় তাহাদের সঙ্গে লইলেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ রঘুনাথের মহিমা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন:—

'আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুর শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো,
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

অর্থাৎ বাসুদেব দত্তের প্রিয়তম ও প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য। তাঁহার শিষ্য বিবিধগুণের আকর রঘুনাথ দাস আমাদের প্রাণাধিক প্রিয়। তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয় লাভ করিয়া সংসারের ত্রিতাপ হইতে মুক্ত, তিনি স্বরূপ দামোদরের প্রিয় ও বিশেষ বিরাগী। নীলাচলবাসীগণের মধ্যে কে তাঁহাকে না জানে? পুনর্ব্বার উক্ত নাটকেই লিখিত আছে—

'যঃ সর্ব্বলৌকিক মনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রাৎ সমারোপণতুল্যকালং
তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যং॥

অর্থাৎ যে রঘুনাথ সকল লোকের প্রীতিপাত্র হইয়া অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্য ভূমি অর্থাৎ যাহাতে কর্ষণ না করিয়া বীজ বপন করিলেই প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়—সর্ব্ববিধ সাধন বিনাও যে হৃদয় নিখিলজনের প্রেমের বিষয় হেতু প্রেমফল ধারণ করিয়াছে, যে রঘুনাথের হৃদয়রূপ ভূমিতে বীজ বপনের সমকালেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমতরু ফল ধারণ করিয়াছে।

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীমৎ রঘুনাথের অপূর্ব্ব প্রেম ও বৈরাগ্য-মহিমাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হোক্ শ্রীমৎ রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্য যে লোক ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। তবে সেই অর্থ দ্বারা শ্রীমৎ রঘুনাথ মাসে দুইবার শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই প্রকার দুই বৎসর করিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ পূর্ব্বকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীস্বরূপ বলিলেন যে রঘুনাথ মনে বিচার করিল যে বিষয়ীর অর্থে প্রভুর সেবা তাঁহার প্রীতির কারণ হয় না। তাহারও চিত্ত এরূপ কর্ম্মে প্রসন্ন হইতেছে না। ইহাতে তাহার খ্যাতি ঘোষিত হইবে, কিন্তু পরমার্থ সাধিত হইবে না। সে বুঝিয়াছে যে—পাছে সে দুঃখিত হয় সেইজন্যই প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া সে আর ভিক্ষা গ্রহণে অনুরোধ করে না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন হৈলে মন, নহে কৃষ্ণের স্মরণ'॥

কিছুদিন পরে শ্রীমৎ রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা ত্যাগ-পূর্ব্বক ছত্রে গমন করিয়া আহার করিতেন। গোবিন্দের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু স্বরূপকে বলিলেন, যে রঘুনাথ ভালই করিয়াছে। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার ব্যবসায়ের মত। কে কখন আগমন করিবে তাহার অপেক্ষায় থাকায় অনেক সময় ভজন বিনাই বৃথা অতিবাহিত হয়।

শ্রীশঙ্করানন্দ ভারতী যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি তথা হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা আনয়ন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে উপহার প্রদান করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তিন বৎসর পূর্ব্বোক্ত বস্তুদ্বয়ের সেবা করেন। কিছুদিন পর শ্রীমন্ মহাপ্রভু রঘুনাথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ঐ অপূর্ব্ব বস্তুদ্বয় অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিলেন ও এক কমণ্ডলু জল ও তুলসীমঞ্জরী দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক সেবার উপদেশ করিলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথও আনন্দ সহকারে প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীস্বরূপ রঘুনাথকে অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত দুইটী বস্ত্র, পীঠ ও জলাধার আনয়ন করিয়া দিলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ পূজার সময় সেই শিলাকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রূপেই দর্শন করিতেন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া প্রেমবিহ্বল হইতেন। তাঁহার ভজন নিয়ম অতীব কঠোর। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতে উক্ত আছে, 'রঘুনাথের নিয়ম যেমন পাষাণের রেখা' অর্থাৎ পাষাণের উপর রেখা অঙ্কিত হইলে যেরূপ উহা কখনও অপগত হয় না, সেইরূপ তাঁহারও ভজন-পরিপাটীর কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই। তিনি দেহানুসন্ধান

রহিত হইয়া সাড়ে বাইশ ঘণ্টা প্রতিদিন ভজনে মগ্ন থাকিতেন। আহার নিদ্রায় দেড়ঘণ্টা কাল ব্যয়িত হইত। তাহাও কোনদিন ভজনাবেশে ঘটিত না। নিদ্রাবেশেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতেন। অসীম গুণের খনি শ্রীরঘুনাথের তুলনা নাই। তাঁহার অসাধারণ বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রেমভক্তির আচরণ অধ্যাত্ম-জগতের ভজন-ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির মুখ্য উপায়

শ্রীযদুগোপাল গোস্বামী (কাব্যব্যাকরণতীর্থ)

দেহাভিমানী জীব অনাদিকাল হইতে নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া দেহে ও দৈহিক পদার্থে আমি ও আমার সম্বন্ধ পাতিয়া, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির দাসত্বে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমন করিতে করিতে যদি সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই জীবের হৃদয়ে "কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়," এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। পরম কারুণিক সাধু ও শাস্ত্র তাহার প্রাপ্তির উপদেশ করেন। সেই উপদেশের ভিতরে অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই উপদিষ্ট উপায়ের মধ্যে কোনটি সাক্ষাৎরূপে কোনটি বা পরম্পরারূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধ বিনা উপদিষ্ট সকল উপায়ই পণ্ডশ্রম মাত্র। যেমন তণ্ডুল বিনা অন্য সমুদয় খাদ্যের উপকরণ সংগ্রহ করা বিফল হইয়া থাকে, তেমনই শ্রীহরিভক্তি বিনা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এই তিনটী সাধনও প্রাণহীন দেহে ভূষণ পরিধানের মত উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন—

কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থ-স্নান, পুণ্যকর্ম্ম জপধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥

সেই ভক্তির মধ্যেও দুইটী বিভাগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটির নাম 'বৈধী' অপরটীর নাম 'রাগানুগা'। শাস্ত্রশাসনে যে ভজন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম বৈধী, আর আকুল পিপাসায় প্রেরিত হইয়া যে ভজন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম রাগ। সেই রাগ যে নিত্য-সিদ্ধ ব্রজবাসিজনে নিত্যই বিদ্যমান আছে, তাঁহারই আনুগত্যে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম 'রাগানুগা'। এই দুই প্রকার ভক্তিতেই মুখ্য সাধন— শ্রীনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং স্মরণ; এই তিনের মধ্যেও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গেরই অত্যন্ত প্রাশস্ত্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছেন। ভজন-সম্প্রদায়ে এই ভজনটিরই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; যেহেতু কাহারও নিকটে উপস্থিত হইতে হইলে যেমন তাহারই অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়জনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়তম শ্রীনাম অবলম্বনে তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়াই সর্ব্বথা সমীচীন এবং মুখ্য উপায়। শ্রীনামের ভিতর দিয়াই রসময় শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও নিজেও আস্বাদনে বিভোর হইয়া জগৎকেও 'হরেকৃষ্ণ' এই নামাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিবার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকুণ্ডোদয়

শ্রীগৌরহরি দাস

(শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিরচিত শ্লোকসমূহ অবলম্বনে)

"শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ী কিং তাবদন্যৎ স্থলম্।
যস্যাপ্যংশলবেন না ইতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে।"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত ব্রজবিলাস স্তব ৫৩ শ্লোক।

ভাবার্থ—অন্য স্থলের কথা দূরে থাকুক, সুরম্য শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন, রসময়ী রাসস্থলীও যাঁহার অংশ লবের সমতালাভে যোগ্য বিবেচিত হন না, মুকুন্দের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ন্যায় যাঁহা মুকুন্দের অতি প্রিয়, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডেরই আশ্রয় গ্রহণ করি।

অরিষ্টাসুরবধের পর রাত্রিকালে মিলিত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—হে বৃষভার্দ্দন, তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিও না।

শ্রীকৃষ্ণ—তোমাদিগকে নিতান্তই মুগ্ধা (বুদ্ধিহীনা) মনে হইতেছে। আমি যে অরিষ্টকে বধ করিয়াছি উহা ত বৃষ নয়, উহা যে একটা ভয়ঙ্কর অসুর ছিল

গোপীগণ—তা' হোক্, তথাপি উহা বৃষের আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। অসুর হইলেও (ব্রাহ্মণদেহধারী) বৃত্রের বধে কি দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন নাই? অবশ্যই হইয়াছিলেন অরিষ্টাসুরবধে তুমিও সেই প্রকার গোহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণ—আচ্ছা, এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত?

গোপীগণ—তুমি ত্রিভুবনস্থিত সমস্ত তীর্থে স্নান করিতে পারিলে এই পাপ হইতে মুক্ত এবং শুদ্ধ বিবেচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ—আমাকে কি তবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে হইবে? তোমরা দেখ, আমি এখনই সমস্ত তীর্থ এই-স্থানে আনয়ন করতঃ তন্মধ্যে স্নান করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ স্পর্দ্ধা সহকারে এই কথা বলিয়া তথায় ভূমিতলে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

"পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার জল এই স্থানে উত্থিত হইয়াছে। নিখিল তীর্থসমূহ এই স্থানে আগমন কর—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে সমস্ত তীর্থগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—তোমরা দর্শন কর, সমস্ত তীর্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছে।

গোপীগণ—কৃষ্ণ, শুধু তোমার বাক্যমাত্রেই আমরা ইহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নই।

তখন (শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়) তীর্থগণ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন—আমি লবণ সমুদ্র, আমি সুরদীর্ঘিকা, আমি শোন, আমি সিন্ধু, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কর, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি যমুনা, আমি সরয়ূ, আমি প্রয়াগ, আমি রেবা,—তোমরা আমাদের জল দর্শন কর এবং (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ও) আমাদের বাক্যে বিশ্বাস কর।

অনন্তর একত্রিত সমস্ত তীর্থের জলে স্নান করিয়া শ্রীহরি অতি প্রগলভবাক্যে বলিয়াছিলেন—দেখ, আমি শুদ্ধ হইয়াছি এবং এমন একটী সরোবরও নির্ম্মাণ করিয়াছি যাহাতে সমস্ত তীর্থ আছে।

তোমরা কিন্তু এই পৃথিবীতে জন্মের মধ্যে কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম কর নাই।

তখন শ্রীরাধা নিজ সখীগণকে বলিয়াছিলেন—আমিও একটা অতি মনোহর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিব। তোমরা সকলে সেই জন্য যত্নবতী হও।

শ্রীরাধারাণীর বাক্যশ্রবণান্তর সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড-তটের পশ্চিম দিকে অরিষ্টাসুরের খুর দ্বারা কৃত একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন।

সখীগণ প্রত্যেকে সেই গর্ত্তস্থিত আর্দ্র মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করত অনতিদূরে নিক্ষেপ করিয়া অবিলম্বেই একটী দিব্য সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে বিস্ময়, মৃদুমন্দ হাস্য এবং কৌতুক-সহকারে বলিয়াছিলেন—হে সুনয়নে রাধে! তুমি সখীগণ-সহ আমার কুণ্ড হইতে তীর্থসলিলদ্বারা তোমার কুণ্ড পরিপূর্ণ কর।

শ্রীরাধা বলিয়াছিলন—না, তাহা কেন হইবে? তোমার কুণ্ডের জল যে গোবধ রূপ পাতকের স্মৃতিতে কলঙ্কিত। আমি অর্ব্বুদসংখ্যক সখীগণ সহ শতকোটী কুণ্ডের দ্বারা মানস গঙ্গার পুণ্য সলিল আহরণপূর্ব্বক আমার এই সরোবর পূর্ণ করিব এবং তদ্দারাই লোকে অতুল্য কীর্ত্তি বিস্তার করিব। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তদীয় সরোবরের দিব্যমূর্ত্তিধারী তীর্থসমূহ দ্রুত আগমন-করতঃ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তির আতিশয্যে অশ্রুধারায় স্নান হইয়া গদগদবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন—হে দেবি, তোমার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্ম, রুদ্র, এবং লক্ষ্মীও জানেন না।

কিন্তু যিনি তোমার পাদপদ্ম নিত্য যাবকরসের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া (সেই পাদপদ্মে) নূপুর পরাইয়া দেন এবং তোমার নয়নকোণের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন এবং নিজকে পরম ধন্যতম মনে করেন, রাসনৃত্যে শ্রান্তা তোমার অঙ্গের স্বেদ-মার্জ্জনপরায়ণ সমস্ত পুরুষার্থশিরো-মণি একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং তাহা সম্যক্ অবগত আছেন।

আমরা তাঁহার আদেশেই এখানে আগমন করিয়াছি এবং তাঁহারই পদতলাঘাতে নির্ম্মিত কুণ্ডবরে বাস করি-তেছি। তুমি যদি প্রসন্না হও এবং আমাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর, তবেই আমাদের তৃষ্ণাতরু ফলবান্ হইতে পারে।

নিখিল তীর্থগণের স্তুতি শ্রবণে তুষ্ট শ্রীরাধারাণী বলিয়া-ছিলেন—ওহে তীর্থগণ! তোমাদের কি তৃষ্ণা তাহা আমার কাছে প্রকাশ কর। তখন তীর্থগণ স্পষ্টভাবে বলিয়া-ছিলেন—তোমার সরোবরে স্থান লাভ করিয়া আমাদের জীবন ধন্য এবং সফল হউক্—তোমার কাছে আমরা এই বর প্রার্থনা করি।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কান্তের বদনপদ্মে নয়নকোন অর্পণ করতঃ মৃদুহাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—"তথাস্ত" (অর্থাৎ তোমরা আমার কুণ্ডে আগমন কর এবং বাস কর)

সখীগণ শ্রীরাধারাণীর এই বাক্য অনুমোদন পূর্ব্বক সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং অখিল স্থাবর জঙ্গম এই ঘটনায় উল্লসিত হইয়াছিল।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তীর্থগণ কুণ্ড-দ্বয়ের মধ্যস্থিত ভিত্তি অতি বেগে ভেদ করিয়া স্বীয় সলিল-দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ডকে ক্ষণকালের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া-ছিলেন।

তখন শ্রীহরি বলিয়াছিলেন—প্রিয়তমে, তোমার এই কুণ্ডের মহিমা সর্ব্বত্র আমার কুণ্ড হইতে অধিক হউক্। তোমার কুণ্ডেই, আমার প্রত্যহ স্নান এবং জলকেলি হইবে। এই কুণ্ড আমার নিকট তোমার ন্যায় প্রিয়তম হইবে।

শ্রীরাধারাণীও বলিয়াছিলেন—আমিও সখীগণ সহ আসিয়া প্রত্যহ তোমার কুণ্ডে (শ্রীশ্যামকুণ্ডে) স্নান করিব। ইহার অন্য একটী নাম অরিষ্টমর্দ্দন কুণ্ড হইবে। যেজন ভক্তিভরে তোমার কুণ্ডে স্নান করিবে এবং তোমার কুণ্ড-তীরে বাস করিবে, তাহার শত শত অরিষ্ট বিদূরিত হইবে এবং সে আমার মহা প্রিয় হইবে।

শ্রীরাধিকারূপিণী সৌদামিনী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া নবীন শোভা ধারণ করতঃ ত্রৈলোক্যমধ্যে দিব্য কীর্ত্তি বিস্তার এবং মহা রস এবং আনন্দ বর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনবঘন সেই রাত্রে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে রাসোৎসব প্রকটন করিয়া-ছিলেন

জীবের মনুষ্যজন্ম—৯

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে—ভগবদ্ভজনবিমুখ বহির্ম্মুখ মনুষ্য মায়ার মোহে নিজের জড়দেহে অহন্তাবুদ্ধি ও পিতামাতা পতি পুত্রাদির জড়দেহেই মমতাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সুখে কালযাপন করিতে চাহে, এবং কেবল নিজের দেহেন্দ্রিয়াদির সুখভোগ-সম্পাদন নিমিত্তই সে পিতামাতা পতি পুত্রাদির দেহেরই সেবা করে বলিয়া মায়ার অধীনে তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিলক্ষণ অশেষ সংসারমহা-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যিনি পরমাত্মরূপে তাহার এবং পিতামাতা পতিপুত্রাদি সকলের নশ্বর দেহের অন্তরে থাকিয়া ঐ দেহসকলকে জীবিত রাখেন বলিয়াই তাহারা কমনীয় বলিয়া বোধ হয়, সেই শ্রীভগবানেরই সহিত যে তাহার নিত্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ সে তাহার সন্ধান পর্য্যন্তও করিতে পারে না। অধিকন্তু একমাত্র যাঁহার অযাচিত কৃপাহেতু মায়াকৃত অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়া জীবের ঐ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রকটিত হয় এবং জীব সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণসেবারূপ নিত্য পরমানন্দ-ভোগের অধিকারী হয়, সেই সাধুভক্তের প্রতিও তাহার কিছুমাত্র আদরবুদ্ধি হয় না। যেদিন কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে সে সাধুকৃপা লাভ করিয়া শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইবে, সেইদিন হইতেই সে পিতামাতা পতি-পুত্রাদির নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিতে পারিবে, এবং সেই-দিন হইতেই সে বুঝিতে পারিবে যে প্রাকৃত পিতামাতা পতিপুত্রাদির তত্তৎভাবে ভগবদ্‌বুদ্ধিপূর্ব্বক নিঃস্বার্থ সেবার ফলে স্বয়ং শ্রীভগবানেরই সহিত তাহার বিশুদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি নিত্যসিদ্ধ ভাবের সম্বন্ধ অধিকারানুসারে প্রকটিত হইবে। সাধুকৃপাবলেই সে বুঝিতে পারিবে যে—প্রাকৃত পিতামাতা-পতিপুত্রাদির দেহের স্বার্থপর সেবা হেতুই সে অনাদিকাল হইতে অতল সংসার-জলধিতলে নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণভজন ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়ে সে অনন্তকাল চেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তাহার নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই মায়াকর্ত্তৃক তাহার নশ্বর-দেহের এবং পিতামাতাপতিপুত্রাদির নশ্বর-দেহের সহিতই তাহার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থপর সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এইসকল দুঃখসঙ্কুল দৈহিক-সম্বন্ধের অভিনিবেশ হেতুই সে অনাদিকাল হইতে অনবরতঃ শোক মোহ ও ভয়াদি-দ্বারা অভিভূত হইয়াই কালযাপন করিতেছে। সাধুকৃপা-বলেই সে বুঝিতে পারে যে, অনাদিকাল হইতে এই শোক মোহ ও ভয়াদি লইয়াই সে চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া সৌভাগ্যবলে এইবার পুণ্য ভারতভূমিতে এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াছে, এবং এই মনুষ্যদেহই তাহার অনাদি-জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত শোক মোহ ও ভয়াদি হইতে চিরনিষ্কৃতি-লাভ করিবার একমাত্র সাধকদেহ। এই ক্ষণভঙ্গুর মায়িক-দেহদ্বারা সাধুগুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করিয়া শ্রীভগবচ্চরণপ্রাপ্তিই মনুষ্যোচিত বুদ্ধি ও মনীষার একমাত্র পরিচয়। শ্রীভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবকে তাহাই বলিয়াছেন—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

ভাগ ১১।২৯।২২

অর্থাৎ সংসারে অসত্য ও মরণধর্ম্মশীল দেহদ্বারা ভজন-সাধন করিয়া এই জন্মেই সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হওয়াই মনুষ্যের বিবেক ও চাতুর্য্যের একমাত্র ফল। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—এ জগতে যদি কেহ একটি মুদ্রার বিনিময়ে সহস্রমুদ্রা লাভ করিতে পারে, লোকে তাহাকে পরম-বুদ্ধিমান ও অতিচতুর বলিয়া থাকে। যে একটি মুদ্রার বিনিময়ে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করে সে তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও চতুর; যে হীরকাদি রত্ন উপার্জ্জন করে সে আরও অধিক বুদ্ধিমান ও চতুর; এবং যদি অভ্রান্ত অতি-চতুর ব্যক্তির নিকট হইতে উপার্জ্জন করে তাহা হইলে সে

আরও অধিক বুদ্ধিমান্ ও চতুর বলিয়া পরিচিত হয়। যে চিন্তামণি কামধেনু প্রভৃতি লাভ করিতে পারে, তাহার চাতুর্য্য বর্ণনাতীত। কিন্তু ভারতবাসী কোন কোন মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্য দুর্জাতি হইয়াও তাহার কৌরূপ্যজরা-রোগাদিপূর্ণ স্বশরীর—যাহার মূল্য একটি কাণাকড়িও নহে, তাহা শ্রীভগবান্‌কে দান করিয়া তাহার বিনিময়ে অপ্রাকৃত-মাধুর্য্যসিন্ধু তাঁহাকেই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ চতুর-শিরোমণি হইলেও তদ্দত্ত ঐ তুচ্ছ দেহ পাইয়া তাহার বিনিময়ে কৌস্তুভকিরীট-কটকাদি অমূল্যরত্নালঙ্কারভূষিত সচ্চিদানন্দঘন স্ব-বিগ্রহ তাহাকে সহর্ষে দিয়া থাকেন। ইহাই বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য্যবত্তার চরম অবধি! শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণপরিচর্য্যাদি নিমিত্ত শ্রোত্রাদির বিনিয়োগই শ্রীভগবান্‌কে দেহ দান করা। তাহাও আবার কেবল রসনা তাঁহার নামরূপগুণাদিকীর্ত্তন-নিরতা হইলে, কিম্বা কেবল কর্ণদ্বয় শ্রবণ-নিরত হইলে, অথবা হস্তদ্বয় পরিচর্য্যা-নিরত হইলেও শ্রীভগবান্ আত্ম-দান করিয়া থাকেন। অতএব এই তুচ্ছ মনুষ্যদেহের একদেশদানেও যখন তাঁহাকে লাভ করা যায়, তখন কোন্ বুদ্ধিচাতুর্য্যবান্ মনুষ্য সাধু ও গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া তাহা না করিবেন ?

শ্রীভগবচ্চরণভজনের প্রারম্ভেই মনুষ্যের সকল শোক মোহ ও ভয় স্বয়ংই তিরোহিত হইয়া যায়, সে চরণ লাভ করিতে পারিলে আর মৃত্যুরূপ সংসারপথে ফিরিয়া আসিতে হয় না! সাধুগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবচ্চরণভজনই মনুষ্যদেহের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই দেবদুর্লভ দেহ লাভ করিয়া যে নরাধম সাধু-গুরুর চরণাশ্রয় না করিয়া ইহার অপব্যবহারহেতু শোক মোহ ও ভয়াদিতেই উত্তরোত্তর নিমজ্জিত হয়, তাহার মত দুর্ভাগ্যবান্ জীব আর নাই। এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মে পিতা-মাতাপতিপুত্রাদি স্বজনবর্গঃ জীবের অনাদি সংসারভয় হইতে মুক্ত হইবার কারণস্বরূপ, কারণ সাধু ও গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবচ্চরণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহারা ভজনের অনুকূল হইয়া থাকেন, এবং একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনেই মনুষ্যের সকল শোক মোহ ও ভয় চিরকালের জন্য অপনোদিত হইয়া যায়। শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনানুকূল্য-ব্যতীত জগতে পিতামাতাপতিপুত্রাদি স্বজনবর্গ হইতে মনুষ্যের আর কোন্ স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজন থাকিতে পারে? দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যথাচরণপূর্ব্বক তাঁহারাই যদি শোকমোহ ও ভয়াদির কারণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা এবং স্বয়ং গুরুও তত্তৎপদবাচ্যই নহেন। ভগবান্ শ্রীঋষভদেব স্বপুত্রগণকে বলিয়াছেন—

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্-
> মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥
>
> ভাগ ৫।৫।১৮

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন—শ্রীভগবচ্চরণভজনোপদেশদ্বারা যিনি মনুষ্যকে সংসারমহাভয় হইতে মুক্ত না করেন, তিনি লৌকিক-সম্পর্কে গুরু হইলেও মহারাজ বলি যেরূপ স্বগুরু শুক্রা-চার্য্যকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইরূপই ত্যাজ্য; তিনি লৌকিক স্বজন হইলে বিভীষণ যেরূপ রাবণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইরূপ ত্যাজ্য; তিনি লৌকিক সম্পর্কে পিতা হইলে প্রহ্লাদ যেরূপ হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়া-ছিলেন সেইরূপ ত্যাজ্য; তিনি মাতা হইলেও ভরত যেরূপ কৈকেয়ীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইরূপ ত্যাজ্য; তিনি দেবতা হইলেও খট্টাঙ্গ যেরূপ ইন্দ্রাদিকে ত্যাগ করিয়া-ছিলেন সেইরূপ ত্যাজ্য; তিনি পতি হইলেও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী যেরূপ যাজ্ঞিকবিপ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই-রূপই ত্যাজ্য। এই গুর্ব্বাদিত্যাগের তাৎপর্য্যার্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে—ভগবচ্চরণভজনানুপদেষ্টৃ গুর্ব্বাদির প্রতি প্রণতি-অনুবৃত্ত্যাদির অভাবে প্রত্যবায় নাই। চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যান্তরে বলিয়াছেন যে—শ্রীভগবচ্চরণ-ভজনোপদেশদ্বারা যিনি সংসারভয় হইতে মুক্ত হইবার পথ দেখাইতে না পারেন, তিনি গুরু হইলে যেন আর অন্য শিষ্য না করেন, স্বজন হইলে যেন আর বন্ধুতাপোষণ না করেন, পিতা হইলে যেন আর পুত্রোৎপত্তির যত্ন না করেন, মাতা হইলে যেন আর গর্ভধারণ না করেন, দেবতা হইলে

যেন আর পূজাগ্রহণ না করেন, এবং পতি হইলে যেন আর পাণিগ্রহণ না করেন।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে—জীবের চতুরশীতিলক্ষ জন্মের মধ্যে পুণ্য ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্মলাভই অতি দুর্লভতম, কারণ ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠসিদ্ধিপ্রদ সাধকজন্ম। কিন্তু মনুষ্যজন্ম ক্ষণবিধ্বংসী, কখন আছে কখন নাই তাহার কিছুই ঠিক নাই, এবং ইহার অপব্যবহার করিয়া বৃথা ব্যয় করিলে ইহার পুনঃপ্রাপ্তিও সুদূরপরাহত। সুতরাং এই দুর্লভ জন্ম পাইয়া ইহার ক্ষণকালও বৃথা অতিবাহিত করা উচিত নহে। মনুষ্যজন্মের যথাযথ ব্যবহার সাধু ও শাস্ত্রকৃপাসাপেক্ষ। সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত মনুষ্যের সাধন পথে একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। সাধু কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং নিজের আত্যন্তিক মঙ্গলকামনায় সাধুমুখে শাস্ত্রকথা শুনিবার প্রবৃত্তি ও শাস্ত্রোক্ত সাধনপথ আশ্রয়ের দৃঢ় সংকল্প হয়। শাস্ত্র মনুষ্যের জন্য যতপ্রকার সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অধিকারানুসারে তাহার যে কোন একটি আশ্রয় করিলেই মনুষ্য কৃতার্থ হইতে পারে। সাধুকৃপাবলেই মনুষ্যের শাস্ত্রাজ্ঞাপালনে সামর্থ্য লাভ হয়। শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই তিনটি সাধনেই মনুষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্পাদিত হইলেও ভক্তসাধুর কৃপায় ভক্তিসাধনেই তাহার আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি যুগপৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকালে জ্ঞান ও যোগ সাধনে অধিকার নাই বলিয়া ভক্তিপথই মনুষ্যের একমাত্র প্রশস্ত পথ। ভক্তিসাধনে শ্রীভগবচ্চরণে রতিলাভই মনুষ্যের সর্ব্বপুরুষার্থ শিরোমণি, কারণ জ্ঞান ও যোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া আত্মারাম জীবন্মুক্তেরও কিছু না কিছু অভাব থাকিয়া যায়। শ্রীসনকাদি ঋষিগণ ও শ্রীশুকদেবের চরিত্রে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। শ্রীসনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মানন্দসেবী, ব্রহ্মানন্দেই মগ্ন থাকিতেন; কিন্তু একদা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের শ্রীপাদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসীদলের মধুর মকরন্দস্পর্শীবায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে তাঁহাদের তনু রোমাঞ্চিত ও চিত্ত অতিহর্ষান্বিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব জন্মাবধিই ব্রহ্মসুখমগ্ন ছিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানের রুচিরলীলাকথা শ্রবণেই আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ প্রচার করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভগবদ্ভজনানন্দেরই উৎকর্ষ দেখা যাইতেছে। শ্রীভগবানে রতিলাভ হইলে ভগবদ্রূপমাধুর্য্যাদি আস্বাদন যে ব্রহ্মানন্দ হইতে পরমচমৎকারকারী হইবে তাহার ত কথাই নাই! শ্রীধ্রুব মহাশয় বলিয়াছেন যে—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধ্যানে কিম্বা ভক্তমুখে তাঁহার লীলাকথা-শ্রবণে মনুষ্যের যে পরমানন্দ অনুভূত হয় তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দও অতিতুচ্ছ, অনিত্য স্বর্গাদিসুখভোগের ত কথাই নাই। সেইজন্যই শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

ভাগ ১।৭।১০

অর্থাৎ শ্রীহরিরই এইরূপ অসাধারণ গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ নিরহঙ্কার ও বিধিনিষেধাতীত হইয়াও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষণহেতু ভগবদ্ভজনানন্দ ব্রহ্মানন্দকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকে, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য।

ভক্ত সাধুকৃপায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি রসময় ভক্তিসাধনে যাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যাদি-অনন্তশক্তিমান ও ভক্তবাৎসল্যাদি অশেষকল্যাণগুণাকর সর্ব্বাকর্ষক সচ্চিদানন্দঘন লীলাবিগ্রহের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিত্য সেবাসুখ ভোগ করেন, জ্ঞানী অতিকৃচ্ছ্র জ্ঞান-সাধনে তাঁহারই সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ চিৎসত্ত্বা ব্রহ্মমাত্র অনুভব করিয়া তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্রসত্ত্বা লয় করেন, এবং যোগী অতিকঠোর যোগসাধনে তাঁহারই সর্ব্বজীবহৃদয়স্থ কিঞ্চিদ্বিশেষ অন্তর্যামী অংশ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতএব মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধির বিকাশ হইবামাত্র বাল্যকালাবধিই মনুষ্যের সাধুকৃপাপেক্ষী হইয়া শ্রীভগবচ্চরণভজনই একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভজনে অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই, কিম্বা সাধুকৃপালাভেরও কালাকাল নাই। শ্রীধ্রুব মহাশয় পঞ্চমবর্ষ বয়সেই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের কৃপা তৎক্ষণাৎই পাইয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ

মাতৃগর্ভেই সাধুকৃপা লাভ করিয়া জন্মাবধিই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনগণও পুত্রের যথার্থ মঙ্গলপ্রার্থী হইলে শিশুকাল হইতেই তাহাকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিবেন। মনুষ্যজন্মের কোন সময়ই ভগবদ্ভজনের অনুপযোগী নহে এবং ভগবদ্ভজন ব্যতিরেকে বৃথা অতিবাহিত করিবার নহে। শিশু শ্রীমৎপ্রহ্লাদ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

ভাগ ৭।৬।১

অর্থাৎ পুণ্যভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তির কৌমারকাল হইতেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্ম আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ কৌমারাবস্থায় বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে অধিকার নাই। যৌবনের অপেক্ষায় থাকিলে যদি কৌমারেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজন্মই বৃথা যাইবে। জন্মান্তরের অপেক্ষায় থাকিলেও চলিবে না, কারণ মনুষ্যজন্ম অতিদুর্ল্লভ, কোন্ ভাগ্যে ইহা লাভ হয় তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু ইহা অধ্রুব, অর্থাৎ অদ্য আছে বলিয়া আগামী কল্য থাকিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। এতাদৃক্ ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহার ক্ষণকালও সিদ্ধিপ্রদ হইতে পারে, খট্টাঙ্গাদি ভক্তগণ মুহূর্ত্তমাত্র ভক্তিযাজনেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ভাগ্যবান্ মনুষ্য মহৎকৃপা লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে যথাসময়ে নামাপরাধাদি অন্তরায় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিজের যথার্থ স্বরূপানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার নিত্য কৃষ্ণদাস-স্বরূপের স্ফূর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভজনপ্রভাবে তাঁহার অনাদিসঞ্চিত বাসনারাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তিনি তাঁহার মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান দূরে পরিহার করিয়া কৃষ্ণদাসত্বই যে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ এবং মায়াবদ্ধ জীবের চরম পুরুষার্থ তাহা অনুভব করিতে পারেন। শ্রীসার্ব্বভৌম এই অনুভূতিই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্রও নই; ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপে প্রকটিত যে গোপীজনবল্লভের পদকমল, আমি তাহারই দাসানুদাস মাত্র।

এই অবস্থায় পূর্ব্বকৃত কামাদির সেবা হেতু তাঁহার হৃদয়ে অশেষ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত উত্তরোত্তর উৎকট লালসার উদয় হয়। তাঁহার হৃদয়ের আকূতি শ্রীরূপগোস্বামিচরণ তাঁহার অলৌকিকী ভাষায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

হে যদুপতে! অনাদিকাল হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় প্রভু আমার উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, আমি বিনা বেতনে তাহাদের কতই না দুষ্ট আদেশ কত প্রকারেই না পালন করিলাম! কিন্তু অদ্যাবধি আমার প্রতি তাহাদের কোনও করুণা হয় নাই, এবং বিনা বেতনে আমাকে খাটাইয়াছে বলিয়া তাহারা অণুমাত্রও লজ্জাবোধ করে নাই। অধিকন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার প্রতি আদেশ করিতে ক্ষণকালের জন্যও তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। সম্প্রতি এই ছয় নির্দ্দয় প্রভুকে আমার ছয়জন রিপু বলিয়াই জানিয়াছি, এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমি তোমারই অভয় চরণে শরণ লইয়াছি। হে কৃপাসিন্ধো! এখন তুমি কৃপা করিয়া এ দাসাধমকে তোমার চরণসেবাদানে কৃতার্থ কর।

এই কামক্রোধাদি ষড়রিপু পরাজয় করিতে জ্ঞানী ও যোগীর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভক্তের তাহার জন্য পৃথক প্রয়াসের আবশ্যকতাই হয় না। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তের কামক্রোধাদি পরিত্যাজ্যই নহে, সাধুকৃপাবলে

ভক্তিস্পর্শমণির সম্পর্কে কামক্রোধাদি রূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গমধ্যে স্থান পাইয়া ভক্তের ভগবদ্ভজনে আনুকূল্যই করিয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় সেই কথাই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কামক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে—ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধুভক্তের কৃপা লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধনভক্তির আশ্রয়গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সাধনভক্তি বহু অঙ্গবিশিষ্টা হইলেও ভজনপ্রবৃত্ত ভক্তের নিকট প্রথমতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গরূপেই আবির্ভূতা হয়েন। এই নয়টি অঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই দেখাইয়াছেন যে—কলিহত জীবের নামাশ্রয়ই একমাত্র গতি এবং শ্রীনামসংযোগেই অন্যান্য সাধনে ফললাভ হইয়া থাকে। নাম ও নামী অভিন্নস্বরূপ হইলেও নামই সাধককে কৃপা করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীনাম স্বয়ংই সাধককে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইলেও তাহার কল্যাণের জন্যই তাহাকে দিয়া অন্যান্য সাধন করাইয়া লয়েন। ভজনপ্রবৃত্ত ভক্ত সাধুভক্তের কৃপায় শ্রীনামাশ্রয়পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নববিধ ভক্ত্যঙ্গ সামান্যাকারে অনুষ্ঠানের ফলেই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় লাভ করেন এবং ঐ ভক্ত্যঙ্গসকল প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। এই অবস্থায় তিনি সাধকভক্ত নামে অভিহিত হইয়া যে সাধনভক্তি যাজন করেন, তাহাই সাধনাঙ্গ নামে অভিহিত হয়। তাঁহার সাধনাঙ্গ-যাজনের সিদ্ধিলাভেও পদে পদে সাধুকৃপা অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদ আবশ্যক। সাধনাঙ্গ অসংখ্যাত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া প্রধানতঃ তাহা চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সাধনাঙ্গের এক কিম্বা বহু অঙ্গ সাধনের ফলে শ্রীগুরুকৃপাবলে সাধকের অনর্থনিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ক্রমশঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং সাধনভক্তিই তখন সাধকভক্তের ভাবভক্তি রূপে প্রকটিত হয়েন। ভাবভক্তিই অচিরাৎ প্রেমভক্তিরূপে প্রকটিত হইলে, সাধক সিদ্ধ ভক্তরূপে শ্রীভগবচ্চরণসাক্ষাৎকাররূপ চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া মনুষ্যজন্মের সফলতা লাভ করেন। শ্রীভগবচ্চরণে ভাব বা রতি লাভই সকল সাধনাঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য ও ফল। আচার্য্যপাদগণ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"। কিন্তু তাঁহারাই আবার পদে পদে দেখাইয়াছেন যে সাধুভক্তের চরণরজঃ ও শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবচ্চরণে রতিলাভ সম্ভবপর নহে। পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী পদ্যাবলীতে কোন মহাজনের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

হে জীব, তুমি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এই ভারতভবের হাঠে আসিয়াছ কেবল কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ক্রয় করিবার জন্য। এই অমূল্য দিব্যরত্ন কিনিবার জন্যই তোমার এখানে আসা, এতদ্ভিন্ন এখানে তোমার আর কিছুই কিনিবার নাই। এ বাজারে কোথায় তাহা পাওয়া যায় তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই, তোমাকেই তাহার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। তোমাকে তাহার কেবল মূল্যটিমাত্র আমি বলিয়া দিতে পারি। সেই অমূল্য রত্নের মূল্য কেবল সাকাঙ্ক্ষতা—লালসা মাত্র। তদ্ভিন্ন কোটিজন্মের সুকৃতদ্বারাও তাহা লভ্য হয় না।

গোস্বামিপাদ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতির মূল্যটি কেবল নির্দ্দেশই করিয়াছেন, কিন্তু এই মূল্য ও মতি উভয়ের প্রাপ্তিস্থান অতি দুর্লভ ও অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে এই ভবের হাঠেই কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে যেখানে সেখানে

অকস্মাৎ তাহা লাভ হইতে পারে। আমাদের ক্ষুদ্র পুরুষকার বলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হইলেও তাঁহাদেরই চরণে প্রথমে মতি স্থাপন করিয়া তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আমরা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ও তাহার মূল্য উভয়ই একস্থান হইতেই পাইতে পারি— সাধুভক্তের চরণসেবাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকট লালসার উদ্রেক হয় এবং সাধুগুরুপ্রদত্ত শ্রীনামাদির অভ্যাসের ফলেই সে মতি লাভ হয়। শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতই এই অতিগূঢ় রহস্য ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিয়াছেন—

> নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
> স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
> মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
> নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ভাগ ৭।৫।২৫

অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন সাধুমহান্তের চরণরজে যতদিন আপনার অভিষেক বরণ না করা যায় ততদিন কাহারও মতি শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সাধু-কৃপার আনুষঙ্গিক ফলরূপে ভাগ্যবানের মতি প্রথমে অনাদি-সংসার-বাসনামল হইতে মুক্ত হইলে শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া থাকে, এবং সাধুমুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সেবা দ্বারাই ঐ লালসা উৎকট আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। এই আকাঙ্ক্ষানলেই ভাগ্যবানের মতি কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা হইয়া যায়, আর কিছুতেই তাহা হয় না।

শ্রীঅজামিলোদ্ধার প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছেন—

> সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
> নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥
> ভাগ ৬।২।১০

অর্থাৎ মহাপাতকীর যাবতীয় পাপের নিষ্কৃতির জন্য শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত কিছুই নাই, কারণ নামোচ্চারণ মাত্রই উচ্চারকের ভগবদ্বিষয়া মতির উদয় হয়, এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে পূর্ব্ব হইতেই তাহার মতি সর্ব্ববিধ পাপবাসনা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। শ্রীভগবন্নামোচ্চারণমাত্র শ্রীভগবানেরও এইরূপ মতির উদয় হয় যে আমার নামোচ্চারণকারী এই ব্যক্তি আমার নিজজন এবং আমার সর্ব্বথা রক্ষণীয়। নামোচ্চারণকারীর এই ভগবদ্বিষয়া মতিই যথাকালে, কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা হইয়া যায়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্ত ও ভগবান উভয়েই পরস্পরের আস্বাদনীয়, রস শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও আমরা সেই তত্ত্বই পাইয়াছি। শ্রীভগবান্ নিজে আরও কিছু বলিয়াছেন—

> সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
> ভাগ ৯।৪।৬৮

অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ের যে কেবল পরস্পর বিনিময়ই হয় তাহা নহে। হৃদয়দ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-হেতু ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, ভগবান্‌ও ভক্ত ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটি হইতে আমরা এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিলাম যে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি একমাত্র সাধুভক্ত ও শ্রীনামাদির সেবা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে।

আমরা এতাবৎকাল জীবের মনুষ্যজন্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাই সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম যে আমাদের এজন্মে এ আলোচনা সমাপ্ত হইবে না। আমাদের পক্ষে জীবের মনুষ্যজন্ম এক অনন্তপার দুর্বিগাহ্য রত্নাকর সদৃশ; ইহার অগাধ তলদেশস্থ মহারত্নরাজির অনুসন্ধানও আমাদের অধিকারের বহির্ভূত, কারণ আমরা ভজনবিহীন সাধুকৃপাকণাবঞ্চিত মনুষ্যাধম মাত্র। এই রত্নাকরের তীরে উপনীত হইয়া এতাবৎকাল আমরা কেবল তীরস্থ কতিপয় উপলখণ্ড মাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সুধী সজ্জনগণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবেন না। তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা আপাততঃ এ আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। যদি কেহ মনে করেন যে আমরা এতদ্বিষয়ে বহু সমালোচনা করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিন্তস্য গম্ভীরতাং।
আপাতালনিমগ্নপীবরতনু র্জানাতি মন্থাচলঃ॥

বানরসৈন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সমুদ্রের গম্ভীরতার কোনও খবর কি তাহারা পাইয়াছিল? কেবল মন্থাচল-সদৃশ ধীর সাধুসজ্জনবৃন্দ, যাঁহারা এই মহাসমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত অবগাহন পূর্ব্বক ইহার রত্নসমূহ সংগ্রহ করিয়া অলঙ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার গম্ভীরতার পরিচয় পাইয়াছেন। আমরা কেবল পূজ্যপাদ আচার্য্য গোস্বামিগণের চরণতলে বসিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে সে গম্ভীরতার যাহা কিছু বর্ণনা শুনিয়াছি তাহাই আবৃত্তি মাত্র করিয়াছি, তাঁহাদের কৃপালাভের সৌভাগ্য হইলে আমরাও তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইব, এইমাত্র আমাদের ভরসা। আমাদের এই আবৃত্তির দোষ ও গুণ উভয়ই থাকা সম্ভব, দোষাংশের জন্য নিন্দার পাত্র কেবল আমরা এবং গুণাংশের জন্য প্রশংসার পাত্র আমাদের আচার্য্যগণ।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি এই পুণ্য ভারতভূমিতে কলিকালে মনুষ্যজন্ম-লাভ বহু সৌভাগ্যের ফলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে; বর্ত্তমান বিশিষ্ট কলিযুগে শ্রীগৌড়ভূমিতে মনুষ্যজন্ম যে কি সৌভাগ্যের ফলে লাভ হইয়া থাকে তাহা অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ দ্বিসহস্র চতুর্যুগের মধ্যে কেবল বর্ত্তমান কলির প্রারম্ভেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বাপরলীলাবসানে আমাদিগেরই উপর অসীম কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশচীনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হইয়া আপামর সাধারণে দুর্ল্লভাতিদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম যুগধর্ম্ম-শ্রীনামের সহিত বিতরণ করিয়া থাকেন। কেবল সার্দ্ধ চারিশতবৎসর পূর্ব্বে সেই কেশশেষাদ্যগম্যা লীলা প্রকট হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন এখনও সমগ্র গৌড়দেশ এবং সুদূর শ্রীনীলাচল অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধপরিকরবর্গের স্বনামধন্য বংশধরগণ শিষ্য প্রশিষ্যাদিগণ সহ এখনও এই গৌড়দেশ সমুজ্জ্বল করিয়া আমাদিগেরই মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ভক্তিপথ আপামর সাধারণে প্রচার করিতেছেন। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদেরই চরণধূলির অভিষেক বরণ ভিন্ন জীবের মনুষ্যজন্মের আর অধিক সফলতা নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের স্বসম্পদ শ্রীগৌরাঙ্গপদ আমাদিগকে দিতে পারেন, তাঁহারা কৃপা করিলেই আমরা গৌরপ্রেমরসার্ণবে ডুবিয়া শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গমধ্যে স্থান পাইতে পারি। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজেদেরই দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। গঙ্গাজল বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কাদি মল-মিশ্রিত থাকিলেও পতিতপাবন ব্রহ্মদ্রবত্ব কখনও পরিহার করেন না। গোস্বামিপাদগণও কদাচিৎ স্বভাবজনিত দোষযুক্ত হইলেও আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্বথা সমর্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দোষদৃষ্টিই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। এই দোষদৃষ্টি হেতুই "শ্রীহরিনামই যখন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তখন গুরুপাদাশ্রয়ের কোন আবশ্যকতা নাই" এই অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায় অবলম্বনে কোন ভ্রান্ত মহাত্মা বৈষ্ণবজগতে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎপাতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অলমতি বিস্তারেণ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

---

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত "নাহং বিপ্র" ইত্যাদি শ্লোকের রচয়িতা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু, "কামাদীনাং কতি ন" ইত্যাদি পদ্যটি অপরাধভঞ্জনের, এবং "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ" ইত্যাদি পদ্যটি শ্রীল রামানন্দরায়কৃত, ইতি—প্রবন্ধলেখক।

পাগল প্রভু

গল্প

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত]

(বাল্যলীলা)

কাটোয়া হইতে আমোদপুর পর্য্যন্ত যে রেললাইন গিয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী মল্লারপুর ষ্টেসন হইতে চারিক্রোশ দক্ষিণে একখানি গ্রাম আজও বিদ্যমান। ইহার নাম একচাকা বা একচক্রা। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত। গ্রামখানি বেশ বৰ্দ্ধিষ্ট, দেখিলেই মনে হয় এখানে অনেক সমৃদ্ধিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও প্রাসাদাবলীতে গ্রামখানি বেশ সুশোভিত। এই গুলিকে বুকে ধরিয়া একচাকা পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলির প্রতি উপহাসের সহিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। গ্রামখানির পার্শ্বদেশ বিধৌত করিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। নদীটার নাম যমুনা। কিন্তু যমুনা নামের কোন বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। নদীর উভয় কূলে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদিসঙ্কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবনগুলি ফলেফুলে পরিব্যাপ্ত। ভ্রমরের সুমধুর গুঞ্জনে এবং বিচিত্রবর্ণ সুকণ্ঠ বিহঙ্গবৃন্দের সঙ্গীতে গ্রাম উপবন মুখরিত হইয়া অজানা সুরে কোন এক অজানা মহাপুরুষের জয়ঘোষণা করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীনা লতিকার নিবিড় আলিঙ্গন। পাতায় পাতায় মসৃণতা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। তরুলতায় মঞ্জরিত রক্তিমাভ নবপল্লবগুলি নবীনা বধূর অধরোষ্ঠকে তিরস্কার করিতেছে। শরৎ বা বসন্ত ঋতু যেন তার কোমল হস্তের কোমল স্পর্শ সর্ব্বত্রই অনুভব করাইতেছে। স্রোতস্বিনীর বিমল সলিলদর্পণে প্রতিবিম্বিত কাননচ্ছবি তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সুগন্ধ গন্ধবহ চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পপরাগ বিকীরণ করিয়া জলে ও স্থলে কোমল আসন পাতিয়া দিতেছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে গ্রামদেবতা একচক্রেশ্বর শিবের মন্দিরটী আকাশের কোলে মাথা তুলিয়া, নিজের সৌভাগ্যগর্ব্বে আপনহারার মত অচল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উপরিস্থিত রক্তবর্ণের পতাকাটী বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া বিজয়ানন্দে গগনগাত্রে লুটাইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনগণের মুখে শুনা যায়, অতি পুরাতনকালে এখানে অনেক রাক্ষসের বাস ছিল। পাণ্ডবগণ তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করতঃ অসুরের কবল হইতে গ্রামটীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

একচাকা গ্রামে বহুসংখ্যক লোকের বাস থাকিলেও বিভিন্ন জাতীয় জনগণের বাসস্থানগুলির সন্নিবেশ পৃথক্ পৃথক্ রূপে থাকায় গ্রামখানির শোভা আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপল্লীর অনতিদূরেই একটী বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ বকুল বৃক্ষ। মধুমাসের নির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রমালার ন্যায় এই বৃক্ষের চারিপার্শ্বে প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে একটী একটী বিভিন্নজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিরাজিত থাকায় স্থানটী বেশ রমণীয় এবং বৃক্ষাবলীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অতিশয় সুশীতল। দেখিলে মনে হয় যেন জগতের নিখিল সন্তাপের তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া রমণীয়তা এই বকুলবৃক্ষের স্নেহময় আশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করিতেছে।

সেই স্নিগ্ধশ্যামল ছায়াশীতল বকুল বৃক্ষের বিস্তৃত তলে কয়েকটী কিশোর বালক আনন্দে বিভোর হইয়া খেলা করিতেছে। বকুল বৃক্ষটী তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ অসংখ্য শাখা বাহু বিস্তার করিয়া বালকগুলিকে নিজের বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছে। সকলেই প্রায় সমবয়স্ক। যদিও তাহারা বিভিন্নজাতীয়, তথাপি সখ্যতাজন্য তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাব এতই অধিক যে, তাহাদের দেহ ও জাতি পৃথক হইলেও সকলেই এক আত্মা। জাতিবৈষম্যজন্য কাহারও প্রতি কাহারও পূজ্য বা ঘৃণ্যভাব নাই।

তাহারা যেন এ জগতের বালক নয়। অলৌকিক দেশের অলৌকিক সম্বন্ধের সূত্রে তাহাদের হৃদয়গুলি গাঁথা। তাহারা বয়সে কিশোর হইলেও বালকোচিত চাঞ্চল্য ভাব এখনও তাহাদের মধুর সেবাসুখ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই। ইঁহাদের মধ্যে যিনি দলপতি, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রশান্তমূর্ত্তি সুচিকন কৃষ্ণবর্ণ দীঘল দীঘল কুঞ্চিত কেশকলাপ শ্রীমুখখানিকে বেষ্টন করতঃ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অমৃতপানের লোভে সমাগত নন্দনকাননের ভ্রমরপঙ্‌ক্তির শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে। সুবর্ণনিন্দী শ্রীঅঙ্গের কান্তি। আয়ত আকর্ণ-বিশ্রান্ত কমলনয়নযুগল ঢুলু ঢুলু করিতেছে। কোন এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ সেই নেত্র হইতে বিকশিত হইতেছে। কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ। সুদীর্ঘ সুগোল বাহুযুগল আজানুলম্বিত। যজ্ঞোপবীতরূপে ত্রিধারা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বালকের বিশাল বক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। পরিধানে নীলপট্টাম্বর। শ্রীমুখে মৃদুমন্দহাস্য নিত্য বিরাজিত। গমন অতি ধীর। রক্তকোকনদ সদৃশ কোমল অরুণ চরণতলকে পৃথিবীদেবী অতি আদরের সহিত ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করিতেছে।

এই বালকের নাম নিত্যানন্দ। ইঁহার পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ুওঝা। ঐ অদূরে ব্রাহ্মণপল্লীর মধ্যে সুদীর্ঘ একটী পুষ্করিণীর তীরে ইঁহাদের বাড়ী। মা পদ্মাবতী ও পিতৃদেবের বুকভরা বাৎসল্যরসের উচ্ছাসময়ী উৎসধারার অমিয়াসিঞ্চনে আজ তাঁহাদের আদরের নিতাই দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত পুষ্ট হইয়া আসিতেছেন। সেই নিরাবিল অমৃত আস্বাদন করিয়া নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ-উদ্ভাসিত লাবণ্যচ্ছটায় গৃহপ্রাঙ্গন পথ প্রান্তর ও একচাকা আলোকময় হইয়া উঠিতেছে। সকল বালক ও পল্লিবাসিগণ তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রীতি করে। নিতাই তাহাদের চক্ষের মণি, প্রাণের নিশ্বাস।

বালকেরা প্রতিদিনই এই প্রান্তরে আসিয়া খেলা করে। কেবল আজকাল নয়, যখন হইতে তাহাদের মা তাহাদিগকে ঘরের বাহিরে খেলা করার অনুমতি দিয়াছেন, সেই সাত আট বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহারা এই বৃক্ষসকলের স্নেহজড়ান ছায়ায় আসিয়া খেলা করে। এক্ষণে যদিও তাহারা কিছু কিছু বিদ্যাশিক্ষার অভ্যাসে মন দিয়াছে, যদিও বাল্যকালের মত তাহারা দিবসের অধিকাংশ সময় আর এখানে থাকিতে পারে না, তথাপি প্রতিদিন একবার করিয়া এখানে আসিয়া সকলে মিলিত হওয়া চাই। বৃদ্ধ বকুল বৃক্ষটী তাহাদের নিত্য ক্রীড়ার নিত্য সাক্ষী। যদি কোন দিন কোন বালক কোনও অপরিহার্য্য কারণে সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিত, তবে সেদিন সেই সময়েই তাহার প্রত্যেকটী কার্য্যের বিশৃঙ্খলা তাহার অন্যমনা ভাবের পরিচয় দিত। বকুল বৃক্ষের সহিত তাহাদের মনের কি যেন একটা অব্যক্ত বাঁধনের গ্রন্থি লাগিয়া গিয়াছে।

নিত্যানন্দের সঙ্গে অপর বালকগুলিও নিত্যানন্দে বিভোর। প্রত্যেকের অঙ্গই আনন্দে টলমল করিতেছে। তাহারা যখন যে খেলা করে, তাহাও যেন কেমন অস্বাভাবিক। সে যেন এদেশের খেলা নয়। ঐ উপরের বহু উপরের স্বর্গেরও ওপার হইতে এ খেলা আসিয়াছে। এই বালকগণকে এ সব যে কে শিখাইয়াছে তাহা কেহ জানে না। এজন্য সাধারণ লোকে এ সব খেলা দেখিয়া মনে করিত, এসব ইহাদের পাগ্‌লামি। অতি পুরাতন কালে ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র নিজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত, এবং দ্বাপরের শেষে শ্রীবৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকায় অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেবচন্দ্রের সহিত প্রকটকালে পরিকরবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া যে সব লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকলই ইহাদের খেলার বিষয়। তদ্ব্যতীত শ্রীবামন প্রভৃতি অন্যান্য শ্রীভগবানের অবতার-সকলের লীলাও ইহারা অভিনয় করিয়া থাকে। ইহারা যখন যে লীলার অনুকরণ করে, তখন তাহা দেখিয়া মনে হয়, এই বালকগণও যেন সেই সেই লীলায় বর্ত্তমান ছিল। আজ তাহাই জাতিস্মর যোগীর মত ইহাদের মনে জাগরূক হইতেছে। নিত্যানন্দই তাহাদের এ সকল খেলার পরামর্শ দাতা। যেদিন তাহারা লক্ষ্মণের শক্তিশেল লীলার-অনুকরণ করিতেছিল, সেদিনের এক অদ্ভুত ঘটনায় দেশের লোক সেখানে একত্রিত হইয়া দেখে যে—লক্ষ্মণরূপী

নিত্যানন্দ শক্তিশেলরূপ পুষ্পের আঘাতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধুলাতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন। অন্যান্য বালকগণ এবং সমাগত জনবৃন্দ এমন কি পিতামাতা পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য নানা উপায় অবলম্বনেও বিফলমনোরথ হইয়া যুগপৎ নির্ব্বাক্ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ বালকগণের পরিচালক ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায়ই পূর্ব্বে বলিয়া রাখেন নাই। অবশেষে হনুমানরূপী বালকের মস্তকে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার বুদ্ধি প্রকাশ পাইল, এবং তাহাতেই নিত্যানন্দের দেহে চেতনার সঞ্চার হইল। সেই দিন সকলেই ভাবিয়াছিল, বালকেরা সবাই পাগল। আর এই নিত্যানন্দ পাগলদলের পাগল পরিচালক।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একটী একটী করিয়া অনন্তের কোলে লীন হইতে লাগিল, তথাপি তাহাদের খেলার অন্ত নাই। অফুরন্ত আনন্দেরও শেষ নাই। একদিন বালকগণ তাহাদের পরাণ-পুতলী পাগল-পরিচালককে মধ্যস্থলে রাখিয়া করতালি দিতে দিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিতেছিল। তাহাদের গানের সুরে ও প্রাণের ঝঙ্কারে আকাশপাতাল মাতাল হইয়া উঠিতেছিল,—

জয় জয় পদ্মা- বতীসুত সুন্দর
নিত্যানন্দ চন্দ্র গণ ভূপ।
ভবজন নয়ন তাপ ভবভঞ্জন
জিনি কনকারুণ অপরূপ রূপ॥
শশধর নিকর দরপহর আনন
ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদুহাস।
গাঢ় প্রেমভরে গর গর অন্তর
নিরুপম নব নব বচন বিলাস॥
টলমল অমল কমল লোচন জল
গিরত নিরত জনু সুরধুনী ধার।
পুলক কদম্ব বলিত সুললিত
অতি পরিসর বক্ষে তরল মণিহার॥
কুঞ্জর দমন গমন মনোরঞ্জন
বাহু পসারি অমিয় অবিরাম।
পতিত কোরে করি বিতরই সো ধন

এইরূপে ক্রীড়ারসে ডোবা আপনভোলা বালকগণের অজ্ঞাতসারে সূর্য্য যখন পশ্চিমদিগ্‌বধূর ঘোমটাখানি নিজহাতে খুলিয়া দিয়া তার মুখখানিকে লজ্জায় লাল করিয়া দিল, যখন গাছের মাথাগুলি আবিরগোলা-কিরণে আরক্তিম হইয়া উঠিল, তখন তাহারা দেখিল সেই বকুল বৃক্ষের তলদেশে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসনপরিহিত দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী তাহাদিগের প্রতি নিমেষহারা নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি যে কোন সময়ে তথায় আসিয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। তেজঃপুঞ্জশালী নবাগত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বালকগণ অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কেবল শ্রীনিতাইচাঁদের মুখে মৃদুহাস্য। যেন কতকালের পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা। বালকগণের সম্মুখে সঙ্কোচবশতঃ উভয়েরই বুকের উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা যেন নীরব হইয়া আসিতেছে। কেবল তাহাদের নয়নের ভাষা তাহাদের মরমে মরমে উপলব্ধি হইতে লাগিল।

সন্ধ্যাবধূ যখন তার কাল রংএর ওড়নাখানা গায়ে দিয়া একচাকায় আসিয়া প্রবেশ করিল, যখন ঈষৎ অন্ধকারে পথ ঘাট আবৃত হইল, তখন সেই সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। পণ্ডিত অতি যত্নের সহিত সন্ন্যাসীর আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের পরিচর্য্যায় সন্ন্যাসীর পথশ্রমজনিত ক্লান্তি ও ক্ষুৎপিপাসার উপশম হইয়া গেল। সমগ্র রজনী পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। ঊষারাণীর সমাগমে উভয়ে নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। অনন্তর সন্ন্যাসী যখন চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন পণ্ডিত তাঁহার নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "সন্ন্যাসী! আজ আপনার শুভাগমনে আমার গৃহ পরম পবিত্র। আমার পরম সৌভাগ্যের ফলেই আজ আপনার চরণধূলি লাভ করলাম। গৃহস্থের ধর্ম্ম অতিথিকে কিছু অভিলষিত বস্তু দান করা। অতএব আমি কি দিয়া আপনার সন্তোষ বিধান করতে পারি?"

তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "পণ্ডিত! আপনি কি আমার অভিলষিত বস্তু দিতে পারবেন ?"

পণ্ডিত,—"আজ্ঞে, আদেশ করুন। আপনার সন্তোষের জন্যে আমি সর্ব্বস্ব দান করতে পারি। এমন কি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! আপনি বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন। আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে চাই। আপনার পুত্র নিত্যানন্দকে আমায় দান করুন।"

সন্ন্যাসীর মুখ হইতে নির্গত বজ্রনির্ঘোষবৎ এই কথাকয়টী শুনিয়াই পণ্ডিত বজ্রাহতজনের মত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত নিষ্পন্দ হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু সময় পর্য্যন্ত তাহার মুখে একটী বর্ণও স্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁর পায়ের নীচে হইতে জগৎ সরিয়া যাইতে লাগিল, তাঁর নিকটে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পণ্ডিতের চিত্তে এ চিন্তা উঠে নাই যে, নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী বাস্তবিকই তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারেই প্রাণ ধরিয়া আকর্ষণ করিবেন। তখন পণ্ডিতের বক্ষে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষের অশ্রু শুখাইয়া গেল। বক্ষের তীব্র উষ্ণতা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত নির্গত হইতে লাগিল। কিছু সময় পরে চৈতন্য লাভ করিয়া পণ্ডিত শুষ্ককণ্ঠে সন্ন্যাসীকে বলিলেন "সন্ন্যাসী! আপনার মনে কি এই ছিল? কে জানিত যে কোমল পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে তীক্ষ্ণ তরবারি লুকায়িত ছিল? আপনার কি আর কিছুই চাহিবার ছিল না। ওঃ! বিধাতা কি আপনার দেহটীকে নবনীতকোমল লাবণ্যময় করেও হৃদয়টীকে বজ্র দিয়া নির্ম্মাণ ক'রেছেন। হায়! হায়! আমিও কি কঠোর, একথা শুনিয়াও আমি এখনও বাঁচিয়া আছি ?"

তখন সন্ন্যাসী পুনরায় ধীরস্বরে বলিলেন "যদি আপনি দুঃখিত হ'য়ে থাকেন দেবেন না. আমি চাহি না। আমার কোন দুঃখ নাই, চলিলাম।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে চরণে ধরিয়া পণ্ডিত কাতরতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "না না, সন্ন্যাসী? যাবেন না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন নিশ্চয়ই দিব। তবে নিতাই আমার একার নয়। তার উপর তার জননীরও দাবী আছে। একবার তার অনুমতি লয়ে আসি। একটু অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়াই হাড়াই পণ্ডিত পাগলের মত গৃহের অভ্যন্তরের দিকে ছুটীয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া পণ্ডিত দেখিলেন, পদ্মাবতী প্রাণকোটী নির্ম্মঞ্ছনীয় নিতাই চাঁদকে বক্ষে লইয়া সবে মাত্র শয্যাত্যাগ করতঃ আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিতকে ঐ অবস্থায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া পদ্মাবতী ও নিত্যানন্দ উভয়েই কোন এক অশুভ আশঙ্কা করিলেন। আঙ্গিনায় আসিয়া হাড়াই পণ্ডিত তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়াই নীরসস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পদ্মা! তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। পতির ধর্ম্মে পত্নীর অধিকার। কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী যে এক সন্ন্যাসী এসেছেন তিনি আজ এক অদ্ভুত ভিক্ষা চাইছেন। সে আর কিছু নয়, আমাদের প্রাণ। না, না, পদ্মা! প্রাণ নয়। ভুল বল্‌লাম। প্রাণ হতেও প্রিয়তম আমাদের নিতাই চাঁদ। ভিক্ষা দিব ব'লে আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। কিন্তু এ দান ত আমার একার নয়, এদানে তোমারও অধিকার আছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। চল, পদ্মা! শীঘ্র চল। সন্ন্যাসী আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা ক'রছেন।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্রই পদ্মাবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মার কোমল বক্ষে এ বাক্যবাণ সহ্য হইল না। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে বাণাহত কুরঙ্গিণীর মত ভূমিতলে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে সন্ন্যাসী সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতামাতার প্রাণ [illegible] ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন হাড়াই পণ্ডিত তাঁ[illegible]কে বলিতে লাগিলেন,—"সন্ন্যাসী! আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন আপনাকে বিফলমনোরথ করবো না। কিন্তু আপনি যদি কৃপা ক'রে অন্য কোন বস্তু ভিক্ষা চান,

তবে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়। নিতাই চাঁদকে ছেড়ে আমরা যে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। সে যে আমাদের প্রাণের সঙ্গী। তাকে তিলমাত্র না দেখ্‌লে, ক্ষণকালও আমাদের শতযুগ ব'লে মনে হয়। আমি যখন কৃষিকর্ম্মে, বা যজমানগৃহে, অথবা অন্য কাজে স্থানান্তরে যাই, তখনও যে আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারি না। সে যদি আমার পাছে থাকে, তবে যে আমি বারবার ফিরিয়া দেখি, নিতাই আমার সঙ্গে আছে কি না? আমার অন্য পুত্র থাক্‌লেও নিতাই যে আমার সবটা বুকের মধ্যে রাজত্ব ক'রছে। আমি তাকে ছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচবো সন্ন্যাসী?

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিলেন "যদি আপনাদের দুঃখ হয়, তবে আমি চাই না। কিন্তু আমার আর অন্য কিছু ভিক্ষা লইবার নাই।"

হাড়াই পণ্ডিত তখন নিত্যানন্দকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসী! আপনাকে বিমুখ কর্‌বো না। শাস্ত্রে শুনেছি, পূর্ব্বে মহাপুরুষগণ ভিক্ষার্থীকে প্রাণপর্য্যন্ত দান ক'রেছেন। রাজা দশরথ জীবনসদৃশ পুত্র রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ ক'রেছিলেন। দানবীর কর্ণ পত্নীর সহিত হাসিতে হাসিতে প্রিয়তম পুত্র বৃষকেতুর মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'রে ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ ক'রেছিলেন। আমি নিজে মরিলেও আপনার ভিক্ষা পূরণ কর্‌বো। আপনাকে নিরাশ কর্‌বো না।" এই বলিয়া নিত্যানন্দের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নিত্যানন্দের অবস্থা কিন্তু কাল সন্ধ্যা হইতেই কেমন একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সে চাঞ্চল্যময় উদ্দাম ভাব নাই। কেমন একটু স্থির ধীর। বাল্যের চাঞ্চল্য না থাকায় সমুদ্রের মত প্রশান্ত গম্ভীর। জগতের কাহারও সঙ্গে যেন তার কোন সম্বন্ধই নাই। নিত্যানন্দ যেন আজ ঔদাসীন্যের মূর্ত্তি। তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলে অপরেরও হৃদয় হইতে সংসারের সহিত স্নেহবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। নিত্যানন্দ আজ আর এসংসারের কেহ নহেন। তিনি যেন আজ অন্য জগতের কোন অব্যক্ত-আকর্ষণে সকলভোলা হইয়া চলিয়াছেন। পিতামাতার এই পাষাণ-বিদারী দুঃখেও তার কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ পাইতেছে না। তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া পিতার বক্ষের ব্যাকুলতাও কিছু শান্ত হইল। কি যেন একটা অজ্ঞাত শক্তি পিতার হৃদয়ে স্থান করিতে লাগিল।

মা পদ্মাবতীর কিন্তু নয়নধারার আর বিরাম নাই। কোন প্রতিবাদের ভাষাও মুখে আসিতেছে না। পাছে স্বামী দুঃখ পান, অথবা সন্ন্যাসী অভিসম্পাত দেন। স্বামীর সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া পতিপ্রাণা পদ্মাবতী পুত্রকে সন্ন্যাসীর নিকটে আনিয়া নয়ননীরে বক্ষ ভাসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর! আমার নিতাই চাঁদকে লইবার আগে, আপনি আমাকে হত্যা কর্‌লেন না কেন? আপনি কি আমার নিতাইকে নিয়া তার মুখ চাহিয়া খাওয়াইবেন? ও যে আমার পাগল ছেলে। খেলায় মত্ত থাক্‌লে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলে যায়। আমি যে সময় বুঝে ওকে পালন করি। ঠাকুর! বাবা! দেখ্‌বেন আমার নিতাইয়ের চাঁদমুখখানি যেন কখনও শুখিয়ে না যায়। ওর যেন কখনও কোন কষ্ট না হয়।" এই বলিতে বলিতে বাৎসল্য-ময়ী মার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরে নিত্যানন্দকে বুকে ধরিয়া পদ্মাবতী বলিলেন, "বাপ! নিতাই আমার!— তোর মনে কি এই ছিল? আমি পাষাণী, আমার কথা তোর মনে না হ'তে পারে, কিন্তু তোর জনকের কথা কি এক-বার ভেবেছিস্? উনি তোকে ছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচ্‌বেন বাবা? একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখ, কি অবস্থা হ'য়েছে। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। দেখ্‌ছিস্ না, চোখ দিয়ে সেই আগু-নের শিখা বেরুচ্ছে। তুই কেমন ক'রে আমাদিগকে ছেড়ে থাক্‌বি বাবা?

নিত্যানন্দ কিন্তু মার কোন কথার উত্তর দিলেন না। তাঁদের স্নেহের নিতাই আজ আর সে নিতাই নাই। নিত্যানন্দ আজ কোটী সমুদ্র হইতেও গম্ভীর, পর্ব্বত হইতেও অচল অটল। তাঁর প্রশান্ত মুখের প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মার হৃদয়ের উদ্বেলিত ব্যাকুলতাও কিছু স্তম্ভিত হইয়া গেল। সন্ন্যাসী আর বিলম্ব না করিয়া নিত্যানন্দকে

নয়নের ইঙ্গিত করতঃ চলিতে লাগিলেন। তিনিও যন্ত্র-চালিতের মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অল্পদূর যাওয়া-মাত্রই মার প্রাণ আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বৎসহারা গাভীর মত মা পদ্মাবতী ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হইলেন, এবং মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! ঠাকুর! বাবা! আমায় রক্ষা করুন। আমার নিতাইকে আমায় ভিক্ষা দিন!" এই বলিয়াই নিত্যানন্দকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কিন্তু পুত্রের ভাবের প্রেরণায় তাঁর সে শোকাবেগও শান্ত হইল।

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। নিতাই একটু দূরে যাইলেই মার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। তিনিও বার বার এই ভাবে সন্ন্যাসীর গতিতে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যখন একেবারে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পাঁজরভেদী স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্রুনীরে পৃথিবীর হৃদয়ও গলিয়া গেল। তাঁহাদের আর্ত্তনাদে বনের পশুপক্ষীও কাঁদিতে লাগিল। তাঁহাদের উষ্ণ নিশ্বাসে বৃক্ষলতার পর্ণগুলিও বিশীর্ণ হইয়া গেল। যখন একটু বেলা হইল, যখন খেলার সহচরগণ তাঁদের নিতাইকে খুঁজিতে আসিল, তখন দূর হইতেই পিতা-মাতার করুণ বিলাপ তাহাদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিল। যতই নিকটে আসিতেছিল, ততই পথ-প্রান্তর তরু-গুল্ম এবং পণ্ডিতের গৃহখানিও হাহাকার করিয়া পাগল নিতাইএর হারানো সংবাদ জানাইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া বাবা মার অবস্থা দেখিয়া তাহাদেরও হৃদয় গলিয়া নয়নধারে বহিতে লাগিল। সকল কথা শুনিয়া তাহারা পিতামাতাকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল,—"বাবা! মা! আপনারা অধীর হবেন না, আপনারা আর কাঁদবেন না। ওসব আমাদের পাগল নিতাইএর পাগল লীলা॥"

আনন্দ

[প্রোফেসর শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা]

প্রাণের আনন্দ আজি ফিরে এল প্রাণে।
আনন্দে পাগল প্রাণ আপনা না জানে॥
আকাশে অমিয়-ভরা আলোকের বান।
রূপের মেলায় সবি রসগন্ধ-গান॥
শত জনমের মোর কামনার ধন।
আইল লইয়া সঙ্গে সখা-সখীগণ।
ফুলে ফুলে রঙে রঙে সুরে সুরে সব।
পরিপূর্ণ করি এল প্রীতির উৎসব।
গান গাহি নাচি হাসি কাঁদি অনিবার।
করি কি যে কি উচ্ছ্বাসে দিশা নাহি তার।
উছলে আনন্দ শুধু রসে গন্ধে গানে।
প্রাণের বান্ধব ফিরে এল আজি প্রাণে।

শ্রীশ্রীধাম রামকেলী দর্শন

শ্রীধাম রামকেলী মালদহ সহর হইতে সাড়ে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ্য ও মূল আচার্য্য শ্রীপাদ রূপসনাতন বাস করিতেন। তাঁহারা যে গৌড়বাদসাহ হুসেনসার মন্ত্রীত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—সেই বাদসাহের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ স্তূপ, গড়খাই, বাইশগজিপ্রাচীরের কতক অংশ, সু-উচ্চ স্তম্ভ এই স্থানের অনতিদূরে অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া এইটীই যে একসময় গৌড়বাদসাহের রাজধানী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ দিতেছে না। শ্রীপাদ রূপসনাতনের স্মৃতি উদ্বোধন করিবার জন্য শ্রীরূপসায়র শ্রীসনাতন-সায়র শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ভক্তের প্রাণে আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। যে স্থানে শ্রীপাদ রূপসনাতন গভীর রজনীতে অতি দীনবেশে দীনআবেশে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া চিরদিনের তরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই লীলার সাক্ষী দিবার জন্য অদ্যাপি সেই কেলীকদম্ব-বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঐস্থানে আরও তিনটী কেলীকদম্ব ও তমাল তরু আছেন। প্রাচীন কেলীকদম্ব বৃক্ষটীর কাণ্ড এবং ত্বক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়—ইহা অতি প্রাচীনতম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক। বৃক্ষটী যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতনের মিলনলীলা-কালে যে প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়াছিল তাহারই হিল্লোলে নিজে বিগলিত হইয়া ঈষৎ হেলিয়াছেন। তা না হইবেই বা কেন? যে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীমুখ-উদ্গীর্ণ হরেকৃষ্ণ-নাম-ধ্বনিতে তরুলতা প্রভৃতিও অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়াছিল—শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইয়াছিল—বন্য ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু আকুল আবেশের আকাঙ্ক্ষায় নিজ অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীপাদ রূপসনাতনের সহিত যখন মিলিত হইয়াছিলেন, তখন যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়াছিল তাহা রসিক ভক্তগণমাত্রেরই হৃদয়-উন্মাদকারী। আহা! মরি মরি! সেই শুভ-সম্মিলন-লীলার কথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া কোন পাষাণ-হৃদয় না বিগলিত হয়? এই মিলনের কথা-প্রসঙ্গ পাঠ করিবামাত্রই শ্রীবৃন্দাবনের মহারাসরজনীতে গাঢ় অনুরাগ ও আবেশ ভরে অদম্য আকুল পিপাসায় রাসরসিক-নটবর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের প্রথমমিলনস্থান 'রাসোলী' নামে বিখ্যাত ব্রজের চত্বর-প্রদেশের কথা উদ্দীপন করায়। তাঁহারা যেমন অতিদীনা ও কাতরা হইয়া নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণের কথা জানাইয়া নিজ মরমের বেদনা নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ রূপসনাতনের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রথমমিলন-চত্বরপ্রদেশও সেই কথা স্মরণ করাইয়া দর্শক মাত্রের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনের অফুরন্ত উচ্ছাস তুলিয়া দেয়। তা নাই বা হইবে কেন? যেহেতু এই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের সেই শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী সেই শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে আবার মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী মিলিত হইয়াছেন; এহেন প্রভুর সহিত শ্রীরূপসনাতনের মিলন-প্রসঙ্গ যে কত মধুর, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

বেগবতী গঙ্গা যখন নিখিল বাধা অতিক্রম করিয়া একান্তগম্য সিন্ধুর সহিত মিলিত হয়েন, তখন সেই মিলনস্থানে যেমন উভয়েই উর্ম্মিমালা উত্থিত করিয়া পরস্পরের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছাস জগৎকে জ্ঞাপন করেন এবং ঐ সঙ্গমস্থানে উপনীত হইয়া যাহারা দর্শন ও স্নানাদি করেন তাহারাও নিজ জীবন ধন্য করতঃ পূর্ব্বপুরুষগণকেও পরিতৃপ্ত করিয়া আশীর্ব্বাদভাজন হন। শ্রীপাদ রূপসনাতনের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত এই প্রেমময় মিলন স্থানটী

যাহারা দর্শন করেন এবং সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দেন তাঁহারা নিজেরাও এক অনির্ব্বচনীয়-অনুভূতিলাভে ধন্য হয়েন ও পিতৃপুরুষগণকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন। তা না হইবেই বা কেন? শ্রীভগবানকে অনুভব করিবার জন্য, ও তাঁহাতে প্রেমপ্রাপ্তির কারণরূপে শাস্ত্রে যত যত উপায় উল্লেখ করিয়াছেন সেই সমুদায় উপায়ের মধ্যে মহৎপাদ-রজো অভিষেকটি অব্যর্থ মোক্ষউপায়রূপে বর্ণিত আছেন; আবার নিখিল মহন্তের মধ্যে শ্রীপাদ রূপসনাতন বৈরাগ্যে, পাণ্ডিত্যে, অনুভবে ও রসিকতায় শীর্ষস্থানীয় বলিলে কোন অত্যুক্তি হইতে পারে না; কারণ ইঁহারা একদিকে নিগূঢ় শ্রীব্রজলীলার অতি অন্তরঙ্গ মধুর রসের সহায়কারী নিত্য-পার্ষদ, অপরদিকে নিখিল অবতারের মুকুটমণি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অতি অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদ ও সম্প্রদায়ের মুখ্য-আচার্য্য। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রদত্ত শক্তিলাভে নিখিল লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতঃ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানস-অভীষ্ট বিষয় নিজগ্রন্থে লেখনীচিত্রে অঙ্কিত করিয়া কলিঘোর-তিমিরাচ্ছন্ন মানবের হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিমল উজ্জ্বল রসের সংবাদদানে কিশোরযুগলের চরণে ভক্তের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। এত গুণের শ্রীপাদ রূপসনাতনের অপার করুণার কথা মনে করিয়া কাহার না হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে অশ্রু উদ্গম হয়? তাই তাঁহাদের গুণের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"জয় সনাতন-রূপ প্রেমভক্তিরসরূপ
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক পাসরিল সব শোক
প্রকট কল্পতরু জনু॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত নিজগ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হ'তে পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর-রসাশ্রয়॥
যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ বাণ যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপসনাতন দেহ মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গলে হারা॥"

পরমারাধ্যতমা শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতা গোস্বামিনীর অপার করুণায় ও শ্রীপাদ রূপসনাতনের অহৈতুকী কৃপা-আকর্ষণে—মাদৃশ ভাগ্যহীন জনও শ্রীধাম রামকেলী দর্শন ও তাঁহাদের পদরজসেবিত স্থানে গড়াগড়ি দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। এইস্থানে বহুকাল যাবৎ জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে মিলন-মহোৎসব মেলা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে এই মেলাটিতে শ্রীপাদ রূপসনাতনের প্রবর্ত্তিত সদাচারসম্পন্ন শ্রীবৈষ্ণবগণের সমাগম খুব কমই হইত। আজ কয়েক বৎসর হইতে শ্রীপাদ রূপসনাতনের কৃপা-আকর্ষণে পড়িয়া মালদহের সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহোদয়ের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে শ্রীশ্রীরামকেলীসংস্কারসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছেন। ইনিই সেই সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক। সম্পাদক মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে রামকেলীতে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই একজন সুবিখ্যাত গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীপাদ সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন প্রমুখ অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি এই সভার সভাপতিত্ব করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। এবার সর্ব্বথা অযোগ্য ভক্তিহীন আমাকেও সেই বিরাট সভার সভাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে উদারচেতা শ্রীপাদরূপসনাতনের স্মৃতিরক্ষার জন্য নিজ পদমর্য্যাদাগৌরব পদবিদলিত করিয়া যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—সেই অকাট্যসঙ্কল্পে যিনি নিজের মানমর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ ভ্রাতৃগণ সহ অক্লান্তপরিশ্রম স্বীকার এবং এই মহামহোৎসব নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার দিকে না তাকাইয়া সভাপতিত্ব পদ গ্রহণের

অনুরোধ করায় আমিও শ্রীদাম বিপ্রের মত "অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমশ্লোকদর্শনম্" এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপসনাতনের স্থানে গড়াগড়ি দিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার আশায় তাঁহার অনুরোধ হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করি। গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রির গাড়ীতে উঠিয়া তৎপরদিন বেলা ১১টার সময় মালদহ ষ্টেসনে নামিয়াই দেখি ভক্তিজীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয় ভ্রাতৃ ও ভক্তগণসঙ্গে তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। গাড়ী হইতে নামিবা মাত্রই ষ্টেসনের একটী কেদারায় আমাকে বসাইয়া মাল্য-চন্দন ও অর্ঘ্যদানে আমাকে এবং আমার সঙ্গীয় লোক ও গৌরকীর্ত্তনরসিক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহারাজের উপযুক্ত শিষ্য শ্রীনিতাইরমণ দাস বাবাজী মহাশয়কে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে সম্পাদক মহাশয়ের উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা হার্ম্মোনিয়ম যোগে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সহিত শ্রীপাদ রূপসনাতনের মিলনপ্রসঙ্গ গান করিয়া আমাদের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত করিয়াছিলেন। সেই গান শ্রবণে আমি ও আমার বন্ধুপ্রতিম শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বিশেষভাবে শ্রীপাদ রূপসনাতনের স্ফুর্ত্তিলাভে ধন্য হইলাম। তখন হইতেই শ্রীরূপসনাতনের চরণের প্রতি বুকে একটা আবেশ আসিল। সেই আবেশভরা বুক লইয়াই মালদহ সহরে আমাদের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত নিতাইরমণ দাস বাবাজী মহাশয় সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণসহ ষ্টেসন হইতে "ভজ নিতাই গৌর রাধাশ্যাম" ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় অতি আদর আগ্রহের সহিত আমাদের মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎপর বেলা ছয় ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণমিশনের প্রাঙ্গনে সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য একটী সুবৃহৎ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই সভায় উচ্চশিক্ষিত বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে কতিপয় পণ্ডিতও ছিলেন। সভা আরম্ভ হইলে ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈষ্ণবোচিত ভক্তিরসমাখা-ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত করতঃ আমাকে মাল্য-চন্দন-অর্ঘ্যদানে সভাপতিত্ব-পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে আমিও নিজ-সৌভাগ্য মনে করিয়া ঐ আসন গ্রহণ করি। তৎপরে ভক্তির বৈশিষ্ট্যসূচক অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলাম। সে দিন শরীর ক্লান্ত থাকায় বেশী কিছু বলিতে সমর্থ হই নাই। তৎপরদিবস বেলা চারিঘটিকার সময় মালদহ হইতে মটরবাসে শ্রীরামকেলী যাত্রা করি। যাইবার সময় দেখি—পথের দুই ধারে মেলার যাত্রীগণ দলবদ্ধ হইয়া যাইতেছে এবং আসিতেছে। তাহারা থাকিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে এবং উচ্ছাসভরা বুকে "জয় রামকেলী ধামকি জয়" "জয় রামকেলী সংস্কার সমিতি কি জয়" 'জয় শ্রীরূপসনাতন কি জয়" এই ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিল। আমি এ যাবৎ অনেক তীর্থস্থানে গিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানে শ্রীরূপসনাতনের জয়ধ্বনি শুনি নাই। আজ অভিনব প্রাণজুড়ান প্রাণারাধ্য শ্রীরূপসনাতনের জয়ধ্বনি শুনিবামাত্র প্রাণে একটা অজানা আনন্দ-উচ্ছাসের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। কেবল আমি বলিয়া নহে, আমার সঙ্গী যাহারা যাহারা ছিলেন, তাহাদের মনও যেন একটা অভিনব সুখোল্লাসময় দেশে প্রবেশ করিতেছিল। সেই মেলায় সমাগত ভক্ত অভক্ত সকলের নিকট যেন শ্রীরূপসনাতন চিরপরিচিত এবং চির-আপন। তাহাদের সেইসকল ভাব দেখিয়া নিজকে অকৃতার্থ এবং অধন্য মনে হইতে লাগিল। কারণ এতদিন ভজন করিয়াও শ্রীরূপসনাতনের প্রতি আপনজনবুদ্ধি করিতে পারিলাম না, অথবা ইহাদের অনেকে ভজন না করিয়াও তাঁহাদিগকে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে। মনে মনে তাহাদের সৌভাগ্যকে রাশি রাশি ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। আর একটা অলৌকিক ঘটনা এই হইল যে—মালদহ বাসস্থান হইতে যাওয়া ও আসা পর্য্যন্ত রসনা আমার অজ্ঞাতেই শ্রীনামামৃত আস্বাদনে বিভোর ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীচরণরেণু প্রার্থী—
শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী

প্রাপ্ত-পত্র

সবিনয় নিবেদন—

যে কোটি-চন্দ্র-সুশীতল গৌরচন্দ্রের চরণচ্ছায়ায় ত্রিতাপ-তাপিত জীবের জীবন জুড়াইয়েছে, সেই সংসার-কল্পতরুটীকে যে মালী গোলোকোদ্যান হইতে অতি যতনে আনিয়া এই মর্ত্ত ভূমে রোপিত করিয়াছিলেন, সেই ভুবন-পাবন মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শ্রীশ্রীচরণকমলে সমগ্র বৈষ্ণব-জগত-চিরঋণী। সেই শান্তিপুরনাথের— 'এনেছি এনেছি' এই সোল্লাস-হুঙ্কারধ্বনি আজও প্রতি-ভক্তহৃদয়ে সুপরিত। এ হেন দয়ালঠাকুরের সাধনের স্থান— যাহা সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের পরমারাধ্যতম তীর্থক্ষেত্র— যে স্থানের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিতে পারিলে জন্ম সার্থক হইয়া যায়—সেই পরম রমণীয় যোগিজনদুর্লভ আশ্রমভূমি— যেখানে বসিয়াই শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র 'গৌর আনার' আরাধনা করিয়াছিলেন—সেই মহামহিমান্বিত স্থান বর্ত্তমানে অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ;—শ্রীশ্রীমন্দির ভগ্নপ্রায়, শ্রীনাটমন্দির ভূতলশায়ী হইতেছেন, ভোগমন্দিরাদির সুব্যবস্থা আদৌ নাই, সমাগত বৈষ্ণব-সজ্জনের উপযুক্ত বিশ্রামস্থান নাই, সেবাপূজার ও পানীয়জলের বিশেষ অভাব, দৈনন্দিন সেবাপূজাদিও অতি দীনভাবে চলিতেছে। শ্রীশ্রীপ্রভুর আশ্রমের এই করুণ দৃশ্য দেখিলে বেদনায় প্রাণ কাতর হইয়া উঠে,—মনে হয় এই অপরাধের জন্য সমগ্র বৈষ্ণবজগতই কত অপরাধী। শান্তিপুরবাসী প্রভুসন্তানেরা তাঁহাদের অর্থাভাববশতঃ নিজেদের পৈত্রিক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিগ্রহের সেবা পূজাদি অতিকষ্টে পরিচালনা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই পবিত্র আশ্রমের মর্য্যাদারক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই আজ সকলে সমবেত হইয়া অতি কাতর-কণ্ঠে সমগ্র বৈষ্ণবজগতের নিকটে এই নিবেদন জানাইতে বাধ্য হইতেছেন,—নিজেদের সহস্র ত্রুটি উপলব্ধি করিয়াও সমগ্র বৈষ্ণব নরনারীগণকে তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য সাদরে ও সাগ্রহে আহ্বান করিতেছেন। ভরসা রাখেন—শ্রীশ্রীপ্রভুর আশ্রম-সম্বন্ধীয় অভাবের বিষয় মহাপ্রাণ ভক্তবৃন্দের গোচরীভূত হইলে অচিরাৎ তাহা পূরণ হইবে। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদির সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আনুমানিক ২৫০০০৲ (পঁচিশ সহস্র) মুদ্রার প্রয়োজন, শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপা হইলে হয়ত কোনও একজন কৃতী ভক্তই এই অর্থব্যয় করিয়া ধন্য হইতে পারেন, হয়ত বা দশজনে কিম্বা শতজনেও এককালীন অর্থপ্রদান করিয়া প্রত্যেকেই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। উপসংহারে নিবেদন এই যে—এই সম্পত্তি দেবোত্তর, ইহাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষের কোনও প্রকার নিজস্ব স্বত্ব নাই। ইতি তারিখ ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল

মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়—(মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি), শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গুহ—(মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি), শ্রীরাধিকাভূষণ রায়—(রায়বাহাদুর জমিদার তাড়াশ), শ্রীকিশোরী লাল সেন—(রায়বাহাদুর অবসরপ্রাপ্ত সবজজ), শ্রীনীরদ রঞ্জন গুহ—(অবসরপ্রাপ্ত এডিসনাল সবজজ), শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—(ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স্ প্রেসিডেন্সী বিভাগ), জিতেন্দ্র নাথ মৈত্র—(এম্ ডি অধ্যাপক ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল), শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—(এম্ এল্ সি এটর্ণী এট্ ল, রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের সদস্য), শ্রীশৈলেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(রায়বাহাদুর সুপারিণ্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার), শ্রীহেমচন্দ্র গুহ—(পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নদীয়াবিভাগ), শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার—(এম্ এ অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীঅভয়কুমার গুহ—(এম্ এ পি এইচ ডি অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীকান্তিচরণ মিত্র—(এম এ বর্দ্ধমান রাজ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), শ্রীযোগীন্দ্র কুমার গোস্বামী, শ্রীমান গোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরাধিকা লাল গোস্বামী, শ্রীনিকুঞ্জ মোহন গোস্বামী, শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দু লাল গোস্বামী, শ্রীঅমৃত লাল গোস্বামী, শ্রীকমলাপতি গোস্বামী, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী—(শ্রীধাম শান্তিপুর), শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল, দীন শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস—(বি, এ শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার), শ্রীকিশোরী মোহন গুপ্ত—(এম্ এ ব্যাকরণতীর্থ, কবিরাজ ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল দৌলতপুর কলেজ), শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ—(অমৃতবাজার পত্রিকা), শ্রীরেবতী মোহন সেন—(কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অধ্যাপক), শ্রীহেমেন্দ্র নাথ গুহ, রায়—(ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক), শ্রীহর কুমার সাহা—(এম্‌এ বিএল্ উকিল জজকোর্ট ১৩নং নবগোলা ঢাকা), শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—(ভাগবৎ ধর্ম্মমণ্ডলের সভাপতি), শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী—(শ্রীধাম নবদ্বীপ), শ্রীভাগবত-

কুমার গোস্বামী—(শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় এম্‌ এ পি এইচ ডি), শ্রীঅজিত মোহন ভক্তিবাচস্পতি—(নিবাস কলিকাতা), শ্রীগোবর্দ্ধন ভাগবতভূষণ গোস্বামী, (শ্রীনিত্যানন্দাত্মজা শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর জিরাট গদির স্থলাভিষিক্ত গোস্বামী), শ্রীশ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস—(কাঙ্গাল শ্রীরাম দাস), শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস—(রূপলাল হাউস ঢাকা)

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীচরণপ্রার্থী—
শ্রীগৌরহরি দাস—(শ্রীহট্ট)

শোকসংবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশৃঙ্গারবট ও শ্রীগোপীনাথের মন্দির হইতে প্রসাদী ওড়না আসিলে শ্রীল বাবাজীমহারাজকে বিমানে চড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট দিয়া চক্রবেড় পরিক্রমার পথে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-আনন্দের সহিত মহাসমারোহে শ্রীনিকুঞ্জকানন নিধুবন পরিক্রমা করাইয়া শ্রীযমুনাপুলিনের রঙ্গে নামানো হইলে প্রায় একহাজার বৈষ্ণব উচ্চকণ্ঠে আকুলপ্রাণে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীমহারাজকে ঘিরিয়া সকল বৈষ্ণবগণ যখন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন এত অধিক পরিমাণে রজ উড়িতে লাগিল যে তাহাতে এমন অন্ধকার হইয়াছিল কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। একে ভূমির রজঃরাশিতে সকল শ্রীবৈষ্ণবগণের অঙ্গ ধূসরিত, অপরদিকে উচ্চকণ্ঠে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে তখন সকল বৈষ্ণবগণের হৃদয় আনন্দ-উল্লাস-উন্মাদনায়-মাতোয়ারাপ্রায় হইয়াছিল। এই প্রকারের সৌভাগ্য অনেক শ্রীবৈষ্ণবের পক্ষেই ঘটিবার সম্ভাবনা করা যায় না। আর অন্য কোনও বৈষ্ণবের সহিত এত প্রভুসন্তান, আচার্য্য-সন্তান, এবং উদাসীন বৈষ্ণবসমাজ অনুগমন করিয়াছেন বলিয়া খুবই কম শুনা যায়। তৎপর পানিঘাটে যখন সেই শবদেহ দাহন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, তখন এক অপার আনন্দ-উল্লাসের খেলা দেখা যাইতেছিল। এইটা বড়ই অপূর্ব্ব হইয়াছিল যে—সেই দগ্ধদেহ হইতে একটুমাত্রও দুর্গন্ধ নির্গত হইয়াছিল না, বরঞ্চ একটী অলৌকিক সুগন্ধ অনুভব হইতেছিল। তৎপর শ্রীপ্রভু সন্তান প্রভৃতি শ্রীধীর সমীর ঘাটে স্নান করিয়া বাবাজী মহারাজের থাকিবার স্থানে (গোপীনাথের বাগ গোপাল ছড়িদারের কুঞ্জে) আসিলে শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যার পরে প্রায় সহস্রাধিক বৈষ্ণব প্রভুসন্তান প্রভৃতিকে মালপোয়া, লাড্ডু, শাক, প্রভৃতি মহাপ্রসাদ ভোজন করান হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে উদাসীন বৈষ্ণবগণকে বহির্ব্বাস বিতরণ করা হইয়াছিল। সে দিনের কৃত্য এইপ্রকারে সমাধা করিয়া তৎপর দিবস অপরাহ্ন ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগণেশদাস কীর্ত্তনীয়া কলহান্তরিতা রাসলীলা গান করেন। সেই সময়ে ভাগবতপরমহংস পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীল যুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ নিজ পরিবার সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল পণ্ডিত বাবাজী মহারাজকে সভাপতির আসন দান করিয়া শোক-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; তাহাতে প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী বিরহ-উচ্ছাসময়ী ভাষায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের যে সদ্‌গুণরাশি বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ সকল বৈষ্ণবগণেরই চোখে জল আসিয়াছিল। প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীবাবু বাবাজী-মহারাজের বিরহে অধীর-বুকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বাবাজী-মহারাজের যে সদ্‌গুণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তদনন্তর সেই সভায় আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বাবাজী মহারাজের বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছিল। যেই শ্রীউৎসবে ভক্তিজীবন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ সাহেব মহাশয় শ্রীযুক্ত গণেশ দাস কীর্ত্তনীয়ার পনের দিন ব্যাপী শ্রীলীলাকীর্ত্তনের ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই সকল সৌভাগ্য-সম্পৎ-লাভের মুখ্যকারণ তিনি অকপটে শ্রীগুরুচরণের সেবা করিয়াছেন এবং অনিন্দুক হইয়া একান্তভাবে শ্রীনাম এবং শ্রীলীলার আশ্রয়ে ও বৈষ্ণবের বহুসৎকারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অলমতিবিস্তারেণ

জনৈক শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

সংবাদ

শ্রীরাধাকুণ্ডের মামলা

আমাদের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বত্ব লইয়া আবাগড়ের মহারাজের সহিত স্থানীয় বৈষ্ণবগণের মামলা চলিতেছিল। সম্প্রতি মথুরার নিম্ন আদালতে ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার তারিখে ঐ মামলার বিচারের দিন ধার্য্য থাকায় শ্রীকুণ্ডের মহান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য দাস (ভূতপূর্ব্ব সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের বিচারপতি) মহাশয় নিজ পক্ষীয় সাক্ষী এবং দলিলপত্র প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মামলায় ভক্তিজীবন ভারতবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ সাহেব ও ভূতপূর্ব্ব পাটনা হাইকোর্টের জজ রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া মামলা পরিচালনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সাত দিন পর্য্যন্ত বিচারপতিকে দলিলপত্র প্রভৃতি বুঝান এবং এই শ্রীকুণ্ড যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময়ে প্রকট হইয়াছিলেন, এবং পাণ্ডবগণও এই মহাতীর্থে আসিয়া স্নান তর্পণাদি করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ক্রমে শাস্ত্রাদিদ্বারা এমন বক্তৃতা করিয়া বিচারপতিকে এই শ্রীকুণ্ডের মহিমা সুচারুভাবে বুঝাইয়াছিলেন, যাহাতে বিচারপতিও শ্রীকুণ্ডের মহিমার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত এই মহাতীর্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কুণ্ডদ্বয়ের তীরবর্ত্তী আম্লিতলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন "আমার সেই শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথায়" ? অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন সম্মুখেই সেই কুণ্ডদুইটি ধান্যক্ষেত্রময় হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন সেই দুইটি ধান্যক্ষেত্রে স্নান করিয়াছিলেন এবং সেই দুই কুণ্ডের রজ লইয়া তিলক করেন ও রজঃ সঙ্গে লইয়া যান। তৎপরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ যেমন করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে বাদসাহের নিকট হইতে উহা খরিদ করেন, এই সমুদয় প্রসঙ্গগুলি ভক্তিজীবন দাশ সাহেব যখন বক্তৃতা করিয়া বিচারপতিকে বুঝাইতেছিলেন, তখন তাঁহার এমনই ভাবাবেশ হইয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার নেত্রে অশ্রু ও কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। তাহাতে মিলিত দর্শক বহু বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এমন কি বিচারপতি মহাশয় পর্য্যন্ত স্তম্ভিত বিস্মিত ও ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ের দৃশ্যটী যাহাদের নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহারা আজও পর্য্যন্ত সে ছবি ভুলিতে পারেন নাই। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে—যে দাশসাহেব বিলাতে মেম বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কেমন করিয়া এই অনাবিল ভক্তিরসের সত্তা এতদিন লুকাইয়া ছিল। আজ শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর করুণায় সেই লুক্কায়িত প্রেম ফুটিয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত দাশ সাহেব বহুল অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগুরুচরণে অনাবিল ও অকপট-ভক্তির প্রভাবে এবং শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর কৃপায় সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। বিচারপতি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগেরই অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজকে এবং তাহার সহকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ দাসজীকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ বহুদিন যাবৎ তাঁহারা যে অক্লান্ত-পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে সমুদয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাদের নিকটে ঋণী ও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত দাশ সাহেব এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগের পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই কার্য্যের পারিতোষিকরূপে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী যেন তাঁহাদিগকে নিজ চরণের দাসীরূপে অঙ্গীকার করিয়া সেবারসে নিমজ্জিত করেন।

আষাঢ়-সংখ্যায় শ্যামসুন্দরে মামলা সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিবার ইচ্ছা রহিল।

ম্যানেজার—

"শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর"

তাঁহার থাকা অত্যন্ত অসম্ভাবনা-বুদ্ধিজন্য তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা দেখিতে না পাইয়া জীবসমূহে লৌকিকপ্রকারে প্রিয় অপ্রিয় প্রভৃতি যে চৌদ্দটী অবস্থা আছে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় প্রভৃতি নাই, তাহাই শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুনরায় উপদেশ করিতে লাগিলেন।

হে গোপরাজ! ব্যবহারিক জগতে যেমন উপকারাদি-দ্বারা কেহ প্রিয় হয় এবং অপকার দ্বারা অপ্রিয় হয়, তেমনই তাঁহার কেহ উপকার বা অপকার করিতে পারে না বলিয়া কোন অংশেও প্রিয় বা অপ্রিয় হইতে পারে না। যেহেতু তিনি পূর্ণকাম। তাঁহার বাহ্যিক কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই, এই জন্য তাঁহার কেহ উপকার করিতে পারে না, কেহ অপকারও করিতে সমর্থ হয় না। ব্যবহারিক-জগতে যেমন সুন্দর বা পণ্ডিত হইলে সকলে তাহাকে স্তব করিয়া থাকে, এবং কুরূপ বা মূর্খ হইলে সকলে তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কেহ স্তুত্য বা নিন্দ্য নাই, যেহেতু তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত বা অভিমানী নহেন। সৌন্দর্য্য ও পাণ্ডিত্য, কৌরূপ্য অথবা মূর্খত্ব এসকলই মায়ার ধর্ম্ম। তিনি মায়াতীত, মায়িক কোন বস্তুতে তাঁহার অভিমান নাই, যেহেতু তিনি নির্লেপ ও নির্ব্বিকার। মায়িক গুণ ও দোষে তাঁহার দৃষ্টি নাই বলিয়া তাঁহার উপেক্ষ্যও কেহই নাই। ব্যবহারিক জগতে ধাতুদ্বারা দেহ উৎপন্ন হয় বলিয়া যেমন পিতা ও মাতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইপ্রকার ধাতু-সম্বন্ধে জন্ম নাই বলিয়া কেহই তাঁহার মাতা বা পিতা হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণে ধাতুসম্বন্ধ নাই বলিয়া তাঁহার কেহ পুত্রাদিও হইতে পারে না। বিবাহসম্বন্ধে লিপ্ত হন না বলিয়া কেহ তাঁহার ভার্য্যা হইতে পারে না। নিখিল কারণের আদিকারণ বলিয়া তাঁহার আপন বলিতে কেহই নাই এবং কেহই তাঁহার পরও নহে। স্বরূপভিন্ন দেহে আমিত্ব অভিমান করে বলিয়া যেমন জীবের দেহ আছে, শ্রীকৃষ্ণে দেহ ও দেহী ভিন্ন বস্তু নহে বলিয়া তাঁহার দেহ নাই, কারণ তাঁহার যেটী স্বরূপ সেইটীই দেহ; এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ি ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন। "নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্" হে পরম! আপনি কৃপা করিয়া আমার চোখের নিকটে যে মূর্ত্তিটী প্রকাশ করিয়াছেন, এই শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন আপনার স্বতন্ত্র কোন স্বরূপ নাই। অর্থাৎ আপনার শ্রীমূর্ত্তি ও স্বরূপ দুইই অভিন্ন বস্তু। তিনি যে সকল কর্ম্ম করেন সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না বলিয়া তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া মায়াময় কর্ত্তৃত্বে অভিমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মজন্য-অদৃষ্ট-উৎপত্তির যোগ্যতা থাকে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণেরই কর্ত্তৃত্ব অভিমান না থাকাতে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না বা তাঁহারা শুভাশুভ কর্ম্ম ও তৎফলে লিপ্ত হন না। জীব-মুক্তগণেরও আরাধ্যপদারবিন্দ তুরীয়চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না তাহা বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স লিপ্যতে॥"

যদ্যপি তিনি পূর্ণকাম, আত্মারাম, নির্লেপ, নির্বিষয় এবং বিকাররহিত বলিয়া তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, তথাপি সাধুসম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় এবং অপ্রিয় আছে; অর্থাৎ যেজন সাধু সে তাঁহার প্রিয়, আর যেজন সাধুদ্রোহী সেজন তাঁহার অপ্রিয় হইয়া থাকে। তাঁহার নিকটে সজ্জাতি বলিয়া আদরবুদ্ধি নাই, অসজ্জাতি বলিয়াও অনাদরবুদ্ধি নাই। অর্থাৎ তিনি সজ্জাতি অথবা অসজ্জাতি কিম্বা সদসৎমিশ্রজাতির অনুসন্ধান না করিয়া সেই সৎ, অসৎ ও উভয়মিশ্র জাতির অনুরূপ স্বরূপবিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া সাধুসকলের রক্ষা করিবার জন্য যোগ্য হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সজ্জাতি দেবগণের ভিতরে বামনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণের অনুকরণ করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করেন। এবং অসৎ তামস যোনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি জাতিতে আবির্ভূত হইয়া সেই জাতির অনুকরণে লীলা করিয়া থাকেন। আবার সৎ ও অসৎ মিশ্রিত মানুষ জাতিতেও আবির্ভূত হইয়া সেই জাতির অনুকরণে লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেকটী লীলার ভিতরে সাধুগণকে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। হে ব্রজরাজ! হয়তো আপনি মনে করিতে পারেন—যিনি ভগবান্ তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই সাধুদ্রোহী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ,

সেই কার্য্যের জন্য সেই জাতিতে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছি—কর্ম্মময় দেহ-ধারী জীব যেমন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; তেমনই লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালও লীলা না করিয়া থাকিতে পারেন না। লীলাই তাঁহার মুখ্য-প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মসূত্রে "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" অর্থাৎ তাঁহার লীলাটী অলৌকিক হইয়াও লোকের মত, অথচ সেই লীলাই তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এইসকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—অন্য কোনও লেপ তাঁহাতে সংযুক্ত হয় না; যেহেতু তিনি নির্বিষয়। কিন্তু পরমসদ্গুণশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সাধুত্ব অত্যন্ত অভিরুচিত, অর্থাৎ সাধুকে অত্যন্ত ভাল-বাসেন। "সাধু কাহাকে বলে" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে—যিনি অকপট তিনিই সাধু। যাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়াছে তিনিই অকপট; আবার ভিতর বাহির তখনই এক হইতে পারে, যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ যেজন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করিতে পারিয়াছে; সেইজনই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে। আবার যেজন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহারই ভিতর বাহির এক হইতে পারিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়বর্গ শ্রীকৃষ্ণেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণে ইন্দ্রিয়বর্গের একান্ত নিষ্ঠা না হইলে সাধুসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণে একান্ত নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই সাধু, এমন কি যতদিন মোক্ষ-কামনাও হৃদয়ে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তও তিনি কপটী নামে অভিহিত। এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" শ্লোকে মোক্ষকামনাকেও কৈতব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধুর লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ১১।২০।৩৪ শ্লোকে উদ্ধবকে কহিয়াছেন "ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ হে উদ্ধব! আমার একান্তী, ধীর, সাধুভক্তগণ আমাকর্ত্তৃক-দত্ত অপুনর্ভব-কৈবল্যও বাঞ্ছা করে না। আবার ভগবান্ যে সাধু ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না তাহাও ৯।৪।৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—"

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

হে মুনিবর! যাহারা আমারই জন্য সাধু তাহারা আমার হৃদয়; আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমাভিন্ন তাহারাও কিছু জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতে সম অর্থাৎ নির্লিপ্ত, আমার কেহ দ্বেষ্য নাই বা কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তিতে আমাকে ভজিতেছে, তাহারা আমাতে, আমি তাহাদিগেতে। এই অভিপ্রায়ে "ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভে" শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—"ভক্তির্হি ভক্তহৃদয়-কোটিপ্রবিষ্ট ভগবদ্ধৃদয়বিদ্রাবয়িতৃশক্তিবিশেষঃ" যে শক্তি-বিশেষ ভক্তহৃদয়কোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের হৃদয়কে বিশেষরূপে বিগলিত করিয়া দিবার সামর্থ্য ধারণ করে, সেই শক্তিবিশেষের নাম ভক্তি। অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্ববিষয়ে নির্লেপ থাকিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিতে তিনি লিপ্ত হয়েন। ভক্তিতে এমনই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিবিশেষ আছে, যে শক্তিতে সর্ব্বনিরপেক্ষ ভগবান্‌কেও ভক্তপক্ষপাতী করিয়া দেয়। আবার সেই ভক্তগণেরও প্রেমের তরতমতা জন্য শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠারও তরতমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে ভক্তেরও তারতম্য আছে। সেই ভক্ত-গণের ভাবের প্রকার ও গাঢ়তা অনুসারে শ্রীভগবানেও আবেশের প্রকার ও গাঢ়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজ জননীকে বলিয়াছেন—"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্"। "হে মাতঃ আমি যাহাদের প্রিয় অর্থাৎ যেমন গোপীগণের আমি নিগূঢ়-প্রাণবল্লভ, সনকাদির আমি আত্মা, (পরমাত্মা), শ্রীযশোদা দেবকী প্রভৃতির নিকট আমি পুত্র, অর্জ্জুনাদির সখা, প্রদ্যুম্ন

প্রভৃতির গুরু (পিতা), পাণ্ডবাদির সুহৃৎ, যাদবাদির ইষ্টদেব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি।" এই প্রমাণে ভক্তগণের ভাব ও আবেশের জাতি ও পরিমাণ অনুসারে যে শ্রীভগবান্ কান্ত-পুত্রাদিরূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই দেখান হইয়াছে। তবে যে উদ্ধব শ্রীল ব্রজরাজকে বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, অপ্রিয়, পিতা, মাতা প্রভৃতি কেহই নাই" তাহার উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যবহারিক-জগতে যেমন মায়াময় ব্যবহারিক সম্বন্ধে প্রিয় অপ্রিয় পিতা মাতা প্রভৃতি হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার ব্যবহারিক সম্বন্ধে কাহারও প্রিয়াদি হয়েন না; কেবল মাত্র বিশুদ্ধ প্রীতি-সম্বন্ধেই তাঁহার প্রিয় পিতা মাতা প্রভৃতি হইয়া থাকেন। কেহ মনে করিতে পারেন, গুণাতীত শ্রীভগবানে গুণময় সম্বন্ধ কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবৎপ্রেমটী প্রাকৃত-গুণধর্ম্ম নহে, স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরই সার বৃত্তি রূপ। এই প্রেমভক্তিরই অপর নাম গুহ্যবিদ্যা। যেমন সন্ধিনী-শক্তির সার বৃত্তির নাম ব্রহ্মবিদ্যা, সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তির সার বৃত্তিরূপ প্রেমভক্তিই গুহ্যবিদ্যা নামে অভিহিত। প্রেম-ভক্তি যে নির্গুণা একথা দূরে থাক্, সাধনভক্তির প্রথম-সোপান শ্রদ্ধাকেই শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৫ অধ্যায়ে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥"

অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভবজনিত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ানুভবজনিত সুখ রাজস, মোহ ও দৈন্য হইতে উত্থিত সুখ তামস, ভগবদনুভবজনিত সুখ নির্গুণ। বেদান্তাদি-শাস্ত্রবিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া, যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস তাহা তামসী, আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা সেটী নির্গুণা। যেহেতু সেই শ্রদ্ধার মূল কারণ সাধুসঙ্গ। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতেই ভগবৎসেবা-দিতে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। সেই সাধুসঙ্গ নির্গুণ, অতএব নির্গুণ সাধুসঙ্গ হইতে আবির্ভূতা শ্রদ্ধাটীও নির্গুণা। যদি ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধাই নির্গুণা, তাহা হইলে মোক্ষসুখ-তিরস্কারিণী প্রেমভক্তি যে নির্গুণা তাহাতো বলাই বাহুল্য। অতএব শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিষয়েই অপেক্ষাশূন্য, কিন্তু প্রেমিক-সাধুজনের অপেক্ষাটী তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই সাধু-গণের মধ্যে যাহার যেমন ভাব সেই অনুরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি কোনও ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পিতৃমাতৃভাবে আবেশ থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ও তাহাদের প্রতি পুত্রভাবেই আবিষ্ট হয়েন। এইরূপ অন্যান্য-ভাবের ভক্তসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সেই পুত্রাদিরূপে আবেশটীও ভগবানের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু অভিনয় বা অনু-করণ করা নয়। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই শ্লোকের অর্থ টী আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—

"আমাকে তো যে যে ভক্তে ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"

যেমন একটী কার্য্যোৎপত্তির প্রতি দ্রব্য, স্বভাব, কাল, কর্ম্ম ও ঈশ্বরানুগ্রহ এই ৫টী কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত—দ্রব্য দুগ্ধ, স্বভাব দধিরূপে পরিণত হওয়া, কর্ম্ম অম্লসংযোগ, কাল—১০ বা ১২ ঘণ্টা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন ওই ৪টীই বিফল হইয়া থাকে। তেমনি দ্রব্য শ্রীভগবান্, স্বভাব ভক্তের প্রেমের জাতি ও পরিমাণ-অনুরূপ ভজন করা, কর্ম্ম প্রেমভক্তির যোগ, কাল—ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে অনুগ্রহ আকিঞ্চন ও সর্ব্বভাবে শরণাগত-জনকে নিজের ভাবানুরূপ আস্বাদন দান। পয়ারটীতে "স্বভাব" পদটী উল্লেখ আছে বলিয়া অভিনয় বা অনুকরণের অভাব সূচিত হইয়াছে। অতএব সম্প্রতি বসুদেব দেবকী প্রভৃতি হইতেও আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধবাৎসল্য-নামক প্রেমের আতিশয্য আছে বলিয়া তাঁহাদের অপেক্ষাও আপনাদের রক্ষা করিবার জন্য আপনাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আপনাদেরই পুত্র বলিয়া নিজমনে গভীরতর আবিষ্ট আছেন। আপনাদের সমক্ষে পুত্রসমুচিত মনোহর লীলা প্রকাশ-

লালসায় তিনি সত্বরই ব্রজে আসিবেন। আপনারা আর বৃথা অনুতাপ করিবেন না।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥
যথাভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ॥
যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণু মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

হে গোপরাজ! লীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভিন্ন কখনও থাকিতে পারেন না। তাই তাঁহার লীলা করিবার অযোগ্য প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ জড়ীয়গুণসমূহকেও নিজ সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য করার ক্ষমতা সঞ্চার করিয়া বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি, লীলা করিয়া থাকেন। নিজে কিন্তু সেই সকল গুণে লিপ্ত হয়েন না। যেমন ক্রীড়াসক্ত কোনও বালক একটী কদলীবৃক্ষের বৃন্ত (ডগা) কে "খেলার ঘোড়া" করিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া নিজের কাঁধে দিয়া খেলা করে। শ্রীকৃষ্ণও তেমনই জড়ীয় সত্ত্ব রজঃ তমোগুণকে লইয়া বিশ্বসৃষ্টাদি লীলা করিয়া থাকেন। হে গোপরাজ! ইহাতে আপনার মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌কে সেই সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে আবিষ্ট দেখা যায় কেন? তাহার উত্তরে দুইটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। যেমন কোন একটী বালক কুম্ভকারের চক্রের মত নিজদেহটী পরিভ্রমণ করাইয়া "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই রূপ মনে করে, তেমনই জীবও চিত্তে আমিত্ববুদ্ধি করাতে নিজে বিশুদ্ধস্বরূপ হইয়াও চিত্তের ধর্ম্মে সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে "আমি সুখী," "আমি দুঃখী," এইরূপ অভিমানী হইয়া থাকে।

বস্তুত জীব স্বতন্ত্র স্বরূপে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে। অথচ যখন "কর্ত্তা বলিয়া" অভিমান করিতেছে, তখনও জীব যেমন কর্ত্তা নয়, তেমনই পরমেশ্বরও সৃষ্ট্যাদিলীলায় কখনও আবিষ্ট নহেন। হে গোপরাজ! শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের বাৎসল্যপ্রেমে বিশেষ বশীভূত বলিয়া আপনাদেরই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য্যানুরোধে মথুরায় গেলেও সত্বরই আসিবেন। যদি আপনারা জাগতিক জন্যজনকসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রঅভিমান পোষণ করেন তাহা হইলে তিনি সকলেরই আত্মা অর্থাৎ প্রিয় বলিয়া কেবল আপনাদেরই পুত্র নহেন সকলেরই তিনি পুত্র। কেবল পুত্রই নহেন—পিতা, মাতা প্রভৃতিও হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া অভিমান করে বটে, এবং তিনিও বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" হে অর্জ্জুন! আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলই। আমার মত দাসভক্তগণের সর্ব্বদুঃখহরণকারী অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রভু, কিন্তু সেই সেই সম্বন্ধে আবিষ্ট হয়েন না। যেহেতু আপনাদের মত সাধারণ জীবে বিশুদ্ধ বাৎসল্যাদি প্রেম নাই। অথবা "যুবয়োরেব নৈবায়ং" এই শ্লোকটীর অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব আপনাদের বিশুদ্ধবাৎসল্যভাবে গভীর আবেশ আছে বলিয়া তিনি আপনাদেরই পুত্র। সকলের পুত্র নহেন। যেহেতু ভাবশূন্য সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে তিনি পরমাত্মা বিশ্বের জনক বলিয়া পিতা, ধারণ করেন বলিয়া মাতা, কর্ম্মফল দান করেন বলিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বের, নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। যেমন উপাদান কারণ মৃত্তিকাভিন্ন ঘটাদির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তেমনই যাহা শুনিয়াছেন, দেখিয়াছেন, যাহা অতীত, যাহা বিদ্যমান্, যাহা হইবে, যাহা স্থাবর, যাহা জঙ্গম, যাহা বৃহৎ, যাহা অণু, সে সমুদয়-ই অচ্যুতাখ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহে, তিনিই সকল। যেহেতু তিনি পরমাত্মা, অর্থাৎ পরমাশ্রয়। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র সত্তার কোন বস্তু নাই; তিনিই সর্ব্বস্বরূপ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

সর্ব্ববস্তু হইতে স্বতন্ত্র-সত্তায় পৃথক্‌রূপে নিত্য বিদ্যমান আছেন। যেমন পৃথিবী হইতে ঘট স্বতন্ত্র সত্তায় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ মাটী ছাড়া ঘট নাই। কিন্তু মাটী, ঘট ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তায় বহুল পরিমাণে আছে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশ্ব পৃথক্ নহে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব হইতে পৃথক্-সত্তায় নিত্যই বিদ্যমান্ আছেন। এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয়-স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন—

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত! ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥ ২।৭।৫০

হে বৎস! এইত আমি তোমাকে বিশ্বপালক শ্রীভগবান্ শ্রীহরির কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব শ্রীহরি হইতে পৃথক্ নহে, শ্রীহরি কিন্তু বিশ্ব হইতে পৃথক্—অর্থাৎ স্বতন্ত্র সত্তায় নিত্য বিদ্যমান্। বিশ্ব হরি হইতে অভিন্ন, শ্রীহরি বিশ্ব হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদাভেদ-বাদটাও এই প্রমাণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এবং নিশা সা ব্রুবতো র্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণপিতা শ্রীনন্দ মহারাজ যখন পরস্পর আবেশযুক্তহৃদয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের তাদৃশ আলাপ সর্ব্বক্ষনী রাত্রি সাধারণ রাত্রি হইতে সুদীর্ঘা হইলেও নিঃশেষরূপে অতীত হইল। অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। যে রজনীতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীব্রজরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই রজনী যেন শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণে নিজে ধন্য হইবার লালসায় কলেবর বিস্তার করিয়াছিল। রজনী চলিয়া গেল বটে কিন্তু শ্রীল ব্রজরাজ ও শ্রীমান্ উদ্ধবের কথাপ্রসঙ্গ নিবৃত্ত হইল না। তন্মধ্যে শ্রীল ব্রজরাজ যত কথা কহিতে লাগিলেন, সকল কথারই মুখ্য তাৎপর্য্য "যে কোনও উপায়েই হউক্ আমার পুত্র ফিরিয়া ঘরে আসিবে কি না?" শ্রীউদ্ধবও যত কথাই কহিলেন—সমস্ত কথার তাৎপর্য্য শ্রীলব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দেওয়া। শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীউদ্ধবের এই ভাব সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়। যেহেতু শ্রীউদ্ধব দেখিলেন—পুত্রভাবময় ইঁহাদের এই বিরহদুঃখ সম্প্রতি অতি অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও মথুরা হইতে ব্রজে আগমন সম্ভবপর নয়। অতএব ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় পুত্রভাবের প্রশংসার সহিতই তত্ত্ব উপদেশ করিয়া এই বিশুদ্ধ-পুত্রভাব যৎকিঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারিলে বিরহজনিত দুঃখ কিঞ্চিৎ উপশম হইবে। এইপ্রকার সান্ত্বনামাত্র দেওয়া ভিন্ন আর দুঃখ-উপশমের কোনই উপায় দেখি না, এই ভাবে শ্রীউদ্ধব শ্রীলব্রজরাজকে তত্ত্ব উপদেশ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র" এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের শৈথিল্য সম্পাদনের জন্য যত উপদেশ করিতে লাগিলেন, শ্রীল ব্রজরাজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় সম্বন্ধজ্ঞানসিন্ধুমধ্যে মন্দার পর্ব্বতের মত কোথায় ডুবিয়া গেল তাহার অনুসন্ধান পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। শ্রীউদ্ধবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীলব্রজরাজ এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া উদ্ধব যে আমাকে উপদেশ করে তাহা কি আমি জানি না? এই কৃষ্ণের নামকরণ সময়েই ত্রিকালদর্শী শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণ নারায়ণের সমান এই কথা শুনিয়াছি। কৃষ্ণ ভিন্ন নাকি নারায়ণের সমান আর কেহই নাই। বিশেষতঃ পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতিকে সংহার, গোবর্দ্ধন ধারণ, দাবানল ভক্ষণ, লোকপাল বরুণের প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা ইহার নারায়ণ-সমধর্ম্ম অনুভব করিয়াছি। নারায়ণই পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মাই পরব্রহ্ম, ইহাও আমি বেশ জানি। তথাপি এই কৃষ্ণ আমাদের পুত্র এবিষয়েও আমাদের অনুভবই অভ্রান্ত প্রমাণ। শ্রীগর্গমুনি মহাশয়ও "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে" অতএব হে নন্দ! এই কৃষ্ণ তোমার পুত্র—এইরূপে উপদেশ করিলেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণে আমরা কখনও আরাধ্য-বুদ্ধি করি নাই, বরং নিজ চর্ব্বিত তাম্বুল প্রভৃতি কৃষ্ণবদনে সমর্পণ করিয়াও আমাদের মানস অপ্রসন্ন কখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে কৃষ্ণজন্মের পূর্ব্বে আরাধ্যদেব শ্রীনারায়ণকে আমরা ধ্যান করিতে পারিতাম বটে; এখন কিন্তু ধ্যান করিবামাত্রই হৃদয়মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারি।

ইহাই আমাদের মনঃপ্রসন্নতার অভ্রান্ত পরিচয়। অর্থাৎ কৃষ্ণকে চর্ব্বিত তাম্বূল অর্পণ করাতে যদি আমাদের অপরাধ হইত, তাহা হইলে ধ্যানকালে হৃদয়ে শ্রীনারায়ণের প্রচুরতর স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিতাম না। কারণ অপরাধীর হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি সর্ব্বদাই অসম্ভব। অতএব আমাদের পুত্র সেই কৃষ্ণকে ভুক্তাবশেষ চর্ব্বিত তাম্বূল প্রভৃতি দেওয়া দোষাবহ হয় নাই।

কেবল আমাদেরই কৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি তাহা নয়, কৃষ্ণেরও আমাদের প্রতি পিতৃ-মাতৃ-বুদ্ধি স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কৃষ্ণের অনুভবই অভ্রান্ত প্রমাণ। যেহেতু আমাদের দুই জনের চর্ব্বিত প্রদান, ক্রোড়ে আরোহণ, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি লালন না পাইলে তাহার মুখখানি মলিন হইয়া যাইত; ইহা আমরা অনেক সময়ই দেখিয়াছি। যদি যশোদা তাহার মাতা না হইবে, তাহা হইলে দধিমথনগাগরী-স্ফোটন অপরাধে তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিল? এবং সেই বন্ধনে তাহার মুখখানি মলিন হইয়াছিল এবং আমি যখন তাহাকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম তখন সে যেমন হাসিয়াছিল তাহাতো সাক্ষাতই দেখিয়াছি। আমরা দুই জন তাহার পিতামাতা বলিয়াই সে পরমেশ্বর হইয়াও আমাদের বিহিত অনুশাসন ভৎর্সন ও বন্ধনাদি স্বীকার করিয়াছে। তাহা না হইলে সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের বন্ধন কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু সম্প্রতি মথুরাতে চানুর কংস প্রভৃতি বধের পর "হে কৃষ্ণ! তুমি পরমেশ্বরই" এই কথা সকলেই বলিয়াছিল। তন্মধ্যে দেবকী কিন্তু "আমি তোমার মাতা, বসুদেব বলিলেন "আমি তোমার পিতা," অন্য কেহ বলিতে লাগিল "আমরা তোমার পিতৃব্য," কেহ কেহ—বলিতে লাগিলেন "আমরা তোমার ভ্রাতা," কেহ বলিয়াছিল "আমরা তোমার আত্মীয়" কেহও বা বলিয়াছিল—"আমরা তোমার বন্ধু হই"। এই প্রকার বলিয়া যখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ গৃহে লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে মথুরাতেই অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন মহাভব্যশিরোমণি আমার পুত্র কৃষ্ণও তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া মহাসঙ্কটজালে পতিত হইয়াছিল। নিজ ব্রজেও আসিতে না পারিয়া সকলের নিকটে দাক্ষিণ্য ভাবেই এইরূপে বলিয়াছিল বলিয়া আমি অনুমান করি,—"আমিই সর্ব্ববিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা—পরমেশ্বর, আমার কেহ মাতা পিতা আত্মীয় পর নাই। তোমরা সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে—যেজন আমাকে ভক্তি কবিবে, আমি তাহারই হইব। ভক্তহীন জনের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমি ভক্তের ঘরেই যাইব এবং ভক্তই আমার পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব; এমন কি ভক্তের ঘরেই আমি সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। এই উদ্ধব বুদ্ধিমান হইলেও বালক। আমার পুত্রের মহাগম্ভীর হৃদয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সেই উপদেশই যথার্থ মনে করিয়া এই ব্রজে আমাকে তেমনি ভাবে প্রবোধ প্রদান করিতেছে। আহা! শ্রীল ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় বাৎসল্যের নিকটে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণ তত্ত্বউপদেশও বৃথা হইল, তাঁহাদের বিশুদ্ধ-বাৎসল্যের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতে পারিল না, বরঞ্চ উদ্ধবই বালবুদ্ধি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে শ্রীমান্ উদ্ধব স্নানাদি-কৃত্য সম্পাদনের জন্য বাহিরে যাইবার সময় শ্রীল শ্রীব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীকে বিনীত ভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন "অহো! বড়ই খেদের কথা আমি আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছি; আপনাদের দুজনার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্নেহ-পরিপাটি, তাহার এক কণাও স্পর্শ করিবার আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই স্নেহপরিপাটীই আপনাদের সকল অভীষ্ট অতি সত্বর সম্পাদন করিবে। আপনাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সেটী কেবলই আমার ধৃষ্টতা-মাত্র, এবং সেই জন্য আমি অত্যন্তই কষ্ট অনুভব করিতেছি। যেহেতুক যাহার যে বিষয়ে কোন-ই অধিকার নাই, তাহার সেই বিষয়ে হানি বৃদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টা করা কেবল ধৃষ্টতামাত্র। আপনারা ব্রজবাসিজনমাত্রের পালক, আপনারা অত চিন্তা করিবেন না। আপনারা যদি চিন্তায় অত কাতর হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের আশ্রিত ব্রজবাসি-জনের দুঃখ আরও অতিশয় অধিক হইবে। যিনি আপনা-নাদের শিশু, তিনি জগতে জীবসমাজের সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ তরণী। এইরূপ নিবেদন করিয়া

শ্রীউদ্ধব মহাশয় স্নানার্থে বহির্গত হইলেন। এদিকে বিশ্রব্ধ-প্রধানা গোপীগণ হৃদয়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিসুখে বিভোরা আছেন বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করতঃ দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বাস্তুপূজা করিয়া দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হইলেন। শ্রীল ব্রজরাজের আদেশানুসারে প্রতি দিবসই এই সকল নবনীত, দধি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জন্য মথুরায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

তা দীপদীপ্তৈর্ম্মণিভির্ব্বিরেজু-
রজ্জূর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ৩৫॥

যাহারা দধিমন্থনে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে যে সকল মণিবলয় ছিল তাহাতে প্রদীপের ছটা লাগিয়া অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। মন্থনকালে রজ্জুআকর্ষণ, বিকর্ষণ করাতে নিতম্বপ্রদেশ স্তনোপবিস্থিত হার ও কর্ণস্থিত কুণ্ডল চঞ্চল হইয়াছিল। একে অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে গণ্ডস্থল অরুণিম, তাহাতে চঞ্চল মণিকুণ্ডলের আভা লাগিয়া আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই দধিমন্থনসময়ে শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাংশ গান করিতেছিলেন। সেই গানের ধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এমন তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বর্গবাসী দেবদেবীগণের কর্ণেও সেই গানধ্বনি প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ ধ্বনি দশদিগ্‌বাসী লোকসকলের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক নিখিল দুঃখ বিনাশ করিতেছিল। কেবল যে দুঃখই নাশ করিতেছিল তাহা নয়, নিখিল দুঃখের মূল কর্ম্ম, এবং কর্ম্মমূল বাসনাকে পর্য্যন্ত বহুদূরে নিক্ষেপ করিতেছিল।

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে ব্রজদ্বারি ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্॥ ৩৬॥
অক্রূরঃ আগতঃ কিম্বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ৩৭॥
কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্॥ ৩৮॥
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ॥ ৩৯॥

উদিত হইলে জগতের অন্ধকার নাশ হয় বলিয়া অথবা ভগবৎপূজার অধিষ্ঠান জন্য ভগবান্ বলিয়া যে সূর্য্যদেব অভিহিত হয়েন, কিম্বা শ্রীভগবান্ যেমন ভক্তগণের নিখিল-দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকেন, বহুদিন পর্য্যন্ত যাহারা শ্রীকৃষ্ণের কোনও সংবাদ না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া আছেন; সেই ব্রজবাসিজনকে আজ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাইবার অবসর দান করিবেন বলিয়া শ্রীশুকমুনি সূর্য্যদেবকে "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—ভগবান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলে ব্রজবাসী পুরুষগণ ব্রজরাজের দ্বারে অবস্থিত স্বর্ণরথখানি দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতেছিলেন "এই রথখানি কাহার? কোথা হইতেই বা আসিল? কে-ই বা ব্রজে লইয়া আসিল?" এই অবসরে উৎকণ্ঠাপ্রধানা কোন কোনও গোপী সেথায় আসিয়া মিলিত হইয়া আক্ষেপ করতঃ বলিতেছিলেন—যে অক্রূর কংসের উদ্দেশ্য সফল করিতে ব্রজে আসিয়াছিল, সেই কি আবার ব্রজে আসিয়াছে? যে ক্রূরচেতা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরী লইয়া গিয়াছে, আবার কি উদ্দেশ্যে সে ব্রজে আসিল? সখীগণ! পূর্ব্বে মধুনামে এক দৈত্য ছিল, সেই দৈত্যের পুরী বলিয়া মথুরার একটী নাম মধুপুরী। বর্ত্তমানে সেই পুরীর অধিকারী ও স্বভাবে দৈত্য বলিয়া কংসও মধু নামে অভিহিত। তাহারই পুরীতে কি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে নেওয়া উচিত হইয়াছে? যাহার নয়নকমলের সৌন্দর্য্যবিশেষ দর্শন করিবামাত্র সর্ব্ব-সন্তাপ দূর হইয়া থাকে, এমত শ্রীকৃষ্ণকে নয়নদৃষ্টির দূরেই নেওয়া উচিত নয়, কেমন করিয়া তাহাকেই ব্রজের বাহিরে অসুরের পুরীতে লইয়া গেল? যদি কংসের উদ্দেশ্য সাধন করাই তাহার সঙ্কল্প ছিল, তাহা হইলে আমাদের পুত্রমধ্যে

কাহাকেও কেন নিল না? যদ্যপি নিজপ্রভু কংসের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়াছিল, কিন্তু শ্রীনারায়ণের অপার করুণায় সেই কংসই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণের তো কোনও দোষ নাই! দুষ্টচিত্ত কংস নিজকৃত পাপের ফলে নিজেই মরিয়াছে। মহতের প্রতি যে জন দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই দৌরাত্ম্যে মহতের কেশ মাত্রেরও ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ নিজকৃত দৌরাত্ম্যে নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কংসের মনে অভিসন্ধি ছিল যে, ব্রজে নানারূপ বিঘ্ন আচরণ করিয়াও সফলমনোরথ হইতে না পারায় অবশেষে যজ্ঞের ছলে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সকল অসুরগণ মিলিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবে। শ্রীনারায়ণের প্রসাদে তাহার বিপরীত হইয়াছে। অক্রুর নিজের কোনও অভীষ্টবিশেষ সিদ্ধির জন্যই মথুরাতেই শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া পুনরায় সে আগমন করিয়াছে। হে সখীগণ! তাহাতে আমার মনে হয় পূর্ব্বে যাহার (অক্রুরের) ব্যবহারে কংস প্রীত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব বশতঃ এখন কংস প্রেত হইয়াছে কি না। এখন সেই প্রেতের ঋণ পরিশোধের জন্য কি আমাদিগের মাংসের দ্বারা পিণ্ড রচনা করিয়া প্রেতকে সমর্পণ করিবে? রথ দর্শন করিবামাত্র অক্রুরের কথা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। কারণ চুণ খাইয়া যাহার জিহ্বা পুড়িয়াছে, তাহার দধিদর্শনেও চুণ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। ব্রজরমণীগণ এই প্রকার পরস্পর বলিতে থাকিলেন। শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু আহ্নিকাদিকৃত্য শেষ করিয়া সেই সকল কথা শুনিয়াও নাশোনার মত অনাদর করিয়া যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপিকাগণ সমঃদুঃখে পরস্পর মিলিত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই একান্ত বিশেষ স্থান অন্বেষণ করিয়া তথায় চলিয়া গেলেন। এস্থানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীউদ্ধব মহাশয় আহ্নিকাদি কৃত্য শেষ করিয়া সেই দিবস আর ব্রজে প্রবেশ করেন নাই। কারণ ব্রজ বিস্তারে চারিক্রোশ এবং দৈর্ঘ্যে আটক্রোশ। তন্মধ্যে নানাপ্রকার গৃহস্থগণের বাস। অতএব সেই ব্রজে একত্র সকল শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করা সর্ব্বথাই অসম্ভব, কারণ একসঙ্গে তিনশত কোটী ব্রজাঙ্গনার পক্ষে উদ্ধবের দর্শন হইতে পারে না। বিশেষতঃ দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকা স্বয়ংই বলিবেন—"অগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণাম্" অর্থাৎ "সে আমাদিগকে গৃহ ছাড়াইয়া বৃক্ষতলে বসাইয়াছে। এইরূপ উক্তিতে এবং সমাগত অতিথি উদ্ধবকে কেবল একখানি আসন প্রদান করিয়া সৎকার করিয়াছিলেন ও বনমধ্যে ছিলেন বলিয়াই সহসা ভ্রমর-আগমনের সম্ভাবনাও করা যায়। আরও বলিবেন "রহস্যপৃচ্ছন্" অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধবও বলিবেন "অহং ভর্ত্তুর্-হস্করঃ" অর্থাৎ আমি নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অন্যের নিকটে অপ্রকাশ্য রহস্য আদেশই প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই-সকল উক্তি থাকায় এবং ব্রজের পথে অথবা গৃহে এই ব্রজাঙ্গনাগণের একত্র সমাবেশ সর্ব্বথাই অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন, সেইদিন হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজদেবীগণ বনমধ্যে নিজ নিজ অভীষ্ট-দেবদেবীর নিকটে সঙ্গিনীগণসহ তপস্বিনীগণের মত একত্র বাস করিতেছিলেন, এবং বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া নিজ নিজ অভীষ্টদেবের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। শ্রীউদ্ধব মহাশয় তথায় যাইয়া তাঁহাদের চরণসমীপে মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব অতিভক্তিযুক্তমানসে যখন শ্রীলব্রজদেবীগণের নিকটে মিলিত হইয়াছিলেন, তখন কিঞ্চিৎদূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিলেন—

ক্ষীণাঙ্গাঃ স্রস্তকেশাঃ মলশবলপটাঃ প্রজ্জ্বলৎ সন্নিকৃষ্টাঃ
দৃষ্টাস্তা জাতবেদস্ততয় ইব বৃতা ধূমভস্মাদিভির্যা।
কিঞ্চ ব্যাগ্রাক্ষিযুগ্মা দলদধরদলশ্বাসবর্গা মুখান্তঃ-
শোষা যোষা মৃগাণামিব দবদবনাস্রস্তনেত্রা বিমৃষ্টাঃ ॥ ৩ ॥

গোপালচম্পূ উঃ।১১। পূরণ

ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, কেশকলাপ এলোথেলো, মলিন ও বিবিধ বর্ণের বস্ত্র পরিধান, ধূমভস্মাদি-দ্বারা আবৃত অগ্নিসমূহের ন্যায় তাঁহাদের অঙ্গকান্তিচ্ছটা কিছু নিষ্প্রভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠায় নয়নযুগল সুচঞ্চল, দীর্ঘনিশ্বাসরাশিতে অরুণবর্ণ অধর বিদলিত হইতেছে, শ্রীমুখের মধ্যস্থল শুকাইয়াছে।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর

২য় বর্ষ | আষাঢ়—১৩৪০ | ১১শ সংখ্যা

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

(১৭)

[শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শুভ আবির্ভাব—বর্ত্তমান যুগের মঙ্গলপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। অদূর ভবিষ্যতে, জড়বাদ—জড়ধর্ম্মের চিতাভস্মের উপর সমস্ত জগৎব্যাপী যে এক বিরাট আত্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে,—যাহার অচিন্ত্য প্রভাবে মানব-হৃদয়ের সকল দুঃখ,—সকল দৈন্য,—সকল বিষাদ,—সকল বিদ্বেষ—সকল কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া গিয়া, এক অমল—অখণ্ড ভগবৎ-প্রীতির পবিত্র বন্ধনে সমস্ত জগত একসূত্রে সংবদ্ধ হইবে, তাহারই নাম শ্রীগৌরাঙ্গের "প্রেমধর্ম্ম";—তাহাই হইবে বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম।

যে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় কেবল ভারতবর্ষ নহে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর দ্বারা আলোড়িত হইয়া,—মথিত সমুদ্র হইতে অমৃতের অভ্যুদয়ের পর তাহা যেমন আপনিই সুশান্ত হইয়া যায়,—সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্ম "প্রেমধর্ম্মের" অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের সকল চাঞ্চল্য—সকল অস্থিরতা—সকল গ্লানি প্রকৃষ্টরূপে প্রশমিত হইয়া যাইবে,—তাহারই নাম "শ্রীগৌরলীলা"।

শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা যতই অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব,—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিগূঢ় রহস্য জগতের সমক্ষে যতই অধিকতররূপে উদ্ঘাটিত হইবে,—বর্ত্তমান জগত ততই পরমানন্দ ও পরম-শান্তির সন্নিকটবর্ত্তী হইবে, ইহা আমাদিগের সুদৃঢ়রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। পূর্ণতম জীব-স্বরূপের যাহা পূর্ণতম স্বধর্ম্ম—তাহাই শ্রীগৌর-লীলা-রূপ কারণের কার্য্য বা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিকল্পে একবার করিয়া একযোগে এই জগতে সার্ব্বজনীনভাবে স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের শ্রীগৌর-লীলা এই জগতে অপ্রকট হইলেও, সেই লীলার পরমমঙ্গলময় ও বিরাট প্রতিক্রিয়া সমস্ত পৃথিবীর উপর সূক্ষ্মভাবে সম্প্রতি কেবল মাত্র আরব্ধ হইয়াছে, যাহার অব্যর্থ প্রভাব জগতের উপর ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিবে; এবং এই প্রেম-ধর্ম্মই বর্ত্তমান কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জীবের শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম্ম-রূপে আত্ম-মহিমায় আপনিই সমুদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, আমাদের এই মনুষ্যলোকের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে দেবলোকের

একটি যুগ হইয়া থাকে, যাহাকে এক চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ কহে। এই প্রকার প্রায় সহস্র চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ ব্রহ্মার একটি দিবস পরিমিত কাল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; যাহাকে "কল্প" নামেও অভিহিত করা হয়। এইরূপ এক একটি কল্পের অন্তর্গত চতুর্দ্দশটি মন্বন্তর; এবং একাত্তরটি চতুর্যুগ আবার এক একটি মন্বন্তরের অন্তর্গত। উক্ত শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসারে শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনা এইরূপ;—

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগ জানি।
এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥
একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

কলিযুগের পরিমাণ আমাদের বর্ষ-পরিমাণের ৪,৩২০০০ বর্ষ; দ্বাপর যুগের ৮,৬৪০০০, ত্রেতাযুগের ১২,৯৬০০০, ও সত্যযুগের ১৭,২৮০০০ বর্ষ; তাহা হইলে আমাদের মনুষ্য-লোকের ৪৩২,০০০০০০০, চারিশত বত্রিশকোটী বর্ষ পরিমিত কালে এক "কল্প" হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার একটি দিন, ও তদনুরূপ দিনের ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস ও তদ্রূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার একটি বর্ষ হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষে ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ; এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধকাল বা শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল স্মরণ করিতেই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি; কিন্তু যাঁহার চক্ষের উন্মেষ ও নিমেষকাল মধ্যে এতাদৃশ ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে,—সেই নিত্যেরও নিত্য—অনাদিরও আদি—সর্ব্ব-কারণের কারণ শ্রীভগবানের গুণ-লীলা-মহিমাদি সমস্তই, যে ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে তদপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীভগবানের অসীম মহিমা স্মরণ করিয়া, তাই বৈষ্ণবকবি লিখিয়াছেন,—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাপত
সাগর লহরি সমানা॥"

(বিদ্যাপতি)

এতাদৃশ শ্রীভগবল্লীলা-মহিমা শ্রবণে আমরা অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হইতে পারি, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন জীবের পক্ষে অপরিচ্ছিন্ন ও অচিন্ত্য শ্রীভগবল্লীলা ও মহিমাদি বিষয়ে অবিশ্বাসী হইবার কোনও অধিকার নাই,—ইহাও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শাস্ত্র-দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, ব্রহ্মার এক দিনে বা এককল্পে—সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে শ্রীভগবান্ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, ও কৃষ্ণ এই বর্ণ ও এই নাম ধারণ পূর্ব্বক অংশে ও আবেশে যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

(লঘুভাগবত)

কল্পান্তর্গত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে ৯৯০টি চতুর্যুগ সম্বন্ধে যুগাবতার-আবির্ভাবের ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু প্রতিকল্পের প্রায় মধ্যবর্ত্তী সময়—বৈবস্বত নামক সপ্তম-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ উক্ত সহস্র চতুর্যুগ মধ্যে একমাত্র অসাধারণ লক্ষণান্বিত। এই বিশেষ চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য ও ত্রেতাযুগের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সাধারণ চতুর্যুগের ন্যায় "শুক্ল" ও "রক্ত" যুগাবতার-কর্ত্তৃক উক্ত সত্য ও ত্রেতাযুগে যথাক্রমে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই চতুর্যুগের কেবল দ্বাপর ও কলি যুগেরই বৈশিষ্ট্য আছে। কল্পান্তর্গত সহস্র দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যে কেবলমাত্র বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-সংখ্যক চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলিযুগকেই অসাধারণ লক্ষণে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কারণ এই যুগ দুইটিতে যথাক্রমে "শ্যাম" ও "কৃষ্ণ" বর্ণ ও নাম বিশিষ্ট যুগাবতারের পরিবর্ত্তে "কৃষ্ণ" ও "পীত" যুগাবতারের বিষয় শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সহস্র চতুর্যুগের মধ্যে যুগাবতার সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—কেবল এই একটি অসাধারণ চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপর ও কলি-বিশেষেই—প্রতিকল্পে একবার করিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। উক্ত অসাধারণ চতুর্যুগের অসাধারণ যুগাবতার-সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে শ্রীগর্গোক্তি; যথা—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

এই অসাধারণ যুগাবতার বিষয়েই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিযুগে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সর্ব্ব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম॥"

এই অসাধারণ যুগের যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৯ হইতে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকরভাজনকর্ত্তৃক সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে;—বাহুল্য-ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

"কৃষ্ণ" ও "পীত" এই যে অসাধারণ যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন, ইঁহারা অবতার নহেন—সর্ব্বাবতার-অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই উক্ত বিশেষ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় আবির্ভাব-বিশেষে তৎসন্নিকৃষ্ট কলিযুগের প্রারম্ভে "পীত" অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। সর্ব্বাংশী স্বয়ংভগবানের অবতরণ-কালে সেই সেই যুগে, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য যুগাবতারের আর প্রয়োজন হয় না বলিয়া, সেই সেই যুগাবতার, সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। "স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব" বা পূর্ণতম ভগবানের অবতরণ-কালে কেবল যুগাবতারই নহেন,—বিলাস ও স্বাংশাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপই যে তৎসহ মিলিত হইয়া থাকেন,—এই শাস্ত্রনির্দ্দেশ, শ্রীচরিতামৃতকার সহজ কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন;—

"পূর্ণ অবতার অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর।
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥"

সুতরাং যে দ্বাপরযুগে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন তৎকালের "শ্যাম" বর্ণাখ্য যুগাবতার যেমন শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলিত থাকেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, তৎকালেও সেই কলিযুগের "কৃষ্ণ"-বর্ণাখ্য যুগাবতার স্বর্ণ-গৌর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে একীভূত হয়েন—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই কারণে কল্পের মধ্যে কেবল সেই দ্বাপর ও কলিযুগবিশেষে সাধারণ যুগাবতার-কর্ত্তৃক সাধারণ যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় না। এই অসাধারণ দ্বাপর-যুগে পূর্ণতম শ্রীভগবান্—জীবের পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা "প্রেমধর্ম্ম" জগতে প্রকট করেন এবং নিজ আবির্ভাব-বিশেষে তৎপরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভেই পুনরায় প্রকট হইয়া সেই পূর্ব্বসঞ্চিত "প্রেম-ধর্ম্ম" তদীয় লীলাকালে বিপুলভাবে বিতরণপূর্ব্বক আবার সেই প্রেমধর্ম্মের বীজ এই কলিযুগের ভাবী জীবগণের জন্য জগতে সঞ্চার করিয়া থাকেন,—যাহার প্রতিক্রিয়ায় গৌরলীলা-অপ্রকটের কয়েকশতাব্দী পরেই সূক্ষ্মাকারে সঞ্চারিত সেই প্রেমধর্ম্ম-বীজ জগতের উপর ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত ও সেই কলিযুগের অবশিষ্ট কাল—সত্যযুগ হইতেও শ্রেষ্ঠ এমন কোনও এক "প্রেমযুগে" পরিণত করিয়া থাকে। প্রতি কল্পে অর্থাৎ ৭৩২,০০০০০০০ কোটী বৎসরের মধ্যে (ব্রহ্মার রাত্রিকাল বা কল্পান্ত-প্রলয়কাল ধরিলে ইহার দ্বিগুণ-পরিমিত বর্ষের মধ্যে) জীবের পূর্ণতম স্বধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন-ভাবে প্রাপ্ত হইবার এরূপ পরিপূর্ণ সুযোগ, জগতের ইতিহাসে কেবলমাত্র একবার সংঘটিত হয়, এবং আমাদিগের পক্ষে বিশেষ আশার ও আনন্দের কথা এই যে—বর্ত্তমান যুগই সেই অসাধারণ কলিযুগ।

শস্য উৎপাদনের পক্ষে ভূমিকর্ষণাদি সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও, যেমন উহা শস্য উৎপাদন উদ্দেশ্যই বহন করিয়া তৎকার্য্যের সহায়ক হয়,—কিন্তু বীজবপনই শস্য উৎ-পাদনের সাক্ষাৎ কারণ, সেইরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের মৎস্য-কূর্ম্মাদি ও শুক্ল-রক্তাদি নিখিল অবতারসকল ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, যে সমস্ত লীলা প্রকাশ করেন, ক্ষেত্র-নির্ম্মাণের ন্যায় সেই যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তণাদি কার্য্যসকল জগতে প্রেম-শস্য উৎপাদনের কারণ না হইয়াও পরম্পরায় উহা প্রেম-প্রবর্ত্তন-কার্য্যেরই সহায়ক হয়,—প্রেমশস্য উৎপাদন-উদ্দেশ্যই বহন করিয়া থাকে; কিন্তু যে মুখ্য উদ্দেশ্য বহন করিয়া সকল অবতারের—সকল লীলার প্রকাশ,—পৃথিবী-ব্যাপী সেই প্রেম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনকাল সমাগত হইলে অবতারী

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজের সহিত প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া প্রেম-লীলার প্রকাশ করেন। জগতে সাক্ষাৎ প্রেম-ধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ংভগবান্ ভিন্ন অপর কোনও অবতার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় না। তাই বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে প্রেম-লীলা ব্রজে প্রকাশ করেন, সেই প্রেমের বীজ পরবর্ত্তী কলিযুগ-বিশেষে বা "প্রেমযুগে" বিতরণ ও রোপন করিবার ইচ্ছায়, উহা তখন জগতের উপর সঞ্চিত রাখিয়া, তিনি কিয়ৎ-কালের জন্য সাধারণ-লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েন। অতঃপর জীবজগতের পক্ষে কল্পের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম শুভকাল,—সেই পূর্ণতম আত্মধর্ম্ম বা প্রেমভক্তি-দানের প্রকৃষ্ট সময় সমাগত হইলে,, তৎকার্য্যের যাহা একমাত্র অনুকূলভাব,—সেই মহাভাব-স্বরূপিণী নিজ কান্তা শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা আবৃত অতএব পূর্ণতম ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া, পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ব্ব-সঞ্চিত সেই প্রেমবীজ লইয়া, এই কলিযুগের প্রথম-সন্ধ্যাংশে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপে শ্রীনব-দ্বীপ ধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রের সেই নিগূঢ়-রহস্য শ্রীচরিতামৃতকার নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

* * *

যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

* * *

আপনে করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে॥

* * * *

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপনে ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়॥

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌর-লীলা অপ্রকট হইলেও, যে প্রেম-বীজ সেই লীলার মধ্যে সঞ্চার করা রহিয়াছে, তাহারই অব্যর্থ প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক "প্রেমধর্ম্মের" বিরাট প্লাবনে পরিপ্লাবিত করিবে।

ভবিষ্যতের কোটি জগাই মাধাই যাহা হইতে সেই প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, এক জগাই মাধাই উদ্ধারের ভিতর তাহার সূচনা করা রহিয়াছে। যে প্রেমবীজ—অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে অদূর-ভবিষ্যতে—তাহার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখার ছায়ায় কোটি কোটি সন্তপ্ত জগাই মাধাইকে সুশীতল করিবে,—এক জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলায়, ভবিষ্যতের সেই বিরাট্ কার্য্যেরই কারণ বা বীজ সঞ্চারিত রহিয়াছে ; নচেৎ তৎকালীন সমষ্টির অভিধানে ব্যষ্টিগত-ভাবে জীবোদ্ধারপ্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়। অদূর ভবিষ্যতে মহদপরাধী কোটী গোপাল-চাপাল যে প্রণালীতে উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ আত্মাকে পূর্ণ করিয়া লইবে,—এক গোপাল-চাপাল-উদ্ধার-লীলায় তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের কোটীশ্বর ইন্দ্রসম-ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসমা রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া, শ্রীভগ-বানের মহা মাধুর্য্যের আকর্ষণে যে ভাবে ছুটিয়া চলিবে, প্রকটলীলায় সে কার্য্যের কারণ বা বীজ, এক রঘুনাথের বিষয়ত্যাগের মধ্যে সঞ্চার করা রহিয়াছে ; নচেৎ নিত্য-সিদ্ধ পরিকর শ্রীরঘুদাস গোস্বামীর পক্ষে বিষয়ত্যাগের গৌরব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভবিষ্যতের উচ্চপদ-গর্ব্বিত—প্রতিষ্ঠামদ-দর্পিত কোটী কোটী জন যে বিবেক ও বৈরা-গ্যের অমোঘ-স্পর্শে, প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাদিকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় বোধ করিয়া, ভগবচ্চরণসেবাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিবে, প্রকটলীলায় এক রূপ-সনাতনের গৌড়রাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সেই কার্য্যের কারণ বা বীজ বপণ করা রহিয়াছে ; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী তাঁহারা—

এ ত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। অদূর ভবিষ্যতের কোটী রাজেশ্বর, রাজলক্ষ্মীকর্ত্তৃক নিয়ত সেবিত হইয়াও তৎপরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবকগণের চরণসেবাই অধিকতর সুখকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহার বীজ বা কারণ এক প্রতাপরুদ্র উদ্ধার লীলায় সঞ্চার করা রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেও কোটী জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া যে ভাবে ভক্তিদেবীর চরণতলে লুটাইয়া দিবে, প্রকটলীলায় এক প্রবোধানন্দ ও সার্ব্বভৌমের পরিবর্ত্তনে তাহার কারণ বা বীজ সঞ্চার করা রহিয়াছে; নচেৎ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহারা, তাঁহাদের জ্ঞানের অহঙ্কার কোনদিনই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটী কোটী অবনত—অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছাদি জাতি যে নামযজ্ঞের বিশাল প্রাঙ্গনে একত্রিত ও মিলিত হইয়া পরম শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদি দেবতারও বন্দনীয় হইবে, শ্রীগৌরলীলায় এক হরিদাসের হরিনামসাধনে সেই বিরাট কার্য্যের কারণ বা বীজ সুরক্ষিত হইয়াছে; নচেৎ ব্রহ্মহরিদাসের যবনত্বপ্রাপ্তি,—ইহা সুবর্ণের লৌহত্বপ্রাপ্তির ন্যায় অসম্ভব। এইরূপ শ্রীগৌরলীলার অনেক কার্য্যই সেই সময়ের জন্য আবশ্যকীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র; কিন্তু ঐ সকল লীলার মুখ্য প্রয়োজনীয়তা—যথার্থ সার্থকতা—শ্রীগৌর-আবির্ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত এই কলির ভাবী জীবগণের মহা ভাগ্যোদয়ের জন্য। সত্যযুগের জীবগণের পক্ষেও যাহা দুর্লভ,—কল্পের মধ্যে—আর কোন যুগে—কোনও জীবের পক্ষে যাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই,—বর্ত্তমান কলিযুগের ভাবী জীবগণ সেই অবিচিন্ত্য-সৌভাগ্যের কারণ লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সেই-ব্রজকিশোরীর অনুগত প্রেম—যাঁহার আবির্ভাব বশতঃ এই কলিহত জীবের ভাগ্যেও প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছে—সেই প্রেমদাতাশিরোমণি পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সহিত বর্ত্তমান জগতের যে কি মহতী আশা ও মহান্ আনন্দের বার্ত্তা বিজড়ীত রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ে হৃত হইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

বিবেক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চাকী, কাব্যনিধি

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য ধরাতলে।
অভিনব রূপ তব অবনী মণ্ডলে॥
তব গতি যথা তথা না হয় কখন।
দেবতাবাঞ্ছিত পথে তোমার গমন॥
বিপদে হইয়ে বন্ধু দাও উপদেশ।
তোমার অসীম গুণ নাহি তার শেষ॥
তব দয়া না হইলে এই ধরামাঝে।
কোনজন শান্তি নাহি পায় কোন কাজে॥
তোমার সমান কেহ নাই ত্রিভুবনে।
সুবুদ্ধির রূপে রহ মানবের মনে॥
তোমার শাসনদণ্ড সর্ব্বত্র সমান।
সারা বিশ্ব জোড়া তাই তব জয় গান॥
তোমার গুণের কভু না হয় তুলনা।
'পুণ্যপথ মানবের' তোমার রচনা॥
পরম পণ্ডিত তুমি বুদ্ধির সাগর।
সুন্দর সুবেশ ধর রূপ মনোহর॥
তুমি যারে কৃপা করে রাখ পুণ্যপথে।
সেই জন পুণ্যবান হয় এ জগতে॥
তোমার দর্শনে পাপ নাহি থাকে আর।
জ্বালাও জ্ঞানের আলো অবনী-মাঝার॥
চরণে তোমার মোর এই নিবেদন।
পাপ পথে যেন নাহি যায় মোর মন॥
সদা তুমি দয়া করে রেখ চরণেতে।
সুপথে কামনা যেন জাগে মোর চিতে॥
পুণ্যপথে সদা তুমি রেখ মম মতি।
ইহাই কামনা আমি করি নিতি নিতি॥

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ)

আজন্ম তিনি উত্তম ভোজ্যদ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেন নাই ও ছিন্ন-কন্থাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের আবরণ ও আভরণ হইয়াছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনবাসকালে যাহা কিছু প্রাণধারণের জন্য তিনি গ্রহণ করিতেন, তাহাতেও তাঁহার তীব্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইত। শ্রীস্তবাবলীতে উক্ত আছে—,

'নিভৃত-বিপিন-লীলাঃ কৃষ্ণবক্ত্রং সদক্ষ্যা
প্রপিবথ মৃগকন্যা যূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা-
প্যুদর ভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্।'

অর্থাৎ, হে মৃগকন্যাগণ, তোমরাই ধন্য ; যেহেতু নির্জ্জন-কাননে ক্রীড়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদনসুধা নেত্রদ্বারা সর্ব্বদা পান করিয়া থাক। এই সারমেয়ী (কুকুরী) সদৃশী আমি ক্ষণকালের জন্যও ঐ মুখচন্দ্র দর্শন করিতে পাইলাম না, যেহেতু উদরভরণ কার্য্যে বারম্বার ভ্রমণ করিয়া হত হইলাম। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া জগতে জ্ঞানপরিপাটীর আদর্শ শিক্ষা দান করিয়াছেন। ও সেইজন্য আজও তিনি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র রূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

শ্রীমৎ রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ ছত্রে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। ইহাও তাঁহার পক্ষে ভজনের উদ্বেগজনক বলিয়াই মনে হইল ; কারণ ছত্রে নির্দ্দিষ্টসময়-মত গমন না করিলে ভিক্ষালাভ অসম্ভব হইত। ইহা তাঁহার জ্ঞানাবেশের বিঘাতক। এইজন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে সকল প্রসাদান্ন বিক্রীত হইত না, পসারিগণ দুই তিন দিন পরে উহা পচিয়া যাইত বলিয়া সিংহদ্বারে গাভী-গণের সম্মুখে ঢালিয়া দিত। সেই পর্য্যুসিত অন্নের দুর্গন্ধ-নিবন্ধন গাভীগণ ভোজন করিতে সমর্থ হইত না, কিন্তু শ্রীমৎ রঘুনাথ উহার মধ্যে যে অন্নের দৃঢ় কঠিনাংশ প্রাপ্ত হইতেন তাহাই জল দিয়া ধৌত করিয়া লবণ সহকারে গ্রহণ করিতেন।

একদিন শ্রীস্বরূপ রঘুনাথকে এইরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু প্রার্থনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন—

ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ?

গোবিন্দের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই বার্ত্তা শুনিয়া একদিন স্বয়ং উপস্থিত হইলেন ও সেই প্রসাদ এক কণা ভক্ষণ করিলেন। পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে যাইলে শ্রীস্বরূপ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

'প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ;
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই'।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর মর্ম্মার্থ সমুদ্রকোটীগম্ভীর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনের আনুকূল্যে ভক্তের ভোগত্যাগে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। শুষ্ক বৈরাগ্যে তাঁহার আদর নাই কিন্তু প্রীতিপূর্ব্বক অবিচারে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য ভক্ত যে স্বসুখাভিলাষ বিসর্জ্জন করেন, তাহাই শুদ্ধ-ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া শ্রীভগবানের পরম আস্বাদ্য হইয়া থাকে।

ইহাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যুক্তবৈরাগ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঈদৃশ বৈরাগ্যের মূলে

আছে প্রিয়তম-বস্তুর প্রতি প্রেম। সেই প্রাণের প্রাণ যিনি, তাঁহার অভাব-নিবন্ধন জগতের কোন সুখভোগেই ভক্তের রুচী থাকে না। পতিবিরহিণী সতীর যেরূপ প্রিয়বিরহই সকল বিষয়সুখে বিরাগের হেতু, ইহাও তদ্রূপ। কোথা দিয়া রাত্র যায়, দিন আসে তাহা তাঁহার বোধের বিষয়ীভূত হয় না; কারণ পতির চিন্তায় তিনি একতানতা লাভ করায় অন্যবিষয়ে তাঁহার মন গমন করিতে অসমর্থ। সেইরূপ শ্রীমৎ রঘুনাথের প্রীতিবাসিত বৈরাগ্য আচরণ দেখিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্তরে আনন্দবিশেষই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীস্তবাবলীতে শ্রীমৎ রঘুনাথ আপন উদ্ধারকাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কু-জনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।

অর্থাৎ যিনি আমার মত পতিত কুজনকেও সম্পত্তি ও কলত্ররূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ অন্তরঙ্গজন শ্রীস্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ও বক্ষঃস্থলের গুঞ্জামালা ও প্রিয় গোবর্দ্ধনশীলা আমাকে দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমৎ রঘুনাথ যখন শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অসীম করুণা ও অনন্ত দিব্যলীলা-স্মৃতি তদীয় হৃদয়ে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে ভাবাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীস্তবাবলী গ্রন্থখানি শ্রীরাধাকুণ্ডেই শ্রীপাদ প্রণয়ন করেন। ইহাতে নীলাচলের অতীত স্মৃতি ও শ্রীবৃন্দাবনবাসের পর যে যে লীলাবিশেষ শ্রীমৎ রঘুনাথ অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ আছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে শ্রীমৎ রঘুনাথ তদীয় বিগাঢ়-বিরহবেদনা-বিধুর হইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন আগমন করেন। ইহাই তাঁহার জন্য 'প্রভুদত্ত' স্থান। যখন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করেন, তখনই শ্রীমৎ রঘুনাথ মনে মনে তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন যে,—

'শিলা দিয়া মোরে গোঁসাই সমর্পিল গোবর্দ্ধনে
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা চরণে'।

সেইজন্য শ্রীগোবর্দ্ধন-সমীপস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীপাদ কখনও ত্যাগ করেন নাই। জীবনের শেষদিন অবধিই তথায় অবস্থান করিয়া জগতে রাগ ও ভজনমার্গের ঋত্বিগ্-রূপে তিনি বিরাজিত ছিলেন।

শ্রীস্তবাবলীতে উল্লেখ আছে,—

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ

যখন শ্রীমৎ রঘুনাথ নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসেন তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় ন্যূনাধিক ৪০ বর্ষ হইবে; কারণ যখন তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন তখন প্রায় তাঁহার বয়স বিংশ বৎসর হইতে পারে। তদনন্তর শ্রীক্ষেত্রে ষোড়শ বৎসর বাস করিলে তাঁহার বয়ক্রম পূর্ব্বোক্ত রূপই হইবার সম্ভাবনা। শ্রীরাধাকুণ্ডই তাঁহার অন্ত্যলীলাস্থলী। এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি বহু দীর্ঘ দিন বাস সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহবেদনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ গোস্বামীদ্বয়ের উপদেশ ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম কারতে বিরত হইয়াছিলেন।

শ্রীস্তবাবলীতে উক্ত আছে,—

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্ব্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেন দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা'।

অর্থাৎ যদি কেহ বলে যে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহাকে ভৃগুপাত হইতে রক্ষা করিয়া অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছেন। সেই জন্য শ্রীমৎ রঘুনাথ বলিতেছেন :— যদি দেহত্যাগ না হয় তবে তাঁহার জীবনোপায়স্বরূপ শ্রীরূপের কোন দোষ নাই। কারণ সেই দেহ বিধাতা বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অথবা আমি বিশেষ বিচার দ্বারা ইহার অন্যহেতুও দেখিতেছি। যেহেতু এই যে বিধাতা দেখিলেন—আমার দেহপাত যদি, হয় তাহা

হইলে এত হৃদয়বিদারক ক্লেশনিবহ কে আর সহ্য করিবে? অতএব দুঃখভোগের জন্যই বিধাতা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতেও এইরূপ দেখা যায়:—

'চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ি করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরিগোবর্দ্ধনে
দুই গোঁসাঞি তাঁহারে দেখিলা।
ধরি রূপ সনাতন, রাখিলা তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা।'

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিরহে শ্রীরঘুনাথের হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত হইয়াছিল, তাহা শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রীতিরস-নিষেক দ্বারা কিছুদিনের জন্য ঈষৎ আরোগ্য লাভ করিয়া-করিয়াছিল। শ্রীরূপগোস্বামিপাদই যে তাঁহার রাগ-মার্গের গুরু সে বিষয়ও শ্রীস্তবাবলীতে দৃষ্ট হয়—

'যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপ পূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা-সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ'।

অর্থাৎ হে বৃন্দাবনেশ্বরি, যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয়া রূপমঞ্জরী আমাকে রাগমার্গে শিক্ষা-দান করিয়া নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণকমলের অলক্তক সন্দর্শন করিতে অভিলাষ সঞ্জাত হইয়াছে। তদীয় সেবানিষ্ঠা ও সংকল্পের কথাও শ্রীস্তবা-বলীতে উক্ত আছে,।

'গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে, ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মমরতিঃ।

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে, মন্ত্রে, নামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনে, স্বরূপ গোস্বামীতে, শ্রীরূপ গোস্বামীতে, গণাগ্রগণ্য শ্রীসনা-তন গোস্বামীতে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরা-ধামে, বৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তে, ও ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার পরম অনুরাগ বিদ্যমান থাকুক্।

আরও উক্ত আছে,—

'ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ'।

অর্থাৎ-ব্রজে উৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা অহঙ্কারশূন্য হইয়া নিয়ম-সহকারে আমি জীবন নির্ব্বাহ করিব। গোবর্দ্ধনে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে আমি বাস করিয়া অন্তিম-সময়ে কিন্তু শ্রীজীব প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয় রাধাকুণ্ডতীরে আমি প্রাণত্যাগ করিব।

এইরূপ নিয়মপূর্ব্বক শ্রীদাস গোস্বামিপাদ শ্রীকুণ্ড-তীরে ভজন ও বাস করিয়াছিলেন ও তাহার বহুদিন-সঞ্চিত আশালতিকা তদীয় প্রাণেশ্বরী, শ্রীরাধার কৃপা-বারি-সেচনে ফলবতী হইয়াছিল। এই শ্রীকুণ্ডতটভূমিতে তিনি শ্রীরাধাবিরহে দিন যামিনী অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন ও স্বামিনীর শ্রীচরণকমলে নিত্য নব নব বিলাপকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তবটী পাঠ করিলেই সহৃদয় ভক্তগণ ইহা উপলব্ধি করিবেন। উহার শেষে উক্ত আছে,—

'অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়পুষ্টদাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতিরোদনৈঃ প্রচুর-দুঃখদগ্ধাত্মনা।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি হৃদি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিং মনাক্।

অর্থাৎ অয়ি প্রেমময়ি, তোমার প্রণয়পরিপূর্ণ দাস্য-লাভের আশায় তদীয় শ্রীচরণকমল হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখানলে দগ্ধীভূতা হইয়া অধিক ক্রন্দন-সহকারে এই বিলাপরূপ-কুসুমাঞ্জলি আমার দ্বারা সমর্পিত হইল। ইহা কিছুমাত্রও তোমার আনন্দবিধান করুক্।

কখনও শ্রীরাধিকার সন্দর্শন লাভ জন্য এইরূপ ব্যাকুল-প্রার্থনা করিয়াছেন:—

'মুদির-রুচির-বক্ষস্থলে মাধবস্থ
স্থিরচর-বরবিদ্যুদ্বল্লিবল্লিস্তরে
ললিত-কনকযূথী মালিকাবচ্চ ভান্তী
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মেঘের মত সুন্দর, স্নিগ্ধবর্ণ ও উন্নত বক্ষঃস্থলের শ্রেষ্ঠ অচলা চপলা-লতিকার মত ও মল্লিকা-কুসুম নির্ম্মিত শয্যায় একটী যুথিকা মাল্যের সদৃশ শোভিত হইয়া হে রাধে, ক্ষণকালের জন্য আমার নয়নের আনন্দ দান কর।

এসকল পদ্যে দ্রষ্টব্য এই যে, শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামিপাদের হৃদয়নিহিত ভাবোচ্ছ্বাস নির্ম্মল নির্ঝরের মতই প্রবাহিত হইয়াছে। সেইজন্য সাহিত্যের দিক্ দিয়াও দেখিলে এইরূপ প্রসাদগুম্ফিত ও মাধুর্য্যমণ্ডিত, ভাব-গম্ভীর ও কোমল ললিত কাব্য ও বিশ্বসাহিত্যে অতীব বিরল তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। কাব্যের যেসকল গুণাবলী প্রকটিত হইলে উহা সহৃদয়হৃদয়হারী ও কাব্যরসিকগণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, এখানে তাহার প্রচুর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। শব্দ ও অর্থালঙ্কারে, ছন্দে ও পদলালিত্যে, ভাবমাধুর্য্যে ও স্বতঃপ্রণোদিত-হৃদয়াবেগে, ও সর্ব্বশেষে ভাব রসধ্বনিতে শ্রীস্তবাবলী গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে অপূর্ব্ব অলৌকিক কাব্যকলাকৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা এক বিরাট্ বিপুল ব্যাপার। এক কথায় শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের যাহা প্রধান গুণাবলী তাহা শ্রীগ্রন্থে সুষ্ঠুরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যেরূপ (রমণীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য থাকিলে তাহার অলঙ্কারাদির প্রয়োজন হয় না, পরন্তু বৃক্ষের বল্কল ধারণেও তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা ও মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হয়, সেই-রূপ যে কাব্য ভাবপ্রচুর তাহা অলঙ্কারাদির দ্বারা তাদৃশ-ভাবে ভূষিত না হইলেও অপূর্ব্ব লালিত্য লাভ করে ও যাঁহারা প্রকৃত কাব্যরসিক তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

যে স্থলে প্রীতি নিরুপাধি সে স্থলে অঙ্গে অলঙ্কারাদি-ধারণ যেরূপ নিষ্প্রয়োজন বরং মিলনরসের বিঘাতকই হইয়া থাকে, সেইরূপ যে কাব্য ভাবসম্পদে গৌরবান্বিত ও প্রেম-প্রেরণায় উচ্ছ্বাসিত, তাহাতে বিশেষ অলঙ্কারাদি-আড়ম্বর রসাস্বাদের বিঘ্নই উৎপাদন করে। জগতের শ্রেষ্ঠকাব্যসমূহে এইরূপ উচ্চাদর্শই পরিদৃষ্ট হয়। তবে যে সকল মধুর শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা ভাবের স্বতঃপ্রেরণায় ঘটিয়া থাকে কিন্তু কোন কষ্টকল্পনার দ্বারা নহে।

(ক্রমশঃ)

বাসনা*

[শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী]

কৃষ্ণপদ-অরবিন্দে বস ওরে মন,
বচন কর হে বৈকুণ্ঠ গুণানু বর্ণন।
কর কর শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জন,
অচ্যুতের কথামৃত করহে শ্রবণ॥

মুকুন্দবদনে আঁখি রাখ আপনার,
ভকতের আলিঙ্গনে হৃদয় তোমার
চরণ কমল গন্ধ মুগ্ধ নাসিকায়,
প্রসাদের অধিকার রাখ রসনায়॥

প্রতি পদক্ষেপে কর তীর্থানুগমন,
শ্রীহরিচরণপ্রান্তে লুটাও হে শির।
অন্য কামনারে তুমি কর হে বর্জ্জন,
শ্রীহরির দাস তুমি ইহা জেন স্থির॥

* শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোক হইতে সপ্তদশ শ্লোকাবলম্বনে লিখিত।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা

(প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল গোস্বামি মহাশয়ের পাঠাবলম্বনে

রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্‌বিষয়ক সঙ্কল্পযুক্ত ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে প্রণাম কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। আমি তোমার নিকটে শপথ করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি—এইরূপ ভজন করিতে করিতে তুমি অবশ্যই আমাকে পাইবে। এবিষয়ে আমি প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন রহিলাম। যে হেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তুমি অন্য যে কোন সাধনপথেই যাও, আমার সহিত তোমার দেখা হইবেনা। তুমি হয়ত ভুক্তিতে, সিদ্ধিতে, অথবা মুক্তিতে অর্থাৎ স্বরূপানন্দ-আস্বাদন-আবেশে ডুবিয়া থাকিবে, আমার কথা তোমার মনেও পড়িবে না। আমি কিন্তু তোমাকে প্রীতি করি বলিয়া তোমাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি। যদি এই বিশুদ্ধ-ভক্তিপথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে, আমাতে তোমাতে নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিবে, এবং আমাকে পাইয়া তুমি সুখী হইবে, তোমাকে পাইয়া আমিও সুখী হইব। এই বিশুদ্ধ-ভক্তিপথই আমাকে পাওয়াইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় অন্বয়মুখে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।২—৩ শ্লোকে শ্রীচমস যোগীন্দ্রও নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

হে রাজন্! দ্বিতীয় পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজ-সত্ত্বগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণে বৈশ্য, এবং কেবল তমোগুণে শূদ্র এই চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই পুরুষের জঘনদেশ হইতে গার্হস্থ্য, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ, এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা নিজের জনক-পুরুষ পরমেশ্বরকে ভজনা করেনা, কিন্তু অবজ্ঞাই করিয়া থাকে, তাহারা নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই দুইটী শ্লোকে যাহারা শ্রীভগবানকে ভজনা করে না, তাহাদের দোষের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবদ্‌ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতেও—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

হে অর্জ্জুন! দুষ্কৃতিমূঢ় মায়ায় বিলুপ্তজ্ঞান আসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। এই শ্লোকেও ভগবদ্ভজনবিমুখের প্রচুরতর নিন্দাদ্বারা ভগবদ্ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতাই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি,-
বার্ত্তা সুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরা-মরণ-জন্মশতাভিঘাত,-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥

এই পৃথিবীতে যে জন জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ আস্বাদনের মুখ্য-সারবস্তু বিষ্ণুভক্তি-কথা-সুধারস সেবা করে না, সেই জন বহু বহু জন্মে দেহ ধারণ করিয়া জরা জন্ম মরণ প্রভৃতি শতশত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; পদ্মপুরাণে কোথাও কোথাও দেখা যায়, এরূপ দোষকীর্ত্তন দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অন্বয় অর্থাৎ বিধিমুখে, ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে

ভগবদ্ভক্তির সংবাদ যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, সেইটী দেখাইয়া বলা হইতেছে—যে পদার্থটী সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা পাওয়া যায় সেই পদার্থটী শ্রীগুরুচরণসমীপ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ বস্তুটী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় তাহাই ব্যাখ্যা-দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বকর্ত্তায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বকরণে, সর্ব্বদ্রব্যে, সর্ব্বক্রিয়ায়, সর্ব্বফলে, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একে একে প্রমাণের দ্বারা দেখাইতে-ছেন। সমস্ত শাস্ত্রে যে ভক্তির অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে বর্ণিত আছে; যথা—

সংসারেঽস্মিন মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্॥

সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ বলেন—এই মহাঘোর জন্মমৃত্যুসমাকুল সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধারকারী; এই প্রমাণে সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীভগ-বদ্ভজনেরই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেখান হইল। সর্ব্বশাস্ত্রেও অন্বয়মুখে যে শ্রীভগবদ্ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ২।২।৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যথা ভবেৎ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে নিখিলবেদ তিনবার বিচার করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নিখিল বেদ যাহা হইতে ভগবান শ্রীহরিতে রতির উদয় হয়, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা নিখিল বেদে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব দেখান হইল। তেমনই স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে যে—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ও পুনঃ পুনঃ বিচার করতঃ মুখ্যরূপে ইহাই সুনিষ্পন্ন হইল যে, সর্ব্বদাই নারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধ মুখেও—

"পারং গতোঽপি বেদানাম"

ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইবে যে—সর্ব্ববেদবিৎ হইয়াও যেজন জনার্দ্দন শ্রীহরিতে ভক্তিহীন; তাহার সমুদায় অধ্যয়ণ পণ্ডশ্রম মাত্র।

(ক্রমশঃ)

ওমা দেরে সাজিয়ে দেমা মোদের নন্দগোপালে

[শ্রীসুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ]

ওমা, দেরে দে সাজিয়ে দেমা
মোদের নন্দ গোপালে,
তার পথ পানে চেয়ে চেয়ে
আছে সকল রাখালে।
কাননে না গেলে কালা
চলেনা ধেনু
তোলেনা বদনে তৃণ
না শুনে বেণু
বিহগ গাহেনা গান
বসিয়া তরু-তলে।

কাহারো মুখে কভু
ফোটেনা হাসি
না শুনে কালার মুখে
মোহন বাঁশী
তারা, কালা বিনে জানেনা ত
কাহারে কোনো কালে
ওমা দেরে দে সাজিয়ে দে মা
মোদের নন্দগোপালে॥

আসক্তি

[শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্]

বিগত ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসে ১ম বৎসরের ৭ম সংখ্যার "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভাগবত ভূষণ মহাশয় "আসক্তি" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া আরো কথঞ্চিৎ আলোচনা করার জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই দীনাতিদীনের হৃদয়ে প্রেরণা করিয়া আজ আমাকে "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের" ভক্ত পাঠক-পাঠিকাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

আসক্তি কাহাকে বলে।

মনে কোন একটী বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য যে বিশেষ আকর্ষণ বা টান তাহারই নাম আসক্তি। "কোন বস্তুর প্রতি হৃদয়ের যে আকর্ষণ থাকিলে তাহার প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং অপ্রাপ্তিতে ক্লেশ জন্মে, সেই আকর্ষণই আসক্তির জীবন। ইহার মধ্যে আরো প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুখলালসা ও ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা এই দুইটি আসক্তির প্রধান উপাদান।"

(শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রি কৃত ধর্ম্মজীবন।)

আসক্তির কারণ।

আসক্তির কারণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ২য় অধ্যায়ে ৬২ শ্লোকে পাওয়া যায়—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

অর্থাৎ নিরন্তর বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি হয়। বিষয় পাঁচ প্রকার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। "যাহা সুখকর, ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর বা চিত্তোত্তেজক, তাহার মধ্যে বসবাস করিতে করিতে অল্পে অল্পে তাহাতে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ চিত্ত তাহাতে লগ্ন হইয়া যায়। তৎপরে যে বস্তুতে আসক্তি জন্মে মানুষ স্বতঃই তাহা লাভ করিবার জন্য প্রয়াসী হয়; এবং লাভ করিবার জন্য বিবিধ উপায়ও অবলম্বন করিতে থাকে।" (ধর্ম্মজীবন)। বিষয়ের ধ্যান বলিতে বিষয়ের চিন্তা করাই বুঝিতে হইবে। নিরন্তর বিষয়ের চিন্তাই সেই সেই বিষয়ে আসক্তির কারণ। এস্থলে দেখা যায় মনের সহিত বিষয়ের সংযোগেই আসক্তির উদয়। আসক্তির উদয়ের পর সেই সেই বিষয় প্রাপ্তির চেষ্টা।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা। (ভাঃ ১১।২৬।২২) অর্থাৎ "বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের মিলন না হইলে, জীবের মন কখনো ক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হয় না। যে কোন উত্তেজনা মনোমধ্যে উদয় হয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সমাগমই তাহার কারণ।"

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃত ব্যাখ্যা।)

এস্থলে যাহাকে চিত্তের ক্ষোভ বলিয়া বলা হইয়াছে তাহাই আসক্তির পরিণত অবস্থা।

"এক্ষণে প্রশ্ন এই যে—কেন মানুষ ক্ষুদ্র পদার্থে এরূপ আসক্ত হয়? উপনিষৎকার ঋষিগণ বলেন, অজ্ঞতাবশতঃ, অনিত্যকে নিত্য বলিয়া জানে বলিয়া ভ্রান্ত জীব সর্ব্বদাই এজগতে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভাবিতেছে, রূপরস গন্ধ স্পর্শময় অনিত্য-পদার্থে ভুলিয়া নিত্য পদার্থে যে ব্রহ্মসত্তা তাহাকে বিস্মৃত হইতেছে, সেই জন্য মানুষের এত দুর্গতি।" (ধর্ম্মজীবন)।

অনিত্যে নিত্যবদ্ বুদ্ধিশ্চিদ্বুদ্ধিশ্চ জড়ে সদা।
দুঃখে চ সুখবদ্বুদ্ধিঃ কিমজ্ঞানমতঃপরম্॥

৺নীলকান্ত গোস্বামিকৃত পঞ্চরত্নম্।

অর্থ—হায়, হায়! কি অজ্ঞানের বশে অনিত্যকে নিত্য বস্তু বলিয়া, জড়কে চিদ্বস্তু বলিয়া এবং দুঃখকে সুখবৎ বলিয়া বোধ করায়!

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্॥

ভাঃ ১১।২১।১৯

অর্থাৎ—বিষয়সমূহে কেবলমাত্র রমণীয়তার আরোপই পুরুষের তৎপ্রতি আসক্তির কারণ। এবং আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়। মানবগণের কামনাই পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদনের প্রধান হেতু। বস্তুর যথার্থত যে রমণীয়তা তাহাতে নাই, তাহাই তাহাতে আরোপ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয়। বস্তুর দোষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, কেবল গুনের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিলে ক্রমশ আসক্তির পরিণামে যে দুর্দ্দশা হয়, তাহাই এ স্থানে কথিত হইতেছে।

মমত্ব জ্ঞান এবং আসক্তি।

"আমার" বলিয়া যে মিথ্যা জ্ঞান তাহাও আংশিকভাবে আসক্তির কারণ বলিয়া কথিত হয়। এই "আমি" এবং "আমার" বলিয়া যে জ্ঞান, ইহাকেই মমত্ব-বুদ্ধি বলে। "আমি" ও "আমার" বলিয়া এই মিথ্যা জ্ঞান হয় কেন? ইহা জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। এবং অতি শৈশব কাল হইতেই হয়। অনেক সময় শিশুরও "আমার আমার" করিয়া তীব্র আসক্তি দেখা যায়। সম্ভবত কোন একটি বস্তু হইতে সম্যক প্রকারে সুখভোগ করিতে হইলে সেটি সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তাধান না হইলে তাহা হয় না। সেই জন্যই কোন একটা বস্তুকে "আমার" বলিয়া, অন্ততঃ মনের মধ্যে "আমার" করিয়া লইয়া, তাহা হইতে যতদূর পরিমাণে সুখ পাওয়া যায়,—তাহাই এই মিথ্যা "আমার" "আমার" জ্ঞানের কারণ। আমার সুখের উপাদান বস্তু যদি সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন না হয়, যদি তাহাতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, তবে সেই বস্তু হইতে সম্যক্ সুখলাভের ভরসা আমার নাই। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে—তবেই তাহা হইতে উদ্ভূত সম্যক সুখ আমার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নচেৎ নহে।

অহং মমাভিমানোথৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্॥ ভাঃ ৩।২৫।১৫

অর্থাৎ দেহাদিতে "আমি" ও পুত্র মিত্র কলত্রাদি দেহ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুতে "আমার" অভিমান হইতে উৎপন্ন কামলোভাদি—অর্থাৎ প্রাপ্তি-বাসনা ও ভোগস্পৃহাদি-মলিনতা-মুক্ত হইলে মন বিশুদ্ধ এবং সুখদুঃখদ্বন্দ্বাতীত ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হয়।

মমত্ব জ্ঞানের অভাবে আসক্তির অভাব হয়। তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। পরম পূজ্য প্রভু-পাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামী মহাশয়ের শ্রীভাগবৎ-ব্যাখ্যা হইতে এইটি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি নিজের অতি কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা একটি সুন্দর বাড়ী নিজে ছাতা মাথায় দিয়া রাজ মজুর খাটাইয়া প্রস্তুত করাইলেন। সেই বাড়ীটি প্রস্তুত করা শেষ হইলে স্বতঃই সেই ব্যক্তির তাহার প্রতি দৃঢ় আসক্তি হইবে। প্রথম প্রথম সে এমনই আসক্তির বশে বশীভূত হয় যে, সময় সময় নিজের পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বাড়ীর ঘরের স্থানে স্থানে ধুলা ঝাড়িতেও কোন দ্বিধা বোধ করে না। এই আসক্তির কারণ বাড়ীটি আমার বলিয়া যে বুদ্ধি। ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তনে ৫ বৎসর পরে সেই বাড়ী বিক্রয় করিতে হইল; তাহার পর একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে যখন সেই ব্যক্তি দেখিল যে, বাড়ীর দেওয়ালের খানিকটা নোনা ধরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহার মনে বিশেষ কোন দুঃখই হইল না। হয় তো মনে করিতে লাগিল যে, বিক্রি করার পর হইতেই বাড়ীর এই দশা হইয়াছে। দেওয়াল ভাঙ্গা দেখিয়া হয়তো মনে কথঞ্চিৎ ক্ষোভের উদয় হইতে পারে। কিন্তু ঐ ক্ষোভ বাড়ীটি তাহার নিজের থাকা কালে যে রূপ হইবে, বিক্রয়ের পর তাহার শতাংশের একাংশও হইবে না। উপরোক্ত উদাহরণ হইতে মমত্ব-বুদ্ধির সহিত আসক্তির সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়।

যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি হইতে আমার সুখের উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে, তাহারই উপর আমার আসক্তির সম্ভাবনা। যাহা হইতে আমার কোনরূপ সুখের সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমার আসক্তি হইতে পারে না। রস-গোল্লা আস্বাদনে রসনার সুখোৎপত্তি হয়। ময়রার দোকানে রসগোল্লা আছে। তাহাতে আমার মমত্ব-বুদ্ধি নাই। সেই রসগোল্লা দেখিয়া আমি আস্বাদন জানি বলিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই—তাহা পাইবার ইচ্ছা

করি। হয়তো লোলুপ-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া থাকি। অতি লোলুপ ব্যক্তির হয়তো ঐ রসগোল্লা দেখিয়া রসনা হইতে লালা নিঃসরণও হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না ঐ রসগোল্লা আমার আয়ত্তাধীন হইতেছে ততক্ষণ উহা আমার সুখের উপাদানরূপে পরিণত হইবে না। সেই-জন্যই আমি পয়সা দিয়া উহাকে ক্রয় করিয়া, উহাকে সম্যগ্‌ভাবে "আমার" করিয়া লইয়া তবে আস্বাদন করিয়া সুখ পাই।

নবনীতকোমল সুকুমার হৃষ্ট পুষ্ট শিশু দেখিয়া মন প্রফুল্লিত হয় কেন? তাহার সৌন্দর্য্যে। তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নয়নের উৎসব সম্পন্ন হয়। দেখিতে ভাল লাগে। তাই সে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখিতে দেখিতে আর শুধু নয়নের পরিতৃপ্তিতে মন সন্তুষ্ট থাকে না। ইচ্ছা হয় একবার স্পর্শ করি বা কোলে করি। উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সুখলাভ করার ইচ্ছা হইতে এসব হয়। হয়তো কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করি। আবার পরের ছেলে বলিয়া জ্ঞান থাকার জন্য কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরাইয়া দিই। হয়তো মনে মনে 'আরো একটু কোলে করে নাড়াচাড়া করার' বাসনা থাকা স্বত্তেও ফিরাইয়া দিতে হয়—কেননা সে আমার নয়—পরের। সেই শিশুটি যদি আমার পুত্র বলিয়া জ্ঞান থাকে, তবে তাহার উপর আমার আসক্তি অনেক পরিমাণে বেশী হয়। তাহার কারণ এই যে—আমার নিজের বলিয়া ঐ শিশু হইতে যত রকমে ইচ্ছা, তাহাকে কোলে করিয়া, তাহার খেলা দেখিয়া তাহার অস্ফুট মনোহরণকারি ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহার চরণের লীলায়িত গতি নিরীক্ষণ করিয়া সকল রকমে আমি সুখভোগ করিতে পারি। তাহাতে কোন রকম বাধা বিঘ্ন নাই।

মমত্ব জ্ঞানই কিন্তু সকল সময়ে আসক্তির কারণ নহে। সুখের লালসা হইতেই আসক্তির উৎপত্তি। যাহার যে পরিমাণে সুখের লালসা আছে, তাহার সেই পরিমাণে আসক্তি। উপরোক্ত রসগোল্লা বা সুকুমার শিশু কোন-টিতেই তো মমত্ববুদ্ধি নাই। তথাপি দর্শন মাত্রেই মনের মধ্যে একটা বিক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয় কেন? নয়নেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা হইতে অল্প পরিমাণে সুখটুকু পাইবার লালসাই এই বিক্ষোভের কারণ। বিবেকবুদ্ধি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পুনঃ পুনঃ মানা করিয়াও সকলক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হয় না কেন? নয়নরূপ দ্বার দিয়া তাহা হইতে যে স্বল্প পরিমাণে সুখটুকু পাওয়ার সম্ভাবনা, মন সে সুখটুকু ত্যাগ করিতে রাজী নহে। তাই পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা। এই সুখের লালসা হইতেই আসক্তি। ঐ সুখ লাভের লালসার স্বল্পতাতেই আসক্তির স্বল্পতা। অতএব দেখা গেল যে সুখের লালসা হইতেই আসক্তির উৎপত্তি।

আসক্তি কাহাকে আশ্রয় করে।

আসক্তি দুই প্রকার—বিষয়াসক্তি এবং শ্রীভগবানে আসক্তি। বিষয় বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি বুঝায়। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা এই পাঁচ-প্রকার বিষয়ের সুখ সম্ভোগের নানা প্রকার উপায় আছে। সেই সেই গুলিই বিভিন্নপ্রকারের আসক্তি। কাহারও সুন্দর রূপে আসক্তি। কাহারও সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন করিতে আসক্তি। কাহারও বা সুন্দর ঘ্রাণ করিতে আসক্তি। কাহারও বা সুন্দর শব্দ শ্রবণে আসক্তি। কাহারও বা সুখস্পর্শ-দ্রব্যের জন্য আসক্তি। পতঙ্গ রূপে আসক্ত হইয়া, মৎস্য ভক্ষ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া, ভৃঙ্গ সুগন্ধে আসক্ত হইয়া, হরিণ সুন্দর শব্দে আসক্ত হইয়া এবং মাতঙ্গ সুখস্পর্শে আসক্ত হইয়া কিরূপে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়, তাহা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভাগবতভূষণ মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন; সুতরাং এস্থানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঐ পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়দ্বারা পঞ্চ রকমে সুখ ভোগ করার জন্য মানবের আসক্তি। এইরূপে ধন, মান, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র পরিজন, দেহ, গেহ প্রভৃতি নানাজাতীয় দ্রব্য মানবের আসক্তির আশ্রয় হয়।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিরেখা

[শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামি কাব্যব্যাকরণতীর্থ]

আজ বাস্তবের কঠোর হতে'ও কঠোরতম আঘাতে আমার অন্তরপ্রদেশটা বেদনায় ভ'রে উঠেছে। পুঞ্জীভূত বেদনা জমে জমে হৃদয়টা এম্‌নি ভারী হয়ে' উঠেছে যে, এখন কোনও আশার কথা মনে আনতেও ভয় হয়। আজ মনে পড়ে সেই কতদিন আগের কথা; যখন আমার চোখে জগতের সব পদার্থই অতি রমণীয় ছিল। যেদিকে চোখ ফিরাইতাম সেই দিকেই দেখিতে পাইতাম—যেন এক মায়াময় মোহময় স্বপনের মেলা বসিয়া গিয়াছে।

সারাদিন পৃথিবীকে খরতাপে তপ্ত করিয়া নিয়তির অলঙ্ঘ্যবিধানে সূর্য্য যখন পশ্চিমদিকের কোলে আত্মসমর্পণ করিত—রাঙা রাঙা ছোট ছোট মেঘগুলি যখন আকাশের কোলে চঞ্চলা বালিকার মত লুকোচুরী খেলা করিত—আমার মন তখন যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের রাজ্যে উড়িয়া বেড়াইত। অনিমেষ-নয়নে পশ্চিম আকাশে চাহিয়া থাকিতাম; মনে হইত যেন কিশোরী দেববালাগণ অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া প্রিয়তম সূর্য্যের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এখন সন্ধ্যাসমাগমে সহসা তাহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদের মুখ লজ্জার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রিতে আকাশের দিকে চাহিলে মনে হইত, যেন কোন্ অজানা রহস্যময়ী অভিসারিকা উজ্জ্বলনক্ষত্রখচিত-নীলাম্বরে সজ্জিতা হইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রিয়তমের নিকট গমন করিতেছে।

উষাকালে পূর্ব্ব আকাশে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতাম—ওই যে পূর্ব্ব আকাশে কতশত রঙের ঘটা দেখা যাইতেছে—বায়ু অতি স্নিগ্ধ অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে নবজীবনের সঞ্চার করিতেছে—আমাদের মনকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে আকুল করিয়া কোথায় যেন লইয়া যাইতে চাহিতেছে—এসবের অর্থ কি? কিছুই বুঝিতে পারিতাম না; কেবল উদ্দেশ্যবিহীন মুগ্ধদৃষ্টি তুলিয়া আকাশপ্রান্তে চাহিয়া থাকিতাম।

বর্ষাকালে যখন সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আসিত, গুরু গুরু স্বরে গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া কাননে কাননে ময়ূরিণীদিগকে নৃত্য করিতে উৎসাহিতা করিত, তখন আমি আত্মহারা হইয়া আকাশে নিকষকালো মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিতাম! হৃদয় মথিত করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আমার মনের অতৃপ্তবেদনার সাক্ষ্য প্রদান করিত। ভাবিতাম—যে অতৃপ্ত পিপাসায় আমার হৃদয় শুকাইয়া উঠিয়াছে, ওই ঝরঝরশ্রাবণধারা কি তাহার একটুকুও উপশম করিতে সমর্থ নয়? ভ্রমর-কালো মেঘের দিকে চাহিয়া আকুলহৃদয়ে সেই অজানা প্রিয়ের উদ্দেশে হাতদুটী যোড় করিয়া বলিতাম—ওগো প্রিয়তম! কোথায় তুমি? কোন্ অজানা রাজ্যে বসিয়া—এমন করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছ? শুষ্ক পত্রে তোমার পায়ের মর্ম্মর-ধ্বনি শুনিতে পাই; সুরভিবায়ুতে তোমার চরণসংশ্লিষ্ট পুষ্পসৌরভ অনুভব করিতে পারি; মানসদর্পণে তোমার মায়ামূর্ত্তিখানি ক্ষণেকের জন্য প্রতিফলিত হইয়া তখনি আবার মিলাইয়া যায়। ওগো অকরুণ! কেন এমন করিয়া আমাকে লইয়া খেলা কর? তোমার এ খেলার যোগ্য তো আমি নই! একবার দেখা দাও, এখানকার দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সেই আনন্দময় দেশে চলিয়া যাই!

এম্‌নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। কতদিন এমন ভাবে ছিলাম জানিনা—সহসা সংসারসমুদ্রের তীব্র কোলাহলে আমার সে ঘোর কাটিয়া গেল। সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রাণ চমকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম এক অতি বিস্তীর্ণ ভীষণদর্শন সমুদ্র কর্ণবধিরকারী শব্দে সমাগত জীবের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে। বুঝিতে পারিলাম না—কি করিয়া আমি এখানে আসিলাম। হয়তো আমার পিপাসাতুর চিত্ত আমার অজ্ঞাতে আমাকে এ পথে টানিয়া আনিয়াছে; হয়তো বা আমার প্রিয়তম তাঁহার আনন্দময় রাজ্যে আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই আকর্ষণ

করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

হাঁ! আমাকে এই পথেই যাইতে হইবে। ওই দেখিতেছ না কাহার সুঠাম মূর্ত্তির ছায়া নীল সাগর জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! কান পাতিয়া শুন—কি মধুময় বংশীর ধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া প্রাণ আকুল করিতেছে! তরঙ্গবালাগণ যেন সেই মধুমাখা সুরে উন্মাদিনীর মত আপনহারা হইয়া নাচিতেছে। এ সব দেখিয়াও কি আর সন্দেহের অবকাশ থাকে? এই পথেই আমার প্রিয়তমের সন্ধান মিলিবে।

অধীর হৃদয়ে ছুটিলাম। দেখিলাম—একখানি সুন্দর তরণী তীরসন্নিহিত একটী বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে। আর দেখিলাম—যেন আমাকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্ম কতকগুলি নরনারী সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মুখে চটুল হাসি; নয়নে অপূর্ব্ব ইঙ্গিত। যেন কতকালের পরিচিতের মত তাহারা আমাকে সম্ভাষণ করিল; বলিল—হে মাননীয় অতিথি! আমাদের নৌকায় আরোহণ কর—আমরা তোমাকে আনন্দের দেশে লইয়া যাইব। তাহাদের মুখে চোখে এম্নি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাহাদের প্রস্তাবে কোন আপত্তিই করিতে পারিলাম না; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার শক্তি হারাইলাম। তাহাদের আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলাম।

তারপর কতবর্ষ কতমাস কতদিন কতরাত্রি চলিয়া গিয়াছে—আমাদের নৌকা আজিও সেই সমুদ্রের মধ্যে লীলায়িত গতিতে ঘুরিতেছে। কতবার সাথীদের পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি—"ওগো! আমাকে তীরে নামাইয়া দাও। কতদিন হইয়া গেল তাঁহাকে দেখি নাই, মন আকুল হইয়া উঠিতেছে। সমুদ্রের উন্মত্ত জলরাশির ভীষণ হুঙ্কারে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে—আতঙ্কে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—আর আমি যে সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমাকে নামাইয়া দাও"। তাহারা আমাকে কথার কোন উত্তরই দেয় না; স্মিতহাস্যে অধরওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া তরণী লইয়া বিলাসচ্ছলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এখনও যেন সে বাঁশির স্বর তেম্নি করিয়াই আকুল সুরে আমাকে ডাকে; কিন্তু হায়! আজিকার আমি, আর সেদিনের আমিতে কত প্রভেদ? উহাদের সঙ্গে থাকিয়া মনও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সে বাঁশির স্বরে আমার মন আর তেমন আকুল হইয়া তাঁহার পানে ছুটিতে চাহে না। না হইবে কেন?—সংসর্গদোষ যে অপরিহরণীয়! পূর্ব্বের কথা স্বপ্নের মত হৃদয়ে উদিত হইয়া এখনও মাঝে মাঝে মনকে চঞ্চল করে। কি জন্ম নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, কোথায় আমায় যাইতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্ন অস্ফুটভাবে জাগিয়া এখনও মনের মাঝে দোলা দিয়া যায়।

কিন্তু আজ আর আমার নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিবার শক্তি নাই; কোনদিন এমনও মনে হইয়াছে—উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নৌকা লইয়া নিজের গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাই। কিন্তু কাজের সময় কিছুই করিতে পারি নাই; কেবল নিজেই ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। অনুতাপানলে নিজেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছি। স্বখাতসলিলে ডুবিয়া মরা আর কাহাকে বলে?

এখনও কিন্তু আশা ছাড়িতে পারি নাই; আশা ত্যাগ করিলে সেই দিনই আমার মৃত্যু হইত। এখনও মনের মাঝে ক্ষীণ একটু আশার রশ্মি দেখিতে পাই। মনে হয়—সেই অহৈতুকী করুণাময় একদিন নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিবেন। আমার এই অবস্থায় কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। সেইদিন—সেই শুভদিনে তাহার চরণদুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিব—"ঠাকুর! আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলিওনা। চিরদিন দূরে দূরে রাখিয়া চরণসেবার সৌভাগ্য হইতে আমাকে আর বঞ্চিত করিও না। আমার শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম তোমার করুণাবারিতে ধুইয়া দিয়া, চরণসন্নিকটে না পার এমন স্থানে আমাকে রাখ, যেথান হইতে তোমার মুনি-মন-মোহন পদযুগল সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারি।"

হয়তো এখনও সে সময় আমার আসে নাই; তাঁহাকে পাইবার জন্ম যে আকুলতা-প্রয়োজন, তাহা হয়তো আমার নাই। এখন তাঁহাকে পাইলে হয়ত রাখিতে পারিব না, হারাইয়া ফেলিব—তাই তিনি এখনও আসিতেছেন না।

তবে তাহাই হউক; হে জীবক্লেশ-মোচন-তৎপর প্রিয়তম! তোমার ধামে যাইতে না পারি ক্ষতি নাই;

আমাকে অধিকার দাও তোমাকে পাইবার—একটীবার মাত্র তোমাকে দেখিবার। নতুবা এই অধিকার দাও,—ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও যেন নিশিদিন শয়নে স্বপনে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে পারি—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শ্রীরাসলীলা-তত্ত্ব

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত ও পূজনীয়
প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-
সিদ্ধান্তরত্ন কর্ত্তৃক অনুমোদিত)

রসিকভক্তগণের মুকুটমণি, পূজনীয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামিচরণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রজলীলা সর্ব্বোত্তম ও হৃদ্‌কর্ণ-রসায়ন ; আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীমতী রাসলীলা সর্ব্ব-গুহ্যতম, অতীব গম্ভীর, পরম মধুর এবং সকল লীলার শিরো-মণি। কারণ ইহাতে প্রেমভক্তির চরম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর-বপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের তত্ত্ব ও লীলা বিশেষরূপে অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীরাস-লীলা সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করেন। যিনি, তাঁহার প্রিয় সখা ও পরম ভাগবত শ্রীল অর্জ্জুন মহাশয়কে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতারূপ অমূল্য উপদেশ-রত্ন প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনেকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু "তিনি শ্রীরাসলীলায় পরদারবিনোদরূপ অবৈধ-কার্য্য কি প্রকারে করিলেন ?" এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া তাঁহার অবিচিন্ত্যমহাশক্তি-শ্রীভগবচ্চরণে মহা অপরাধ সঞ্চয় করেন। এমন কি ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ মহারাজও নিজ সংশয়চ্ছলে সভাস্থিত কোন কোন সন্দিগ্ধ-জনগণের সন্দেহনিরাকরণঅভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শ্রীলশুকমুনিকে এই প্রকার প্রশ্ন করেন ; এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ তাঁহার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গের উপ-সংহারে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবেন। বস্তুতঃ শ্রীরাসলীলা রসিক ভক্তগণের উপাসনাবেদ্যা প্রেমময়ী লীলা ; মাদৃশ ভজনহীন ব্যক্তির ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু আমাদের উপাস্য-দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্বন্ধে অযথা কটাক্ষ বা নিন্দা শুনিলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। সেই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার এই প্রয়াস।

যখন মহারাজ দুর্য্যোধনের সভায় দুষ্টমতি দুঃশাসন শ্রীমতী দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতেছিল, তখন শ্রীভীমসেন ও শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন ও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"দাদা ! একবার অনুমতি করুন দুঃশাসনের মস্তক ছেদন করি ; কিন্তু শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিয়া ক্ষান্ত করিলেন। পরে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। কিন্তু যখন রাজসূয়যজ্ঞস্থলে শিশুপাল পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোষ হইতে তরবারি মোচন করিয়া শিশুপালের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় শ্রীভীমসেন

ও শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয় বলিলেন—দাদা একি ? আপনি ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ; যজ্ঞের সময় এ কি করিতেছেন ? যখন সভাস্থলে দুঃশাসন কুলবধূ দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতেছিল, তখন আপনি আমাদিগকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন ও নিজে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন ! আর এখন এরূপ অধীর হইলেন কেন ? উত্তরে মহারাজ বলিলেন—আমি সব দুঃখ কষ্ট ও অপমান কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাধে সহ্য করিতে পারি ; কিন্তু শিশুপাল তাঁহাকে অপমান করিতেছে, ইহা কাহার দিকে তাকাইয়া সহ্য করিব ? পরম ভক্ত যুধিষ্ঠিরের কথা দূরে থাকুক্ ভক্তমাত্রই ভগবানের নিন্দা শুনিতে পারেন না বা শোনাও উচিৎ নহে। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য যথা :—

"বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

অনেক পাপাচারী ব্যক্তি আছে, তাহারা বহু পাপকর্ম্ম করে ; তাহাদিগকে কেহ গালি দিলে তাহারা কুপিত হয় না ; কিন্তু তাহদিগের পিতাকে কেহ অপমানসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিলে তাহারা সহ্য করিতে পারে না। বলে—আমাদিগকে গালি দাও, অপমান কর, প্রহার কর, অবাধে সহ্য করিব ; কিন্তু আমাদের বাপ তুলিওনা, বাবার নিন্দা করিলে, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।

শ্রীরাসলীলা যে প্রাকৃত কামময়ী নহে, বাস্তবিক অপ্রাকৃত-প্রেমময়ী লীলা তাহা শুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে অশেষ বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বিস্তারিতরূপে তাঁহাদের সংস্কৃতটীকায় উহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীরাধাগোবিন্দের তত্ত্ব অনুশীলন করেন নাই বা যাঁহাদের সংস্কৃত মূল ও টীকা সহজে বোধগম্য হয় না, অথবা ঐ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবন করিবার অবসর হইয়া উঠেনা, কিম্বা যাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা পূজনীয় প্রভুপাদগণকৃত শ্রীরাসলীলাতত্ত্ব-ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগ ঘটে না, পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ও শ্রীশুকদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ তাঁহাদের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভক্তি ও প্রেমের বিষয় পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-চরণকৃত "ভক্তি-সন্দর্ভে" এবং প্রীতি-সন্দর্ভে এবং শ্রীলরূপ-গোস্বামিপাদকৃত "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" নামক গ্রন্থে সংস্কৃত-ভাষায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এবং মৎকৃত "ভক্তিসন্দর্ভসার" নামক গ্রন্থে এবং এই শ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকায় প্রকাশিত "ভক্তিমাহাত্ম্য" "অভিমান" ও "কৃতজ্ঞতা" ইত্যাদি নামক প্রবন্ধগুলিতে বাঙ্গলাভাষায় ভক্তির সারমর্ম্ম কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

এখানে অতি সংক্ষেপে ভক্তিশব্দের তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। ভক্তিশব্দের অর্থ ভজন অর্থাৎ ভগবৎসেবা। যাহা করিলে যিনি সন্তুষ্ট হন, তাহা করাই তাঁহার সেবা বা পূজা বলা যায়। শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে তিনি সুখী হ'ন সুতরাং ইহাই ভক্তি। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"ভক্তি হি ভক্তহৃদয়-কোটি-প্রবিষ্টভগবৎহৃদয়বিগলয়িত্রী শক্তিবিশেষঃ" অর্থাৎ ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ; উহা ভগবানের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার হৃদয় গলায় না, কিন্তু ভক্তহৃদয়স্থিত হইলে ঐ শক্তি আধারসাদ্‌গুণ্যে ভগবানের হৃদয় বিশেষরূপে গলায় তখন ঐ শক্তিকে ভক্তি কহে। যেমন সূর্য্যের জ্যোতি সমস্ত জগতে ছড়াইয়া আছে বলিয়া ঐ জ্যোতির শক্তি কম মনে হয়, কিন্তু আয়াস-পাথরের মধ্যে পড়িলে উহার দাহিকা শক্তি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জল গজে পড়িলে গজমুক্তা, মৃগে পড়িলে মৃগনাভি, ঝিনুকে পড়িলে মুক্তা ইত্যাদি প্রসব করে। অর্থাৎ ঐ স্বাতী নক্ষত্রের জল যখন এই সকল আধার প্রাপ্ত হয় তখন রত্নাদি প্রসব করে, কিন্তু অন্যত্র পড়িলে রত্নাদি কিছুই জন্মায় না ; সেইরূপ ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি দাস, সখা, বৎসল, ও মধুর জাতীয় ভক্তের হৃদয়রূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইলে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকার প্রেমরস উৎপাদন করে। এবং ভগবানের চিত্তরূপ ভ্রমর ভক্তহৃদয়রূপ কমলস্থিত ঐ প্রীতি-রসরূপ মধু আস্বাদন করিয়া আপ্যায়িত হয়। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখস্বরূপকৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চারিবিধ ভক্তই আধার॥"

পুনরায় বলিয়াছেন :—

াক্য যথা :—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে মোরে যেই করে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন"॥ চৈঃ চঃ।

প্রেমভক্তির লক্ষণ যথা :—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংজ্ঞতা॥
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অর্থাৎ নিখিল বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত মমতাকেই শ্রীভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব মহাশয় ও শ্রীনারদ ঋষি প্রভৃতি প্রেমভক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার ভক্তির অর্থাৎ ভজনের উন্নতি বা পরিপাকের তারতম্যানুসারে উহা প্রেম, ভাব ও মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ মহাভাবস্বরূপিনী অর্থাৎ মধুরজাতীয় ভক্তগণের শিরোমণি তাঁহাদিগের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমা কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥"

শ্রীমতী রাসলীলা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক; এবং রাস ও লীলা কাহাকে বলে, রাসলীলা শ্রবণের অধিকারীই বা কে, এবং ঐ লীলা শ্রবণের ফলই বা কি ইহা ক্রমশঃ বলা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকেই "শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ" এইরূপ লেখা আছে; অর্থাৎ "শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন"; শ্রীসূত গোস্বামী এখানে শ্রীশুক না বলিয়া বাদরায়ণি বলিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে চারিটী নামে পরিচয় কবান হইয়াছে। কোথায়ও ঋষি, কোথায়ও বৈয়াসকি, কোথায় শ্রীশুক ও কোথায়ও বাদরায়ণি। যে প্রসঙ্গে যে নামটী উল্লেখ করিলে সেই প্রসঙ্গের সঙ্গতি রক্ষা হয়, শ্রীসূত-গোস্বামী সেখানে সেই নামই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাসলীলা-প্রসঙ্গে বাদরায়ণি বলিবার অভিপ্রায় পূজনীয় শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণী টীকার প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—বাদর অর্থাৎ বদরিকা হইয়াছে, অয়ন অর্থাৎ আশ্রম যাঁহার, তিনি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস। তাঁহার পুত্রের নাম বাদরায়ণি।

শ্রীবেদব্যাসের শ্রীকৃষ্ণতপস্যালব্ধ পুত্র শ্রীশুকদেব। শ্রীবেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের উপাসনারূপ যে মহা-তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছিল। কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরমোত্তম, বেদব্যাসও সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ। অতএব সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে পরমোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা সঙ্গতই হইয়াছে; যে হেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা প্রভৃতি উপাস্যতত্ত্বের প্রতি তাঁহার চিত্তের আকর্ষণ হইতে পারে না। শ্রীবেদব্যাস মনে করিলেন, আমি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রনয়ন করিলাম বটে, কিন্তু এই রসময় গ্রন্থ আস্বাদন করিবে কে? যদি এমন একটী মহাভাগবত পুত্র জন্মে যাহাকে মায়া স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা হইলে এই গ্রন্থ তাহাকে শুনাইতাম। ভক্তের বাসনা ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান অপূর্ণ রাখেন না। তাই পরমকারুণিক শ্রীভগবান শ্রীবেদব্যাসকে তাঁহার তপস্যার ফলরূপ এই পুত্র-রত্ন দান করিলেন। সে পুত্র সামান্য জীবতুল্য নহেন, পরন্তু শ্রীভগবানের পরম প্রীতির পাত্র ও বিশুদ্ধ প্রেমের আশ্রয়-স্বরূপ।

যদিও শ্রীব্যাসনন্দনে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদি ভক্তোচিত নানাবিধ গুণ অধিক মাত্রায় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রীরাসলীলা-বর্ণনে তাঁহার ঐ সকল মহৎ গুণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

গর্ভ হইতে বাহির হইলে যদি মায়া স্পর্শ করে এই আশ-ঙ্কায় শ্রীশুকদেব দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জননীর গর্ভে অব-

স্নান করেন। এই সময় একদিন দৈববাণী হইল যে "তুমি বাহির হও, মায়া তোমাকে স্পর্শ করিবেনা"। দৈববাণী শুনিয়া

শ্রীশুকমুনির জন্ম-বৃত্তান্ত।

গর্ভ হইতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু বাহির হইবামাত্র মায়া স্পর্শ করিবে এই ভয়ে নেঙ্‌টা অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া বেগে ছুটিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পিছু পিছু ধাবমান্ হইলেন। কিন্তু উহাঁকে ধরিতে পারিলেন না। পথে একটী পুষ্করিণীতে অপ্সরাগণ তীরে বস্ত্র রাখিয়া জলে স্নান করিতেছিলেন। যখন শ্রীশুকমুনিকে উঁহারা দেখিলেন তখন কাপড় পরিলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বেদব্যাসকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বস্ত্র গ্রহণ করিলেন ঋষি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমার উলঙ্গ যুবক পুত্রকে দেখিয়া আপনাদের লজ্জা হইলনা, আর অতিবৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইলেন ইহার কারণ কি?" উত্তরে, তাঁহারা বলিলেন, যেমন স্ত্রীপুরুষজ্ঞানহীন ছোট একটী শিশুর নিকট তাহার গর্ভধারিণী বস্ত্রহীনা হইতে লজ্জা বোধ করেনা, সেইরূপ স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞানহীন ও মায়াস্পর্শশূন্য আপনার পুত্রকে দেখিয়া আমাদের লজ্জা বোধ হয় নাই; কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও আপনার স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান আছে, সুতরাং আপনাকে দেখিয়া আমাদের লজ্জার উদ্রেক হইয়াছে।

শ্রীবেদব্যাস অনেক চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে ধরিতে পারিলেন না। পরে কয়েকটী কাঠুরিয়াবালককে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী সুমধুর শ্লোক সমস্বরে গান করিতে শিখাইয়া দিলেন ও নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বালকগণের ঐ গান শুনিয়া ব্রহ্মধ্যাননিমগ্ন শ্রীশুকমুনির সমাধি ভঙ্গ হইল; তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত, দেহ পুলকিত ও নেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন, বিভু-আনন্দ ক্ষুদ্র আনন্দকে ক্রোড়ীভূত করিতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পাইলে জীব ক্ষুদ্র মায়িক আনন্দ তুচ্ছ-বোধে পরিত্যাগ করে। আমিও বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়াছি; এই গান শুনিয়া আমার চিত্ত ক্ষোভিত হইল কেন? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক মুনি বলিয়াছেন :—

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্॥"

অর্থাৎ হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে সম্যক রূপে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলা-শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও প্রেমভক্তিরসের আলয়। তাই এই গ্রন্থেই উক্ত আছে :—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং।
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং।
মুহুরহো রসিকা ভুবিভাবুকাঃ॥"

অর্থাৎ হে ভাবুক ও রসিক ভক্তগণ! আপনারা শুক-মুখ হইতে এই পৃথিবীতে বিগলিত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃত-দ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মোক্ষ ক্রোড়ী-ভূত করিয়া অর্থাৎ মোক্ষের পূর্ব্বে ও পর পর্য্যন্ত নিরন্তর পান করুন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবৎ-প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিকতর মধুর, শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয়। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ একই প্রকার অর্থাৎ উহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই। সবিশেষ ভগবদানন্দের নিকট উহা অত্যন্ত লঘু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে —

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ নহে তার খাতোদক সম"॥

এখানে কৃষ্ণনাম এইটী উপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে আনন্দ উপলব্ধি হয়, ব্রহ্মানন্দ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। তাহা না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মসমাধিনিরত শ্রীশুকমুনি জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া কখনই ভক্তিপথের পথিক হইয়া রসিক-ভাগবত-চূড়ামণি হইতেন না। কাঠুরিয়া বালকগণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন :—"তোমরা কাহার নিকট হইতে এই সুমধুর শ্লোকগুলি শিখিলে? তাঁহাকে একবার দেখাইতে পার"! এই কথানুসারে তাহারা শ্রীশুক-দেবকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবেদব্যাসের নিকট লইয়া গেল। তিনি নিজ পিতৃদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন। শ্রুতিধর শ্রীশুকমুনি একবার মাত্র শুনিয়া ১৮০০০ শ্লোক কণ্ঠগত করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এমনি মাহাত্ম্য যে, শ্রবণ করিতে করিতে তিনি প্রেমে আত্মহারা হইলেন। হর্ষ, কম্প

পুলক, অশ্রু ইত্যাদি সাত্ত্বিক-ভাব-সকল তাঁহার শরীরে প্রকাশ হইল। পরে শ্রীকৃষ্ণতপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। প্রেমসমাধিতে সিদ্ধ হইয়া ভাগবতপরমহংসচূড়ামণিআখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং এই রাসলীলা শ্রীশুকদেবের ন্যায় ভক্তি-সহকারে পঠিতব্য ইহাই প্রকাশ করা হইল। অর্থাৎ ভক্ত পরমহংসচুড়ামণি শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক বর্ণিতা এই রাসক্রীড়া ভক্তগণই আদরে শ্রবণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অপক্ক-হৃদয়, সুতরাং প্রাকৃত কামাতুর অসজ্জনের পক্ষে এই রাসলীলাশ্রবণ নিষিদ্ধ। যেহেতু ইহা অপ্রাকৃতা প্রেমময়ী লীলা হইলেও ইহাতে প্রাকৃত-রসের সাদৃশ্য থাকায় মনে সহসা অসদ্ভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে শ্রীভগবচ্চরণে পরম অপরাধের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে।

"শ্রীশুক উবাচ"—অর্থাৎ শ্রীশুকদেব কহিলেন —এইরূপ পাঠও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শুক পাখী যেমন স্বভাবতঃ সুকোমল ধ্বনি করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীমতী রাসলীলাবর্ণনে শ্রীশুকদেবের পরম উজ্জ্বল-রস-স্বভাবহেতু তাঁহার সুমধুর ও পরম কোমল আলাপতা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং এইরূপ কোমল চিত্তে এই লীলা কীর্ত্তনীয় ইহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন, যে পরীক্ষিৎ মহারাজ বনে মৃগয়া করিতে গিয়া তৃষ্ণাতুর হইয়া শ্রীশমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন ঋষি শ্রীকৃষ্ণধ্যানে সমাধিস্থ ছিলেন। মহারাজ জলপিপাসায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ উঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া ক্রোধে তাঁহার গলায় একটী মৃত সর্প জড়াইয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবিলম্বে ঐ ঋষির বালক পুত্র পিতার ঐরূপ অবস্থা প্রথমতঃ শুনিয়া পরে দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া এক-গণ্ডূষ পরিমাণ জল হস্তে গ্রহণ করিয়া এইরূপ অভিশাপ দিলেন—"যে আমার সমাধিস্থ পিতৃদেবের এইরূপ অবমাননা • করিয়াছে সপ্তমদিবসে তক্ষকদংশনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে।" • শ্রীকৃষ্ণচরণধ্যাননিরত ঋষির তৎক্ষণাৎ সমাধি-ভঙ্গ হইল। যেমন একটী ভ্রমর কোন একটী পদ্মফুলের উপর বসিয়া মধুপান করিতেছে, এমন সময় যদি ঐ ফুলটী বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভ্রমর মধুপানে বিরত হইয়া স্থানান্তরে উড়িয়া যায়। তেমনি শ্রীঋষির চিত্তভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলের মধুপানে নিরত ছিল। তিনি প্রেমানন্দে এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে গলায় মৃত সর্প দেওয়াতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু অন্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রেমিকভক্ত শ্রীপরীক্ষিতের অকালে ব্রহ্মশাপে সর্পদংশনে প্রাণবিয়োগ হইবে জানিয়া ব্যাকুল হইলেন ও তাঁহার চরণ কাঁপিয়া উঠিল। • শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল বিচলিত হওয়ায় ঋষির চিত্ত ভ্রমর স্থানচ্যুত হইল সুতরাং তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল।

পুত্রের এই অভিশাপ শুনিয়া ঋষি তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "যে মহারাজ আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার রক্ষক ও প্রতিপালক; তিনি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমার নিকট পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জল দেওয়াতো দূরের কথা আমি তাঁহার কথার কোন উত্তরই দিই নাই, ইহাতে আমার মহাপরাধই হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে এরূপ অভিশাপ করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে।"

এদিকে ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ মহারাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র-কলত্রাদি সকলে সার্ব্বাঙ্গীন কুশলে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাঁহার রাজ্যের বা রাজপ্রাসাদের কোনও প্রকার ক্ষতি হয় নাই। বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি ঋষিচরণে এমন ভয়ানক অপরাধ করিলাম, এখনও তাহার কোনরূপ প্রতিফল পাইলাম না! তবে কি কলি প্রবেশ করিয়াছে এবং ব্রহ্ম-তেজ নষ্ট হইয়াছে! এখন পর্য্যন্তও মহর্ষির নিকট হইতে কোনও অভিশাপের সংবাদ পাইতেছি না, কেন?" এইরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, এমন সময় শমীক ঋষি-প্রেরিত কোন মুনিবালকমুখে মহারাজ এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ঋষিপুত্রের কি অপার করুণা! আমার মত এমন ভয়ানক অপরাধীকে ৭ দিনের জন্য জীবনভিক্ষা দিলেন, এবং আমার ধন জন রাজ্য পুত্র পরিবার ও রাজ প্রাসাদাদি ভস্মসাৎ করিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "যে জলের

জন্য এই মহদপরাধ করিয়াছি, এ জীবনে আর উহার এক-বিন্দুও পান করিবনা। পরন্তু অনশনে গঙ্গাতীরে ভগবচ্চিন্তায় জীবনের অবসান করিব।" নিজপুত্র শ্রীজনমেজয়ের সানুনয় কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও এক বিন্দু জল পান করিলেন না। পরন্তু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে একটী মহতী সভা আহ্বান করিতে বলিলেন; এবং উহাতে সমগ্র জগতের মুনিঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে তাহাই করা হইল; অনন্তর প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট সর্ব্বত্যাগী ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুক-মুনির নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের কতদূর প্রিয় ভক্ত ও অলৌকিক কৃপার পাত্র তাহা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। তিনি জননীগর্ভেই কৃষ্ণকৃপা পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরীক্ষিৎ-মহারাজের মাতার গর্ভে সুদর্শন চক্র ও গদা লইয়া প্রবেশ করতঃ তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহা-রাজের অন্তিমকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করান সুতরাং তাহার দেহখানি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার বিভূতি-স্বরূপ।

বস্তুতঃ শ্রীরাসলীলা যদি প্রাকৃত কামময় বা অশ্লীল হইত, তাহা হইলে আজীবন বৈরাগ্যবান্, স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞানহীন, মায়াতীত পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সভাস্থিত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি নানাবিধ লোকের সাক্ষাতে এই লীলা কখনই বর্ণন করিতেন না এবং শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও আসন্নমৃত্যুকালে ইহা কখনই শ্রবণ করিতেন না।

মহারাজের সভায় শ্রীশুকদেবের সহসা আগমন।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিলেন। সকলেই ভাবিতেছেন কে এই সভার উপযুক্ত বক্তা হইবেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া নেংটা সাধু শ্রীশুকমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোনও সঙ্কোচ বা সাধ্বস নাই। যখন রাজসভায় আসিতেছেন, দূর হইতে সভাস্থ সকলে দেখিলেন, যেন একটী ঘনীভূত জ্যোতিঃপুঞ্জ আসিতেছে। সভায় উপস্থিত হইলে দেখা গেল একটী তেজোময় উলঙ্গ সাধু শ্রীশুকদেব। তখন কতকগুলি বালক তাঁহাকে ঘেরিয়াছে, তাঁহারা মনে করিতেছে ইনি পাগল, তাই গায়ে ধুলা দিতেছে। শুক মুনির তাঁহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন তিনি সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে এমন কি তাঁহার গুরুদেব ও পিতা শ্রীব্যাসদেব এবং পরমগুরুদেব শ্রীনারদ ঋষি পর্য্যন্ত আসন ত্যাগ করতঃ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মনের বিচার এই যে আদর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে, আদর হইল গুণের, সর্ব্বাপেক্ষা আদরের জিনিষ শ্রীভগবান্। আবার ভগবান্ প্রেমাধীন; সুতরাং প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। শ্রীশুকদেবের শ্রীভগবানের প্রতি যে জাতীয় প্রেম, সেইরূপ প্রেম আমাদের কাহারও নাই। এই প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে অভ্যর্থনা ও সম্মান করিলেন।

এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত এই যে, গুরুদেব অপেক্ষা শিষ্য যে অধিকতর শক্তিমান্ হইবেন না, তাহা বলা যায় না। যদি গুরুদেব হইতে শিষ্যের স্বভাবতঃ শক্তি হ্রাস হইত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম, শিষ্যানুশিষ্যের একেবারেই শক্তি লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। উপা-সনা-বলে শিষ্য গুরুদেব হইতে অধিকতর উন্নত হইতে পারেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে হৃদয়ে কতটা আবেশ, তাহা তিনি শ্রীশুকমুনিকে নিজমুখে নিম্নলিখিত কথায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই বেশ বুঝা যায়;—

"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥"

আমি নির্জ্জল অনশনব্রতগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার মুখকমলনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিতেছি বলিয়া অতি দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কোনও কষ্ট দিতেছে না। এখন আমরা বুঝিলাম যে, শ্রীশুকদেবের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা-রহিত, একমাত্র কৃষ্ণসুখে সুখী, প্রেমরসময়, পরমভাগবতগণই শ্রীম-দ্ভাগবতের উপযুক্ত বক্তা এবং শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী ভক্তচূড়ামণিগণই ইহার উপযুক্ত শ্রোতা।

এক্ষণে শ্রীমতী রাসলীলা কাহাকে বলে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্।

প্রথমতঃ "রাস" শব্দের অর্থ কি ? রস বা আস্বাদন-সমূহকে রাস বলে অর্থাৎ বিবিধ ও বিচিত্র প্রীতিরসাস্বাদনময়ী লীলাকে রাসলীলা কহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন :—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ রসবস্তু বা রসস্বরূপ বা পরমানন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি। সুতরাং তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া জীব যথার্থ সুখী হয়। যেমন রসগোল্লা পাইয়াও জিহ্বা ব্যতীত উহার আস্বাদন হয় না। সুতরাং রসগোল্লা-প্রাপ্তি আমাদের প্রয়োজন নহে ; উহার আস্বাদনই প্রয়োজন। তেমনি প্রেমরূপ রসনা বিনা রসবস্তু শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করা যায় না। সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি প্রয়োজন নহে, তাঁহার আস্বাদনই প্রয়োজন এবং যতদিন জীব তাঁহাকে আস্বাদন করিতে না পারিবে, ততদিন সে প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে পারিবে না। তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারিলে, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে এবং সে প্রকৃতপক্ষে সুখী হইবে।

রস শব্দ হইতে আমরা কি পাই ? রস শব্দ কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে—"রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ ইতি রসঃ" তখন উহার অর্থ হয় "আস্বাদ্যবস্তু" অর্থাৎ যাহা আস্বাদন করা যায়। আর ভাব বাচ্যে—"রস্যতে ইতি রসঃ" উহার অর্থ আস্বাদন। সাধন অবস্থায় রসবস্তু আস্বাদ্য অর্থাৎ উহা আস্বাদনের পূর্ব্বাবস্থা ; আর সিদ্ধ-অবস্থায় উহাই আস্বাদন হয়। যেমন মিশ্রির নাম ও গুণ অর্থাৎ মিষ্টতার কথা শুনিলে কোথায় এবং কিরূপে মিশ্রি পাওয়া যায় আমরা তাহার চেষ্টা করি, এই অবস্থার নাম আস্বাদ্য অবস্থা। আর চেষ্টা অর্থাৎ সাধন করিতে করিতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যখন ঐ বস্তুর অনুভব হয় তখন সেইটীকে আস্বাদন অবস্থা বলে। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা পরিতৃপ্ত হইব, তখন আর কিছুই চাহিবনা। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, আস্বাদ্য বস্তুটী কি ? অর্থাৎ আমরা কি আস্বাদন করিতে চাহি ? ইহার উত্তর এই যে, আমরা সকলেই "আনন্দ" আস্বাদন করিতে চাহি। আনন্দলাভই আমাদের নিখিল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। আবার সেই আনন্দ নিত্য ও অসীম হওয়া চাই ;—

"ভূমা বৈ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

অর্থাৎ বিভু বা অসীম আনন্দে সুখ, অল্প বা সসীম আনন্দে সুখ নাই। সুতরাং বিভু অর্থাৎ ভগবদানন্দই আমাদের লক্ষ্য ; কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আমূতরি ডুবু ডুবু প্রায়—এখনও আনন্দের সন্ধান পাইলামনা। ইহার কারণ এই যে—মায়াবদ্ধ জীব আমরা জড়ে আনন্দ চাই কিন্তু পাইনা, জড়ে অর্থাৎ অচেতন বস্তুতে আনন্দ নাই। কারণ যাহার জ্ঞান বা বোধশক্তি নাই, তাহার আনন্দ দিবার ক্ষমতাও নাই। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব আমরা—তাঁহার মায়ায় নিজ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত হইয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের—একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র-উপাখ্যানে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন :—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু দেবতাত্মা ॥"

অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীব শ্রীভগবানের মায়াবশতঃ নিজের স্বরূপ যে নিত্যভগবদ্দাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য নিজের দেহে ও দৈহিক-বিষয়ে উহার আমিত্ব ও মমতা ঘটিয়াছে, ঐ অভিনিবেশবশতঃ ভয় হইতেছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহারই ধ্বনি শুনিয়া থাকি :—

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল !
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

সুতরাং আমরা শ্রীভগবানের উপাসনা দ্বারা যতই মায়িক-বিষয় ত্যাগ করিয়া চৈতন্যতত্ত্বে যাইব, ততই আনন্দ পাইব।

আবার যেমন মিশ্রি আমরা চাই, জড়পদার্থ মিশ্রি তাহা বুঝেনা এবং আমাদিগকে চায় না। ইহাতে আস্বাদনের সুখ হয় না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তবৎসল দয়ালু ও কৃতজ্ঞ শ্রীভগবান্‌কে আমরা যে ভাবে চাইব, তিনিও আমাদিগকে ঠিক সেই ভাবে চাইবেন। শ্রীগীতায় তাই তিনি বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"।

অর্থাৎ "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।

আমি সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥" চৈঃ চঃ।

পুনরায়—

"ভক্তবৎসল দয়ালু কৃতজ্ঞ বদান্য।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি বিজ্ঞ নাহি ভজে অন্য॥" চৈঃ চঃ॥

কিন্তু ব্রহ্মা ও পরমাত্মায় এই গুণগুলি নাই, কেবল ভগবৎস্বরূপে আছে। কারণ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও নির্ব্বিকার এবং পরমাত্মা নিরপেক্ষ ও সাক্ষিস্বরূপ। সবিশেষ অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ভক্তিরসলোলুপ; সর্ব্বদাই ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন। আমরা যদি তাঁহাকে চাই অর্থাৎ ভক্তি করি তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে টানিয়া লইবেন। আমাদের ভক্তি কখনও নষ্ট হইবেনা। তাই শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি"।

হে অর্জ্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল—আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবেনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি কেবল আস্বাদ্য নহেন, অর্থাৎ ভক্ত কেবল তাঁহাকে আস্বাদন করিবেন তাহা নহে, তিনি আস্বাদকও বটেন। অর্থাৎ তিনি ভক্তকে আস্বাদন করিবার জন্য লোলুপ।

"রসঃ বৈ সঃ" পূর্ব্বে রস শব্দ ভাববাচ্যে ও কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্পন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে; এখন রস শব্দ কর্ত্তরি বাচ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রস। যিনি আস্বাদন করেন, তিনি রসিক বা আস্বাদক। তিনি আত্মারামেশ্বর ও পূর্ণকাম হইলেও অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন অন্য সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার বিরক্তি হইলেও ভক্তিতে তাঁহার আসক্তি আছে, ইহা তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম। তাই শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

অর্থাৎ "আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। ইহা আমার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাঁহাতে আসক্ত।" ভক্তের ব্যাকুলতা বা আকুল ক্রন্দন সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছায়। ইহার অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাহার একটী বলি;—পাণ্ডবগণের যখনই ভয়ানক ২ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহারা আকুলপ্রাণে "কোথায় পাণ্ডবের সখা দেখা দাও" বলিয়া ডাকিয়াছেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছেন—"এই যে দাদা আমি আসিয়াছি, ভাবনা কি?" এইরূপ কৃতজ্ঞ, দয়ার ঠাকুর, ভক্তবৎসল না হইলে তাঁহার জন্য কি আমাদের প্রাণ কাঁদিত? না তাঁহার কথা শুনিয়া কি আমাদের বুক জুড়াইত বা চোখে জল আসিত? তাঁহাকে দেখি নাই কিন্তু তাঁহার করুণার কথা শুনিয়া চোখে জল আসে। ইহাতেই বোঝা যায় তিনি আমাদের কত আত্মীয়। তিনি একমাত্র ভক্তহৃদয়স্থিত প্রীতিরস-সুধার আকাঙ্ক্ষাবান্। প্রাকৃত বা জড়ীয় কোন বস্তু ভগবান্ ভোগ করেন না। কেবল মাত্র প্রীতিরস ভোগ করেন। এই আকাঙ্ক্ষার সত্ত্বা রক্ষা করাই শ্রীবৈষ্ণবদার্শনিকগণের জীবাতু অর্থাৎ ইহাই তাঁহাদের মর্ম্মের কথা বা সার সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণের এই আকাঙ্ক্ষা, অভাব হইতে উঠেনা, স্বভাব হইতেই উঠে। অভাব হইতে আকাঙ্ক্ষা উঠিলে সেটী দোষণীয়; শাস্ত্র উহার রাশি রাশি তিরস্কার করিয়াছেন। আর স্বভাব হইতে উঠিলে উহা ভূষণস্বরূপ, শাস্ত্র উহার বহু বহু পুরস্কার করিয়াছেন। আবার যিনি যত বড়, তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও তত বড়। শ্রীভগবান্, বিভু বা অসীম, তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও অসীম অর্থাৎ তিনি যত যত ভক্তই পান, তাঁহার নুতন নুতন ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদন করিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়না, পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, নূতন ভক্ত পাইলে তিনি পুরাতন ভক্তের প্রতি অনাদর করেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে অসংখ্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ও করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং শতকোটী গোপীগণের সহিত শতকোটী প্রকাশে কেবল মাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীরাসলীলা করিতে পারেন। আর কেহ তো দূরের কথা, অন্য কোন ভগবৎস্বরূপও উহা করিতে পারেন না ও করেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযদুগোপাল গোস্বামি কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ]

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র মুখ্য উপায় ভক্তি, এবং সেই ভক্তির বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুইটী প্রকার প্রধান হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত দুই প্রকার ভক্তিই একমাত্র সাধুসঙ্গ হইতেই লাভ হয়, অন্য কোনও উপায়েই শ্রীভগবানে বিশুদ্ধা-ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না, তাহাই সারার্থপূর্ণ সংক্ষেপে দেখান হইবে। শাস্ত্রে ভক্তিপ্রাপ্তির যত-প্রকার সাধন উল্লেখ করা আছে, সে সমুদায়গুলিই পরম্পরা-রূপে সাধুসঙ্গ অথবা সাধুকৃপাপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন কোনও একটী পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্যলাভের আশায় একটী প্রশস্ত পথের ধারে বৃহদাকার পুষ্করিণী খনন এবং তাহার চারিধারে ফল ফুল ও তুলসীর বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কতকদিন পর একটী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে সেই পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—"এই স্থানেই স্নান করিয়া শ্রীগোবিন্দকে ফুল, জল ও তুলসী দিয়া সেবা করি।" এই ভাবিয়া সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাহার তীরবর্তী ফুল তুলসী চয়ন করিয়া শ্রীগোবিন্দের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেখিলেন—সঙ্গে নিজ প্রাণবল্লভকে নিবেদন করিবার উপযোগী কোনও উপচার নাই; তখন তিনি মনে মনে বড়ই চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। কারণ এই ভক্তিজীবন লাভ করা হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগোবিন্দকে যেমন মানসোপচারে সেবা করিয়া আসিতেছেন, তেমনি যথা কথঞ্চিৎ বাহ্যোপচারেও সেবা করিতেন। বাহ্যোপচারে সেবার কোনও উপকরণ না পাওয়ায় ভক্তি-জীবন ভক্তের পক্ষে চিন্তিত ও দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক। এমত সময়ে একটি পেঁপে গাছে একটি সুপক্ক পেঁপে ফল দেখিতে পাইলেন। সেই পেঁপেটি যেন রসে পাকিয়া শ্রীগোবিন্দে অর্পিত হইবার জন্য ঐ মহাপুরুষটিরই অপেক্ষা করিতেছিল। তখন সেই মহাপুরুষ সেই পেঁপে ফলটি পাড়িয়া শ্রীগোবিন্দে অর্পণ করিবার উপযোগিতা সম্পাদন করতঃ যখন নিজ জীবিতবল্লভকে অর্পণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার করুণার কথা ভাবিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে যে পুণ্যাত্মা ঐ ফলফুলের বাগান ও পুকুরটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাঁহার উপরেও প্রচুরতর কৃপা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"যে পুণ্যাত্মা এইরূপ পবিত্র অনুষ্ঠানে প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের সেবার আনুকূল্য বিধান করিয়াছে, তাহার প্রাণটি যেন আমার সর্ব্বস্বধন শ্রীগোবিন্দের জন্য সর্ব্বদা কাঁদে।" এইরূপ মহাপুরুষের কৃপাশীর্ব্বাদে সেই পবিত্র অনুষ্ঠাতার মন তখন হইতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্য অবশ্যই আকুলিত হইয়া উঠিবে। এইভাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা-প্রাপ্তির সম্ভাবনাতেই নিখিলশাস্ত্রগণ পবিত্র অনুষ্ঠান করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিতেছেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই শ্রীভগবানে ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও অন্য কোনও উপায়েই যে ভগবানে ভক্তিলাভ করিতে পারা যায় না,—তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১২।১২ শ্লোকে রাজর্ষি শ্রীভরত মহাশয় রহূগণ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

> রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি,
> নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
> ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
> র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

হে রহূগণ! এই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান তপস্যা বৈদিক-কর্ম্ম, অন্নাদি দান, পরোপকার, বেদাভ্যাস, উপসিত জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না—যতদিন পর্য্যন্ত মহাপুরুষের পাদরজে অভিষিক্ত না হইবে; অর্থাৎ ভক্তিরসিক মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপা ভিন্ন শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ সর্ব্বথাই অসম্ভব, এবং ভক্তিলাভ বিনাও

ভগবদ্বিষয়ক অনুভূতি লাভ হইতে পারে না। জীব অনাদি-কাল হইতে তাহার নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে, এবং সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই যে তাহার নিত্য সেব্য প্রভু ও নিজে তাঁহার নিত্যসেবক—এই দাস-প্রভুরূপ নিত্যসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভুলটি জীবের অনাদিকাল হইতেই ঘটিয়াছে। এই ভুলের উপরে "কেন ভুলিল" এইরূপ প্রশ্ন চলিতে পারে না। জীবের ভুলটি স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম, যেমন নিম্বফল তিক্ত কেন ও কতদিন হইতে এইরূপ তিক্ত হইয়াছে? অথবা আগুণ পোড়ায় কেন? এবং এই পোড়ান ধর্মটি কত দিনের? এইরূপ প্রশ্ন করা চলে না, তেমনি জীব কত দিন হইল ভগবান্‌কে ভুলিয়াছে, এবং কেন ভুলিয়াছে? এই প্রকার প্রশ্ন করা চলে না। যেটি যাহার স্বরূপের ধর্ম সেটি তাহার অনাদিসিদ্ধ বা স্বাভাবিক। যেহেতু জীব কোনও সময়েই সর্ব্বজ্ঞ নহে, অণুচৈতন্য জীবের জ্ঞানটিও অণু বা প্রাদেশিক। বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বজ্ঞ, জীব তেমন সর্ব্বজ্ঞ নহে। যদি জীব সর্ব্বজ্ঞ হইত, তাহা হইলে মায়া তাহাকে কখনই আবরণ করিতে সমর্থ হইত না। এই ভুলটী জীবের না থাকিলে সে রসময় শ্রীভগবান্‌কে পরিপূর্ণ আবেশে ভোগ করিতে সমর্থ হইত না। কারণ তাহার যখন ভগবদ্-আস্বাদন লাভের সৌভাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে মায়াময় জড়ীয় বস্তু ভুল না হইলে সম্পূর্ণরূপে নিজ অভীষ্ট ভগবানে কেমন করিয়া আবিষ্ট হইতে পারিত? অতএব জীবের এই স্বরূপনিষ্ঠ-ভুল অথবা প্রাদেশিক জ্ঞান শ্রীভগবানেরই কৃপাতে উদ্ভাসিত। তবে সেই ভুলটি যেখানে থাকিলে জীব পরা-শান্তি লাভ করিতে পারে, সেই স্থানেই সে স্মৃতিটি রাখিয়াছে, আর যেস্থানে স্মৃতি থাকিলে সুখ উপস্থিত হয় সেইস্থানে ভুলটি রাখিয়াছে। অর্থাৎ যে মায়া ও মায়াকার্য্য দেহ-দৈহিকাদি জড়ীয় বস্তুতে ভুল থাকিলে জীব পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে, সেইস্থানে অনবরত স্মৃতি রাখিয়াছে; আর যে আনন্দময় ভগবানে স্মৃতি থাকিলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়, জীব সেইস্থানেই অনবরত ভুলটি রাখিয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা হইতে সেই ভুলটি দেহ-দৈহিকাদি মায়াময় জড়ীয় বস্তুতে আসিয়া আনন্দময় শ্রীভগবানেতে অনবরত স্মৃতিটির উদয় হইলেই জীব পরমা-শান্তি ও পরম সুখলাভের অধিকারী হইতে পারে, এবং ঐ ভগবৎস্মৃতিটির নামই ভক্তি।

ক্রমশঃ

মনোজয়

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রই মনুষ্যকে মনোজয় করিবার উপদেশ করিয়াছেন। কোনও শাস্ত্র মুখ্যভাবে এবং কোনও শাস্ত্র গৌণভাবে মনোজয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাংখ্যপাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শনেরও সেই এক ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥ ১০।৪৭।৩৩

অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকলাপ, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মানাত্মবিচাররূপ সাংখ্যযোগ, ত্যাগ, দান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সত্য এই সকলেরই পর্য্যবসান একমাত্র মনোজয়ে, অর্থাৎ মনোজয়ই এই সকলের ফলস্বরূপ। যেমন বিভিন্ন দিগ্‌দেশে প্রবাহিতা স্রোতস্বতীসমূহের পরিসমাপ্তি একমাত্র সমুদ্রে, সেইরূপ শাস্ত্রসমূহের মার্গভেদ থাকিলেও ফল একমাত্র মনোজয়।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিই সকল শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সকল শাস্ত্রই একবাক্যে মনুষ্যকে মনোজয় করিবার উপদেশ দিতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে মনই মনুষ্যের সকল বন্ধন ও দুঃখের

কারণ, এবং মনোজয় করিতে পারিলেই তাহার সকল বন্ধন ও দুঃখ দূর হইয়া নিত্য সুখময় স্বস্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তি সংসাধিত হইয়া যায়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মায়িক-বিষয়াসক্ত মনই তাহার বন্ধনের হেতু, এবং নির্ব্বিষয় মন মুক্তির হেতু বলিয়া কথিত হয়।

এক্ষণে আমাদিগের আলোচনার বিষয় এই যে—এই মন জিনিষটা কি, এবং ইহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ ?

আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যে কোন কার্য্য করি এই মনের সংযোগে আমাদিগের দশটি ইন্দ্রিয়ের একটি কিম্বা ততোধিক দ্বারাই তাহা করিয়া থাকি। আমরা মনে চিন্তা বা সঙ্কল্প করিয়া মনেরই অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। মন আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, এবং আর দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা আমাদের রূপজ্ঞান লাভ হয়, কর্ণ দ্বারা শব্দজ্ঞান, নাসিকা দ্বারা গন্ধজ্ঞান, জিহ্বা দ্বারা রসজ্ঞান এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদের দ্বারা আমাদিগের বচন, গ্রহণ, গমন ও মল-মূত্রাদি ত্যাগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব নিরন্তরই মনে অনুভব করিয়া থাকি এবং মনেই সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি। তাহার ফলে আমরা মনে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখ ভোগ করি। আমরা মনে সকল সময়ে সুখভোগই করিতে চাহি, এবং সেই সুখের নিমিত্ত পুণ্য-পাপাদি নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া অধিকাংশস্থলে দুঃখভোগই করিয়া থাকি। আমরা বিচার করিলে ইহাও বুঝিতে পারি যে, এই মনকেই আমরা "আমি" বলিয়া জানি এবং দেহেন্দ্রিয়াদিকে কখনও "আমি" এবং কখনও বা "আমার" বলিয়া থাকি। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বিচারবলে কখনও বিচলিত করিতে পারিলেও আমরা এই মন হইতে কখনও পৃথক্ হইতে পারি না। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, জন্মগ্রহণের পর আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মন অনবরতঃ পরিবর্ত্তিত হয় এবং কিয়ৎকাল বিষয়সংযোগে সুখ দুঃখ ভোগ করিবার পর আমাদের মৃত্যু হইলে আমাদের এই দেহেন্দ্রিয় কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্ম পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর এই মনের সহিত আমাদের কি হয়, আমরা তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না। আমরা বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, এই মনঃ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় আমাদের অধীন নহে, এবং আমাদিগকেই ইহাদের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল কোন বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত মনে সঙ্কল্প করিয়া এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও সকল সময়ে আমরা তাহা পাইতে পারি না। আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের এই মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের শক্তিও অতি সীমাবদ্ধ এবং আমাদের ইচ্ছানুরূপ একেবারেই নহে। আমরা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তৃত্ব আমাদিগের নাই। কিন্তু এই নিয়ন্তা যে কে তাহা আমরা মনে ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারি না। এতদবস্থায় আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রানুসন্ধিৎসা এবং শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। (ক্রমশঃ)

প্রমাণ নির্ণয়

শ্রীনন্দগোপাল গোস্বামি কাব্যব্যাকরণতীর্থ

এই জগতে যত কিছু বস্তু আছে সেই নিখিল বস্তুই প্রমেয়। প্রমাণ দ্বারা অনুভূত বস্তুই প্রমেয়। আমরা হৃদয়ের মধ্যে যাহা অনুভব করি, তন্মধ্যে কোনটী বা নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা কোনওটী অনুমান গ্রাহ্য, অপর কোনওটী শাস্ত্রদ্বারা অনুভূত হয়। যেমন ঘট' পট প্রভৃতি বস্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করি, দূরবর্ত্তী অদৃষ্ট পর্ব্বতস্থ অগ্নিপ্রভৃতি আমরা অনুমানদ্বারা অবগত হইয়া থাকি, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং অনুমান-

দ্বারা যাহা অনুভব করা যায় না, তাদৃশ ভাব-বস্তুর অনুভব শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা হইয়া থাকে। আমাদের এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, জগতের সমস্তগুলি পদার্থই প্রমেয়। এবং তাহারা প্রমাণসিদ্ধ। অতএব প্রথমতঃ প্রমাণের স্বরূপ অবগত হওয়া প্রয়োজন। এখন সেই প্রমাণ নিরূপণ করা যাইতেছে।

বাৎস্যায়ন মুনি বলেন "প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তদেব প্রমাণম্।" অর্থাৎ প্রমাতা যাহাদ্বারা পদার্থকে অনুভব করে তাহাই প্রমাণ। মতভেদে প্রমাণ বহুবিধ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ভেদে প্রমাণ অষ্টপ্রকার। তন্মধ্যে চার্ব্বাক মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক, ও বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান। প্রভাকর-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান শব্দ, উপমান, ও অর্থাপত্তি। ভট্টমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, এবং অনুপলব্ধি। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, এবং ঐতিহ্য, এই অষ্ট-প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন।

পদার্থের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষকে প্রত্যক্ষ বলে। অনুমিতির করণকে অনুমান বলা হয়। যথা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এস্থলে পর্ব্বতে বহ্নির সত্তাজ্ঞানটী অনুমিতি, ধূম তাহার করণ। আপ্তবাক্য শব্দ, যেমন কেহ উপদেশ করিল 'হিমালয়ে হিম আছে', এই উপদেশ দ্বারা অপরের হিমালয়ে হিমবত্তা-জ্ঞানের প্রতি কারণ, সেই পূর্ব্বোপদিষ্ট বাক্যই আপ্ত-বাক্য। এই আপ্তবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলে। গোসদৃশ গবয় ইত্যাদিস্থলে গরুর সহিত গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞানটী উপমান প্রমাণ।

অর্থাপত্তি, যেখানে সাক্ষাৎ কারণ পরিদৃষ্ট না হইলেও "কার্য্য কখনও কারণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে না," সুতরাং কার্য্যদর্শনে কার্য্যের সাধক কোন কারণের কল্পনা করা। যেমন দিবায় অভোজনকারী পুরুষের স্থূলত্ব দর্শন করিয়া, ভোজন বিনা স্থূলত্ব অসম্ভব, অতএব নিশ্চয় রাত্রিতে ভোজন করে, এই প্রকার কারণ কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। ভূতলে ঘটের অনুপলব্ধি হেতু ঘটাভাব-বোধের কারণকে অনুপলব্ধি প্রমাণ বলা হয়। সহস্রের মধ্যে শত আছে, এই প্রকার সম্ভাবনাকে সম্ভব বলে। যে স্থলে বক্তাকে দেখা যায় না বা জানা যায় না, অথচ পরম্পরারূপে প্রসিদ্ধ, তাহা ঐতিহ্য প্রমাণ। যথা "এই বৃক্ষে যক্ষ আছে" ইহার বক্তা কে তাহা জানা যাইতেছে না, অথচ তাহার কথা পরম্পরাপ্রসিদ্ধ। এই অষ্টপ্রকার প্রমাণ।

যদিও নানাবিধ মতানুসারে প্রমাণ অষ্টপ্রকার, তথাপি উক্ত সমূহ প্রমাণই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অতএব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রমাতাপুরুষ-জীবের ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা, করণা-পাটব রূপ দোষ-চতুষ্টয় থাকায় প্রত্যক্ষ, এবং অনুমান অনেক স্থলেই প্রমেয়কে নির্ণয় করিতে পারে না। যাহা যে বস্তু নয়, তাহাতে সেই বস্তু বুদ্ধির নাম ভ্রম, যেমন শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি। অন্য বস্তুতে চিত্ত আবিষ্ট থাকায় যে অনবধান তাকে প্রমাদ বলে, যেমন চিত্ত অন্যবিষয়ে আবিষ্ট থাকিলে নিকটের গান শুনিতে পায় না। প্রতারণা করিবার ইচ্ছা, বিপ্রলিপ্সা। যেমন স্বজ্ঞাত কোন শাস্ত্রের রহস্য শিষ্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া গুরু তাহা গোপন করেন। ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য, করণাপাটব। যেমন ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য না থাকায় অতি সন্নিকটে বর্ত্তমান পরমাণু প্রভৃতি আমরা দেখিতে পাই না।

প্রমাতা জীবের এই সমস্ত দোষ থাকায়, প্রমাণ সমূহে ঐ সমস্ত দোষ সংক্রমিত হয়। অতএব পৌরুষেয় প্রমাণ-গুলি অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ মায়া-মুগ্ধ জীবের বুদ্ধি অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং উক্তবিষয়ে প্রাকৃত প্রমাতা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত প্রমাণসকল ব্যর্থ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত তত্ত্ব নির্ণয় স্থলে অপৌরুষেয় এবং অপ্রাকৃত বেদই প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং তদনুগত ভাবে প্রত্যক্ষ, ও অনুমান

প্রযুক্ত হইলে, উক্ত উভয়বিধ প্রমাণ অব্যভিচারী হইতে পারে।

আরও বেদ পুরুষনির্ম্মিত নয় বলিয়া তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা, করণাপটব, এই চতুষ্টয় দোষ নাই, বেদ ভগবানের মত নিত্যসিদ্ধ, এবং জ্ঞানময়। অতএব বেদ-প্রমাণে যাহা নির্ণীত হয় তাহাও অভ্রান্ত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান সত্য কি না—ইহা শব্দপ্রমাণবলেই নির্ণীত হইয়া থাকে। শব্দপ্রমাণ কিন্তু নিরপেক্ষ। সে কাহারও ধার ধারে না। তবে উক্ত দ্বিবিধ প্রমাণ কখনও কখনও প্রমেয়-নির্ণয়ে সহায়কারী হইয়া থাকে মাত্র। আর শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে উপমর্দ্দন করিয়া স্বয়ংই মহারাজসদৃশ বিরাজমান থাকে এবং প্রত্যক্ষ, ও অনুমান-প্রতিপাদ্য বস্তুকে অন্যথা করিতে পারে। প্রত্যক্ষ অনুমান কিন্তু শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য-বস্তুকে অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না শব্দপ্রমাণ তাহাকেও নির্ণয় করিতে পারে। যেমন স্বর্গে যে ইন্দ্র আছে, এবং সত্যযুগে ভরত মহারাজের রাজত্ব ছিল, তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, অনুমানের দ্বারাও নির্ণীত হইবার নয়। এমতস্থলে শব্দপ্রমাণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব প্রমেয়-নির্ণয়ে শব্দপ্রমাণই মুখ্যতম সাধন।

প্রত্যক্ষের ব্যভিচার অনেকস্থলে দেখা যায়। ঐন্দ্র-জালিক মায়াপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে কাহারও মস্তক দেখাইলে, উহা যে মায়িক তাহা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারি না, পরন্তু 'এটা দেবদত্তেরই মাথা বটে,' এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। এস্থলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার অবশ্যই স্বীকার্য্য। এইপ্রকার অনুমানও কোন কোন স্থলে ব্যভিচারী হইয়া থাকে। কারণ অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। যেখানে প্রত্যক্ষের ভ্রম হইবে, সেখানে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। যেমন পূর্ব্বক্ষণে বৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু ধূম তখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে কোনও ব্যক্তি অনুমানের দ্বারা সে স্থানটীকে বহ্নিমানরূপে নিরূপণ করিলেন, কারণ তখনও হেতু যে ধূম, তাহার সত্তা রহিয়াছে। এস্থানে অনুমানটী ব্যভিচারী হইবে না কি? যদি কেহ বলেন, ধূমসামান্যই বহ্ন্যনুমিতির জনক নহে, অবিচ্ছিন্ন মূলক ধূমই বহ্ন্যনুমিতির জনক, তাহা হইলেও দোষ হইবে। কারণ ধূমটী বিচ্ছিন্নমূলক কি অবিচ্ছিন্নমূলক তাহা নিরূপণ করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ, ও অনুমান অব্যভিচারী হইতে পারে না। কিন্তু শব্দ-প্রমাণের তাদৃশ ব্যভিচার হয় না। যেমন "হিমালয়ে হিম আছে" এই বৈদিক প্রমাণ কখনও ভ্রান্ত হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, শব্দের প্রামাণ্য নির্ণীত হইলে কীদৃশ শব্দ প্রমাণ হইবে? তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

তত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামি পাদ বলিয়াছেন,—সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্য স্বভাব বিশিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে, অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরায় আগত, লৌকিক অলৌকিক সকলপ্রকার জ্ঞানের নিদান, অপৌরুষেয় অপ্রাকৃতবচনস্বরূপ বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রুতিকেই যে পরমার্থ-নিরূপণে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, মহর্ষি বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রে তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন :—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ"। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে কেবল তর্কদ্বারা বেদার্থনিরূপণ স্বীকার করেন নাই, কারণ তর্ক পুরুষবুদ্ধি-বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পুরুষান্তরোত্থাপিত তর্ক-বৈচিত্র্যে খণ্ডিত হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষোত্থাপিত তর্কের পর পর পুরুষোত্থাপিত তর্কবৈশিষ্ট্যে খণ্ডন অনিবার্য্য অতএব তর্ক অপ্রতিষ্ঠ।

গোবিন্দ ভাষ্যেও প্রায় এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—তর্কে বুদ্ধিচাতুর্য্যই প্রধান বলিয়া—এবং কপিল কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের মতবৈষম্য-পরিদৃষ্টিনিবন্ধন লৌকিক ব্যবহারে অর্থাৎ ঘটপটাদিব্যবহারে তর্কের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও পরমার্থনিরূপণে তাহার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই এবং তর্কের শেষ নাই বলিয়া মোক্ষ-নিরূপণ অসম্ভব হইয়া উঠে, অতএব পরমার্থনিরূপণে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ।

বৈষ্ণব সংবাদ

গত ৩২ শে আষাঢ় রবিবার দিন বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত ১৬১ নং হ্যারিসন রোড্. সিন্দুরিয়াপটি ৺কাশীনাথ মল্লিকের দাতব্য সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয়ের আগ্রহে কীর্ত্তন-গায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী, শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রোফেসর শ্রীযুক্ত নবীগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয় মিলিত হইয়া "উত্তর গোষ্ঠ" লীলাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীলীলাকীর্ত্তনে ভক্তিরসিক শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বড় আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। এই জাতীয় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ লীলারস-কীর্ত্তন আজকাল প্রায়ই বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহোদয় প্রভৃতির বিশেষ আন্তরিক প্রযত্নে অদ্যাপি অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মাগণ এই জাতীয় লীলারস কীর্ত্তন শ্রবণে নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন, এবং তাঁহাদের লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য প্রাণে একটা আশঙ্কা জাগিয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই আশান্বিত হইলাম।

ঐ রবিবার দিন চালতা বাগান ১।১ এ, সেকেণ্ড লেন শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে মহাসমারোহের সহিত অপরাহ্ণ ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত একটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীশ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের স্বত্ব লইয়া আবাগড়ের মহারাজ এবং রঙ্গনাথমন্দিরের মোহান্তমহোদয়ের সহিত শ্রীকুণ্ডবাসী নিষ্কিঞ্চন শ্রীবৈষ্ণবগণের বহুদিন যাবৎ যে বিবাদ চলিতেছিল, গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ মথুরার নিম্ন আদালতে ঐ মামলার তারিখ নির্দ্ধারণ থাকায় ভক্তিজীবন ভারতবিখ্যাত ব্যারিষ্টার পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রঞ্জন দাশ (শ্রীযুক্ত পি, আর দাশ) এবং পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়, প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের আদেশানুসারে উক্ত তারিখে শ্রীমথুরায় নিজ ব্যয়ে যাইয়া ৯ দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের স্বত্বপ্রমাণে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণেরই পক্ষে যে জয় লাভ করাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, সেই মহৎ কার্য্যের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর শরীর যদ্যপি খুবই অসুস্থ, তথাপি তিনি আনন্দোল্লাসভরে নিজের শরীরের দিকে না তাকাইয়া সভ্যা-কালে মিলনমন্দিরে উপস্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিত-বাদীর সম্পাদক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবসুরামানন্দের বংশধর শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীর উপযুক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রফুল্লচিত্তে আসন গ্রহণ করেন। তৎপর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী অত্যন্ত উল্লাসভরে ও ভক্তিবিনীত হৃদয়ে শ্রীপ্রভুপাদকে অর্ঘ্য মাল্য চন্দনাদি দ্বারা পূজা করেন। তৎপর সুললিত ভক্তি-প্রীতি-মাখা সরল ভাষায় শ্রীল সভাপতি প্রভুপাদের সুযশ কীর্ত্তন করতঃ সম্মিলনীর শ্রীমন্দির শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং নাটমন্দিরাদির নির্ম্মাণকার্য্যে মুখ্যতম উদ্যোগী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস নন্দী মহাশয়ের কৃতকার্য্যের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া তাহাকে মাল্য চন্দনে বিভূষিত করতঃ সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কেও মাল্য চন্দনে বিভূষিত করিয়াছিলেন তৎপর ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় যে প্রকারে প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়ের নিকটে "শ্রীকৃষ্ণ" মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিয়া অর্ঘ্যমাল্য চন্দনাদি দ্বারা উভয়কেই যথেষ্ট মর্য্যাদা করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতায় শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্র যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন—সম্পাদক মহাশয় এবিষয়েও বিশেষ ভাবে বক্তৃতা করিয়া সমবেত ভক্তগুলীকে প্রচুর আনন্দিত ও প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতি মহাশয় আবেশপূর্ণ ও নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে এবং প্রধানতম এটর্ণি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহোদয় প্রভৃতির শ্রীসম্মিলনীসম্বন্ধে বিনা স্বার্থে কৃতকার্য্যের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করেন, এবং তাঁহাদিগকেও মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহোদয়কে শ্রীকুণ্ডের মামলা সম্বন্ধে বিনা স্বার্থে ও নিজ ভক্তির টানে কৃতকার্য্যের অভিনন্দনের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য হরিদ্বর্ণ ভূর্জপত্র কাগজে লিখিত ২টি শ্লোকও দেওয়া হইয়াছে। তৎপর ভক্তিসুলভ দীন স্বভাবে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকুণ্ডের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ মনে করেন এইরূপ ভাবে বিশেষ দৈন্যসূচক সুললিত ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

(প্রাপ্ত)

দাবানল-ভয়ে মৃগীগণের মত তাঁহাদের নেত্রপ্রান্ত অত্যন্ত ভীতির ছবি ধারণ করিয়াছে। শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীল-ব্রজরামাগণের এই প্রকার বিরহবিধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজেও বিস্মিত হইলেন। তাহা নাই বা হইবেন কেন? কারণ এ যাবত শ্রীকৃষ্ণবিরহে এই প্রকার অবস্থা কোথাও কাহার হইয়াছে—তাহাতো চোখে দেখেন নাই, কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে সকল অবস্থা হইতে পারে বলিয়া রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, গোপাঙ্গনাগণ সেই বিরহরসেরই যেন সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শ্রীশুক উবাচ—

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়:
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনং।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লস-
ন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকা-
স্তমুত্তমশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥
তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণ-সূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্ন্ পবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ প্রীতিক্ষেত্র ব্রজমধ্যেও যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধা, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপা রমণীগণও সেই উদ্ধবকে দেখিয়া এবং তাঁহাকে কৃষ্ণের অনুচররূপে বুঝিতে পারিয়া তাহার সাহত শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধবের দুইটী বাহু যেমন জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, তেমনি বর্ত্তুল ও স্থূল ছিল। বর্ণখানি শ্যামল, মুখখানি চন্দ্র বা কমলের মত লাবণ্যপূর্ণ, তাহাতে নবকমলদলের মত আয়ত-লোচনযুগল শোভা পাইতেছিল। বয়সে নবীন যৌবন, প্রতিঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌন্দর্য্যরাশি-নিষেবিত, কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল, কটিতটে কনককান্তিহারী পীতবসন, অঙ্গে পীত উত্তরীয়। শ্রীমথুরা হইতে আসিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রসাদী পদ্মমালা যাহা ধারণ করাইয়াছিলেন, আজও সেই মালাটী তাঁহার বক্ষে শোভা পাইতেছে। উদ্ধব যখন সরোবরে স্নান করিতেছিলেন, তখন ঐ মালাটী তীরে রাখিয়া আহ্নিকাদি কৃত্য সম্পাদন করতঃ পুনরায় আত্ম-বিভূষণরূপে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। মালাটী কিন্তু একটুকুও মলিন হয় নাই, তাহা হইবেই বা কেন? যাহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাদরে নিজকণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা যে অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। আর ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালাটীই তাঁহার কৃপার প্রতিনিধি-রূপে কার্য্য করিবে বলিয়া শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদীবস্তুর অলোকসামান্য ক্ষমতাবিশেষের কথা কেই বা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে? মণিমন্ত্র-ঔষধের প্রভাব যেমন অচিন্ত্য, তেমনি শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ হইতে উত্থিত বিলেপন এবং তাঁহার শ্রীনাম ও নির্ম্মাল্য-মালার প্রভাবও অচিন্ত্য বলিয়া মহানুভবগণমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই শ্রীউদ্ধবকে দেখিবামাত্র শ্রীল ব্রজা-ঙ্গনাগণ অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন "হে সখীগণ! আমরা পূর্ব্বে জানিতাম এই ব্রজে অচ্যুতের সমবয়স, সমানরূপ, সমানবেশ, সমান-স্বভাব সখাগণ যেমন আছে, এমন তাঁহার সখা অন্যত্র কোথাও নাই; কিন্তু আজ এ-কি অপূর্ব্ব-রূপের মানুষ আমাদের নিকট আসিতেছে। ইঁহার রূপ, বেশ, ভূষণ প্রভৃতি সকলই অচ্যুতের মত। এতদ্রূপের মানুষটী কাহার? কোথা হইতেই বা আসিতেছে? তাহাই শ্রবণ করিয়া অন্য কোনও ব্রজাঙ্গনা কহিলেন—"হে সখি! অচ্যুতের মত বেশ-ভূষা কেন বলিতেছ? এ বেশভূষাসকল যে অচ্যুতেরই কারণ উহার ঐ বেশভূষা হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হইতেছে, এ যে আমাদের প্রাণবল্লভেরই অঙ্গসৌরভে সুমণ্ডিত। শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণ যাহা নির্দ্দেশ করিলেন তাহা অতি সুসত্য। কারণ শ্রীউদ্ধব বাল্যাবধি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে— "ত্বয়োপযুক্তঃ স্রগ্গন্ধো বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥" হে নাথ! তোমার

দাসভক্ত আমরা তোমাতে অর্পিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, এবং তোমারই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অনায়াসে মায়া জয় করিতে সমর্থ। অতএব উদ্ধব নিজ ব্রতহানিকর অন্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইবেন কেন? নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণ নিজ নিজ রসের আবেশে যে বাণী উদ্গার করেন, নিখিল শাস্ত্র সমস্বরে সিদ্ধান্তরূপে তাহাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন।"

শ্রীউদ্ধবকে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্যরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভ্রান্তি উপস্থিত হয় নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বিশুদ্ধ ভাবই অভ্রান্ত চক্ষু। শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের কথঞ্চিৎ সাম্য দর্শনে অপ্রাণী বস্তুতেও কৃষ্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণসাম্যদর্শনে প্রাণীবস্তুতেও কৃষ্ণ-ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহাদের বিমলভাবই ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষাকারী হইয়া থাকে। বিকসিত কমলমধুই যাহাদের জীবাতু, সেই মধুপমালা যেমত প্রফুল্লকমলসরোবরের জলসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি যে উদ্ধবের হৃদয়ে অনবরত শ্রীকৃষ্ণনীলাম্বুজ বিকশিত থাকায় অন্তর বাহ্যেন্দ্রিয় সকলই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমকরন্দে সুবাসিত, সেই শ্রীউদ্ধবকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। যেহেতু শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলই শৈশবাবধি একমাত্র পরমাশ্রয়, অথবা যিনি পা-বালিশের মত শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের আশ্রয়, অর্থাৎ যখন শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করেন তখন উদ্ধবের বক্ষঃস্থলে দুইচরণ প্রসারিত করিয়া রাখেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কালবিলম্ব সহিতে না পারিয়া বিচারশূন্যহৃদয়ে এতগুণের শ্রীউদ্ধবকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেই শ্রীউদ্ধবকে রমাপতির রহস্য-বিষয়ের সন্দেশবাহক দূত মনে করিয়া অতিথিসৎকারের অঙ্গরূপে বসিতে একখানি ছিন্নমলিন আসন অর্পণ করিলেন। উদ্ধব মহাশয় কিন্তু শ্রীব্রজাঙ্গনাদত্ত আসনে না বসিয়া দক্ষিণ-হস্তদ্বারা সেই আসনখানি স্পর্শকরতঃ তাঁহাদের আদেশের মর্য্যাদা রাখিয়া ভূতলেই বসিলেন। যেহেতু "দাস" অভিমানী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াদত্ত আসনে উপবেশন করিলে তাঁহাদের অমর্য্যাদাই করা হইত, অথচ আদেশ প্রতিপালন না করিলেও আজ্ঞালঙ্ঘন জনিত অপরাধ ঘটে,এইসব ভাবিয়াই উভয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবার মানসে ভূতলেই বসিলেন। শ্রীসৈরিন্ধ্রীর প্রতিও শ্রীউদ্ধবের এই প্রকার ব্যবহারের কথাই বর্ণিত হইবে। যিনি শ্রীসৈরিন্ধ্রীর প্রতিও এই প্রকার মর্য্যাদা রাখিয়া ব্যবহার করিবেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-গণমুখ্যা ব্রজাঙ্গনাদের প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদাময় ব্যবহার করিবেন তাহা তো বলাই বাহুল্য। তবে মূল শ্লোকে যে "উপবিষ্টমাসনে" এইরূপ উল্লেখ করা আছে, সেটা কিন্তু সামীপ্য-অধিকরণেই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে। তখন শ্রীল ব্রজরামাগণ বিনয়ে অবনতশিরা হইয়া লজ্জা ও প্রসন্নতাযুক্ত অবলোকনে এবং মধুর বচনে তাঁহার সুন্দর আদর করিয়া বিজাতীয় ভাবের অগোচর স্থানে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীলব্রজরামাগণ শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের তাদৃশ রহঃস্থানে আগমন ও উপবেশন প্রভৃতি দর্শন করিয়া মনে মনে বুঝিলেন, ইনি রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনও গুপ্ত সন্দেশ লইয়াই আগমন করিয়াছেন, এবং সেই সন্দেশও আমাদিগের জন্যই প্রেরণ করা হইয়াছে; তাহা না হইলে এ আমাদের বিজাতীয় ভাবের অগম্য স্থানে আসিবেই বা কেন? আর যদি আসিয়াছেই, তাহা হইলে আমাদের দত্ত আসনে বসিবেই বা কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই রমাপতির কোনও গুপ্তসংবাদ ইহার নিকট হইতে পাইতে পারিব,—এইজন্যই যদ্যপি শ্রীউদ্ধবকে তাঁহারা কখনও দর্শন করেন নাই, তথাপি চিরপরিচিত বান্ধবজনের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে রমা-পতি বলিয়া উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে সে (শ্রীকৃষ্ণ) বিবিধসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছে, তাঁহার দূতস্থানীয় উদ্ধবের ভূষণাদিসম্পত্তি দর্শন করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ে যে এই-রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল—"রমাপতি" শব্দের উল্লেখের দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতং।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৩ ॥
অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৪ ॥
অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থ বিড়ম্বনং।
পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥ ৫ ॥

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৬ ॥
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহং।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধব ত্যক্তলৌকিকাঃ
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্গের সৌরভাদিদ্বারাই আমরা জানিতে পারিলাম—বর্ত্তমানে যিনি নিখিল রাজবংশ্যযাদবগণের অধিপতি হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই পার্ষদ হইবে, তাহা না হইলে তোমার অঙ্গ হইতে যদুপতির অঙ্গের সৌরভ নির্গত হইবে কেন? বিশেষতঃ মহারাজাধিরাজের পার্ষদ বলিয়াই মূল্যবান্ অলঙ্কার ও বসনেতে বিভূষিত হইয়া পথের ভিখারিণী আমাদের নিকটে আগমন করিয়াছ। রাজপুরুষ যাহারা,—তাহারাই কাঙ্গালিনীদের নিকটেও এইরূপ মহামূল্যের বসনভূষণে সাজিয়া আসিয়া থাকে। আর এইরূপ সাজিয়া না আসিলে আমরাও তোমাকে রাজপুরুষ বলিয়া পরিচয় করিতে পারিতাম না। অবশ্য কপালের কথা বলা যায় না, একদিন যে জন এই গোব্রজের মধ্যে গোচারক রাখাল বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই জন এখন রাজবংশীয় যাদবগণেরও অধীশ্বর হইয়াছে। তাহার পক্ষে এখন ব্রজে আগমন অবমানজনক বলিয়াই নিজে না আসিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। এখন তাহার সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিতেও প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়, কারণ সে এখন মহারাজেশ্বর হইয়াছে, আর আমরা বৃক্ষতলবাসিনী, পথের কাঙ্গালিনী। কাঙ্গালিনীর সহিত মহারাজরাজেশ্বরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে কেনই বা ভীতির সঞ্চার না হইবে? তুমিও হয়তো সে কথা শুনিয়া আমাদের বড়ই আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া মনে করিতে পার। (অত্যন্ত দুঃখভরেই শ্রীলব্রজরমাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ সম্বন্ধের অপলাপ করিয়া যদুপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।) আচ্ছা! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই মূল্যবান্ বেশভূষায় কি তুমিই সাজিয়া আসিয়াছ, অথবা তোমার প্রভু আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই এইরূপে সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন? যাহা হউক্ এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, আপনি এই ব্রজে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া আগমন করেন নাই, কারণ আপনাদের আগমনের উপযুক্তস্থান এই গরুচরাবাবার মাঠ হইতে পারে না। নিশ্চয়ই যিনি আপনার ভরণপোষণের কর্ত্তা, তিনিই পাঠাইয়াছেন। তাই দাস হইয়া কেমন করিয়া নিজ প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিবেন? সেইজন্য আপনার এ স্থানে আগমন হইয়াছে। তিনি আপনাকে কি কার্য্যসাধনের জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন! যদি বল আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আমরা তো তাহার কেহই নই, বা সেও তো আমাদের কেহ নয়। তাহার সহিত আমাদের দেহসম্বন্ধ, অথবা গ্রামসম্বন্ধ, কিম্বা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতি কোনও সম্বন্ধই নাই, ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতির সম্বন্ধ। যখন সে প্রীতিসম্বন্ধকে অনাদর করিয়া কর্ত্তব্যতার ও ঐশ্বর্য্যের আদর করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে প্রীতিসম্বন্ধের প্রতি অনাদর করিয়াছে। যেখানে প্রীতির আদর থাকে, সেস্থানে কর্ত্তব্যতার এবং ঐশ্বর্য্যের অনাদর স্বতঃই ঘটিয়া থাকে; আবার কর্ত্তব্যতার ও ঐশ্বর্য্যের আদর করিলে প্রীতির অনাদরও স্বভাবতঃই হইয়া পড়ে। তাহার সহিত একমাত্র প্রীতিরই সম্বন্ধ, অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধই ছিল না, তাহা হইলে সে যখন প্রীতিকে অনাদর করিয়াছে, তখন আমাদের সহিতও সম্বন্ধের বন্ধন সর্ব্বথাই ছিন্ন করিয়াছে। অতএব সে যদি আমাদের কেহ হইত, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের নিকট পাঠানো, এবং সান্ত্বনা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্ভব হইতে পারিত। তবে আমরা বুঝিতেছি—এই ব্রজে তাহার স্মরণযোগ্য একমাত্র বিশুদ্ধ স্নেহময় জনক ও জননী ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না, কারণ এই গরু চরাবার মাঠের কথা স্মরণ করাও রাজরাজেশ্বরপদবীপ্রাপ্ত আপনার প্রভুর পক্ষে অত্যন্তই লজ্জা ও ঘৃণাজনক। এই ব্রজে ধনের মধ্যে

কতকগুলি গো এবং গোবন্ধনের রজ্জু ছাড়া আর কিছুই নাই। যে মধুপুরীতে বর্ত্তমানে তিনি বাস করিতেছেন সেস্থানে দেব, নর, রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ প্রভৃতি বহুল সম্পদ্ রহিয়াছে, সেই বৈভবের স্থানে থাকিয়া এ ব্রজের কথা তাহার মনে করা অত্যন্তই অসম্ভব। বর্ত্তমানে এই ব্রজ ও ব্রজের কার্য্যের কথা যখনই তাঁহার মনে উঠে, তখনই হয়তো দাঁত দিয়া জীহ্বা কাটিয়া থাকেন। তবে পিতামাতার প্রীতিসম্পাদনের জন্ম যে আপনাকে পাঠাইয়াছেন সেটীও তাহার গুণে নয়, কিন্তু পিতামাতারই অসমোর্দ্ধস্নেহের আকর্ষণই তাহার মূল কারণ। ভাবিয়া দেখুন যেমন কুম্ভ কখনই মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ মৃত্তিকাকে পরিত্যাগ করিলে কুম্ভের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; কিন্তু দণ্ড-চক্রাদির সহিত কুম্ভের সম্বন্ধ সাময়িক অপেক্ষণীয়। তেমনি পিতামাতা তাহার পক্ষে মৃত্তিকা-স্থানীয়, আমরা দণ্ড চক্রাদি স্থানীয়। অতএব পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে যে নিজেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, তাই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই আপনাকে ব্রজে পাঠাইয়াছেন। চক্র দণ্ড স্থানীয় আমাদিগের প্রয়োজনমত গ্রহণ ও ত্যাগ হইতে পারে ন্যায়বিৎ আপনি ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন। এমন কি মুনিগণের পক্ষেও পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুজনের স্নেহের অনুবন্ধন দুস্ত্যজ, তাই পিতামাতার স্নেহের প্রতিদান করিতে তোমাকে পাঠাইয়াছে। আমাদের মনে বড়ই খেদ উঠে যে কাঙ্গালের ছেলে যদি ভাগ্যবশতঃ রাজপদবী লাভ করে, তাহা হইলে কাঙ্গাল পিতামাতার পক্ষে এইরূপেই পুত্রকৃত অবমাননা লাভ করিতে হয়। অহো! যে পিতামাতা কর্ত্তৃক বুকভরা স্নেহে লালিত, পালিত ও পোষিত, সেই পিতামাতাকেই এই প্রকার ভৃত্যের দ্বারা সংবাদদানে সুখী করিতে পাঠাইয়াছেন। তা বেশ! যদি আসিয়াছেন, তাহা হইলে পথ ভুলিয়া দিশেহারা হইয়া আমাদের নিকটে আসিলেন কেন? আর যদিই বা কাঙ্গালিনীদের দুরবস্থা দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে তাহাতো দেখা হইয়াছে। এখন উঠ, যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ, এবং তোমার প্রভু পাঠাইয়াছে, সেই পিতামাতার অবস্থা নিজচক্ষে দেখিয়া যাও। এবং হয়তো তোমাকে পাইয়া ও তোমার রূপ এবং বেশভূষাদি দর্শন করিয়া তাঁহাদের সকল শোক নিবৃত্তি হইবে ও সুখসাগরে নিমজ্জিত হইবেন। আমরা মথুরা হইতে প্রত্যাবৃত্ত সুবলাদির মুখে শুনিয়াছি যে মধুপুরীতে তুমিই নাকি একজন রসিকভক্ত আছ; তাই তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—যেস্থানে প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া প্রীতি করা হয়, সে স্থানে যতদিন পর্য্যন্ত নিজ প্রয়োজন সফল না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই প্রীতি থাকে, এবং প্রয়োজনসিদ্ধির তরতমতা অনুসারে প্রীতিরও তরতমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে প্রীতিও ভঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা তোমার প্রভুকে কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির মতলবে প্রীতি করি নাই, এবং সেও আমাদিগকে কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রীতি করে নাই। তাহা হইলে এই বিশুদ্ধপ্রেমে বিরহ ঘটিল কেন? কারণ আমরা জানি—যে প্রেমে কৈতব নাই সে প্রেমে কখনও বিরহ নাই। যদি তুমি প্রীতিরসিক হও তাহা হইলে অবশ্যই ইহার উত্তর দানে সমর্থ হইবে। তাহা না হইলে আমরা বুঝিব যে তুমি সকলবিষয়েই সুপণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু প্রীতিরসবিষয়ে সর্ব্বথাই অনভিজ্ঞ। তোমার প্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বহু দূরদেশ মথুরায় গিয়াছেন, সেজন্য আমাদের তেমন দুঃখ বা খেদ হয় না, কিন্তু এই বিমল নিরুপাধি প্রেমে যে কলঙ্ক লাগিল তাহাতেই আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়া পড়িয়াছি। যে প্রেমের অনুরোধে আমরা স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইহকাল পরকাল, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ভাল বা মন্দ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিষয়ে একটুকুমাত্রও অপেক্ষা করি নাই, সেই প্রেমে এখন এই দুরন্ত বিরহ ঘটিল। এ দুঃখ সহিবার আর কি উপায় আছে?

ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়, যাহারা অপেক্ষণীয় পদার্থ উপাধি লইয়া প্রীতি করে, তাহাদের সেই প্রীতিটী স্বাভাবিক হইতে পারে না, কেবল প্রীতির অভিনয়ই করা হয়। স্বাভাবিক প্রীতির রীতিও তোমাকে বলিতেছি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

গুণেন গুরুতাং দোষেণ ক্ষয়িতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেয়ঃ স্বারসিকস্ত কস্তচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

যে প্রেমে স্তব করিলে তটস্থতা প্রকটিতা করিয়া চিত্তের বেদনা ধারণ করে, নিন্দাও পরিহাসরস পোষণ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করে, যে প্রেম গুণদর্শনে গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় না, অথবা দোষদর্শনে ক্ষয় লাভ করে না, কোন অনির্ব্বচনীয় স্বারসিকপ্রেমের এই প্রকারটী প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমার প্রভুর সহিত আমাদের প্রেমের স্বরূপটী এই প্রকারই ছিল। আজ সেই প্রেমে এই দুরন্ত বিরহদর্শনে মনে হয়, যেন কৈতবময় প্রীতির অভিনয়ই করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে স্বার্থ-উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা বন্ধুজনোচিত ভাব প্রকাশ করে সেটী কিন্তু যথার্থতঃ বন্ধুতা নয়, কিন্তু যতটা পর্য্যন্ত প্রয়োজন ততটা পর্য্যন্ত প্রীতির অভিনয় মাত্র। তাহাই ব্রজরামাগণ সুনীতি-অবলম্বনে বহুল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকৈতব প্রীতির রীতি বলিতে লাগিলেন।

ষট্‌পদ ভ্রমরসকল সুমনঃ কুসুমেতে যতক্ষণ মধু পায় ততক্ষণই কুসুমকে আদর করিয়া থাকে, কিন্তু মধু ফুরাইয়া গেলে আর সেই কুসুমের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। তাহাতে কুসুমের কোনই দোষ নাই, কিন্তু ভ্রমর নিজ চাপল্য-দোষে কুসুমের প্রতি যেমন অনাদর করিয়া থাকে, তেমনি শোভনচিত্তা রমণীগণের প্রতি লম্পট কামুক পুরুষগণ প্রীতির অভিনয় করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল হইবার পর চাপল্যদোষে সেই রমণীগণের প্রতি অনাদর করিয়া থাকে। হে মন্ত্রিপ্রবর! স্ত্রীপুরুষের মিথুনসম্বন্ধটীও যদি কোথাও ধর্ম্মপ্রাধান্তে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে মিথুন-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার সম্ভব আছে, কিন্তু যে স্থানে কামপ্রাধান্তে মিথুনসম্বন্ধ, সে স্থানে সেই সম্বন্ধটী কুসুম ও ভ্রমরের মত অস্থিরতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গণিকা বেশ্যাগণ ধনীযুবকগণের প্রতি ততদিন পর্য্যন্ত প্রীতির অভিনয় করে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ধনী যুবকের ধন থাকে; ধন ফুরাইয়া গেলে বেশ্যা আর সেই যুবকের প্রতি ফিরিয়াও চায় না; কারণ ঐ বেশ্যা ধনী যুবকের নিকটে ধনপ্রাপ্তি স্বার্থ লইয়াই প্রীতির অভিনয় করিয়াছিল। সুতরাং ধনের অভাবে আর তাহাকে প্রীতি করিবে কেন? প্রজাগণ যেমন ততদিন পর্য্যন্তই রাজার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই রাজা প্রজাপালনে সমর্থ থাকে। যখন ঐ রাজা প্রজাপালনে সামর্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে, তখন আর প্রজাগণ রাজার প্রতি প্রীতি করে না। কারণ পালনরূপ স্বার্থ উপাধি লইয়া প্রজাগণ রাজাকে প্রীতি করিয়াছিল, সুতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির অভাবে আর প্রীতি করিবে কেন? বিদ্যার্থী ছাত্রগণ ততদিন পর্য্যন্ত অধ্যাপককে প্রীতি করে, যতদিন পর্য্যন্ত নিজের বিদ্যাধ্যয়ন কার্য্য পরিসমাপ্ত না হয়। অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেলে আর অধ্যাপকের কোনই অনুসন্ধান লয় না, কারণ বিদ্যাধ্যয়নরূপ স্বার্থ উপাধি লইয়াই ছাত্রগণ অধ্যাপককে প্রীতি করিয়াছিল, সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে আর প্রীতি করিবেই বা কেন? আরও দেখুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত যজমান দক্ষিণা দান না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই পুরোহিতগণ যজমানের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে, দক্ষিণাটী দেওয়া হইলে আর তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া "তবে এখন আসি" বলিয়া বিদায় লয়। সেস্থানেও পুরোহিতগণের প্রীতির কারণ দক্ষিণালাভ; সুতরাং দক্ষিণা পাইলে আর প্রীতি করিবার প্রয়োজন থাকে না। পাখীকুল ততক্ষণই বৃক্ষের প্রতি আদর ভাব প্রকাশ করে; যতক্ষণ সেই বৃক্ষটী ফলবান্ থাকে, কিন্তু কিন্তু ফল ফুরাইয়া গেলে একটী পাখীও বৃক্ষের অপেক্ষা করে না। সে স্থানেও ফলপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য লইয়াই পাখীকুল বৃক্ষকে প্রীতি করিয়াছিল। ফল ফুরাইয়া গেলে আর প্রীতি করিবে কেন? হে মন্ত্রিপ্রবর! আরও দেখুন—অতিথিগণ ততক্ষণই গৃহের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যনিষ্পত্তি না হয়। ভোজন হইয়া গেলে গৃহে আগুন লাগিলেও ফিরিয়া তাকায় না। সেস্থানেও ভোজন রূপ স্বার্থ উপাধি লইয়াই গৃহের প্রতি অতিথি আদর প্রদর্শন করিয়াছিল, সুতরাং ভোজন নিষ্পত্তি হইয়া গেলে আর গৃহের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে কেন? মৃগগণ ততক্ষণ পর্য্যন্তই অরণ্যের প্রতি আদর করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অরণ্যটী আগুনে পুড়িয়া না যায়। আগুনে পুড়িয়া গেলে আর মৃগগণ সেই অরণ্যের প্রতি আদর পোষণ করে না। সে স্থানেও অরণ্যে বাস রূপ

স্বার্থ উপাধি লইয়াই মৃগগণ অরণ্যকে আদর করিত, বাস-রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভাবে আর বনের প্রতি আদর করিবে কেন ? জার লম্পটপুরুষগণ অনুরক্তা রমণীকেও উপভোগ করিয়া পরে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এস্থানে স্ত্রীপদের বিশেষণরূপে "রক্তা" পদ এবং পুরুষের বিশেষণ-রূপে "জার" পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাই দেখান হইতেছে যে, আমরা তোমার প্রভুতে আজন্মকাল গাঢ় অনুরাগই বহন করিয়া আসিতেছি, তোমার প্রভু কিন্তু আমাদিগকে উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করা। ঠিক যেন জারের মতই হইয়াছে। সে কেন আমাদের প্রতি এরূপ হইল এবং স্বার্থবুদ্ধিশূন্য এই প্রেমে বিরহই বা হইল কেন ? তবে বুঝিতাম যদি সে আমাদের নিকটে কিছু পাইবার আশায় প্রেম করিয়াছিল, কিন্তু সেই বস্তুটী পাইল না বলিয়া প্রেম ভাঙ্গিয়া গেল। যে প্রেমে সেরূপ কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য নাই, সেইরূপ প্রেমে এই দুরন্ত বিরহ রসিকজনমাত্রের মানসেই গুরুতর পীড়া প্রদান করিতেছে ও করিবে। শ্রীল-ব্রজরামাগণ আবেশভরে আরও কহিলেন—"আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলে কেন ?" শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীলব্রজদেবীগণের আবেশভরা-বুকের আর্ত্তিমাখা প্রশ্নটী শ্রবণ করিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। তাহা নাই বা হইবেন কেন ? এই জাতীয় প্রেমের ভাষা তো কখনও শুনেন নাই ! অথবা এই জাতীয় কৃষ্ণপ্রেমের সংবাদ কোনও শাস্ত্রে পাইতে পারেন নাই। যে গোপীপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই বলিলেন "শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্" অর্থাৎ নিখিল শ্রুতি-গণ যে ব্রজগোপীগণের অনুরাগপদ্ধতি অন্বেষণ করে বটে, কিন্তু নিশ্চয় করিতে পারে না। তাই শ্রীউদ্ধব উত্তর-প্রদানে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বাক্ ও বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীলব্রজরামাগণ মনে ভাবিলেন—অরসিকের নিকটে রসের কথার প্রসঙ্গ করিয়া কি লাভ হইবে, বরঞ্চ মনো-বেদনাই পাইতে হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদের হৃদয়, বাক্য ও দেহবৃত্তিসকল একমাত্র শ্রীগোবিন্দেতেই ডুবিয়া গেল। বাহিরের ভালমন্দ কিছুরই অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য থাকিল না। হায় হায়! স্থাবরজঙ্গম, পুরুষ যোষিৎ প্রভৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত, তাঁহারই দূত উদ্ধবকে দর্শন করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার বিরহে এতই কাতরা হইয়া পড়িলেন যে—ব্যাকুলা হইয়া সেই অপরিচিত উদ্ধবের সমক্ষেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া নিজেদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে রহস্যময়ী লীলা হইয়াছিল, তাহাও গান করিতে লাগিলেন। সেই কথা শ্রবণ করিয়া কোন্ রসিকজনের মর্ম্মস্থান প্রপীড়িত করিয়া না তোলে ? শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরবয়োচিত নিজ ভাবানুকূল গান করিতে করিতে তাঁহার বাল্যলীলাও গান করিতে লাগিলেন, কারণ শ্রীলব্রজরামাগণের বাল্যাবধিই শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। কেবল যে গানই করিতেছিলেন তাহাই নয়, অবশেষে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া হা কৃষ্ণ ! হা রমানাথ ! হা ব্রজনাথ ! হা আর্ত্তিনাশন ! একবার আসিয়া তোমার ব্রজের দশা দেখিয়া যাও। বিশেষতঃ যাহারা শৈশবাবধি তোমাকে ছাড়া অন্য কিছুই জানে না, তোমার সেই ব্রজাঙ্গনাগণ আজ শোকসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, একবার ব্রজে আগমন করিয়া নিজ চরণতরি দানে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।" এইরূপ কতই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটুকুও ভাবিলেন না "আমাদের এই প্রকার ব্যবহারে যদুপুরী হইতে সমাগত অপরিচিত উদ্ধব আমা-দিগকে কি মনে করিবে ?" শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু শ্রীব্রজা-ঙ্গনাগণের সেই প্রকার আকুলতা মাখা আবেশ দেখিয়া ও আর্ত্তিমাখাবাণী শুনিয়া নিজকে অতিশয় ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং ।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৯॥

কোনও একটী ব্রজাঙ্গনা অর্থাৎ শ্রীরাধা মথুরাস্থিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনও মাথুর-নায়িকার সহিত সঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে সহসা সেইদিক হইতে পীতবর্ণ পরাগে রঞ্জিতশ্মশ্রু একটী মধুকরকে দর্শন করিয়া নিজ মান প্রসাদনের জন্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত দূত কল্পনা করিয়া সেই মধুকরটীকে মানভঙ্গীতে দশাদ-চিত্রজল্পময়

লজ্জাবাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। এইস্থানে অনেক বিচার বুঝিবার বিষয় আছে বলিয়া কিছু বিবৃতি করা যাইতেছে।

যে মহাভাব শ্রীল ব্রজাঙ্গনাগণের অসাধারণ লক্ষণ, যেমন গলদেশের মাংসদোলা দ্বারাই গো পরিচয় করিয়া লওয়া হয়, তেমনি মহাভাব দ্বারাই গোপীগণ পরিচিত হইয়া থাকেন। গলদেশের মাংসদোলাটী যেমন গোজাতি ভিন্ন অন্য কোনও পশুতে নাই, তেমনি মহাভাবটীও একমাত্র শ্রীব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীতে নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই মহাভাবের নিখিল চেষ্টা। সেই মহাভাবের লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি নামক রসগ্রন্থে শ্রীপাদরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥

যাবদাশ্রয়বৃত্তি অনুরাগ যদি স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রসিক পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাভাব বলেন। অনুরাগের আশ্রয় রাগ। সেই রাগটী যতটা পরিমাণে উদয় হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে, ততটা পরিমাণে উদয় হইলে তাহার নাম অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি। রাগের লক্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

প্রণয়ের সে উৎকর্ষাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অসম্ভাবনায় অতিশয় সুখও দুঃখধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, রসিক পণ্ডিতগণ তাহাকেই "রাগ" সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। সেই দুঃখেরও পরাকাষ্ঠা মর্য্যাদাপ্রাপ্ত-সুপ্রতিষ্ঠিত-কুলকন্যাগণের ও কুলবধূগণের লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংস। সুপ্রতিষ্ঠিত কুলকন্যা ও কুলবধূগণের পক্ষে লজ্জাত্যাগ এবং পাতিব্রত্যধ্বংস যত দুঃখদায়ী, অগ্নিতে বিষপানে দেহত্যাগও তেমন দুঃখদায়ী হয় না। যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ সেই লজ্জাত্যাগকারী এবং পাতিব্রত্য ধ্বংশকারী হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আকুল আকাঙ্ক্ষার আবেগে সেই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংশ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক বলিয়া অর্থাৎ "এই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধর্ম্মত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিব" এইরূপে আকুল পিপাসার আবেগে প্রীতির যে অবস্থায় পরমসুখে সেই লজ্জাত্যাগ ও পাতিব্রত্যধ্বংশকেও স্বীকার করায়, সেই স্থানেই রাগের ইয়ত্তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই রাগের উপরে উদিত অনুরাগই স্বয়ংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব সংজ্ঞা লাভ করে। এস্থানে স্বসংবেদ্য শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীজন বিশেষ শ্রীব্রজদেবীগণেরই একমাত্র গোচর হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী প্রভৃতিরও এই মহাভাবটী সর্ব্বথা অগোচর। এমন কি—কখনও তাঁহাদিগেতে এই মহাভাবের সম্ভাবনাও করা যাইতে পারে না। "স্বসংবেদ্য" শব্দের এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেখা যায়—কোনও একদিন কুরুকুলের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক দ্রোণাচার্য্য মহাশয় কুরুবালকগণের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—বালকগণ! ঐ বৃক্ষশাখাস্থিত পাখীটির দক্ষিণ চক্ষুতে বাণ বিদ্ধ করিতে তোমাদের মধ্যে কে সমর্থ? তাহাতে সকলেই নিজ ক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন—"আমি পারিব"। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কিন্তু কেহই পারিলেন না। তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন। অর্জ্জুন কিন্তু গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেন ও কৃতকার্য্য হইলেন। তখন শ্রীল দ্রোণাচার্য্য মহাশয় অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! কি প্রকারে তুমি সকলের অসাধ্য এই লক্ষ্যভেদ অবাধে সাধন করিলে? তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—গুরুদেব! আমি লক্ষ্যস্থির করিতে করিতে যখন বৃক্ষসমূহের মধ্যে ঐ বৃক্ষটি মাত্র দেখিলাম তখনও ঐ বৃক্ষের অনেক শাখার মধ্যে যে শাখায় মাত্র পাখীটি বসিয়া আছে, সেই শাখাটি লক্ষ্য স্থির হইল, তখনও আমি শরক্ষেপ করি নাই। তারপর লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে কেবল মাত্র পাখীটাই আমার লক্ষ্য হইল তখনও আমি শরক্ষেপ করিলাম না। তারপর ঐ পাখীটাকে লক্ষ্য স্থির করিতে করিতে যখন অন্য কিছুই আমার দৃষ্টিপথে না আসিয়া শুধুমাত্র ঐ পাখীটার দক্ষিণ চক্ষুই লক্ষ্য স্থির হইল, তখন আমি শরনিক্ষেপ করিলাম।

এই প্রকার সঙ্কেত ও একাগ্রতারই আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। সেইরূপ এই মহাভাব অন্য কোনও দিকে অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়চরিতার্থ-স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকেই দৃষ্টি রাখে। এই মহাভাবের রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে ২টী অবস্থা আছে। তন্মধ্যে নিখিল গোপীযূথে রূঢ় মহাভাবের সত্ত্বা আছে। অধিরূঢ় ভাবটী একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেই বিদ্যমান আছে। সেই অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন নামে ২টী ভেদ। তন্মধ্যে মোদনাখ্য মহাভাবের সাত্ত্বিক বিচার উদ্দীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সাত্ত্বিক বিকার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই সমান ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক বিকারের শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে ৫টী অবস্থা দেখা যায়—(১) ধূমায়িত, (২) জ্বলিত, (৩) দীপ্ত, (৪) উদ্দীপ্ত, (৫) ও সূদ্দীপ্ত। পুলকের মধ্যে কোনও একটী সাত্ত্বিক যথা-কথঞ্চিৎ রূপে উদিত হইলে তাহাকে ধূমায়িত বলা হয়। একটী বা ২টি সাত্ত্বিকের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইলে তাহাকে জ্বলিত বলা হয়। যেস্থানে এক-সঙ্গে দুইটী বা ৩টী সাত্ত্বিকের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম দীপ্ত। আর যে স্থানে ৪টী বা ৫টি সাত্ত্বিক একসঙ্গে প্রচুরতর ভাবে প্রকাশ পায় তাহার নাম উদ্দীপ্ত। যে অবস্থায় একসঙ্গে ৬।৭টি অথবা ৮টি সাত্ত্বিক প্রকাশ পায় তাহাকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলিয়া রসিকগণ বর্ণন করেন। সেই মোদনাখ্য মহাভাবই সুদীর্ঘ বিরহাবস্থায় মোহন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই মোহনাখ্য-মহাভাবে সাত্ত্বিক-বিকারসকল সূদ্দীপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মোহনাখ্য মহাভাবের ৬টি অনুভাব শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। সেই ৬টি অনুভাবের মধ্যে দিব্যোন্মাদ নামে যে ষষ্ঠ অনুভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার লক্ষণও সেই স্থানে এইরূপ উল্লেখ করা আছে—

> এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
> ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
> উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

কোনও এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত এই মোহনাখ্য-মহাভাবের কোনও এক অদ্ভুত ভ্রমাভা বিচিত্র অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দিব্যোন্মাদ বলেন। অর্থাৎ যে অবস্থায় এক দেখিতে অন্য দেখেন, এক বলিতে অন্য বলেন, এক করিতে অন্য করেন, এক ভাবিতে অন্য ভাবেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিচরণ এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাটি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুতে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

> শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
> কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
> শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধবদর্শনে।
> সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
> নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
> ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ॥
> রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
> ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
> গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব।
> ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
> তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
> কভু সিংহ দ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
> চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
> ধাইয়া চলেন আর্ত্ত করিয়া ক্রন্দনে॥
> উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
> তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদের অবস্থাসকল বিশেষ অনুসন্ধান করিলে শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিচয় করিতে পারা যায়। সেই দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প প্রভৃতি বহুল অবস্থা আছে। তন্মধ্যে নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যময় চেষ্টাকেই উদ্ঘূর্ণা বলা হয়। সেই উদ্ঘূর্ণার পরিচয় শ্রীললিতমাধবের ২য় অঙ্কে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সুচারুরূপে দিয়াছেন। মূলকথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে না বসিলে দিব্যোন্মাদের চেষ্টা কেহই কিছু মাত্র বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে না। শ্রীপাদ শুকগোস্বামী শ্রীরাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজদেবীগণের রূঢ়মহাভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

২য় বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৪০ { ১২শ সংখ্যা

ঝুলন লীলায় গৌরচন্দ্র

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি তর্কতীর্থ]

আজি সোণার বরণ গোরা
ঝুলিছে ঝুলনে গদাধর সনে
আয়রে দেখিতে তোরা।
তাম্বুলরাগ শোভিছে অধরে
শত শত চাঁদ লুটায় নখরে
জিনি শতদল কমপদতল
(তায়) লুব্ধ মধুপ ভোরা,
ঝুলিছে ঝুলনে গদাধর সনে
সোণার বরণ গোরা
আয়রে দেখিতে তোরা।

২

নাচিছে গোরার সঙ্গে
নবীন নীরদ অম্বরতলে
প্রদোষে নবীন রঙ্গে,
নাচিছে কোকিল নব নব তানে
ভুবন ভুলায়ে নব নব গানে
বিতরি সুবাস নবীন-কলিকা
দুলিছে নবীনভঙ্গে,
নবীন নীরদ অম্বরতলে
নাচিছে গোরার সঙ্গে
প্রদোষে নবীন রঙ্গে।

কৃষ্ণ আবেশে ভোলা।
যেন, গদাধর রাই গৌর কানাই
খেলিছে ঝুলন খেলা,
নদীয়া হইল নব বৃন্দাবন
ভাগীরথী বয় যমুনা যেমন
কদম্বতলে যেন গোপীকুলে
মাধবে দিতেছে দোলা,
গদাধর রাই গৌর কানাই
খেলিছে ঝুলন খেলা
কৃষ্ণ আবেশে ভোলা।

৪

মুগ্ধ ভকতকুল
হেরি রসময়ে নব ভাবোদয়
আপনা করিল ভুল,
সুরনরগণ বন্দিত-পদে
সঁপিল জীবন কত মনঃসাধে
সকল ভুলিল এ দীন সুরেন
তার, রূপের নাহিক তুল,
হেরি রসময়ে নব ভাবোদয়
আপন করিল ভুল,
মুগ্ধ ভকতকুল।

ঝুলন লীলায় কৃষ্ণচন্দ্র

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি তর্কতীর্থ]

ছুল ছুল ছুল কালিন্দীজল উতল মলয় আজ,
অম্বরতলে নবীন নীরদ পরিয়াছে নব সাজ,
গাহিছে পাপিয়া নাচিয়া নাচিয়া কোকিল ধরেছে তান,
আকুল ছন্দে পরমানন্দে পাগল হইছে প্রাণ ॥
নবীনা লতিকা ঘোমটা খুলিয়া ইতি উতি কারে চায়,
সোহাগে মলয় চিবুক পরশি গোপনে গোপনে চুমিয়া যায়।
কিশোর কিশোরী ঝুলিবে বলিয়া মধুর প্রকৃতি-সঙ্গ,
তাই গোপীকুল হরষ আকুল হেরিতে মোহন রঙ্গ।
ললিতা বিশাখা পরাণ ভরিয়া সাজায় কিশোরী রাই,
রাই তাহাদের জীবন মরণ রাই বিনে কিছু নাই।
আনি পাঁতি পাঁতি মল্লিকা যূথী করা'ল রাইয়ের বেশ,
ভুবন ভোলানো অপরূপরূপ কোনো যুগে নাহি শেষ।
অঙ্গে অঙ্গে উজলি উজলি উঠিছে কুসুমদাম,
তায়, চতুরা নাগরী বিথারি বিথারি লিখেছে নাগর নাম।
তমাল ডালে তালে তালে ঝুলিছে ঝুলন দোলা,
দুলিছে দোলনে নাগর নাগরী বিশ্বভুবন ভোলা।
দিয়ে জয়ধ্বনি কাঁপালো মেদিনী গোপিনীকুল রঙ্গে,
সবার, হলো প্রাণমন প্রেমমগন নৃত্য মধুর ভঙ্গে।
ডুবিল ভুবন পবন গগন মিটিল দীন-সুরেন-কাজ,
নিখিল ধরণী জুড়িয়া হেরিছে ঝুলনে মাধব-মোহন-সাজ।

শ্রীরূপসনাতন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)—২

[শ্রীবামাচরণ বসু]

জগতের আচার্য্য শ্রীরূপসনাতন।
মহাপ্রভুর মনোবৃত্তি প্রকাশে দুই জন॥
(ভক্তিরত্নাকর)

দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
(শ্রীচরিতামৃত)

নীল, রক্ত, পীতাদি বহুবিধ বর্ণের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিক বিক্রিয়াচ্ছবি সুনীল গগনপটে সমুদ্ভাসিত, প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠধাম স্বরূপ, জগজ্জনন‌য়নানন্দ ইন্দ্রধনুর অনুরূপ চিত্র ফলাইবার প্রয়াস করিতে যাওয়া যেরূপ বাতুল চেষ্টা, কলির জীবের মহাসৌভাগ্যে গৌড়চন্দ্রাকাশে সম্প্রকাশিত, প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্তগুণমহিমা বিমণ্ডিত, জগজ্জন নিখিল সন্তাপহর শ্রীনবদ্বীপসুধাকরের নিত্যসহচর শ্রীরূপসনাতনের মহাবৈচিত্র্যময়ী কোটিসমুদ্রগম্ভীর লীলা-কাহিনী বর্ণন করিতে যাওয়া মাদৃশ অনধিকারীর পক্ষে ততোধিক বাতুলতা। প্রেমময় শ্রীনিতাইচাঁদের অযাচিত করুণাই এই মূককে মুখর করিতেছে, কিন্তু "মন্দ বাজিলে যন্ত্রের দোষ, ভাল যন্ত্রীর গুণে॥" এ কৈফিয়ৎ আমাকে বার বার দিতে হইতেছে তজ্জন্য পাঠক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীরূপসনাতনকে যাঁহারা চিনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং জীবনসর্ব্বস্বজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা মুক্ত-কণ্ঠে পরমার্ত্তির সহিত গাইয়াছেন :—

শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
(শ্রীনরোত্তম)

কলিভব সংসারের তারণ কারণ।
তরণী সৃজিল বিধি রূপসনাতন॥ (শ্রীভক্তমাল)

সেই বৈষ্ণব মহাজনগণের অনুগত হইয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিলে, যদি কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যগুণে, সেই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের ভেলা মিলিয়া যায় তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে যেহেতু সাধুমুখে শুনিয়াছি :—

"তুহুঁ দাতা শিরোমণি অতিদীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে।

সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট প্রাপ্তিও সুনিশ্চিত হইবে, চিরতরে সেবানন্দরসে নিমজ্জিত হইবেন।

প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে॥

তাই পুনরপি বলিতেছি পরমহংসগণের অনুগমন করা ভিন্ন শ্রীরূপসনাতনকে চিনিবার বা তাঁহাদের কৃপাশ্রয় পাইবার গত্যন্তর নাই।

হে প্রেমময় সুধীপাঠক, আসুন আমরাও এই শুভ সুযোগে ভক্তিভরে করজোড়ে প্রেম-আনা-ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাসআচার্য্য প্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া সমস্বরে বন্দনা করি।

*"শ্রীগৌরাঙ্গগুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যান্বিতৌ।
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ অনুভৃতাম্ গোবিন্দগানামৃতৈঃ॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ!
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥
ত্যক্ত্বাতূর্ণমশেষ মণ্ডলপতি শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বাদীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥

* ইহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে নিরস্ত হইলাম, মাধুকরী পত্রিকায় শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুকৃত ষড়গোস্বামীষ্টকের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

প্রেমভক্তি মহাশয় শ্রীলঠাকুর মহাশয় যাহা সহজ বাংলায় বলিয়াছেন "যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।" তাহাই দেবভাষায় গৌরপ্রেমমূরতি শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি "পাপতাপনিকৃন্তনৌ আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ" যাঁহারা জীবমাত্রেরই পাপতাপ নিঃশেষরূপে উন্মূলিত করেন এবং প্রেমসিন্ধুর আবর্ত্ত তুলিয়া জীবকে কৃতার্থ করেন। প্রভু আরো নূতন সংবাদ তারস্বরে এই-রূপে ঘোষণা করিলেন "যে কৈবল্যমুক্তি পাইবার লালসায় সাধকগণ এতদিন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেদান্তের দোহাই দিয়া ছুটিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিচার দ্বারা জীবকৃষ্ণ অভেদ "এই মোক্ষাবস্থা যে প্রধান কৈতব" পরন্তু মহাপরাধ তাহা জীবকে বুঝাইয়া সেই পরমানর্থকর সাধ্যসাধন হইতে জীবকে উদ্ধার করিলেন। শ্রীরূপ স্পষ্টবাক্যে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততো
তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

জগজ্জীবের মোহ ঘুচাইবার জন্য দৈন্যের অবতার শ্রীপাদরূপগোস্বামী এখানে সুতীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া-ছেন, মুক্তিকে পিশাচী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবুও কি জীবের বদ্ধমূল ভ্রান্তি যাইতেছে? এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কাশিমবাজারের ছোট রাজবাড়ীতে রাজা কমলারঞ্জন রায় বাহাদুরের প্রযত্নে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে অকুতো-ভয়ে সেদিন বলিয়াছিলেন—বৃক্ষতলবাসী কৌপীন কন্থাধারী শ্রীরূপগোস্বামীকে চিনিবার ভাগ্য আমাদের এখনও হয় নাই। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ছইশতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামিপাদ তৎকৃত "ভাবার্থ-দীপিকা" নাম্নী টীকার একপ্রান্তে লিখিয়াছেন "প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপিনিরস্ত" এই টিপ্পনীতে বিশেষ কোন ফল হইল না, তাৎকালিক প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের স্রোত ফিরিল না, যুগযুগান্তরের পরে এই সত্য সম্প্রচারিত হইল। জ্ঞানীর মুক্তিবাদকে নিন্দা করিয়া জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত বিশুদ্ধা ভক্তিবাদ যাহার ফলে সেবানন্দ প্রাপ্তি হয় "(কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে সেবানন্দ কাছে)" তাহাই বিঘোষিত হইল। যাঁহারা মুক্তিবাদের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন সেই মহাবৈদা-ন্তিক পণ্ডিতকুলকেশরী বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও দণ্ডীরাজ প্রকাশানন্দ সৎশাস্ত্র প্রমাণাদি দর্শাইয়া "মোক্ষলঘুতাকৃত" ভক্তির বিজয় ডঙ্কা নিনাদিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার-স্বরে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী স্পষ্টকথা শুনাইলেন (সাধক) "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়া বৈষ্ণবকবিগণ মধুর পদ রচনা করিয়া জ্ঞানীর মুক্তিবাদকে ও কর্ম্মীর কর্ম্মবাদকে নিরসন করিয়া বিমল ভক্তিসহকারে গোবিন্দসেবাই যে জীবের পরম পুরুষার্থ তাহাই প্রচার করিলেন। তাই আমরা এখন পথে ঘাটে শুনিতে পাই—

"যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্য দেব পূজক ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥

সর্ব্বশেষে তর্কভূষণ মহাশয় সনির্ব্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিলেন, মৎসরতা পরিহার করিয়া এই সৎসিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া যাহা পারমার্থিক সত্য তাহা জগতের হিতের জন্য প্রচার করিতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি। আমার অকপট বিশ্বাস নিখিল জগজ্জীবের কল্যাণ জন্য বাঙ্গালীর পরমগৌরব ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবি-র্ভাবের ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁহারই উপদেশে গোস্বামীগণের এই প্রচেষ্টা, নির্ব্বাণমুক্তিবাদ ঘুচাইয়া বিশুদ্ধা ভক্তিবাদ স্থাপন।

শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামীগণের চরিত লীলামধ্যে অন্য প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে "গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমগ্নো মুহু"। গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ সেবা-নন্দে নিমগ্ন। এ বিষয়টী সকল সাধকের লোভনীয় বস্তু। আমরা যথাস্থানে তাহা আস্বাদন করিবার চেষ্টা পাইব।

এখন আমাদের প্রথম সমস্যা এই যে শ্রীরূপসনাতনকে মানুষ বলিব, না দেবতা বলিব, সাধক বলিব, না সিদ্ধ বলিব? গৌরপার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী বলিব, না শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয়নর্ম্মসঙ্গিনী সেবাপরামঞ্জরীপ্রধানা শ্রীমতী

রূপমঞ্জরী বলিব? তাঁহাদের জীবনের প্রতিস্তরই দুরধিগম্য। প্রথমে দেখিতেছি তাঁহারা কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাবের মসনদের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সমধিষ্ঠিত হইয়া বিশাল রাজ্য শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন, সামদান ভেদ বিগ্রহ নীতি বিস্তার করিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি-নৈপুণ্যে দুর্দ্দান্ত হিন্দুদ্বেষী মুসলমাননরপতিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করতলগত করিয়া রাখিয়াছেন, ভীষণ ষড়যন্ত্রকারী হিংস্রশার্দ্দূলের ন্যায় সর্ব্বদা হিংসাতৎপর আমীর ওমরাহ কাজিগণকে তাঁহারা সূত্রবদ্ধ পুত্তলিকার মত নাচাইছেন, তখন তাঁহাদিগকে কূটরাজনীতিবিশারদ বিস্মার্ক বা হিণ্ডেববার্গের মত সুচতুর কর্ম্মী ভিন্ন আর কি বলিব? আবার তখনই যবন রাজমন্ত্রীদের অন্য চিত্র দেখিতেছি—

"সদা শাস্ত্রচর্চ্চা করে লৈয়া পণ্ডিতগণ।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন করেন সেবন॥
(ভক্তিরত্নাকর)

ইহা কি জীবে সম্ভবে? এরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাশ্রয়কে পাঠক কি বলিবেন! যাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের বিহারভূমি রামকেলী তীর্থ সন্দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিরত্নাকরের এ চিত্রকে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত বলিতে পারিবেন না। হোসেনসাহার ন্যায় মহাদুর্বৃত্ত বাদসাহের বাইশগজিদুর্গের অনতিদূরে, বারোদুয়ারী মসজিদের সার্দ্ধশতরসির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ রূপসাগর, সনাতনসাগর ও শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড প্রভৃতি বৃন্দাবনীয় লীলাস্থলী।

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধা শ্যামকুণ্ড তাতে॥ ভঃ রঃ

তথা কেলিকদম্ব ও তমাল কানন মধ্যে শ্রীশ্রীমদন-মোহনের প্রস্তর মন্দির অদ্যাপি বিরাজিত দেখিয়া বিস্ময়-বিপ্লুত হইবেন'। এই ভ্রাতৃযুগলকে পাঠক অসাধারণ ঐশীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক না বলিয়া পারিবেন কি? উচ্চহরিনাম করিবার অপরাধে যে হোসেন সাহা হরিদাস ঠাকুরকে বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিয়াছিল, এই কি সেই হোসেন সাহা? হিন্দুর দেবমন্দিরোত্থিত কাসর ঘণ্টা রোল মসজিদে বসিয়া নীরবে হজম করিতেছেন! অথচ এই নিত্য ভজনবিঘ্নকারিগণকে শাস্তি না দিয়া বরং প্রীতি করিতেছেন! "রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন" ইহা আমরা শ্রীসনাতনের মুখেই পাইয়াছি সুতরাং এরূপ মহাশক্তিধর মহাখেলোয়াড় বিরুদ্ধ কর্ম্মকৃৎ জীবকে পাঠক কি বলিবেন? মানুষ বলিবেন না ঈশ্বর বলিবেন?

এখন সিদ্ধ বা সাধক এই সমস্যার সমালোচনা—

শ্রীরূপরঘুনাথের স্তব, শ্রীসনাতনের গীতচ্ছন্দে রচিত পদসমূহ, বৈষ্ণব সাধকগণের অমূল্য সম্পত্তি। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামি নিজে মাল্যাকারে তাহা গ্রন্থন করিয়া সাধককণ্ঠে তাহা হার করিয়া দিয়াছেন। গোপীভাবাবিষ্টচিত্তে কিরূপে তাঁহারা প্রণয়িযুগলের বিভিন্ন প্রকারের সেবা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্তবমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া আছে। সাধক সেই দিশা অবলম্বন করিয়া রাগানুগা পথে অগ্রসর হইবেন ইহাই পরমহিতৈষী শ্রীজীবের আশয়। পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ স্তবের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া দুর্দ্দর্শ রাগমার্গে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমরা পাঠকগণকে সেই অপ্রাকৃত অমৃতের কিঞ্চিৎ মাধুকরী পরিবেশন করিতেছি, তাঁহারা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হউন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী গোপীভাবামৃতরসে নিমগ্ন হইয়া সেবাপরামঞ্জরী আবেশে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে সাজাইতেছেন আর ভাবাবেশে কৃষ্ণমনোমোহিনীর অনুপম রূপমাধুরী বর্ণন করিতেছেন আর প্রেমানন্দে ঘুরিতেছেন—

"সরত্ন স্বর্ণরাজীব কর্ণিকাকৃত কর্ণিকাং
কস্তুরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং
দিব্যাঙ্গদ পরিষঙ্গ লসদ্ভুজ মৃণালিকাং
বলারি রত্নবলয় কলালম্বি কলাবিকাং॥

এখন আর শ্রীরূপ দবীরখাস নাই বা নিখিল তত্ত্ব-বিচারে সুপণ্ডিত রসাচার্য্য গৌরপার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামীও নহেন এখন তিনি প্রধানা সেবাপরামঞ্জরী। এই মঞ্জরী-

গণের সৌভাগ্য ও অধিকার কম নহে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণের অর্থাৎ মধুরলীলার সঙ্গিনী শ্রীললিতা বিশাখা অন্তরঙ্গা সখাগণও যে স্থানে থাকিতে পারেন না বা কুঞ্জমধ্যে থাকিয়া প্রণায়যুগলের যে লীলা দর্শন করিতে পান না সেবাপরা-মঞ্জরীগণ শ্রীমতীর কৃপায় সেই পরম সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়েন না। এখন শ্রীরূপমঞ্জরী নিজানুগতাসখীমঞ্জরীগণকেও সঙ্গে লইয়া লীলা দর্শন করাইতেছেন ও সেবা শিখাইতেছেন। ঐ দেখুন অতি কোমল হস্তে শ্রীমতীর কর্ণমূলে স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকারের ন্যায় বিবিধ মণিরত্নখচিত বিচিত্র তাড়ঙ্ক বিশেষ সাবধানতার সহিত পরাইয়া তদনন্তর রাজনন্দিনীর চিবুকখানি কোমল হস্তে একটুকু উঠাইয়া সেই সুবিকসিত মুখপদ্মের নিম্নদেশে অর্থাৎ অধরপ্রান্তে মনের সাধে কস্তুরীবিন্দু দিয়া একটী কৃষ্ণভ্রমর লিখিয়াছিলেন, তৎপরে প্রাণেশ্বরীর কণ্ঠে প্রাণ বঁধুর অতিপ্রিয় গজমতি হার (যাহার প্রতি মতিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া প্রেয়সীর বক্ষে আপনাকে অনুক্ষণ বিরাজিত দেখিয়া কৃতার্থ হয়েন) দোলাইয়া দিলেন এবং গ্রীবা বাঁকাইয়া একদিঠে কামুমনোমোহিনীর রূপদর্শন করিতেছেন আর সেবানন্দরসে আত্মহারা হইয়া আছেন, এখন পাঠক ইঁহাকে সিদ্ধ না বলিয়া পারিবেন কি? ইহাইত সাধনের চরম ফল,—সেবানন্দপ্রাপ্তি। পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈষ্ণবমহাজনেরা যাঁহারা ইহার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহারা বলেন "কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে সেবানন্দ কাছে।" পাঠক আবার দেখুন—সেই চরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত পরমানন্দরসে নিমগ্ন শ্রীরূপ শ্রীযমুনা-পুলিনে বালুকামধ্যে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন সাধকোচিত আর্ত্তিসহকারে কাঁদিতেছেন আর কাকুবাক্যে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন :—

"কৃতাগস্কেহপ্যযোগ্যেপি জনেঽস্মিন কুমতাবপি।
দাস্য দান প্রদানস্য-লবমপ্যুপপাদয়॥

আমি মহাপরাধী, দুষ্টমতি কিছুতেই তোমার কৃপা পাইবার যোগ্য নহি, তবে তুমি পরমকরুণাময়ি, পাপী-তাপী অবিচারে পদাশ্রিতজনকে করুণামৃতে সিঞ্চিত কর, তাই কাতরে জানাইতেছি "প্রসীদাশ্মিনজনে দেবি নিজ দাস্যস্পৃহাজুষি" শ্রীচরণসেবা করিবার অধিকার দিয়া এই জনকে কৃতার্থ করো। এরূপ সাধনোত্তম সিদ্ধের থাকিতে পারে না কাজেই ইঁহাকে এক্ষণে সাধক বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই আমরা শ্রীরূপসনাতনকে সাধক বলিব না সিদ্ধ বলিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। তবে এ সমস্তই লীলার ভঙ্গী, মাদৃশ মোহাচ্ছন্ন, সংসার-সাগরে নিপতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমকরুণাময়ের এই কারুণ্য লীলা। শ্রীভক্তমাল খাঁটী কথা বলিয়াছেন, অত বিচার বিতর্ক করিয়া লাভ নাই আমরা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি উঁহাদের সবই "চিত্রভাব চিত্রলীলা চিত্রব্যবহার" এই দেখুন মীরাবাই শ্রীরূপের দর্শন প্রার্থনা করিয়া দাসী পাঠাইলেন, শ্রীরূপ বলিয়া পাঠাইলেন আমি পুরুষ, ষড়বর্গের অধীন কিরূপে স্ত্রীলোক দর্শনে যাইব?

অথচ একদিন বিস্মিত সনাতন দেখিলেন শ্রীরূপ গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য ভোগ রাঁধিতেছেন স্বয়ং শ্রীমতী শ্রীরাধারাণী সেই সেবা কার্য্যের টহল (সহায়তা) করিতেছেন। "শ্রীমতী কিশোরী জীউ টহল করেন" ভক্তমাল। ইহা তর্ক যুক্তির অতীত। তবে বিশ্বাসীর কাছে এই অলৌকিকতা মাখা সাধনের মর্য্যাদা খুব বেশী, ইহা কিন্তু সকল ধর্ম্মের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা একেবারে বর্জ্জনীয় নহে।

নিভৃত বনমধ্যস্থিত সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সৌগন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া শতযোজন দূর হইতে ভ্রমর মধুলোভে ছুটিয়া আইসে। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া "আকবর বাতসা আইলা দর্শন লাগিয়া" সৈন্যসামন্ত লোকজন দূরে রাখিয়া অতি দীনভাবে শ্রীযমুনা তীরে সমুপবিষ্ট শ্রীসনাতনের সম্মুখে—

যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে॥ ভক্তমাল।

রাজদর্শন নিষ্কিঞ্চন ভক্তের করিতে নাই, শ্রীরূপ লীলা-স্মরণে আবিষ্ট, তাঁহার দর্শন আকবরের ভাগ্যে আদৌ মিলল না। সত্যধর্ম্মমত সংগ্রহ ও বিশুদ্ধ ভজন পদ্ধতি জানিবার জন্য নবীন বাদসাহের এই নবোদ্যম। তিনি সকল ধর্ম্মের সারতথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, সাধু সন্ন্যাসী সুফি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে সমাদরে আহ্বান করিয়া নিগূঢ়

ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সাধনপ্রণালীর উপর দিল্লীশ্বরের বিশেষ আস্থা, বিশেষতঃ নবাবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য তাঁহার চিত্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাঁহার আভাস আমরা দেখিতে পাই "আইনী আকবরী"তে। প্রথমেই এক অলৌকিক ঘটনাই উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাই। একদিন আকবর পাতসাহ সুরক্ষিত রাজান্তঃপুরের ত্রিতল গৃহের বারান্দার সন্নিকটে (Near a balcony where the Emperor used to sleep) বিচিত্র বিমানে সমাসীন একটী দিব্যমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া চমকিত হইলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে অবতরণ করিলেন না, বিমানোপরি থাকিয়াই সত্যধর্ম্মানুসন্ধানতৎপর নবীন দিল্লীশ্বরকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত রহস্য, পৌরাণিক কাহিনী, শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা ও দার্শনিকতা, সেবাপূজার প্রণালী ও আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি ও সূর্য্যের উপাস্যত্ব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিষ্ণুর ত্রিগুণাবতার, কৃষ্ণ রাম ও মহামায়ার স্বরূপ তাঁহাদের অবতাররূপে আবির্ভাব ইত্যাদি তত্ত্বের আভাস জানাইলেন।*

আবুল ফাজেল বলেন, বাল্যকাল হইতেই আকবর সত্যানুসন্ধানী ছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে ঈশ্বর জানিত মহাপুরুষ আছেন, তাঁহারা ভজনবলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং জগতের কল্যাণ জন্য অনেক সার সত্যের প্রচার করিয়াছেন। সম্রাট হইয়া মুনি ঋষি ব্রাহ্মণগণের সহিত পাতসাহের যতই নির্জ্জন আলাপ ঘন ঘন হইতে লাগিল (Frequent private intermited with his majesty) ততই তিনি হিন্দুধর্ম্মের দিকে বেশী ঝুঁকিতে লাগিলেন।

দিল্লীর রাজসিংহাসন প্রাপ্তির প্রথম বর্ষেই আকবর শুনিলেন লাহোর প্রদেশের এক মহাত্মা পাঞ্জাব লাহোর অঞ্চলে কি এক অপূর্ব্ব সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। বাদসাহ শুনিলেন—

> কৃপা করি নিজশক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া।
> উদ্ধারিলা সর্ব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া॥

আরো শুনিলেন—

> মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইলা।
> নামসঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণব আচার প্রচারিলা॥ ভক্তমাল

ক্রমে সেই মহাপুরুষের প্রচেষ্টায় মথুরা, গুজরাট, সুরাট প্রভৃতি স্থানও এই নব প্রেমধর্ম্মের প্রচার হইল। কাজিগণ সন্ত্রাস্ত হইয়া বিধর্ম্মীকে শাসন করিবার জন্য বাদসাহের নিকট নালিশ করিলেন কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। বাদসাহ তাঁহাকে বাঁধিয়া না আনিয়া মহাসমাদরে দোলায় চড়াইয়া আনিলেন উচ্চাসন দিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নানা ধর্ম্মোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পাইয়াছেন জানিয়া শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের অনেক তথ্য অবগত হইলেন। যাহা খুঁজিতেছিলেন সেই জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে জীবকে অবিচারে নামপ্রেম বিলান শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম। অহিংসা পরনিন্দা অসাধুসঙ্গ বর্জ্জন ও কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা ও ভক্তসেবা হইল তাঁহার সদাচার। এই মহাপুরুষের নিকটই শ্রীরূপসনাতনের ত্যাগ বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা রাজদর্শনকে বিষভক্ষণের ন্যায় মনে করেন আর তাঁহাদের সেরূপ চিত্তবৃত্তি নাই অনুক্ষণ লীলাস্মরণে গ্রন্থালোচনায় নিমগ্ন থাকেন ইত্যাদি বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই স্থির করিলেন। আইনি আকবরীতে এই সাধুর নাম পূজকোত্তম (বোধ হয় পুরুষোত্তম হইবে) বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ইনিই ভাগ্যক্রমে যৌবনকালে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পান ইঁহার পরিচয় ভক্তমালে এইরূপ পাওয়া যায়—

> "নিত্যসিদ্ধ তেঁহ গৌরাঙ্গের অনুচর।
> জন্মিলা পশ্চিমের লোক করিতে উদ্ধার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার ভক্তি আচরণে পরিতুষ্ট হইয়া "নিজকণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাহে দিলা" তদবধি তাঁহার

* He instrucled His Majesty in the secrets and legends of Hinduism in manner of worshipping idols. The Sire, the San and of revering the cheef Gods as Brahma, Mahedeb, Brisnue, Krisna, Rama and Mohama who are suppored to have been men in their beelcif once, as Gods and other as angels.

নাম হইল কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী। শ্রীচরিতামৃতেও উল্লেখ আছে "হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম" বোধ হয় ইনিই তিনি.।

শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তারে।
পশ্চিম দেশেতে কর ভক্তির সঞ্চারে॥

ভক্তমাল

এই সাধুমহান্তের সঙ্গলাভের অব্যবহিত পরেই আকবরের তীর্থ দর্শনে যাত্রা এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের সঙ্গলাভ। রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া সনাতন প্রথমে মুখ হেট করিয়াছিলেন, শেষে বাদসাহের দীনতা ও আর্ত্তির ভাব বুঝিয়া সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। বাদসাহের মন জানিয়া অনেক রহস্যতত্ত্বের আভাস জানাইলেন। আকবরের সকল প্রশ্নের সুসমাধান হইল তিনি কৃতার্থ হইয়া তাঁহাদের কোনরূপ সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন। বাদসাহের গরিমা বুঝিয়া সনাতন ভঙ্গী করিয়া প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিলেন—

তুমি কিবা দিবে মুঞি পাইনু যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান॥

তবে নিতান্তই যদি সেবা করিবার সাধ হইয়া থাকে এই শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করো। আমি এই ঘাটে বসিয়া ভজন করি।

এই ঘাটের ঐ দেখ দুই একটী সোপান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উহা পূর্ব্ববৎ বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইলে সুখী হইব। এইবার দিল্লীশ্বরের গরম ছুটিল, মহাপুরুষের অচিন্ত্য প্রভাবে রাজ অহঙ্কার বিদূরিত হইল। আকবর প্রথমে মনে করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সেবা অল্প অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইবে কিন্তু সনাতন বাদসাহের প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইলেন তখন বাদসাহের অন্তর্দর্শন খুলিল, দিব্য চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবন আত্মপ্রকাশ করিলেন, বাদসাহ দেখিলেন—

নানাবিধ মণিমুক্তা পরশ রতনে।
যমুনার তীর বান্ধা কতেক তাঙ্গনে॥

তাঁহার রাজকোষের সমগ্র অর্থ দিলেও সে মাণিকখচিত সোপানের একটী ধাপ হইবে না। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

মহৎ কৃপার ফল হাতে হাতেই ফলিল, ব্লকম্যান সাহেবের ভাষায় পাঠক অবগত হউন The doctrine of Transmigrafiar of souls especially took a deep root in his heart and huell. His magesty Cost aside the Islamitic revelation regarding resurrection, the day of Judzment and the details comeched with it as also all the ordinances bosed onthe tradition of our Prophet.

Beef was in terdicled and to touch beefs was Considered defiling. His majesty gave up Beef, Garlio, onions and the wearing of a beard and introduced Hindu Customs. He had been in Company with Hindu Libertines and looked upon Cow as something holy. He also believed that it was wrong to kill cows. which the Hindus worship. He lookod upon Cowdung as pure interdicled the use of beef He had also introduced though in morfied form Hindu Customs.

মহৎ কৃপা ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণভক্তি রহু দূরে সংসার না যায় ক্ষয়॥

বিশুদ্ধ সাধু দর্শন মাত্রেই যবনসম্রাটের হৃদয় সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গেল, জন্মান্তরবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, কঠোর শাসনে রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিবারিত হইল, এমন কি গোমাংস স্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল, বাদসাহ নিজে হিন্দুর সাত্বিক আহার ও অনেক পবিত্র সদাচার গ্রহণ করিলেন।

কেহ কেহ ভক্তমালের বিবরণকে অতিরঞ্জিত বা ভিত্তিহীন বলেন, এমন কি আকবরের সহিত শ্রীরূপসনাতনের সন্দর্শনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না যেহেতু তাঁহারা সমসাময়িক নহেন, তাঁহাদের জন্যই আমরা আইনী• আকবরীর আশ্রয় লইলাম, আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীরূপসনাতনের অন্তর্ধান।

(ক্রমশঃ)

একটী গুণের কথা

[শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ]

অনন্তকল্যাণ-গুণরত্নাকর শ্রীভগবানের একটী গুণ করুণা। এই গুণে তিনি ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করেন, ব্রহ্মানন্দ নিমগ্ন আত্মারাম পুরুষকে নিজদাস্যে প্রলুব্ধ করিয়া সমাধিচ্যুত করেন এবং পতিত-দুর্গত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভাগবতোত্তমজনে এই গুণ ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার প্রারম্ভে, পূতনা মোক্ষণে এই গুণের প্রচুরতম অভিব্যক্তি দেখা যায়—

পূতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং॥

শ্রীভা, ১০।৬।৩৫

রাক্ষসী পূতনা; শিশুহত্যা করাই তাহার ব্যবসায়; রুধির ছিল তাহার ভক্ষ্য; কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় কোলে তুলিয়া লইয়া তীব্র বিষমাখা স্তন তাঁহার মুখে দিয়াছিল; এত দোষ যাহার, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ নরকে বা আসুরীযোনিতে নিক্ষেপ না করিয়া, বৃন্দাবনীয় লীলার অপ্রকটপ্রকাশে—গোলোকে স্থান দিয়াছেন—এই অবস্থায় তাহাকে আত্মদান করিয়াছেন। ঈদৃশী উত্তমাগতি প্রাপ্তিতে পূতনার কোন যোগ্যতা ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম করুণাই তাহার সদ্গতি লাভের একমাত্র হেতু। তাই, শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগবিধুর শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন—

অহোবকী যং স্তন কালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ শ্রীভা, ৩।

"অহো! অসাধ্বী পূতনা, যাঁহাকে হত্যা করিবার মানসে কালকূটবিষমাখা স্তন দান করিয়া ধাত্রীজনের উপযুক্তা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন দয়ালুর শরণাপন্ন হইব?"

পূতনা মোক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই করুণার আশ্রয় বলিয়া বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীউদ্ধব তাঁহাকে ভজনাশ্রয়রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন।

এই কারুণ্য যে কেবল ভক্তচিত্তকে আকৃষ্ট করে তাহা নহে, আত্মারাম মুনীন্দ্রের চিত্তকেও শ্রীকৃষ্ণ এইগুণে আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ব্রহ্মসমাধি-সম্পন্ন মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীকৃষ্ণ এই গুণেই সমাধি হইতেও আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই বনগমন করিলেন। শ্রীবেদব্যাস তপস্যালব্ধ পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাপুত্র! হাপুত্র! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিলেন; শ্রীশুকদেব যে বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আপনার কাছে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আকুলভাবে ডাকিয়াছিল। তিনি কাহারও ডাক শুনিলেন না; নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, যোগাসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীব্যাস কৌশলে কতিপয় শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে সমাধিচ্যুত করিলেন। তাহাতে পূতনামোক্ষণ লীলার বর্ণনাও ছিল।

শ্রীশুকদেব নিজেই রাজর্ষি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান॥

শ্রীভা, ২।১।১

"হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেহেতু আমি এই মহদাখ্যান—শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি।"

সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে যে আনন্দ, রূপগুণ লীলাসৌষ্ঠবসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের অনুভবে তাহা হইতে সুপ্রচুর আনন্দ আছে। নির্ধূতকষায় মহানুভবগণ রূপাদি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। শ্রীশুকদেবের তাহাই হইয়াছিল। সেই হেতুই তিনি শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণরতি বা প্রীতিই তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদনের একমাত্র উপায়। ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত পুরুষের যে সে প্রীতি আছে, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানযোগের সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মানন্দানুভব; আর, ভক্তিযোগের সিদ্ধাবস্থায় সেই প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীশুকদেব আদৌ জ্ঞানযোগে সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া, ব্রহ্মানন্দানুভবের নিমিত্ত জন্মমাত্র বনগমনপূর্ব্বক সমাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পুতনামোক্ষণলীলা শ্রবণ করিয়া যে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিয়াছেন, তাহা তদীয় শ্রীমুখোক্তি হইতে অনুমিত হয়। পুতনামোক্ষণ লীলা বর্ণনের পর শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতং।
শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিং॥

শ্রীভা, ১০।৬।

"যে মর্ত্ত্যজন শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণের উদার বাল্যচেষ্টা পুতনামোক্ষণলীলা শ্রবণ করে, তাহার গোবিন্দে রতিলাভ হইয়া থাকে।"

বনে যোগরতাবস্থায় শ্রীব্যাসদেবের কৌশলে তিনি তাহা শুনিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলাভের উপযোগী কোন সাধনের কথা শুনা যায় না।

পুতনামোক্ষণ লীলায় প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় কারুণ্যানুভবে শ্রীশুকদেব যে কেবল তাঁহার প্রীতিমান হইয়াছিলেন তাহা নহে, এমন গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন না বলিয়া, নিজের মতির প্রতি দোষারোপও করিয়াছিলেন—

হরেগুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥

শ্রীভা, ১।৭।১১

"হরির গুণে আক্ষিপ্ত মতি হইয়া, হরিভক্তি প্রিয়, ভগবান্ ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মহদাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।"

অপিচ, পুতনামোক্ষণ লীলায় প্রকটিত-কারুণ্য বেদবিজ্ঞাণময় তনু শ্রীব্রহ্মার পর্য্যন্ত বিস্ময়াবহ হইয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—সদ্বেশাদেব স্বকুলাত্মামেব দেবাপিতা—"সজ্জনের অনুকরণ করিয়া পুতনা সবংশে তোমাকে প্রাপ্ত হইল।" অর্থাৎ তোমার যাহা দিবার আছে, সবই পুতনাকে দিয়াছ; এখন যথার্থ সজ্জন ব্রজজনকে যোগ্য প্রতিদান করিতে অসমর্থ হইয়া চিরকাল তাঁহাদের কাছে ঋণী থাকিবে। অহো! কি করুণা!

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর লীলা সহ অবতীর্ণ হইয়া রূপ-গুণ পরিকর-লীলাসহ অন্তর্হিত হয়েন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কারুণ্যগুণে বিজ্ঞগণের পরম সমাদর, বিশেষ আবেশ এবং দুর্গতজীবোদ্ধারে এই গুণের সমধিক উপযোগিতা দেখিয়াই যেন ইহাকে জগৎ হইতে তিরোহিত হইতে দেন নাই; ইহাকে জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। কোথায়? যাহা তাহার আধার, তাহাতে। করুণার আধার কি? হৃদয়। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ হৃদয়ে যদি করুণাকে রাখেন, তবে তাঁহার সঙ্গেইত তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। না, তিনি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার হৃদয় এ জগতেও আছে। সাধুগণ তাঁহার হৃদয়—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং"। আপনার হৃদয়ভূত সাধুগণে তিনি সেই করুণা রাখিয়া গিয়াছেন।

সাধুগণে সেই করুণা সাধারণতঃ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। তবে যখন তাহা অত্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন সাধু তদ্দারা পরিব্যাপ্ত হইয়া করুণাময় শ্রীগুরুরূপে সংসারবদ্ধ জীবের নিকট উপস্থিত হয়েন। সেই হেতু তিনি "কারুণ্যঘনাঘনত্বং" প্রাপ্ত—শ্রীগুরুদেব অমূর্ত্ত করুণার মূর্ত্তপ্রকাশ।

পুতনার সদ্গতি প্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের যে পরিমাণ করুণা পরিব্যক্ত হইয়াছিল, সংসারবদ্ধ জীবোদ্ধারে শ্রীগুরুদেব তাহা হইতে কম করুণা প্রকাশ করেন বলিয়া ত মনে হয়

না। পুতনা—রাক্ষসী—জাতিগতদোষ লোকবালঘ্নী ব্যবসায় গত দোষ, রুধিরাশনা—ভক্ষ্যদোষ, হিংসাবশবর্ত্তিনী—প্রবৃত্তি গত দোষ,—এই কয়টী দোষের আধার বলিয়া সদ্গতি লাভের অযোগ্যা ছিল। শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনে কি এই সকল দোষ নাই? পরপীড়ন, পরহিংসন, অন্যের মাংসে নিজদেহ পুষ্টি করণ, অভক্ষ্য ভক্ষণ, ছলে বলে পরস্বাপহরণ, নরচর্ম্মে আবৃত হইয়া পশুবৎ আচরণ ইত্যাদি দোষ যাহাতে বর্ত্তমান আছে, সে কিছুতেই সৎসমাজে যাইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবই কৃপা করিয়া এমন ব্যক্তিকেও সৎসমাজে গমনের অধিকারী করেন—এমন ব্যক্তিকেও "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্যসার" পাইবার উপযুক্ত করেন। তাহা হইলে এস্থলে পুতনামোক্ষণ হইতে কি কম করুণা ব্যক্ত হইল? এ করুণা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? তাই, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার মূর্ত্ত প্রকাশ; মহাজন বলিয়াছেন—

মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি মান।

অপিচ, পুতনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই করুণা ভাগিনী হইয়াছিল। শ্রীগুরুদেব প্রায়শঃ শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই করুণা বিতরণ করেন। পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল বলিয়া তাঁহার করুণা লাভ করিয়াছিল। শ্রীগুরুদেব কিন্তু যাচিয়া দুর্গত জীবকে বুকে তুলিয়া লন, আপন হৃদয়ে—যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নিকেতন, তাহাতে অধম জীবকে স্থান দেন—তাহার শুভানুধ্যান করেন! অগো কি করুণা! 'এমন করুণার প্রকাশ কি আর কোথাও আছে? তাই মহাজনের কথা—

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকল্পতরু
অদ্‌ভুত যাক প্রকাশ।

এ হেন করুণা বিগ্রহকে যাহাদের উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হয়, শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অপ্রয়োজনীয়তা বোধ যাহাদের উপস্থিত হয় তাহাদের মত হতভাগ্য জগতে আর কে আছে? তাহাদের নিস্তারের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা

অকৃত কর্ণধারা জলধৌ।

চিরকাল ভবসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীব্রহ্মমোহন লীলা

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ]

ব্রহ্মমোহন লীলা সখ্যরসের সর্ব্বোত্তম এবং ইহা প্রাকৃত-বুদ্ধির অগম্য লীলা; সেই জন্য শ্রীশুকদেব স্বামী মহারাজা পরীক্ষিতের নিকট যখন এই লীলাটি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন ইহাকে শ্রীভগবানের অতি 'গুহ্য' লীলা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। বাস্তবিকপক্ষে অপ্রাকৃত নবীন মদনমোহন ঘনচিন্ময়বস্তু শ্রীগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করিতে হইলে হৃদয় হইতে প্রাকৃত বুদ্ধির মাপকাঠি সম্যকরূপে ত্যাগ করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রীভগবানে দোষদৃষ্টি আসিয়া পড়ে—ইহাপেক্ষা জীবের দোষের ক্ষোভের দুঃখের লজ্জার মূর্খতার আত্মহত্যার বিষয় আর কি আছে?

একদা শ্রীভগবান শ্রীহরি নন্দনন্দন সখাগণসহ যখন গোষ্ঠ হইতে নন্দালয়ে ফিরিতেছিলেন, তখন স্থির করিলেন যে পরদিন প্রত্যুষে গোষ্ঠে সকলে বনভোজন উৎসব করিবেন। এদিকে মা ব্রজেশ্বরী গোপালের গৃহাগমনে স্বল্প বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পাগলপারা হইয়া উঠিলেন। কখন বা গৃহছাদে উঠিয়া ঘন তালতমালবেষ্টিত দূর প্রান্তস্থিত শ্যামল গোচারণ ভূমির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কখন বা প্রাঙ্গনে আসিয়া বিস্ফারিত লোচনে গোপাল দর্শন লালসায় রাজপথের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা দূরে শিশুকণ্ঠের কলরব, আনন্দ-সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত বাঁশরীধ্বনি শুনিয়া এবং গোক্ষুরোত্থ ধূলি-

পাটল পথ দেখিয়া মা দুলালের আগমন বুঝিতে পারিয়া অতি সত্বর গমনে অন্যান্য গোপিণীসহ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি পূর্ণ বরণডালা লইয়া বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে রামকৃষ্ণ গোপবৎসাদি সহ নানা মোহন নৃত্যকৌতুকাদি করিতে করিতে এবং নানা সুললিত ছন্দে বেণু শৃঙ্গাদি বাজাইতে বাজাইতে সুসজ্জিত ব্রজের পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন। ব্রজের গৃহ সকল নানা সুন্দর মাঙ্গলিক দ্রব্যভারে সুশোভিত হইয়াছিল এবং সখাগণ সহ ব্রজের সেই প্রাণারামদ্বয় যখন সেই সকল গৃহের সম্মুখীন হইতেছিলেন তখন ব্রজাঙ্গণাগণ তাঁহাদের মস্তকোপরি ধান্য পুষ্পাদি বর্ষণ করিতেছিলেন, সুমধুর শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাদের সুগন্ধ মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া দিতেছিল। ক্রমে তাহারা নন্দালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা ব্রজেশ্বরী পুত্রদ্বয়কে দুই ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চাঁদমুখদ্বয়ে অসংখ্য চুম্বন করিলেন। তারপর তাহাদের মণিময় উচ্চাসনে বসাইয়া বরণকার্য্য প্রভৃতি সমাপনান্তে অগ্নিস্পর্শ করাইয়া তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। মায়ের বিশ্বাস পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে বনের কোন অপদেবতা যদি আসিয়া থাকে, অগ্নি স্পর্শ করিলে পুত্রদ্বয় নিরাপদ হইবে, অপদেবতা পলাইয়া যাইবে। ওহো অসাধু বিনাশের জন্য ধরায় যাঁহাদের আগমন শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা মাতার সম্মুখে উপর্য্যুপরি কয়েকটী অপদেবতা নিধন করিলেন তথাপি মা এমনই মধুর বাৎসল্যরসে আবিষ্ট যে সেই ভবভয়হারী দ্বয়কে নিরাপদ করিবেন বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করাইতেছেন। বলিহারী ব্রজের ভাব। তারপর সুবাসিত শীতল জলে গোপালের অঙ্গাদি মার্জ্জন করিয়া নব বসন পরাইয়া কেশবিন্যাস ও তিলকাদি করিয়া সুঅঙ্গ যথাযোগ্য আভরণে ভূষিত করিয়াদিলেন। তৎপর নানা সুখাদ্য সুপেয় ভোজ্যবস্তুর দ্বারা পুত্রের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করাইলেন। রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে গোপাল মাকে কল্যকার বনভোজনের কথা বলিয়া বলিলেন যে তাহাকে যেন খুব প্রত্যুষে জাগাইয়া দেয়, কারণ তাহাকেই সখাগণকে জাগাইতে হইবে।

যশোদানন্দন মণিপালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছেন। মাও সেই ঘুমন্ত শিশুটির বুকে দক্ষিণহস্তটি রাখিয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছেন। মধ্যরাত্রে পুত্র চমকিয়া উঠিলেন, মাও জাগিয়া উঠিলেন। বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো দেখিয়া পুত্র বলিয়া উঠিল 'মা! রাত্র প্রভাত হয়ে গেল তুমি আমায় ডাকলে না?' আশ্বাস দিয়া মা পুত্রকে পুনরায় নিদ্রিত করিলেন। কুলায় কুলায় পাখীরা যখন প্রভাতী-গান গাহিয়া দুলালের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, দুলাল উঠিল। মুখ প্রক্ষালনাদি সম্পন্ন হইলে মা দুলালকে রাখাল বেশে সাজিয়ে দিবার আয়োজন ঠিক করিয়া লইয়া সম্মুখে উচ্চ মণিময় আসনে বসাইলেন, মাতৃস্থানীয়া গোপীরাও চারিদিকে আসিয়া বসিলেন। মা প্রথমে গোপালের মাথার ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশপুঞ্জের উপর বঙ্কিমভাবে শিখীচূড়া বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাতে একটি মতির মালা জড়াইয়া দিলেন। তারপর গলায় একটি বৈজয়ন্তীর মালা পরাইয়া দিয়া দীর্ঘ নিবিড় পক্ষ্মশোভিত আকর্ণায়ত চক্ষু দুটি স্নিগ্ধ কাজল দিয়া আরো টানা করিয়া দিলেন, তুলি দিয়ে আঁকার মত সুঠাম তাঁর ভ্রূযুগল, অল্প কাজল বুলিয়ে আরো সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। সুন্দর ললাটদেশে বিমল ধবল সুগন্ধ চন্দন তিলকের দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। সুকর্ণদ্বয়ে দুইটি মুক্তার কুণ্ডল এবং সুগোল বাহুদ্বয়ে মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণ কঙ্কন পরাইয়া দিলেন। চরণে নূপুর পরাইয়া উহার তলদেশ অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মুক্তাখচিত পীতবর্ণের ধড়া ঝুলাইয়া দিলেন। যদিও গোপাল আজ বনে বনভোজন করিবেন তথাপি মা দুলালকে কিছু প্রাতঃভোজন করাইয়া দিলেন। গোপালের আজ সখাগণকে ডাকিবার পালা গোপাল ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই মা মাঙ্গলিক দ্রব্য আনিয়া তাড়াতাড়ি পুত্রের গোষ্ঠযাত্রা করিয়া দিলেন। তারপর মা নিজের পায়ের ধূলা গোপালের মাথায় দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বার বার নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন এবং মস্তকে ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দিলেন। যাবার মুহূর্ত্তে মোহন বাঁশী আর রাঙ্গা পাঁচননড়ি হাতে তুলিয়া দিলেন, নানা সুখাদ্যে শোভিত মনোহর

শিক্য কাঁধে ঝুলাইয়া দিলেন এবং মাঠে খুব সাবধানে থাকিতে বলিলেন কারণ সে দিন অগ্রজ বলদেবচন্দ্র যাইবে না, তাহার জন্মতিথি উৎসব ছিল। চারিদিক হইতে মাঙ্গলিক ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ গৃহপ্রাঙ্গন হইতে নির্গত হইলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের রাজপথে দাঁড়াইয়া সখাগণের উদ্দেশ্যে মনোহর বংশীধ্বনি করিলেন। সকল সখা শুনিল তাদের প্রাণকানাই তাদের নাম ধরিয়া বাঁশী বাজাই-তেছে। মুহূর্তকাল মধ্যে প্রত্যেক গোপবালক নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুমনোহর রাখালবেশে হস্তে শিক্য বেত্র বিষাণ লইয়া প্রাণকানাইয়ের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক সহস্র করিয়া গোবৎস ছিল এবং তাহারাও সংখ্যায় সহস্র সহস্র ছিল আর নন্দ-নন্দন স্বয়ং এক অর্ব্বুদ গোবৎস লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের পরিধিমাত্র চৌরাশী ক্রোশ, ইহার মধ্যে এত গোপবালক ও গোবৎসের সংস্থান কিরূপে হয়? শ্রীবৃন্দাবনধাম-তত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আমাদিগের বুঝা উচিত। একদিন গোপাল মায়ের কোলে শুইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতেছে, মাতৃদুগ্ধপানাধিক্য হেতু জৃম্ভন তুলিতেছে মা সেই মুহূর্তে পুত্রের ক্ষুদ্র মুখবিবরে' সমস্ত বিশ্ব দর্শন করিলেন অর্থাৎ যাহার সমগ্র অবয়বটি মা ব্রজেশ্বরীর ক্রোড়াস্তর্গত এবং যাহার উদরটি যশোদার সমু-দায় স্তন্যদুগ্ধ পানে অসমর্থ তাহারই ক্ষুদ্রমুখে চৌদ্দভুবন দেখিলেন। সসীমের ভিতর এরূপ অসীম দর্শন কিরূপে সম্ভব? যুগবৎ সসীম-অসীম হওয়াই হইল শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি। আবার যে ধাম এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিময় পুরুষের আশ্রয়স্থল হইয়া তিনি না জানি তাবার কি বড় অচিন্ত্যশক্তিশালী পদার্থ। অতএব শ্রীধাম বৃন্দাবনের সঙ্কুচিত অসঙ্কুচিত হওয়া তাহারই নিজ ইচ্ছাধীন। আজ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলায় সহায়তা করিবে বলিয়া শ্রীধাম আপন অচিন্ত্যশক্তিতে বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিল।

(ক্রমশঃ)

প্রীতি-সন্দর্ভ

[শ্রীগোপীনাথ বসাক]

'নিখিলপরমানন্দ-চন্দ্রিকার যিনি চন্দ্র
অখিল সৌভাগ্যসার-ধন।
প্রাকৃত সত্বের প্রাণ, অনন্তবিলাস-বান—
বিশুদ্ধ সত্বের উল্লাসন॥
অসমোর্দ্ধ ভগবানে, চিত্তের অবতারণে
স্বপ্রকাশ-ময় স্বভাবেতে—
যাহার উল্লাস হয়, নিখিলমায়াবিষয়—
যারে কভু নারে খণ্ডাইতে।
কৃষ্ণের সন্তোষ বিনে, যাহার স্বভাবে আন—
তাৎপর্য্য নারে সহিবার।
হ্লাদিনীর বৃত্তিসার—বিশিষ্ট-স্বরূপ যার
(কৃষ্ণঅন্তরঙ্গাশক্তিসার)॥

কৃষ্ণ আনুকূল্যাত্মক—আনুকূল্য-অনুগত
প্রাপ্তি ইচ্ছাময় জ্ঞানাকৃতি।
ভক্তমনোবৃত্তিব্যূহ, বিশেষ যাহার দেহ
সুধাসার স্বাদু-রস-রতি॥
"ভক্তাত্মগোপনসার"-গুণময় চন্দ্রহার
অশ্রুমুক্তাদিভূষা ভূষিত।
নিখিল গুণের খনি, যত পুরুষার্থ মণি,
যার পদে দাস্যভাবাশ্রিত॥
কৃষ্ণপাতিব্রত্য ব্রতে, আত্মহারা (স্বভাবেতে) প্রকৃতিতে
সর্ব্বচিত্ত হরিকৃষ্ণচিত—
প্রতিক্ষণে হরি সেই—হরিকে সেবিছে সেই—
"প্রীতি", গোপীকৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষিত॥

পাগল প্রভু

(সন্ন্যাস লীলা)

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত]

পাগল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ একচক্রা শূন্য করিয়া সন্ন্যাসীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। বিরহ-সন্তাপে জর্জ্জরিত পিতা মাতা প্রভৃতি নিজগণের দুঃখের কথা তাঁহার প্রাণে উদয় হইল না। সন্ন্যাসী শ্রীনিতাইচাঁদকে সঙ্গে লইয়া একটী একটী করিয়া ভারতবর্ষের সকলগুলি তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নিত্যানন্দের আর এক নূতন বেশ। পরিধানে অরুণ বসন। দণ্ড-কমণ্ডলুর ভারে সুকোমল বাহুযুগল যেন কিছু অবনত। মস্তকে এখন যদিও সেই সুকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নাই, তথাপি মুখখানির শোভা অতি মনোরম। তার তেজোময় ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি দেখিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই চক্ষু নিজকে সার্থক মনে করিতেছে। প্রত্যেকটী তীর্থ নিতাইচাঁদের কোমল পদের কোমল স্পর্শসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে।

এদিকে একচাকার দুঃখের আর অন্ত নাই। মরম বিদারী ক্রন্দনের রোল অনেক দিন পর্য্যন্ত তথাকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু নিতাইচাঁদের করুণ ইচ্ছার করুণ হস্তস্পর্শে ধীরে ধীরে সেই আর্ত্তনাদ শান্ত হইয়া আসিল। নিত্যলীলার নিত্য পরিকরগণ অনেকেই একে একে মরজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, কেহ বা শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সাক্ষাৎকার লালসায় স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আজও একচাকা তাহার প্রাণের নিতাই-চাঁদের বাসস্থান ও লীলাস্থলীগুলি অতি যত্নের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া সারা জগতে তাহার পুরাতন সৌভাগ্যের লিপি ফলকগুলি প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। আজ একচাকার পর্য্যন্ত সেই নির্ব্বাপিত আর্ত্তনাদ সময়ে সময়ে তথাকার আকাশে বাতাসে গুমরাইয়া উঠিতেছে।

যেদিন হইতে নিত্যানন্দ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার লীলানাটিকার দ্বিতীয়াঙ্ক প্রকটনের জন্য দ্বিতীয় যবনিকা উত্থিত হইল। তীর্থ ভ্রমণের পথে সন্ন্যাসীর অনুগমন করিতে করিতে কোন সময়ে যে সেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিদেশের পথে সঙ্গীহারা হইয়া তিনি প্রথমতঃ একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে স্বাভাবিক ধৈর্য্যের সহিত প্রবল বৈরাগ্যের আবেশে চিত্ত সংযত করিলেন।

এই ভাবে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ গোস্বাইএর মধ্যবর্ত্তী পাণ্ডুরপুর নামে একগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামে শ্রীমন্ লক্ষ্মীপতি গোস্বামীর শিষ্য, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সতীর্থ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহারই গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের আদর যত্নে পরমপ্রীতি লাভ করিয়া তিনি দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল ও দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করিতেন, এবং পাণ্ডুরপুরের অধি-দেবতা শ্রীবিঠ্ঠলনাথ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবেই তাঁহার কয়েকটী দিন অতি-বাহিত হইতে লাগিল। তীর্থভ্রমণকারী সন্ন্যাসী। কোথাও একদিনের অধিক কাল অবস্থান করেন না। তথাপি এই পাণ্ডুর পরে তাঁহার সেই নিয়মিত চরিত্রের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল। মহাপুরুষের চিন্তধারা সাধারণ চিন্তার ধারার প্রতিকূল।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত গৃহস্বামী সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাণ নিজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলযুগল সাক্ষাৎ দর্শন করিবার জন্য কেন যেন হাহাকার করিতেছিল। শ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখ-ক্ষরিত অমিয়া মাখান দুই একটী কথা শুনিবার জন্য তাঁহার হৃদয় যেমন একটু অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। হঠাৎ সেই সময়ে তৃষ্ণার্ত্ত চাত-কের পক্ষে নবীন মেঘমালার ন্যায় গুরুদেব সন্ন্যাসী প্রবর

শ্রীলক্ষ্মীপতি গোস্বামী ব্রাহ্মণের গৃহ ও চিত্ত উদ্ভাসিত করিয়া পাণ্ডুরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্ লক্ষ্মীপতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ। বয়সে অতি প্রাচীন, এবং ভক্তিপথের পরম আচার্য্য। অধিক কথা তাঁর সম্বন্ধে বলিবার প্রয়োজন হয় না। জগদ্বিখ্যাত প্রেম-ভক্তিরসময় বিগ্রহ শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী তাঁহার শিষ্য। ইহাই তাঁহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পরিচয়। বহুগুণের আকর ভক্তবৎসল শ্রীলক্ষ্মীপতি ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবারায় শিষ্যের গৃহে গুরুদেব কেন যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। বুকের আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া সন্ন্যাসী গোস্বামীর বদনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের বেগ সংযত করিতে না পারিয়া একদিন শিষ্যকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার গাত্রে স্নেহহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বৎস! কতবার তোমার গৃহে এসেছি, কিন্তু এবারের মত এমন অপূর্ব্ব আনন্দ কই কোনদিনও ত পাই নাই! নিশ্চয়ই তোমার গৃহে কোন মঙ্গলের আবির্ভাব হয়েছে।"

শ্রীগুরুদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীনিতাইচাঁদের ইচ্ছায় তাঁহার কথা ব্রাহ্মণের মুখে স্ফূর্ত্তি হইল না। এইভাবে আরও কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নিশাভাগে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি শ্রীবলদেবচন্দ্রের মনোহর চরিত্র কথা স্মরণ করিয়া ভাবের আবেগে বাষ্পরুদ্ধস্বরে তাঁর লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে কাতরতার সহিত প্রভুর চরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! বলদেব! আমি বড়ই অধম বড়ই দুরাচার আমি। আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত আমার জীবনের আর অন্য অবলম্বন নাই।" এই প্রকারে বৃদ্ধ গোস্বামী অতিশয় খেদ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। নয়নের অশ্রুধারা অবিরল ধারে পড়িতেছিল। একে অতিশয় বৃদ্ধ, তাহাতে আবার অতিশয় কাতরতা। তজ্জন্য শ্রীলক্ষ্মীপতির দেহখানি শীঘ্রই বিবশ হইয়া পড়িল। এমন সময় অকস্মাৎ নিদ্রা আসিয়া তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। সেই নিদ্রাঘোরে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। জাগ্রত অবস্থায় তিনি যাঁহার কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছিলেন, সেই শ্রীবলদেবচন্দ্র স্বপ্নে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আহাহা! কি অপূর্ব্ব রূপ! রূপের শোভায় কন্দর্পের দর্পও খর্ব্ব হইতেছে। সুমধুর অঙ্গপ্রভায় রজত পর্ব্বত লজ্জায় অধোবদন হইতেছে। আজানুলম্বিত বাহু। পরিসর বক্ষ। কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নেত্রভঙ্গী। এক কর্ণে একটী কুণ্ডল। বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ। প্রেমে নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতেছে। উন্মাদের মত বেশ ও আবেশ।' তাহার তুলনা জগতে দেখা যায় না। বদন শশধর হইতে বচনসুধা বর্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মীপতিকে বলিলেন "বৎস আমার! ভক্ত আমার! কেন তুমি অত খেদ করছ? তোমার হৃদয়ের আর্ত্তনাদগুলি আমার বুকের মর্ম্মস্থান ভেদ ক'রে দিচ্ছে। তুমি অত অধীর হ'য়ো না। লক্ষ্মীপতি! যে কৃষ্ণ আমার প্রাণের প্রাণ, সেই কৃষ্ণের চরণে তুমি একান্ত শরণাগত তুমি তাঁহার প্রিয় সেবক। অতএব আমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তুমি স্থির হও।" এইভাবে গোস্বামীর সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনরায় তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ লক্ষ্মীপতি! এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ কুমার কয়দিন যাবৎ এসেছে। তার অবধূত বেশ, দেখতে পাগলের মত। সে কিন্তু তোমার শিষ্য হ'বে। তাকে প্রত্যাখান ক'রো না। এই মন্ত্রে তাকে দীক্ষা দিও।" এই বলিয়া গোস্বামীর কর্ণে কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীবলদেবচন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপতির সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আনন্দে ও বিস্ময়ে তিনি সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। প্রভাতকালেও যখন তিনি বসিয়া বসিয়া স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ শ্রীনিত্যানন্দ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তেজোময় কান্তি

দেখিয়া গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। এবং ইনি সাধারণ মানুষ নহেন ভাবিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শ্রীনিতাইচাঁদ পাগলের বেশে গোস্বামীর নিকটে আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন "প্রভো! আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ যখন পেয়েছি, তখন আমাকে কৃপা করুণ। আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করুন। আমাকে উদ্ধার করুন।" নিত্যানন্দ প্রভুর মধুর বাক্যে ও আগ্রহে গোস্বামী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া শ্রীবলদেবচন্দ্রের আদেশ পালন করিলেন। পরে নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার চরণে একটী প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া, হঠাৎ কোন দিকে পাগলের মত চলিয়া গেলেন। গৃহস্বামী বা গ্রামবাসী কাহাকেও কোন কথা বলিয়া গেলেন না। সেই দিন হইতে পাণ্ডুরপুর চিরদিনের জন্য নিতাইচাঁদের চরণস্পর্শলাভে বঞ্চিত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দের চলিয়া যাওয়ার কিছু পরে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী লক্ষ্মীপতি গোস্বামী বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া স্নেহের প্রিয়শিষ্যকে সম্মুখে না দেখিয়া কিছু চঞ্চল হইলেন, এবং এই অদ্ভুত ঘটনা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই দিন শেষ রাত্রে স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষ্মীপতির হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহের বন্যা বহিল। চক্ষে আনন্দের ধারা বহিতেছিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দ হঠাৎ শ্রীবলদেব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই সকল অদ্ভুত লীলা দেখিয়া সন্ন্যাসী বিস্ময়ে আত্মহারা হইলেন। এবং নয়ননীরে প্রভুর চরণ সিক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে প্রভো! দয়াময়! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তোমাকে চিন্‌তে পারে না। আমি তোমাকে কেমন ক'রে বুঝ্‌ব। আমি মূর্খ, আমিত তোমার তত্ত্ব কিছুই জানি না। তবে প্রভো! আমার কাছে কেন এত ছলনা ক'র্‌ছো। তুমি দয়া ক'রে যাকে তোমার নিজের পরিচয় দাও, সেই তোমাকে চিন্‌তে পারে। যদি আমার মত হতভাগ্যের নিকটে এসে দেখা দিয়েছো, তবে আর কেন বঞ্চনা কর? আমাকে দয়া করো।"

লক্ষ্মীপতির এইরূপ কাতরতা মাখা বচনে শ্রীনিতাচাঁদের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এবং অপূর্ব্ব করুণা দৃষ্টির ধারার বর্ষণে সন্ন্যাসীকে অভিসিক্ত করিলেন। লক্ষ্মীপতি কৃতার্থ হইলেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীপাদ গোস্বামী গতরাত্রের স্বপ্নকথা ভাবিয়া একটু বিস্মিত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ আবার প্রভুর কি অদ্ভুত লীলা? প্রভুর আবার দীক্ষাগ্রহণ? তবে কি প্রভু আবার নিত্যানন্দরূপে জগতে প্রকট অবতীর্ণ? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সবই আমার পাগল প্রভুর পাগল লীলা!!" শুনা যায় সেই দিন হইতে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির দশা অন্য ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাঁর শিষ্যগণ একটু চিন্তিত হইলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ তিনি একদিন লীলা সম্বোপন করিলেন।

পাণ্ডুরপুর হইতে বিজয়যাত্রা করিয়া পাগলপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ আবার তীর্থভ্রমণে চলিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করার পর হইতে তাঁহার পাগল লীলা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীঅঙ্গখানি কৃষ্ণাবেশে নিরন্তর ডগমগী। কখনও কান্দেন, কখনও হাসেন, কখনও প্রেমে নৃত্য করেন। ক্ষণকালের জন্যও ভাবের স্থিরতা নাই। এই ভাবে দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি প্রতীচী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুরী গোস্বামীর নাম জগতে সুবিখ্যাত। ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলিয়া সকলে তাঁহাকে বর্ণন করেন। উভয়ে উভয়কে দেখিবামাত্রই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক উন্মাদনা তাঁহাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিল। কিছু সময় পরে বাহ্যস্মৃতি আসিয়া যখন জমাট বাঁধা প্রেমকে কিছু অপসারিত করিল, তখন দুইজনে দুইজনার গলা ধরিয়া অঝোর নয়নে

ঘুরিতে লাগিলেন। কোনদিনও দেখা-সাক্ষাৎ নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই পরস্পরের চিত্তের বিনিময়ে পরস্পরের চিত্ত চিরবিক্রীত হইল। উভয়েরই ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য পরস্পরের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। এইভাবে তাঁহাদের প্রথম মিলনের দৃশ্যটী বড়ই অপূর্ব্ব। তার পর কত কথা! কত প্রীতির কথা, আদরের কথা! কথার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের ভক্তিপূত হৃদয়ের কপাট ভাঙ্গিয়া যেন প্রীতির নির্ঝরিণী ছুটিয়াছে।

এই ভাবে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেমময় চেষ্টাগুলিও অদ্ভুত। আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মাতালের মত প্রেমে কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও হায় হায় করেন। এইরূপে কতদিন চলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও ক্ষণকালের জন্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ পুরী গোঁসাইকে গুরুবুদ্ধি করিতেন, কিন্তু তিনি শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত বন্ধুর আচরণ করিতেন। হঠাৎ একদিন তাঁহাদের প্রেমে ঘূর্ণী বাতাস উঠিল। তাহারা বেগে পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্নদিকে চলিয়া গেলেন। প্রেমের আবেগে বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল, উভয়ের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত ছিল না। এই জন্ত বিচ্ছেদের প্রথম অবস্থায় কেহ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। পরে যখন অনুসন্ধান আসিল, তখন আর মিলনের কোনও উপায় নাই, কেহ কাহারও কোনই সংবাদ সাগ্রহ করিতে পারিলেন না। উভয়েই স্ব স্ব গন্তব্য-পথে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমের হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে সেতুবন্ধের দিকে চলিলেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বহুতীর্থ স্থানকে যথার্থ তীর্থ করিতে দ্বিতীয়বার মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যথারীতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া পিতামাতার বাৎসল্য রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। পরে বিশ বৎসর যাবৎ তীর্থ ভ্রমণ করেন। এই সুদীর্ঘ বিশ-বৎসরব্যাপী পর্য্যটনের পরে যখন দ্বিতীয় বার মথুরায় আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে শ্রীনিতাইচাঁদের হৃদয় ভরপূর। এখন আর স্নান আহারের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। যদি কেহ কোন সময়ে একটু দুগ্ধ আনিয়া দেয় তাহাই পান করেন। ইহা ছাড়া আর অন্ত আবেশ নাই। বৃক্ষলতা পশুপক্ষী প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "ভাই সব! তোরা কি আমার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে দেখেছিস? তোরা কি আমার আদরের ভাই কানাইএর কোন খবর জানিস্? সে যে আমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকৃতে পারে না! আমি সারা জগৎ ঘুরে এলাম, কোথাও তার সন্ধান পেলাম না।" এই বলিয়া প্রেমবিহ্বল অন্তরে উন্মাদের ন্যায় কৃষ্ণের অন্বেষণে ছুটাছুটী করেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃন্দাবনের অধিবাসী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতির আনন্দের আর সীমা নাই। হরিণগুলি আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ময়ূরগুলি পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। গাভীগুলি হাম্বারব করিতে করিতে নিকটে আসিয়া আদরভরে তাঁহার অঙ্গের আঘ্রাণ লইতেছে। শ্রীনিতাইচাঁদ যেন তাহাদের সকলের কত পরিচিত, কত আত্মীয় কত প্রিয়! তাহাদের হৃদয়স্থ প্রীতি বিগলিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নয়নদ্বারে নির্গত হইতেছে। প্রাণের নিত্যানন্দকে দেখিয়া আজ বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগুলিও আনন্দ উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের শাখাবাহু সঞ্চালিত করিয়া এবং পুষ্পপরাগ রূপ বস্ত্র উড়াইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভূমিতে কুসুমের কোমল আসন পাতিয়া দিতেছে। ফলফুল দিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে। পুষ্পবিকাশে হাস্য, ভ্রমর-গুঞ্জনে গান, পত্রস্পন্দনে নৃত্য প্রভৃতি করিয়া তাহারা শ্রীনিতাইচাঁদের সম্মান করিতেছে।

এইভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রকটলীলার আবেশে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপভূত জ্ঞানও আচ্ছন্ন

হইয়া রহিয়াছে। তিনি যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই তাঁহার আদরের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ যে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। লীলা-শক্তি তাঁহাকে যেন কেমন করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় যেন এখনও তাঁহাদের দুই ভ্রাতার মিলনের উপযুক্ত সময় আসে নাই, সেইজন্য এই ছলনা। কিছুদিন পর একদিন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার গুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যাইচাঁদের পাগল-লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। এবারে বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন সে উন্মত্ততা আরও অনেক বেশী হইয়াছে। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি এখানে কি করিতেছেন। আপনার কৃষ্ণ বাঙ্গালা দেশে নবদ্বীপে শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি এখানে আসিবার পথে দেখিলাম তিনি গয়াধামে তাঁর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। এইমাত্র নবদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন। আপনিও নবদ্বীপে যান, সেখানে গিয়া শীতল হউন।"

শ্রীঈশ্বরপুরীর শ্রীমুখক্ষরিত সুধামাখা কথা কয়টি শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের চমক ভাঙ্গিল। আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া "আমার ভাই কানাই কোথায় রে?" বলিতে বলিতে পাগলের মত নবদ্বীপের দিকে ছুটিলেন। তখনকার সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রভু আমার প্রণয়রসে বিভোর। অঙ্গ গদগদ। চলিতে অস্থির হইতেছেন প্রতিপদবিক্ষেপে স্খলিত হইতেছেন। যেন পাগলের মূর্ত্তি!! (ক্রমশঃ)

উৎসব পত্রিকায় মহতের অমর্য্যাদা

[শ্রীসুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রিতর্কতীর্থ]

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,—

'অরসজ্ঞ কাকচুষে জ্ঞানবিষ ফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে'।

এই উক্তিটী শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানন্দের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। সেখানে শ্রীপাদ রামানন্দ বলিয়াছেন,—'উপাস্য তত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিষয় শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট বলিলাম। ইহার পর আর কি বক্তব্য আছে? এখন যাহা বলিব তাহাতে তাঁহার সুখোদয় হইবে কি না তাহা আমি জানি না। ইহা চিন্তা করিয়াই প্রকাশ্যভাবে বলিলেন,—

নির্ব্বাণ নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা
শ্চ বন্তু নাম রসতত্ত্ববিদো বয়ন্ত
শ্যামামৃতং মদন মন্থরগোপরামা
নেত্রাঞ্জলী চুলুকিতাবশিষ্টং পিবামঃ।'

অর্থাৎ অরসিক ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ রূপ নিম্বফল চুষণে রত থাকেন তাহাই তাঁহারা করুন, কিন্তু রসতত্ত্বজ্ঞ আমরা সেই প্রেমাবেশবিবশা ব্রজসুন্দরীগণ নয়নাঞ্চলের দ্বারা যে শ্যামামৃত পান করিয়াছেন তাহারই অবশিষ্ট মাত্র পান করিব।

অলঙ্কার কৌস্তভেও উক্ত শ্লোকটী কিছু পরিবর্ত্তিত রূপে দৃষ্ট হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদি কেহ নির্ব্বাণ বা আপনার সত্ত্বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিন্দু সত্ত্বমাত্রে বিলীন করিয়া সুখী হন, তিনি তাহাই করুণ কিন্তু তিনি রসিক সজ্ঞালাভ করিতে পারেন না, কারণ শ্রুতি যে রসতত্ত্বের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহা আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমিক সাধকের নিজ সত্ত্বা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য শ্রুতি বলেন, 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে রসলাভ করিয়া সাধক

জীব 'আনন্দী' বা আনন্দবিশিষ্ট বা আনন্দিত হইয়া থাকে কিন্তু আনন্দই যে হইয়া যায় তাহা নহে। সেই জন্য আস্বাদ্য ও আস্বাদক সম্বন্ধ স্পষ্টই উক্ত আছে। এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, 'তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দ কারণং রসবৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ স্বীকার করিতে হইবে যে রসবিশিষ্ট ব্রহ্ম আছেন'। এখানে যে সবিশেষ তত্ত্বই ভঙ্গিক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যে রসস্বরূপটি প্রেমিকের আস্বাদ্য হয় না বা নিজেও নিজেকে আস্বাদন করিতে পারেন না তাহার ব্যর্থতাই সূচিত হয়। শ্রীপাদ রামানন্দ এখানে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের আনুগত্যে ভজনই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাই রাগানুগামার্গ নামে অভিহিত হয়।

যাহা নব নব ভাববৈচিত্র্যে ও বিলাস বৈদগ্ধীতে ভরঙ্গায়মান না হয় তাহা রস সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। নির্বিশেষে ব্রহ্ম কিন্তু চিন্মাত্র, সেইজন্য সে স্বরূপে রসবৈচিত্র্য না থাকায়, তিনি, ভক্তগণ যাহাকে রসব্রহ্ম বা নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করেন, সেই স্বরূপের সহিত তত্ত্বতঃ বিভিন্ন না হইলেও সাধন ও প্রাপ্তির তারতম্য নিবন্ধন প্রকাশের তারতম্য হেতু অবশ্যই ভিন্ন বলিতে হইবে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শুষ্কজ্ঞানের কথাই এখানে ইঙ্গিত করিয়াছেন অর্থাৎ যে জ্ঞান বা তত্ত্বম্পদার্থের অভেদানুসন্ধান কেবলই ভক্তিশূন্য শুষ্ক সদসৎ বিচারে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই এখানে নিম্বফলের সহিত উপমিত হইয়াছে। উপমাও সর্ব্বাংশে কোথাও প্রযুক্ত হয় না। এখানে শ্রীভগবানের যে অসীম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনন্ত গুণরাশি আছে তাহা না দেখিয়া কেবলই তাঁহার চিন্মাত্রসত্তার বিচারাত্মক অনুসন্ধানই এখানে অরসিকতার কার্য্য রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান যে রসময় তাহা বোধ হয় জ্ঞানীগণও প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন না কারণ তাঁহাদের লক্ষ্য রসসাক্ষাৎকার নহে কিন্তু আপনাকে সেই অখণ্ডসচ্চিদানন্দে বিলীন করা বা আপনাকে সেই চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে অনুভব করাই তাঁহাদের সাধন। সেই জন্য বিবুদ্ধশিরোমণি অদ্বৈতবৈদান্তিক শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসায়নে বলেন,—

'ভগবচ্ছাস্ত্রকৃতচিত্তদ্য নির্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানং দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎকথা শ্রবণাদিভাগবত ধর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত কঠোর বা দ্রুতভাব প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের পক্ষে জড়বিষয়ে নির্বেদ সহকারে তত্ত্বজ্ঞানালোচনা প্রয়োজন কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রুতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভগবৎ কথা শ্রবণ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সেই জন্যই শ্রীভাগবতে উক্ত আছে,—

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।

ভাঃ ১১।২০।৯।

শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তি যে সাধন ও সাধ্য ভেদে দ্বিবিধ তাহা স্বীকার পূর্ব্বক বিচার সহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি 'আনন্দমন্দাকিনী' স্তবে বলেন,—

সাফল্যং শ্রুতিসম্পদাং ত্রিজগতাং প্রালেয়ধারা প্রপা
পীযূষদ্রবমাধুরী পরিভবক্লেশাম্বুধেঃ শোষণম্।।
ব্রহ্মানন্দতিরস্কৃতিঃ কুলবধূধৈর্য্যাদ্রি বজ্রাহতিঃ
কংসধ্বংসন শংস কিং ন ভবতোবংশীনিনাদোদয় ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ শ্রুতি সম্পত্তির সার্থকতা, ত্রিজগতে শিশিধারা প্রপা বা শীতল জলচ্ছত্র স্বরূপ অমৃতদ্রবের মাধুর্য্যবৎ, জন্মজন্মান্তরের ক্লেশরাশির শোষক, ব্রহ্মানন্দের তিরস্কারক, কুলবধূগণের ধৈর্য্যরূপ পর্ব্বতে বজ্রস্বরূপ তোমার বেণুরব উদয় কি প্রশংসার বিষয়ীভূত নহে? অর্থাৎ তোমার বেণুরবে এই সকল ঘটিয়া থাকে, এখানে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী স্পষ্টই শব্দব্রহ্মের ঘনীভূত মূর্ত্তি স্বরূপ বেণুর দ্বারা ব্রহ্মানন্দের তিরস্কার উল্লেখ করেছেন।

আর একটী শ্লোকে আছে,—

'মুক্তেরপ্যতিদুর্লভা হিমগিরিপ্রস্যন্দিমন্দাকিনী
ধারাতোঽপ্যতি শীতলাতিমসৃণা চান্দ্রাদ্ময়ূখাদপি।
বাহ্যাভোগ্যপ্যতি বিস্তৃতা বিষয়িণাং যৎপাদচিন্তাপর-
স্বাস্তাদপ্যতি নির্ম্মলা যদি কৃপাদৃষ্টিস্তবাস্তাং হরে।

অর্থাৎ হে হরে, মুক্তি হইতেও অতি দুর্লভ, হিমগিরি হইতে নিঃস্যন্দিত মন্দাকিনী ধারা হইতে অতি শীতল, চন্দ্রকিরণ হইতেও অতি স্নিগ্ধ, বিষয়ীগণের সংসারবাসনা

হইতেও বিস্তারশীল, তোমার চরণপদ্ম ধ্যানকারীদিগের নিজ চিত্ত হইতেও নির্ম্মল তোমার কৃপা দৃষ্টি আমার প্রতি বিদ্যমান থাকুক। এখানে শ্রীভগবানের কৃপা মুক্তি হইতে দুর্লভা বলা হইয়াছে। যিনি অদ্বৈতসিদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদই স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার লেখনী হইতে এইরূপ পরাভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে বিশ্ব বিস্মিত হয়। জ্ঞানের পরা অবস্থা এই রূপই, 'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা' শ্রীগীতা উক্তি এখানেই সার্থক দেখা যায়।

সেই জন্য ইহাতে বিবাদের কিছুই নাই সাধকের চিত্তের রুচি অনুসারেই সাধন ও তাঁহার পরতত্ত্ব প্রাপ্তি শাস্ত্রে শ্রুত হয়।

ইহাতে যখন যেরূপ চিত্তের অবস্থা তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে এক দর্শন অন্য দর্শনের দোষ দেখাইয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্বেষ নাই, কিন্তু স্বীয় অনুভূতির গাঢ় আবেশই সূচিত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ পরিহাস করিয়া বলেন যে বরং বৃন্দাবনে শৃগাল রূপে জন্মও শ্রেয়ঃ কিন্তু বৈশেষিকী মুক্তি অর্থাৎ সুখদুঃখের সংবেদন শূন্যা প্রস্তরাদির মত অবস্থা লাভ গৌতম কখনও ইচ্ছা করেন না। ইহাতে একটী দর্শনের ভিত্তি কিছুই নাই তাহা কিন্তু বুঝিতে হইবে না কিন্তু নৈয়ায়িকের স্বমতে দৃঢ় বিশ্বাসই সূচিত হয়। সেই রূপ শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামির শুষ্ক জ্ঞানীকে অরসিক বলাও বুঝিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার কোন বিদ্বেষ বা হিংসা সূচিত হয় না কিন্তু স্বীয় ভক্তিমার্গের প্রগাঢ় আস্বাদন হইতেই উত্থিত এই রূপ উক্তি বুঝিতে হইবে।

শ্রীভাগবতে নারদব্যাস-সংবাদে ভক্তিবিবর্জ্জিত কেবল শুষ্কজ্ঞানের হেয়ত্ব উপপাদিত হইয়াছে যথা,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্'

অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে সম্যক রূপে অপরোক্ষ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ অসম্ভব কারণ শ্রীভগবানের মায়োপহিত চৈতন্য এই রূপ ভাবনা লক্ষণ রূপ অপরাধ তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। সেইজন্য আরও উক্ত আছে,—

'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়' ইতি অর্থাৎ অনেক ক্লেশে সেইরূপ জ্ঞানী পরমপদ বা মোক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়াও শ্রীভগবানে অপরাধ নিবন্ধন বন্ধন লাভ করে। বাসনাভাষ্যে ধৃত পরিশিষ্ট বচন এইরূপ দেখা যায়।

'জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসারবাসনাং'
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন ইতি।

'শ্রীগীতাও ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্' ইত্যাদি বাক্যে শুষ্ক জ্ঞানের ক্লেশকরত্ব ও পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ কারের অযোগ্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্য যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারা সাযুজ্য মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ প্রথম সাধনাবস্থায় ভক্তিকে উপায় রূপে গ্রহণ করেন। সেই জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বিবেক চূড়ামণিতে বলেন,—

'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'।

স্বরূপের যে অনুসন্ধান অর্থাৎ স্বরূপ চিন্তনও ধ্যানাদি তাহাই ভক্তি রূপে আচার্য্যপাদ উল্লেখ করেছেন।

'অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' ব্রঃ ৩।২।২৪, এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন, 'সংরাধনং চ ভক্তিধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠাম্' অর্থাৎ সংরাধন শব্দে ভক্তিধ্যান প্রণিধানাদি ক্রিয়া বুঝায়।

এইরূপে ভক্তির সহায়তা মুক্তিকামিগণেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় কিন্তু যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের আশায় সম্পূর্ণভাবে ভক্তিবর্জ্জন করেন তাঁহাদেরই নিষ্ফলাস্বাদকারী অরসিক বলিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার উক্তিটী স্বকপোলকল্পিত নহে, এবং শাস্ত্রেও এইরূপ বাক্যের ভূরি ভূরি সন্নিবেশ রহিয়াছে।

এবিষয় বেশি লেখা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা শাস্ত্রাদি আলোচনা করেন না তাহারাই এইরূপ বাক্যাদি দেখিয়া থাকিবেন। ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই।

"কষ্টি পাথর"

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত]

সাধারণতঃ মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশ ত্যাগ, প্রকৃত-শাস্ত্রার্থজ্ঞান ও ভাগবৎসঙ্গদ্বারা ভগবদুন্মুখীনতা প্রভৃতি কারণে হয়, আমাদের জীবন হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত,—ত্যাগ ত নাইই বরং বিষয়বাসনার কুটিল অট্টহাস্যে সারা জীবন ভরপুর, প্রকৃতশাস্ত্রার্থচর্চ্চা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রত্যাখ্যাত, আপন আপন মত পোষণকারী অপব্যাখ্যায় প্রকৃত অর্থ বিলুপ্ত, আর ভাগবতসঙ্গদ্বারা ভগবদুন্মুখীনতার স্থলে তাঁর বিরুদ্ধ চির অপরাধী মানবসঙ্গ দ্বারা বিষয়াবেশ।

এ সমস্ত কারণে মানুষ মনুষ্যত্বকে অর্থাৎ আপনার চিরানন্দময়ী শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, আপনার স্বরূপের সন্ধান পায় না। অখণ্ড আনন্দরসে প্রাণ সঞ্জীবিত হয় না বলে মানবের এক অভিনব প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। সৃজনীশক্তির অভাবে প্রতিভার পবিত্র কিরণসম্পাত না থাকায় এ প্রবৃত্তির কাছে থাকে,—প্রাণহীন, সত্যহীন, অসম্বদ্ধ উচ্ছ্বাস, যাতে করে চিরসত্য সিদ্ধান্ত সমুদয় আলোড়িত হয় এবং সাধারণের মতিভ্রম জন্মায়।

১৩৪০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'উৎসব' পত্রিকায় ঠিক এ ভাবেরই একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, প্রবন্ধের গুরুত্বহিসাবে এতে প্রতিবাদ বা সমালোচনার কোন বিষয় নেই, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই লিখতে পারেন, আমাদের আপত্তিরও কোন কারণ নেই, থাকতেও পারে না, কিন্তু সত্যের অপলাপ করতঃ জনসাধারণের মতিভ্রম জন্মাবার যে চেষ্টা করা হয়েছে, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের যে অপব্যাখ্যা হয়েছে, যাঁরা সর্ব্বত্যাগী মহামনীষী, ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শরূপে সমগ্র বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে বিভাবিত তাঁদের মত মহাপুরুষের বাণীর যে অন্যথাপ্রতিপাদনচেষ্টা করা হয়েছে তার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'একটি কথা বলতে হলো।

প্রবন্ধটির নাম 'নূতনবৎসরে-ভক্তির কথা'। প্রবন্ধের নাম ও অর্থ উভয়ই একটু বিচিত্র রকমের, যাক্ এসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিযোগ কাহাকে বলে? ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগ', এই বলে লেখক নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির অবতারণা করেছেন,—

> মদ্‌গুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে।
> অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ॥
> তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি।
> অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তির্ম্ময়ি জায়তে॥
> সা মে সালোক্যসামীপ্যসার্ষ্টি সাযুজ্যমেব বা।
> দদাত্যপি ন গৃহ্নন্তি ভক্তা মৎ সেবনং বিনা॥

এখন দেখবার বিষয় হচ্ছে এই, শ্লোকগুলি কি লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত, না অন্য কোন গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছেন, কোন গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছেন তা'র উল্লেখ না থাকায় এবং পদবিন্যাসচাতুর্য্য দেখে মনে হয় লেখকের নিজস্ব, কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণের নিকট এ প্রতীতি হলেও সকলের নিকট এ প্রতীতি হবার উপায় নেই। শ্লোকগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ের। লেখক নিজের প্রতিভাবিস্তারের জন্যই হোক্ বা আমাদের অজ্ঞাত কোন কারণেই হোক্ সম্পূর্ণ শ্লোকগুলি গ্রহণ না করে কতক অংশ গ্রহণ করেছেন আর কতক অংশ বর্জ্জন করেছেন, এবং তাঁর যা' বাংলা অর্থ করেছেন তা' বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও সম্পূর্ণ অভিনব, এ রকম অনুবাদ শক্তি অনেকেরই নেই, এবং নেই বলেই বাংলাভাষার এ দুরবস্থা, পাঠক যদি 'উৎসব' যোগার কর্ত্তে পারেন তঁ' দেখে নেবেন। আমরা প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে সব উল্লেখ করলাম না, প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে উল্লেখ করব।

এখন মূল শ্লোকগুলি একবার উদ্ধৃত করা যা'ক্,—নির্গুণ ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীভগবানের কি উক্তি:—

> মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
> মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ১১

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৩ ॥
তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ২৯ অধ্যায়ঃ।

স্বামিপাদের টীকা :—'নির্গুণাত্ত ভক্তেরেকবিধৈব তামাহ,—মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি দ্বাভ্যাম। অবিচ্ছিন্না সন্ততা, অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা অব্যবহিতা ভেদদর্শন রহিতা। মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি পুরুষোত্তমে মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ, লক্ষণং স্বরূপং। ১১।১২।

ভক্তানাং নিষ্কামকত্বাং কৈমুতিকন্যায়মাহ,
সালোক্যংময়াসহ একস্মিন্ লোকেবাসং, সার্ষ্টি সমানৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বম্ সারূপ্যং সমানরূপতাম্ একত্বং সাযুজ্যম্, উত অপি, দীয়মানমপি ন গৃহ্নন্তি, কুতস্তৎ কামনেত্যর্থঃ।

'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে' এখানে 'মদ্গুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে' করেছেন। 'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ' এ বাক্যার্থের সাথে 'ময্যনন্তগুণালয়ে' এ 'বাক্যার্থের কি বৈষম্য পাঠক তা' বুঝ্বেন। তিনি এ'র বাংলা করেছেন, যা' শ্লোকার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত, "ভগবান্ বলিতেছেন আমি অনন্ত কল্যাণগুণের আলয় অনন্ত গুণ আমার এই নিরাকারের নরাকার দেহ আশ্রয় করিয়া আমার লীলা কার্য্যে প্রকটিত হয়" কোথায় মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ অর্থাৎ আমার গুণ শ্রুতিমাত্রেই, আর কোথায় এ বাংলা অর্থ! এবং 'নিরাকারের নরাকার দেহ' দেহ কি রকম? না নিরাকারের নরাকার, অর্থাৎ কিনা সোনার পাথর বাটী, আমরা এ প্রবন্ধ দেখে লেখকের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছি।

'মনোগতিরবিচ্ছিনা যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ' এখানে 'অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ'—করেছেন 'গঙ্গাম্ভঃ' স্থলে করেছেন 'গঙ্গাম্বু', যাক্ তাঁর বাক্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু 'মনোগতিরবিচ্ছিন্না' এস্থলে 'অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তিঃ' করেছেন, স্বামিপাদ 'অবিচ্ছিন্না' শব্দের অর্থ করেছেন সন্ততা অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় এবং সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভক্তির একতানতা, 'অবিচ্ছন্ন' এবং 'অবিচ্ছিন্ন' এ উভয়ের কি প্রভেদ এ জ্ঞান যাঁর নেই তিনি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তে কি করে সাহস পা'ন, ভাব্লে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। আরো পরিতাপের বিষয়—সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এরূপ প্রবন্ধ পত্রিকায় ছেপেছেন! লেখক কেবল 'অবিচ্ছন্না' বলেই থামেন নি, পাঠকবর্গ বুঝ্তে পারেন কিনা সন্দেহে তার টীকা করেছেন (আমরা তাঁর লেখাকে টীকাও বল্তে পারি) 'নিরবচ্ছিন্নবিচ্ছেদরহিত', 'এ'র উত্তরে আমরা কি বল্তে পারি তার ভাষা খুঁজে না পেয়ে চুপ থাক্তে হলো

অনুবাদের আর এক স্থলে বলেছেন "অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি সগুণ বা নির্গুণ ধ্যানের প্রাপক "তিনি কি করে এ অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার কর্‌লেন তা' আমরা বুঝে উঠ্তে পারিন। কারণ শ্লোকার্থ ত এ' নয়ই, শ্লোকতাৎপর্য্যবাদ দিয়েও এ কি করে সঙ্গত হয়!

'ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ'
সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৬।২৫

অন্তঃকরণে বিষয়ের অভাব, অর্থাৎ বিষয়ের পরিশূন্যতাই হলো ধ্যান, নির্গুণ ধ্যান কি প্রকার! কি প্রকারেই বা নির্গুণধ্যানের প্রাপক হলো অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি, তা' আমাদের বিচার বুদ্ধির অতীত, লেখক মহোদয় এ' চিন্তাবীজ কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন তা' বিবেচ্য, তবে যেখান হতেই সংগ্রহ করুন না কেন, চমকপ্রদ ত নিশ্চয়ই!

'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্,
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।

এ' হলো মূল শ্লোক, লেখক মহোদয়ের হাতে পড়ে শ্লোকগুলির কি দুরবস্থা তা' দেখুন তিনি করেছেন,—

ভবেৎ ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ময়ি জায়তে॥

'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য' স্থলে করেছেন 'ভবেৎ ভক্তিযোগস্য,—'নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্' স্থলে 'হ্যুদাহৃতম্' তুলেই দিয়েছেন, এবং প্রথম চরণের 'লক্ষণং'কে এনে যোগ

করেছেন, 'যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে' স্থলে করেছেন 'যা ভক্তির্ময়ি জায়তে'!

শ্রীধরস্বামিপাদ অব্যবহিতার অর্থ করেছেন ভেদদর্শন-রহিতা, অর্থাৎ অনন্তবিশ্বে তাঁর অখণ্ডসত্ত্বোপলব্ধি করা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অর্থ করেছেন 'জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্যা', লেখক মহাশয় করেছেন 'অব্যবহিত অর্থাৎ বিশেষেণ অবহিতা সম্বন্ধা, এ সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমরা যা' বুঝ্‌লাম তা না বল্‌লেই ভাল হয়।

এ রকম করে মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা কর্ত্তে যেয়ে তাদের আনুপূর্ব্বিকত্ব নষ্ট করে ইচ্ছামত পদসংযোজনপূর্ব্বক কদর্থ করে দোষোদ্ভাবন যে কিসের পরিচায়ক তা' আমরা আর কি বল্‌ব! পাঠকের চিন্তারাজ্যেই এর মীমাংসা হবে।

'যা ভক্তির্ময়ি জায়তে' এ বাক্যের দ্বারা ভক্তিদেবীর মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, ভক্তিপ্রাণ ভক্তের এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? ভক্তিজন্যা হলেই ধ্বংস প্রাগভাব প্রতিযোগিস্বরূপ জন্যত্বলক্ষণাক্রান্তা হবেন, অথচ ভক্তিনিত্যা, চিৎশক্তিবৃত্তিরূপা, ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তিতে তপ্তায়ঃপিণ্ডে অগ্নিতাদাত্ম্য প্রতীতিবৎ প্রতীত হয়।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥

এই হলো মূল শ্লোক, তার লেখক মহাশয় করেছেন,—

'সা মে সালোক্য সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য মেববা,
দদাত্যপি ন গৃহ্নন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা।

স্বামিপাদ এ শ্লোকের টীকার শেষে বলেছেন '...... দীয়মানমপি ন গৃহ্নন্তি কুতস্তৎকামনেত্যর্থঃ, অর্থাৎ আমি এই চার প্রকার মুক্তি প্রদান করলেও ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই চাহে না, মুক্তিকে উপেক্ষা করে, অতএব মুক্তির জন্য কামনা কোথায় এ ভাবে ভক্তের নিষ্কামতা কৈমুতিকন্যায়ে দেখায়েছেন।

লেখক মহাশয় প্রথম চরণে 'সা মে' যোগ করেছেন, 'অপ্যুত' পদ তুলে দিয়েছেন, দীয়মানং তুলে দিয়ে করেছেন 'দদাত্যপি' এরূপে নিজের কল্পনা দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের যে অবমাননা তা' সত্যই বিস্ময়জনক!

জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লেখক অনেক পরিশ্রম করেছেন, প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে আমরা তার উল্লেখ করলামনা, আমরা কেবল শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি সম্বন্ধে কি বলেছেন তা' দেখাবার চেষ্টা কর্‌বো অতি সংক্ষেপে—

মহর্ষি বেদব্যাস গ্রন্থারম্ভে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং॥

স্বামিপাদ টীকা কচ্ছেন—'......প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কি বলেছেন তা' দেখা যাক্।

"যৎ কর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ৩২॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥ ৩৩॥

স্বামিপাদ :—'......ইতরৈরপি তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিঃ শ্রেয়ঃ সাধনৈর্যদ্ভাব্যং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি তৎ সর্ব্বমঞ্জসা অনায়াসেনৈব স্বর্গমপবর্গং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠং লভত এব। বাঞ্ছা তু নাস্তীত্যুক্তং যদি বাঞ্ছতীতি।

তাৎপর্য্য হলো এই যে জ্ঞান কর্ম্ম বৈরাগ্য তপস্যা দান ধর্ম্ম তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা যা' কাম্য তা' সমস্তই মদ্ভক্তি যোগে আমার ভক্তেরা অনায়াসে পেতে পারে, কিন্তু তা'রা, তা' চায়না তাদের মোক্ষের প্রতি ইচ্ছাই নাই, এর চেয়ে ভক্তির প্রাধান্য কিরূপে স্থাপিত হয় আমরা তা' বুঝিনে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তির স্থান কোথায় তা' নির্দ্দেশ করে আমরা প্রবন্ধ শেষ কর্‌বো।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চপরন্তপ॥ ১১।৫৪।

অর্থাৎ হে পরন্তপ অর্জ্জুন কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারাই আমার এইরূপ জ্ঞাত, দৃষ্ট ও অধিগত হইয়া থাকে।

জ্ঞানে যে পুরুষার্থ প্রাপ্তি যেখানে, জ্ঞান, জ্ঞাতা জ্ঞেয়ে ভেদ না থাকাতে অখণ্ড আনন্দরসের উপভোগ করবে কে? এই হিসেবেই কবিরাজ গোস্বামিপাদ জ্ঞানীকে অরসজ্ঞ ও জ্ঞানযোগের স্থান ভক্তির নিম্নে দিয়েছেন। আর একে প্রক্ষিপ্ত বললে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতকেও প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়।

শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ]

শ্যামল তমাল তরুর উল্লাস বিধানে শ্রীরাধিকাই বাসন্তীশ্রী রূপে বিরাজিতা হন। শুধু মধুশ্রী কেন, সকল ঋতুর আবর্তনে তিনিই সেই সেই ঋতুর শোভনা মূর্ত্তি রূপে প্রাণবল্লভের হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চার করেন। তাই স্তবাবলীতে আছে :-

গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রচন্দন চন্দ্রিকা,
শীতে শ্যাম শুভাঙ্গেষু পীতপট্যালসৎপটী।
মধৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রী মধুরাকৃতিঃ,
মঞ্জু মল্লার রাগশ্রী প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী।
ঋতৌ শরদি রাসৈকরসিকেন্দ্রমিহস্ফুটম্
বরিতুং হন্ত রাসশ্রী বিহরন্তী সখীশ্রিতা।
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনং,
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রী মূর্ত্তিধারিণী।

অর্থাৎ নিদাঘে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র, কর্পূর ও জ্যোৎস্না; শীতকালে শোভমান পীতপট্টবাস; বসন্তে বাসন্তী শ্রী, বর্ষায় মনোজ্ঞ মল্লার রাগের শোভা, শরতে সখী সঙ্গে প্রাণবল্লভকে প্রেমের ডালা সাজাইয়া বরণ করিতে মূর্ত্তিমতী শারদ লক্ষ্মী ও হেমন্তে প্রেমসমরে মূর্ত্তিধারিণী জয়শ্রী রূপে বিরাজ করেন

ইহা তন্ময় ভাবেরই পরিচায়ক শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা বাহিরেও নব নব নানারূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে তদীয় নয়নযুগলকে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীরাধিকার দাস্যলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আকুল আবেগ ভরে শ্রীপাদ শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন,—

'অতি চটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজ নৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদানু।'

অর্থাৎ বনে আগত অতি চপল শ্রীব্রজরাজ কুমারকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্র যুগল শঙ্কাকুল হইয়াছে ও যিনি নেত্রভঙ্গি দ্বারা, সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা স্বীয় দাস্যে কবে আমাকে অভিষিক্ত করিবেন?

শ্রীনাগরেন্দ্র অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব—তাঁহার প্রেম তৃষ্ণা হৃদয়ে সর্ব্বদাই বলবতী। সেই জন্য তিনি স্বরূপানন্দে রমন করিয়াও তৃপ্ত হন না, তিনি ভক্তের প্রেমরসানন্দে রমন বিশেষ অভিলাষ করেন, বিশেষতঃ শ্রীভানুনন্দিনী অখণ্ড মহাভাব স্বরূপিণী, সেই জন্য তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্র তদীয় হৃদয়ে লালসার উদগম হইয়া থাকে। দর্শন করা দূরে থাক, তদীয় অঙ্গ গন্ধপ্রাপ্তি মাত্রই উন্মত্ত হন। যিনি সমুদ্রকোটি গম্ভীর, তিনিই তখন লীলারস তরঙ্গে চপলিত ও তরলিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্দাস-গোস্বামিচরণ অন্যস্থানে সেই জন্য বলিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণনঙ্গরাজীবে ভানুশ্রী বার্ষভানবী'। শ্রীবৃষভানুনন্দিণী শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গ বা প্রেমরূপ পদ্মে সূর্য্য কিরণের শোভা সদৃশী অর্থাৎ সূর্য্য কিরণ সম্পাতে যেরূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ শ্রীবৃষভানু কুমারীর দর্শন মাত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠে। এখানে অনঙ্গ শব্দটীর ব্যাখ্যা বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যেরূপ করিয়াছেন তদনুরূপই করা গেল।

অনঙ্গ := ন অঙ্গ অপিতু অঙ্গী, অঙ্গীতু প্রেমা; অঙ্গঃ কাম কলা অর্থাৎ যাহা অঙ্গ নহে কিন্তু অঙ্গী বা প্রেম প্রেমের অনুভাবগুলিই অঙ্গ। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীও অলঙ্কার কৌস্তুভে সামান্য ভাবে প্রেমকেই অঙ্গীরস স্বীকার করিয়াছেন ও শৃঙ্গার রস যদিও অন্যান্য রসের সম্বন্ধে অঙ্গী কিন্তু প্রেম রসের তুলনায় অঙ্গ। কারণ যেরূপ সাগরের বক্ষে অনন্ত তরঙ্গ মালা উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ স্থায়ী প্রেমরস সাগরের বক্ষে সকল ভাব ও রস তরঙ্গবৎ উঠে ও নামে

সকল রসেরই স্থায়িভাব প্রেম: সেইজন্য উহাই অঙ্গী, কাননমধ্যে অত্যন্ত দুর্লীল ও চপলশিরোমণি নাগরেন্দ্রের দর্শনে শ্রীমতী ভীতা হইয়াছেন। এই শঙ্কা ও ভয় প্রেমেরই ব্যভিচারী ভাব। প্রেমের গতি কেহ কখনও বুঝাইতে সমর্থ নহেন। যিনি কোন সময় মানভরে প্রাণবল্লভকে কঠোর-বচনে তিরস্কার করেন ও পাদপল্লবে পতিত হইলেও যাঁহার দুর্জ্জয় মান অপগত হয় না, তিনি কোন ভাববিশেষে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শঙ্কিত হন। এইরূপ যুগপৎ ভয় ও নির্ভয় বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশেই শ্রীরাধিকার প্রেমের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই-জন্য মৃদু মধুর বচনভঙ্গী দ্বারাই নয়ন ইঙ্গিতে যেন কোন প্রার্থিত অভীষ্ট অনুমোদন ও অভ্যর্থনা করেন। সে সময়ে স্বামিনীর অনুগতা ভাবে নাগরেন্দ্রকে আশ্বাসিত করাই বোধ হয় তৎকালে দাসীর সেবার অনুকূল হইবে। ইহাও শ্রীপাদের হার্দ্দ হইতে পারে যে, যিনি এই প্রকার করিয়া থাকেন, সেই রাধিকা আমাকে কবে দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন। তৎকালের কথা না হইয়াও ইহা সামান্য-ভাবে সকল শ্লোকগুলিতেই অভীষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

এইরূপ স্তব করিতে করিতে সহসা কখনও শ্রীযুগল-কিশোরকে ভাবনেত্রে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া এইরূপে শ্রীপাদ তাঁহাদের প্রণতি করিতেছেন,—

'সুবলসখাধরপল্লবসমুদিত মুগ্ধমাধুরীলুব্ধাং
রুচিজিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে।
বৃষরবিজাধরবিম্বীফলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরং
ধৃতশিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি।'

অর্থাৎ যিনি সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধরপল্লবে বিকশিত মধুর সুন্দর মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গের কান্তি সুবর্ণ-নির্ম্মিত চিত্রের প্রভাকে পরাজয় করিয়াছে, সেই কাঞ্চনবর্ণের বিচিত্রা কোকিলাকে বন্দনা করি।

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের রস-পানে অভিলাষী অদ্ভুতভ্রমররূপ ময়ূরপুচ্ছধারী পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

এই কয়েক পাদে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামি মহোদয়ের অপূর্ব্ব অলৌকিক কাব্যকলা প্রকাশিত হইয়াছে। রসধ্বনির মাধুর্য্যে ও শব্দসম্পত্তির বিপুল বিস্তার ও সমাবেশে ইহা যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শন তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্দাস-গোস্বামিপাদের কাব্যরসতটিনী নব নব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের তরঙ্গে আকুলা, নিত্য নূতন ভাবচন্দ্রমার কোমল কমনীয় কিরণস্পর্শে আলোকিতা। তাহাতে যে ললিতলীলালাস্য ও বিলাসরঙ্গভঙ্গ দৃষ্ট হয় তাহা ভাবুক সুনিপুণ চিত্রকার ও অলৌকিক কল্পনাপ্রবণ কবি—উভয়েরই উপভোগযোগ্য। বিরহ মিলনের ছায়ালোকসম্পাতে তাহাতে যে বিশাল বিপুল স্ফীত উর্ম্মিমালার নৃত্য, তাহা কেবলই রাগানুগামার্গীয় একনিষ্ঠ রসিক ভক্তেরই নয়নগোচর হইবে।

স্বনিয়মদশকে উক্ত আছে,—

'স্ফুরল্লক্ষ্মী লক্ষ্মীব্রজ বিজয়িলক্ষ্মীভরলস-
দ্বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা স্মরনিকরদিব্যদ্গিরিভৃতোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ বরিবস্যাঃ সরভসং,
রহঃ শ্রীরূপাখ্য প্রিয়তম জনস্যৈব চরমঃ।

অর্থাৎ যাহার শোভাময় অঙ্গলাবণ্য দেদীপ্যমান-শোভাবিশিষ্ট লক্ষ্মীগণের অঙ্গকান্তিকেও পরাজয় করিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমূহ হইতেও যিনি পরমসুন্দর সেই শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনের নিভৃত নিকুঞ্জ-ভবনে তদীয় প্রিয়স্বজন শ্রীরূপের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া আমি বিবিধ সেবা করিব।

সাধকদশোচিত উৎকণ্ঠায় শ্রীপাদ বলিতেছেন,—

'প্রেমোদ্রেকৈর্নয়ননিপাতজ্বারিধারো ধরণ্যাং
বৈবর্ণ্যাদ্যৈর্বলিতবপুঃ প্রৌঢ়কম্পঃ কদাহম্।
স্বেদাম্ভোভিঃ স্নপিতপুলকশ্রেণিমূলঃ স্মিতাক্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ মদনসমর স্ফারদক্ষৌ স্মরামি'।

অর্থাৎ হে সখি, আমার প্রেমোদ্রেক-বশতঃ ধরাতল নয়নসলিলে অভিষিক্ত হইবে, শরীর বৈবর্ণ্যশ্রেণীর দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও কম্পান্বিত হইবে, নিবিড় পুলকসমূহে মূলদেশ ঘর্ম্মজলে স্নপিত হইবে—কবে এইরূপ সাত্ত্বিকভূষণে ভূষিত হইয়া প্রেমসমরে সুদক্ষ ও ঈষৎ হাস্য যাঁহাদের মুখ-মণ্ডলে বিকশিত আছে, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করিব।

আরও উক্ত আছে,—

'কচ নচ দয়লোবাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাং
সপদি বিচিন্তমানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিত পটু চাটু প্রার্থ্যমানপ্রসাদা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্।

অর্থাৎ হে রাধে, কোন সময়ে দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ মানিনী হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অনেক চাটুবাক্য দ্বারা তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করিবেন, এইরূপে ক্ষণকাল আমার নয়নের আনন্দ বিধান কর।

ইহার পূর্ব্বশ্লোকটীতে মিলনাবসরে ও এইটীতে মানাখ্য-বিরহকালে শ্রীরাধার সন্দর্শন শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামিপাদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

শেষে উক্ত আছে,—

'নিরবধি-গুণসিন্ধো স্তত্রসেনাদিবন্ধো
নিরুপম গুণবৃন্দ প্রেয়সীবৃন্দমৌলে।
অতিকদনসমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্।

অর্থাৎ হে অসীম গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রেমপাত্রি, যাঁহাদের গুণসমূহের উপমা নাই সেই প্রেয়সীগণে মুকুটমণিস্বরূপে. হে দয়াময়ি, আমি অগাধ দুঃখসাগরে-পতিত হইয়াছি, ক্ষণকাল আমাকে দর্শন প্রদান কর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের 'আদিবন্ধু' এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধা-মাধবের নিত্য-অনাদিসিদ্ধ প্রেমসম্বন্ধটী সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল সদ্গুণরাশি আছে তদ্রূপ স্বজাতীয় সকল গুণে তুমি ভূষিতা। অতএব তাঁহার মত শত্রুমিত্র-উদাসীন-ভাব শূন্য রূপে আমার প্রতি কৃপা করিয়, দর্শন দাও। ইহাই শ্লোকে ধ্বনিত হইয়াছে। দৈন্যের খনি শ্রীমৎ রঘুনাথের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই এইরূপ প্রেমোত্থ দৈন্য-তরঙ্গ-উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এটী তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ ও প্রধান অঙ্গ। উৎকণ্ঠাপ্রধানা রতির ইহাই গৌরব ও মাধুর্য্য। আবার কখনও কোন লীলাবিশেষ দর্শন করিয়া যেন তদীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

'কৃষ্ণস্তাংসে বিনিহিতভুজাবল্লিরুৎফুল্লরোমা
রামা কেয়ং কলয়তিতরাং ভূধরারণ্যলক্ষ্মীম্?
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয়চটুলা ব্যাকুলারাগপূরৈ-
রন্যা কান্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা'।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে বাহুলতা স্থাপন পূর্ব্বক পুলকিতা হইয়া কে এই রমণী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের বনশোভা দর্শন করিতেছেন? হে সহচরি, জানি, জানি, ইনি প্রেমে চঞ্চলা ও অসমোর্দ্ধ অনুরাগে আকুলা রাধিকা ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

আবার কোথাও লালসাময়ী প্রার্থনা অভিব্যক্ত হইয়াছে,—

'মসার ক্ষাসারোদ্ভব নবতমালোদ্ভটমদ-
প্রহারি শ্রীভারোজ্জ্বলবপুরমুষ্মৎশুচিরসৈঃ
কদারাকাচন্দ্রস্তবদন নিদ্রালসদৃশং
দৃশা কৃষ্ণং রক্ষঃস্বপনপররাধং সখি ভজে'।

অর্থাৎ হে সখি, যাঁহার শরীর মরকতমণিপর্ব্বতসম্ভূত তমালের সাতিশয় গর্ব্বহারী শোভাসমূহের দ্বারা উজ্জ্বল ও ও যিনি শৃঙ্গাররসসারসর্ব্বস্ব ও যাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণশশধর দ্বারা বিরাজিত হয় অর্থাৎ শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রও যে মুখশোভার নিকট বিমলিন হইয়া যায়, যাঁহার নেত্র-যুগল নিদ্রালস ও যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধিকা শয়ন করিতেছেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি কবে দর্শন করিব?

এখানে শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদ কিরূপ গাঢ়লৌল্য-সহকারে দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাহা রাগানুগা-মার্গীয় সাধকের ধ্যানের বিষয়। রাগমার্গে লালসাই অভীষ্ট বস্তু আস্বাদনের ও লাভের একমাত্র কারণ। লীলা-স্মরণটী যত দেহ-গেহ-বিস্মৃতি সহকারে প্রগাঢ় লালসা ও আর্ত্তিপূর্ণ হইবে ততই সাধকের স্বাভীষ্টবস্তুপ্রাপ্তির কাল নিকট হইয়া আসিবে।

লালসার তীব্রতানুসারেই যে প্রাপ্তির তারতম্য ঘটে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যোগশাস্ত্রেও উক্ত আছে, 'তীব্রসম্বেগা-নামাসন্নঃ' অর্থাৎ যাঁহারা অতিশয় তীব্রভাবে ধারণা ও ধ্যান করিতে সমর্থ তাঁহাদের সমাধি নিকটবর্ত্তী।

শ্রীরাধিকার নাম মাত্রে বিশ্বসংসার দ্রবীভূত হইয়া থাকে, সেইজন্য উক্ত আছে,—

'নামমাত্র জগচ্চিত্তদ্রাবিকা দীনপালিকা',

শ্রীরাধিকা হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি মহাভাবস্বরূপিণী। সেইজন্য তাঁহার নামে কঠোরচিত্ত বিশ্বমানবের চিত্তে প্রেমাবির্ভূত হয় ও তখন সেই চিত্ত দ্রবীভূত হয়। শ্রীরাধিকা দীনজনের পালন করেন অর্থাৎ কেহ যদি আপনাকে সাতিশয় দীন বোধে তাঁহার শরণাগত হয়, তাহ'লে তিনি তাঁহাকে প্রেমভক্তিদানে রক্ষা করেন। সেইজন্য আরও উক্ত আছে, 'করুণাবিদ্রবদ্দেহা' অর্থাৎ যাঁহার শরীর কৃপায় দ্রবীভূত মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী। শ্রীরাধিকা লজ্জাপুঞ্জের ঘনীভূতা মূর্ত্তি 'পুঞ্জীভূতজগল্লজ্জা'। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে স্বীয় কায়, মন ও জীবন সমর্পণ করিয়াছেন ও স্বীয় অসংখ্য প্রাণসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণার নিরাজন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই অভিব্যক্ত করা হইয়াছে।

মনোজয়—২

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত]

আমাদের কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হইলেই শাস্ত্রানুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের মন-প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের নিয়মন করিয়া থাকেন, এবং আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় সম্বলিত দেহগুলি এই পরিদৃশ্যমান উৎপত্তিবিনাশশীল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ-স্বরূপ ও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী জড়া মায়াশক্তির কার্য্য। শাস্ত্রালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভগবানেরই নিয়মে আমাদিগের দেহেন্দ্রিয় ও মনসহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পুনরায় যথাপূর্ব্ব সৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রালোচনাদ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা নিজে অণুচিৎস্বরূপ, বিভুচৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানেরই অংশ, এবং আমাদের সহিত এই জড় দেহেন্দ্রিয় ও মনের বাস্তব-সম্বন্ধ কিছুই নাই। শাস্ত্রই বলিয়াছেন যে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডসমূহ শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতি মাত্র; তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অনন্ত চিদ্ধামরূপে নিত্য বিরাজিত আছে, এবং সেই সকল নিত্যধামে শ্রীভগবান্ অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্তকাল হইতে তাঁহার অনন্ত পরিকরগণসহ নিত্য বিহার করিতেছেন। ঐই ধাম সকল এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিকরবর্গের দেহেন্দ্রিয় ও মন তাঁহার স্বরূপ বা চিচ্ছক্তির কার্য্য, এবং এখানে নিত্য স্বপ্রকাশ আনন্দের বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও তদন্তর্গত জীবের দেহেন্দ্রিয়মনপ্রভৃতি সকলই সত্ত্বরজস্তমোগুণময় এবং নিরন্তর উৎপত্তি-বিনাশশীল। এখানকার বৈশিষ্ট্য কেবল দুঃখ—জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকমোহ প্রভৃতিই এখানকার ধর্ম্ম।

আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি মায়িক জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবানের মনের সম্বাদ শাস্ত্র হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। শ্রুতি বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়, তদৈক্ষত" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নানাবিধ জগৎ সৃষ্টির জন্য সঙ্কল্প করিয়া মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পাত্মক মন শ্রীভগবানের, ইহা আমাদের মত পরিচ্ছিন্ন মায়িক মন নহে—সেই সময়ে মায়িক মনের সৃষ্টিও হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের ও

তাঁহার পরিকরবর্গেরও মনের সম্বাদ আমরা পাইয়া থাকি। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

(১) তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃস্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥

ভাগ ০।১৫।৩

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বেণুগান করিতে করিতে বয়স্য ও পশুগণসহ কুসুমাকর বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে অলিকুলের ঝঙ্কারে, পক্ষিসকলের কাকলিতে ও মৃগগণের সুমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছে, এবং সরোবর-সমূহের জল মনস্বিগণের মনের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে ও তত্রত্য কমলরাজির সৌরভবহনকরতঃ শীতল মৃদুমন্দ গন্ধবহ প্রবাহিত হইয়া সকলের সন্তাপ হরণ করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনের এই মনোহর ভাব নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীভগবান্ মনে মনে তথায় ক্রীড়া করিবার অভিলাষ করিলেন।

(২) ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বানুরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীভগবানের সহিত রমণ করিবার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীভগবানও, নিজে আত্মারাম হইয়াও, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত শরৎকালীন উৎফুল্লমল্লিকায় সুশোভিত রজনীসমূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিবার জন্য মনে সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রেই আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরবর্গ তাঁহাদের ধামে নানা সঙ্কল্প করিয়া নানাপ্রকারে পরস্পরের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই তাঁহার পিতামাতা সখা ও প্রেয়সীপ্রভৃতি পরিকররূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ পরিকর। ইঁহাদের অনুগত বহু সাধনসিদ্ধ পরিকরও আছেন। সাধনসিদ্ধ পরিকরগণ আমাদেরই মত অণুচৈতন্য জীব, সাধনবলে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়া মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবোপযোগী চিন্ময় দেহেন্দ্রিয় ও মন লাভ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যেও জীব আছেন, তাঁহাদের সহিত মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ কখনই হয় নাই—তাঁহারা নিত্য ভগবদুন্মুখ এবং নিত্য চিন্ময় দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা ভগবৎ-সেবাসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরবর্গের যে মনের সম্বাদ আমরা পাইলাম সে মনের সহিত তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে মনে মায়িক বন্ধন ও দুঃখের কখনও কোনও সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের চরণে ঐকান্তিক শরণ-গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদিগের মত মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক মনেরও মায়িক বন্ধন ও দুঃখ দূর হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

ভাগ ১।১১।৩৯

অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যই এই যে তিনি প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, প্রকৃতির সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। তাঁহার কি কথা, যে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই মনোবুদ্ধির ও প্রাকৃতগুণের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। মায়িকগুণের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইলেই সে মন হইতে মায়িকবন্ধন ও দুঃখ বিদূরিত হইয়া যায়, এবং তাহা নির্গুণ চিৎস্বরূপধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎসম্বন্ধ লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্র যে মায়াবদ্ধ মনুষ্যের জন্য মনোজয়ের ভূয়োভূয় ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ও একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা যথাস্থানে সেই তত্ত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব।

এক্ষণে আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জীবের সহিত এই জড় দুঃখসঙ্কুল মায়িক মনের সংযোগ কবে, কোথায়, কাহাকর্ত্তৃক এবং কেন সংঘটিত হইল। শাস্ত্রানুসন্ধানেই আমরা জানিতে পারি যে পরমকারুণিক মহানুভব বৈষ্ণব দার্শনিকগণ-

বেদাদিশাস্ত্র হইতেই এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জীব অণুচৈতন্য ও শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য, জীব অল্পজ্ঞ ও শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব নিত্য ভগবদ্দাস ও শ্রীভগবান্ তাহার নিত্যপ্রভু; সেই জীবের মধ্যে একজাতীয় জীব ভগবদ্ধামে তাহার স্বাভাবিক ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করিতেছে, এবং আর একজাতীয় জীব অল্পজ্ঞতাহেতু অনাদিকাল হইতে তাহার নিত্যভগবদ্দাস-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আছে। এই জাতীয় জীবকে স্বচরণোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভগবৎ-বিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ মায়া এই জীবের চৈতন্য স্বরূপ আবরণ করতঃ মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারাই তাহাকে আবদ্ধ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ সংসারমহাদুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিদ্বারাও দেখাইয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যগণে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
শাস্ত্র সাধুকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব মায়াকর্ত্তৃক এই মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে চতুরশীতিলক্ষ-যোনি ভ্রমণ পূর্ব্বক একবার মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া থাকে। কেবল মনুষ্যের মনই মায়াবদ্ধ জীবের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করিতে সমর্থ, এবং শ্রীভগবান্ সাধু ও শাস্ত্ররূপে মনুষ্যকেই তাহার মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারা ভজন সাধন করাইয়া তাহাকে স্বচরণোন্মুখ হইবার সহায়তা করিয়া থাকেন। মনুষ্যজন্মেই জীব সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় ভজন সাধন করিয়া মায়াতিক্রমপূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম শ্রীভগবচ্চরণসেবা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়।

স্বচরণ-বিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবের শোধন জন্যই শ্রীভগবান্ জগৎসৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া থাকেন এবং প্রথমপুরুষাবতাররূপে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী জড়া প্রকৃতি তাঁহার চিদাভাসপ্রাপ্তিহেতু ক্রিয়াশীলা হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়, এবং মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্বে পরিণত হয়। অহঙ্কার তত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশে মন ও দেবতার সৃষ্টি হয়, রাজস অংশে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং তামস অংশে পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দস্পর্শরূপরস গন্ধ ও পঞ্চ মহাভূত—আকাশ বায়ু তেজ জল ও মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। শ্রীভগবানের সঙ্কল্পমাত্রে প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়, এবং শ্রীভগবান্ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়-পুরুষাবতাররূপে প্রবেশ করেন। এই রূপেই তিনি নিজের নাভিকমল হইতে শ্রীব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক অনন্ত ব্যষ্টি জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তৃতীয়-পুরুষাবতাররূপে প্রতি জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তত্তৎ দেহেন্দ্রিয় ও মনের নিয়মন করিয়া থাকেন।

এইরূপ অনন্ত জীবদেহ সৃষ্ট হইলে মনুষ্যদেহ দেখিয়াই শ্রীভগবান্ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি জানেন যে মনুষ্যের দেহেন্দ্রিয় ও মনোদ্বারাই সাধন করিয়া জীব তাঁহাকে জানিতে ও দেখিতে পাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেই বলিয়াছেন—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥

ভাগ ১১।৯।২৮

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা বৃক্ষাদি স্থাবর এবং সরীসৃপ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি বিবিধ জীবদেহ রচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই, পরে আত্মসন্দর্শনোপযোগী মন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট নরকলেবর নির্ম্মাণ করিয়াই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক দেহ দ্বারাই ভগবদ্বিস্মৃত জীব মায়াকর্ত্তৃক আবরিত হইয়াছে। প্রতি জীবদেহই কারণ, সূক্ষ্ম (লিঙ্গ) এবং স্থূলভেদে তিন ভাগে বিভক্ত।

মায়াবদ্ধ জীব এই তিনটি দেহদ্বারা উপর্য্যুপরি আবৃত। জীবের কারণদেহ কেবল মায়ার অজ্ঞান আবরণ মাত্র। কারণদেহ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ দ্বারা আবৃত। সূক্ষ্মদেহ—পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, এবং ইহা অপঞ্চীকৃত ভূতসম্ভূত বলিয়া আমাদের চক্ষুর অগোচর। এই দেহেই জীবের ভোগসাধন সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহের বাহিরে জীবের স্থূলদেহের আবরণ। স্থূল দেহ জীবের পরিদৃশ্যমান বাহ্য ইন্দ্রিয়-গোলোকাদিসম্বলিত সপ্তধাতুময় ভোগায়তন দেহ। জাগ্রদবস্থায় জীবের স্থূলদেহেই আত্মাভিমান ও ব্যবহার সম্পন্ন হয়, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহের অভিমান, অনুভূতি ও ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং সুষুপ্তিতে কেবল কারণদেহের অনুভূতিমাত্রই থাকে। স্থূলদেহই মনুষ্যপশুপক্ষী প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষপ্রকার আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ জীব এই দেহত্রয়েই আত্মাভিমান করিয়া ঐ দেহের ধর্ম্ম নিজের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে ঐ দেহের অন্তরে থাকিয়া জড়দেহকে ক্রিয়াশীল করেন, মায়ামুগ্ধ জীব সেই সকল ক্রিয়াকেই নিজের কার্য্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে। মায়িক দেহের স্বভাব এই যে ইহা প্রতিক্ষণ ক্ষয়শীল এবং শ্রীভগবানের নিয়মে প্রতিক্ষণ মায়িক বিষয় সংযোগেই তাহার কথঞ্চিৎ পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে। দেহাভিমানী জীব এই বিষয়-সংযোগকেই নিজের সুখ ও পুরুষকার বলিয়া মনে করে, এবং মনের সহিত অভেদবুদ্ধি হেতু মনে মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ব্বক মনের অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা নানাবিধ পাপপুণ্যাদি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলের অধীন হয়। এই কর্ম্মফল ভোগের জন্যই তাহাকে চতুরশীতি লক্ষ প্রকার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। একপ্রকার প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের জন্য একপ্রকার স্থূলদেহ লাভ হয়, এবং তদন্তে সেই স্থূলদেহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা মৃত্যু হইলে, জীব কারণ ও সূক্ষ্ম দেহ লইয়া অন্য প্রারব্ধ ভোগের জন্য অন্য স্থূলদেহ লাভ করে। ইহাই জীবের জন্ম ও মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যু স্থূল দেহেরই ধর্ম্ম, কারণ ও সূক্ষ্মদেহ অনাদিকাল হইতে যতদিন না জীব মায়ামুক্ত হয় ততদিন একই থাকে। সূক্ষ্মদেহের মনই জীবের প্রধান আশ্রয়, সূক্ষ্ম-দেহের মনেই নিজের অভেদবুদ্ধিহেতু সেই মনের অধ্যক্ষতায় স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়দ্বার-দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে ও মনেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। আবার সূক্ষ্মদেহের মনেই জীব স্থূলদেহের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই মিথ্যা ভোক্তৃত্বাভিমানহেতু দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত অনাদিকাল হইতে পাপপুণ্যাদি কর্ম্ম করিয়া জীব মনেই অনাদি কর্ম্মসংস্কার সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই কর্ম্ম-সংস্কার বা ভোগবাসনা হেতুই তাহাকে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিয়া পুনঃ-পুনঃজন্মমরণরূপ অতল সংসার-জলধিতলে নিমগ্ন হইতে হয়।

মায়াবদ্ধ জীবের মন মায়িক পদার্থ, সুতরাং মায়িক ধর্ম্মেই তাহা স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। মায়াবদ্ধ জীবের মনেই যখন নিজের অভেদবুদ্ধি, তখন মায়াতীত নিজের যথার্থ তত্ত্বানু-সন্ধান সে কি করিয়া সেই মনোদ্বারা করিতে পারে? সৌভাগ্যক্রমে সে সাধুকৃপা লাভ করিলেই তাহার সেই মনেই শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শাস্ত্রাজ্ঞাপালন-রূপ সাধনানুষ্ঠানে সে কৃতসঙ্কল্প হয়। সাধনবলে তাহার মনের বিষয়-প্রবণতা বিদূরিত হয়, এবং তখন সেই মনো-দ্বারাই সে নিজের মায়াতীত স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। মায়াবদ্ধ জীবের ইহাই মনোজন্ম এবং ইহাই আমাদিগের বিস্তারিতভাবে আলোচনার বিষয়।

(ক্রমশঃ)

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম

(১৮)

[শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী]

সাধারণতঃ দ্বাপরান্ত যুগই "কলিযুগ" নামে কথিত হইয়া থাকে বলিয়া, বর্ত্তমান যুগ কলিযুগ নামেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অসাধারণ যুগে সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেম-ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন্ ধর্ম্ম রূপে একযোগে বিশ্বের প্রায় সকল মানব মানবীকে পরিপূর্ণতা বা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য, বর্ত্তমান্ যুগ কলিযুগের পরিবর্ত্তে 'প্রেমযুগ" নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য। কালস্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "কলি"। দ্বাপর যুগের শেষদিনের পর হইতে সত্যযুগের প্রথম দিবসারম্ভের পূর্ব্বাবধি কাল পর্য্যন্ত কলির কর্ত্তৃত্ব সীমা বলিয়া, এই সময়কে কলিকাল বলা হয়। কলি সর্ব্বদোষনিধি ও সাক্ষাৎ পাপ স্বরূপ। কলির প্রভাব বশতই সাধারণতঃ মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও পারলৌকিক বিষয়ে অবিশ্বাসী বা এক কথায় ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে। কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া, শেষ কলিতে নাস্তিকতা বা অধর্ম্ম পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া থাকে; ইহাই সর্ব্বসাধারণ কলিযুগের নিয়ম। সাধারণ কলিযুগের শেষ কলির যে সকল প্রভাব বা লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৪,৩২০০০ বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ হাজার বৎসর মাত্র অতীত না হইতেই, পূর্ণ-কলির প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কলিযুগের এই এক বৈশিষ্ট্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়, ইহা কলি বিনির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইবার নিদর্শন। এক বিরাট প্রেমযুগের অভ্যুদয় সূচনা জানাইয়া দিয়া, কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে অপর কলিযুগ হইতে বর্ত্তমান্ কলিযুগের এই অসাধারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয়।

অভিধানে যেমন চতুর্থযুগকে "কলিযুগ" নামে নিরূপিত করা হইয়াছে, তেমনি আবার দেখা যায়, "কলি" শব্দের যুদ্ধ, বিগ্রহ, কলহ প্রভৃতি অর্থ। শাস্ত্র বর্ণিত পূর্ণ কলির লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবার যদি কাহারও অবসর না ঘটে, অন্ততঃ কলি শব্দার্থের সহিত জগতের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেও কলিভাবের পরিপূর্ণতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। বিদ্বেষ ও কলহের দীপ্ত বহ্নি কেবল ভারতে নহে,—জগতের সর্ব্বত্রই প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শাসক ও শাসিতে কলহ, ধনিক ও শ্রমিকে কলহ, প্রাচীন ও তরুণে কলহ, জাতিতে জাতিতে কলহ, বর্ণে বর্ণে কলহ, স্ত্রী পুরুষে কলহ,—শিক্ষায়, ধর্ম্মে, সমাজে, সম্প্রদায়ে কলহ,—কলহ—কলহ—সর্ব্বত্রই এই কলহানল—এই বিদ্বেষাগ্নি বিপুল আকারে জ্বলিয়া উঠিতেছে। একস্থানের কলহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে যাইয়া উহাই আবার শতধায় শত ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এরূপ হিংসা—বিদ্বেষ, এরূপ যুদ্ধ, বিগ্রহ ও কলহ ভাব একযোগে জাগ্রত হওয়া জগতের ইতিহাসে একান্তই বিরল। সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ততঃ এই "কলি" শব্দার্থের কলহ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলে বর্ত্তমান সময়কে কলির পূর্ণাবস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না; অতএব এই কলিযুগের প্রথমেই অন্তিম কলি-প্রভাব যাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে,—গৌরলীলা-প্রভাবেই কলির এই মরণ লক্ষণের মূল কারণ,—একথা জগত ক্রমশই বুঝিতে পারিবে।

এই কলিযুগকে "প্রেমযুগে" পরিণত করিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি স্বয়ং আসিয়া এই জগতের উপর প্রেম-বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। যেমন শস্যাদির বীজ বপনের পর অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে কিছু দিন তাহাকে মৃত্তিকাগর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়, গৌরলীলা সঞ্চারিত প্রেমধর্ম্ম-বীজেরও এখনও পর্য্যন্ত প্রায় সেইরূপ প্রথমাবস্থা, কচিৎ কোথাও অঙ্কুর বা দ্বিতীয়াবস্থার বিকাশ হইতেছে মাত্র। কারণ বা বীজরূপে

সঞ্চারিত যে প্রেমতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু—নদে ভেসে" গিয়াছিল,—তাহারই কার্য্য বা ফলস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রেমধর্ম্মের এক মহা-প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষকে ডুবাইয়া, সারা জগত ভাসাইয়া দিবে। যে কলিযুগে বিশ্বব্যাপী প্রেমধর্ম্মের বীজ বা কারণের সঞ্চার হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেম-ক্ষেত্রের উপর কলির অবস্থিতি একান্তই অসম্ভব। তাই অন্যান্য কলি-যুগের শেষ লক্ষণ, শ্রীগৌর প্রকটিত কলিযুগের প্রারম্ভেই প্রকাশ হইতে দেখিয়া, কলির দ্রুত নিষ্ক্রমণ ও প্রেমযুগের আগমন বা অভ্যুদয় সূচনা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখা যেমন শেষ একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রথম কলিতে পূর্ণ কলিভাবের প্রকাশ—ইহা কলিপ্রভাব নির্ব্বাপিত হইবার সূচনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নিজ যুগকে করতলভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা দৃষ্টে, কলি 'মরণ কামড়ের' মত অবসান-প্রাপ্তির পূর্ব্বে একবার তাহার পূর্ণ ও শেষ প্রভাব প্রদর্শন করাইবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছে।

চিদাত্মবাদের পবিত্র বেদীর উপর দেহাত্মবাদ বা জড়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করাই কলির শ্রেষ্ঠতম প্রভাব; যাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল—ধর্ম্মে অনাস্থা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এই দুই অনর্থ-কীটের অবিরত দংশনে জীবের অন্তরস্থিত চিদ্বৃত্তিরূপ কোমল পল্লব সকল জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তৎস্থলে এক বিকট শুষ্কতা জাগিয়া উঠে—যাহার অন্য নাম নাস্তিকতা। বর্ত্তমান জগত নির্গমনোন্মুখ কলির প্রভাবকৃত জড়বাদ বা নাস্তিকতার এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিবার জন্য সারা বিশ্ব যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! প্রকাশ্যে আস্তিকতা পোষণ করিয়াও আবার অন্তরে অনেকেই জড়বাদী—নাস্তিক। জীবের এই জড়তা, কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণে যতই দ্রুততর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, জড়ের উপাসনা বা কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল লালসা সন্নিপাত রোগীর পিপাসার মত ততই দুর্দ্দমণীয় ভাব ধারণ করিতেছে। বহির্ম্মুখতার খরস্রোতের ভিতর এখন একখানি জীর্ণ কঙ্কালের মতই ধর্ম্ম ভাসিয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মই বিশ্বকে ধারণ করেন। ধর্ম্মের বন্ধন যতই শিথিল হইয়া পড়ে, সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য বা অস্থিরতা জগতে ততই জাগিয়া উঠে। আত্মধর্ম্মের অবমাননা হইতেই বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী অসমতা ও অশান্তির উদ্ভব। সকল বৈষম্য,—সকল অস্থিরতা,—সকল হিংসা, বিদ্বেষ, কলহের একমাত্র কারণ—আত্মধর্ম্মের শৈথিল্য কেবল জীব জগতেই নহে, জড় জগতেও এক অসাধারণ—এক অশ্রুতপূর্ব্ব বৈষম্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই যে অস্বাভাবিক ঝটিকা, ঘূর্ণবাত্যা, জল প্লাবন, ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির অনলোদ্গার, দুর্ভিক্ষ, মহামরক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত, অপঘাত প্রভৃতির সংবাদ প্রায় প্রত্যহই বর্দ্ধিতাকারে পাওয়া যাইতেছে, ইহারও একমাত্র কারণ, সেই ধারণ-রজ্জু বা ধর্ম্মের শিথিলতা।

একযোগে সমস্ত জগতব্যাপী এই যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা বা অশান্তভাব,—এই অসাধারণ লক্ষণ সকলই জানাইয়া দিতেছে,—একযোগে সমগ্র জগতব্যাপী কোনও এক বিরাট সাম্যধর্ম্ম বা শান্তভাব আগতপ্রায়! শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন সাম্য-ধর্ম্ম বা পরম শান্তির কারণ স্বরূপ হইয়া, এই নির্গতপ্রায় কলির অবসান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উদিত হইবেন। গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য। চঞ্চল হইবার জন্য—স্থিরতা প্রাপ্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থ অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বর্ত্তমান জগতের এই অস্বাভাবিক অস্থিরতা যে, কোনও এক পরম সুস্থিরতাকে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বরূপ বা সূচনা মাত্র, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যে শান্তিকে—যে স্থিরতাকে—যে সমতার মহামিলনকে জগৎ সুদীর্ঘকাল হইতে অন্বেষণ করিতেছে, সেই প্রেমধর্ম্মের অভ্যুদয় যে প্রাদেশিক বা আংশিক না হইয়া বিশ্বব্যাপী আকারেই উদিত হইবে—এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চলতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঝটিকা বিধ্বস্ত রজনীর অবসানের পর যেমন বালারুণ-চুম্বিত স্নিগ্ধ উষার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এই কলিকৃত জড়বাদ বা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার অবসানেই, ভক্তিবাদ—প্রেমবাদের স্নিগ্ধ ও শান্ত উষার আলোকে আবার জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিবে। হিরণ্যকশিপুর বৃদ্ধি হইলেই যেমন প্রহ্লাদের বিকাশ হয়, তেমন কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃষ্ট আনন্দের বিকাশ বা প্রেমপুণ্যের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। জগতের সেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন—সেদিন উদয় হইবার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবসংবাদ

শ্রীপাট রামকেলী দর্শন

এইস্থানে রূপসাগর নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এই সাগরটীর জল অতি সুনির্ম্মল এবং সম্পাদক গোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিস-কর্ম্মচারিগণ যাহাতে কেহ যেন নামিয়া স্নান বা কুলকুচির জল না ফেলে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেছেন। শুনিলাম এই সরোবর পূর্ব্বে জঙ্গল ও কর্দ্দমময় থাকায় লোকের অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টাতেই ভারতেশ্বরের ও পুর্ত্তবিভাগের উদারচেতা ভক্ত ও ধনিগনের সাহায্য লইয়া চব্বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তাহার সংস্কার করা হইয়াছে। তৎপরে সম্পাদক গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে লইয়া যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ রূপ সনাতন মিলিত হইয়াছিলেন, সেই মিলনের সাক্ষি-স্বরূপ কেলীকদম্ব বৃক্ষ-মূলে লইয়া গেলেন। সেই স্থানের বৃক্ষ-পাঁচটীর তল-প্রদেশ বৃহৎ ও উচ্চ করিয়া বাঁধান আছে, তাহার উপরিভাগে তমাল-তরুমূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতি জাগাইবার জন্য প্রস্তরের উপর দুইটী চরণচিহ্ন সুরক্ষিত হইয়াছে। আমি ও আমার সঙ্গিগণ দর্শন করিবামাত্রই সেই মিলন-লীলাটী হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হওয়ায় কিছু বিবশ হইয়া পড়িলাম। তখন সেস্থানে অষ্টাঙ্গে প্রণাম ও গড়াগড়ি দিয়া নিজেকে ধন্য মানিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আবেশ-ভরে সম্পাদক গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এই-স্থানেই শ্রীরূপ সনাতন আপনাদের প্রভুর চরণে মিলিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন"। তাঁহার এই কথাগুলির যেন প্রতি অক্ষর কর্ণে সুধা ঢালিতে লাগিল। তৎপরে সেস্থান হইতে শ্রীরাধা-মদনমোহন জিউকে দর্শন করাইবার জন্য আমাদিগকে লইয়া গেলেন। এই শ্রীরাধা-মদনমোহন-জিউর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এই শ্রীবিগ্রহ যুগল শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত, কেহ-বা বলেন শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পক্ষে কিন্তু উভয় প্রবাদই সমান আদরনীয়। শ্রীরাধামদন-মোহন জিউকে দর্শন প্রণামাদি করিয়া আবার শ্রীকেলী-কদম্ব বৃক্ষমূলে আসিয়া বেদীর উপর বসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের নিশীথ রজনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ হইতে লাগিলেন ; সেই পাঠের সময় চোখের জল সম্বরণ করা দায় হইয়া পড়িল—কারণ না জানি কি এক অপূর্ব্বভাবে শ্রীপাদ রূপসনাতনের ও সেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিরহ স্ফুর্ত্তি হওয়ায় প্রাণটা বড়ই অধীর হইয়া উঠিল। সেই লীলাস্থলীতে সেই কেলীকদম্ব বিদ্যমান রহিয়াছেন কিন্তু তোমরা কোথায়! মূল কথা সেইসময়ে হৃদয়ের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। শ্রীশ্রীরামকেলীর প্রত্যেক ধুলী-কণাতে যেন অনুভূতি মাখান রহিয়াছে। তা নাই বা হইবে কেন? কারণ সাধারণ বৈষ্ণবচরণরেণুই অনুভূতির হেতুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আর শ্রীপাদ রূপসনাতনের পদাঙ্ক-বিভূষিত ধূলিকণা যে অনুভূতি দান করিবে সে বিষয়ে আর সংশয় করিবার কি আছে? তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন—

"বৈষ্ণব চরণরেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।"

তারপর শ্রীরূপসায়রের ঘাটে আসিয়া বসিলাম। মেলায় মিলিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা করা সুকঠিন। কেন না তাহাদের মধ্যে অনেকে চলিয়া ফিরিয়া দর্শন আদি করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কেহ বা বৃক্ষতলে বসিয়া গোপীযন্ত্র প্রভৃতি তাদের যন্ত্র ও খোল করতাল সহযোগে শ্রীরূপ-সনাতন ও নিতাইগৌরাঙ্গের নাম, গুণ লীলা গান করিতেছে কেহ বা রন্ধন শেষ করিয়া ভোজনে বসিয়াছে, কেহ বা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সরোবরের চারিদিকে অনেক খড়ের ঘর ও চাঁদোয়া খাটান আছে, ঘরগুলিতে ও চাঁদোয়ার তলে লোকের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় আম্র-বাগানে আশ্রয় নিয়াছে। সভার স্থানটীতে একটী সুবৃহৎ খড়ের ঘর আছে, সেই ঘরখানিতেও বহু যাত্রী আশ্রয় লইয়াছিল; আবার তাহার চারি পার্শ্বের অনাবৃত-স্থানেও বহু যাত্রী ছিল। ঐ বৃহৎ খড়ের ঘরের সন্নিকটে সম্পাদক মহাশয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয় যাত্রীদের জন্য কতক-গুলি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘরগুলিতে সম্ভ্রান্ত যাত্রিগণ সপরিবারে অবস্থান করিয়া উৎসবে যোগদান করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয় ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের প্রসাদ পাইবার সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জিউর মন্দিরে প্রচুর ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই প্রসাদ যথাযোগ্য ভাবে বিতরণ করিতেছিলেন। রূপ-সায়রের চতুর্দ্দিকে ছোট বড় অনেক অন্ন-মহোৎসব যাত্রিগণের ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। শুনিলাম এইরূপ প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে; জানিলাম এবার লোকসমাগম অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কম হইয়াছে। আমরা এইসকল অনুষ্ঠান হৃষ্ট-চিত্তে দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করিবার মানসে রূপ-সায়রের জল পান করিলাম।

বেলা ৬ ঘটিকার সময় রূপ-সায়রের তীরে সুবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সভার প্রারম্ভ হইলে অমানি-অদম্ভি-সহিষ্ণু-উদারচেতা-ভক্তিজীবন ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে একটী প্রারম্ভিক সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় গত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তারপর পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিপ্রাণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব গোস্বামী মহাশয় সুললিত ভাষায় ভক্তি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করেন। অতঃপর সম্পাদক গোস্বামী মহাশয়ের ও সভ্যগণের অনুরোধে প্রথমত শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের কি মহিমা বর্ণন করিয়া—

"এইতো কহিনু সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদ শাস্ত্র উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥"

এই শ্রীসনাতনশিক্ষার পয়ারটী অবলম্বনে দুইঘন্টা বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি প্রচুরতর আনন্দ ও কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীপাটে বৈষ্ণবগণের আবেশ দেখিয়া প্রচুরতর আনন্দ ও কৃতার্থতালাভ করিয়াছিলাম। পরে আমরা পুনরায় রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় মালদহের বাসা বাটীতে পৌঁছি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয়ের প্রগাঢ় চেষ্টা ও প্রযত্নে এই শ্রীরামকেলী সমুজ্জলরূপে পুনর্জ্জাগরণ লাভ করিয়াছেন, এইজন্য সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁহার শ্রীপাদ রূপ সনাতনের চরণে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিলাম, তাহাতে অবশ্যই শ্রীপাদ গোস্বামিযুগল এ জন্মেই হউক্ বা জন্মান্তরেই হউক্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিত প্রেমভক্তিরসে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবেন এ বিষয়ে আমার মনে অনুমাত্র সংশয় নাই। তিনি পুনরায় ১লা আষাঢ় অতি যত্নে ও সমাদরের সহিত আমাদিগকে ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

আমি যেরূপ আনন্দ ও আস্বাদন পাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে মনে হয় আবার কতদিনে শ্রীরামকেলী যাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিজ জীবন ধন্য করিব। এখনও আমার বুকের নেশা যায় নাই; আমি যাহা শিখিলাম তাহা সকলই স্বভাবোক্তি-অলঙ্কারে বিভূষিত!

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী